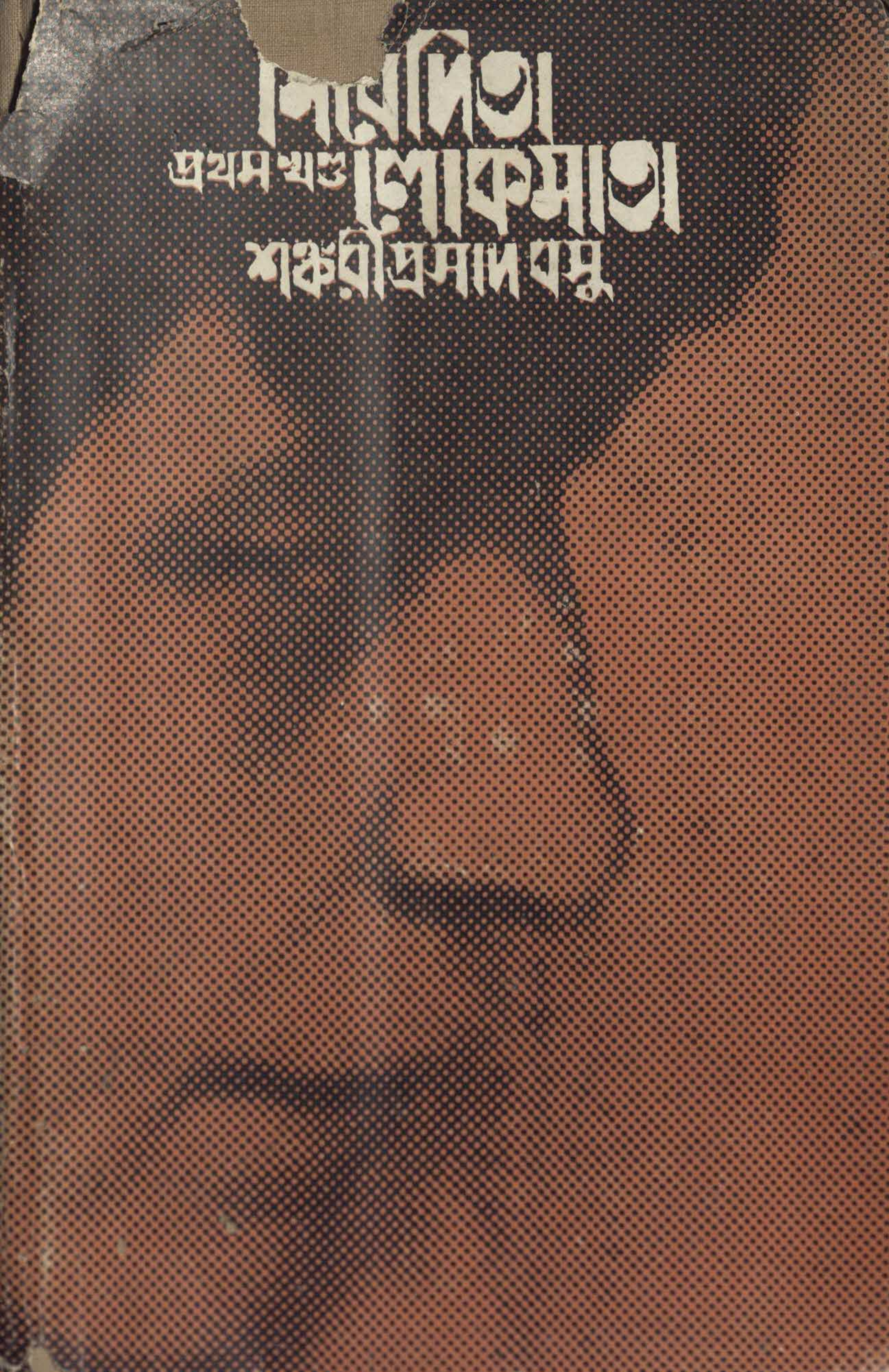
নিবেদিতা লোকমাতা

প্রথম খণ্ড

শঙ্করীপ্রসাদ বসু



ভগিনী নিবেদিতা (পূর্বনাম মার্গারেট ই নোবল : ১৮৬৭-১৯১১) স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, ভারত-ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের ধাত্রী-জননী। নিবেদিতা কী ছিলেন এবং কী করেছিলেন, তার অর্ধাবৃত ইতিহাসকে বিপুল পরিশ্রমে, বহু অজানিত তথ্যসহ এই গ্রন্থে লেখক উন্মোচন করেছেন। সমসাময়িক সংবাদপত্র, দুর্লভ গ্রন্থ, নানা স্মৃতি-কথা ছাড়াও নিবেদিতার পাঁচ শতাধিক অপ্রকাশিত পত্র থেকে উপাদান সংগৃহীত। ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী সারদানন্দ, প্রিন্স ক্রপটকিন, লেডী ইসাবেলা মার্গেসন, ই টি স্টার্ডি, মিস লংফেলো প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নরনারীর পত্রও গ্রন্থে আছে। মূল্যবান তথ্যগুলির প্রামাণিকতা দেখানোর জন্য প্রচুর সংখ্যায় চিত্র ও প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্রটি এই গ্রন্থের সম্পদ। স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্বে নিবেদিতার এক সপ্তাহের দিনলিপির প্রতিলিপিও তাই।

বর্তমান খণ্ডে চার পর্ব। "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা" পর্বে নিবেদিতার আধ্যাত্মিক জীবন, রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী সম্বন্ধে তাঁর উৎকৃষ্ট রচনার সংকলন, সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-জ্বলন্ত মূর্তি। নিবেদিতার চিঠিতে বিবেকানন্দের যে অন্তরঙ্গ উদ্দীপিত রূপের সাক্ষাৎ মিলেছে, পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে তা মূল্যবান সংযোজন। "মৃত্যুরূপা কালী" নামক দ্বিতীয় পর্বে বিবেকানন্দের অসাধারণ মৃত্যু-দর্শন, নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা, তার তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। এইসূত্রে অধ্যাত্মরাজ্যের কিছু 'গোপন দলিল'ও প্রথম লোকলোচনে আনা হয়েছে। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই যে, নিবেদিতা লণ্ডনের বিদগ্ধমহলে প্রতিপত্তি অর্জনের পথে এগিয়েছিলেন, তা দেখানো হয়েছে "পূর্বজীবন" পর্বে। ঐকালে লেখা নিবেদিতার ১৫টি দুষ্প্রাপ্য লেখাও এখানে রয়েছে। বিস্তৃত চতুর্থ পর্বের বিষয়বস্তু আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কার, ভারতে বিজ্ঞান-আন্দোলন, আচার্যের জীবন ও সাধনায় নিবেদিতার প্রেরণালক্ষ্মীর ভূমিকা। এই পর্বটিকে ডঃ বসুর উপর বিশেষ গবেষণাও বলা চলে।

পশ্চাতের প্রচ্ছদে দেখুন—

নিবেদিতা লোকমাতা

প্রথম খণ্ড



নিবেদিতা লোকমাতা

প্রথম খণ্ড

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

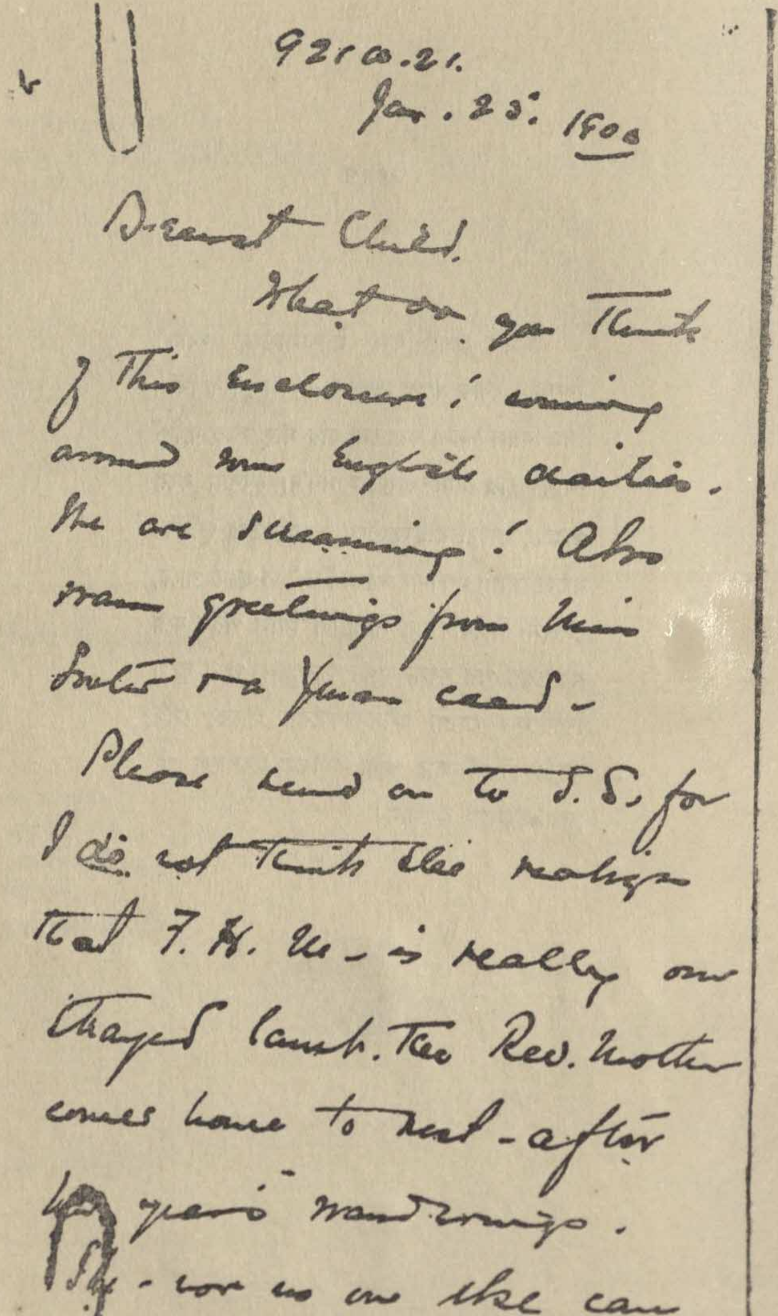
প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ :
জন্মাষ্টমী, ১৩৭৫
১৫ই আগস্ট ১৯৬৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
১৫ই জনুয়ারী ১৯৭১

দাম : ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন থেকে যিনি নিজ বয়স গণনা করতেন, যাঁর মাতৃস্নেহ-দৃষ্টি স্বামীজীর মানসকন্যাকে সর্বদা বেষ্টন করে থাকত, ভারতের ইতিহাসে নিবেদিতার ভূমিকা যাতে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নির্ণীত হতে পারে, সেজন্য নিবেদিতার পত্রগুলি যিনি পরম যত্নে বৎসরের পর বৎসর রক্ষা করেছেন, পরে তুলে দিয়েছেন যোগ্য জীবনীকারের হাতে, সেই মহীয়সী মহিলার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।


921 W. 21.
Jan. 23. 1900

Dearest Child.
What do you think
of this enclosure; coming
around our English critics.
We are screaming! Also
warm greetings from Miss
Souter on a Xmas card -
Please send on to J. S. for
I do not think she realizes
that F. H. M.- is really our
changed lamb. The Rev. Mother
comes home to rest - after
years' wanderings.
She - for no one else can

নিবেদিতাকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠির এক পৃষ্ঠা

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে প্রবেশ ও পরিক্রমণকে রোমা রোলাঁ আত্মার তীর্থযাত্রা বলেছিলেন। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'র জীবন ও সাধনার ইতিহাসের মধ্যে কয়েক বৎসর ধরে যে পরিক্রমণ করছি—তাও আত্মারই তীর্থযাত্রা, সন্দেহ নেই।

একথা গোপন করার প্রয়োজন নেই, ভগিনী নিবেদিতার উপর এই আকর গ্রন্থ প্রস্তুতের জন্য কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবহেলার ধূলি সরিয়ে প্রায় লুপ্ত উপাদানসম্ভার উদ্ধার করার কালে দৈহিক ক্লান্তি বোধ করেছি অনেক সময়, কিন্তু মানসিক ক্লান্তি কদাপি নয়; এই গবেষণা যে আনন্দ দিয়েছে, দুর্লভ সে প্রাপ্তি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, আরো আরো চাই, প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে, এবং বিস্ময়—জীবন এত বৃহৎ, এত মহৎ হয়! ভগিনী নিবেদিতার জীবনকে জানা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

অথচ ভগিনী নিবেদিতার উপর বৃহৎ আকারে সন্ধানকাজ চালাবো, আট-দশ বছর আগেও তেমন কোনো অভিপ্রায় ছিল না। বিবেকানন্দ-জীবন সম্বন্ধে আমাদের পূর্বাবধি আকর্ষণ, ব্যাপক গবেষণায় বহুদিনের অভিলাষ। সে কাজ প্রায় এক যুগ আগে আরম্ভও করে দিয়েছিলাম। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর সময়ে তার প্রারম্ভিক কিছু ফসল 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। তারও পূর্ব থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে বিবেকানন্দ-সংবাদের জন্য বিস্তারিত সন্ধান করে আসছি শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায়। এই সন্ধানের জন্য ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণও করেছি। ফলে ইংরাজিতে "বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপারস্" নামে যে বিশাল আকর গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে, তার মধ্যে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের এক প্রধান চরিত্ররূপে ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বেশ কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। ঐ সংবাদগুলি নিবেদিতা সম্বন্ধে অধিক সন্ধানের ইচ্ছা মনে ক্রমে জাগরূক করে।

বিবেকানন্দ-জীবনে আগ্রহীদের কাছে ভগিনী নিবেদিতার জীবন স্বভাবতই আগ্রহের বস্তু ছিল, কিন্তু খুব সীমাবদ্ধ আকারে। নিবেদিতা বিবেকানন্দের মানসকন্যা, একথা দীর্ঘদিন শুনে এসেছি। সরলাবালা সরকার রচিত ও উদ্বোধন-প্রকাশিত নিবেদিতার যে-স্মৃতিকাহিনীটি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে নিবেদিতার অসাধারণ চরিত্রমহিমা আশ্চর্য সরলতা ও মর্যাদার সঙ্গে লিখিত ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র আকারের ঐ বইটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-কাহিনী নয়। স্বামীজীর জীবনীতে নিবেদিতার কথা অবশ্য যথেষ্টই ছিল এবং স্বামীজীর উপরে নিবেদিতার লেখা দুটি গ্রন্থও প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত কিছু থেকে নিবেদিতা অসাধারণ ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের প্রতীক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন কিন্তু কেন তিনি বিবেকানন্দের মানসকন্যা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, এবং যাঁরা তাঁকে সে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও তা স্পষ্ট করে তোলেননি। বিশেষ ভক্তির সঙ্গে আত্মনিবেদন করাই

কি বিবেকানন্দের মত প্রচণ্ড গতিশীল মানুষের মানসকন্যা হবার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতা? রামকৃষ্ণের দায়ভার যিনি বহন করেছেন, সেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে কী করেছেন, তার কিছুটা আমরা জেনেছি, কিন্তু বিবেকানন্দকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নিবেদিতা কতটুকু করেছিলেন? মেয়েদের একটি স্কুল চালানো এবং কয়েকটি বই লেখার বাইরে তাঁর কর্মের রূপ কী ছিল?

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যখন উদ্বোধন পত্রিকায় ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি থেকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিপুলায়তন রচনাটি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, তখন আংশিক কিছু উত্তর পেয়েছিলাম। গিরিজাশঙ্কর প্রাসঙ্গিকভাবে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং শিল্প-আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছিলেন। সে এমন তথ্য, যা মনে প্রশ্ন উদ্রিক্ত করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তর কতখানি, তা অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। ডঃ কালিদাস নাগের একটি-দুটি প্রবন্ধ একই ধরনের কাজ করেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, যখন শ্রীনারায়ণী দেবী মাসিক বসুমতীতে ১৯৫২ সালের প্রায় শেষ ভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে লিজেল রেম'-লিখিত নিবেদিতার ফরাসী জীবনীর বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করে দিলেন। লিজেল রেম'র ফরাসী জীবনীর একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রবন্ধ ভারত পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৪৬ সংখ্যায় ডঃ বিনয়কুমার সরকার করেছিলেন, কিন্তু তা মনে রাখার প্রয়োজন হয়নি যেহেতু ফরাসী গ্রন্থ ভাষাব্যবধানে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। নারায়ণী দেবীর অনুবাদ আমাদের চমকিত করেছিল। সেই প্রথম নিবেদিতার কর্মজীবনে ব্যাপকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, অন্তর্জীবনের গভীর-মথিত রূপের সঙ্গেও। সেই প্রথম নিবেদিতা পূর্ণাঙ্গ রূপের আভাস নিয়ে বাঙালী মনের কাছে অবতীর্ণ হলেন। আমরা বুঝেছিলাম, বিবেকানন্দের মানসকন্যা হওয়ার অর্থ বিবেকানন্দের অভিপ্রেত ভাবগুলিকে ভাবে-কর্মে সর্বাত্মকভাবে বিকশিত, প্রকাশিত করে তোলা। মনে রাখতে হবে, ভারত ও পৃথিবী সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মত গভীর-ব্যাপক চিন্তা আর কোনো ভারতীয়ের মধ্যে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

নারায়ণী দেবীর অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। তার চার বছর পরে (১৯৫৯) সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের পক্ষ থেকে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বাংলায় 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে জীবনী গ্রন্থখানি লেখেন, আরও দু'বছর পরে (১৯৬১) একই তথ্যের উপরে লেখা প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার 'সিস্টার নিবেদিতা' নামক ইংরাজী জীবনী প্রকাশিত হয়। তার কিছু আগে (১৯৬০) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রকাশিত হয়েছে। কাছাকাছি সময়ে আরও একটি দুটি বই।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, লিজেল রেম'র গ্রন্থের বাংলা অনুবাদই এদেশে নিবেদিতার বিষয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে এবং মুক্তিপ্রাণা-আত্মপ্রাণার লেখা জীবনী দুটি সেই কৌতূহলকে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপন করে। মুক্তিপ্রাণা-আত্মপ্রাণা জীবনী রচনায় সত্যই শ্রমস্বীকার করেছেন, কোনো তথ্যকেই যাচাই করার আগে সত্য বলে মানতে রাজি হননি। তাঁরা লিজেল রেম' বা তাঁর উপর নির্ভরশীল গিরিজাশঙ্করের লেখায় নিবেদিতার বৈপ্লবিক জীবন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার বহুলাংশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। সে প্রতিবাদ যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গে করা হয়েছে কিনা, তার বিচার যথাসময়ে আমরা করব, এখানে এইটুকু বলে নিতে পারি, নিবেদিতা সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন লিজেল রেম', তার মীমাংসায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তিপ্রাণা ও আত্মপ্রাণা।

এই সমস্ত গ্রন্থপাঠ করে প্রভূত আনন্দ ও শিক্ষালাভ করলেও নিবেদিতার উপর গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিনি। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থের অভূতপূর্ব সমাদর লক্ষ্য করার পরে ক্রমে মনে হতে লাগল, নিবেদিতা শতবার্ষিকীতে নিবেদিতার উপরে ঐ ধরনের একটা কাজ করা উচিত। তদনুযায়ী পুরাতন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দিলাম। প্রচুর সংবাদ মিলল। নিবেদিতার বহিরঙ্গ কার্যকলাপের ঐসব বিবরণের সঙ্গে অন্তর্জীবনের রূপ জানবার আগ্রহ স্বতঃই হতে লাগল। মনে পড়ল, নারায়ণী দেবীর গ্রন্থের শেষে 'নিবেদিতার পত্রাবলী যন্ত্রস্থ', এই ধরনের একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল। সেই গ্রন্থটির সংবাদ চেয়ে নারায়ণী দেবীর নামে একটি চিঠি দিয়েছিলাম প্রকাশকের ঠিকানায়। পত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনই উচ্চাশা ছিল না।

উত্তর এসেছিল, কিছু বিলম্বে, যেহেতু ঠিকানা ফিরি হয়ে তবে গন্তব্যস্থানে চিঠি পৌঁছেছিল। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে নারায়ণী দেবী লিখেছিলেন, নিবেদিতা-পত্রাবলী আপাতত বেরুচ্ছে না, চিঠিগুলি আছে শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে, যদি প্রয়োজন মনে করি, কেয়াতলা রোডের একটি বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে যেন দেখা করি।

রবিবারের সেই দুপুরটি নিশ্চয় আমার জীবনের এক শুভদিন, যেদিন শান্ত পরিচ্ছন্ন কেয়াতলা রোডের একটি বাড়িতে ঠিকানা খুঁজে উপস্থিত হয়েছিলাম, সৌম্যদর্শন, স্পষ্টতঃ অবাঙালী এক ভদ্রলোক সুমিষ্ট বাংলায় বলেছিলেন, হাঁ, স্বামীজী আছেন, একটু অপেক্ষা করুন। অল্প পরে ভিতরের একটি ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ছোট ইজিচেয়ারে শীর্ণকায় এক সাধু বসেছিলেন, পরনে গেরুয়া নয়, শুভ্রবাস, মুখে কাঁচা-পাকা অল্প দাড়ি, অনেকটা রামকৃষ্ণ-পার্ষদ বলরাম বসুর মত চেহারা, ভারী শান্ত, গভীর কালো চোখ, মৃদু-স্বরে যখন কথা বললেন—স্নিগ্ধ সুরেলা কণ্ঠ। আমি পরিচয় দিলাম, প্রয়োজন জানালাম। উত্তরে বললেন, হাঁ, নিবেদিতার চিঠি তাঁর কাছে আছে। আনন্দের উত্তেজনায় নিজের পরিচয় ও প্রয়োজনকে ঈষৎ আতিশয্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছি পুনশ্চ। তিনি চুপ করে শুনেছেন। কথা শেষ হলে বলেছেন, 'বেশ তো, চিঠিগুলি নিয়ে যান!' কী বললেন, আমি যেন সত্যই বুঝতে পারিনি। 'কতগুলি চিঠি আছে?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম। 'কম বেশী পাঁচশো।' সংখ্যা শুনে হতবাক হয়ে আমি বলেছিলাম, 'যদি অনুগ্রহ করে চিঠিগুলি ব্যবহার করতে দেন! বলেন তো, আমি এখানে এসে অল্পে অল্পে দেখে যাব।' পূর্বের মতই মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'বলেছি তো, চিঠিগুলি নিয়ে যান।' এবার সত্যই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আত্মসংবরণ করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'কিন্তু শর্ত কী—এতগুলি মহামূল্য জিনিস দিচ্ছেন—'

সে হাসি কখনো ভুলবো না—সাধু ব্যক্তি হেসে বলেছিলেন, 'শর্ত আছে, একমাত্র শর্ত, আপনি নিবেদিতার উপরে কাজ করবেন।' ইতিমধ্যে আমি নিজেকে আরও সামলে নিয়েছি। স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমি যে সত্যই কাজ করব, তা বুঝলেন কি করে?' তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনি করবেন।'

এরপরে ইতস্ততঃ আরও কিছু কথা হয়েছিল। অধিকাংশই আমি বলেছিলাম, তিনি নীরবে শুনেছিলেন। তারপরে গৌতমবাবুকে ডেকে (অবাঙালী গুজরাটি ভদ্রলোকের নাম শ্রীগৌতম ধর্মপাল) চিঠির বাক্স আনতে বলেছিলেন। সেই বাক্সভর্তি অনুভূতিময় ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আমি আবার দ্বিধা প্রকাশ করেছিলাম। তখন তিনি একটু স্পষ্ট

তীক্ষ্ম ভাষায় বলেছিলেন, 'দশ বছর ধরে এই তাড়া আগলাচ্ছি, অনেককে বলেছি, কেউ রাজি হয়নি কাজ করতে। আপনি নিজে এসেছেন, আপনার কিছু লেখার কাজের সঙ্গে আমি পরিচিত, আমার মনে হচ্ছে, আপনি একাজ করবেন, আপনাকে বিশ্বাস করছি, আশা করছি সত্যই করবেন। বাল্যকাল থেকে নিবেদিতার ভক্ত আমি। তিনি আমাদের জন্য কতখানি করেছেন, তার কিছুটা জানতাম, আর কী দুঃখ হত যখন দেখতাম, এমন চরিত্রকে বাঙালী ভুলে গেল...।' শেষের দিকে গলা ভারী হয়ে এল।

সেদিন অপরাহ্ণশেষে একটি পিচবোর্ডের বাক্স হাতে নিয়ে কেয়াতলা রোডের সেই বাড়িটির গেট খুলে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন সুগভীর আনন্দের বিষাদে মন আচ্ছন্ন, আর আতঙ্ক, প্রায় আতঙ্কই বোধ হচ্ছিল—আমার প্রতি একজন অপরিচিত সাধু ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য। তাঁর মধ্যে সাধুত্বের একটা লক্ষণ অন্তত সেই প্রথম পরিচয়েই দেখেছিলাম—অসাধারণ আনন্দময় নির্লিপ্ততা, যা সামান্য শর্ত না রেখে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে-কোনো বস্তু দান করতে পারে।

কয়েক বছর ধরে সেই বিশ্বাসের দায় আমাকে বইতে হচ্ছে। নিবেদিতার বিপুল পরিমাণ চিঠির ভিতর থেকে তথ্য সংকলন করে গ্রন্থমধ্যে নানাপ্রসঙ্গে পরিবেশন করেছি অন্যত্র-সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে। তারপরে আরও বহুবার শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে গিয়েছি, লিজেল রেম'র কাছ থেকে তিনি আরও চিঠি ও উপাদান আনিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ওখানেই নারায়ণী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, জেনিভা থেকে কিছুদিনের জন্য ভারতে আগত শ্রীমতী রেম'র সঙ্গেও, যখনি প্রয়োজন অকুণ্ঠ সাহায্য তাঁরা করেছেন—কৃতজ্ঞতার কথা এখানে বাহুল্য।

গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। বর্তমান খণ্ড চার পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব স্বভাবতই 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। এই পর্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছাড়া রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই পর্বের সম্পদ—নিবেদিতার পত্র থেকে প্রাপ্ত স্বামীজীর ব্যক্তিগত রূপ। বিবেকানন্দ নামক অসীম জ্বলন্ত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে নিবেদিতা পত্রমধ্যে তুলে ধরেছেন, নিখিল ধর্ম-সাহিত্যের যা গৌরব হতে পারে। এইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যায়, এই গ্রন্থ নিবেদিতা-গবেষণার মত বহুলাংশে বিবেকানন্দ-গবেষণাও। নিবেদিতা তাঁর প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও কখনই বিবেকানন্দ-অতিক্রমী চরিত্র নন। কর্মে ও রচনায় বিবেকানন্দের জীবন-ভাষ্য রচনা করাই তাঁর সাধনা ছিল। তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গের গোড়ায় স্বামীজীর চিন্তা ও চরিত্রের একটা ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

মার্গারেট নোবল নিবেদিতা হয়ে কালীকে বরণ করেছিলেন, তাই দ্বিতীয় পর্ব 'মৃত্যু-রূপা কালী'। ইংরাজ মহিলার কালীপূজা ও কালী-বক্তৃতা সেকালের শিক্ষিত বাঙালীকে চমকিত করে কিভাবে তাঁদের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—সমসাময়িক সূত্রে তার বহু সংবাদ সংগ্রহ করে দিয়েছি। সেইসঙ্গে 'অধ্যাত্মরাজ্যের মহাদলিল' নামে আখ্যাত করে নিবেদিতার পত্রের কয়েক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দিয়েছি, যার মধ্যে কালীর সঙ্গে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাক্ষাৎ স্বীকারোক্তি মিলবে স্বামীজীরই মুখে।

একথা আবার একই সঙ্গে সত্য, মার্গারেট নোবলই ভগিনী নিবেদিতা হয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রাণ-মনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহ বোধ করবেন তাঁদের কাছে তৃতীয় পর্ব 'পূর্ব জীবন' মূল্যবান ঠেকবে। নিবেদিতার বংশ-পরিচয় এবং পিতা, মাতা, ভাই, বোন সম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ এখানে আছে। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজে নিবেদিতা কি প্রকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার আভাস এখানে পাওয়া যাবে। ছদ্মনামে লেখা নিবেদিতার ১৫টি রচনা মূল ইংরাজিতে (বাংলায় সারানুবাদসহ) উপস্থিত করেছি। এই লেখাগুলি অন্যত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এগুলি ছিল, পরে তাঁর বোন সেগুলি রক্ষা করেন। এই লেখাগুলি দেখিয়ে দেয়, তরুণ বয়সেই নিবেদিতা কি ধরনের পরিণত বুদ্ধি ও রচনাশৈলীর অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৃথা বলেননি, তাঁর যে প্রতিভা ছিল তাতে সহজেই স্বদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারতেন।

শ্রীমতী লিজেল রেম'র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিবেদিতা-গবেষণার সূত্রপাত; তারই একটা পটভূমিকা আমরা এই অংশে দিয়েছি।

বৃহৎ চতুর্থ পর্বের মূল বিষয়বস্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার ব্যাপক সাহায্য। জগদীশচন্দ্র কেবল বড় বৈজ্ঞানিক নন, ভারতে বিজ্ঞান-আন্দোলনেরও কার্যতঃ প্রবর্তক। তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার সময়ে সেকথা নিবেদিতা মনে রেখেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের ইতিহাস ইতিপূর্বে কোথাও ব্যাপকভাবে বিবৃত হয়নি। যাঁদের সর্বাগ্রে তা করা উচিত ছিল, সেই বসু বিজ্ঞানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখাননি। যাই হোক, আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার পরিমাণও বিপুল। নিবেদিতার পত্রধারা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র বা গ্রন্থাদি থেকে সংবাদ সংগ্রহ তো করেছিই, অধিকন্তু জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি মূল্যবান পত্র এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাবকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, আমরা আচার্য বসুর জীবনকাহিনী একটু বিস্তারিত বলেছি, বলার কারণ, অতি দুঃখের বিষয়, জগদীশ-চন্দ্রের বিরাট জীবন যেন আমাদের অগোচর রয়ে গেছে। নিবেদিতা কেবল জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে নয়, তাঁর জীবনের মহিমাতেও মুগ্ধ ছিলেন। সে 'জীবনের উপনিষদ' রচনার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর উপরে কোনো বৃহৎ গবেষণাগ্রন্থ বেরোয়নি। যে-স্মারক পুস্তিকা বেরিয়েছে, তার তথ্যাদি ডঃ বসুর জীবিতকালে রচিত প্যাট্রিক গেডিসের বসু-জীবনী থেকে গৃহীত। (গেডিসের গ্রন্থের উপাদান আবার নিবেদিতাই বহুলাংশে সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন।) ডঃ বসু সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য বেদনাদায়ক। স্বামীজীর বিষয়ে সমসাময়িক ভারতীয় সংবাদ-পত্রে তথ্যসন্ধানকালে ডঃ বসুর সম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ চোখে পড়েছিল। তার কিছু কিছু এখানে পরিবেশন করে দিয়েছি। এই পর্বে মিসেস ওলি বুলের কথাও বহুলভাবে বলা হয়েছে। জগদীশচন্দ্র এঁকে মাতৃসম্বোধন করতেন, মিসেস বুলও তাঁর 'পুত্রে'র জন্য যৎপরোনাস্তি করে গেছেন। মিসেস বুলের সূত্রে নিবেদিতার জীবনের কিছু বেদনাদায়ক সংবাদ ঐতিহাসিক সত্যের প্রয়োজনে আমাদের উপস্থিত করতে হয়েছে।

নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রন্থশেষ করার কারণ, ভারতে নিবেদিতার জীবনারম্ভ স্বামীজীর আলোকে, জীবনাবসান জগদীশচন্দ্রের আবাসে।

গ্রন্থে ছবির সংখ্যা প্রচুর। তার কয়েকটিকে বর্তমান লেখকের 'আবিষ্কার' বলা চলে। ইংরাজ-পরিচালিত কলকাতার সচিত্র সাময়িক পত্রিকা 'এমপ্রেস্' থেকে নিবেদিতার অনেকগুলি ছবি পেয়েছি। নিবেদিতার ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরে বাগবাজারের গলিতে তাঁর প্রথম বাসগৃহকে কেন্দ্র করে সেগুলি তোলা। এর কয়েকটি নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের কর্তৃপক্ষ 'কর্মাপ্লট ওয়ার্কস্ অব নিবেদিতা'-র জন্য নিয়েছেন। অন্য দুষ্প্রাপ্য ছবির একটি (মিসেস বুলের উইলের মামলা-সংক্রান্ত সংবাদপত্রের চিত্র) রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সৌজন্যে পেয়েছি। তার জন্য শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কাছে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যে-সব দুষ্প্রাপ্য তথ্য গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলির প্রামাণিকতা দেখিয়ে দেবার জন্য বহুসংখ্যক পত্র বা উপাদানের প্রতিলিপি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অতীব মূল্যবান—স্বামীজীর জীবনের শেষ সপ্তাহ সম্বন্ধে ডায়েরীর আকারে লেখা নিবেদিতার চিঠির প্রতিলিপি।

আমাদের সৌভাগ্য, গ্রন্থে আমরা এমন একটি চিত্র প্রকাশ করতে পেরেছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনীর ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব স্বীকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। রঙিন চিত্রটির বিষয়—নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি দান করছেন। শিল্পী—প্রিয়নাথ সিংহ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্বামীজীর সহপাঠী-বন্ধু ও শিষ্য। প্রিয়নাথ সিংহ, গুরুদাস বর্মন এই ছদ্মনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' লেখেন, যার প্রথম খণ্ডই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশিত হয়নি।

ছবিটির সন্ধান পাই সর্বজনবন্ধু প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে। তিনি আমাকে জানান, প্রিয়নাথ সিংহের পুত্র শ্রীতারানাথ সিংহের কাছে স্বামীজী ও নিবেদিতা-সংক্রান্ত কিছু উপাদান আছে। ৬৩ বৎসরের সৌম্যমূর্তি শ্রীযুক্ত তারানাথ সিংহ অতি সৌজন্যের সঙ্গে তাঁর আপার সারকুলার রোডের বাসভবনে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন, অনেক কিছুই ছিল কিন্তু বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ এবং জীবনের আবর্ত প্রায় সবকিছুই হারিয়ে দিয়েছে। 'এত বালক ছিলুম এবং অবস্থা তখন এমন যে, ওসব জিনিসের মূল্য বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, বুঝলেও রক্ষা করা শক্ত ছিল।' বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানান, তাঁর পিতার রচিত রামকৃষ্ণ চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য গণেন্দ্রনাথের কাছে দেওয়া হয়েছিল, পরে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট যা-কিছু সংগ্রহ একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে পড়েছিল, সেগুলি এনে দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে, বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিয়োর তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের থামে হাত দিয়ে দাঁড়ানো ছবির পুরাতন প্রিন্ট, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির পুরানো ফটো, অনেকগুলি আঁকা ছবির খসড়া, তার একটি নব্যবঙ্গের চিত্রকলার ইতিহাসে পরিচিত 'যম ও নচিকেতা', রবীন্দ্রনাথের দুটি স্কেচ ইত্যাদি ছিল। সেগুলি দেখাবার পরে সগৌরবে শ্রীযুক্ত সিংহ বলেছিলেন, এবার এমন একটি ছবি দেখাবো চমকে উঠবেন। সেইটিই এই ছবি।

ছবিটির শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই, ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধেই কিছু বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি ফটো সুপরিচিত; তার একটি উপবিষ্ট। দাঁড়ানো দুটি ফটোর একটি কেশব সেনের বাড়িতে সমাধির কালে তোলা, অন্যটি তোলা হয় বউ-

বাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিয়োতে। 'ইলাস্ট্রেটিং এ নিউ বায়োগ্রাফি অব রামকৃষ্ণ' নামে প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ, ১৯৬৫ সংখ্যায় লেখা এক অত্যন্ত কৌতূহলজনক প্রবন্ধে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ ক্রিস্টোফার ইশারউডের রামকৃষ্ণ-জীবনীতে সংযোজিত চিত্রগুলির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ ফটো—তাঁর দেহান্তের পরে ভক্তজনসঙ্গে গৃহীত সেই ফটোটি—এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ বাদ দিয়ে ভক্তদের গ্রুপ ছবি হিসাবে মুদ্রিত হত, সেটি সম্পূর্ণতঃ ঈশারউডের গ্রন্থের আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সংস্করণে দেওয়া হয়েছে। দেহান্তের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি ছবি তোলা হয়; মোটামুটি সে দুটি একই রকম। বিদ্যাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দের কাছে শুনেছেন, স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেছিলেন যে, ডাঃ রাম দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি তোলান, সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ না করায় নেগেটিভসুদ্ধ প্রিণ্ট গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালের তিনটি ছবিই প্রাপ্তব্য। চতুর্থ ছবি দেহান্তের পরে তোলা। তারপরেই মূল্যদান করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেশ মিত্র কর্তৃক আঁকানো কেশবের নববিধান চিত্রের, যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে ধর্মসমন্বয়ের আদর্শরূপে দেখাচ্ছেন। চিত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যবাসকালেই অঙ্কিত এবং স্বয়ং তিনি ছবিটি দেখে প্রসন্ন পরিহাস করেছেন। এই চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের আকার মোটামুটি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিয়োয় তোলা তাঁর ফটোর অনুরূপ। গুরুত্বের দিক দিয়ে এই চিত্রটিকে তাই পঞ্চম স্থানে স্থাপন করতে পারি।

ষষ্ঠ স্থান লাভ করবে, আমাদের ধারণা, এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রিয়নাথ সিংহের আঁকা চিত্রটি। শ্রীযুক্ত তারানাথ সিংহ বলেন, এই ছবিটি স্বামীজী নিজে দেখে অনুমোদন করেছিলেন, একথা তাঁর মা হেমন্তকুমারী সিংহ তাঁকে বলেছেন। এই সংবাদে বিশ্বাস করা হোক বা না হোক, একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই—এই ছবি যিনি এঁকেছেন তিনি বাল্যাবধি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, এবং তিনি স্বামীজীর বাল্যবন্ধু। উপরন্তু তিনি সেকালের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ যখন হয়, তার কাছাকাছি সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে ইনি দেখেছেন—সেই দর্শন-সংস্কার তাঁর ছিল। তদুপরি ঐকালে তিনি নরেন্দ্রনাথের সাথী-বন্ধু (সে বিষয়ে চমৎকার স্মৃতিকথা প্রিয়নাথ সিংহ লিখে গেছেন), সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ঐ কালের আচার ও বেশবাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকার কথা। নরেন্দ্রনাথের এ সময়ের কোনো ছবি আমরা পাই না। তাই এই চিত্রটির অসাধারণ মূল্য যে আছে তা না বললেও চলে।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' পর্বের সূচনায় এই চিত্রটি আমরা স্থাপন করেছি। এর থেকে উপযুক্ত শিল্প-ভূমিকা সম্ভব নয়।

এই আকর গ্রন্থটি আকারে বৃহৎ—ঋণের বোঝাও যে এক্ষেত্রে বৃহৎ হবে, সহজেই ধরে নেওয়া যায়। বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য আমি নিয়েছি। কৃতজ্ঞচিত্তে সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। বিভিন্ন সময়ে আমি জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটি, পুণা তিলক ট্রাস্ট, উদ্বোধন গ্রন্থাগার, প্রবাসী কার্যালয়, সাহিত্য পরিষদ, মহাবোধি সোসাইটি, অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থানে কাজ করেছি। হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম নিয়মিত ব্যবহৃত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসী এই কাজে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের স্নেহ ও উৎসাহবাক্যে প্রেরণা পেয়েছি। বিশেষ করে নিবেদিতা-গবেষণায় স্বামী অভয়ানন্দ যেভাবে দিনের পর দিন আশ্বাস ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন, তা ভুলবার নয়। সিস্টারের উপর গবেষণা করছি—তাঁর স্নেহ ও প্রশ্রয়লাভের পক্ষে এর থেকে বড় ছাড়পত্র বোধহয় আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ এবং সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দের ইচ্ছায় বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার আমার কাছে উন্মুক্ত ছিল এবং গ্রন্থাগারিক স্বামী ত্যাগানন্দ সর্বদা তৎপর আগ্রহ দেখিয়েছেন।

নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের কর্তৃপক্ষও যখনি প্রয়োজন সাহায্য করেছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা এবং নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার আনুকূল্য প্রায়শঃ পেয়েছি।

গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল লিখিত উপাদানই নয়, মুদ্রিত চিত্রকেও আমি মূল্যবান জ্ঞান করি। নানা গ্রন্থাগার বা সংগ্রহ থেকে ছবি তোলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ফটো-শিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ। ফটো তোলার বহু 'অভিযানে' তিনি নেতৃত্ব করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে এমনি এক অভিযানে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন শ্রীমতী শান্তি মিত্র ও শ্রীতপন দে। ফটোগ্রাফি-জগতে সুবিখ্যাত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ নিবেদিতার চিঠিগুলির আলোকচিত্র তোলার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমার বন্ধু বা আত্মীয়রা আমাকে সাহায্য করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সুতরাং শ্রীবিশ্বনাথ বসু কিছুদিন নানা গ্রন্থাগারে একত্রে সন্ধান করেছিলেন, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বড়ালও তাই। শ্রীঅরুণ ঘোষ ও শ্রীনিত্যানন্দ ভকত সর্বদা সুপরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীবিমল ঘোষ—এই দুইজনের কাছে ঋণের কথা বলে ভার লাঘবের দুশ্চেষ্টা করতে চাই না—এত বেশী এঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ বহু সময়ই বিবেকানন্দ-গবেষণায় আমার সহযোগী; অভ্যস্ত নিপুণতায় এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তিনি করে দিয়েছেন অল্প সময়ের মধ্যে। শ্রীবিমল ঘোষের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি প্রায় প্রতিদিনই।

আমার প্রতি স্নেহ ও প্রীতিপরায়ণ যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন বা সাহায্য করেছেন, তাঁদের কয়েকজন—ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীজানকীনাথ বসু, ডঃ শ্রীসুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, শ্রীকালীচরণ কর্মকার, শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু।

সবশেষে, যাঁরা ধন্যবাদ দেওয়া মোটে পছন্দ করবেন না, তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি 'রীতিভঙ্গ' করে। গ্রন্থ-প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের কাছে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। এহেন বিপুলায়তন, বহু চিত্র সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন, তার পিছনে আছে ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বইয়ের সম্বন্ধে শ্রীঅভীককুমার সরকারের বিশেষ মনোযোগের মূলে তাঁর পারিবারিক-সূত্রে প্রাপ্ত নিবেদিতা-ভক্তি রয়েছে, তাও সহজে বোঝা যায়। শ্রীফণিভূষণ দেব নিতান্ত উৎকণ্ঠিত অনুরাগের সঙ্গে গ্রন্থসমাপনে তাগিদ দিয়েছেন এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দে ও শ্রীবাদল

বসু আমার বহু সঙ্গত অসঙ্গত দাবিপূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শ্রীশঙ্কর বসু মল্লিকের নিত্য কৌতূহল আমার পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহজনক ছিল। আমি জানি, এঁরা এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সকলে কর্তব্যপালনই করেছেন, তবু সেইসঙ্গে এই গ্রন্থটি যে তার বিশেষ প্রকৃতির জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ পেয়েছে, তাও মনে হয়েছে সর্বদা।

উপসংহারে জানাই, 'নিবেদিতা লোকমাতা'—বইটির এই নামের পিছনে আমার একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। গুরুর দেওয়া নাম 'নিবেদিতা'—সেই নিবেদিতাকে গুরুর আশীর্বাদ—তুমি ভারতের সেবিকা-বান্ধবী-মাতা হও। সে আশীর্বাদকে নিবেদিতা জীবনে কতখানি সত্য করে তুলতে পেরেছিলেন, তারই স্বীকৃতি কবিকণ্ঠে—'লোকমাতা' সম্বোধনে। একালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আচার্য ও শ্রেষ্ঠ কবির আশা ও আদর্শকে চরিতার্থ করেছিলেন এক মহীয়সী বিদেশিনী নারী—'নিবেদিতা লোকমাতা' নামের মধ্যে লেখকের সেই নিবেদন রইল।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৩১ জুলাই, ১৯৬৮

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মিসেস উইলসনের পত্র (২ পৃষ্ঠা)
মর্নিং লীডার কাগজে রিচমণ্ড নোবলের পত্র—স্বামীজীর বিরুদ্ধে কুৎসার প্রতিবাদ (৪ পৃষ্ঠা)
১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা নিবেদিতার 'ক্রাইস্ট চাইলড্' প্রবন্ধ
প্রিন্স ক্রপটকিনের পত্র (২ পৃষ্ঠা)
সোফি ক্রপটকিনের পত্র (২ পৃষ্ঠা)
নিজ পরিবারে সম্ভবতঃ নিবেদিতার শেষ চিঠি

'নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র" পর্বের মধ্যে :

১৮৯৭ সালে রয়াল ইনস্টিটিউশনে ভাষণরত ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু
নিউইয়র্ক ইভনিং জার্নাল পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দের চিত্রসহ মিসেস ওলি বুলের মামলার বিবরণ
নিবেদিতার পত্র : বিষয়—স্বামীজীর প্রতি ডঃ বসুর শ্রদ্ধা (১ পৃষ্ঠা)
নিবেদিতাকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র
নিবেদিতা-কৃত ডঃ বসুর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা, ডঃ বসুর লেখাসুদ্ধ
রাখীবন্ধন (১৯০৫) দিবসে মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার পত্র (২ পৃষ্ঠা)
স্বামীজীর উইলের উপর ব্যাঙ্কের চিঠি, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও স্বামী সারদানন্দের মন্তব্যসুদ্ধ (২ পৃষ্ঠা)
নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদ—লণ্ডন ডেইলী নিউজ, লণ্ডন টাইমস ও অমৃতবাজার পত্রিকায়
নিবেদিতার দেহত্যাগ প্রসঙ্গে মিস লংফেলোর পত্র (৪ পৃষ্ঠা)
নিবেদিতার মৃত্যুর পরে মিসেস উইলসনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র (১ পৃষ্ঠা)
বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিবেদিতার স্মৃতিপূজা করে জগদীশচন্দ্রের পত্র—মিসেস উইলসনকে (১ পৃষ্ঠা)
নিবেদিতা সম্বন্ধে জিন হারবার্টকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র (২ পৃষ্ঠা)
নিবেদিতার ক্রেয়ন স্কেচ
বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রবেশপথে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তি

[অদ্বৈত আশ্রম ও নিবেদিতা গার্লস স্কুল একটি করে ব্লক এবং শ্রীধীরাজ বসু দুটি ব্লক ব্যবহার করতে দিয়েছেন।]

P. O. AND TELEGRAPH:
STONE RIDGE, ULSTER CO., N. Y.
RAILROAD STATION:
BINNEWATER, N. Y.

Guru Guru

RIDGELY MANOR

21.10.08

Thou that art Knowledge Itself.
Pure, Free, Ever the Witness.
Beyond all thought.
And beyond all qualities.
To Thee, the Only True Guru,
My Salutation.
— Shiva Guru! Shiva Guru! Shiva Guru!

Oct. 21st 1908 — From Oct. 1899.

'শিবগুরু' সম্ভবতঃ নিবেদিতার 'ইষ্টদেবতা'। স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন সন্ধ্যায় ধ্যানের সময়ে নিবেদিতার মন অনিবার্যভাবে শিবগুরুর দিকেই ধাবিত হয়েছিল—নিবেদিতার দিনলিপি (যার প্রতিলিপি পরে দেওয়া হয়েছে) থেকে তা দেখা যায়। 'বুদ্ধিইজম্ অ্যাণ্ড হিন্দুইজম্' নামক প্রবন্ধের শেষাংশে (পরে যা 'ফুটফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়) নিবেদিতা এই 'শিবগুরু' কবিতাটি দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, গোড়ায় বুদ্ধ ছিলেন ভারতবর্ষের শুদ্ধ জ্ঞানের ও সন্ন্যাসের প্রতীক। পরে শিব সেই স্থান নেন—যখন বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যগুলিকে পুনশ্চ আত্মসাৎ করে নিল হিন্দুধর্ম।

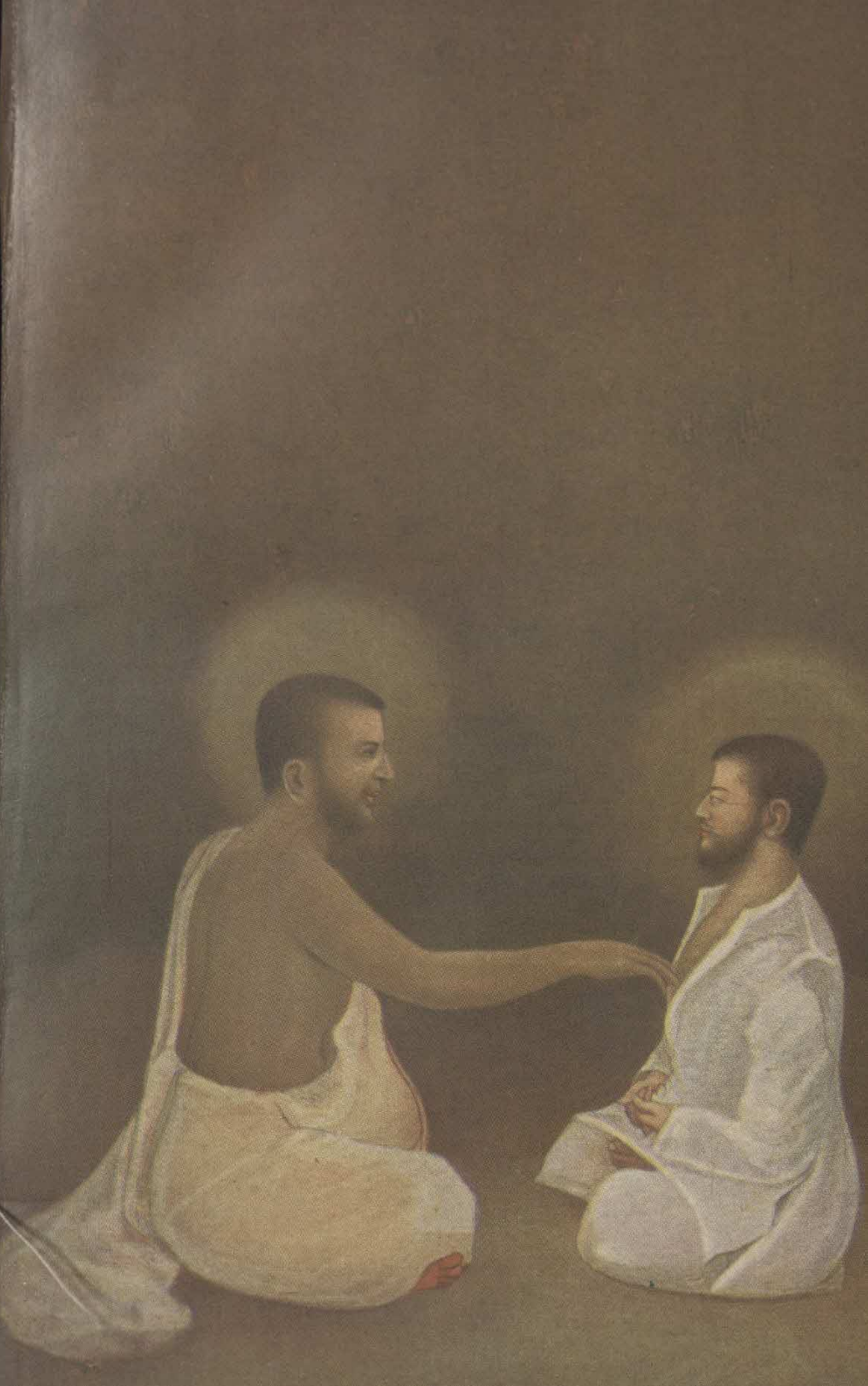
নিবেদিতার কাছে স্বামীজী ছিলেন শিব ও বুদ্ধের মিলিত প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অদ্বৈত অনুভূতি সঞ্চারিত করছেন, এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত, ডান দিকে মুদ্রিত, দুর্লভ চিত্রটির শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ। তাঁর পুত্র শ্রীতারানাথ সিংহের সৌজন্যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছে। এর সর্বস্বত্ব তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত।

প্রিয়নাথ সিংহ, গুরুদাস বর্মণ ছদ্মনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' লিখেছিলেন। তার মধ্য থেকে চিত্রটির বিষয় সম্বন্ধে পাই :

"রামকৃষ্ণদেব, যাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন,... ও (নরেন্দ্রনাথ) যখন প্রথম প্রথম আসতো, তখন একদিন ভাব হয়ে ওকে ছুঁয়ে দিয়েছিলুম, তাইতে ও একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হবার মত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—'ওগো, তুমি আমায় কি করে দিলে? আমার যে বাপ মা আছে।' তখন আবার ওর বুকে হাত দিয়ে বলি—'তবে এখন থাক, তবে এখন থাক।'......(প্রথম সং—পৃষ্ঠা—২২১)

"একদিন জনৈক ভক্ত নরেনের পূর্বোক্ত ঘটনা উত্থাপন করাতে নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষস্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর হইল, পা হইতে রি রি করিয়া কি একপ্রকার স্নায়বীয় স্রোত ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুসমূহ শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল তিনি বুঝি শূন্যে মিশাইয়া যাইবেন। পিতামাতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহারা সন্তপ্ত হইবেন, এই ভাবনা মনে উদয় হওয়াতেই তিনি পূর্বোক্তরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া ঐভাব প্রশমিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু হইতে অনন্ত আকাশ পর্যন্ত সেই এক মহান লক্ষ্যের দিকে ছুটিতেছে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাঁহাকে সেই মহান আদি পুরুষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে।"......(প্রথম সং—পৃষ্ঠা—২২২)



রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে তাঁর প্রধান বাণীবহের ভূমিকা নেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী মিস্ ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, নিবেদিতার নির্মাণে তিনি সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছেন। স্বামীজী নামক বিধাতার হস্তনিক্ষিপ্ত এই নারী-বজ্রটি ভারতের ইতিহাসে কোন্ আগ্নেয় ভূমিকা নিয়েছিল, তা দেখানোই বর্তমান গবেষণাগ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিবেদিতার বহিরঙ্গ প্রকাশের পিছনে যে বিশাল অধ্যাত্মরহস্যময় মহাদেশের পটভূমিকা ছিল, তা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি এখনো পর্যন্ত। নিবেদিতার প্রকাশিত রচনাগুলি সেই গভীর আবৃত জীবনের উপর চকিত আলোকপাত মাত্র করেছে। অতি সৌভাগ্যের বিষয়, মিস্ ম্যাকলাউডের কাছে লেখা পত্রাবলীতে তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্যরূপ উদ্ঘাটিত—সেই পত্রগুলি বহুলাংশে আমরা বর্তমানে ব্যবহার করতে সমর্থ।

বিবেকানন্দই নিবেদিতা-জীবনের সবকিছু—গুরু, পিতা, ঈশ্বর—সবকিছু। নিবেদিতা স্বামীজীর চিন্তায় ও কথায় ডুবে থাকতেন সর্বসময়। স্বামীজীর বিষয়ে তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প নয়। এ বিষয়ে তাঁর লেখা দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই আছে— 'The Master as I saw him' এবং 'Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda'। এছাড়া স্বামীজীর উপর রচিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, এবং অনেকগুলি বক্তৃতার অল্পবিস্তর রিপোর্ট। নিবেদিতার অন্যান্য রচনায় বিবেকানন্দ উল্লিখিত হয়েছেন, তাও না বললে চলবে। নিবেদিতার পত্রাবলীর 'বিষয়ী পুরুষ' বিবেকানন্দই।

'The Master as I saw Him' নামক মহাগ্রন্থটি শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। খ্রীস্টতত্ত্বে সুপণ্ডিত অক্সফোর্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক এই গ্রন্থটিকে ধর্মীয় ক্লাসিকস্-এর স্তরে স্থান দিয়েছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মত মনীষী ও মহাযোগী এটিকে স্বামীজী সম্পর্কে লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলেছেন। স্বামী মাধবানন্দ-কৃত এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং স্বামীজী প্রসঙ্গে এখানে বইটি থেকে অংশ সংকলন করার প্রয়োজন নেই, যদিও পরে, তথ্যরূপে অন্যান্য প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বহু অংশ ব্যবহৃত হবে। তাছাড়া "মনস্বিনী" খণ্ডে (যে খণ্ডে পৃথিবীবিখ্যাত লেখিকা নিবেদিতার গ্রন্থাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় থাকবে) এই গ্রন্থের উৎপত্তির পটভূমিকা ও পরবর্তী প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হবে। 'Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda' নামক বইটির (বঙ্গানুবাদ "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে") সম্বন্ধে একই রীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই দুটি গ্রন্থ ছাড়াও নানা সূত্রে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে প্রচুর সংবাদ পাওয়া যায়। বহু অজানিত সংবাদও আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেই সমস্ত তথ্য এই গ্রন্থের সর্বত্র পরিবেশন করা হবে প্রাসঙ্গিকভাবে। তবে

যে-সব সংবাদ বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জীবনীর কল্যাণে বহুবিদিত সেগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে, বা তাদের উল্লেখমাত্র করে, আমরা অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত সংবাদের উপরেই জোর দেব। কিন্তু তাহলেও, নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর কয়েকটি পত্র বহুল পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা বাদ দিতে পারব না, যেহেতু প্রথমত, নিবেদিতার জীবনের ধারা নির্দেশে পত্রগুলির মূল্য অপরিসীম, দ্বিতীয়ত, কেবল নিবেদিতার জীবন গঠনে নয়, আত্মত্যাগী বাঙালী ও ভারতবাসীর সত্তায় অগ্নিদাহ ঘটাত ঐসব পত্র—এবং এখনো তা চঞ্চল করে তোলে রক্তস্রোত। যে-নিবেদিতা ভাবী ভারতের কাছে প্রেরণাদেবী হয়ে উঠবেন, তাঁকে জাগাতে বিবেকানন্দের ঐসব রচনা মহাকাব্যিক মহিমা লাভ করেছে। বিবেকানন্দের এই জাতীয় উক্তিকে স্মরণ করেই রোমা রোলাঁ বলেছিলেন—'মহাসঙ্গীতের মত তাঁর শব্দাবলী, বীঠোফেনের মত তার বাগ্‌রীতি, হেণ্ডেলের একতানের মত তার উদ্দীপ্ত ছন্দ। তিরিশ বছরের দূরত্বে তারা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থমধ্যে—কিন্তু আজও যখন তাদের স্পর্শ করছি, শরীরে যেন ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ লাগছে—নাড়া খাচ্ছি সর্বাঙ্গে। তাহলে কী সে চমক, কী না উন্মাদনা পেয়েছিল তারা—যারা এই আগুনের মত কথাগুলি বীরের নিজের মুখ থেকে শুনেছিল!'

সর্বাধিক শুনেছিলেন—নিবেদিতা।

নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর পত্রাবলী

["বাণী ও রচনায়" নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর মোট ৩১টি চিঠি আছে। প্রথমটির রচনার তারিখ ১৮৯৫-এর ৪ঠা অক্টোবর, শেষ চিঠি ১৯০২-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী। মধ্যে প্রায় সাত বৎসরের ব্যবধান। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, প্রথম ও শেষ চিঠির বক্তব্য একই—'ওঠ! জাগো!'

আমরা কিছু কিছু পত্র বা পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি। চিঠিগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের দুটি মূর্তি উন্মোচিত; একটিতে তিনি জগৎপ্রেমিক, জাতির প্রেরণাপুরুষ, অন্যটিতে জগজ্জাল ছেদনে অস্থির চিরবৈরাগী সন্ন্যাসী। নিবেদিতার পরম সৌভাগ্য তিনি একই দেহাধারে মানুষের দুই পরম প্রকাশকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।]

*

...পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় ব্যাপার অবশ্যই ধীরে ঘটে।

[রিডিং, ইংলণ্ড—৪ অক্টোবর, ১৮৯৫]

আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে,—তা এই : মানবের

অন্তর্নিহিত দেবত্বের সত্য তার কাছে প্রচার করা, এবং কিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে বিকশিত করা যায়—তাই দেখিয়ে দেওয়া।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই পৃথিবী। যে উৎপীড়িত—পুরুষ বা নারী—আমার করুণা তার প্রতি। আরও অনেক করুণা করি তাকে, যে উৎপীড়নকারী।

দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে একটি ধারণা আমার কাছে—সকল দুঃখের মূলে আছে **অজ্ঞান**, অন্য কিছু নয়। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে! পৃথিবীতে যারা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।' অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন—চরিত্র। নিঃস্বার্থ, অগ্নিজ্বলন্ত প্রেম যাঁদের মধ্যে—তাঁদের এখন জগৎ চায়। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্র করে তুলবে।

তোমার মধ্যে আছে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি,—এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চয়। তোমার পিছনে অন্যরাও আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তারো চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ! ওঠ, জাগো! জগৎ যে দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?

[লন্ডন, ৭ জুন, ১৮৯৬]

নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, আমি সন্তুষ্টই আছি। দেশবাসীর অনেককে আমি জাগিয়েছি, মোটমাট আমি তাই চেয়েছিলাম। জগৎ আপন ধারায় চলুক, কর্ম চলুক নিজ গতিতে। এ জগতে আমার আর কোনো বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে,—এর সবটাই স্বার্থ; স্বার্থের জন্য বাঁচা, স্বার্থের জন্য ভালবাসা, স্বার্থের জন্য মানের কামনা,—সবই স্বার্থ, স্বার্থ! নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে কিন্তু দেখি, আমি এমন প্রায় কোনো কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্য করা হয়েছিল,—এমনকি আমার অপকর্মও স্বার্থোদ্দেশ্যে নয়—সুতরাং আমি সন্তুষ্ট। তার মানে এই নয় যে, আমি বিশেষ কোনো ভালো বা বড় কাজ করেছি। কিন্তু জগৎ এমন সংকীর্ণ, জীবন এমন হীন, অস্তিত্ব এতই জঘন্য, অতি জঘন্য যে, আমি অবাক হয়ে যাই, হেসেও ফেলি, যখন দেখি, স্বার্থসিদ্ধি নামক নীচ, ঘৃণ্য পুরস্কারের লোভে মানুষের মত যুক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন জীব ধাবিত হচ্ছে নিরন্তর!

খাঁটি কথা এই। আমরা জালে ধরা পড়েছি, যত শীঘ্র কেউ বেরিয়ে আসতে পারে, ততই মঙ্গল। সত্যের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি—এখন দেহটা জোয়ার-ভাঁটায় উঠুক নামুক—কে মাথা ঘামায়!...

লোকালয় থেকে দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়ে আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ—তবু পূর্ব সংস্কার আছেই—যায়নি।

[আলমোড়া, ৩ জুন, ১৮৯৭]

আমি নিজে যেভাবে শিক্ষালাভ করেছি—সেইভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি, অর্থাৎ গাছের তলা আশ্রয় করে, কোনো রকমে একমুঠো খাবার জুটিয়ে নিয়ে কাজ করে যাওয়া। পরিকল্পনারও কিছু বদল হয়েছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে। যে কথা আমি চিরদিন ভেবেছি তারই প্রমাণ দেখলাম : হৃদয়, শুধু হৃদয় দিয়েই জগতের মর্মে পেঁছান যায়। তাই বর্তমান পরিকল্পনা হল, বহু যুবককে গড়ে তোলা, (উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে, নিম্নশ্রেণীর মধ্য থেকে নয়; নিম্নশ্রেণীর জন্য অল্প কিছু অপেক্ষা করতে হবে),—তারপর তাদের জনকয়েককে কোনো একটি জেলায় পাঠিয়ে দিয়ে প্রথম অভিযান শুরু করে দেওয়া। ধর্মযুদ্ধের এই অগ্রগামী কর্মী-সেনারা পথ পরিষ্কার করে ফেলার পরে তবে তত্ত্ব ও দর্শন বিস্তারের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষাধীনে; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম (আলমবাজার মঠ), তা গত ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। বাঁচোয়া যে এটি ভাড়া-বাড়ি ছিল। তবে ভাববার কিছু নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না, কষ্টের, অসুবিধার সীমা থাকবে না,—তারি মধ্যে তো কাজ চালিয়ে যেতে হবে!... এ পর্যন্ত, মুণ্ডিত মস্তক, ছিন্ন কন্থা এবং অনিশ্চিত আহার—এই অবস্থা।

[আলমোড়া, ২০ জুন, ১৮৯৭]

দুর্ভিক্ষের কাজে এখন দারুণ ব্যস্ত। ভাবী কাজের জন্য জনকয়েক ছেলেকে তৈরী করে তোলা ছাড়া শিক্ষাদান কার্যে বেশী শক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। "খাদ্য দান" কাজটিই আমার সব শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য টেনে নিয়েছে। কাজ যদিও এ অবধি খুবই ছোট আকারে করা গেছে, তবু ফল অপূর্ব। বুদ্ধের কালের পরে এই প্রথম দেখা গেল, অন্ত্যজ জাতির কলেরা রোগীর পাশে বসে সেবা করছে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা![1]

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন আসল সিংহিনীর প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না—সেজন্য অন্য জাতির থেকে তাকে ধার করতেই হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা,

---

[1] বিবেকানন্দ নিশ্চয় একথা লেখার সময়ে অজ্ঞেয়বাদী বুদ্ধের অজ্ঞেয়বাদী ব্রাহ্মণ-শিষ্য একালের বিদ্যাসাগরের কথা ভুলে যাননি। কলেরা-রোগী বাগ্‌দী মেয়েকে বুকে তুলে এনে যেদিন বিদ্যাসাগর সেবা করেছিলেন, সেদিন থেকে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের মানবতার ইতিহাসে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি। স্বামীজী বলেছিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন কেউ নেই, যার উপরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব পড়েনি।' নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'আহা, যদি তোমার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হত!' কিন্তু নিবেদিতার ভারতে আসার সাত বছর আগেই বিদ্যাসাগরের দেহান্ত হয়! যাই হোক, বিদ্যাসাগরের জীবনের দুর্ভাগ্য, তিনি এই সেবার কোনো ধারা সৃষ্টি করতে পারেননি। সেই ধারা বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। এবং তা হয়েছিল প্রচলিত হিন্দু-সমাজের ভিতরেই। এই সময়ের ১৪।১৫ বছর পরে কিশোর সুভাষচন্দ্র যখন কলেরা রোগীর সেবা করছেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে, তখনো তিনি নিজেকে বিবেকানন্দের অনুগামী ভেবেছেন।

অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেলটিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী—যাকে ভারতের প্রয়োজন।

কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশে যে কী দুঃখ, কী কুসংস্কার, কী দাসত্ব—সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এদেশে এলে দেখবে, চারিদিকে অর্ধ-নগ্ন অগণিত নরনারী, জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভয়ে বা ঘৃণায়। উল্টোপক্ষে ঘৃণা পায়ও অসম্ভব। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গরা মনে করবে, তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে।

তাছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। দক্ষিণে তো সর্বসময় আগুনের হল্‌কা।

সহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, স্বাগত তুমি—শতবার স্বাগত! নিজের পক্ষে বলতে পারি, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি—আমি সামান্য মানুষ, কিন্তু যেটুকু প্রভাব আমার আছে তা তোমার সাহায্যে নিয়োজিত হবে।

ঝাঁপ দেবার আগে রীতিমত ভেবে দেখবে। কিন্তু কাজ শুরু করার পরে যদি ব্যর্থ হও, কিংবা যদি বিরাগ, বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে জেনো—**আমি আমরণ তোমার পাশে আছি**—তা তুমি ভারতের জন্য কাজ কর বা না কর, বেদান্ত রাখ বা না রাখ। 'মরদ্‌কী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না। পুরুষের কথার নড়চড় হয় না। সে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আবার সতর্ক করে দিই। তোমাকে এখানে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস্ মুলার বা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া চলবে না।...

[আলমোড়া, ২৯ জুলাই, ১৮৯৭]

অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি 'শিশুর মত নেতৃত্ব করেন।' শিশুকে আপাতত অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে হলেও, সে-ই বাড়ির রাজা। অন্তত, আমার ধারণায়, এখানেই নেতৃত্বের রহস্য। অনুভব অনেকেই করে, প্রকাশ করতে পারে মাত্র কয়েকজন। অন্যের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমাদর জ্ঞাপনের ক্ষমতার দ্বারাই একে অন্যের তুলনায় ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্যলাভ করে।...

বড় অসুবিধা এই : আমি দেখতে পাই অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমার উপর অর্পণ করে। কিন্তু প্রতিদানে কোনো একজনকে আমার সবটুকু তো দেওয়া চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে একদিনেই সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কেউ তেমনই চায়—যাদের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির ব্যাপ্তি নেই। কাজের সাফল্যের জন্য যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মানুষের উৎসাহপূর্ণ ভালবাসা পাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অপরদিকে আমাকে ভালবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পর্কের উপরে থাকতে হবে। নচেৎ ঈর্ষা ও বিপদে সব কিছু চুরমার করে দেবে। নেতাকে থাকতে হবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডীর বাইরে। জিনিসটি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, অপরের ভক্তিকে তিনি পাষণ্ডের মত নিজের কাজে লাগাবেন,

আর পিছনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই তা আমার জীবনেই ব্যক্ত; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হলে— বুদ্ধদেব যেমন বলতেন—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' আমি নিজ হস্তে নিজ হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। পাগল এই প্রেম, কিন্তু কোনো বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে জড় চেতনে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত, এই হল বেদান্তের সার কথা। সেই একই আছেন, অজ্ঞানীরা যাকে জড়বস্তু বলে দেখে, মনীষীরা তাকেই দেখে ভগবান্ বলে। সভ্যতার ইতিহাস জড়ের মধ্যে চৈতন্যকে দর্শনের ক্রমিক ইতিহাস ভিন্ন আর কিছু নয়। অজ্ঞানীরা নিরাকারকে সাকার দেখে, জ্ঞানীরা সাকারের মধ্যে নিরাকারের দর্শন পায়। সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায় এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে যাচ্ছি...।

[শ্রীনগর, কাশ্মীর, ১ অক্টোবর, ১৮৯৭]

...অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—এই মূল মন্ত্র।

আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে, বিপদে আমি তোমার পাশে থাকব। ভারতে যদি আমি এক টুকরো রুটিও পাই, নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকু পাবে।...

[জম্মু, ৩ নভেম্বর, ১৮৯৭]

[উপরে উদ্ধৃত পত্র বা পত্রাংশগুলি নিবেদিতার ভারত আগমনের পূর্বে লিখিত।]

...কর্তব্যের শেষ নেই; আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর। দুঃখ করো না। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—(কল্যাণকারী কেউ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না)।

[আলমোড়া, ২০ মে, ১৮৯৮]

...কাজ করে করে নিজেকে শেষ ক'রে ফেলো না যেন। ওতে কোনো লাভ নেই। সর্বদা মনে রাখবে : "কর্তব্যরূপ মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় মানবের প্রাণবস্তু।" অনুশীলনের জন্য ওর সাময়িক মূল্য আছে; কিন্তু তার বাইরে কর্তব্য একটা অসুস্থ স্বপ্ন মাত্র। জগৎ তার নিজের ভাবে চলবে —আমরা তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াই, বা না বাড়াই। মাঝ থেকে মায়াঘোরে আমরা নিজেদের ধ্বংস করি। নিঃস্বার্থতার চরম!—এই ধরনের মিথ্যা আবেগের চেহারা নিয়ে একটি জিনিস হাজির হয়, যা শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অন্যায়ের কাছে মাথা নামিয়ে অপরের ক্ষতিই করে। আমাদের স্বার্থহীনতার দ্বারা অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোনো অধিকার আমাদের নেই।...

[কাশ্মীর, ২৫ অগস্ট, ১৮৯৮]

মনে হচ্ছে, তোমার মনে যেন বিষাদ রয়েছে। ভয় পেয়ো না। কিছুই চিরদিন থাকে না। যাই হোক, জীবন চিরন্তন নয়। এর জন্য আমি কী না কৃতজ্ঞ! জগতের

মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, আর সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি। তবু অনন্ত ভাবীকালের মধ্যে, যে-অবধি না সবকিছু ঠিক পথে চলে সেই অবধি, এই পৃথিবীতে অন্তত যাতনার দ্বারা স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষা হয়। স্থিতবুদ্ধির ক্ষণে আমি আমার যাতনায় উল্লাস বোধ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতে হবেই— দুঃখভোগের দায় যে আমার উপরে পড়েছে, তার জন্য আমি খুসী—আমি খুসী যে প্রকৃতির জন্য যারা বলিপ্রদত্ত, আমি তাদের একজন।

[রিজলি, আমেরিকা, ১ নভেম্বর, ১৮৯৯]

কারো কারো প্রকৃতি এমন যে তারা দুঃখ পেতে ভালবাসে। যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, তাদের জন্য যদি হৃদয় চূর্ণ করে নিবেদন না করতাম, তাহলে অন্যদের জন্য তা করতেই হত। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই হল কারও কারও ধাত—ক্রমে বুঝতে পারছি। সবাই আমরা সুখের পিছনে ছুটছি, সত্য, কিন্তু কেউ কেউ আছে, যারা সুখী হয় দুঃখী হলেই মাত্র! অদ্ভুত, তাই নয়? এতে ক্ষতি বিশেষ নেই, শুধু—সুখ ও দুঃখ উভয়ই সংক্রামক। ইঙ্গারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি ভগবান্ হলে ব্যাধির পরিবর্তে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। বলবার সময়ে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, স্বাস্থ্য ব্যাধির মতই সংক্রামক, যদি বেশী না হয়! বিপদ এখানেই। আমি সুখী হলাম, কি দুঃখী হলাম, তাতে জগতের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু অপরে যেন তার আওতায় না পড়ে। এই হল আসল কথা। কোনো মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে ব্যথিত হওয়া মাত্র মুখভার করেন, বুক চাপড়ান, সকলকে ডেকে বলেন, তোমরা টক খাও, কাঠকয়লা চিবাও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদার উপর বসে থাকো, আর কথা বলো চোখের জলের সঙ্গে গোঙিয়ে গোঙিয়ে। আমি দেখছি এঁরা সবাই অসম্পূর্ণ—কোনো সন্দেহ নেই। যদি জগতের বোঝা বইবার জন্য সত্যই তৈরী হয়ে থাক, সর্বতোভাবে তা নাও। কিন্তু তোমার গোঙানি আর অভিসম্পাত যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার জ্বালা-যন্ত্রণার চেহারা দেখিয়ে আমাদের আতঙ্কিত করে তুলো না। আমরা যেন তা দেখার পরে মনে করে না বসি, নিজের দুঃখজ্বালা নিয়ে আমরা বেশ ছিলাম। যে মানুষ সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে তুলে নেয়, সে জগৎ-কে আশীর্বাদ করে নিজের পথে চলে যায়। তাঁর মুখে নিন্দা বা সমালোচনার একটি কথাও শোনা যায় না। তার কারণ এই নয় যে, জগতে পাপ নেই। তার কারণ এই যে, তিনি স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভার তুলে নিয়েছেন। পরিত্রাতাই আনন্দে আপন পথে চলেন—ত্রাণপ্রাপ্তরা নয়।

আজ প্রভাতে কেবল এই তত্ত্বের আলোকই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদি এ ভাবটি আমার জীবনে স্থায়িভাবে এসে থাকে, যদি আমার সমগ্র জীবনে তা সঞ্চারিত হয়—তাহলেই যথেষ্ট।

দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাকো, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোনোকালে ছিলাম।

[লস এঞ্জেলস, ৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯]

যে শান্তি ও বিশ্রাম খুঁজছি, তা কোনোদিন আসবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের, অন্তত আমার স্বদেশের কিছু কল্যাণ করাচ্ছেন। আর এই উৎসর্গের ভাব অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে আপস করা সহজতর হয়। আমরা সবাই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে। একটা বিরাট বলি—এছাড়া এর অন্য তাৎপর্য গোচর হয় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। যারা বাধা দেয়, তাদের ভেঙে দুমড়ে নোয়ানো হয়—তাদের দুর্ভোগ বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।

[লস এঞ্জেলস, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০০]

কাজ করতে চাই না। বিশ্রাম চাই, শান্তি চাই। তার স্থান ও কাল আমার জানা আছে। কিন্তু আমার বিধিলিপি বা কর্মফল আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—কাজ, কাজ! কসাইখানার দিকে তাড়িত পশুরা যেমন চাবুকের চোটে চলতে চলতে পথের ধার থেকে এক খাবলা ঘাস কামড়ে তুলে নেয়—আমাদের দশাও তাই। কিন্তু এ সকলের মূলে আমাদের কর্মফল—আমাদের ভয়—ভয়ই যত দুঃখ ব্যাধির আকর। আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আমরা আরও আঘাত করি। মন্দকে এড়াতে ব্যাকুল চেষ্টার দ্বারা আমরা তার কবলে গিয়ে পড়ি।

নিজেদের চারপাশে কত হেন-তেন অর্থহীন আবর্জনাই জমিয়ে তুলেছি!! এর কোনো ভাল ফল নেই—এর দ্বারা যাকে পরিহার করতে চাই, সেই দুঃখেরই মুখে ছুটে যেতে হয়।...

আ—হা! যদি একেবারে নির্ভয় হতে, সাহসী হতে, বেপরোয়া হতে পারা যেত।...

[সানফ্রানসিসকো, ৪ মার্চ, ১৯০০]

আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি, ক্রমশঃ খুবই বল পাচ্ছি। এখন কখনো কখনো মনে হয়, মুক্তি নিকটে। গত দু'বছরের জ্বালাযন্ত্রণা আমাকে নানা বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য পরিণামে আমাদের কল্যাণসাধনই করে, যদিও তখনকার মত মনে হয়, বুঝি আমরা একেবারে ডুবে গেলাম।

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ; মাঝে মাঝে সে আকাশে মেঘ জমলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীল আকাশই আছি।

আমি এখন সেই শান্তির আস্বাদের জন্য তৃষাতুর, যা আমার মূল প্রকৃতি, যা প্রত্যেক জীবের মূল প্রকৃতি। এই হাড়মাসের খাঁচা আর সুখদুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন—এগুলো আবার কি?

আমার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। ওঁ তৎ সৎ।

[সানফ্রানসিসকো, ২৮ মার্চ, ১৯০০]

আমি খুব খাটছি—আর যত বেশী খাটছি ততই ভাল বোধ করছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটি বিশেষ উপকার হয়েছে, নিশ্চয়। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, অনাসক্তি মানে কি। ভরসা করি, শীঘ্রই সম্পূর্ণ অনাসক্ত হতে পারব।

কোনো একটা বিষয়ে আসক্ত হবার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি, কিন্তু তার বিপরীত দিকে আর একটি সমভাবে কঠিন জিনিস রয়েছে, তার বিষয়ে কোনই মনোযোগ দিই না, তা হল—মুহূর্তমধ্যে কোনো বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা।

পূর্ণ বিকশিত আসক্তি, এবং পূর্ণ বিকশিত অনাসক্তি মানুষকে সুখী ও মহান করে।...

সব জিনিসকেই ঘুরে ফিরে আসতে হবে; বৃক্ষরূপে বিকশিত হতে হলে বীজকে ভূমিগর্ভে পচে মরতে হবে। গত দু' বছর ধরে আমার এই ভূমিগর্ভের মৃত্যুজীবন চলছিল। মৃত্যুগ্রাসে পড়ে আগেও আমি ছটফট করেছি, কিন্তু তার পরেই সমগ্র জীবনের বিপুল উচ্ছ্বাস ঘটেছে। এখনই এক উচ্ছ্বাস আমাকে রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিল; আর একটি ছুঁড়ে দিয়েছে আমেরিকায়। শেষটিই বৃহত্তম ঢেউ। সে ঢেউ নেমে গেছে—আমি এখন এতই শান্ত যে সময়ে সময়ে গভীর আশ্চর্য বোধ হয়!! প্রতি সকাল সন্ধ্যায় কাজ করি, যখন যা পাই খাই,—রাত বারটায় শুতে যাই,—কিন্তু কী ঘুম—ঘুম! এমন ঘুম কখনো ঘুমোইনি এ জীবনে!

[সানফ্রানসিসকো, ২৮ মার্চ, ১৯০০]

আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো। কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু! শ্রী ওয়া গুরু! ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা। ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আদর্শ—সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়। শ্রী ওয়া গুরু!...

কুটিল ভাগ্যের কালো ঘন ছায়া। কিন্তু আমি তো সর্বময় প্রভু! যে-মুহূর্তে আমি উত্তোলন করি হস্ত—অন্তর্হিত হয় তমসা! এসব অর্থহীন—এই ভয়! আমি ভয়েরও ভয়, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি অদৃষ্টের নিয়ামক, আমি কপালমোচন। শ্রী ওয়া গুরু! দৃঢ় হও, বৎসে! টাকা বা অন্য কিছুর দাস হয়ো না, তবেই সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

[সানফ্রানসিসকো, ২৬ মে, ১৯০০]

মা-ই সব জানেন—যা আমি সর্বদা বলি। মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সংঘের পায়ে যথাসর্বস্ব, এমন কি নিজের সত্তা পর্যন্ত চূর্ণ করে বিসর্জন দিতে হয় নেতাকে।...

[নিউইয়র্ক, ২ জুলাই, ১৯০০]

এই তো জীবন—খেটে খাও, শুধু খেটে মর! তাছাড়া আর কী-ই-বা করার আছে! খেটে খাও—শুধু খেটে মর! একটা কিছু ঘটবে—কোনো একটা পথ খুলে যাবে। তা যদি না হয়,—হয়তো সত্যই কখনো হবে না,—তাহলে, তাহলে, তাহলে —কী! আমাদের সব উদ্যমই হল সাময়িকভাবে চরম পরিণতিটিকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা, যার নাম—মৃত্যু! কিন্তু হে মৃত্যু! হে সর্বদুঃখহর মহামৃত্যু—তুমি ছাড়া এ জগৎ কি করত!

এই প্রতীয়মান জগৎ সত্য নয়, নিত্য নয়—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!! ভবিষ্যৎ আরও ভাল হবে কি উপায়ে? সে তো বর্তমানেরই ফল-পরিণতি! সুতরাং সে ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই মতো—যদি মন্দতর না দাঁড়ায়!

স্বপ্ন, আহা! স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু—স্বপ্নেই তার লয়। স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙো!

...পৃথিবীর কাছে যে-কথা বলে চলেছি : দুনিয়ার অন্তহীন প্রহেলিকা, অদৃষ্টের সীমাহীন সুতোর পাকানো গুলির কথা—যার শেষপ্রান্ত কেউ খুঁজে পায় না কোনদিন, অথচ মনে করে পেয়েছে, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই কিছু সময়ের জন্য যা মনে করা তার প্রয়োজন—প্রয়োজন নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য,—এই কথাই বলে চলেছি।

যাহোক, এখন বড় বড় কাজ করতে হবে—কিন্তু—বড় কাজের পরোয়া করার দরকার কি? একই সঙ্গে ছোট কাজ করে যাও না কেন? ছোট ও বড়—সমান ভাল। ছোটর মহিমা দেখতে গীতা শিখিয়েছে। ধন্য সেই প্রাচীন গ্রন্থ!!...

শরীরের কথা চিন্তা করার মতো বেশী সময় দেওয়া যায়নি। সুতরাং তা ভালই আছে ধরে নিতে হবে। আর—এ জগতে নিত্য ভাল বলে কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই—ভাল হচ্ছে শুধু ভাল হওয়া ও ভাল করা।

ভালই হোক, মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এইসব নিয়ে একবার প্রাণখুলে হাসব। এই কথাটুকু আমি নিশ্চয় বুঝেছি।

[প্যারিস, ২৮ অগস্ট, ১৯০০]

মহাদেশসমূহের আর এক প্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমাকে প্রশ্ন করছে : 'কেমন আছ?' অবাক হচ্ছ না কি? সত্যই, আমি ঋতুর পাখী।

চঞ্চল আনন্দমুখর প্যারিস, প্রাচীন গম্ভীর কনস্টান্টিনোপল, ঝক্‌ঝকে ছোট্ট এথেন্স, পিরামিডের কায়রো,—পিছনে ফেলে এসেছি; এখন এখানে আমি গঙ্গাতীরে, মঠে, আমার ঘরটিতে বসে লিখছি। চারিদিক কী নীরব! কী শান্ত! প্রশস্ত নদী প্রদীপ্ত সূর্যালোকে নৃত্যশীল। ক্বচিৎ কখনো বোঝাই নৌকার দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে ক্ষণিক নীরবতা ভঙ্গ।

এখানে এখন শীত চলছে, কিন্তু মধ্যাহ্ন উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত, প্রতিদিন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতের মতো। সব কিছু সবুজ, সোনালি; মখমলের মত ঘাস; আর বাতাস শীতল, নির্মল ও সুখময়।

[বেলুড় মঠ, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯০০]

সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক! মহামায়া তোমার বাহুতে ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক। এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা।...

যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক

তেমনিভাবে, কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী স্পষ্টভাবে তিনি তোমাকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যান!

[বেনারস, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২]

স্বামীজীর পত্রাদিতে নিবেদিতার উল্লেখ

নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর অনেকগুলি চিঠির নির্বাচিত অংশ আমরা উপস্থিত করেছি। অন্যান্যজনকে লেখা চিঠিতেও যে নিবেদিতার নানা উল্লেখ থাকবে, তা না বললেও চলে। অবশ্য এইসব উল্লেখ খুব বিস্তারিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সব কয়টি উদ্ধৃত করার প্রয়োজনও নেই।

নিবেদিতা ভারতে আসার আগে তাঁর বিষয়ে জানাবার সময়ে স্বামীজী তাঁর কর্মশক্তির কথা বিশেষভাবে বলেছেন। যেমন আলাসিঙ্গাকে (২০ নভেম্বর, ১৮৯৬)—'উইম্বলডনের মিস নোবল মস্ত কর্মী।' মেরী হালবয়েস্টারকে (২৫ জুলাই, ১৮৯৭)—'উইম্বলডনের মিস মার্গারেট নোবলকে জানো নাকি? আমার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি পার তার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করো।' মিসেস ওলি বুলকে (১৯ অগস্ট, ১৮৯৭)—'মিস মার্গারেট নোবল নামে এক ইংরাজ তরুণী ভারতে আসতে এবং এখানকার অবস্থা জানতে খুবই আগ্রহী, যাতে সে ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে ভারতের জন্য কিছু কাজ করতে পারে।'

ভারতে আসার আগে নিবেদিতা ভারতীয় অবস্থা এবং স্বামীজীর কার্যধারা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন। স্বামীজী শ্রীনগর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে ঐ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে লিখে পাঠিয়েছিলেন। মার্গারেট নোবলের প্রশ্নধারা থেকে তিনি কতখানি যাচিয়ে বিচার করে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন বোঝা যায়, এবং স্বামীজীর উত্তর থেকেও রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের একটি পর্যায়ের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার চিত্র পাওয়া যায়। স্বামীজী-প্রদত্ত উত্তরগুলি নিম্নোক্ত প্রকার :

১। প্রায় সকল শাখাকেন্দ্রই খোলা হয়েছে। তবে আন্দোলনের এই সবে সূত্রপাত।

২। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই শিক্ষিত। যাঁরা নন, তাঁরাও ঐহিক শিক্ষা পাচ্ছেন। কিন্তু যদি লোককল্যাণ করতে হয়, সর্বোপরি দরকার পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা। সেই উদ্দেশ্য যাতে অবশ্যই সিদ্ধ হতে পারে সেজন্য অন্য শিক্ষার তুলনায় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে।

৩। ঐহিক শিক্ষকবৃন্দ : আমরা যাদের পাচ্ছি, তাদের অধিকাংশ পূর্ব থেকেই শিক্ষিত। এখন দরকার শুধু আমাদের 'পদ্ধতি' তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের চরিত্র তৈরী করা। এখানে তাদের শিক্ষা—আনুগত্যের এবং অভীঃমন্ত্রের;

আর পদ্ধতি—দরিদ্রদের জন্য প্রথমে দেহপুষ্টির ব্যবস্থা করা, তারপরে উচ্চতর মানসিক পর্যায়ের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

কলা ও শিল্প : পরিকল্পনার এই অংশটুকু অর্থাভাবের জন্য এখনি আরম্ভ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে সহজতম গ্রহণযোগ্য পথ হল—ভারতীয়গণকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্রণোদিত করা, এবং অন্য দেশে যাতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরী হয়, তার চেষ্টা করা। একাজ তারাই করবে, যারা 'দালাল'-জাতীয় নয়, শুধু তাই নয়, যারা অপরপক্ষে লাভের সবটুকু অংশ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করবে।

৪। দেশের সকল জায়গায় ঘুরে বেড়ানো দরকার হবে, যে পর্যন্ত না 'জনগণ শিক্ষার কাছে আসে।'[১] এই ভ্রাম্যমান শিক্ষকেরা যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ধর্মের মানুষ—এই জিনিসটি সর্বাধিক ফলপ্রদ হবে।

৫। সকল বর্ণের মানুষের মধ্যেই আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার মুখে। এপর্যন্ত উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যেই কাজ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-কেন্দ্রগুলির কাজ পুরোপুরি চালু হওয়ার ফলে আমরা নিম্নবর্ণের মানুষদের উত্তরোত্তর প্রভাবিত করছি।

৬। প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুই আমাদের কাজের অনুমোদন করে। তবে এই জাতীয় কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করার ব্যাপারে তারা এখনো অভ্যস্ত নয়।

৭। হাঁ, নিশ্চয়, সেবাকাজে ও অন্যান্য সৎকাজে গোড়া থেকেই আমরা পীড়িত মানুষ কোন্ ধর্মাবলম্বী—সে হিসাব নিই না।[২]

---

[১] 'জনগণ শিক্ষার কাছে যে পর্যন্ত না আসে'—কথাটির অর্থ, ভারতীয় জনসাধারণ এতই দরিদ্র যে, শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও তাদের পক্ষে সে শিক্ষা নেওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ গ্রাসাচ্ছাদনের পরিশ্রমেই তাদের সবটুকু সময় ব্যয় করতে হত। সুতরাং স্বামীজীর বক্তব্য ছিল—জনসাধারণের কাছে গিয়ে, তাদের অবসরমতো তাদের শিক্ষা দিতে হবে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু Chemicals ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography প্রভৃতি ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে যায়, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যের পরে, দিন দুপুরে, কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁতি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।"

স্বামীজীর অজস্র চিঠিতে এই জনশিক্ষার কথা আছে—এখানে অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

[২] স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-সেবার কাজ করছিলেন, এবং অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। নিবেদিতার মতই তিনিও নিশ্চয় একই প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লেখেন (১০ অক্টোবর, ১৮৯৭)—"মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি, এবং তাহাদের ধর্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল, এবং যাহাতে তাহারা নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকায় তুলিয়া রাখ।" দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের সময়ে ধর্ম-বিবেচনা কেন—এই কথাটি আজ যত হাস্যকর বা বিরক্তিকর মনে হোক, যে-কালের আলোচনা হচ্ছে, তখন তা ছিল না। ভারতের পক্ষে ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল—যখন ক্রীশ্চান মিশনারীরা দুর্ভিক্ষের সস্তা বাজারে ক্রীশ্চান কিনত হাজারে হাজারে। ধর্মের দয়া ও ক্ষুধার সেই বিকট চেহারায় মানবতা মলিন হয়ে গিয়েছিল সেদিন ভারতে। বিবেকানন্দের উদারতা সেই পটভূমিকায় শুভ্র জ্যোতির মত।

প্রসঙ্গটির কিছু বিস্তারিত আলোচনা আমরা নিবেদিতার সেবামূর্তির প্রসঙ্গে করব।

নিবেদিতা ভারতে আসার পরে স্বভাবতঃই নিবেদিতার বিদ্যালয় এবং সেবাকাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিঠিপত্রে কিছুকিছু উল্লেখ আছে। সেগুলি আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত করব। ঐ দুই ভূমিকা ছাড়াও নিবেদিতার বাগ্মিতায় স্বামীজী খুবই খুশী হয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে নিবেদিতা 'ইংলণ্ডে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামীজী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেন—'ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে—এই মিস্ মার্গারেট নোবল্—যাঁর কাছে আমাদের বহু প্রত্যাশা',—এই প্রত্যাশা নিবেদিতা-চরিত্রের কাছে অবশ্যই, কিন্তু নিবেদিতার বক্তৃতা শোনার পরে নিবেদিতার বাগ্মিতার কাছেও সম্ভবতঃ। কারণ এই বক্তৃতার পরেই স্বামীজী গভীর আনন্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন—'মিস নোবল্—সত্যই রত্নপ্রাপ্তি আমাদের! আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ইনি শীঘ্রই মিসেস বেশান্তকে বক্তারূপে ছাড়িয়ে যাবেন।' স্বামীজী পরেও নিবেদিতার বক্তৃতা-সাফল্যে খুশী হয়েছেন দেখতে পাই।

এখানে জানানো উচিত, নিবেদিতা বক্তারূপে মিসেস বেশান্তকে ছাড়িয়ে যাবেন, এটা খুবই উচ্চ আশা, কারণ বেশান্তকে তৎকালীন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলা হত—স্বয়ং স্বামীজীই তাই বলেছেন। স্বামীজীর নিবেদিতা-প্রশংসায় কিন্তু নিছক শিষ্যা-স্নেহ ছিল না, পরবর্তীকালে নিবেদিতা বাগ্মী হিসাবে নাম করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশান্ত হয়ে উঠতে পারেননি, কারণ প্রথমতঃ তিনি রাজনৈতিক কাজে ও লেখার কাজে এতই জড়িয়ে পড়েন যে, বক্তৃতার অভিপ্রায় ত্যাগ করেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তৃতা অনেক সময়ই এত উচ্চ ও ঘনীভূত চিন্তায় পূর্ণ থাকত যে জনসাধারণের পক্ষে সব সময় বোধগম্য হত না।

সম্ভব হলে আমরা পরে 'বাগ্মী নিবেদিতা'—এই বিষয়ে কিছু তথ্য দেব।

নানা চিঠিতে দেখতে পাই স্বামীজী আমেরিকায় নিবেদিতার বক্তৃতা ও অর্থ-সংগ্রহ-প্রচেষ্টার সমূহ প্রশংসা করেছেন।

ভারতের কল্যাণে নিবেদিতা যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন, সশ্রদ্ধ চিত্তে তা রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনীতে লেখা হয়েছে—

'যে সব পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের শিক্ষাদান কাজটিকে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে এই মহান হিন্দু এবং বিরাট আচার্য মনে করেছিলেন।...পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁর উপরে তাঁর গভীর আশা ও বিশ্বাস ছিল; সেইজন্য স্বামীজীর ধ্রুবজ্যোতিপূর্ণ আলোচনার প্রবাহ উক্ত শিষ্যার দিকেই সর্বাধিক প্রবাহিত হত। ঐকালে যদি তিনি ভগিনী নিবেদিতার গঠনের অতিরিক্ত আর কিছু না করে থাকতেন, তাহলেও বলা যেত না, তাঁর সময় বৃথা গেছে।'

নিবেদিতা সংশ্লিষ্ট স্বামীজীর কবিতা

॥ ১ ॥

স্বামীজী নিবেদিতার বিষয়ে ও উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে দুটি কবিতা রচনা করেন। একটির নাম Benediction অর্থাৎ আশীর্বাদ, দ্বিতীয়টি Peace অর্থাৎ শান্তি। 'নিবেদিতা' নামটি নিবেদিতার বিষয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ততম বক্তব্য, বলা উচিত বহু বক্তব্যের হৃদয়-মধ্যস্থ কৌস্তুভমণি; আর ঐ কবিতা দুটিতে সেই মহামাণিক্যেরই উদ্ভাসিত দ্যুতি। প্রথম কবিতায়—ভারতের নিবেদিতা, দ্বিতীয় কবিতায়—নিত্য সত্যের নিবেদিতা। প্রথম কবিতায় স্বামীজী এক বিদেশিনী নারীকে সমগ্র ভারত-সাধনাকে আত্মসাৎ করে ভাবী ভারতের সেবিকা, গুরু ও বান্ধবী হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন; সে রকম গুরুদায়িত্ব আর কখনো কোনো বিদেশীকে বহন করতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিবেদিতা তা করতে কতখানি পেরেছিলেন—তার চরম স্বীকারোক্তি ভারতের মহাকবির কণ্ঠে শোনা গেছে, যখন তিনি নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু নিবেদিতাকে ভারতের জন্য উৎসর্গ করার কালে বিবেকানন্দ জানতেন যে, পরিপূর্ণ প্রেম ও পরিপূর্ণ সেবা কখনই সম্ভব নয়, যদি না অন্তরে সেই পরম অধ্যাত্ম সত্যের আলোক চির দীপ্যমান হয়ে থাকে। তাই তিনি চেয়েছেন, বাইরের কর্মতরঙ্গের মধ্যে যখন নিবেদিতা থাকবেন, তখন তিনি যেন শক্তির অন্তরে যে শক্তি, আলোকের মর্মে যে আলোক,—তার সন্ধান পান। Peace কবিতায় বিবেকানন্দের সেই দ্বিতীয় অর্পণ নিবেদিতাকে।

প্রথমে Benediction কবিতাটি অনুবাদসহ উদ্ধৃত হচ্ছে। কবিতাটির রচনা-কাল অজ্ঞাত।

The mother's heart, the heroes will,
The sweetness of the southern breeze,
The Sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free:
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.

Be thou to India's future son
The mistress, servant and friend in one.

মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে-অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদীতলে :

এসব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু—তুমি একাধারে।

(নারায়ণী দেবী অনূদিত)

কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত হলেও[১] অনুমানের চেষ্টা করা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারীতে নিবেদিতা স্বামীজীকে এক পত্রে লিখেছেন—"আপনার জন্মদিনের কবিতা (স্বামীজীর জন্ম তারিখ ১২ জানুয়ারী, ১৮৬৩) এসে পৌঁছল গত রাত্রে।"

এই কবিতাটি কোন্ কবিতা? এই চিঠিতে অতঃপর নিবেদিতা যা লিখেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী ঐ কবিতায় নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে তাঁর ভবিষ্যতের বিষয়ে অত্যুচ্চ কিছু কথা বলেছেন। হয়ত আলোচ্য Benediction কবিতাটিই স্বামীজী পাঠিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সেক্ষেত্রে কবিতাটির রচনাকাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়। নিবেদিতার চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

"আমার প্রিয় পিতা, আপনার জন্মদিনের কবিতা এসে পৌঁছল গতরাত্রে। কী এমন বলতে পারি কবিতাটির বিষয়ে যা শেষপর্যন্ত তুচ্ছ শোনাবে না! শুধু বলি, আপনার সুন্দর ইচ্ছা যদি সফল হয়, তা আমার হৃদয়কে ভেঙে দেবে। কারণ আমি এখন রামপ্রসাদের ভাবে আছি : 'চিনি হতে চাই না মন—চিনি খেতে ভালবাসি।' একথা ভাবাও যদিচ উদ্ভট তবু বলি—আমি এমন কোনো পথে ভগবানকেও পেতে চাই না, যদি না তার দ্বারা আমার পিতা অলঙ্ঘনীয়ভাবে ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন।

অধ্যাত্মসিদ্ধির ক্ষণে গুরু হারিয়ে যাবেন, এমন কথা ভাববার দরকার হয় না জানি, তবু সেই মহা মুহূর্তেও এমন কোনো দিব্য আনন্দের কথা কল্পনা করতে পারি না, যার প্রাপ্তি গুরুর ক্ষেত্রে অধিকতর নয়।

অসম্ভব কথা বলার, কিংবা অচিন্তনীয় চিন্তা করার চেষ্টা করছে একজন, তবু, আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কি প্রকাশ করতে চাইছি।

আগে ভাবতাম, আমি ভারতের নারীদের জন্য কাজ করতে চাই; এই ধরনের নানা সুমহান নৈর্ব্যক্তিক ভাবরাজিতে পূর্ণ থাকত মস্তিষ্ক, কিন্তু ক্রমেই নিশ্চিতভাবে সেই উচ্চ শিখর থেকে নেমে এসেছি; আজ আমি যদি কিছু করতে চাই, তার একমাত্র কারণ—আমার পিতার ইচ্ছা তাই। এমনকি আমাদের ঈশ্বরজ্ঞানের ইচ্ছাও দেওয়া-নেওয়ার ভাবমুক্ত নয়। সেবার জন্যই সেবার চির কামনা অবশ্যই শ্রেয়, কিন্তু

[১] 'বাণী ও রচনা'র সপ্তম খণ্ডে কবিতাটির রচনার তারিখ দেওয়া আছে ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০। এই তারিখ কিভাবে পাওয়া গেল জানি না। যদি মূল রচনা থেকে নেওয়া হয় ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে ১৯০০-র ১৩ জানুয়ারীর চিঠিতে নিবেদিতা স্বামীজীর রচিত কোন্ কবিতার কথা বলেছেন?

হে প্রিয় আচার্যদেব।—সে আমাদের এই দুঃখী ক্ষুদ্র জীবনের জন্য নয়।

আর একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত, অন্তত আমার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, সময় উপস্থিত হলে আপনি হাজার হাজার সন্তান লাভ করবেন, যারা বৃহত্তর, শ্রেষ্ঠতর, যারা আমার থেকে অনন্ত গুণ বেশী করে আপনাকে ভালবাসবে ও সেবা করবে—আর তার দেরীও নেই।

এখন স্বামীজী, আপনাকে স্বীকার করতে হবে আপনার কিছু ভুল হয়েছিল; 'আমেরিকা—ইতি!'[২] উঁহু! জ্যাকসনে একটি মানুষের কাছে আপনার নাম ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের কাছে লাল আলোর মত ছিল। সে ব্যক্তি আজ আপনার এবং আমার মিত্র, কারণ—আপনার কন্যার রসবোধ আছে!!!!"[৩]

॥ ২ ॥

Peace কবিতাটি লেখা হয় আমেরিকায়, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁর দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন, এবং নিবেদিতাও সেখানে ছিলেন ভারতীয় কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। সেইকালে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কবিতাটি লিখিত হয়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সে বিষয়ে লিখেছেন :

"২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা 'রিজলি ম্যানর' (মিঃ লেগেটের বাসগৃহ)

---

২ এই সময়ে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণে এসেছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে, এবং মানসিক ঔদাসীন্যের জন্যও বটে, স্বামীজী বলেছিলেন,—তাঁর আমেরিকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

৩ ভারতীয় কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কাজটিকে অত্যন্ত দুরূহ দেখেন। আমেরিকা তখন বিবেকানন্দের বন্ধু ও শত্রুতে পূর্ণ। বিবেকানন্দ প্রচণ্ডভাবে মিশনারীদের ভারত-বিষয়ক কুৎসার বিরোধিতা করেছিলেন, যার উত্তর মিশনারীরা দেবার চেষ্টা করেছিল বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা করে। ভারত-কুৎসার মাত্রাও বেড়েছিল। মিশনারীদের সমবেত চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। স্বামীজীর নামে প্রচার করাও স্থানবিশেষে নিবেদিতার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। এইসব বিরোধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষে জানতেন না, বা তাঁর বক্তৃতা শোনেননি। স্বামীজীকে লেখা উদ্ধৃত পত্রে তেমনই এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা, যিনি মূলে কিন্তু ভদ্র ও রসিক মানুষ। নিবেদিতা যথার্থ সত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে, তাঁর সুরসিক হৃদয়ের কাছে আবেদন করে কোন্ ফললাভ করেছিলেন, তা ১৩. ১. ১৯০০ তারিখে মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"মিঃ ও' ডনেলের স্বামীজী-বিষয়ক মনোভাব : ও নাম আমার সামনে উচ্চারণ পর্যন্ত করবে না। এই ব্যক্তি মিশিগানের সকল 'সানডে স্কুলের' সুপারিনটেনডেণ্ট, এবং কি নন? আর—সবিস্ময়ে দেখলাম, পাকাচুল নিতান্ত উষ্ণ-মিষ্ট মানুষ তিনি, চোখে ঝিলিক, সবসময়ে লোকের কৌতুকবোধে নাড়া দেন। আমাকে তিনি সৎ-স্বভাব 'চার্চ-উওম্যান' বলেই ধরলেন, এবং সেখান থেকে চলে আসার আগে আমরা সকলে মিলে রেক্টরের কাছে গিয়ে কোনো এক রবিবার স্বামীজীকে বেদী থেকে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম!!! তুমি জানো, গির্জা-আইনে অ-সন্ন্যাসী বেদী (Pulpit) থেকে প্রচারের অধিকার পেতে পারে, যে আইন অনুসারে রোমান ও এপিক চার্চের চোখে স্বামীজী অ-সন্ন্যাসী, তত্ত্বগতভাবে!!!"

পৌঁছিলেন। মিঃ লেগেট ছিলেন ধনী ব্যক্তি। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার ও মিসেস লেগেটের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। ...স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও কয়েকদিন কাটাইয়া গেলেন।...মিসেস সারা বুল আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার কন্যা ওলিয়া। মিসেস লেগেটের ভগ্নী মিস ম্যাকলাউড পূর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন।...

নিবেদিতার আমেরিকায় অবস্থানের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। কাজে নামিবার পূর্বে স্বামীজীর সঙ্গ ও বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে। তিনি ইতি-পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই আদর্শে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন। ...লেগেটের বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ গৃহে বাস করিলেও তাঁহার জীবন যে একটি বিশেষ আদর্শবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা স্থির রাখিবার জন্য চালচলন, বেশভূষায় পরিবর্তন প্রয়োজন।...

রিজলি ম্যানরে আগমনের পর নিবেদিতা সংকল্প স্থির করিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী; যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পরদিন (২১শে সেপ্টেম্বর) তিনি তদুপযোগী পরিচ্ছদ গ্রহণের অভিপ্রায় স্বামীজীর নিকট ব্যক্ত করেন। আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তা ও অনুরাগ দর্শনে স্বামীজী প্রীত হন। ঐ দিন বৈকালবেলা ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র স্বামীজী তাঁহাকে একটি উপহার দেন। কবিতাটির নাম 'শান্তি' (Peace)।"[৪]

স্বামীজী এইকালে কি ধরনের আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের মধ্যে ছিলেন—তার বিস্তৃততর পরিচয় যদি পাঠকগণ বুঝতে চান, তাহলে এইসঙ্গে তাঁদের অল্প পূর্বে উদ্ধৃত নিবেদিতাকে আমেরিকা থেকে লেখা ১৮৯৯—১৯০০-এর চিঠিগুলি দেখে নিতে হবে। সেই সঙ্গে ঐ কালেই স্বামীজীর ভাবানুভূতির সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্রও পঠিতব্য। নিবেদিতার পত্র ও পত্রাংশ অল্প পরেই উপস্থিত করব।—

Peace

Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

---

[৪] কবিতাটির প্রতিলিপি দেওয়া আছে "The Life of Swami Vivekananda By His Eastern and Western Disciple"-এর মধ্যে।

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music;
And pause in sacred art;
The silence between speaking;
Between two fits of passion—
It is calm of heart.

It is beauty never seen,
And love that stands above,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear-drop goes,
To spread the smiling form
It is the goal of life,
And Peace—its only home.

শান্তি

মহাবলে ধেয়ে আসে শক্তি—
কিন্তু তা শক্তি নয়,
তা অন্ধকারে অন্তর্লীন আলোক,
তা ছায়া—তীব্র জ্যোতি মাঝে।

আনন্দ তা— অনির্বচনীয়,
গভীর বেদনা—অননুভূত,
অমর জীবন তা— অযাপিত,
নিত্য মরণ—অশোচিত।

তা দুঃখ নয়, তা সুখ নয়,
দুয়ের মর্মে যা আছে, তাই।
তা নিশা নয়, তা উষা নয়,
উভয়ের সন্ধির সেতু।

সঙ্গীতের সম, পবিত্র ছন্দের যতি,
মুখর ভাষণের অন্তরের নৈঃশব্দ্য,
বাসনার উচ্ছ্বাসের দুই তরঙ্গের মধ্যে
হৃদয়ের ক্ষান্তি, ধৃতি।

নয়নে ধরা দেয়নি, এমন সৌন্দর্য,
পাত্র নেই তবু নিঃসঙ্গ প্রেম,
অগীত অশ্রুত সুর,
আর জ্ঞান, যা জ্ঞানের অতীত।

জন্মতরঙ্গের মধ্যে স্থির মৃত্যু,
ঝঞ্ঝার শিরে নিশ্চল নিরোধ,
সৃষ্টিগর্ভ মহানেতি,
আর মহানেতি যা সৃষ্টি পরিণাম।

নয়নাশ্রু ঝরে পড়ে সেইখানে,
হাসিতে আবার ফোটে নব প্রাণে,
জীবনের পরম লক্ষ্য সেই—
'শান্তি'—তার একমাত্র ধাম।

॥ ৩ ॥

স্বামীজীর ইংরাজ শিষ্য জে. জে. গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী Requiescat in Peace নামে যে কবিতাটি লেখেন, তার প্রাথমিক রূপ কিন্তু নিবেদিতাকৃত। সে হিসাবে কবিতাটিকে স্বামীজী ও নিবেদিতার যৌথ সৃষ্টি বলা যায়, যদিও নিবেদিতারচিত প্রাথমিক রূপটি সামান্যই, এবং ত্রুটিযুক্ত বলে স্বয়ং নিবেদিতাই জানিয়েছেন।

ভারতবর্ষের জন্য, ঠিকভাবে বলতে গেলে বিবেকানন্দের জন্য, গুডউইন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। মিসেস ওলি বুল লিখেছেন, গুডউইন তাঁকে বলেছিলেন যে, "তাঁর প্রথম বয়স কেটেছিল সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মের চেষ্টায় পৃথিবীর নানা দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে—তার ফল,—হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অজ্ঞেয়বাদী

নিউইয়র্কে স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার রূপে কাজ করার অভিজ্ঞতার পরে,— স্বামীজীর সঙ্গে তিনি মাসের পর মাস দিবারাত্র কাটিয়েছিলেন,—জীবনের সর্বোচ্চ উপলব্ধির সৌন্দর্য, আত্মা ও ঈশ্বরের জ্ঞানের সম্মুখীন তিনি হলেন।"

নিউইয়র্কের নিপুণ স্টেনোগ্রাফার বিবেকানন্দকে জানার পরে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে (তাও সব সময় পর্যাপ্ত হয়নি) ভারত ও বিশ্বকে দিয়েছিলেন "বিবেকানন্দের রচনাবলী"—কেননা স্বামীজীর "রচনাবলীর" অধিকাংশই গুডউইন-অনুলিখিত বক্তৃতাবলী,—আর বিনিময়ে পেয়েছিলেন জীবনের পরম প্রাপ্তি—বিবেকানন্দ গুডইনের কাছে ছিলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট।

স্বামীজী গুডউইনকে অপরিসীম ভালবাসতেন। গুডউইন তাঁর কাছে পুত্রবৎ নন, পুত্রাধিক। গুডউইনের প্রতি স্বামীজীর অসীম ভালবাসার জন্য অন্য বিদেশী শিষ্যেরা অনেক সময় আনন্দময় ঈর্ষা বোধ করতেন। গুডউইনের মৃত্যুসংবাদে আর্তনাদ করে স্বামীজী বলেছিলেন—'বুঝলাম, পুত্রশোক কী ভয়ঙ্কর!'

গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজীর বক্তৃতা সফরের সময়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে থাকেন। তারপরে সম্ভবত যখন দারুণ অর্থকৃচ্ছ্র দেখা দেয়, তখন বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সাময়িকভাবে 'মাদ্রাজ মেল' কাগজে যোগদান করেন, এবং উতাকামণ্ডে থাকাকালে ১৮৯৮-এর ২রা জুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যু তাঁর বন্ধু ও পরিচিত মানুষদের কাছে গভীরতম বেদনার কারণ হয়েছিল, যাঁরা তাঁর আনুগত্য ও সেবার মধ্যে "খাঁটি ইংরেজের চরিত্র" দেখেছিলেন, যিনি "স্বদেশে বিদেশে যেখানেই হোক মহান ও ঈশ্বরীয় প্রকাশকে বরণ করে নেবার মত শক্তি-সম্পন্ন।" তাঁর সাহসী ও প্রেমময় জীবন, ওলি বুল লিখেছিলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের ভান্ডারে মহৈশ্বর্যতুল্য।"

গুডউইন যখন মারা যান, স্বামীজী আলমোড়ায় ছিলেন। নিবেদিতা প্রভৃতিও সেখানেই ছিলেন। তবে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ আসার সময়ে স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে কিছু দূরে কোনো একটি স্থানে গিয়েছিলেন। সুতরাং সংবাদ আসা মাত্র স্বামীজী তা পাননি। কিন্তু স্বামীজী ভিন্ন অন্যান্যরাও গুডউইনকে এতই ভালবাসতেন যে মৃত্যুসংবাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া হয় তাঁদের মনে। এ বিষয়ে মিসেস হ্যামণ্ডকে ৫ জুন, ১৮৯৮-তে লেখা নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্র থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি :

"গতকাল দুপুরের দিকে একটি টেলিগ্রাম এসে আমাদের বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিল—গুডউইনের মৃত্যু হয়েছে। মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁকে আমার চেয়ে বেশী ভালভাবে জানতেন, কিন্তু তাঁর শেষ দেখা আমার সঙ্গেই—কী ভাল ব্যবহারই সেদিন তিনি করেছিলেন মাদ্রাজে—ভালোত্ব একেবারে তাঁর স্বভাবধর্ম। যে-সব হিন্দুরা এখানে তাঁকে জানতেন, তাঁরা যথার্থ দুঃখে অধীর—দেখলেই বোঝা যায়। সারাক্ষণ আমাদের কাজ করে এমন একটি ছোকরা খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তিন-চার ঘণ্টা ধরে—কথা বলবার সামর্থ্যও যেন তার হারিয়ে গিয়েছিল। একটি সাধু সারা বিকাল বসে রইলেন, আর তাঁর বিষয়ে মধুর স্নিগ্ধ সব কাহিনী

বলতে লাগলেন। বদ্রীশা এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি; তিনি এই সাধুর কাছে খুব সকালে এসে বলেছিলেন, তাঁর মন যেন বলছে যে তাঁর ভাই গোবিন্দলাল নিশ্চয় মারা গেছে। টেলিগ্রাম যখন এল তখন স্বামী সদানন্দ সেটি চেপে যেতে চেয়েছিলেন, যেহেতু সেটি রাজার (স্বামীজীর) নামে পাঠানো এবং রাজা অন্যত্র আছেন—কিন্তু সদানন্দ 'চোখের কয়েকফোঁটা জল' গড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে পারেন নি; তাতে বদ্রীশা ব্যাপারটা কি জানবার জন্য জেদ করলেন। তারপর সব শুনে বললেন, 'একই ব্যাপার, গোবিন্দলাল না হয়ে গুডউইন—তফাৎ কি!' গুডউইনকে সকলে এখানে এমনই ভালবাসে। রাজা এখনো বাইরে, আজ সকালেই ফিরবেন,—আঘাতটা দারুণ বাজবে। একমাত্র সান্ত্বনা, গুডউইন মারা গেছেন দারুণ মাদ্রাজে নয়—উতাকামণ্ডে—পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানের একটিতে। গুডউইন শহীদ হয়েছেন—স্বামীজীর কাজের জন্য, আর এখানকার আবহাওয়ার জন্য। মনে হচ্ছে, টাইফয়েডে নয়, প্লেগেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[৫] তাঁর সেবায় কোনো ত্রুটি ছিল না, ভক্তিতে ছিল না ফাঁক। কানায় কানায় পূর্ণ, সংহত, অর্জিত সেবা ও ভক্তি। ভারতে নবযুগের ঋষিদের মধ্যে প্রথম স্থান নিলেন একজন ইংরেজ। এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যে আমাদের একমাত্র উপযুক্ত অর্ঘ্য হতে পারে ধূপ-দীপ, পুষ্প ও মাল্য এবং সুন্দর সঙ্গীত।

ভারতে আগত পাশ্চাত্ত্য শিষ্যের সংখ্যা একটি কমল—সাতের বদলে এখন ছয়।[৬]

সোমবার সকাল : স্বামীজী গতকাল সন্ধ্যার শেষে এলেন, অনেকটা মুহ্যমান অবস্থায়, কেননা তিনি সেই বৃদ্ধ সাধু পওহারী বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও বলেছিলেন—"প্রিয়তমের বার্তা।" এজন্য স্বামীজীকে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়নি। জানানো হল আজ সকালে, যখন তিনি আমাদের কাছে এলেন। মিস ম্যাকলাউড সংবাদ দিলেন। খুব শান্তভাবে সংবাদটি নিলেন। তারপর থেকে খবরের কাগজ পড়ে এবং ক্রমাগত কথা বলে গেলেন। তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে তোমার চিঠির বিষয় শুনলেন, কবিতাটি দেখলেন।—নেল, নেল, প্রিয় আমার—ভারত সত্যই পুণ্যভূমি!"

গুডউইনের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসার পরিমাণ নিবেদিতা জানতেন বলেই গুডউইনের অভাবিত মৃত্যুকে স্বামীজী যখন শান্তভাবে নিতে পেরেছিলেন, তখন সেটি পরম বিস্ময়কর বস্তু বলে তাঁর মনে হয়েছিল, এবং সে বস্তু পুণ্যভূমি ভারতের মহাপুরুষদের পক্ষেই দেখানো সম্ভব বলে সোচ্ছ্বাসে জানিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু

---

৫ ভারতের নানা স্থানে তখন প্লেগ মহামারী চলছে। স্বামীজী প্লেগ শুশ্রূষার পরিকল্পনাও করেছেন। গুডউইন অবশ্য টাইফয়েডেই মারা যান।

৬ নিবেদিতা এখানে কাদের কথা বলছেন ঠিকভাবে বলা শক্ত। স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যা বা ভক্তদের মধ্যে ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে এসেছেন—সেভিয়ার দম্পতি, গুডউইন, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিস মুলার, মিসেস প্যাটারসন (আমেরিকান কন্সাল পত্নী) এবং স্বয়ং নিবেদিতা। মোট সংখ্যা হয় আট। এঁদের মধ্যে হিসাবে বাদ যেতে পারেন হয় মিস মুলার, বা মিসেস প্যাটারসন। সম্ভবত মিস মুলারই বাদ যাবেন। ক্রিস্টিনের কথা এখানে ওঠে না, কারণ ক্রিস্টিন ভারতে এসেছিলেন ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের গোড়ায়।

নেলকে। নিবেদিতার প্রাপ্ত পত্রসমূহে এর বেশী পাই না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার বিবরণ ডায়েরীতে তিনি রক্ষা করেছিলেন। বাইরে শান্ত বিবেকানন্দের বুকে কোন্ বেদনার ঝড় উঠেছিল, তা ডায়েরীর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, গুডউইনের মৃত্যুর বিষয় না জেনেও গুডউইন যখন মারা যাচ্ছেন সেইসময়ে নিবেদিতা প্রভৃতির মন কিভাবে অজ্ঞাত বিষাদ ও যাতনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।—

"৩০শে মে থেকে ২রা জুন (১৮৯৮) : পরবর্তী সোমবার যাঁরা তাঁকে আতিথ্য দিয়েছিলেন (সেভিয়ার দম্পতি), তাঁদের সঙ্গে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন এক সপ্তাহের জন্য। আমরা আলমোড়ায় রয়ে গেলাম—ব্যাপৃত রইলাম পড়াশোনায়, অঙ্কনে এবং উদ্ভিদ চর্চায়। সেই সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় আহারাদির পরে আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম, তখন বিচিত্রভাবে আমাদের মন আকৃষ্ট হল 'In Memoriam' -এর[৭] প্রতি, এবং আমাদের মধ্যে একজন পড়ে শোনালেন :

Yet in these ears, till hearing dies,
One set slow bell will seem to toll
The passing of the sweetest soul
That ever looked with human eyes.
I hear it now, and O'er and O'er,
Eternal greetings to the dead ;
And 'Ave, Ave, Ave' said,
'Adieu, Adieu', for evermore.

আমার এই শ্রবণের শক্তি যতদিন থাকবে,
ততদিন বেজেই যাবে ধীরে, মন্থরে, ঘন্টাধ্বনি—
প্রিয়তম আত্মার বিদায়ের বার্তা নিয়ে,
এ পৃথিবীতে নয়ন মেলেছে এমন মধুতম আত্মা সে।
সেই ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনছি, শুনছি, শুনছি—
মৃতের উদ্দেশে নিত্য নমস্কার নিয়ে তা বাজছে,
বলছে— শুভ হোক! শুভ হোক! শুভ হোক!
বলছে—বিদায়! বিদায়! বিদায়—চিরতরে!

সেই বিশেষ ক্ষণেই, সুদূর দক্ষিণে, আমাদের গোষ্ঠীরই একজন প্রয়াণ করছিল এই ক্ষুদ্র, দৃশ্যমান সংসারমন্দির থেকে সূক্ষ্মতর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, দীপ্ততর

---

৭ In Memoriam লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত শোকগীতি—তাঁর প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরী হালামের মৃত্যুতে রচিত।

কোনো প্রকাশলোকের মধ্যে, যেখানে হয়ত পরম সান্নিধ্য স্পষ্টতর, ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু সেকথা আমরা জানতে পারিনি তখনো। আরও একটি কালিমাচ্ছন্ন দিন গেল—কেন, বুঝিনি তখনো। তারপরে, যখন শুক্রবার সকালে বসে কাজকর্ম করছি, টেলিগ্রাম এল, একদিন দেরী করে, তাতে লেখা : 'গুডউইন গতরাত্রে উতাকামণ্ডে দেহত্যাগ করেছেন।' ঐ অঞ্চলে পরে যা টাইফয়েড মহামারী হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের হতভাগ্য বন্ধু, দেখা গেল, তারই প্রথম শিকারের অন্যতম। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বামীজীর কথা বলেছিলেন;—স্বামীজী যেন পাশে এসে দাঁড়ান—চেয়েছিলেন শেষ ক্ষণেও।

রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী ফিরলেন।...তিনি সংবাদটি জানেন না; কিন্তু পূর্ব থেকেই গভীর বিষাদে তিনি মগ্ন; নীরবতা ভঙ্গ করে তখনি সেই মহাপুরুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও "প্রিয়তমের বার্তা" বলেছিলেন, যাঁকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাধিক ভালবাসতেন। স্বামীজী বললেন, "আমি এইমাত্র একটি চিঠি পেয়েছি; পওহারী বাবা তাঁর সকল উৎসর্গকে পূর্ণ করেছেন দেহোৎসর্গ করে; যজ্ঞাগ্নিতে দেহ বিসর্জন করে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন।" শ্রোতাদের একজন শিউরে বললেন : 'সেকি—কাজটি কি খুবই মন্দ হয়নি?'

"কী করে বলব তা?" গভীর ভাবোত্তেজনার সঙ্গে স্বামীজী বললেন,—তিনি এত বড় যে আমার বিচারের অধিকার নেই; তিনি জানতেন তিনি কি করছেন!'

এর পরে খুব অল্প কথাবার্তাই হল; সন্ন্যাসীর দল চলে গেলেন; অন্য সংবাদটি তখনও ভাঙা গেল না।

পরদিন খুব সকালে তিনি এলেন; গভীর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন। পরে জানা গেল, রাত চারটে থেকে জেগে আছেন। একজন (মিস ম্যাকলাউড) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মিঃ গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ জানান। বজ্রাঘাত তিনি নীরবে সইলেন। কয়েক দিন পরে, যেখানে তিনি ঐ সংবাদ শুনেছিলেন, সেখানে থাকতে চাইলেন না; সর্বাধিক বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি সর্বদা মনে জাগছে—এই দুর্বলতার জন্য নিজের উপর দোষারোপ করলেন। প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন—কারো স্মৃতির দাস হওয়া পুরুষোচিত নয়; ক্রমবিকাশের ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠে মানুষ যদি মৎস্য বা কুক্কুরের লক্ষণগুলি বজায় রাখে তাহলে যেমন ঘটে এও তাই। এ মায়া মানুষকে জয় করতে হবে, মৃতেরা যে পূর্বের মত আমাদের সান্নিধ্যেই আছেন, একথা বুঝতে হবে। তাঁদের অনুপস্থিতি বা বিচ্ছেদের ধারণাটাই মায়া। তারপর আবার ফেটে পড়লেন; সগুণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বসংসার চালিত হচ্ছে, এই নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেক্ষেত্রে গুডউইনকে মেরে ফেলার জন্য এমন একজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁকে নিকেশ করে ফেলা কি মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না?—গুডউইন—আহা।—যদি বেঁচে থাকত কত কি করতে পারত!'...

কিন্তু শোকসংবাদ পাবার পরে স্বামীজী তাঁর বিয়োগদুঃখ সম্বন্ধে শান্তই ছিলেন। শান্তভাবে বসে তিনি কথা বলছিলেন। যে-ভক্তি ত্যাগ-বৈরাগ্যে পৌঁছায়, তারই কথায় পূর্ণ ছিলেন সেই সকালে—সেই দিব্য আকুতি যা মানুষের আত্মাকে খরপ্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিত্বসীমার অনেক দূরে, অথচ আবার এমন এক

স্থানে তাকে স্থাপন করে, যেখানে সে ঐ ব্যক্তিত্বেরই মধুবন্ধন ছেদনে অস্থির ব্যাকুল হয়ে ওঠে।...

কিন্তু এই দিনগুলিতে স্বামীজী কোথাও সরে যেতে, একাকী থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যে-জায়গায় গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন, সে জায়গাটি তাঁর পক্ষে অসহ্য ঠেকছিল; আর সে বিষয়ে চিঠি পাওয়া বা লেখা নিত্য ক্ষতের যাতনা বাড়িয়ে তুলছিল। একদিন তিনি বললেন, 'বাইরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তিময় মনে হলেও তিনি অন্তরে জ্ঞানস্বরূপ, আর তিনি নিজে বাহ্যত যদিও জ্ঞানময় মনে হন, আসলে ভক্তিতে পূর্ণ; তাই তিনি নারীর মত দুর্বল হয়ে পড়েন।'"

এই মানসিক পটভূমিকায় গুডউইন বিষয়ে আলোচ্য কবিতাটি লিখিত হয়। কবিতাটি নিবেদিতাই শুরু করেন, ত্রিপদী ছন্দে লেখা আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু স্বামীজীর হাতে পড়ে সেটি আমূল বদলে যায়। এই পরিবর্তনে নিবেদিতা পাছে ক্ষুণ্ণ হন, স্বামীজী 'কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস' তাই বর্ণনা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে। কবিতাটি গুডউইনের মায়ের কাছে পাঠানো হয়। কবিতাটি এই :

Requiescat in Peace!

Speed forth, O soul! upon thy
Star-strewn path,
Speed, blissful one, where thought
is ever free,
Where time and sense no longer
mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee!
Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home the heart of love
transcendent find,
Remembrance sweet, that kills all
space and time,
Like altar-roses, fill thy place behind.
Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found.
And—one with that which comes as
Death and Life,—
Thou helpful one! unselfish e'er on earth,
Ahead, still aid with love this world of strife.

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম

চল আত্মা, শীঘ্রগতি, তারকা-খচিত তব পথে,
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ!
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে!

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ-সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তাঁর সাথে হলে একপ্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়!

[কিরণচন্দ্র দত্ত অনূদিত]

এই কবিতার সঙ্গে স্বামীজী গুডউইন-জননীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন পত্রে : "তাঁর কাছে আমার যে ঋণ,—তা কখনো শোধ করা যাবে না। আমার কোনো চিন্তার দ্বারা যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকেন তিনি জেনে রাখুন, তার প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য পরিশ্রমের ফলেই প্রকাশিত হতে পেরেছে। তাঁকে হারিয়ে আমি ইস্পাতের মত খাঁটি বন্ধু হারিয়েছি, অপরাজেয় ভক্তিতে পূর্ণ শিষ্য হারিয়েছি, এমন একজন কর্মী হারিয়েছি, ক্লান্তি কাকে বলে যিনি কখনও জানতেন না। আর পৃথিবী হারিয়েছে এমন বিরল মানুষদের একজনকে, যিনি সর্বদাই অপরের জন্য দেহধারণ করে থাকেন। পৃথিবী তাঁকে হারিয়ে সম্পদ হারিয়েছে।"

কবিতা ও চিঠি পেয়ে শোকসন্তপ্ত গুডউইন-জননী তাঁর "পরলোকগত পুত্রের উপর স্বামীজী কি জাতীয় উচ্চ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন" সে বিষয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে লিখে পাঠান।

গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী কি দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন বোঝা যাবে, তাঁর অন্য আরও উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন; 'আমার ডান হাত খসে গেছে; ক্ষতির সীমা রইল না।' পুনশ্চ, 'আমার বক্তৃতার পালা শেষ।'

॥ ৪ ॥

নিবেদিতার লেখার মধ্যে স্বামীজীর আরও কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার পট-ভূমিকা পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে কোনো এক

সময়ে শ্রীনগরে অবস্থানকালে স্বামীজী পুনঃ প্রবর্তিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য To the Awakened India কবিতাটি, ঐ বৎসরের ৪ঠা জুলাই 'To the fourth of July' এবং অগস্ট-সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময়ে Kali the Mother কবিতা রচনা করেন। এই সমস্ত কবিতার পটভূমিকার বিষয়ে সংবাদ নিবেদিতার লেখায় পাই। এদের মধ্যে কিছু পরে Kali the Mother-এর বিষয়ে আমরা বিশেষ উল্লেখ করব। নিবেদিতার পত্র থেকে ১৮৯৯, জুনে, য়ুরোপ যাত্রাকালে জাহাজে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক বাংলা কবিতাটি রচনার বিষয়ে উল্লেখও পাই।

নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী

নিবেদিতার যে বিপুল সংখ্যক পত্র লিজেল রেম' সংগ্রহ করেছেন, তার অধিকাংশ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা, এবং সেইসব পত্রের একটি বড়ো অংশের বিষয়বস্তু বিবেকানন্দ। স্বামীজী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পত্রগুলি স্বামীজীর উক্তি ও বিভিন্ন মুড-এর বিবরণে পূর্ণ থাকত, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে সেগুলি পূর্ণ থাকত তার স্মৃতি ও চিন্তার অনুধ্যানে। বিবেকানন্দ নামক সর্বগ্রাসী চেতনা কিভাবে নিবেদিতার জীবনের প্রতিটি অংশকে অধিকার করে ছিল, এই পত্রগুলি থেকে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে নিবেদিতার অন্তর্জীবনের এক অপূর্ব ইতিহাসের সম্মুখীন হই আমরা, যার একদিকে আছে আত্মার বিপুল সংগ্রামের কাহিনী, অন্যদিকে আত্মবিলয়ের শান্তি সঙ্গীত। স্বয়ং বিবেকানন্দের অন্তরাত্মার উদ্দীপন কিংবা হাহাকারের অসাধারণ মুহূর্তও এর মধ্যে বারেবারে ফুটে উঠেছে। বিপুল প্রতিভার ঐশ্বর্যে পূর্ণ এক মানব ক্ষণে ক্ষণে কিভাবে লোকসীমাকে অতিক্রম করে দিব্যসত্তায় উন্নীত হতেন, তার গরিমাময় কাহিনীও এইসব অংশে পাওয়া যাবে। স্বামীজীর এইসব ভাববিকাশের কথা পরে অল্পবিস্তর নিবেদিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেও অনেক অংশ বাদ দিয়েছিলেন। পত্রের মধ্যে তার অধিক প্রকাশ এবং অধিকতর জীবন্ত সান্নিধ্য। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও তাঁর অশরীরী উপস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করেই নিবেদিতার বাকি জীবন কেটেছিল।

নিবেদিতার পত্রাবলীতে প্রাপ্ত স্বামীজীর সকল বর্ণনা বা উক্তি বর্তমান প্রসঙ্গে চয়িত হচ্ছে না। আমরা প্রধানত নিবেদিতার অন্তর্জীবনের সঙ্গে যুক্ত অংশগুলিই নির্বাচন করব। এইসব অংশে কোথাও কোথাও ফাঁক থেকে গেছে, কারণ সব চিঠি আমরা নিশ্চয় পাইনি, দ্বিতীয়ত, অন্তর্জীবনসংক্রান্ত পত্রগুলি মূলত মিস ম্যাকলাউডকে লেখা বলে যখন ম্যাকলাউড স্বামীজীর সান্নিধ্যে ছিলেন, তখন তাঁকে চিঠি লেখার কথা ওঠে না। সেইসব সময়ের বিবরণ নিবেদিতা ডায়েরীতে অনেক সময় রক্ষা করেছেন। ফাঁক পূরণের জন্য এইসব ডায়েরীজাতীয় রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে যোগ করে দেব।

রাজনীতি, লোকসেবা, শিক্ষা, সমাজ সমস্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ে স্বামীজীর অনেক আলোচনা পত্রগুলিতে রক্ষিত আছে। সেগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য নানা পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হবে।

পাঠকগণ প্রথমে নিবেদিতার ভারতে আসার পূর্বে তাঁকে লেখা স্বামীজীর পত্রগুলি, যা ইতিমধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে, স্মরণ করুন। নিবেদিতা কলকাতায় মম্বাসা নামক জাহাজ থেকে অবতরণ করেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী। স্বামীজী তাঁর অভ্যর্থনায় জাহাজ-ঘাটে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা প্রথমে চৌরঙ্গীর এক হোটেলে ওঠেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড কলকাতায় পৌঁছান। কিছু-দিনের মধ্যে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জন্য জমি কেনার বন্দোবস্ত হয়, এবং ওলি বুল প্রভৃতি ঐ জমির একটি পুরনো বাড়িকে সংস্কার করে নিয়ে বাস করবার প্রস্তাব করেন। স্বামীজী সম্মত হন। নিবেদিতা সেই বাড়িতে ওলি বুল ও ম্যাকলাউডের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। এই বাড়িতে বসবাসের পূর্বে জায়গাটির প্রথম দর্শনের পরে নিবেদিতা লিখেছেন: (মিসেস হ্যামণ্ডকে, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮)—

মাননীয়া মাতা (মিসেস ওলি বুল) গত সোমবার খুব সকালে এলেন। মঙ্গলবার স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেলাম। গতকাল তাঁর অতিথি হিসাবে পিকনিক করলাম সুন্দর এক নদীর তীরে (গঙ্গাতীরে), যে-জায়গাটি মিস মুলার মঠ তৈরীর জন্য স্বামীজীকে কিনে দিচ্ছেন। জায়গাটি ঠিক উইম্বলডন কমনের কোন একটি অংশের মতই—গাছপালাগুলোকে খুব খুঁটিয়ে নজর না করলে তফাৎ ধরা পড়ে না। তেমন ভাবে দেখলে দেখা যায়, রুপোলী বার্চ, বা বাদাম বা ওক্ গাছের তলায় তুমি বসে নেই, বসে আছ পূর্ণমঞ্জরী আম্রবৃক্ষতলে কিংবা বাবলাগাছের নীচে, আশেপাশে ছড়িয়ে আছে একটি দুটি তালবৃক্ষ, মাটিতে লুটিয়ে অপরূপ পুষ্পিত লতা, জড়ানো তারের মত শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে......।

[আগেই বলা হয়েছে, আমরা ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিই বেশী পেয়েছি, আর এইসময় ম্যাকলাউড ভারতে স্বামীজীর সান্নিধ্যেই ছিলেন। সুতরাং নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী প্রসঙ্গ অল্প পাই। তবে নিবেদিতা ডায়েরী রক্ষা করতেন, এবং সেই ডায়েরীর বিবরণ নিয়ে 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থটি রচিত। এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থটি সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট—খুব অল্প ক্ষেত্রেই এত ক্ষুদ্র আকারে এমন বৃহৎ ও গভীর বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। বিবেকানন্দ যেখানে বক্তা এবং নিবেদিতা যেখানে লেখিকা, সেখানেই এ জিনিস সম্ভবপর। এই বইটি থেকে আমি ঘটনার সূত্র রক্ষা করবার জন্য সামান্য কিছু অংশ এখন উদ্ধৃত করব, বিশেষ করে সেই অংশগুলি, যেগুলি পরবর্তীকালে নিবেদিতা বারবার স্মরণ করেছেন।]

*

১৮৯৮, ৯ই মে :

"এরূপ একটি দিন কখনো ভুলবার নয়। গাছের তলায় বসে আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময়ে সহসা ঝঞ্ঝা ধেয়ে এল। আমরা প্রথমে গেলাম নদীতে ঝুঁকে-পড়া পোস্তায়, তারপরে বারান্দায়। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্বও করা যেত না। দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার অপর পার ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে। অন্ধকারের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, ঘোর বজ্র-গর্জন, আর ক্ষণে ক্ষণে ঝলসানো বিদ্যুতের তীব্র আলোক।

প্রকৃতির এই ভয়ানক আলোড়ন যখন চলেছে বাইরে, তখন কিন্তু আমরা ছোট বারান্দাটিতে বসে অভিভূত হয়ে দেখছি গভীরতর এক নাটক। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চটিতে একটি মূর্তিই বর্তমান ছিলেন, তাঁর মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল সকল অভিনেতার ভূমিকা, তিনি মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমণ করছিলেন,—আর, যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল, তার বিষয়বস্তু—ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার প্রেম।......ক্রমে তার শিখা স্পর্শ করল আমাদেরও, সেই ক্ষণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার আগুন জ্বলল অন্তরে, ধাবমান নদীস্রোত যা নির্বাপিত করতে পারল না, নিঃশেষিত করতে পারল না মহা ঝঞ্ঝাও। 'বিপুল জলরাশি কি প্রেমের নির্বাপণ করতে পারে, বন্যা কি পারে তাকে প্লাবিত করতে?' প্রমিথিউসের চরণে আমরা সকলে নত হলাম, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন বিদায় নেবার আগে।

২৫শে মার্চ :

শুক্রবার (২৭শে?) খ্রীষ্টানদের জ্ঞাপনোৎসবের দিনে (The Day of Annunciation— অর্থাৎ যেদিন দেবদূত এসে খ্রীষ্টমাতা মেরীকে 'তাঁর গর্ভে ভগবান্ জন্ম নেবেন', এইকথা জ্ঞাপন করেন) স্বামীজী আমাদের সকলকে মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাগানের মঠে) নিয়ে গেলেন, সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পরে একজনকে (নিবেদিতাকে) ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষাদান করলেন। সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত। পূজানুষ্ঠানের পরে আমাদের উপরতলায় নিয়ে যাওয়া হল। স্বামীজী শিব-যোগীর মত ভস্মবিভূতি, জটা, হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রসহ ভারতীয় গীত গাইলেন।[১]

---

[১] দীক্ষাদানকালে স্বামীজীর শিব-সাজের আর একটি বর্ণনা পাই স্বামীশিষ্য সংবাদের পূর্বকান্ডে। সময় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর দু'একদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির প্রভাত। স্থান একই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠ। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির মহাদিনে 'ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র' দেন; উদ্দেশ্য : 'ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে।...হিন্দু মাত্রেই পরস্পরের ভাই। ছোঁব না, ছোঁব না বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে।' ৪০।৫০ জন ভক্ত পৈতা নেন। কিছু পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠে হাজির হন। তার পরে—

'এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বামহস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষ বলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। ঐ

১৮৯৮, ১১মে থেকে ২৫শে মে

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথাবার্তাতে একটি বিচিত্র নূতন ব্যাপার আবির্ভূত হল, যা কষ্টকর হলেও শিক্ষাপ্রদ। একপক্ষে জাগল অদ্ভুত তিক্ততা ও অবিশ্বাস, অন্যপক্ষে বিরক্তি ও প্রতিরোধ। এখানে মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর এইকালের শিষ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন একজন ইংরাজ রমণী (অর্থাৎ স্বয়ং নিবেদিতা)। ইংরাজ হওয়ার মননগত তাৎপর্য, ভারতের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইংরাজের পূর্বাপর ধারণার বদ্ধমূল প্রকৃতি, অপরদিকে নিজ জাতির ইতিহাস ও কীর্তির বিষয়ে উচ্চ ভাবাবেগ—এ সকলের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে উক্ত শিষ্যাকে মন্দিরে দীক্ষাদানের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজীর কোনই ধারণা ছিল না। স্বামীজী দীক্ষার পরে তাঁকে উল্লাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এখন কোন্ জাতি-ভুক্ত?' তাঁর উত্তর স্বামীজীকে চমকিত করেছিল। ইংরেজের জাতীয় প্রতীকের প্রতি তাঁর কী অপরিসীম আনুগত্য ও পূজা—ভারতীয় নারী যে আবেগে ঠাকুরপূজা করেন—সেই একই আবেগ এখানেও। স্বামীজীর বিস্ময় ও নৈরাশ্য এইকালে প্রায় অলক্ষ্য থেকে গিয়েছিল—বিস্ময়চকিত এক চাহনি—এই পর্যন্ত। তাঁর এই শিষ্যা কত অগভীরভাবে তাঁর জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তা বুঝেও পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে সমভূমিতে অবস্থানকালে তাঁর বিশ্বাস ও সৌজন্য কোনোমতে হ্রাস পায়নি। কিন্তু আলমোড়ায় দেখা গেল পাঠশালার শিক্ষা যেন শুরু হয়েছে, এবং, ও-ব্যাপারটা শিক্ষার্থীর কাছে সাধারণত যেমন অমনঃপূত হয়ে দাঁড়ায়, এখানেও তাই হয়েছিল, অসীম কষ্টের কারণ—তবু আধখানা নেওয়ার অন্ধতা দূর করতেই হয়; মনকে বদলাতে গেলে তার ভারকেন্দ্রে পরিবর্তনের দরকার হয়। এর এতটুকু বেশী নয়, কদাপি কোনো মত বা আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া নয়, একদেশিতা থেকে

সকল পরিয়া স্বামীজীর রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে সেই মূর্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ কালভৈরব স্বামী-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজীও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর চারিদিকে মূর্তিমান ভৈরবগণের ন্যায় অবস্থান করিয়া মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা বিস্তার করিলেন।'

স্বামীজী অতঃপর 'কূজন্তং রামরামেতি' স্তবপাঠ করেন; তারপর তানপুরা নিয়ে 'রাম রাম শ্রীরাম রাম'—এই ছত্রটি মাতোয়ারা হয়ে গাইতে গাইতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তারপরে সেই অবস্থাতেই 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ' গাইতে থাকেন। এই-ভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পরে তিনি নিজ অঙ্গ থেকে শিব-বেশ উন্মোচন করে স্বহস্তে সাজিয়ে দেন গিরিশচন্দ্রকে। সেই সঙ্গে বলেন, 'পরমহংসদেব বলতেন, ইনি ভৈরবের অবতার।'

স্বামীজীর ঐদিনকার ভাবাবস্থা সম্বন্ধে 'শিষ্য' লিখেছেন—'স্বামীজীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্ধ-নিমীলিত নেত্রপ্রান্তে যেন প্রভাতসূর্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে। সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে, অনুভূতির বিষয়। দর্শকগণ 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।'

স্বামীজীর শিবভাব, এবং পরবর্তী সঙ্গীতাদির ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করার কারণ সঙ্গীদের সঙ্গে নিবেদিতা তাঁর প্রথম দীক্ষার দিনে স্বামীজীর আর একটি অনুরূপ অবস্থা দর্শন করেছিলেন।

মুক্তিদান ভিন্ন আর কিছু নয়। দেশ বা জাতি সম্বন্ধে সংস্কার ছেদনের শিক্ষাদান যখন স্বামীজী সমাপন করলেন, যাকে পরে ধারাবাহিকভাবে আর কখনো গ্রহণ করেন নি, সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার শেষেও তিনি কখনো শিষ্যার কাছে নূতন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, বা নূতন মতের ঘোষণা দাবি করেন নি। সমস্ত ব্যাপারটি সেখানেই চুকিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রোত্রী মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু তিনি ভিন্ন একটি চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছিলেন—এত সর্বাত্মকভাবে, এত প্রচণ্ডভাবে তা করেছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত না শিষ্যা নিজ শ্রমের দ্বারা এমন একটি মতে উপনীত হতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে এই দুই আংশিক মত যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যাত ও সমন্বিত হতে পেরেছিল—ততদিন পর্যন্ত তাঁর পক্ষে মানসিকভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হয়নি। 'তোমার যে দেশপ্রেম—সে পাপ ছাড়া আর কি!'—বহু সপ্তাহ পরে কোনো একটি ঘটনা সম্বন্ধে উক্ত শিষ্যার পক্ষপাতহীন মত পাওয়ার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে তিনি তীব্রভাবে বলেছিলেন—'আমি তোমাকে এইটুকু শুধু দেখাবার চেষ্টা করছি যে, অধিকাংশ মানুষ কাজ করে স্বার্থের তাগিদে, আর তুমি অবিরত এই কথার বিরোধিতা করে বলতে চাইছ, কোনো কোনো জাতির সকলেই দেবতাবিশেষ। এমন মরীয়া অন্ধতা—দুর্বৃত্ততা ছাড়া আর কি!' অন্য যে প্রশ্নটিতে এই একই শিষ্যা চরম তিক্ত একগুঁয়েমি দেখিয়েছিলেন, তা সমসাময়িককালে পাশ্চাত্ত্য-দেশে নারীর সমাদরের পক্ষে। যে-মন উদার ও নিঃস্বার্থভাবে সত্যকে বরণ করতে চায়, তার তুলনায় শিষ্যার সহানুভূতির সীমাবদ্ধতা এখন শিষ্যার কাছে খুবই তুচ্ছ ও স্থূল মনে হয়, কিন্তু ঐকালে তা গমনপথের সামনে মহা বিঘ্নকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা সেইভাবেই বজায় ছিল যে পর্যন্ত না তিনি অনুভব করেছিলেন—পরম প্রকাশ ঘটছে এক মানবদেহকে অবলম্বন করে—তার সামনে বাধাসৃষ্টির মত মহাভ্রান্তি আর কিছু হতে পারে না। যখন এই সত্যটি শিষ্যা পেলেন, তারপর থেকে যাকে গ্রহণ করা বা বোঝা সম্ভব নয়, তাদের বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকা সহজ হয়েছিল,— তাদের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত যাতে যথাসময়ে গড়ে উঠতে পারে, সে জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব হয়েছিল।

১৮৯৮, মে

......অন্তঃসংঘাত (স্বামীজী ও নিবেদিতার মধ্যে) তীব্রতর হয়ে উঠেছিল; আমাদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠা একজনের (মিস ম্যাকলাউড) মনে হয়েছিল, আচার্যদেবের সেবা ও শান্তির প্রয়োজন। বিস্ময়ে, আবেগে তিনি জীবনযন্ত্রণার কথা বহুবার বলেছেন—তাঁর শান্তি ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজনের পক্ষে আর কোন্ সাক্ষ্যের দরকার ছিল? সে বিষয়ে একটি দুটি কথা, ইঙ্গিতে—কিন্তু তাই যথেষ্ট; বহু ঘণ্টা পরে ফিরে এসে তিনি আমাদের বললেন, নির্জনবাস একান্তই তাঁর চাই, একাকী অরণ্যে প্রস্থান করবেন—শান্তি খুঁজে নেবেন।

তারপর উপরের দিকে তাকালেন। আকাশে উদিত দীপ্ত নূতন চন্দ্র। 'মুসলমানেরা নতুন চাঁদকে বরণ করে পরম আদরে। এস, আমরাও নতুন চাঁদের সঙ্গে নতুন জীবন আরম্ভ করি।' কন্যাকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। কন্যা বুঝলেন, পুরনো সম্পর্কের লয় হয়েছে; তার স্থানে নূতনতর গভীরতর জীবনের

প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তা যদিও স্বপ্নেও বোঝেন নি, তবু অনুভব করেছিলেন যে, সে এক অভিনব, অপরূপ মধুময় ক্ষণ।

এইভাবে সংঘর্ষের অবসান। স্বামীজীর সকল মত ও আদর্শের জন্য অতঃপর মুক্ত দ্বার। প্রথম দৃষ্টিতে সেগুলি যতই অসম্ভব বা অপ্রিয় বলে মনে হোক, আপাতত সেগুলি গ্রহণ করে, পরে অবসরমত বিচার ও বিবেচনার সিদ্ধান্ত।

২৫শে মে। তিনি চলে গেলেন। বুধবার সেদিন। শনিবার ফিরলেন। প্রতিদিন অরণ্যে দশ ঘণ্টা মৌন কাটিয়েছেন। সন্ধ্যায় তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করলে উৎসুক মানুষেরা এমন করে তাঁকে ঘিরে ধরত যে তাঁর ভাব ভঙ্গ হবার উপক্রম হত, আর তিনি পালাতেন। সত্যই—কী জ্যোতির্ময় এখন তিনি! নিজের মধ্যে সেই পুরনো সন্ন্যাসীকে আবার খুঁজে পেয়েছেন, যে খালি পায়ে হাঁটতে পারে, শীত-তাপ সইতে পারে, কাটাতে পারে একাহারে,—পাশ্চাত্ত্য যা নষ্ট করতে পারেনি। এই প্রাপ্তি, এবং নির্জনবাসের অন্য প্রাপ্তিগুলি এখনকার মত যথেষ্ট। গভীর কৃতজ্ঞতা এবং শান্তির মন নিয়ে তাঁকে ছেড়ে এলাম—তিনি তখন ছিলেন মিঃ সেভিয়ারের বাগানে, চারা গোলাপের মধ্যে, ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়।

*

অতঃপর পুনশ্চ নিবেদিতার পত্রাংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

৭ই অগস্ট, ১৮৯৮, মিসেস হ্যামণ্ডকে—

আমরা শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছি। কন্‌সাল-পত্নী (আমেরিকান কন্‌সাল মিঃ প্যাটারসনের স্ত্রী, স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত) কিছু আগে স্বামীর কাছে চলে যাওয়ায় আমি এখন একটা গোটা নৌকার মালিক। স্বামীজীর নৌকা কিছু দূরে। তার ঠিক পিছনে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের নৌকা, যাতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে।......নদী দর্পণবৎ, মন্দ মন্দ বয়ে চলার সময়ে ধীরে বাতাসের স্পর্শ লাগে—স্বর্গ, একেবারে স্বর্গ! কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সব কিছুর সমাপ্তি ঘটবে। একমাত্র সান্ত্বনা—হৃদয়ের সচেতন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে রেখেছিলুম এর প্রতিটি মুহূর্তকে।......

স্বামীজী সম্বন্ধে নানাজনের মনোভাবকে খতিয়ে দেখি। তোমার কাছে তিনি আচার্যদেব, আমার কাছে রাজা, মিসেস বুলের কাছে মেরী-কোলের শিশু যীশু। চমৎকার সব ভাব—নয় কি! বিশেষত শিশুর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যটুকু স্বতঃই মনে উদিত হয়।

এবার যা বলব তাতে চমকে যাবে। এক সপ্তাহের জন্য হিমালয়ের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম— ১৮০০০ ফুট উঁচুতে! স্বামীজীর সঙ্গে হিমবাহ দেখতে গিয়েছিলাম, বাইরের লোকের এইটুকু জানলেই চলবে, বাকি অংশ নাই বা জানালে। আসলে আমরা অমরনাথের গুহায় তীর্থযাত্রা করতে গিয়েছিলাম, যেখানে স্বামীজী আমাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন বিশেষভাবে।

স্বামীজীর কাছে গভীর-গম্ভীর সেই ক্ষণ। তিনি একেবারে আত্ম-নিমজ্জিত—যদিও গুহামধ্যে মাত্র দু-মিনিট ছিলেন, তারপরেই নির্গত হয়ে আসেন পাছে ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে যান। দারুণ শ্রান্তও হয়ে পড়েছিলেন; দীর্ঘ মারাত্মক পথ ভেঙে তাঁকে উঠতে হয়েছিল, হৃদ্‌যন্ত্রও দুর্বল ছিল। কিন্তু তারপর থেকে সে কী বিশ্বাস আর সাহস আর আনন্দ তাঁর! তিনি বললেন, শিব তাঁকে অমর-বর দিয়েছেন, এরপর স্বেচ্ছায় ভিন্ন মৃত্যু নেই তাঁর। তাঁর সঙ্গে যে যেতে পেরেছি, এতে আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই আমার। এ আমার নিত্য স্মৃতি হয়ে রইল, নিশ্চয়ই, এবং তিনি **সত্যই** শিবের কাছে আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন, ...তাঁর মুখে সেকথা শোনার পর থেকে আমি দারুণ দ্রুতবেগে হিন্দু হয়ে উঠছি ভাবাদর্শে।

তাঁর দিব্যানুভূতিতে গভীরভাবে, তীব্রভাবে আমি আনন্দিত, কিন্তু আমার দারুণ যাতনার কথাও ভাবো, প্রিয় নেল আমার,—যাঁকে আমি পূজা করি, তিনি আমার সামনে অন্তরলোকে পূর্ণ হয়ে বিদ্যমান, অথচ আমি বাইরের রূপদর্শনের অতিরিক্ত কিছু পেলাম না। স্বামীজী সে অনুভূতিকে আমার কাছে জীবন্ত করতে পারতেন—কিন্তু তিনি রইলেন আত্মমগ্ন!

এখনো পর্যন্ত সেই সময়টির দিকে ফিরে চাইলে আমার হৃদয় দারুণ ক্ষোভে ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। সে আমারই দোষ জানি, রাজাও আমাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছেন, এবং বিচিত্রভাবে আমি তাঁর মনের নিকটতর হয়েছি, এই তীর্থযাত্রার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞও, তবু—প্রায় মুঠোয় পেয়ে হারানোর তিক্ত দুঃখের শেষ কোথায়—যে-সৌভাগ্য হয়ত জীবনে আর আসবে না! আমার মন ক্ষোভে-রোষে আচ্ছন্ন ছিল—তিনি কথা কইতে চাইলেও আমি শুনতে চাইনি।

প্রিয় নেল, আমার কেমন যেন মনে হয়, তোমার সাহসী প্রাণে সান্ত্বনার আশ্রয় আছে, তাই তোমায় বলছি,—যদি তাঁর কাছে আমি বেসুরো হয়ে না বাজতাম! যদি আমি গোটা ব্যাপারটির অংশ হয়ে উঠতে পারতাম—একটু ধৈর্য ও সহানুভূতির দ্বারা। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। একমাত্র সান্ত্বনা—ক্ষতি যা, তা **আমার**, কিন্তু **কী না ক্ষতি**!

তুমি জানো কি, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি যদি 'গুরু' কথাটিকে বাস্তব করে তুলতে না চান, তাহলে আমরা পরস্পর সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কি! এই বলে তাঁকে তিরস্কার করে নিজেকে কঠোরভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

তিনি কিন্তু মধুরতম মনোভাবে ছিলেন—এতটুকু রাগ নয়—আমার সুখ-সুবিধার দিকে শুধু লক্ষ্য। মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন, আমি ক্লান্ত। নিজের বিষয়ে অধিক কিছু বলতে তিনি পারছিলেন না। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে এলে তিনি বললেন, "মার্গট, ও বস্তু তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই—আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।" অপরূপ! অসচেতন দীনতার চরম!

কিন্তু তুমি জানো, এই অনিবার্য দুঃখভোগের অন্যতম কারণ আছে জাতিগত সংস্কারের মধ্যে। আমার আইরিশ স্বভাব সবকিছু প্রকাশ করে—হিন্দু সে রকম প্রকাশের কল্পনাও করে না। আর স্বামীজী গুরুগিরি সম্বন্ধে কিভাবে না সংকুচিত,

অপরপক্ষে আমি তাকেই সর্বদা চাইছি, ইত্যাদি। এ-ই যথেষ্ট স্বার্থপরতা। যাই হোক, মনে রেখো, আমি বাইরের অজস্র লোককে বলব, আমি অমরনাথে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে যে-কথা বললাম, তা বলব না কাউকে, এবং তুমিও, আমি দৃশ্যদর্শনে গিয়েছিলাম, এর অতিরিক্ত এই তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে আসল কথা কারো কাছে ভাঙবে না।

*

[নিবেদিতা তাঁর জীবনের এই মহাসৌভাগ্যের কথা কখনো বিস্মৃত হন নি যে, এক বিরাট পুরুষকে তিনি চরম অনুভূতির অব্যবহিত পরেই দর্শন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে কথাবার্তায় ও নানা রচনায় এই সৌভাগ্যের বার্তা তিনি নিবেদন করেছেন। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থের গোটা দশম পরিচ্ছেদটি এই অমরনাথ যাত্রা ও স্বামীজীর শিব দর্শনের কথা নিয়ে রচিত। 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদটিরও নাম 'অমরনাথ'। নিবেদিতার অধ্যাত্মজীবনে এই তীর্থযাত্রার গুরুত্বের কথা মনে রেখে আমরা তাঁর লিখিত যাত্রাবিবরণ কিয়দংশে উদ্ধৃত করছি। এখানে জানিয়ে দেওয়া যায়, অমরনাথের মূল পথে যাত্রা আরম্ভ হয় ১৮৯৮-এর ২৯শে জুলাই, এবং শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন ঘটে ৮ই অগস্ট।—]

"আচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখতে পেলাম।...প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্নভোজন করলাম।...আহারে উপবিষ্ট হলে স্বামীজী তাঁর কন্যাকে তাঁর সঙ্গে অমরনাথের গুহায় তীর্থযাত্রার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে কন্যা শিবের কাছে উৎসর্গীকৃতা হবেন।......

২৯শে জুলাই। এর পর থেকে আমরা স্বামীজীর দর্শন অল্পই পেয়েছি। তীর্থযাত্রার ব্যাপারে প্রভূত উৎসাহ তাঁর। অধিকাংশ দিনই একাহারে। সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গে রুচি নেই। মাঝে মাঝে তাঁবুর জায়গায় আসতেন, হাতে জপমালা। আজ রাত্রে আমাদের দলের দুজন বাওয়ানে ঘুরতে গেলেন; একটি পবিত্র কুণ্ডকে কেন্দ্র করে জায়গাটি গ্রাম্য মেলার চেহারা নিয়ে গড়ে উঠেছে—ধর্মভাবে ভরপুর। এর পরে ধীরা মাতার সঙ্গে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে হিন্দী ভাষায় সাধুরা স্বামীজীকে ক্রমাগত যে-সব প্রশ্ন করছিলেন, সেই কথাবার্তা শুনতে সুযোগ পেলাম।

বৃহস্পতিবারে পহলগামে পৌঁছলাম। উপত্যকার নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়ল। আমাদের আদৌ ঢুকতে দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে স্বামীজীকে দারুণ আপত্তির সম্মুখীন হতে হল। নাগারা স্বামীজীকে সমর্থন করলেন। তাঁদের একজন বললেন, 'স্বামীজী আপনার শক্তিতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তার প্রকাশ করা উচিত নয়।' এই কথায় স্বামীজী চুপ করে গেলেন। সেই বিকেলে তিনি তাঁর কন্যাকে নিয়ে সাধুদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরলেন, যাতে সে আশীর্বাদ পায় সকলের। ভিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে এ জিনিস ঘটে।......পরদিন আমাদের তাঁবু ছাউনীর পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।......

(সাধুদের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ-আলোচনার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা

পাই The Master গ্রন্থে।—"যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু ছিলেন। তাঁহাদের তাঁবুগুলি গেরুয়া রঙের। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার বড় ছাতার চেয়ে আকারে বড় নয়। সাধুদের উপরে স্বামীজীর প্রভাব যেন বৈদ্যুতিক। অপেক্ষাকৃত বিদ্বান সাধুরা তাঁহার প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেন; তাঁহার তাঁবু ভরিয়া যাইত, এবং যতক্ষণ দিবালোক থাকিত তাঁহারা কথাবার্তায় মগ্ন থাকিতেন। স্বামীজী পরে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, 'শিব'ই তাঁহাদের আলাপের বিষয়। স্বামীজী মাঝে মাঝে জোর করিয়া বাহ্যজগতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাঁহারা গম্ভীরভাবে ভর্ৎসনা করিতেন। বিদেশীরাও মানুষ,—তাঁহারা জোর করিয়া বলিতেন—স্বদেশ ও বিদেশে পার্থক্য করা কেন! অপরপক্ষে তাঁহাদের অনেকে আবার মুসলমান ধর্মের প্রতি স্বামীজীর প্রেম ও সহানুভূতির অর্থ বুঝিতে পারিতেন না। যে পরাজাগতিক চিন্তার জন্য তাঁহাদের কাছে স্বদেশ ও বিদেশে পার্থক্য নাই, তাহাই আবার এই সরলপ্রাণ মানুষগুলির কাছে জাগতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের একত্বের ধারণায় বাধা দিয়াছিল, কেননা প্রত্যক্ষত হিন্দু ও মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহাদের যুক্তি, পঞ্জাবের মৃত্তিকা নিজ ধর্ম-বিশ্বাসীর রক্তে সিক্ত। এখানে অন্তত স্বামীজী যেন আচারগত সংকীর্ণতা পালন করেন। ইহার উত্তরে স্বামীজী সেই সময়ের জন্য এমন কতকগুলি আচরণে বিরত রহিলেন, যাহাতে ভ্রাতৃস্থানীয় সাধুগণের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল, যাহা অপরপক্ষে এই 'বর্তমানে প্রক্ষিপ্ত ভবিষ্যৎরূপী মনুষ্যটির' মতগুলিকে অধিকতর দৃঢ় ও গভীরভাবে তাঁহাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার সহায়ক হইয়াছিল। এইসকল উত্তপ্ত বাদপ্রতিবাদের কালে আমাদের বিদেশী বুদ্ধি একটি বিচিত্র অসংলগ্নতা দেখিয়া আমোদবোধ না করিয়া পারে নাই, তাহা হইল—এই যাত্রার তহশীলদার স্বয়ং এবং আরও বহু কর্মচারী ও ভৃত্য ধর্মে মুসলমান, গুহায় উপস্থিত হইলে তাহার ভিতরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ইঁহাদের প্রবেশে কোনো আপত্তির কথা স্বপ্নেও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তহশীলদার পরে বন্ধুসহ স্বামীজীর কাছে যথাবিধি শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আসিয়াছিলেন—এই ব্যাপারটিও, বিস্ময়ের কথা, কাহারও নিকট বিসদৃশ বা বিস্ময়কর মনে হয় নাই।")

৩০শে জুলাই। ভোর ৬টায় প্রাতরাশ করে আমরা বাহির হলাম। কখন ছাউনী স্থানান্তরিত হতে শুরু হয়েছিল, তা অনুমান করা শক্ত, কারণ অতি প্রত্যুষে আমাদের জলযোগ কালেই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। গতকাল যেখানে সহস্র সহস্র মানুষ ও তাদের তাঁবুর আবাস, সেখানে অগ্নিহীন বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত ভস্মরাশি ছাড়া আর কিছু নেই।

পরবর্তী বিশ্রামস্থল চন্দনবাড়ির যাত্রাপথটি কি সুন্দর! সেখানে এক গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় আমাদের তাঁবু পড়ল। সারা বিকেল বৃষ্টি হয়েছে। পাঁচ মিনিটের এক কথাবার্তা ভিন্ন স্বামীজীর দর্শন পাইনি। কিন্তু অন্য যাত্রী ও ভৃত্যদের কাছ থেকে অশেষ সদয় ব্যবহার পেলাম—মর্মস্পর্শী তা।......

পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির অপেক্ষা কঠিনতর। পথ যেন শেষ হয় না। চন্দনবাড়ির কাছে প্রথম তুষারবর্ত্মে—যাতে আমি খালি পায়ে হেঁটে যাই,

তার জন্য স্বামীজী জোর দিয়েছিলেন। জ্ঞাতব্য প্রতিটি জিনিসের খুঁটিনাটি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তারপরে পাহাড়ে পাহাড়ে পাক খাওয়া সংকীর্ণ পথে দীর্ঘ যাত্রা, তারপরে আবার দারুণ খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির শীর্ষের ভূমি 'এডেলউইস' ঘাসের গালিচায় মোড়া যেন। তার পরের রাস্তা স্তব্ধ-বারি শেষনাগের পাঁচশো ফুট উঁচু দিয়ে চলেছে। অবশেষে আমাদের তাঁবু পড়ল আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে, তুষারশৃঙ্গঘেরা শীতল আর্দ্র এক স্থানে। বহু নিম্নে ফারগাছগুলি। সারা বিকেল ও সন্ধ্যা ধরে কুলিদের জুনিপার গাছ সংগ্রহে নানা দিকে যেতে হল। তহশীলদার, স্বামীজী ও আমার তাঁবু কাছাকাছি; সন্ধ্যায় বড় করে আগুন জ্বালানো হল তাদের সামনে। ভালো জ্বলল না। হিমবাহ রয়েছে আমাদের অনেক নীচে। তাঁবু পড়ার পরে আর স্বামীজীর দর্শন পাইনি।

পাঁচটি তটিনীর সম্মিলন স্থল "পঞ্চতরণী" এত দূরের পথ ছিল না। তদুপরি সেই জায়গাটি শেষনাগের থেকে নীচে, শীত শুষ্কতর এবং আবহাওয়া সতেজকর। ছাউনির সামনে নুড়িতে ভর্তি জলহীন নদীতট, তারই মধ্য দিয়ে পাঁচ তটিনী প্রবাহিত। প্রতিটি ধারায় তীর্থযাত্রীদের স্নান করার বিধি; এক ধারায় স্নান শেষ করে আর্দ্র বস্ত্রে বাকি ধারাগুলিতে ক্রমান্বয়ে স্নান করার কথা। সম্পূর্ণ-ভাবে অন্যের নজর এড়িয়ে স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে এই বিধি পালন করলেন।......

এইসব উচ্চ অবস্থানে আমরা প্রায়ই বিরাট তুষার শৃঙ্গের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত দেখতাম। এইসব নীরব বিরাটেরাই হিন্দুর মনে ভস্মভূষণ মহাদেবের কল্পনা জাগিয়েছে।

মঙ্গলবার, ২রা অগস্ট। অমরনাথের মহাদিন। প্রথম যাত্রীদল নিশ্চয় রাত দুটোয় ছাউনী ছেড়ে এগিয়েছে! পূর্ণিমালোকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সংকীর্ণ উপত্যকাপথে যখন নামছি—তখন সূর্য উঠল। যাত্রাপথের এই অংশটি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু আসল বিপদ আরম্ভ হল ডান্ডী ছেড়ে দিয়ে উঠতে শুরু করবার পর থেকে। একেবারে সোজা খাড়া পাহাড়ের গায়ে পশুদের চলার মতো একটি পথ উপরে উঠে অপর পারে নেমে গেছে অতি ক্ষুদ্র সিঁড়ির আকারে শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিতে। পথের ধারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুষ্পরাজি—কমনীয় 'কলম্বাইন,' মাইকেলমাস ডেইজী, এবং বন্যগোলাপ— সেগুলির লোভে হাত বাড়াতে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা। তারপর আরও ঢাল বেয়ে অবশেষে যখন তলায় নামা গেল, তখন আরম্ভ হল হিমবাহের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল অতি যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা গুহার দিকে। গন্তব্যের মাইলখানেক আগে বরফ শেষ হল, সেখানে তুষারগলিত জলধারায় তীর্থযাত্রীদের স্নান করতে হবে। পৌঁছে গিয়েছি মনে হবার পরেও পাথরের উপর দিয়ে যথেষ্ট খাড়াই হাঁটা বাকি ছিল।

স্বামীজীর সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। তিনি পেছিয়ে পড়েছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, একথা খেয়াল না থাকায় আমি উপল-তটের পিছনে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে তিনি এলেন। দু'এক কথায় আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি স্নান করতে গেলেন। আধঘণ্টা পরে তিনি গুহায় প্রবেশ করলেন। উদ্ভাসিত মুখে অর্ধবৃত্তাকার স্থানটির একপ্রান্তে প্রথমে, পরে অন্যপ্রান্তে তিনি নতজানু হলেন। স্থানটি বিশাল—এমন যে ভিতরে বৃহৎ

গির্জা ধরে যেতে পারে। তার মধ্যে বিশাল তুষার-শিব এক গহ্বরের সঘন ছায়ায় অবস্থিত—যেন নিজ সিংহাসনে আসীন তিনি। কয়েক মিনিট......তারপরেই গুহাত্যাগ করবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত তাঁর কাছে। মহাশিবের পাদস্পর্শ তিনি করেছেন। অসীম চেষ্টায় তাঁকে আত্মসংবরণ করতে হয়েছিল—পাছে ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়েন—তিনি পরে বলেছিলেন। শরীরের শ্রান্তি এমন অবস্থায় গিয়েছিল যে, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারত, একজন ডাক্তার পরে বলেন,—তা না হয়ে তা চিরদিনের জন্য আকারে বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর গুরুর কথাগুলি প্রায় ফলে যাচ্ছিল : 'ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, আর দেহ রাখবে না।'

'কী না আনন্দ পেয়েছি'—আধঘণ্টা পরে, নদীধারার উপরে একটি পাথরে বসে সহৃদয় নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে জলযোগ করতে করতে তিনি বললেন। সেখানে আমিও ছিলাম। 'শিবলিঙ্গকে মনে হল স্বয়ং শিব। আর ওখানে কোন জোচ্চোর ব্রাহ্মণ নেই, ব্যবসা নেই, খারাপ কিছু নেই। সবটাই পূজা—পূজা! কোনো ধর্মস্থানে আমার এত আনন্দ কখনো হয়নি।'

পরে তিনি প্রায়ই বিহ্বলকর দর্শনের কথা বলতেন, যা তাঁকে ঘূর্ণাবর্তের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে মনে হয়েছিল। শুভ্র তুষারস্তম্ভের মহাকবিত্বদ্যোতক রূপের কথাও বলতেন। তিনিই প্রথম অনুমান করেছিলেন যে, একদল মেষপালকের দ্বারাই স্থানটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কোনো এক গ্রীষ্ম দিবসে যারা মেষযূথের সন্ধানে বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে অদ্রব তুষারের সামনে দাঁড়িয়েছিল—একেবারে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সামনে! তিনি সর্বদা আরও বলতেন, অমরনাথ কৃপা করে তাঁকে বর দিয়েছেন—স্বেচ্ছায় না হলে তাঁর মৃত্যু নেই। আর আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন, 'তুমি এখন বুঝতে পারছ না; কিন্তু তীর্থদর্শন তোমার হয়ে গেল, এর ফল ফলতে থাকবে। পরে আরও ভাল করে এর তাৎপর্য বুঝবে। ফল হবেই।'[২]

*

---

[২] এই অংশে নিবেদিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীজী যে-কথা বলেছেন, এর পূর্ণ তাৎপর্য 'Wanderings' বা 'The Master' গ্রন্থ থেকে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা পূর্বে যে পত্র উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেই এই উক্তির পটভূমিকা আছে। নিবেদিতা স্বামীজীর দিব্য দর্শনে আনন্দিত হয়েও নিজের পাশ্চাত্ত্য যোদ্ধৃস্বভাবে গুরুর কাছে ঐ অনুভূতির অংশ দাবি করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। স্বামীজীর পক্ষে তাঁর দাবি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত নিবেদিতার 'প্রাক্তন' ঐ অনুভূতির যোগ্যতা তখনি তাঁকে দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে এই তীর্থযাত্রার ফল ফলবে, স্বামীজীর এই উক্তি সার্থক হয়েছিল। স্বামীজী নিবেদিতাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করবার জন্য অমরনাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা নিবেদিতার পরবর্তী জীবনকে শিবময় দেখব। শুধু তাই নয়, হিমালয়ে শিবের পদে উৎসর্গীকৃতা নিবেদিতা দেহত্যাগও করেছিলেন হিমালয়ে, তুষারশৃঙ্গের দিকে দৃষ্টি মেলে। এটি হয়ত কাকতালীয়, কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষের জীবনে নিয়মিত কাকতালীয় ঘটে, এমন দেখা যায়।

পুনশ্চ পত্র উদ্ধৃত হচ্ছে—

২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে—

(শ্রীনগর থেকে)......আসলে আমি স্বামীজী সম্বন্ধে আরও কথা বলবার জন্য বসেছি, কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। গতকাল তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন; আমরা হয়ত লাহোরে তাঁর সাক্ষাৎ পাব; কিংবা কলকাতায় ফিরে যাবার আগে দেখা নাও পেতে পারি।

পক্ষকাল আগে তিনি একাকী চলে গিয়েছিলেন; প্রায় আট দিন আগে ফিরে এলেন। পরিবর্তিত, উদ্দীপিত, দিব্য রূপে।

সে যে কী তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না—বাক্যের অতীত মহান সে বস্তু। আমার লেখনী যেন মর্মরিত স্বরে কথা বলতে শেখে।

শিশুর মত তাঁর কথা—জগজ্জননীর বিষয়ে; কিন্তু তাঁর সত্তা ও স্বর—সে একেবারে ঈশ্বরের। অন্তর্ধৃত পবিত্র গাম্ভীর্য ও আনন্দ-শিহরণ একই সঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাঁর উপস্থিতি থেকে—এমনই তার সুমহিম রূপ যে ঘরের দূর প্রান্তে সরে গেলাম নীরবে পূজা করবার জন্য—সর্বক্ষণ। "তারকার জন্ম আমরা দেখেছি, আমরা জেনেছি গূঢ় অর্থের একটি প্রকাশ।" সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখছেন—এ তেমনই এক সান্নিধ্য, যাঁর নয়ন পূর্ণ হয়ে আছে ঈশ্বরের রূপে। তাঁর কাছে এই মুহূর্তে 'লোককল্যাণকর্মের' চিন্তা অসহ্য। "শুদ্ধ মা-ই" সক্রিয়া। "দেশপ্রেম ভুল, সব ভুল"—ফিরে এসে তিনি বললেন। "সব কিছু মা।......**সব** মানুষই ভালো। শুদ্ধ আমরাই সকলের **নিকটে** যেতে পারি না।......**আমি** আর শিক্ষা দেব না কখনো। আমি কে, যে শিক্ষা দেব?"

এই মুহূর্তে নীরবতা, তপস্যা, আর প্রত্যাহারই তাঁর কাছে জীবনের মূল বস্তু, এবং সে প্রত্যাহার এমনই পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। মনে হয় তাঁকে দেখে—"জগন্মাতার" সঙ্গে সজ্ঞানে অবস্থিত নয় এমন একটি মুহূর্তেরও মূল্য নেই।......

এই অপূর্ব গ্রীষ্মকালের দিকে ফিরে তাকাই যখন, তখন সবিস্ময়ে ভাবি,—ভাবের এমন সমুচ্চ স্তরে অবস্থানের দুর্লভ সৌভাগ্য পেলাম কি করে! এই মাস-গুলিতে মহান ধর্মীয় ভাবসমূহের আলোকধারায় নিস্নাত ও সঞ্জীবিত হয়েছি; আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ মানুষের চেয়ে ঈশ্বরই অধিক বাস্তব হয়েছেন। আর গতকাল সকালের শেষ কয়েক ঘণ্টা তো আমরা রুদ্ধশ্বাসে ঘনীভূত স্তব্ধ হয়ে ছিলাম, নড়তেও সাহস করিনি,—যখন তিনি মায়ের কাছে গান গাইছিলেন, আর আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখন তিনি **শুদ্ধ ভালবাসা**। অধৈর্যের বাষ্প পর্যন্ত নেই—অন্যায়কারী অত্যাচারী সম্বন্ধেও নয়,—এখন শুদ্ধ শান্তি আর ত্যাগ আর ভাবাবেশ। "স্বামীজী আর নেই, চিরতরে বিদায় নিয়েছেন"—তাঁর শেষ কথা যা আমি শুনেছি।...

(১৩·১০·৯৮) 'মৃত্যুরূপা কালী' কবিতাটি লেখার পর থেকে স্বামীজীর অন্তর্মুখিনতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে একদিন তিনি সকলের অজান্তে নিঃশব্দে চলে যান ক্ষীরভবানীর তীর্থকুণ্ডে। সেখানে আটদিন ছিলেন, যার বিষয়ে কিছু লেখা শক্ত কারণ তা এতই ঐশ্বরিক। সেখানে নিশ্চয় তিনি দারুণ দৈহিক ও

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এক অপরাহ্ণে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখ জ্যোতির্ময়। 'মা' ছাড়া মুখে আর কথা নেই। বললেন, অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তারপর থেকে তাঁর সাক্ষাৎ প্রায় মেলেই নি। তিনি একাকী রইলেন। 'মায়ের কোলে শিশুর মত আছি'—নিজেই বললেন। কী করে আমি তোমাকে অনির্বচনীয় জিনিস বর্ণনা করব! কিন্তু তুমি উপস্থিত থাকলে যা দেখতে সেইকথাই তোমাকে জানাতে চাই। আমি জানি, এগুলিকে তুমি কেবল সংবাদ বলেই নেবে না, গভীর পবিত্র বলে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবে।

আমার নিজের মনে হচ্ছে (আমার কাছে সেইটাই বড় কথা) স্বামীজীর মধ্যে তপস্যার বেগ এত প্রবল যে, তিনি হয়ত আর কখনই পাশ্চাত্তো যাবেন না, বা শিক্ষা দেবেন না। যদি তিনি মৌনের ব্রত নেন, বা চিরতরে তপস্যায় প্রস্থান করেন —তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। কিন্তু অপরপক্ষে একথাও সত্য হতে পারে, তাঁর ক্ষেত্রে এই ভাব শক্তির উৎস নয়, বরং আত্মতৃপ্তির হেতু।* সুতরাং আমি অনুমান করি, এই ভাবের উপরেও তিনি নিজেকে উত্তোলন করে বিশ্বের কাছে জ্ঞান ও ত্রাণের বিশাল উৎস হয়ে দাঁড়াবেন। জীবন থেকে সুখের ও সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা চলে গেছে, বোহিসেবীপনা বা অবিবেচনা অদৃশ্য,—তার জায়গায় এসেছে ব্রহ্মাণ্ডের মতই বিরাট আত্মার প্রকাশ, বিক্ষত যাতনার্ত, কিন্তু প্রেমে পরিপূর্ণ। যখন তিনি কথা বলেন, প্রশ্নের উত্তর দেন, এই ভাবই ফুটে ওঠে। তার কিছু কিছু মুখ ফুটে বলতে গেলেও যেন বাক্যের অতীত সেই মহিমা নষ্ট হয়। অদ্ভুত কথা হল, তাঁর সামনে এখন যে-ধরনের কথা অযোগ্য মনে হয় না তা হচ্ছে —কোনো রসিকতা বা মজার গল্প, যা আমাদের সকলকে হাসিয়ে দেয়। বাকি সময়ে, প্রতি মুহূর্তের ঐশী স্বরূপ আমাদের নিশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেয়।

আরও কিছু বলতে হবে? তাঁর শেষ কথা যা শুনেছি—"স্বামীজী আর নেই"; পুনশ্চ—"যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ আছে।" কারো বিরুদ্ধে রূঢ় বক্তব্য নেই। এমনই ভাববিশালতার মধ্যে খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

পুনশ্চ তিনি বললেন, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি 'কালী দি মাদার' কবিতার প্রতিটি শব্দের অনুধ্যান তাঁকে করতে হবে। গতকাল তাঁর কথামত কবিতাটির প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে হল তাঁর কাছে।

তিনি কথা বলে চলেছিলেন—"মা"র বিষয়ে কথা, তাই তার শব্দগুলি গরীয়ান্। চলে যাবার আগে মা'র সান্নিধ্যের স্পর্শ অনুভব করিয়ে দিয়ে তবে গেলেন। গতকাল না বলে পারিনি রুদ্ধশ্বাসে—"ঈশ্বর!"—**তাঁর সম্বন্ধে।**

একই ছন্দের অন্তর্ভুক্ত আমরা—তুমি এবং আমি—আমাদের ধারণার চেয়ে বৃহৎ এই ছন্দ। ঈশ্বর যেন এর যোগ্য করে তোলেন আমাদের। "মা উড়োচ্ছেন ঘুড়ি"—তিনি গেয়েছিলেন—

---

* এখানে পাঠকের স্বতঃই মনে পড়বে নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারের কথা : নরেন্দ্র যখন বলেছিলেন, সমাধিতে ডুবে থাকাই তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, আমি ভেবেছিলুম তুই বটবৃক্ষের মত সকলের আশ্রয় হবি, তার বদলে আত্মমুক্তির জন্য ব্যস্ত হচ্ছিস!

শ্যামা মা উড়োচ্ছে ঘুড়ি
ভবসংসার বাজার মাঝে...
ঘুড়ি লক্ষের দু একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।

"ধুলোখেলা করছি মায়ের ছেলেরা, ধুলো উড়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখ।"

রবিবার, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'দার্শনিক রূপক বা নৈসর্গিক রূপকের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমার ব্যাখ্যা করা যায় না। ভক্তির দর্শনলব্ধ প্রতিমার আকার। তারা যথার্থ।'

[কাশ্মীরে স্বামীজী অনুভূতির মহারাজ্যের অধীশ্বর। অমরনাথের শিবদর্শনের পরে ক্ষীরভবানীর মাতৃদর্শন। নিত্য ও লীলায় মুক্ত ও আবদ্ধ বিবেকানন্দের জীবন। অদ্বৈতপন্থী বিবেকানন্দ সৃষ্টিরূপের মধ্যে যেখানে আসীন সেখানে শৈব ও শাক্ত। অমরনাথের শুভ্র প্রলয় এবং ক্ষীরভবানীর কৃষ্ণ প্রলয়—উভয়ের স্বরূপই তিনি দর্শন করলেন। নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজী "তুষার স্তম্ভের" সুমহান কবিত্বের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে কোনো কবিতা রচনা করেন নি। সেই কবিতা রচনা করেছিলেন কৃষ্ণভয়ঙ্করীর সম্বন্ধে। সেই 'Kali the Mother' নামক কবিতা একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব, কারণ এ শুধু কাব্যকৃতি নয়, এ হল মানবভাষায় অনাহত ধ্বনির জাগরণ। প্রলয়ের এই মহাধ্বনি আর একবারমাত্র শোনা গেছে—ঈশ্বর-সখার কণ্ঠে, কিন্তু সেখানেও ভয়াতুর কণ্ঠের আর্তনাদ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বলেছিলেন :

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য,—মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥...
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥...
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু, সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা, বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা, বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা, স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা, ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং, ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ'—'আমি কাল। লোকক্ষয় করাই আমার স্বভাব। আমি পুরাতন। এই লোকসকলকে সংহার করিবার জন্যই আমি উদ্যত।' অর্জুন স্তুতি করে তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখতে চেয়েছিলেন। মহাকালী যখন তাঁর প্রলয়মূর্তি দেখালেন, তখন

তাঁর বিবেকানন্দ নামক সন্তান প্রসন্নমুখের কামনা করেননি— উল্লসিত হয়েছিলেন ভয়ংকরের সমীপবর্তী হয়ে। অধ্যাত্ম সাহিত্যে নূতন যোজনা বিবেকানন্দ এখানে করলেন।

কবিতাটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ :

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়!
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে—মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

এই কবিতাটির পটভূমিকা বিষয়ে নিবেদিতা The Master গ্রন্থে লিখেছেন :

"কাশ্মীর যাত্রার উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায়* "ভয়ংকরের উপাসনাই" এখন একমাত্র কথা হয়ে দাঁড়াল। রোগ বা যন্ত্রণা একটি কথাই মনে পাড়িয়ে দিত, "তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী। তিনি স্বয়ং যন্ত্রণা এবং তিনিই যন্ত্রণাদাত্রী। কালী! কালী! কালী!"

একদিন বললেন, মাথায় চিন্তাগুলো পাক খাচ্ছে, সেগুলো লিখে না ফেলা পর্যন্ত শান্তি নেই। সেই সন্ধ্যাতেই যখন আমরা কোনো স্থান ভ্রমণ শেষ করে বজরায় ফিরলাম, শুনলাম তিনি এসেছিলেন, আমাদের জন্য রেখে গেছেন স্বহস্তে লেখা "কালী দি মাদার" কবিতাটি। প্রেরণার অগ্নিদাহে জ্বলতে জ্বলতে কবিতাটি লিখেছিলেন—শেষ করার পরে তীব্র আবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়েন,—একথা পরে শুনেছিলাম।"

এই ঘটনার পরে স্বামীজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ক্ষীরভবানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, ফিরে আসেন ৬ই অক্টোবর।

---

* কাশ্মীরে একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য তাঁকে কাশ্মীরের মহারাজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে জমি দেবার প্রস্তাব বৃটিশ রেসিডেন্ট নাকচ করে দেন। এই বিষয়টি পরে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

ক্ষীরভবানী থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, সেই সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের কথা উদ্ধৃত পত্রে আমরা পেয়েছি, The Master এর 'ক্ষীরভবানী' অধ্যায়েও রয়েছে।

পত্রে নেই, এমন দু'একটি সংবাদ The Master-এর ঐ অধ্যায়টিতে আছে। যেমন স্বামীজী প্রত্যাবর্তন করেই "গাঁদা ফুলের মালা ছড়াটি নীরবে আমাদের মস্তকে একে একে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমাদের একজনের হাতে মালাটি অর্পণ করার পরে অবশেষে বললেন, 'এটি মাকে নিবেদন করেছিলাম।' তারপর বললেন। 'আর হরি ওঁ নয়, এখন শুধু মা, মা,।' হাসিতে ভরে গেল মুখ। আমরা একেবারে নীরব। চিন্তাকে পর্যন্ত স্তব্ধ করে দেয় এমন কিছুতে স্থানটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—কথা বলতে চাইলেও পারতাম না। পুনরায় বললেন, "আমার সব দেশপ্রেম গেছে। সব গেছে। এখন শুধু মা, মা!"

একটু থেমে—"আমি ভুল করেছিলাম। মা বললেন, 'যদি অবিশ্বাসীরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার মূর্তি নষ্ট করে, তাতে তোর কি! তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি!' তাই দেশপ্রেম আর নয়। আমি এখন শিশুসন্তান।"...

তারপর স্বামীজী মস্তক মুণ্ডন করে চিরকালীন সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে যখন অবতীর্ণ হলেন তখন নিবেদিতার কল্পনার চোখে ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর তপস্যার রূপ জেগে উঠল : 'কল্পনানেত্রে দেখলাম—উপবাস, পূজা, কুণ্ডে পায়স ও বাদাম ভোগদান, এবং জনৈক পণ্ডিতের শিশুকন্যাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুমারী উমারূপে পূজা।' স্বামীজী বলেছিলেন, "আর কোনো কামনা নেই—শুধু ফিরে চাই সেই গঙ্গাতীরের মৌনী, নগ্ন পরিব্রাজকের জীবন। আর কিছু নয়, কিছু নয়। 'স্বামীজী' মরে গেছেন—চিরতরে চলে গেছেন। জগৎকে শিক্ষা দেবার দায় বইব আমি—আমি কে? সবই আস্ফালন, অহংকার। আমাকে মায়ের প্রয়োজন নেই—তাঁকে প্রয়োজন আছে আমার!—এ বোধ যখন জাগে, তখন কাজ মায়া ছাড়া আর কিছু নয়।"

স্বামীজী বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্ষমার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন—"প্রেমই একমাত্র উপায়। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তাকে ভালবাসো, ভালবেসে যাও যে পর্যন্ত না তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।"

নিবেদিতা লিখেছেন, "যখন স্বামীজী এই সব কথা বলছিলেন, তখন যে বিশালপ্রাণতা বাঙ্ময় হয়েছিল তাঁর কথার মধ্যে—সে প্রাণকে প্রকাশ করব ভাষায়, সাধ্য কি আমার!"

দলের মধ্যে একজনের (নিবেদিতার) ইচ্ছা হয়েছিল 'পল্লব সমেত নাশপাতি ফুলগুলি' দিয়ে স্বামীজীর পূজা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'স্বামীজী, পূজার জনাই এদের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এদের ফল হবে না।' স্বামীজী সুস্মিত মুখে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু এমনই সঘন ছিল পরিবেশ যে, সে ইচ্ছা বাস্তবে পূর্ণ করার পক্ষে প্রয়োজনীয় আলোড়নটুকু ঘটানো সম্ভব হয়নি।

স্বামীজীর বিদায় বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা—

"তিনি চলে গেলেন। আমরা সকলে—ভৃত্যেরা, মাঝিরা, বন্ধুরা, শিষ্যেরা, পিতামাতা, পুত্রকন্যারা,—এগিয়ে গেলাম রাস্তায় দাঁড়ানো টোঙ্গা পর্যন্ত তাঁকে

বিদায় দিতে। একটি ছোট্ট নিটোল মূর্তি, বড় মাঝির চার বছরের মেয়েটি, অনেক দিন ধরেই স্বামীজীর প্রতি যার ভালবাসা সকলের চোখে পড়েছে, সে তার কেশ-কালো মাথাটির উপরে ফলের ঝুড়ি চাপিয়ে তাঁর পাশে পাশে হেঁটে চলল দৃঢ়পদে। হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিল—তিনি যখন চলে যাচ্ছেন গাড়িতে। আর আমরা, এই ছোট মেয়েটির চেয়ে যাদের বেদনা অল্প নয়, কিন্তু বয়স্থ বলে যাদের জটিল চিন্তা ও অনুভূতিতে ঐ শিশুর নিঃস্বার্থতা নেই—আমরা জানতাম না আবার কখন তাঁর দর্শন পাব,—কিন্তু এটুকু জেনেছিলাম যে, সেই দিনটিতে আমরা চিরন্তনের মধ্যে জীবিত ছিলাম, যার জ্যোতিচ্ছুরণের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হবে আমাদের ভাবী জীবন"]

এই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অভিজ্ঞতার অনুভূতিকে নিবেদিতা যে ভাষায় নিবেদন করেছিলেন 'Wanderings' গ্রন্থের প্রারম্ভে, তা আপাতত যদিও গদ্যের ভাষা, আসলে কবিতারই ভাষা—মহাপুরুষসূক্ত। মুক্ত গদ্যচ্ছন্দে তার অনূদিত রূপ :

অপরূপ দিনগুলি, এই বৎসরের...
মূর্ত হয়েছিল আদর্শ অঙ্কে তার।
বেলুড়ের নদীতটের কুটীরে,
নৈনীতালে, আলমোড়ায় ও কাশ্মীরে,
হিমালয়ে—অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর,
যা বাহিত, ধ্বনিত হবে জীবন থেকে জীবনান্তরে।
তারই মধ্যে একবার...অন্তত একবার...
সহসা আলোকে উন্মোচিত অমরলোকের দ্বার।

লীলা—শুধু লীলা—

প্রেমকে দেখেছি আমরা।
সে এমন প্রেম, যা দীনতম অজ্ঞানতমের সমস্তরে নামে।
প্রেমকে দেখেছি আমরা,
যার চোখে এই পৃথিবী মধুময়, শুধু মধুময়।

হেসেছি আমরা বিরাট প্রতিভার খেয়ালে খুশীতে,
উত্তাপ নিয়েছি বীরব্রতের যজ্ঞকুণ্ড হতে,
আর দেখেছি, দেখেছি যেন, পরম লগ্নে
শিশু ভগবানের নয়ন-পদ্মের প্রথম উন্মীলন।
আমরা ছিলাম, সেখানে ছিলাম।

বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ছিলনা কোথাও, কিছুতে,
বেদনা এসেছে, বিঁধেছে বুকে, শোকস্মৃতি,
চলেও গিয়েছে,
উন্নীত হয়েছে দুঃখ আলোকতীর্থে,
তা হয়েছে জ্যোতির্ময়—নিঃশেষ করেনি আমাদের।

আমাদের যাত্রা-কথা বলতে পারি সে সাধ্য আমার নেই।
বরমুলায় আইরিস ফুল ফুটে আছে, এখনো দেখি,
ইসলামাবাদের পপ্‌লারের কাঁপন-ধরা পাতার তলায়
কচি ধানের শিহর,
আরণ্য হিমালয়ে রহস্যনিশা,
দিল্লীর, আগ্রার রাজৈশ্বর্যমহিমা।
যদি পারতাম এদের শব্দপ্রতিমা রচনা করতে!
হায়—অসম্ভব, সে যে অসম্ভব!

এরা আর মানুষেরা,
স্নেহপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, আমাদের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ
সেই মানুষেরা
বিরাজিত হোক নিত্যস্মৃতির মন্দিরে।

নব বিশ্বাসের উদয়ক্ষেত্র আমরা দেখেছি।
দেখেছি বিশ্বাসের জন্মদাতা পুরুষকে।
এমনি এক সান্নিধ্যে আমরা ছিলাম
যিনি আকর্ষণ করতেন সকলকে,
কান পেতে শুনতেন তাদের কথা,
বুক ভরে নিতেন তাদের ব্যথা,
ফিরে যেত না কেউ সে আশ্রয় থেকে।
দীনতা—যা সর্বতুচ্ছতাকে মুছে দেয়,
ত্যাগ—যা যাতনা ও মৃত্যুর অগ্রসর পদে
বর্ষণ করে আশীর্বাদ,
আমরা দেখেছি, আমরা জেনেছি।

যে-নারী প্রভুর চরণ ধুয়েছিলেন চোখের জলে,
মুছেছিলেন মাথার চুলে,
সে নারীর হাত ধরেছিলাম আমরা,
সেই পরম লগ্ন আমরা পেয়েছি, পেয়েছি,
হায়, সেই বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি ছিলনা আমাদের।

মৃত বাদশাহগণের উদ্যানে বসে স্বপ্ন ঘনালো চোখে :
এই বিরাট আত্মার মন্দিরে
কী হবে যোগ্য অর্ঘ্য ?
পৃথিবীর ঐশ্বর্যের যত সম্ভার,
রাজার মাণিক্যদ্যুতি সিংহাসন,
মহাবীরগণের আন্দোলিত পতাকা,

নগরীর উৎসবসজ্জা,
গর্বিত মানুষের বিলাস-প্রাসাদ,
যাজকগণের অঙ্গাভরণের আড়ম্বর,
গীর্জা বাতায়নের আলোকিত চিত্ররাজি—

প্রত্যাখ্যাত হল সবই, একে একে আমাদের নয়নের স্বপ্নে।

তখন দেখলাম ভিক্ষুকের সাজে তাঁকে,
বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, স্বদেশীর পূজার্হ মূর্তিতে,
সে জীবনের যোগ্য প্রচ্ছদ কি হবে দেখলাম :
ঘর্মাক্ত শ্রমের রুটি, কুটীরের আশ্রয়,
শস্যক্ষেত্রের বুক চিরে চলে যাওয়া
আঁকাবাঁকা মেঠো পথখানি।

তাঁকে ভালবাসত তাঁর দেশবাসী,
পণ্ডিতেরা শুধু—শুধু রাজনীতিক ?
না—যারা অজ্ঞান তারাও।
মাঝি প্রতীক্ষা করত জলের দিকে তাকিয়ে
কখন তিনি ফিরে আসেন,
কোলাহল করত ভৃত্যেরা, কাড়াকাড়ি করত
কে সেবা করবে তাঁকে, তাই নিয়ে।
সবার মাঝে তিনি, সবের মাঝে তিনি,
খেলার আবরণটি খসেনি কখনো।
'তারা খেলছে প্রভুর সঙ্গে'—তারা জানত চেতনায়।

এ মহালগ্নের স্পর্শ যারা পেয়েছিল,
তারা ধন্য, জীবন তাদের অর্থবান, অমৃতময়।
আর...রাত্রি-দীর্ঘ তালীবনে কেঁপেছে বায়ুর নিশ্বাস,
বলেছে মর্মরে
মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!

॥ ১৮৯৯ ॥

৬ মার্চ, ওলি বুলকে :

স্বামীজী এখন স্বস্থানে। আমি আবার পিতাকে পেয়েছি, যাঁকে হারিয়েছি দশ বছর বয়সে। স্বামীজী সত্যই শান্তিতে আছেন, শান্তি, শান্তি—অপরূপ মধুরতা এবং অপূর্ব শক্তি।

ভারতের ক্রীশ্চান হওয়ার বিষয়ে গতকাল তিনি প্রায় স্বগতোক্তি করছিলেন। মিশনারী-সংগঠন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়ে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী খুলছে—এবং কর্মচারীদের **জোর করে** খ্রীষ্টান করার কথা ভাবছে! একথা কি সত্য হতে পারে? শুনলেও লজ্জায় শিউরে উঠতে হয়। মাদার রোলান্ড হয়ত বলতেন, 'খ্রীষ্ট! তোমার নামে কী না চলছে!'

তিনি নিজের মনে যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'মিশনারীদের ঐ প্রয়াস থেকে জনগণকে বাঁচাবার চেষ্টা করার দরকারই বা কি? তাদের খাদ্য চাই—আমরা কি সে খাবার দিতে পারব?' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথা শোনার পর থেকে আচার্যদেবের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তাঁর এই বাণীতে আলোকোজ্জ্বল হয়েছে আমার অন্তর। 'সব মতই সত্য'—ভারতীয় জনগণকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে এই সত্যটিই। তাদের কোনো একটি ধর্মীয় মত নিতে হবে। তারা ক্রীশ্চান হোক, যদিনা তার দ্বারা কিছু হারায়, এবং পরিবর্তে খাদ্য পায়, আর সমব্যবহার। কিন্তু যথার্থত আমার মনে হয় না, এর জন্য খ্রীষ্টধর্ম নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা নিশ্চিত যথেষ্ট সংখ্যক যুবকের মনে আগুন জ্বালাতে পারব, যাতে তারা সব কিছু ত্যাগ করে জগতের এবং মানবের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এবং সাম্যমন্ত্র প্রচার করতে পারে সক্রিয়ভাবে।......

কিছু পূর্বে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেলাম। "আমি আবার কাজের ঝোঁকে আছি" —বলতে বলতে তিনি এলেন। স্বামী সারদানন্দ বোম্বাই যাবেন অর্থসংগ্রহে, স্বামীজী নিজে কিছু সময় মঠে থেকে কাজ করবেন। সকলকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। অনেকগুলি ছেলেকে ভিক্ষায় বেরুতে হবে, কেননা তাদের সংস্থানের সামর্থ্য নেই। দেখলাম, স্বামীজী ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে আছেন। যোগানন্দের এবং তাঁর নিজের অসুখ আবার বাড়তি বোঝা। যোগানন্দের জন্য প্রতিদিন ১০৲ টাকা। স্বামীজী বললেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাক, তিনি চান না। মানুষ তৈরী তাঁর কাজ, কিন্তু সে-কাজ, স্বামীজী মনে করেন, আরও সহজে করা যাবে তাদের খেতে দিয়ে ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে—কষ্টে রাখার চেয়ে। শুধু দেহধারণের জন্য অতিরিক্ত লড়াই মানুষকে ডুবিয়ে দেয়, বিশেষত অপরিণতদের। কী সত্য এই কথা! দারুণ, দারুণ সত্য!......

এইসব কথার মধ্যে ভারত ও ভারতীয় জনগণের বিষয়ে তাঁর চিন্তাপ্রবাহ চলছিল—তাঁর মন এত দ্রুত সক্রিয় ছিল যে, আমার পক্ষে তাকে অনুসরণ করা শক্ত হয়ে উঠেছিল।—কি করে তাদের খাদ্যসংগ্রহের নতুন পথ বের করা যায়? কলোনি নির্মাণ, শস্য উৎপাদন,—মানুষ তৈরীর জন্য। কিভাবে ভারতের পুরনো শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরী করা যায় ইউরোপ আমেরিকায়? 'ট্রেড সিক্রেট' কেনবার টাকা জোগাড়

করা যায় কোথা থেকে? কিভাবে সেই 'সিক্রেট'-কে বৃহৎ উৎপাদনে প্রয়োগ করা যায়?—ইত্যাদি, ইত্যাদি।*......

এখানে আমার থাকা তাঁর পক্ষে বোঝার মত, ক্রমে বুঝতে পারছি। আমার সামনে কোন্ অনভিপ্রেত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, সে বিষয়ে য়ুম (ম্যাকলাউড) তোমাকে জানাবে। কিন্তু পেছিয়ে যাওয়া যে কাপুরুষতা। আমি সেকথা স্বামী সারদানন্দকে আজ বলেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'হাঁ, স্বামীজী সেদিন তোমাকে য়ুরোপে ফেরৎ পাঠাবার কথা বলছিলেন।' শুনে পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল। এখানে কত কাজ আছে করবার—ভগবান জানেন কি হবে—আমি কিছু ভাবতে পারছি না। তারপরে এরই সঙ্গে তাঁর (স্বামীজীর) সেই কথাগুলি শুনলাম —য়ুমকে হুবহু যা লিখে পাঠিয়েছি—কথাগুলি 'মা'-এর জন্যই নির্দিষ্ট :

'বাছা, আমাকে খুসী করবার জন্য বেশী কিছু জ্ঞানের দরকার নেই; শুধু গভীরভাবে ভালবাসো।'

১২ মার্চ, ম্যাকলাউকে

গতরাত্রে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। একজন সন্ন্যাসী বিকেল চারটের সময়ে দেখা করতে আসেন। তাঁকে বললাম, 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য আমি স্বামীজীকে 'ইণ্টারভিউ' করব। তিনি ৬টার সময়ে তাঁর ফেরার নৌকায় আমাকে স্বামীজীর কাছে নিয়ে যেতে রাজি হলেন, যদি আমি ফেরার সময়ে হাঁটাপথে গাড়িতে ফিরতে রাজি থাকি। সদানন্দ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, আমরা হেঁটে ফিরেছিলাম। ব্যাপারটা চমৎকার দাঁড়িয়েছিল।

আটটার সময়ে সেখানে পৌঁছেছিলাম। রাজা গাছের তলায় আগুনের পাশে বসেছিলেন। তিনি নৌকা থেকে নেমে এসেছিলেন। মনে হয়, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মহিলার সাক্ষাতের পক্ষে তখন দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে।

'সাক্ষাৎকার'-প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'মার্গট, আমি বেশ কিছু দিন ধরে ঐ ন্যূনতম সংঘাতের পথ বেছে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। ওটা একেবারেই ভুল তত্ত্ব। তাছাড়া আপেক্ষিক কথাও বটে। আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ও বিষয়ে আমি আর মন দিতে রাজি নই। পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকটি নিষ্ঠাবান মানুষের ইতিহাস। যদি কেউ আন্তরিক হয়, পৃথিবী তার পায়ের তলায় লুটোবে। আমি আর আদর্শকে তরল করতে রাজি নই—এবার আমি নির্দেশ করব শর্ত।†......

---

* ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির চিন্তায় স্বামীজী সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। তার প্রভূত নিদর্শন নানাস্থানে রয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৮৯৮-এর ৭ই অগস্ট নেল হ্যামণ্ডকে নিবেদিতা লেখেন :

"একদিন আচার্যদেব আকাশকুসুম রচনায় ব্যাপৃত : 'বিহারের লোকবিরল অংশে কৃষি-খামার গড়ে তোলা হবে', ইত্যাদি। (তিনি অবশ্য বললেন, হতে হতে কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে যাবে।) তিনি তাঁর কল্পনা শেষ করলেন, 'মিঃ ও মিসেস হ্যামণ্ড এবং আরো প্রচুর ইংরেজ কর্মীকে নিশ্চয় আমি একাজে যোগাড় করে আনব—তাঁরা আমার জন্য একাজে আসবেনই।"

† 'ন্যূনতম সংঘাতের' কথাটি এখানে কিছু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজীর সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে উক্তিসমূহ নিয়ে দেশের সর্বত্র তুমুল আলোড়ন হয়। প্রতিষ্ঠিত মতসমূহকে তিনি আঘাত করেন, সেই মতপক্ষীয়েরাও প্রতিঘাত করে

সবশেষে যখন বললাম, আগামী শনিবার, ২৫শে মার্চ আমাকে "আমৃত্যু সদস্য" করে নিন—রাজা তৎক্ষণাৎ বললেন—"তাই হবে।" গতকাল সকালে দুজনকে ব্রহ্মচর্য দিয়েছেন, তাও বললেন।

["সাক্ষাৎকারটি" বেনামে প্রবুদ্ধ ভারতের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে অবশ্য ন্যূনতম সংঘাতের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। প্রকাশিত আলোচনার মূল বিষয় ছিল, ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যদি স্বধর্মে ফিরে আসতে চায়, তাদের নেওয়া হবে কি না? স্বামীজী বলেন, নিশ্চয়ই। তারা কোন্ জাতিভুক্ত হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী জানান, তারা নিজেরা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে সংগঠিত হবে, ইষ্টসাধনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে তিনি চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের সমাজ সংগঠন ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করেন।

কোন্ পরিবেশে আলোচনা হয়েছিল, নিবেদিতা তা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণনা করেছেন—"সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলাম এক সন্ধ্যায়, যখন তিনি গঙ্গার উপরে হাউসবোটের ছাতে ছিলেন। তখন রাত্রির সূচনা হয়ে গেছে। আমরা রামকৃষ্ণ মঠের পোস্তায় এসে নৌকা লাগালে, স্বামীজী নেমে এলেন কথা বলতে।

"স্থান ও সময় উভয়ই মনোরম। উপরে আকাশ, তারকাখচিত। চারিদিকে কুলুকুলু গঙ্গার প্রবাহ। এক পাশে মৃদু আলোকিত বাড়ির আভাস, যার পটভূমিকায় তালবৃক্ষ এবং উন্নত পত্রঘন তরুরাজি।"

আলোচনার সমাপ্তিতে—"সাদর শুভরাত্রি জানিয়ে এই সুমহান ধর্মাচার্য তাঁর লণ্ঠন তুলে ধরলেন, এবং প্রস্থান করলেন মঠবাড়ির দিকে, আর আমি গঙ্গার পথহীন পথের মধ্য দিয়ে, তার নানা বাঁক ও স্রোতের চাতুরীর মধ্য দিয়ে কলকাতায় ফিরতে লাগলাম।"]

১৬ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন, 'লোক না পোক।' চিকাগোয় থাকাকালে তাঁর একটি দর্শন ঘটে; দুশ্চিন্তা ও অভাবে তিনি অর্ধমৃতের মত মেঝেয় লুটিয়ে আছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বলেছিলেন—'ওঠ্ ছোঁড়া ওঠ্! লোক না পোক।'

২৬ মার্চ, ওলি বুলকে

স্বামীজীর সর্বাঙ্গীণ কুশল। গতকাল তাঁর দর্শনে গিয়েছিলাম। তিনি আমার প্রথম দীক্ষার ঠিক এক বছর পরে গতকাল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করলেন। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ য়ুমকে লিখে পাঠাবার ইচ্ছা আছে—সেটি তোমাদের দুজনের জন্যই। এখন তোমাকে একটি পুজা-পত্র পাঠাচ্ছি—তোমার জন্য বিশেষভাবে

প্রচণ্ডভাবে। স্বামীজীর বন্ধুবান্ধবেরা এতে শঙ্কিত হন। বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার অনুরোধ তাঁকে করা হয়, নিবেদিতা প্রমুখ কেউ কেউ সে চেষ্টায় অগ্রণীও হন। 'ন্যূনতম সংঘাতের' বিষয়ে স্বামীজীও গভীরভাবে চিন্তা করেন। চিন্তার ফল কি দাঁড়িয়েছিল—স্বামীজীর উপরের কথাতেই তা দেখছি।

পাত্রটিকে ভস্মে স্পর্শ করিয়ে নিয়েছি তাঁকে দিয়ে। খুব মজার, নয়! গতকাল সকালে তিনি বহু-আকাঙ্ক্ষিত পূজারীতি শেখালেন। ছোট মন্দিরটিতে আমরা একসঙ্গে পূজা করলাম। সমস্ত সময় তিনি অতি মিষ্টভাবে কথা বললেন, ঠিক যেভাবে মধুরস্বভাবা মায়েরা শিশুদের শিক্ষা দেন স্নিগ্ধতম স্বরে।

আমাকে আমৃত্যু ব্রহ্মচারিণী কেন করলেন? মনে হয়, অংশত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীদের পুরনো ধারার পুনঃ প্রবর্তনের জন্য, বাকি কারণ হয়ত,—আমি তাঁর চোখে উচ্চতর অধিকার লাভের যোগ্য নই।

২৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

গত শনিবারে আমার দীক্ষার বিবরণ বড়ো আকারে তোমাকে লিখে পাঠাবার কথা মনে মনে কতবার ভেবেছি। এখন আর তার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাচ্ছি না। তবু লিখবই।

সকাল ৮টায় মঠে পৌঁছাই। তারপরে মন্দিরে যাই। পূজার পুষ্পাদি না আসা পর্যন্ত আমরা মেঝেয় বসে রইলাম—রাজা বুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন। জাতক কাহিনীর তাৎপর্যের কথা, অপরের জন্য পাঁচশো বার জীবনদান করলে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়—এইসব কথা তিনি বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ের পক্ষে চমৎকার একটি ভাবব্যঞ্জনা, নয় কি?

পূজাদ্রব্যাদি এলে তিনি আমাকে পূজাপদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। অবশেষে তা পেলাম। সারাক্ষণ অতি মধুরভাবে কথা বলে বুঝিয়ে দিলেন সব কিছু। আমার মাথায় স্থাপন করবার জন্য তিনি যে সাদা ফুলটি দিয়েছিলেন, সেটি আমি তোমার জন্য সরিয়ে রাখি, পরে সেটিকে হোমের ভস্মে ছুঁইয়ে নিই তাঁর দ্বারা, তোমারই জন্য। ফুলটির গায়ের লালচে দাগ রক্তচন্দনের। তবে ফুলের সব শুভ্রতা জ্বলে গেছে, দেখতে পাচ্ছি। বাইরে কবিতার এক ছত্র লিখে পাঠিয়েছি, যে-কবিতাটি আমি গতকাল পড়েছিলাম। কবিতাটির মধ্যে আচার্যদেবের রূপ চমৎকার প্রতিফলিত —"আমি সেই গ্যাব্রিয়েল (এখন এই মুহূর্তে আমি যেভাবে তোমাকে বলছি)—ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান।" জনৈক অবতারের কাছে প্রণাম জানিয়ে পূজা শেষ হল, যাঁর নামটি এখন স্মরণ করতে পারছি না। পূজাবেদী পুষ্পসজ্জিত করার পরে তিনি বললেন, "এবার কিছু ফুল আমার বুদ্ধকে দাও। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে ভালবাসে না।"*

পূজা শেষ হলে নীচে গেলাম হোমের জন্য।......

অভয়ানন্দ বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমার ভালবাসা নির্বোধ ও আবেগপূর্ণ, কেননা আমি মাংস খাই যদি তিনি খেতে দেন, এবং তিনি যা যা বলেন, ঠিক তাই তাই করি, এবং তাঁর পক্ষে নিতান্ত সাধারণ যে-সব উক্তি, তাতে মাঝে

---

* এই ঘটনার এক বৎসর আগে স্বামীজী যখন নিবেদিতাকে প্রথম দীক্ষিত করেন, তখনো বুদ্ধের অনুসরণ নিতে বলেছিলেন—

'যাও, তাঁকে অনুসরণ করো, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে অপরের জন্য পাঁচ শতবার জন্ম নিয়েছিলেন!'

মাঝে চমৎকৃত হয়ে পড়ি। আসল কথা আমার মনে হয়, যে-কেউ দেখতে পায় যে, আমি তাঁকে পূজা করি—যেটাই সত্য।

এত বিশালতা, এত মধুরতা, এত দীনতা—অভয়ানন্দ সম্বন্ধে স্বামীজীর—আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। নিউইয়র্কে শিক্ষাদানকালে নিজের সমাধিমগ্ন হয়ে পড়ার বিষয়ে স্বামীজী অভয়ানন্দকে বলেছেন : "সত্যই নির্বোধ আমি! শিক্ষকের নিজেকে সমাধিতে আত্মহারা হতে দেবার অধিকার নেই।"—আর এই উক্তিই, অভয়ানন্দ বলেন, স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ শিক্ষা!!!!! কথাটাকে অভয়ানন্দ আন্তরিকভাবে নিয়েছেন দেখতে পাচ্ছ।

আমার রীতি অবশ্য এরকম নয়—আমি তো ব্রহ্মচারিণী, সন্ন্যাসিনী নয়!*

[ম্যাকলাউডকে লেখা এই চিঠি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নিবেদিতার ব্রহ্মচারিণী ব্রতদীক্ষার বিবরণ পাই। তা ছাড়া দুটি মৃত্যুর বর্ণনা ছিল। প্রথমটি স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু, দ্বিতীয়টি অজ্ঞাত একটি বালকের।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বামী যোগানন্দ বিশেষভাবে মাতৃগতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রীমা সারদাদেবী এবং মাতৃমণ্ডলীর মর্মান্তিক দুঃখকে কয়েক পংক্তিতে নিবেদিতা যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর লেখনীরই যোগ্য।

স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা পরে পৃথকভাবে প্রকাশ করতে পারতাম। সেটিকে এখানেই কিন্তু প্রকাশ করছি, কারণ, এই মৃত্যু স্বামীজীকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, নিবেদিতার মনের উপরে যার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অনেকগুলি চিঠিতে প্রকাশিত।

এই সময়ের আগেও কয়েকটি চিঠিতে যোগানন্দের অসুখের প্রসঙ্গ আছে। যেমন ১৮৯৯-এর ৩০শে জানুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"ডাঃ সরকার বলেছেন, যোগীনন্দ (যোগানন্দ) যক্ষ্মায় মৃত্যুমুখে। আজ শ্রীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু যোগীন মা এবং হতভাগ্য তরুণী পত্নীটির রক্তশূন্য শুষ্ক মুখ দেখে পালিয়ে এসেছি।......একদিন তোমাকে যোগীনন্দের বিবাহ-কাহিনী বলব।" ৭ই ফেব্রুয়ারী একই মহিলাকে লিখিত—"স্বামীজী যখন জানলেন যোগীনন্দ অনেক বল পেয়েছেন, তখন গতরাত্রে তিনি আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। সকলকে কী না ভালবাসেন তিনি!" ওলি বুলকে ২৬শে মার্চ— "যোগীনন্দ তোমার শুভেচ্ছা পেয়েছেন। তিনি এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু সহসা খুব খারাপ লক্ষণ দেখা দিয়েছে—যে-কোনো সময়ে মারা যেতে পারেন।...যোগীনন্দ মঙ্গলবার মারা গেছেন। শ্রীমায়ের উপর নিদারুণ আঘাত।"

যোগানন্দের মৃত্যু বর্ণনার পরে যে বালকটির মৃত্যুকথা আমরা পেয়েছি, তার থেকে মহৎ মৃত্যু অল্পই দেখা যায়। বালকটির নাম আমরা জানি না, জীবনে সে কত বড় ছিল জানার সুযোগ হয়নি, কিন্তু কী অপূর্ব অবসান! যে-প্রশান্ত

* নিবেদিতাকে স্বামীজী ব্রহ্মচারিণী করেছিলেন, সন্ন্যাসিনী করেননি। অভয়ানন্দকে তিনি আমেরিকায় সন্ন্যাসিনী করেছিলেন। সন্ন্যাসিনী না করার জন্য নিবেদিতার নিগূঢ় অভিমান পূর্বে দেখেছি, এখানেও দেখলাম। এ অভিমান তাঁর ছিল। কিন্তু যখন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তখন অনুভব করেন, হয়ত এই ভবিষ্যৎ দর্শন করেই স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস দেননি।

মৃত্যুর জন্য মানুষ সাধনা করে, কল্পনার সাহিত্যে যার সাক্ষাৎ আমরা পেয়ে থাকি, তাকেই ঐ বালকটি পেয়েছিল বাস্তবে, নিজ জীবনে—শ্রীমায়ের ইচ্ছায়। সাধারণের মধ্যে অসাধারণের প্রকাশকে অনুভব করে নিবেদিতা ধন্য হয়েছিলেন,—কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে বর্ণনা করেছেন—যোগানন্দের মৃত্যু বর্ণনার পরে ঐ বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করব অন্তত একটি কারণে—আর এক মহাবালকের, যার মধ্যে তিনি শিশু ভগবানের প্রকাশকে অনুভব করেছিলেন—তাঁরই প্রশান্ত মৃত্যুর কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।]

মঙ্গলবার অপরাহ্নে যোগানন্দ মারা গেলেন। সন্ন্যাসীরা অধিকাংশই পাশে ছিলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'ভাই, কেমন আছো, খুব যন্ত্রণা কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সারাক্ষণ ব্রহ্মচেতনায় ডুবে যেতে চাইছি, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরে ধরা পড়ে আছে মন। একবার গীতা পড়ে শোনাও।' গীতা পাঠ করা হলে তিনি বললেন, 'আর কোনো যন্ত্রণা নেই, সব কিছু বিগলিত হয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মচেতনা আসছে।' বলতে বলতে হঠাৎ গলায় জোর এনে বললেন, 'ওঁ রামকৃষ্ণ!'—তারপরেই চিরসমাধি।

অপরূপ! অপরূপ!

স্বামীজী এসেছিলেন। প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ঘোষ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ভয় পেলেন—স্বামীজী না ফিরে অসুখে পড়েন। তিনি স্বামীজীকে জোর করে মঠে পাঠিয়ে দিলেন। তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

মাতাঠাকুরাণীর কাছে গেলাম। কাঁদছিলেন। যোগীনমা মাসের পর মাস শুশ্রূষা করেছেন—তিনি মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে—অশ্রুহীন, শব্দহীন। বহুক্ষণ সেখানে থাকবার পরে নীচে থেকে ৫০-৬০টি গলায় সমস্বরে শোনা গেল 'হরি ওঁ'!—মা বললেন, তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দেখো!

সুগম্ভীর দৃশ্য। মৃত মানুষটি—গেরুয়া সিল্কের বিরাট পাগড়ি মাথায়—শরীর ফুলে ঢাকা, যেগুলি স্বামীজী ও অন্যান্যরা ছড়িয়েছিলেন—সদানন্দ ধরে আছেন উঁচু করে, জ্বলন্ত কর্পূর আন্দোলিত করা হচ্ছে সামনে, আর ঘরের ভিতর ও বাহিরের মানুষগুলি উচ্চারণ করে যাচ্ছে পুণ্য নাম।

এই সময়ে সদানন্দের মুখের চেহারা যদি দেখতে—একেবারে ঋষি!

অকস্মাৎ সুদীর্ঘ ক্রন্দন আকুল হল উপরতলায়—নীচের পূজার শব্দের সঙ্গে মিশে তা ছড়িয়ে পড়ল। পুরবাসিনীরা বুঝেছিলেন, এতদিন যিনি এই গৃহের কর্তা ছিলেন, তিনি চিরতরে চলে যাচ্ছেন। যোগীন মা'র তুষারশীতল স্তব্ধতা টুটে গেল—মনে হল তাঁর ও মায়ের বুক বুঝি ফেটে গেল। যোগানন্দ চলে গেলেন। বড় কোমল করে বিছানা পাতা হয়েছিল তাঁর জন্য—সব সুন্দ। বিছানা ঢাকা দেওয়া হয়েছিল হলুদ রঙের ফুলে, তাঁর দেহ শ্বেত পুষ্পে।

শ্মশানে ওঁরা চিতা সাজাতে সাজাতে সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন; তারপরে, ব্রহ্মানন্দ মুখাগ্নি করবার ঠিক আগে তাঁরা একে একে ক্ষমা চেয়ে নিলেন—যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে!

"আগুনের মাঝখানে ঠিক যেন শিবের মুখ"—সদানন্দ বললেন।

[২৬শে এপ্রিলের এক চিঠিতে নিবেদিতা শ্রীমায়ের বেদনার কথা লিখেছেন : "যোগানন্দের মৃত্যু মাতাঠাকুরাণী ও যোগীন মা'র কাছে দারুণ বেজেছে। মা **'মৃত্যু'** কথাটি যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা। 'জানি, জানি, সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সেকথা আমি জানি—কিন্তু সে যে **আমার** যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!]

সদানন্দের মুখে আর একটি মুমূর্ষু বালকের কথা শুনলাম। মা তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

'তাহলে কি আমার মৃত্যু নিকটে?'—ছেলেটি বলেছিল।

'মায়ের আদেশ!'—ওঁরা কথা এড়িয়ে বললেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলল, 'নিশ্চয়ই; মাকে আমার প্রণাম। তাঁর কথা তো শুনতেই হবে। আপনারা নিয়ে চলুন।' তখন ওঁরা শয্যাসুদ্ধ তাকে বাইরে আনলেন। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নত নেত্রে চেয়ে রইলেন। ত্রিগুণাতীত তার সারা গায়ে গঙ্গামাটিতে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার নাম লিখতে লাগলেন। ছেলেটি সেই লেখা দেখতে দেখতে বলল, 'ওসব নাম মুছে একটি নাম রাখো—আমি ঐ নামটি নিয়েই এতদিন বেঁচেছি, মরণের সময়ে ঐ নামটি নিয়েই যাব।' যখন তাই করা হল, তখন সে মায়ের দিকে তাকালো বিদায় নিতে। তারপর তাকে সকলে বয়ে নিয়ে চলে গেল। সারা পথ সে চমৎকার কথা বলে গেল। নদীতীরে পেঁছান মাত্র—মৃত্যু ঘটল! ওঁরা যখন গঙ্গার ঘাটে ছিলেন, তখন প্রচন্ড ঝড় উঠে গর্জন করে আছড়ে পড়ছিল সমস্ত সময়—আমার মনে হচ্ছিল কী স্বাভাবিক! পবনদেব তাঁর সঙ্গীতের মহারথ পাঠিয়েছেন বিদায়ী আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য!

৫ এপ্রিল, মিস ম্যাকলাউডকে

যোগানন্দের মৃত্যুর পরে স্বামীজীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। গত রবিবার জেনারেল ও মিসেস প্যাটারসন তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গাড়ি করে মঠে গিয়েছিলেন। মিসেস প্যাটারসন তাঁর অসুস্থতা ও শরীরের শীর্ণতা সম্বন্ধে যে নিদারুণ বর্ণনা দিলেন, তাতে আমি একেবারে বিপর্যস্ত। কী হবে—যদি মৃত্যু হয় তাঁর! পৃথিবী যে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে আমার কাছে মুহূর্তমধ্যে!

৮ এপ্রিল, মিস ম্যাকলাউডকে

যে রকম আশঙ্কা করছিলাম, স্বামীজীর শরীর ঠিক সেই রকমই অসুস্থ। তিনি প্রচুর হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছেন, যার ফলে বিপর্যয়। এখন একটু ভাল। সারদানন্দকে ফিরে আসার জন্য টেলিগ্রাম করেছেন, কারণ তিনি ইংলন্ড যেতে বদ্ধপরিকর। তাঁর কোষ্ঠী আবার গণিয়েছি। শুনে স্বস্তি পেয়েছি যে, বৃহস্পতির প্রভাব আর ৯ বছর সক্রিয় থাকবে। এখন একটা মন্দ গ্রহ স্বাস্থ্যনাশ করছে ও শোকতাপ সৃষ্টি করছে, কিন্তু তার প্রভাব ১৮৯৯-এর ৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে ইতি হবে। তারপর তিনি এমন সাফল্য ও যশ পাবেন, যা পূর্বে কখনো পাননি। সুতরাং আমার ভাবনার হেতু নেই।......

জ্যোতিষ গণনা সম্বন্ধে বলতে চাই, এটা জেনেও সুখ—স্বামীজীর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আছে। যতক্ষণ বৃহস্পতি জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে, ততক্ষণ জাতকের মৃত্যু নেই।......

বুধবার সকাল।—গতকাল ভোর পাঁচটার সময়ে...গেরুয়া পোষাকের এক দূত এসে ঘোষণা করলেন—'সিস্টার নিবেদিতা আছেন?—স্বামীজী এসেছেন!' আমি অবাক। তারপরে বিস্ময়-বিহ্বলতা ঝেড়ে ফেলে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি কি—তিনি আবির্ভূত—স্বাস্থ্যে ও আনন্দে জ্যোতির্ময়। কথাবার্তার জন্য স্বামীজী গিয়ে বসলেন পড়ার ঘরের বারান্দায়, আমি বিদ্যালয়ের সিঁড়িতে। মাঝে মাঝে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি উঠে চত্বরে পায়চারি করতে লাগলেন।

আমার আশঙ্কা ও তাঁর কোষ্ঠী গণনার কথা বললাম। তিনি ফেটে পড়লেন : 'কু-সংস্কারের আর একটি শব্দ যেন না শুনি! এসব তাড়াতে হবে—তার জায়গায় বসাতে হবে খাঁটি অদ্বৈততত্ত্ব।* হিমালয়ে একটি কেন্দ্র। যদি চাও—এখানেও একটি কেন্দ্র।' বিরাট ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণীর মত তাঁর চেহারা—'কাজ চাই—কাজ, কাজ। এ সপ্তাহে একটি বক্তৃতা হবে। তুমি বক্তৃতা দেবে, আমি হব সভাপতি। সারা কলকাতার ছাত্ররা আসবে। তারা আসবে—নিজের হাতে শহর পরিষ্কার করবে। তাদের "মৃত্যু-জ্বর" ধরাতে হবে। তার মানে বুঝতে পারো? আমার নিজের ছেলেদের সেই কথাই বোঝাচ্ছিলাম গোটা গতকাল ধরে—তারা এখন চাবুক-খাওয়া শ্বাপদের মত।'

দারুণ উত্তেজনাভরে পোস্টার তৈরীর আদেশ দিলেন।......

আমি...মঠে গিয়েছিলাম।।...স্বামীজীকে এত রোগা রুগ্ন আর ফোলা-চোখ দেখাচ্ছিল। হায়, প্রিয় রাজা! তিনি বললেন, কিছু দুশ্চিন্তায় তিনি ক্লান্ত। তিনি সবে পড়ানো শুরু করেছিলেন, এমন সময়ে আমার আসার সংবাদ পেয়ে উঠে আসতে পারলেন। সুতরাং আমি খুসী যে আমি গিয়েছিলাম।......

গতকাল তাঁর শীর্ণ দুর্বল চেহারা দেখে আমার বুক ভেঙে গেছে। যোগানন্দের মৃত্যুর পরে আমি বুঝেছি—কিভাবে না বুঝেছি—প্রিয় রুম, বীর হওয়া খুবই ভাল, কিন্তু বীর হওয়ার চিন্তা আমাকে ক্রমেই ভীরু থেকে ভীরুতর করে তুলছে। ঐ সম্ভাবনার এতটুকু স্পর্শে যেন থর্‌থর্‌ করছি। সে যেন ঈশ্বরের বিনাশের মত হবে। তাঁর বিদায়!—শান্তি দাও, শান্তি দাও!

---

* কোষ্ঠী গণনায় নিবেদিতার বিশ্বাস ছিল। তাঁর পত্রাবলীতে অনেক জায়গায় সেকথা পাই। বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ্ কিরোর (Chero) সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। স্বামীজী অপরপক্ষে এই সব ব্যাপারকে মেয়েলি, ও কুসংস্কারবৃদ্ধিকর বলে মনে করতেন। এবং তদনুযায়ী তিরস্কারও করতেন। নিবেদিতা আগেকার আর একটি তিরস্কারের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'Wanderings' বইয়ে।—(১১ অগস্ট, ১৮৯৮)—"আজ হাত দেখার জন্য দলের একজনকে স্বামীজী ভর্ৎসনা করলেন। এ জিনিসটি সবাই চায়, তিনি বললেন, কিন্তু সারা ভারত একে হেয়জ্ঞান করে। যখন ও বিষয়ে বিশেষ একটু সমর্থন করার চেষ্টা করা হল, তখন তিনি বললেন, হাঁ, চেহারা দেখে চরিত্র বলার চেষ্টাতেও তাঁর সমর্থন নেই। 'বলতে কি, তোমাদের অবতারকে আরও সাধু বলে ধরতাম, যদি তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা ঐ সব অলৌকিক ব্যাপারগুলো না দেখাতেন। এই কাজ করার জন্য বুদ্ধদেব একবার এক ভিক্ষুর আলখাল্লা কেড়ে নিয়েছিলেন।'"

[কলকাতায় ইংরেজ মহলে কয়েকজনের সঙ্গে নিবেদিতার হৃদ্যতা হয়। সে বিষয়ে লেখার পরে—]

......এক্ষেত্রে আমাকে চলিত জীবনরীতি সম্বন্ধে মামুলী ধারণা কিছু শিথিল করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কারণ ঐসব মহলে আমার কিছু যথার্থ কাজ করার আছে। গতকাল সহসা মাথায় খেলে গেল—এইজন্যই হয়ত স্বামীজী আমাকে সন্ন্যাসিনী না করে ব্রহ্মচারিণী করেছেন—এই কারণের কথা তিনি সচেতনভাবে ভাবুন আর নাই ভাবুন।

বুধবার সন্ধ্যা।—আসল কথা রাজার শরীর সত্যই ভালো নয়। বারবার বুকে হাত রাখছিলেন অস্বস্তিতে। গতকালকার অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি মনে হল। চায়ের ট্রে সাজিয়ে আনার জন্য আমি উঠে গেলাম। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণতর শিষ্যদের একজনের সঙ্গে কথা হতে লাগল। চমৎকার মানুষ। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভগিনী, তোমাকে একথা আমায় বলতেই হচ্ছে, আমি দেখেছি, আমাদের দেশে মহাপুরুষেরা অন্তত দীর্ঘজীবী হন না।'—য়ুম, মোটকথা আমি ভয় পেয়েছি। তিনি আর পাশ্চাত্ত্যে যেতে পারবেন না—এ বিষয়ে আমার পুরনো আতঙ্ক ফিরে এসেছে। আর, মাদ্রাজ-ভবিষ্যৎবাণী আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মথিত করেছে—'তিন বছরের মধ্যেই!' য়ুম, প্রিয় য়ুম য়ুম, যদি তুমি এখানে থাকতে! এই মানুষটিকে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, যদি কিছু ঘটে, আমাকে যেন সময়মত সংবাদ দেওয়া হয়। অন্যদেরও সেকথা বলে যাব—দিনে রাত্রে, যখনই হোক, খবর যেন পাই।

কিন্তু সত্যই ভয়ের হেতু নেই। অবুঝ ভয়ের আক্রমণ। যোগানন্দের মৃত্যু ওঁকে নাড়া দিয়ে গেছে, একথা সকলে বলছে বলেই দুশ্চিন্তা। কিন্তু সত্যি কী যে দারুণ ভয় লাগছে। অবশ্য যদি কিছু ঘটে, আমি নিশ্চয় তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠাব, যদিনা বারণ করে পাঠাও তুমি। সুতরাং যদি এই চিঠি পাবার আগে কোনো তার না পৌঁছায়, তাহলে জেনো, আমি একটা ভীতু কাঁদুনে মেয়ে ছাড়া কিছু নই। কিন্তু য়ুম, কি আসন্ন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা— তত্ত্বদর্শন এখন কোনই সাহায্য করছে না। 'যদি সমাধি তাঁর আসন্ন হয়, তাহলে যাবার আগে তাঁকে একটু শান্তি আর বিশ্রাম দিও—আর তাঁর যন্ত্রণাটুকু নিতে দিও আমাকে।'—একথা বলা হয়ত ছেলেমানুষি, কিন্তু ভগবান যদি সত্যই স্বামীজীকে শেষক্ষণে যথেষ্ট কষ্ট দেন, তাহলে সে ভগবানকে আমি জানতেও চাই না, ভালবাসতেও চাই না। অনন্তকালের জন্য সেই ব্যক্তি-ভগবানের দিকে আমি দ্বার বন্ধ করে দেব, এই এক পরম পুরুষের প্রতি অবিচারের কারণে। হাঁ, তাঁর অন্যান্য দিকের মতই ব্যক্তিরূপের জন্যও আমি বাঁচব—কাজ করে যাব—থেমে যাবার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু ঈশ্বর—না, না, ও-কাজ তিনি করবেন না, করতে পারবেন না—ওর থেকে শয়তানী নিষ্ঠুরতা আর কিছু হতে পারে না।......

কিন্তু এসব বলে তোমাকেও যন্ত্রণা দিচ্ছি, নিজেও পাচ্ছি। এসব কথা তোমাকে লেখা উচিত কিনা জানি না। কিন্তু তোমার কাছে কিছুই লুকোতে চাই না। তুমি অবশ্য বুঝবে, এই উদ্বেগ অকারণ; আর যদি টেলিগ্রাম না পাও, তাহলে জানবে তিনি মাসাবধি ভালই আছেন। শক্তি ও সান্ত্বনাপূর্ণ একটি দিব্য পত্র পাঠিও আমায়—আমি যে যোগানন্দের মৃত্যুর পরে চরম আঘাতের সম্ভাবনাকে ছুঁয়ে প্রায়

আছি—তাকে এড়াতে পারছি না কিছুতে। এ চিঠি যেন ঈশ্বর করেন আগামীকাল ডাকে ফেলতে পারি নির্বিঘ্নে, আর তুমিও যেন এ চিঠিকে গুরুত্ব দিও না। আমার স্থান পরিবর্তন দরকার এই বলে কদাপি যেন বাইরে যেতে আমাকে বলো না, কেন না, যতক্ষণ তিনি জীবিত আছেন এখানে, আমি তাঁর সান্নিধ্যের পরিধির বাইরে যেতে পারব না,—না, না, তা অসম্ভব—তিনি পূজ্য, প্রিয়, দেবতা—তিনি আমাকে ডেকেছিলেন অথচ আমি সাড়া দেবার জন্য নেই—একথা ভাবতেও পারি না। এই সমস্ত বছরটি ধরে কিভাবে আমার পূজা বেড়ে উঠেছে ভাবতেও স্তম্ভিত হয়ে যাই।......

বৃহস্পতিবার সকাল।—সদানন্দ এসেছেন। সদানন্দ বললেন, স্বামীজী বলেছেন, এটা কিছু নয়। কিন্তু সদানন্দ আমারই মত অনুভব করেন, রাজা কখনই তাঁর গুহা ছেড়ে যাবেন না। স্বামীজী সকলকে বলেছেন, যেখানেই তাঁর মৃত্যু হোক, তাঁর দেহ যেন এখানে আনা হয়। তিনি আরও বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন যে, গিরিশ ঘোষ সুদ্ধ কয়েকজন মিলে একটি মালার মত, যাদের মধ্যে একজনের দেহান্তর হলে অন্যরাও দ্রুত প্রস্থান করবেন। সদানন্দ বললেন, এসব কথা প্রত্যহ সকলে বলাবলি করছে। ঐ তালিকায় যোগানন্দই প্রথম।......

এখনো কিছুই ঘটেনি। কিন্তু সমাপ্তির নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুভব করছি যেন।......

সকলে যেন প্রতীক্ষা করে আছে—উনি বলবেন, 'আমি আমার আমটি পেয়ে গেছি,'—আর তাহলেই সকলে জেনে যাবে। এর পিছনে আছে একটি কাহিনী—শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় তাঁকে একান্তে বলেছিলেন, 'ওরে, এই তোর আম, আমি তোর জন্য রেখে দিলুম।' এই উক্তির সঙ্গে সকলে প্রথম সাক্ষাতের অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণীকে যুক্ত করে দেখছে; তিনি বলেছিলেন, 'ও যখনি জানবে ও কে, তখনি দেহ ছেড়ে চলে যাবে।' সদানন্দ বলেন, আগে যখনি স্বামীজী অসুস্থ হয়েছেন, গুরুভাইরা বলেছেন, 'কিন্তু ও মারা যাবে কি করে, ব্রত যে সিদ্ধ হয়নি।' এই বিশ্বাসের জোর কিন্তু আর পাচ্ছি না।

ওঁদের দিয়ে কোষ্ঠী গণনা করিয়ে নিয়েছি। ওঁরা বললেন, আগামী ৯ বছরে রাজার জীবনের ভয় নেই, কিন্তু অসুস্থ থাকবেন। যে-ভাবেই হোক, তিনি বেঁচে থাকুন—স্বার্থপরের মত হলেও বলছি। তাঁর চরণস্পর্শ পায় যে পৃথিবী— সে ধন্য!

২৫ এপ্রিল, মিস ম্যাকলাউডকে

আগের কয়েক দিনের মত স্বামীজী ভাল ছিলেন না। তাঁর মতে এটা হাঁপানির জন্য, কেননা বাতাস ভারী হলেই অসুখটা মারাত্মক হচ্ছে। এর অর্থ, বৃষ্টির সময়ে তিনি এখানে না থেকে উত্তর বা পশ্চিম ভারতে থাকবেন। বক্তৃতা করা উচিত হয়েছে কি না গোলাপ মা তা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'আমরা সৈনিক, আমরা কি কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করি?' কিন্তু আমাকে বলছিলেন, তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মহান মনু-বচন উদ্ধৃত করে বললেন, সন্ন্যাসী মরতেও চাইবে না, বাঁচতেও নয়।

১ মে, মিস ম্যাকলাউডকে

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ন্যাসিনী হতে গেলে কি ধরনের উন্নতি প্রয়োজন? উত্তরে দ্রুত বললেন, 'তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক।' ফলে আমার ইচ্ছা রুদ্ধ হয়ে গেল চিরতরে। তবু আমি অতি সতর্কভাবে বার করবার চেষ্টা করলাম, আমার ঘুরে বেড়ানো, নানা জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এসব তাঁর চোখে দোষের জিনিস কি না, যেটা আমার নিজের কাছেই অনুচিত বলে মনে হতে শুরু করেছে। তিনি জানালেন, না, তা নয়। সুতরাং সেই সন্ধ্যাতেই আমি বসুদের জানালাম, আমি শুক্রবার-শুক্রবার আসতে থাকব, যদি তাঁরা চান।

৮ মে, মিস ম্যাকলাউডকে

স্বামীজীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলাম। তিনি পরিচিত মানুষদের চরিত্রের উপরে বিচিত্র আলোকপাত করছিলেন। তিনি একবার বলে উঠলেন, 'আহা! যদি তুমি বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতে!' তারপরে বললেন, ট্রাস্ট ডীডে (মঠের) সই হয়ে যাবে, এই সমস্ত জায়গায় তাঁর কোনো কিছুই থাকবে না, ভোটের অধিকার পর্যন্ত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম যেদিন দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বৃক্ষতলে বাস করার জন্য—সেইদিনের মতই তিনি মুক্ত।

'কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর সব দেশের সব কিছু ভাল আমার জন্য তোলা আছে; আমি তা পেয়েছি, ভবিষ্যতেও পাব'—পরিচিত দুষ্টুমিভরা ভঙ্গিতে তিনি যোগ করলেন।

তারপর তিনি বললেন, তাঁর বয়স যখন ১৩ তখন তিনি টমাস আ কেম্পিসের একখণ্ড বই পান, যার ভূমিকায় লেখককৃত সন্ন্যাসী মঠ ও তার সংগঠনের বিবরণ ছিল। বইয়ের সেই অংশটির আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল অফুরন্ত, 'যদিও কখনো ভাবিনি সেই জাতীয় কাজ ভবিষ্যতে আমাদেরই একদিন করতে হবে।' "টমাস কেম্পিসকে আমি ভালবাসি তুমি জানো, সেটি এবং গীতার প্রায় সবটুকু অংশ আমার কণ্ঠস্থ,—আমার দুটি প্রিয় পুস্তক,—কিন্তু বক্তৃতাগুলির মূল্য ঐ ভূমিকার বাইরে আমার কাছে বিশেষ কিছু নয়। আহা, যদি তারা শুধু জানাত, যীশুর খাদ্য পানীয় কি ছিল, তিনি কোথায় থাকতেন, ঘুমোতেন, কিভাবে তাঁর দিন কাটত, —তাঁর মুখে বসানো ঐসব বক্তৃতার বদলে! ঐ লম্বা লম্বা ভাষণ! আরে, ধর্মের মূল কথা-কয়টা আঙুলে গোনা যায়। তত্ত্বকথা নয়—মানুষটাই আসল—মানুষটা বেরিয়ে এলেই হল! কুয়াশা মুঠিতে ধরলে—ক্রমে তা মানুষের আকারে গঠিত হয়ে উঠল। মুক্তি নিজস্ব ভাবে কিছু নয়, ওটা মানুষের অভীপ্সার রূপ; মানুষেরই অভীপ্সা বলে স্বাধীনতা বা ঐ জাতীয় জিনিসের মূল্য। মানুষের মধ্যেই তার জাগরণ। সব কিছুই মানুষ।" এখন আমার মনে পড়ছে এসব কথা বলার আগে তিনি বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণের উক্তি নয়, রামকৃষ্ণের সঙ্গে যে-জীবন তাঁরা যাপন করেছিলেন, তারই প্রয়োজন,—সে জিনিস এখনো লেখা হয়নি।" এ পৃথিবী শেষ-পর্যন্ত কতকগুলি ধারাবাহিক ছবি, 'মানুষ তৈরী' যার মধ্যে সদা-বর্তমান লক্ষ্য।

আমরা মানুষের গড়ে ওঠা দেখে যাচ্ছি—শুধু তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বুড়োদের সরিয়ে দিয়ে তরুণদের নিতেন শিষ্যরূপে।*............

বুধবার। বরাহনগর থেকে গাড়িতে সোজা বাড়ি না ফিরে আমরা গেলাম দক্ষিণেশ্বরে। এ পর্যন্ত ভূমিপথে আমি দক্ষিণেশ্বর যাইনি। অপূর্ব। গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। স্বামীজী অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঝড়ো রাত্রি—বাতাসের গোঙানি, জলের ফুঁপিয়ে কান্না। মিসেস রায়কে (সরলা রায়, পি. কে. রায়ের স্ত্রী) দেবার জন্য একটি পত্র সংগ্রহ করতে গেলাম—তিনটি ছোট পাতা জোগাড় হল। তারপর স্বামীজী এসে তোমার জন্য দুটি এবং মিসেস বুলের জন্য দুটি পাতা দিলেন। বহু পরে আমার মাথায় লাগল—আমরা সাতটি পাতা সংগ্রহ করেছি।

৭ জুন, মিস ম্যাকলাউডকে

আত্মনির্ভরতার জন্য স্বামীজী মঠে ব্যবসায়িক উৎপাদনের কথা বলছিলেন। জ্যাম-তৈরীর ভার আমাদের মেয়েদের উপর পড়বার কথা হচ্ছে। চমৎকার লাগছে পরিকল্পনাটা। কাঁচা আমের জ্যাম যে কী সুস্বাদু সে তুমি ভাবতেও পারো না। অবশ্য বাঙালী চাটনির কথা তুমি জানো। আমরা নিশ্চয় ও কাজ পারব। এর ফলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের প্রসারও ঘটবে। সব কিছু মেয়েরা চালাবে—ভেবে দ্যাখো ব্যাপারটা! অবশ্য খুব সামান্যভাবে আরম্ভ করব। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরা উপার্জন করে নেবার জন্য আমি মরীয়া।

[জ্যাম বা চাটনি তৈরীর ব্যাপারটা নিবেদিতা খুবই মনোযোগের সঙ্গে

---

* টমাস আ কেম্পিস কর্তৃক রচিত বলে অনুমিত Imitation of Christ নামক বইটি স্বামীজীর কাছে আকৈশোর প্রিয় বস্তু। তিনি "১২৯৬ সালে অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে...'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।" অনুবাদের ভূমিকায় স্বামীজী যা লিখেছিলেন তার কয়েক লাইন—'খ্রীষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোনো রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর লিখিত,—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিত বিন্দুতে মুদ্রিত।...তিনি এই পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন? যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের সমুদয় মানসম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরবর্তী লোকেরা অনুমান করিয়া টমাস আ কেম্পিস নামক একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন। কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'

এই লেখার সময়ে স্বামীজীর বয়স ২৭। জ্বলন্ত বৈরাগ্য তখন তাঁর। তিনি বইটির 'দীনতা, আর্তি ও দাস্যভক্তির', 'জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবের', প্রভৃত স্তুতি করেছেন। গ্রন্থটির মধ্যে 'গীতায় ভগবদুক্ত সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি' দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু স্বামীজীর পরবর্তী উক্তি অনুযায়ী তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল ভূমিকাটি, যাতে সন্ন্যাসী-সংঘ গঠনের বিবরণ অংশটি আছে। যুবক নরেন্দ্রনাথ অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে দাস্যভাবের মূল্য স্বীকার করলেও, নিজ জীবনে যে দাস্যভাবাশ্রিত সাধনাকে গ্রহণ করেননি, তা আমরা জানি। সুতরাং তিনি পরবর্তীকালে নিবেদিতার কাছে নিজ ধর্মজীবনে খ্রীষ্টীয় প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেননি, যদিও সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে কেম্পিসের গ্রন্থের প্রভাব স্বীকার্য। এই সঙ্গে নিশ্চয় যোগ করতে হবে—এক্ষেত্রে তাঁর মনের পিছনে বৌদ্ধ সংঘের কাহিনী কম প্রেরণা যোগায়নি।

নিয়েছিলেন। যে শিক্ষানীতি তিনি এদেশে প্রবর্তন করতে চাইছিলেন, তার মধ্যে শিক্ষাকালে স্বাবলম্বন ব্যাপারটা ছিল। স্বামীজীর প্রস্তাবটিকে নিবেদিতা এমনই গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিয়ে কার্যকর করার চেষ্টা করছিলেন যে সেটা স্বামীজীর কাছে কৌতুকের বিষয় হয়ে ওঠে। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-এর চিঠিতে স্বামীজী প্যারিসে লেগেট-ভবনে 'খেয়ালীদের কংগ্রেসের' বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে অনেকগুলি নামকরা লোকের 'খেয়াল' নিয়ে তামাশা করা আছে। তার মধ্যে দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, জনৈক সূর্যোপাসক ধার্মিক ব্যক্তি, জনৈক স্কচ প্রতিনিধি (সম্ভবত প্যাট্রিক গেডেস), নিবেদিতা ছিলেন। 'বিশ্বসমস্যার সমাধানই' ছিল আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকেই নিজ মত বা নিজ গুরুর মত উপস্থিত করেছিলেন, এবং বাকি সকলেই তার প্রতিবাদ করেছেন। সমস্যার সমাধানের আলোচনা যখন ঘনীভূত এবং উত্তপ্ত, তখন—

"'চাটনিই সেই বস্তু'—দরজার কাছ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমরা সকলে পিছনে তাকালাম। দেখি মার্গট। 'তা হল চাটনি'—মার্গট বললেন, 'চাটনি এবং কালীই জীবনের সর্বদুঃখ নিবারণ করবে; তা সকল মন্দকে গিলতে এবং সকল ভালকে চেখে উপভোগ করতে সাহায্য করবে।' বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, সজোরে জানালেন, তিনি আর একটি কথাও মুখ থেকে বার করবেন না, কারণ বক্তৃতাকালে সমবেত শ্রোতাদের মধ্য থেকে জনৈক পুরুষ-জীবের দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ছিল, এবং মহিলার প্রাপ্য মনোযোগ মহিলাকে দিচ্ছিল না, এবং মার্গট যদিও ব্যক্তিগতভাবে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, তথাপি তিনি ঐ বিরক্তিকর লোকটির নারীজাতির প্রতি যথাবিহিত সৌজন্যের অভাবের কারণ জানতে চান। তখন সকলে জানালেন, তাঁরা মার্গটকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন, সর্বোপরি দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার, কিন্তু বৃথা চেষ্টা; এই ভয়াবহ জনতার সঙ্গে মার্গটের আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না,—মার্গট বসে পড়লেন।"

একটি চমৎকার কৌতুক-নক্‌শা। বিবেকানন্দ, নিবেদিতার দুটি বাতিক নিয়ে মজা করেছেন, যে দুটি তাঁরই দান—চাটনি এবং কালী। এদের নিয়ে রসিকতায় তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না, যেহেতু বিবেকানন্দের 'চাটনি' যে কোনো বিরসকে সরস করতে সমর্থ এবং বিবেকানন্দের কালী রস ও রসিকসহ সর্বগ্রাসী। নিবেদিতা প্রথম জীবনে লণ্ডনে নারীর অধিকারের পক্ষে উৎসাহী কর্মী ছিলেন, তার উপরও সকৌতুক খোঁচা—সে খোঁচা তীক্ষ্ণতর যখন তিনি সমানাধিকারবাদীদের বক্তব্য ও আচরণের অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করেছেন। বিবেকানন্দ দেখেছেন এবং বলেছেনও বহুবার—পাশ্চাত্তে একদিকে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার, অন্যদিকে নারীর প্রতি শিভল্‌রির বাড়াবাড়ি—এ দুটো জিনিসের মধ্যে কোনই সঙ্গতি নেই।]

১৮ জুন, মিস ম্যাকলাউডকে

এই সপ্তাহের এক সকালে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি প্রগতি সম্বন্ধে আমার ধারণার উদ্ভটতা সম্পর্কে বললেন। সেই সঙ্গে যোগ করলেন—

প্রাণপণে কাজ করে যাও—'ক্লান্ত হয়ে ওঠার জন্য।' 'অন্ধ মৃত্যুপ্রেমিক হও, মার্গট',—তিনি বলে চললেন। গৌরবময় উক্তি, নয়কি?

[অসুখের ধাক্কা খানিক সামলে স্বামীজী ১৮৯৯-এর ২০শে জুন ইউরোপ ও আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ পাশ্চাত্ত্য যাত্রা। যাত্রার কারণ অনেকগুলি : প্রথমত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আন্তর্জাতিক ধর্ম-কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ, দ্বিতীয়ত ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারবাসনা, শেষত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, এই দুই ভূখণ্ডের উপরে যে প্রাচ্য-বিবেকানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তাঁর শেষ সম্ভাষণ জানাতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যকে। তাঁর এই যাত্রায় ইংলণ্ড পর্যন্ত জাহাজে ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। তুরীয়ানন্দকে নিয়ে যাচ্ছিলেন আমেরিকায় প্রচারের কাজে রেখে আসতে, নিবেদিতা যাচ্ছিলেন ভারতীয় কাজের জন্য ইউরোপে অর্থসংগ্রহ করতে, এবং সম্ভবক্ষেত্রে ভারত-সম্পর্কে আমেরিকার ভ্রান্তি দূর করতে।

২০শে জুন থেকে ৩১শে জুলাই, ১৮৯৯—এই দেড় মাসের সমুদ্রযাত্রাকে নিবেদিতা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল বলেছেন। এমন বলার কারণ, এই সময়েই সর্বপ্রথম তিনি ধারাবাহিকভাবে স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পান, এবং আলমোড়ায় তীব্র মানসিক সংঘর্ষের পরে, মিস ম্যাকলাউডের কথায় বুঝতে পারেন, স্বামীজীর মত উদ্দীপিত মানুষকে তর্কে ব্যাপৃত রাখা নির্বুদ্ধিতা; একমাত্র উচিত কাজ ঐ অগ্নি কখন জ্বলে ওঠে, তার জন্য প্রতীক্ষা করা, জ্বলে ওঠার উপযোগী পরিবেশ রচনা করা, এবং জ্বলে উঠলে তার আলো ও উত্তাপটুকু গ্রহণ করা। এই মানসিক সংস্থিতি লাভ করার জন্য নিবেদিতার পক্ষে এই দেড়মাস স্বামীজীকে স্বরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া দুই মহাদেশের মধ্যবর্তী সমুদ্রের উপরে ভাসমান বিবেকানন্দ বহু চিন্তা ও যন্ত্রণার থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়েছিলেন বলে তাঁর অব্যাহত প্রকাশও সম্ভব হয়েছিল।

এই ভ্রমণের ফলশ্রুতি বিষয়ে নিবেদিতা The Master-এর মধ্যে লিখেছেন :

"ছয় সপ্তাহের এই ভ্রমণের দিকে যখন ফিরে তাকাই, দেখি যে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা তা। স্বামীজীর সঙ্গলাভের সম্ভাব্য কোনো সুযোগই আমি ছাড়িনি, অন্য সঙ্গ প্রায় এড়িয়ে চলতাম।...এইভাবে আমি তাঁর মন ও ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন পরিচয়লাভের যে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম—তার জন্য কোনো কৃতজ্ঞতাই বড় কথা নয়।

এই সমুদ্রযাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরাম ভাবপ্রবাহ এবং কাহিনীপ্রবাহ। কেউই জানত না কখন সহসা স্বামীজীর উপলব্ধির দ্বার খুলে যাবে, এবং নূতন সত্যের ঘোষণা জ্বলে উঠবে কণ্ঠে।"

The Master গ্রন্থে 'গুরুর সঙ্গে অর্ধপৃথিবী অতিক্রম' অধ্যায়ে নিবেদিতা এই ভ্রমণের অতুলনীয় বিবরণ লিখেছেন; স্বামীজী কোন্ ভাবে ও কাহিনীর মধ্যে ডুবে থাকতেন, তার সারমর্মও দিয়েছেন। মহাকালী ও মৃত্যুপূজার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের কথাও সেখানে পাই। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে নিবেদিতার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল 'মানবের' প্রতি স্বামীজীর অখণ্ড শ্রদ্ধার রূপ।

সেই 'মানব' কতকগুলি অধিকার ও স্বার্থকামনায় বড় নয়, বড় তার আত্মিক শক্তিতে। 'সারা পৃথিবীর চোখে **সতী** বড় কেন, কারণ সে ইচ্ছাশক্তির মূর্তি।' এই মানুষের বিকাশ যেখানে বিরাট, সেই বিরাটত্বই তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছিল—'হাঁ, যত বয়স বাড়ছে, ততই দেখছি সব কিছু আছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বাণী। যদি পাপ কিছু কর—পুরুষের মত কর। যদি পার বদমাশ হও—কিন্তু বড় আকারে!' স্বামীজী বলেছিলেন, বড় যে হবে, তাকে সহ্য করতেই হবে। প্রতিটি কামনার আনন্দ তার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—এই দেখাই তার নিয়তি। সারা জীবনের গান আসলে শেষের গান। এর মধ্যে মনুষ্যত্বমহিমা রূপ দেখে স্বামীজী বলেছিলেন : 'সিংহের মর্মে গিয়ে যখন আঘাত লাগে—তখনি সে প্রচণ্ডতম গর্জন করে, কেউটের মাথায় ঘা পড়লে সে হিস্ করে ফণা ধরে, আর মানুষ যখন হৃদয়ের গভীরে আহত হয়, তখনি তার আত্মার মহিমা মাথা তোলে।'

নিবেদিতা স্বামীজীর মানবপ্রীতির বিষয়ে সংহত আকারে বলেছেন—'সর্বোপরি মানবের পক্ষসমর্থন! কখনো পরিত্যক্ত হয়নি, কখনো দুর্বল হয়নি সে সমর্থন—সর্বদা উত্থিত হয়েছে অরক্ষিতের পক্ষে নূতন সংগ্রামে, দুর্বলের পক্ষে মহান বীরত্বে। আচার্য আমাদের এসেছিলেন, এবং চলেও গিয়েছেন; তাঁর পরিচিতজনদের মধ্যে যে অমর স্মৃতি রেখে গেছেন, তার মধ্যে মানবের প্রতি তাঁর ভালবাসার তুলনায় বড় আর কিছু নয়।'

এই যাত্রাকালে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার নানা প্রসঙ্গ The Master গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নিবেদিতা সেখানে স্বামীজীর একান্ত মূর্তি অনেকটা আবৃত রেখেছেন। সেই নিঃসঙ্গ বিরাটের উপরে চকিত আলোকপাত করেছেন তাঁর পত্রে। সেই পত্রগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃত হচ্ছে—]

২৮ জুন, মিস ম্যাকলাউডকে

মাদ্রাজে ব্যাপারটা বিশেষ উদ্দীপনাময়। দলে দলে লোক, গভর্নরের কাছে তাদের আবেদন, যাতে স্বামীজীকে তীরে নামতে দেয়। কিন্তু প্লেগ আইন বলবৎ, সুতরাং আমাদের জাহাজে আটক থাকতে হল। তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, কেননা সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর উন্নতি আকাশ-ছোঁয়া বলতে গেলে। উল্টোদিকে এক দিনের জনসংঘট্ট ও বক্তৃতাদি তাঁকে তাঁর বর্তমান দারুণ ভালো অবস্থা থেকে শ্রান্তির নিম্নতম গহ্বরে টেনে নামাত। নৌকা বোঝাই করে যারা জাহাজের ধারে হাজির হয়েছিল, তাদের উপহার নেওয়া, তাদের সঙ্গে সারাদিন কথা বলাতেই যথেষ্ট মন্দ ঘটেছিল।

মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা জাহাজে উঠলেন, স্বামীজীর সঙ্গে কলম্বো যাবেন বলে। ফলে রাজা সারা সময়ে ক্যাবিনে প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন। ওঁরা তিনজন (স্বামীজী, তুরীয়ানন্দ ও আলাসিঙ্গা) একত্রে আহারাদি করেন; সুতরাং আমি টেবিলে একলাই বসছি এবং অন্য লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টায় আছি। সমুদ্রযাত্রাকে জাতিসমস্যার প্রকৃতি নির্ণয়ে লাগাবার এই সুযোগ আমার আকাঙ্ক্ষিত—একথা কি তোমাকে বলেছি? সমস্ত সময়ে ব্যাপারটার মজা খুব উপভোগ করছি। গৈরিক ও অন্যান্য রঙের পোষাক-পরা এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল আমাদের বিদায়

সম্ভাষণ জানাতে এবং স্বামীজী যেসব মালা বা তোড়া বাতিল করেছিলেন সেগুলি পরতে বা নিতে এতই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম যে, আমরা কারা তা বুঝতে গোড়া থেকেই কারো কোনো অসুবিধা হয়নি। এই ব্যাপারটিকে আমার বিরুদ্ধে কেউ মনে রেখেছিল কিনা জানি না। প্রথম দিন-দুই স্বামীজী আমাকে খুবই সময় দিয়েছেন। যখনি কোনো লোক আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে, আমি মতলব করে আলাপের গতি তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি যে তাঁরই পতাকার তলবর্তী তা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়। অবিলম্বে দেখছি, **প্রতিটি মহিলা** আমার সঙ্গে জানাশোনা করে নিয়েছে আমার গুটিয়ে থাকা সত্ত্বেও। ফলে যুদ্ধে জয় হয়ে গেছে। বর্তমানে যথেষ্টসংখ্যক পুরুষ একের পর এক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারপরেই যদি "জনৈক নেটিভ" অপরদিকে এসে হাজির হয়, তৎক্ষণাৎ সরে পড়েছে।...তবে এ'রা সংখ্যায় কম। অন্যান্যরা কথাবার্তা বলতে থাকে, এবং যাবার আগে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করে যায়।

একে ইংরেজদের পক্ষে খুব গৌরবজনক আচরণ বলি না, তবে একেবারে পাষণ্ডোচিত নয়—কি বল? আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করছি। এখানে বলা উচিত, এই রুটে যারা যাতায়াত করে, তারা খুব বিশিষ্ট কিছু মানুষ নয়; তবে যে-মানুষটি এই সদ্য আমার 'দলে' প্রবেশ করেছেন, তিনি চমৎকার ব্যক্তি, শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুইনবার্ন ও রসেটীর ভক্ত, আমার প্রিয় ছবি বা কবিতা বা বইগুলি পছন্দ করেন। স্বামীজী এসে হাজির হলে তাঁর বিষয়ে এ'র মনোভাব কি হবে জানি না, আমি পরোয়া করি না, কেননা তাঁকে বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে না; আর দেখতে পাচ্ছি জাহাজের অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্কে এ'র বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। এইসব জানাশোনার মূল্য কি? ঠিক বলতে পারি না। আমি তো সারা ভারতের সব কিছু ব্যাপারকে ঠিক পথে চালাতে পারব না, তবু মনে হয়, যদি ৩০-৪০টি তরুণ ব্যক্তিও একমাসের সমুদ্রযাত্রার মধ্যে ভারত সম্বন্ধে সহজ প্রত্যক্ষ বুদ্ধিলাভ করে, যদি তারা স্বামীজীর পাদমূলে বসে আলোকের আকাঙ্ক্ষা বোধ করে—মূল্য তার অপরিসীম। তবু হায়—জাতিপার্থক্য একটা বিরাট বাধাক্ষেত্র।

আমরা তিন মহিলা জাহাজে, তার মধ্যে একজন আমেরিকান মিশনারীর পত্নী, স্বামীসহ যাচ্ছেন, সঙ্গে চারটি শিশু। তারা আমাকে তেমন বন্ধুভাবে দেখে না। কি করি, বেচারা, বড়ই দারিদ্র্যগ্রস্ত; সকরুণ অবস্থা; তাহলেও ওরই মধ্যে প্রাণে স্ফূর্তিও আছে; কিন্তু এত অসুস্থ চেহারা আর এতগুলি সন্তান—মোটেই ভাল নয় তাদের পক্ষে। ছেলেগুলিকে এখনি কিসব ভয়াবহ কথা বলতে শুরু করবে তারা, ভাবছি তাই। ওদের প্রতি কিছুটা স্নেহ বোধ না করে পারিনি, যদিও দূরে থাকতেই চেষ্টা করি, সতর্কতা হিসেবে। 'বোগেশ'—ওদের নাম,... ওঁরা পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় যাচ্ছেন।*

---

* স্বামীজী এই বোগেশ-পরিবারের মনোরম কথাচিত্র এ'কেছেন, বিদ্রূপে ও অনুকম্পায় মিশিয়ে:

"জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটি আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম

এখন পূর্ব সিংহলের বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়ছে। একটা গোটা লীলাচ্ছবি দর্শন করছি। প্রাতরাশের আগে বসন্ত বায়ুর মধুর গন্ধের ছোঁয়া পেলাম। অবশ্য একমাত্র রাজাই স্বীকার করেছেন, আমার ভুল হয়নি।

গঙ্গায় জাহাজে ওঠার পরে তাঁর উচ্চকণ্ঠ উক্তির কথা তোমাকে বলেছি : "আড়াই বছরের কী বিরাট যন্ত্রণাভার নামিয়ে এলাম পিছনে এখন!' এসব কথা তোমাকে বলিনি কারণ এদের সুগভীর পবিত্রতার স্বরূপটি তোমার কাছে গোচর করার মত শক্তি আমার ছিল না; তিনি নিজের জননীর কথা কিভাবে বলেছিলেন, যে দারুণ যন্ত্রণা মাকে দিয়েছেন তার কথা; এবার ফিরে এসে বাকি জীবন তাঁরই সেবায় উৎসর্গ করবেন—এই প্রতিজ্ঞার কথা। তিনি আর্তচীৎকারে বলেছিলেন, 'দেখতে পাচ্ছ না, এখনই আমার খাঁটি বৈরাগ্য এসেছে! যদি পারতাম অতীত জীবনকে বদলে দিতাম। আর কোনো কারণে নয়—শুধু মাকে খুশী করার জন্য বিয়ে করতাম যদি আমার বয়স দশ বছর কম থাকত! এই সমস্ত বৎসরগুলিতে কেন যন্ত্রণা পেয়েছি?—উচ্চাশার উন্মাদ তাড়না—কিন্তু না না,'—সহসা আত্মসমর্থনের ব্যাকুলতায়—'আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই, খ্যাতি আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'সেকথা নিশ্চয় ঠিক স্বামীজী!' আমি বললাম, 'ও ক্ষুদ্রতার কণামাত্র আপনার মধ্যে নেই; কিন্তু আমি বিশেষ খুশী যে আপনার বয়স দশবছর কম নয়।' এই কথায় আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

প্রিয় য়ুম, এইসব বিষয়ে যদি কোনো অধীর উক্তি করে থাকি পূর্বে, তুমি সে বিষয়ে একেবারে ভুলে যাবে। সর্বত্রব্যাপ্ত বিশাল এই প্রেমের প্রতি সম্ভ্রমে আমার চিত্ত এখন পূর্ণ। এসব কথা তুমি বুঝবে, আমার চিন্তার বিষয় এগুলি নয়, মন্তব্য করার অধিকারও নেই। কিন্তু তাঁকে প্রায় মেরে ফেলা হচ্ছিল। তিনি যে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন—এর জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা। নিজেকে বলি দেওয়া খুবই বড় ব্যাপার, কিন্তু তার সচেতন উদ্দেশ্য হয়ত ভ্রান্ত, কে জানে!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর অন্য মূর্তিও দেখলাম। তীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—আর একটি মানুষের জীবনের ও সাধনার ন্যাসরক্ষক—

বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; ছেলেমেয়েতে ৬টি সন্তান; চাকররা বলে, খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধহয়। একখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলে-পিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কে'দেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার জো নেই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাত্নিণী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চারঘণ্টা বসে থাকে। তোমার ইউরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি—বলে কি অসভ্য! আর জড়ামড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও! যা হোক প্রোটেস্টান্ট ধর্মে উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী-পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বে'চে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি!

...টুটুল বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্ছে, মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটুলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে।...বোগেশের একটি এ'ড়ে-লাগা ছেলের বড় অযত্ন। বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের উপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে করে সুরুয়া খাইয়ে যায়, আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, 'কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!' (পরিব্রাজক)

অভিভাবক তিনি। 'যদি কেউ—কোনো পুরুষ বা নারী—আমাদের অর্থাৎ রামকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে কোনো নারীর আমদানী করে, তাহলে তাকে, সেই অপরাধীকে, তরবারি হস্তে নিজে সংহার করব।'*

---

* সন্ন্যাস নিয়ে, সংসার ত্যাগ করে মায়ের প্রতি অবিচার করেছেন, স্বামীজীর মনে এই বেদনা চিরজাগরুক ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-আদিষ্ট কাজের উন্মাদনায় যতদিন তিনি ছিলেন—আমেরিকায় গমন ও প্রথম প্রচার-সাফল্য, ভারতীয় কাজের সংগঠন ইত্যাদি কালে তিনি স্বভাবতই উন্মাদনায় ছিলেন,—ততদিন মায়ের প্রতি অবিচারের জ্বালা চাপা ছিল অনেকটা, যদিও সম্পূর্ণ যায়নি। খেতড়ির মহারাজাকে স্বামীজী তাঁর কাজের প্রধান সহায় মনে করতেন, তা এইজন্য নয় যে, খেতড়ি নিবেদিতাদির মত তাঁর কাজে সাহায্য করেছেন, কিংবা ওলি বুলদের মত টাকা দিয়েছেন—তার মূলে আছে, খেতড়ি তাঁর মা ও ভাইদের পালনের আর্থিক দায়িত্ব তুলে নেওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত মনে ধর্মের ও মানবতার কর্মভার তুলে নিতে পেরেছিলেন। আমেরিকাতেও মায়ের কথা কখনো ভুলে যাননি, অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর বিষয়ে আবেগভরে বলেছেন, এবং প্রতাপ মজুমদার যখন কলকাতায় তাঁর নামে কুৎসা করতে থাকেন, তখন তাঁর সর্বাধিক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঐসব অসার কথা মায়ের কানেও উঠবে, 'যিনি তাঁর সেরা ছেলেটিকে দেশ ও ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন—সেই পুত্র বিদেশে জঘন্য নীতিহীন জীবন যাপন করছে—এই কথা তাঁর বুক ভেঙে দেবে।' আমেরিকা থেকে ফেরার পরে আবার মায়ের দুঃখ ও কান্না তাঁকে বিচলিত করে তুলল। আমরা ধরে নিতে পারি, বাঙালী মায়ের মতই এই মাও দত্ত বংশের ধারালোপের আশঙ্কায় নিত্য আর্তনাদ করেছেন স্বামীজীর কাছে। মাকে শান্ত করার জন্য স্বামীজী তখন একেবারে অস্থির। শ্রীবেণীচরণ শর্মা স্বামীজীর যে অপ্রকাশিত চিঠি ছাপিয়েছেন, তাতে দেখতে পাই, স্বামীজী নিজের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছেন। এর পিছনে মায়ের তাগিদ, দত্ত বংশধারা (যে বংশে দুর্গাচরণ দত্ত, বা নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়েছে) অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং হয়ত মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথকে মনের দিক থেকে অধিকতর বিবাহযোগ্য বলে বোধ করা—এইসব কারণ থাকতে পারে।

মাতৃঋণ ও বংশের প্রতি ঋণ বোধহয় সন্ন্যাসীকেও স্বীকার করতে হয়। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি বংশের প্রতি ঋণ শোধের কথা ভেবেছিলেন, আর মাতৃঋণ শোধ করার জন্য অভ্যস্ত রাজকীয়তা পর্যন্ত ত্যাগ করে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরেছিলেন। ১৮৯৮-এর ২২শে নভেম্বর খেতড়ির মহারাজার কাছে অতি দীনভাবে অর্থভিক্ষা করে যে পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটু অংশ—"আমার মায়ের প্রতি আমি শোচনীয় অবহেলা দেখিয়েছি। তদুপরি আমার দ্বিতীয় ভাই চলে গেছে। মা দুঃখে বিপর্যস্ত। আমার শেষ ইচ্ছা কয়েক বছর অন্তত মার সেবা করা। মার সঙ্গে আমি বাস করতে চাই। ছোট-ভাইয়ের বিয়ে দিতেও চাই যাতে বংশধারা থেমে না যায়। এর ফলে মায়ের ও আমার শেষ দিনগুলি সহজ হয়ে উঠবে। মা এখন থাকেন চালাঘরে। তাঁর জন্য ছোট পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ি তৈরী করার ইচ্ছা, আর ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু রেখে যাওয়া, কেননা সে যে কোনোদিন ভাল কিছু রোজগার করবে, মনে হয় না।...আমি ক্লান্ত, ভগ্নহৃদয়, মৃত্যু-পথযাত্রী। বিশেষ প্রার্থনা জানাই, এই শেষ ইচ্ছাটি আপনি পূরণ করুন, আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহই দেখিয়েছেন, এই সহৃদয়তার কাজটি আপনার মহান ও উদার হৃদয়ের যোগ্য হবে। যদি করেন, তাহলে আমার শেষের দিনগুলি নিশ্চিন্ত সহজ হয়ে উঠবে...।'

খেতড়ির রাজার কাছে স্বামীজীর ইচ্ছা আদেশতুল্য। তিনি অবিলম্বে বাড়ি তৈরীর সম্ভাব্য খরচ এবং পরিবারপালনের খরচের পরিমাণ জানতে চাইলেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে স্বামীজী লিখলেন, 'পৃথিবীতে আজ আমি যা হয়ে উঠেছি, সে আপনারই সাহায্যের জন্য। আপনিই আমাকে দারুণ মনস্তাপ থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীর সামনে পাঠিয়েছিলেন কিছু কাজ করার জন্য। কে জানে, মনের এই ভার মোচন করে আপনি হয়ত আমাকে আরও বড় কোনো কাজের জন্য পাঠাতে বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন।'

নিজের পরিবারের প্রতি অবহেলিত দায়িত্বের জন্য বিক্ষত হৃদয় স্বামীজী ১৮৯৯, ১২ ডিসেম্বর মিসেস ওলি বুলকে লিখেছেন—'বহু বৎসর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম,

তুমি যেমন বলেছ ঠিকই তাই, সত্যই তিনি জানেন না তাঁর সামনে কি আছে! আমাদের যাত্রার আগে একদিন শ্রীমায়ের বসার ঘরে আমরা মধ্যাহ্ন আহার করছিলাম। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কবে ফিরব? আমি যথারীতি উত্তর দিলাম। 'ধর তুমি দু' বছরের মধ্যে ফিরলেই না'—তিনি নীচুস্বরে বললেন।

'কিন্তু স্বামীজী, ঐ সময়ের পূর্বেই আপনি আমাকে নিশ্চয়ই ভারতে ফেরৎ পাঠাবেন,'—ভাবী কাজের আলোচনাকালে অন্য একদিন বললাম।

'না না'—চমকে তিনি বললেন, ভয়-পাওয়া ছোট ছেলের মত, 'আমি এবার বাইরে বেশী দিন থাকবই না, আর তো আমার টাকা রোজগারের ক্ষমতা নেই।' তারপরে তাঁর সর্বশান্তি যেখানে সেখানেই ফিরে গেলেন—'মার্গট, এসব ব্যাপার নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে; মনে রেখো, মা-ই সব জানেন।'

আমার শিক্ষা আমি পেয়েছি; স্রোতের উপরে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যেতে শিখেছি। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই সাধ্যমত সকলকে জুটিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে, যাতে করে আমি লিখে, বক্তৃতা করে এবং ভিক্ষা করে তাঁর জন্য যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারি। তিনি যথেচ্ছ খরচ করবেন—যদি আমার মহাভাগ্যে তাঁকে তা করতে দিতে পারি! মধুময় রাজা! ওগো যুম, যদি এক্ষেত্রে তাঁর সামান্য সাহায্যেও আসতে পারি তাহলে আর কিছু চাই না। তোমার মিসেস স্কটের কথা আমি তাঁকে বলেছি, তারপর থেকে তিনি ধরে নিয়েছেন আমি আমেরিকা যাচ্ছি। নিম-এর (নিবেদিতার বোন) বিয়ের পরে তাঁকে অনুসরণ করব আমেরিকায়—এ-ই পরিকল্পনা। ব্যাপারটা চমৎকার। তিনি বললেন, আমেরিকা অবধি তাঁর সঙ্গে আমার ভ্রমণ করা চলবে না—কেননা মিশনারীগণ আমাকে কদর্যভাবে আক্রমণ করতে পারে। বুঝে দেখ, রাজারও সাংসারিক বুদ্ধি জেগেছে!...

তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—অবশেষে আমার দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়েছে, তাঁকে পূজা করতে পেরেছি ফুল দিয়ে। গোলাপ এনে দিয়েছিল একজন, সেগুলিকে তাঁর পায়ের উপরে রাখার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন—তারপর আশীর্বাদ করলেন।...

ঘণ্টাখানেক তিনি ছিলেন, এখনই। কথায় কথায় প্রেমের প্রশ্ন উপস্থিত হল।

ইংরাজ পত্নী ও বাঙালী পত্নীর ভক্তি।

তাদের নিঃশব্দ যন্ত্রণাবহন, যদি প্রয়োজন হয়।

অশ্রুসমুদ্রে তরঙ্গায়িত মানবিক প্রেমের উপরে আনন্দের ও কবিতার ক্ষণকিরণপাত।

আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা করল, সে-সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছল, আমার সেই দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সেই দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য-ভিক্ষা করতে আমাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।...শান্তি আমি চেয়েছি, কিন্তু ভক্তির আধার আমার হৃদয় তা থেকে বঞ্চিত করেছে আমায়। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম। তাই যখন আমার নিয়তি, তবে তাই হোক!"

১৯০০ খৃীষ্টাব্দের ২৫শে অগস্ট নিবেদিতাকে লিখলেন—'এবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়দের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর আগে যা ত্যাগ করেছিলাম, আনন্দের সঙ্গে আবার তা ঘাড়ে নিলাম।'

কেবল বেদনাশ্রুই অধ্যাত্মদর্শন আনে, আনন্দাশ্রু নয়।

মুখাপেক্ষিতায় অসীম দুঃখ—শুধু স্বাধীনতাতেই সুখ।

মায়ের ভালবাসা বাদ দিয়ে প্রায় সকল ভালবাসাতেই এই বন্ধন। আত্মসুখের কামনা সেখানে—প্রেমপাত্রের সুখ লক্ষ্য নয়।

তিনি বললেন, আগামীকাল ধরা যাক তিনি মদ্যপ হয়ে দাঁড়ালেন, তাহলে কার ভালবাসার উপরে তিনি নির্ভর করবেন? শিষ্যদের ভালবাসার উপরে নয়—তারা আতঙ্কে পদাঘাত করে তাঁকে বিতাড়িত করবে। তিনি নির্ভর করবেন কয়েক-জন (সব কয়জন নয়) গুরুভাইয়ের ভালবাসার উপরে। তাদের কাছে তিনি চিরদিনই এক থাকবেন।

'আর মার্গট, মনে রেখো, যখন আধ ডজন লোক এমন ভালবাসার অধিকারী হয়, তখনই জন্ম হয় নতুন ধর্মের, তার আগে নয়। সেই নারীর কথা আমার সর্বদা মনে পড়ে, যিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে সমাধিভূমিতে দাঁড়াতেন আর একটি স্বর শুনতে পেতেন। তিনি মনে করতেন, বাগানের মালীর কণ্ঠস্বর। তারপর যীশু যখন তাঁকে স্পর্শ করলেন, তিনি শুধু বলতে পারলেন 'My Lord and my God', আমার প্রাণ, আমার ভগবান্। শুধু ঐ—My Lord and my God। ব্যক্তির অন্তর্ধান। দেহের স্তরে ভালবাসার শুরু—তখন জান্তব। তারপরে তা উন্নীত মনের বা বুদ্ধির স্তরে। পরিশেষে আধ্যাত্মিক ভূমিতে। শুধু সবশেষেই—My Lord and my God। ঐ রকম আধ ডজন শিষ্য দাও আমাকে—জগৎ জয় করে নেব।—আহা! রামকৃষ্ণ পরমহংস যদি একটা হারেম রাখতেন তাহলে তাঁর জন্য পৃথিবী কেড়ে আনতাম।

জুলাই ৫, মিস ম্যাকলাউডকে

এই স্বর্গীয় সমুদ্রযাত্রা এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ কলম্বো ছাড়ার পর থেকে শরীরের দিক দিয়ে আমার কাছে কিছুটা কষ্টকর হয়েছে। আবহাওয়া অতীব জঘন্য ছিল, যদিও যতটা মন্দ হবে ভেবেছিলাম, ততটা মন্দ হয়ে দাঁড়ায়নি। ভাগ্য ভাল থাকলে এডেনে পেঁছচ্ছি শুক্রবার, খুব দুর্বিপাক হলে শনিবার। রাজাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে। তাঁর ঘুম হচ্ছে ভালই। ধূমপান আর বরফজল খাওয়া প্রায় বন্ধ করেছেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটের মধ্যে ডুবে আছেন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ের জন্য অধীর। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ বা ওঠাপড়ায় তাঁর কোনই কষ্ট হচ্ছে না, বরং ভালই বোধ করছেন তাতে। আজ সকালে বললেন, 'ঘাড় থেকে বোঝা একেবারে নামিয়ে দিয়েছি।'

অসুবিধা সত্ত্বেও এমন সব মহাগৌরব মুহূর্ত আবির্ভূত হয়েছিল, যার জন্য যে-কেউ পঞ্চাশটি সমুদ্রঝড়ের মধ্য দিয়ে যেতে রাজি হবে। রাজপুতানা বা ভারতীয় কাহিনী দিয়ে শুরু, তাতে মাতোয়ারা; কিন্তু এখন বেশী সময় ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা। পুরনো উদাসীনতা খসে পড়েছে; আমাকে অনুভব করাতে চাইছেন, আমার উপরে সত্যই কোনো কোনো জিনিস নির্ভর করছে,—আমার মধ্যে কোনো শক্তির বিকাশ দেখার প্রত্যাশায় আছেন, ইত্যাদি। **সেই সব বিষয়** সাক্ষাতে তোমাকে বলব। আর সব সময়ে তাঁর সেই দাবিটি গাঢ়তর, গভীরতর হচ্ছে—'আমি বিশেষ অর্থে কালীর ছেলে।' আমার কাছে প্রতীয়মান সত্য যা—যা

দিবালোকের মত স্বচ্ছভাবে দেখছি—এ বিষয়ে তাঁকে যেন কখনো বলো না : 'কালীর সন্তান নয়—সাক্ষাৎ শিব। দেবদম্পতি!'

একটি মধুর সংবাদ তোমাকে অবশ্য করে লিখছি, ট্রাস্ট ডীড সই করা হয়নি। ......গতকাল তিনি আমাকে বললেন, সেটিকে তিনি নিয়ে এসেছেন মায়ের রক্ষা-কবচ হিসাবে, যেন মা বলতে চান, 'সব কিছু ছেড়ে দিলে নেবার মত লোক এখানে এখনো নেই; আরও অল্প কিছু সময় দায়িত্ব তোমাকে বহন করতেই হবে।' কিভাবে না বিরাট ও শক্তিশালী মানুষ চাইছেন শিষ্যরূপে! 'মানুষ চাই—আমার মানুষ চাই—দাও আমাকে',—বারবার বলছেন। 'তুমি জানো, আমি কখনো টাকা বা ক্ষমতা চাইনি—শুধু মানুষ চেয়েছি। আমার চাই-ই তাই।'

কালী বিষয়ে আমার নতুন অনুভূতি জেগেছে। কলকাতায় শেষ দিনে তা পেয়েছি যখন আমি রাজার সঙ্গে এক কালী প্রতিমার পাশে বসেছিলাম, যেটি সরিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করি।

শায়িত ঈশ্বরের আবিষ্ট দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখলাম, তা সত্যই দেবীর নয়নের সঙ্গে মিলিত, সদানন্দ যেকথা আমাকে বলেছেন, এবং তারপর দেখলাম, কিভাবে ব্যাপারটা জগন্মাতা সম্বন্ধে স্বামীজীর দর্শনের অনুরূপ। শুধু শিবের পক্ষেই ঈশ্বরসত্যকে ঐ মূর্তিতে দর্শনের সাহস করা সম্ভবপর, শুধু শিবই পদদলিত হয়েও ঐ প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ। বুঝতে পারছ সমস্ত ব্যাপারটা কত স্পষ্ট।......

কলম্বো সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। যথেষ্ট দেরীতে এবং অসুবিধার মধ্যে আমরা মাঝ দুপুরের পরে নৌকা থেকে অবতরণ করলাম। তারপর ক্রমান্বয়ে সমাদর ও সংবর্ধনা। শেষে জেটি থেকে গাড়ি চড়ে গিয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হল একটি বাড়িতে যার বাইরে ঢাক ঢোল ও বাঁশীর আয়োজন, ভিতরে ঠাসা লোক আর টেবিল-ভর্তি ফল। লোকের সীমা নেই। কী সতৃষ্ণ ভক্তিতে তারা স্বামীজীকে দেখছিল! কালো কালো মানুষ, অনাবৃত দেহ, আলোয় ঝক্ঝকে। তারপর গরম। কিন্তু তাদের যে-কারো জন্য আমি সবকিছু করতে পারতাম—স্বামীজীকে তারা যেভাবে দেখছিল—তার জন্য। স্বামীজী নিজের ইউরোপীয় পোষাকের দিকে দেখালেন—তাতে ব্যত্যয় হল না কিছুই। যে-কোনো রূপেই তিনি তাদের সেই একই অবতার। তারপর তিনি একটি ছোট ফলে কামড় দিলেন, এক গ্লাস দুধে চুমুক দিলেন (সেই সময়েও একই গ্লাস থেকে আমাকে ঢেলে দিতে ভুললেন না, পানের জন্য),[১]......তারপরে যখন যাবার জন্য চলতে শুরু

[১] বিবেকানন্দের কল্পনাতীত সাহস। আজকের ভারতবাসীকে এই সাহসের পরিমাণ বোঝানো সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সর্বসমক্ষে আহার! যিনি হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছেন!! ভারতের ঐকালীন সামাজিক আচারের বিষয়ে যাঁর কিছু জানা আছে, তিনিই বুঝবেন স্বামীজীর ভ্রূক্ষেপহীন শক্তির মহিমাকে। সোস্যাল রিফর্মাররা পর্যন্ত ম্লেচ্ছ সঙ্গে একত্র আহারে সন্ত্রস্ত ছিল।

আহারাদির ব্যাপারে গোঁড়ামি নিয়ে স্বামীজী কিরকম বাস্তব রসিকতা করতেন, তার নমুনা দিয়েছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বামি-শিষ্য সংবাদে'। স্বামী যোগানন্দ, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও নিবেদিতাসহ স্বামীজী আলিপুরে পশুশালা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুপারিনটেনডেন্ট রামব্রহ্ম সান্ন্যাল তাঁদের আপ্যায়ন করেন।—"তথায় চা ও

করলেন তখনকার আওয়াজ যদি শুনতে—'স্বামীজী কি জয়! পার্বতীপতি কি জয়!'—কান ফেটে যাবার জোগাড়। যখন বেরিয়ে এলাম সে কী জনতা—অবতরণের কালে। আমাদের প্রথম আতিথ্যদানকারী দম্পতি বিদায় দিতে এগিয়ে এলেন অগণ্য উপহারসহ; গৃহস্বামিনী লেডী কুমারস্বামী ইংরাজ মহিলা, তাঁর স্বামী মাদ্রাজী হিন্দু—চমৎকার মানুষ। যথেষ্ট ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সরকারের শাসনপরিষদের এই মাননীয় সদস্য সকলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনবার উচ্চকণ্ঠে শিবের জয় দিলেন, এবং তারপরে তিনবার—'স্বামী বিবেকানন্দ কি নমস্কার!'[২] জনতার উচ্চধ্বনির মধ্যে আমরা বোটে করে 'গোলকুণ্ডায়' ফিরে এলাম। জাহাজে উঠে, সেখানে পুনশ্চ অভ্যর্থিত হয়ে, নিজের ক্যাবিনে যখন ফিরে গেলাম, পরমানন্দে দেখলাম—আমার কপালে তখনো পূজার টিপ রয়েছে।

জুলাই ১৩, মিস ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী জগন্মাতা সম্বন্ধে একটা দারুণ বাংলা কবিতা লিখছেন, আর আমি সারা সকাল জনৈক সহৃদয় আমেরিকান মিশনারীর সঙ্গে ভারত বিষয়ে কথা বলছি।......

আর একটা ছোট্ট কথা—মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে এসে তিনি দেখলেন একজনের হাত দেখা হচ্ছে। যথারীতি তিনি নিজের হাত দেখাতে চাইলেন। সেই নিয়ে তাঁর কিছু মজা। স্বামীজী, আপনি যদি আমার হাত দেখে দেন—তাঁকে বললাম। স্বামীজী হেসে উঠে বললেন, 'উঁহু, হাত দেখতে জানি না; তবে আমি আর একটা জিনিস

জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা-পান করিলেন। নিবেদিতাও চা-পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিস্টার নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া উহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন।"

এখানেই ব্যাপারটার শেষ নয়। বাগবাজারে ফিরে আসার পরে সকলের মধ্যে বসে স্বামীজী যৎপরোনাস্তি দুষ্ট কৌতুক করতে আরম্ভ করলেন—"কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন—'আর এক কথা শুনেছেন—আজ এই ভট্‌চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তাঁর ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?' "

শিষ্য অবশ্য উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন—

"শিষ্য। তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম—আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মানবে না।

শিষ্য। না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।"

[২] এই কুমারস্বামী দম্পতি পরবর্তীকালে মনীষী ও শিল্পশাস্ত্রীরূপে বিখ্যাত ডাঃ আনন্দকুমারস্বামীর পিতামাতা। পরিব্রাজকে স্বামীজী লিখেছেন—"কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙায় নেবে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনা হল। স্যর কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু-পায়ে, কপালে বিভূতি।...কুমারস্বামীর বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দু' বোতল সরবৎ ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।"

জানি, যা হাত দেখার চেয়ে উঁচুদরের; আমি তোমার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ চাক্ষুষ করে বলে দিতে পারি।' কিন্তু বললেন, ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ করলে স্বাস্থ্যের উপর দারুণ চাপ পড়ে, আর সন্ন্যাসীর তা করার অধিকার নেই। তা করতে আমিও তাঁকে বললাম না। শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম কথাটা, কেননা তোমার শুনতে ভাল লাগবে।...... কিন্তু একাজ তিনি অ্যালবার্টের জন্য করেছেন, তা মনে পড়ল আমার।

জুলাই ১৫, মিস ম্যাকলাউডকে

যখন ভারতে এসেছিলাম, ব্যক্তিমানুষরূপে স্বামীজী সম্বন্ধে আমার প্রায় কোনো নির্ভরতা ছিল না। আলমোড়ায় সেই দারুণ সময়ে যখন তিনি আমাকে তাঁর জীবন থেকে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিয়েছিলেন—তখনো মূলে কোনো পার্থক্য হয়নি। এখন ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনিই সব কিছু—তিনি আরও বড় হয়ে উঠেছেন। আমি আমার অনুরক্তিতে নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছি। তাঁর সামান্যতম খেয়ালও আমার কাছে সর্বস্ব। যদি কেউ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়, মনে হয় তার সত্তা মুক্ত হয়ে গেল। ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমার এমন ভালবাসা সম্ভব করলেন।

জুলাই ১৯, মিস ম্যাকলাউডকে

রাজা তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মত খাটছেন ক্যাবিনে বসে।...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মত হয়েছে, তোমাকে তা বলা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর জন্য একটি দীর্ঘপত্র রচনা করছেন—মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেইসঙ্গে টিপ্পনী ও মন্তব্য এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপন্থতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণের প্রতি নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন বিষয়ে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি,—সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছু ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠছে, যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে!!![১]

---

[১] নিবেদিতা স্বামীজীর যে বাংলা পত্রিকার কথা বলেছেন, তা উদ্বোধন, এবং 'দীর্ঘপত্র' হল উদ্বোধনে প্রকাশিত 'বিলাতযাত্রীর পত্র', যে-নাম উদ্বোধনে প্রকাশকালের শেষের দিকেই পরিবর্তিত হয়ে 'পরিব্রাজক' হয়। এই নাম পরিবর্তনের হেতু, আমাদের অনুমান, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থটি, যার বিষয়ে স্বামীজী জানতে পারেন, কিংবা জানলেও ভুলে যেতে পারেন। এই নামসাদৃশ্যের প্রতি কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই হয়ত নামটি বদলে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন পত্রিকার প্রতি স্বামীজীর মমত্বের নানা পরিচয় তাঁর পত্রাদিতে ছড়িয়ে আছে। অর্থকষ্টে যখন পত্রিকা চলা ভার হয়ে দাঁড়াল, তখন স্বামীজী তাঁর ভ্রমণকথা পত্রিকার জন্য লিখতে আরম্ভ করলেন (তৎসহ সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দও নিশ্চয় ছিল), এবং লেখাটি ভালভাবে বিজ্ঞাপিত করে প্রকাশ করলে পত্রিকার বিক্রী বাড়বে, এমনও বলেন।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে অসামান্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যের ইতিহাসে প্রথম পর্যায়ে স্তম্ভস্বরূপ এই গ্রন্থটি অপরপক্ষে সাহিত্যগুণেও প্রথম শ্রেণীর। সম্ভবত এ জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। বিশাল প্রতিভার এমন স্বচ্ছন্দ লঘু ও গভীর

তারপর কালীর উপরে তাঁর বিরাট কবিতা। তার একটি লাইন,—আহা তাঁর কণ্ঠে নাটকীয় আবৃত্তি যদি শুনতে,—

(আমি সেই নির্বোধদের একজন নই, যে—)

'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।'[১]

ধূমপান প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, জল প্রায় খান না। এ সবের উপরে, তিনি রাজা, আমার কাছে তিনি একসঙ্গে মা ও শিশু। আহা, পৃথিবীর এই মহানতম

লীলা একই পাত্রে, বাংলা সাহিত্যে পূর্বে দেখা যায়নি। বইটি এখন বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা বহু আদৃত; এখানে এইটুকু শুধু যোগ করা যায়, বইটির প্রথম সাহিত্যিক সমালোচনার গৌরব সম্ভবত নিবেদিতার। রচনা চলাকালেই পাণ্ডুলিপি পড়ে বা শুনে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার যাথার্থ্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিবেদিতার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী বিশেষ উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের উপরে উৎপীড়ন করেছিলেন।

[১] কবিতাটির উল্লেখ ১৩ই জুলাই, এবং ১৯শে জুলাই—এই দুই তারিখের চিঠিতেই পাই। কবিতাটি ১৩ই বা তার অল্প আগে লেখা আরম্ভ হয়, দু'একদিনের মধ্যে শেষ হয়। ১৯শের মধ্যে শেষ হয়েছিল নিশ্চিত। এটির নাম 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। স্বামীজী Kali the Mother কবিতাটি প্রেরণার ক্ষণে লিখেছিলেন। তার মধ্যে অনুভূতিলোকে অপরোক্ষকৃত মহাকালীর প্রলয়চ্ছবি চিত্রিত। ঐ কবিতার মূল দর্শনকে স্বামীজী এই বাংলা কবিতার মধ্যে বাস্তব সংসারের নানা রূপের পটে স্থাপন করে দার্শনিক বক্তব্য-প্রধান করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে মাতৃভক্ত বীরসন্তানগণের প্রতি বীরেশ্বরের আহ্বানধ্বনিও ঘোষিত হয়েছে সমুদ্রকণ্ঠে। তেমন কয়েক ছত্র আমরা উদ্ধৃত করছি :

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্‌, বব-বব-বম্‌—বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা, লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতি॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর্‌থর্‌, লক্ষ অশ্ববরপৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলাবরিষণ গুলি স্বন্‌ স্বন্‌, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্যপরিচয় পতাকা নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্র মুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদগার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনী, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে॥......

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে।
দুঃখভার এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

আত্মাকে অর্চনা করবার সুযোগ যারা পেল না, তাদের জীবনের কোনো মূল্য আছে কি?

এখন ডায়েরীর কথা।......ডায়েরীর নাম দিয়েছি 'De Gabriete'—(of Gabriel), যার অর্থ—'আমি গ্যাব্রিয়েল, যে দাঁড়িয়ে আছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে।'

আমাদের আচার্যদেবের পক্ষে 'গ্যাব্রিয়েল' আখ্যাটি সুন্দর হবে—শক্তি ও দিব্য-দর্শনের দেবদূত যিনি, যিনি মানবসমাজের জন্য পবিত্রতার মহান শুভ্রপদ্ম এনেছিলেন।

ওগো প্রিয় য়ুম, ইংলণ্ডের ভূমি স্পর্শ করবার আগামী ক্ষণটিকে কী যে আতঙ্কের চোখে দেখছি! তখন যে আমার পূজার এই দীর্ঘ ভাবোন্মাদনার অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। তখন যেন প্রাণের কোরকে যে-জিনিস একজনের জন্য সানন্দে রক্ষা করেছি, তাকে সজোরে উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে অন্যের কাছে। কী স্বার্থপরতা আমার! এসব কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে, তবু জানি, প্রিয়তমা তুমি, তোমার অনন্ত ধৈর্যের মধ্যে আমার এই মনোভাবেরও ঠাঁই হবে।......

তিনি বললেন : আমার মত মানুষেরা চরমের সমষ্টি। আমি প্রচুরতম খেতে পারি, একেবারে না খেয়ে থাকতে পারি; অবিরাম ধূমপান করি, আবার তাতে সম্পূর্ণ বিরত থাকি; ইন্দ্রিয়দমনে আমার এত ক্ষমতা, অথচ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেও থাকি;—নচেৎ দমনের মূল্য কোথায়!

জুলাই ২১, মিস ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী আজ একটু অসুস্থ, একটু অস্থির। আমার **বিশ্বাস** এখন তিনি সুখনিদ্রায়। ওগো প্রিয় য়ুম, তাঁকে কী যে ভালবাসি আর পূজা করি। ইচ্ছা হয় তিনি বলেন, তোমার হৃদয় উৎপাটিত করে উৎসর্গ কর আমাকে!

অগস্ট ৩, মিস ম্যাকলাউডকে

তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিজেই নিজের রূপ নেবে। "মা-ই সব জানেন।" স্বস্তি! "মা" সত্যই জানেন। কী আশ্বাস একথা ভাবতে যে, কেউ "মা"র সঙ্গে এবং তাঁর (স্বামীজীর) সঙ্গে সর্বদা আছে যেখানে অপরের ঈর্ষা বা সমালোচনার দাম কানাকড়িও নয়। "যে পাথরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তা আমার চেয়ে অনেক বড়।"......

য়ুম, সেদিন রাত্রে মিসেস 'এফ', এবং মিস্ 'জি'-এর সাক্ষাতে তিনি অপূর্ব সব কথা বললেন। আট বছর যখন তাঁর বয়স, তখনই সমাধিমগ্ন হতেন, যদিও জানতেন না তা কি! আমি মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, তার রূপ তাঁর জানা আছে :

'বার কি পনের বছর আগে পাহাড়ের কোলে (হৃষীকেশে) একটা ছোট কুটীরে তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ ও আমি আছি। আমি জ্বরে মরণাপন্ন—ক্রমে শেষ অবস্থা ঘনিয়ে আসছে—এক সময় এল যখন আমার কাঁধ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—আমি মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি...ক্রমে...ক্রমেই...তারপর আবার ফিরতে শুরু

করলাম! আমার কিছু করবার আছে।...যখন চেতনা ফিরে পেলাম, তুরীয়ানন্দ তখন চণ্ডীপাঠ করছে, আর সারদানন্দ কাঁদছে।'

তুরীয়ানন্দের কাছে ব্যাপারটার উল্লেখ করাতে তিনি বললেন, 'সত্যই অলৌকিক। উনি অলৌকিকভাবেই আরোগ্যলাভ করেছিলেন।'

সেদিন রাত্রি ছিল অন্ধকার ও ঝঞ্ঝামুখর। ভয়ঙ্কর সময়ে, যখন তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু হচ্ছে—একজন সন্ন্যাসীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গিয়েছিল দ্বারের বাহিরে—'ভয় পেয়ো না ভ্রাতৃগণ!' ঘরে প্রবেশ করে স্বামীজীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, তিনি একটা ওষুধ জানেন, যাতে আরোগ্যলাভ হবে—কোথায় পাওয়া যাবে, তাও তিনি জানেন। তা কিন্তু অনেক দূরে। তুরীয়ানন্দ পর্যন্ত স্বামীজীকে নাড়াচাড়া করতে ইতস্তত করছিলেন (স্বামীজী ঘুমুচ্ছিলেন; তুরীয়ানন্দের তখন সেবা করার পালা)। তখন আর একজন সন্ন্যাসী এসে স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে ওষুধ এনে দেবেন বললেন। ওষুধ আনার পরে তুরীয়ানন্দ সেটি খাওয়ালেন, পাঁচ মিনিট পরে মৃত্যুকে সরিয়ে জীবনের পুনরাবির্ভাব—ঐ তো তিনি এখনো বর্তমান...।

সমাধি সম্বন্ধে কিন্তু হিন্দুর আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন—হিন্দু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতন থেকে ঈশ্বরের স্মরণ করতে চায়। "যার ধ্যানে জীবন শেষ করবে, তাই দিয়ে শুরু হবে পরবর্তী জীবন।"

প্রাণের য়ুম, এই চিঠিগুলো অবশ্যই রক্ষা করো, যাতে পরে এগুলি পড়ে ডায়েরীর ধারা রক্ষা করতে পারি।...

...স্বামীজী বারবার বলেছেন, আমাকে আমার হৃদয়ের গভীরে নেমে সন্ধান করতে হবে প্রেরণার; তা পাবার পরে তাকেই বিশ্বাস করতে হবে আমাকে, আর কিছুকে নয়।...

অগস্ট ১২, মিস ম্যাকলাউডকে

কুক (শিল্পী এবেনিজার কুক) সেন্ট ফ্রান্সিস সম্বন্ধে আর্ল বার্নফের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন। ভাষণের পরে চার্চের সিঁড়িতে যখন দাঁড়িয়ে আছেন, ই. টি. এস. (মিঃ স্টার্ডি) তাঁর কাছে এগিয়ে এসে নীচু স্বরে বললেন, 'আর একজন খ্রীষ্টের জন্মের জন্য পৃথিবী প্রস্তুত, একথা কি আপনার মনে হয় না?' উত্তরে কুক বললেন, 'আপনি কি স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন?'

অগস্ট ১৭, মিস ম্যাকলাউডকে

নিম্‌-এর ভাবী স্বামী সম্বন্ধে আমি খুশী। সে আচার্যদেবের পাদমূলে নত হয়েছিল,—আমার মা, নিম, রিচ (ভাই)—সকলেই। সবই অপূর্ব।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মিস্ মুলারের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে আমার। ভাবতে চাই তিনি ব্যর্থ হোন, তবু যেন বিশ্বস্ত থাকি। যদি তিনি সাধারণ মানুষের মত হতেন, অপরিচিত, ঘৃণিত, অন্যের ভালবাসাহীন—তাহলে তাঁকে ভালবাসার মূল্য থাকত। কিন্তু এখন যা তিনি—তাঁকে ভালবাসা কি এমন কথা, যাঁর জন্য আকাশের তারকারা পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যে-ঘরে তিনি ছিলেন, যে-চেয়ারে

বসেছিলেন—সে সবই যেন বিশ্বের মহাকেন্দ্র। সুতরাং প্রিয় য়ুম, দেখতে পাচ্ছ, আমরা ঐশ্বর্যবানকেই ভালবেসেছি। কল্পনা করো, **স্বয়ং ঈশ্বর,** তাঁর বিরুদ্ধে, আর আমরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছি—সেই আনন্দকে।......

তাঁকে পুজা করা ছাড়া উচ্চতর আর কোন্ কাজ আছে? তাঁর চরণতল ছাড়া মহত্তর আর কোন ঠাঁই আছে কামনা করবার?

আমার হয়ে তুমি তাঁকে পুজা করবে, যেমন তোমার হয়ে আমি করেছি,—যখন তিনি তোমার কাছে হাজির হবেন।

অগস্ট ২৩, স্বামী বিবেকানন্দকে

প্রিয় রাজা,

আর কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি নিউইয়র্কে পেঁাছবেন, যেখানে আমার বিশ্বাস য়ুম স্বয়ং আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন।

আমি বিশেষভাবে আশা করি, আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবার মত সমুদ্র যথেষ্ট আলোড়িত ছিল। Londondy থেকে চিঠি পাওয়া গভীর আনন্দের বিষয় হয়েছে, কিন্তু আমি ডেট্রইটে কারো ঠিকানা জানি না বলে মিসেস ফাঙ্ককে তার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারি নি। য়ুম, তাঁর বোন, এবং মিসেস বুলের সঙ্গে রিজলিতে যথার্থ শান্তির মধ্যে আপনার দিন চমৎকার কাটবে মনে করি। তার সব কিছু কিভাবে না আপনার আনন্দের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে! ভাগ্য বটে—আপনার ওখানে যাওয়া এবং অন্য সকলের ক্যাম্পে থাকা একই সময়ে ঘটল। গতকাল হ্যামন্ডদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা মিসেস হ্যামন্ডের সঙ্গে একলা কাটাতে পেরেছিলাম রাত্রে এখানে। অপরূপ সে। মনে হল, সে যেন ভক্তিতে স্পন্দিত বিদ্যুতাধার। সে বলল, আপনাকে প্রথম দেখা মাত্র, যে-মুহূর্তে আপনি ক্লাসরুমে প্রবেশ করেছিলেন, তখনই তার জীবনে আপনার তাৎপর্য তার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল, এবং সে তার স্বামীকে বলেছিল,—'এই সেই মানুষ যার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করে আছি।' তার 'ভিশন্' সম্বন্ধে সে বলল, সে আপনাকে বলেছে, 'আমি মিঃ স্টার্ডির মতই নিষ্ক্রিয়।' সে বলল, 'এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকতে পারে না। তা করা হয়েছে— ফলে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে এখন!' হয়ত খুব ভুল বলব না যদি বলি, হ্যামন্ডরা, এবং টমসন, সেভিয়ারদের পথ মোটামুটি গ্রহণ করতে পারে ভবিষ্যতে।

আপনার শিষ্যা ইপসন-এর মিস্ ফ্রান্সিস উইলিয়ামস্ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। যে-শান্তি ও জীবনের তাৎপর্য আপনি তার জীবনে দিয়েছেন—কখনো বক্তৃতার ইতস্তত দু'একটি বাক্যের দ্বারা, তারপরে হৃদয়ে মনোনিবেশ করা বিষয়ে সামান্য দু'একটি কথার দ্বারা—তার সম্বন্ধে তিনি গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন। এসবের অর্থ কি, কিভাবে এসব সাহায্য করেছে তা তিনি বলতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর জীবন যথার্থ তৃপ্ত হয়েছে, শান্তি পেয়েছেন তিনি। জোর করে কাজের জন্য এক গিনি দিলেন, যা দিয়ে পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট খুলেছি। আমাদের সাহায্য করতে পারলে বাঁচার কিছু অর্থ হয়—তিনি বললেন। আহা রে! তিনি ভারতের কথা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু আমি যখন আবিষ্কার করলাম, তিনি কোনো এক

সময়ে কনভেন্টে ছিলেন, তখন আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

মিঃ কিং-এর চিঠি আপনাকে পাঠালেও আপনি অ্যাসিরিয়া-তত্ত্ব এবং মিসর-তত্ত্বের কোনো বইয়ের তালিকা আমাকে এখনো পাঠাননি। যাই হোক, সেগুলির অর্ডার আমেরিকা থেকে সহজেই দেওয়া যায়, এবং আপনি ম্যাসপেরোর...পেয়ে যাবেন।

মিসেস কলস্টনের কাছে লেখা মিস পোস্টারের এক চিঠি আজ সকালে পড়ে বেশ সজীব বোধ করছি। চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'রমাবাঈ এখানে এলে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম এই আশা করে যে, একজন খাঁটি মহিলাকে দেখব, এবং তাঁর কাজের বিষয় শুনব। কিন্তু যখন দেখলাম তিনি উগ্রচণ্ডা নারী ছাড়া কিছু নন, আদি ও অকৃত্রিম গরল উদ্গীরণ ছাড়া যাঁর কিছু করার নেই, তখন আমার হতাশা অনুমান করতে পারেন।' আমার সামরিক নাসিকায় এ যদি যুদ্ধাগ্নির গন্ধস্পর্শের মত কিছু নাও হয়, তবু এর থেকে লৌকিক পরিতৃপ্তি যে পেয়েছি, তাতে সন্দেহ নেই।

৭ই সেপ্টেম্বর আমি গ্লাসগো বা লিভারপুল ছাড়ব (যেখান থেকে টিকেট পাই)। তার জন্য বিয়ের পরেই রাত্রির ট্রেন ধরতে হতে পারে। আগামী কাল আমার ভাগ্যের বিষয়ে জানবার ভরসা রাখি; কিন্তু যদি পরিকল্পনামত কাজ করে উঠতে পারি, তাহলে নিউইয়র্কে পেঁছচ্ছি ১৭ই সেপ্টেম্বর নাগাদ, অ্যালান লাইনের মঙ্গোলিয়ানে করে।

এম. তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন মিঃ ও মিসেস লেগেটকে। মিঃ ম্যাকনীল মনে করেন, এই বসুন্ধরার মালিকানা ইংরেজ ও আমেরিকানদের—মেরুদণ্ডহীনদের পরিবর্তে। কিন্তু যখন আমি আমেরিকায় মানুষকে ব্যক্তিগত আক্রমণের স্বাধীন অধিকার সম্বন্ধে কিছু তথ্য শোনালাম, তখন তিনি বললেন, তিনি অবশ্যই তাঁর মত পুনর্বিবেচনা করবেন—আমেরিকানদের সম্বন্ধে।

এই ধরনের মানুষ, যাঁরা দলীয় গন্ডীর বাইরে থাকেন, এ'দের দ্বারা আপনার মর্যাদার সহজ শান্ত স্বীকার ইংরেজ জীবনের এক অত্যন্ত স্নিগ্ধ অংশ—কি বলেন?

আপনার কন্যা,
নিবেদিতা

অক্টোবর ১২, মিস ম্যাকলাউডকে

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রিয় প্রিয় য়ুম! এক বছর—এক বছর আগে! বরমুলা—জগজ্জননী—এবং বিদায়!

তুমি চলে যাবার পর থেকে আমাদের মধুময় আচার্যদেব—তাঁর বিষয়ে কোন্ ঐশ্বরিক আখ্যা যথেষ্ট হতে পারে!—ছন্নছাড়া বালকের মত, ধূমপান ভুলেছেন, আর বলছেন, 'এই ঈশ্বর-খ্যাপামি চলে যাক; রামকৃষ্ণ পরমহংস পাগল ছিলেন, তাঁর উপর শয়তান ভর করেছিল, তিনি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।' সবসময় মিসেস বুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন। আর এইসব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর-দ্যুতি বিকিরিত হচ্ছে—তুমি জানো। গত রাত্রে সহসা দশ মিনিটের জন্য মীরাবাঈ

—কিভাবে তাঁর স্বামী তাঁকে বৃন্দাবনে বিরাট মন্দির তৈরী করে দেবার কথা দিয়েছিলেন যদি তিনি বাইরে ঘুরে না বেড়ান। তাতে আমি বললাম, 'সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না কেন?'—নির্বোধের মতই বললাম। তিনি দীপ্ত হয়ে বললেন, 'তিনি এই পাঁকের জীব না কি? সম্মান ও রাজ্যের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর ক্ষুদ্র যুক্তি কি তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল? ঐ লোকটির পক্ষে কি নিজেকে তাঁর স্বামীরূপে জাহির করা স্থূল, নিতান্ত পশুজনোচিত ব্যপার ছিল না—সত্য নয় কি?'

অক্টোবর ১৩, সকাল এগারোটা। দেড়ঘণ্টা ধরে এপাশ থেকে ওপাশে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করেছেন—আমাকে সতর্ক করেছেন তথাকথিত ভব্যতা, "মনোরম", "সুন্দর"-এর বিরুদ্ধে,—বহিরঙ্গ বিষয়ের ধারাবাহিক অনুভূতির বিরুদ্ধে। "হিমালয়ে চলে যাও"—বারবার বলতে থাকেন। "**আবেগহীনভাবে** নিজের স্বরূপ উপলব্ধি কর। তা করতে পারলে পৃথিবীর উপরে বজ্রের মত ফেটে পড়তে পারবে। যারা বলে, কেউ কি আমাদের প্রচারে কর্ণপাত করবে—তেমন মানুষের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। যার সত্যই কিছু বলার আছে, তার কথা পৃথিবী শোনেনি, এমন হয়নি এ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে ওঠো। তা কি করতে পারো—পারবে? তাহলে হিমালয়ে চলে এসো—সেখানে শেখো।" তারপরে তিনি শঙ্করাচার্যের বৈরাগ্যের ষোড়শ শ্লোকের আবৃত্তি করে চললেন, ধুয়াটি প্রতিবার গুন্‌গুন্‌ করে বললেন— Therefore you fool, go and worship the Lord.

কখনো কখনো সেটিকে বদলে বলতে লাগলেন—Therefore Margot you fool! সমাজ ও পরিবারের তুচ্ছ সম্পর্ক ছেদন করতে, ইন্দ্রিয়ের নিরন্তর প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মার শক্তিকে দৃঢ় করে ধরে রাখতে, বাসন্তী পুষ্পোদ্গমের উন্মাদনাকে কোমল শয্যা বা উত্তম ভোজনের মতই সম ইন্দ্রিয়ভোগ বলে অনুভব করতে, লোকের নিন্দাপ্রশংসাকে তুচ্ছ করতে—এইসব কিছু করার আদর্শই তিনি তুলে ধরেছিলেন। বারবার বললেন, 'তিতিক্ষার অভ্যাস করো'—অর্থাৎ শরীরের পীড়া বহন করো তার নিরাময়ের চেষ্টা না করে—সে বিষয়ে চিন্তাও না রেখে। কুষ্ঠরোগে যে-সন্ন্যাসীর আঙুল খসে যাচ্ছিল,—যিনি খসে-পড়া রোগকীটটিকে সযত্নে অবশিষ্ট অঙ্গুলী-সন্ধিতে স্থাপন করার জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁকেই দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করেছিলেন।

গতরাত্রেই একই প্রকারে বলেছিলেন দুঃখকে ভালবাসা ও মৃত্যুকে আলিঙ্গনের কথা।......

গতকাল শিবের বিষয়ে বলতে লাগলেন। মুক্তস্বরূপের কাছে ধ্যান পর্যন্ত বন্ধন। কিন্তু শিব পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সেই ধ্যানেই মগ্ন থাকেন। তিনি নিত্য অবতার। হিন্দুরা বিশ্বাস করে এইসব মহান স্বরূপের ধ্যান ও প্রার্থনা ভিন্ন পৃথিবী ভেঙে টুকরো হয়ে যেত তৎক্ষণাৎ (অর্থাৎ অন্যেরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত না, ফলে স্বাধীনতাও পেত না), কারণ ধ্যানই হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্ভবপর সেবা—সবচেয়ে প্রত্যক্ষ সেবা।

তিনি হিমালয়ের তুষারের বিষয়েও বলছিলেন, সেই তুষারে বনভূমির সবুজের

ধারা কিভাবে বিগলিত হয়ে মিলিত হয়ে যায় সেই কথা—'মহাদেবের দেহে প্রকৃতির নিত্য সতীদাহ'—কালিদাস উদ্ধৃত করে বললেন। অপূর্ব—নয়? পুরুষের জন্য প্রকৃতির চিরন্তন তনুদান! এক বিশেষ মেঘ সম্বন্ধে কালিদাসের আর একটি ছত্র : পশ্চিম দিগন্তরেখায় ক্ষীণ চন্দ্রের মত তা শায়িত।

অক্টোবর ১৮, মিস ম্যাকলাউডকে

শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজনের কালে স্বামীজী আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বললেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন—কিভাবে সেইসব দিনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে তাঁর চিত্ত বিষাক্ত ছিল, যার জন্য কেবলই প্রশ্ন ও যাচাই করেছেন—ঐ মানুষটি পবিত্র কিনা! ৬ বছর কেটে যাবার পরে তিনি বুঝতে পারলেন— 'পবিত্র' তিনি ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং পবিত্রতা। হাসিতে আর মজায় ভরপুর থাকতেন, অথচ তাঁর কাছে তখন সাধু ব্যক্তির পক্ষে বিপরীত আচরণই যেন প্রত্যাশিত ছিল!!......

আমরা মজা করে স্বামীজীকে খোঁচাতে লাগলাম (মধ্যাহ্ন ভোজনের আসরে) : ধর্মাচার্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর বেপরোয়া উদাসীনতা, আর পোর্ট্রেট আঁকার ব্যাপারে তাঁর বিপুল গর্ব! (তিনি আমার তিন-চারটি পোর্ট্রেট এঁকে ফেলেছেন; সেগুলি, অন্য সকলে বলছে যে, এমনকি আমার চেহারার পক্ষেও মানহানিকর! কিন্তু তাঁর তো স্ফূর্তির সীমা নেই—মিষ্টি রাজা!)। সহসা তিনি ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন, 'দেখ Love একটা কথা আর Union আর একটি কথা। Love -এর চেয়ে Union অনেক বড় জিনিস।

'ধর্মকে আমি **ভালবাসি** না, আমি **অভেদ** তার সঙ্গে। সেটাই আমার জীবন। যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ যথার্থ কিছু করেছে, তাকে সে ভালবাসে না; আমরা সেটাকেই ভালবাসি যা আমার সঙ্গে এখনো বিচ্ছিন্ন। আপনার স্বামী (ওলি বুলকে বললেন) সঙ্গীতকে **ভালবাসতেন না,** যা তাঁর জীবনের সদা-ভিত্তি, তিনি ভালবাসতেন ইঞ্জিনীয়ারিংকে, যেটা তিনি অপেক্ষাকৃত কম জানতেন। ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে এখানেই তফাৎ। এইজন্যই জ্ঞান ভক্তির চেয়ে বড়।......

লাঞ্চের আগে তিনি আমাকে নিয়ে প্রথমবারের জন্য গেলেন মিসেস ভগ্যানের সাক্ষাতে; ফেরার পথে পত্নীপূজার বিরুদ্ধে ফেটে পড়লেন। মাতৃত্ব অনেক বড় পত্নীত্বের চেয়ে। 'আমরা, প্রাচ্য দেশের লোকেরা, দু'একটা জিনিস জানি। বিবাহ বিরাট তপস্যা ছাড়া কিছু নয়।'

এর পরে কোন্ কথা বলি? রবিবার সন্ধ্যায় মিসেস শহ্ শেষবারের জন্য এখানে নৈশ আহার করলেন। আমরা শোপেনহাওয়ারের নারী বিষয়ক উক্তি সশব্দে পড়লাম, এবং মিসেস শহ্-কে আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলাম; স্বামীজী আর তুরীয়ানন্দ আমাদের পাহারাদার হিসাবে চললেন। তাঁকে ছেড়ে আসবার পরে আমি মৃদুস্বরে স্বামীজীকে বললাম,—গভীর রাত্রে এমনকি নিজের পদশব্দ পর্যন্ত আমি সইতে পারি না। অপূর্ব চন্দ্রালোকিত রাত্রি; আমরা গাছে-ঢাকা পথ ধরে নীরবে ফিরতে লাগলাম—একটি শব্দও যেন ভাবাবহ ভঙ্গ করত। তারপর স্বামীজী বললেন, ভারতে গভীর রাত্রে শিকারের সন্ধানে বাঘ যখন বেরোয়, যদি তার লেজ বা থাবার সামান্যতম শব্দও হয়, সেগুলিকে ক্রোধে সে দংশন করে, রক্তাক্ত

না হওয়া পর্যন্ত। তারপর বাতাসে গা মিলিয়ে কিভাবে যায় বোঝালেন। তারপরে তিনি পাশ্চাত্য নারীদের পক্ষে শান্তভাবে সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে পরে অন্য সময়ে মনে মনে তার অনুবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন।

মিসেস ভগ্যান-প্রদত্ত পাঠ থেকে তোমার জন্য নচিকেতা-উপনিষদের একটি ছত্র রেখে দিয়েছি: 'বাসনার যখন বিলয় হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে হৃদয়গ্রন্থি, তখনই অমরতা পেয়েছে মানুষ।'

কিন্তু আহা!—সোমবারের অপরাহ্ণটি! মিসেস ব্রিগস্ ও আমি সোফা ও মেঝের উপরে বসে; তিনি শুধু বলে চললেন—চললেন—চললেন—যে-কালে তোমার দেবদূতীর মত বোনটি (মিসেস লেগেট) সকলকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। যেন ভারতে আছি আমরা তখন। যেসব মানুষ অদ্বৈতবাদ ও বৈদিক সাহিত্য পছন্দ করে তাদের কাছে আমার নিজেকে খুবই ছোট মনে হত, কিন্তু সেদিন তার ভিন্নপক্ষের কী রূপই না দেখলাম!

শুরু হল রামপ্রসাদের গান দিয়ে। তোমাকে কথারম্ভের সমস্তটাই দিতে চাই, বিনা ছেদে:

যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি॥

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তারে দিয়ে, মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

নূপুরে মিশায়ে তাল
সেই তালের এক গীত শিখেছি।
তাধিম তাধিম বাজছে সে তাল
নিমিরে ওস্তাদ করেছি॥

প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি
উভয়ে মাথায় রেখেছি,
আমি কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম
ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

From the land where there is no night
Has come unto me a man.
And night and day are now nothing to me.
Ritual worship is become for ever barren.

My sleep is broken. Shall I sleep any more?
Call it what you will, I am awake.
Hush! I have given back sleep unto Him whose it was.
Sleep have I put to sleep for ever.

The music has entered the instrument,
And of that mode I have learned a song.
And that music is always playing before me.
And concentration is the great teacher thereof.

Prasad speaks—Understand O Mind these words of science,
The secret of Her whom I call my Mother,
Shall I break the pot before the market?
To the 6 philosophies could not find the Kali.

"রামকৃষ্ণ পরমহংস একটি দীর্ঘ শ্বেতসূত্র তাঁর ভিতর থেকে নির্গত হতে দেখতে পেতেন, শেষপ্রান্তে পেঁছে—আলোকরাশি। তারপর সেই আলোকপুঞ্জ বিদীর্ণ হলে দেখা যেত বীণা হস্তে জননী তার মধ্যে বিরাজিতা। জগজ্জননী বীণা বাজাতে শুরু করতেন। তারপরে সুরগুলি পশুপাখীর রূপ ধারণ করত, পৃথিবীর সৃষ্টি হত, সুষমায় বিন্যস্ত হত সবকিছু। তারপরে মাতা বীণা বন্ধ করতেন, আর অদৃশ্য হয়ে যেত সমস্তই। জ্যোতি অস্পষ্ট হয়ে আসত ক্রমে, পরিশেষে আলোকপুঞ্জ, সূত্র আরও হ্রস্ব, তারপরে নিজের মধ্যে বিলীন......

"কী অপরূপ দৃশ্য ভেসে আসে আমার চোখের সামনে—আমার সারা জীবনের অপরূপতম দৃশ্যগুলি। পূর্ণ নৈঃশব্দ্য, শৃগালের চীৎকারে শুধু সে নীরবতা ক্বচিৎ বিঘ্নিত, অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের বিরাট পঞ্চবটীর আসন। রাতের পর রাত, সারা রাত, আমরা সেখানে বসেছি,—তখন আমি বালক—তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন।"

"আপনি কি তাঁর পাশে বসতেন, না সামনে, স্বামীজী?"

"উভয় রকমেই। সে তো কয়েক দিনের বা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার নয়,—বছরের পর বছর!!—হরি ওম্! হরি ওম্!"

হাঁ য়ুম, ৬ই অক্টোবরের পরে, এক বছর পরে, তাঁকে আবার ঐ পুরনো মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুনলাম—'হরি ওম্! হরি ওম্!'

তিনি বলে চললেন।—"গুরুই শিব; তাঁকে শিবের মত পূজা করতে হয়, কারণ তিনি বৃক্ষমূলে বসে শিক্ষা দেন, অজ্ঞান তিমিরান্ধকার নাশ করেন। সব কিছুই উৎসর্গ করতে হবে, নচেৎ শুভকর্ম পর্যন্ত বন্ধনের সৃষ্টি করে কর্মফল সঞ্চিত করবে। হিন্দুরা এক ভাঁড় জল দিলেও বলে পৃথিবীকে, পৃথিবীকে, কিংবা জগন্মাতাকে! কিন্তু একটি মাত্র সত্তা আছেন যিনি বিনা ক্ষতিতে সব কিছু গ্রহণ করতে পারেন, যিনি অক্ষয়, অব্যয়, অজর, অমর; যিনি পৃথিবীর গরল পান করে নীলকণ্ঠ—সেই শিবকে সব কিছু দাও।"

তারপর বৈরাগ্যের কথা : "যৌবনে আত্মোৎসর্গ কী মহান্ (এই প্রসঙ্গে রাত্রে আবার এলেন এবং অ্যালবার্টকে আত্মোৎসর্গের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ), আর কী দুঃখজনক যদি বার্ধক্যই দেবার থাকে! যারা বার্ধক্যে আসবে তারা নিজের মুক্তি পাবে, কিন্তু অনেকের পথদ্রষ্টা গুরু হতে পারবে না, আর যারা যৌবনে আসবে তারা নিজেদের লাভ ছাড়াও বহুজনকে বহন করে নিয়ে যাবে।"

তারপর বিদ্যালয়ের বিষয়ে : "মার্গট, তোমার ইচ্ছামত শিক্ষা দাও। A. B. C-র জন্য বেশী ব্যস্ত হয়ো না— ওগুলির মূল্য সামান্য। যত পার তাদের রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, শিব, কালী শেখাও। আর এইসব পাশ্চাত্ত্যের লোকদের ঠকিয়ো না, কদাপি তাদের বলো না যে, তাদের অনুরূপ A. B. C, তাদের শিক্ষাপদ্ধতি দেবার জন্য তুমি টাকা চাইছ। বলো যে, পুরনো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা শিক্ষাই তুমি দিতে চাইছ। সাহায্য **দাবি** কর, তাকে কিনবার চেষ্টা করো না। মনে রেখো, তুমি মায়ের দাসী। যদি তিনি তোমাকে কিছু না দেন, কৃতজ্ঞ বোধ করো যে, তিনি তোমাকে মুক্তি দিলেন। আমি তো চাই, মা আমাকে মুক্তি দিন।"

[ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভাবাবেশের এক অপরূপ অবস্থায় স্বামীজী এইকালে ছিলেন। রামপ্রসাদের গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁর উদ্দীপনের কাজ করেছে। আধ্যাত্মিক অভিমানে অস্থির হয়ে স্বামীজী বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল ছিলেন, তাঁর উপর শয়তান ভর করেছিল, তিনি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি। কোন্ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে চূর্ণ করে তারই ধূলি দিয়ে নূতন মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ আমরা উপস্থিত করছি কথামৃত থেকে, বিশেষ করে এইজন্য যে, স্বামীজী-গীত ঐ 'ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই' গানটি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছিলেন সেক্ষেত্রে, যার পটভূমিকায় ছিল নরেন্দ্রনাথের গাওয়া কয়েকটি গান, যা 'আগুন জেবলে দিয়ে গিয়েছিল' শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তে। এখানে জানিয়ে রাখি, 'ঘুম ভেঙেছে' গানটির পাঠ আমরা কথামৃত (পঞ্চম খণ্ড) থেকেই নিয়েছি। রামপ্রসাদ-পদাবলীর কোনো কোনো সংস্করণে কিছু ভিন্ন পাঠও দেখা যায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১২ই ফাল্গুন, ১২৯১ শুক্লাষ্টমী—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব পালন করছিলেন ভক্তবৃন্দ। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নৃত্যগোপাল, মণি মল্লিক, গিরিশ, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকালে কীর্তনীয়া কীর্তন করছিল : "কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসিতে দেরী হইতেছে। কোন রাখাল বলিতেছে, মা যশোদা আসিতে দিতেছেন না। বলাই রোখ্ করিয়া বলিতেছে, আমি শিঙা বাজিয়ে কানাইকে আনব। বলাইয়ের অগাধ প্রেম। কীর্তনীয়া আবার গাহিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। গোপীরা, রাখালেরা বংশীরব শুনিতেছে, তাহাদের নানা ভাবের উদয় হইতেছে। ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। নরেন্দ্র কাছেই বসিয়াছিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। নরেন্দ্রের জানু

এক পা দিয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন। নরেন্দ্র সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। কীর্তন চলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'ঘরে ক্ষীর আছে নরেন্দ্রকে দিগে যা!'...কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেছেন।......

"ভক্তেরা ঐ ঘরেতেই ঠাকুরের অন্নাদি আহারের আয়োজন করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাহিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি
সমাধি-মন্দিরে মা, কে তুমি একা বসি॥
অভয় পদকমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

নরেন্দ্র যাই গাহিলেন, 'সমাধি-মন্দিরে মা, কে তুমি গো একা বসি!' অমনি ঠাকুর বাহ্যশূন্য সমাধিস্থ।......

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় অনেকক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এইবার নরেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুই হাজরার কাছে বসেছিলি! তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'......

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত।......(সহাস্যে)—ওর মদ্দের ভাব, আর আমার মেদীভাব। নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।......(নরেন্দ্রাদির প্রতি)—সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর গীতার সার কি? গীতা দশবার বললে যা হয়—ত্যাগী ত্যাগী।......

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—হাঁ গা, আমার সব কথা তোমরা কি কচ্ছিলে? আমি খাই দাই থাকি।

গিরিশ—আপনার কথা আর কি বলব? আপনি কি সাধু?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধু-টাধু নয়। আমার তো সাধুবোধ নাই।

গিরিশ—ফচ্কিমিতেও আপনাকে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, আজ বড় যে রঙ, লালপেড়ের বাহার! আমি বললুম, কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন, ঠাকুর অধৈর্য

হইয়াছেন। বিনোদ বলিতেছেন—বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন—এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে, তানপুরাটি ভেঙে ফেলি। কি টং টং—আবার—'তানা নানা নেরে নূম্' হবে।

ভবনাথ—যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।

নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)—সে না বুঝলেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া শুনিতেছেন। নিত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া শুনিতেছেন—

১। অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবসযামিনী।
২। গাওরে আনন্দময়ীর নাম।
ওরে আমার একতন্ত্রী প্রাণের আরাম॥
৩। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কহিতেছেন।—'গান গাইব? থু থু!......উদ্দীপনের জন্য শুনতে হয়। তারপর—কি হলো আর কি গেল! আগুন জেবলে দিলে! সে ত বেশ! তারপর চুপ! বেশ তো, আমিও তো চুপ করে আছি, তুইও চুপ করে থাক! আনন্দরসে মগ্ন হওয়া নিয়ে কথা। গান গাইব? আচ্ছা, গাইলেও হয়। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল।'

নরেন্দ্র কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর বাড়িতে কষ্ট, সেজন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকেন। তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। এখনও সর্বদা জ্ঞানবিচার করেন। বেদান্তাদি গ্রন্থ পড়িবার খুব ইচ্ছা। এক্ষণে বয়স ২৩ বৎসর হইবে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। (নরেন্দ্রের প্রতি সহাস্যে)—'তুই ত 'খ' (আকাশবৎ); তবে যদি টেক্সো না থাকত! কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি 'খ'। একদিন তার বাড়ি গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে, বেশী কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন? সে বললে—টেক্সোওয়ালা এসেছিল; সে বলে গেছে, টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটি-বাটি সব নীলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম,—সে কি গো, তুমি ত 'খ', আকাশবৎ! যাক, শালারা ঘটি-বাটি নিয়ে যাক, তোমার কি?

তাই তোকে বলছি, তুই ত 'খ'—এত ভাবছিস কেন? কি জানিস, এমনি আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অষ্টসিদ্ধির একটি থাকলে কিছু শক্তি হতে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাইয়ের দ্বারা বেশ শক্তি, বল, টাকা—এইসব হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ হয় না।

আর একটি কথা—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অনেকে বলে অমুক বড় জ্ঞানী। বস্তুতঃ তা নয়। বশিষ্ঠ বড় জ্ঞানী—পুত্রশোকে অস্থির হয়েছিল। তখন লক্ষ্মণ বললেন, রাম, একি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত! রাম বললেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার আলো-বোধ আছে তার অন্ধকার-বোধও আছে;

যার ভাল-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধও আছে; যার সুখ-বোধ আছে, তার দুঃখ-বোধও আছে। ভাই, তুমি দুইয়ের পারে যাও, সুখ-দুঃখের পারে যাও, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।—তাই তোকে বলছি, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও।......

সন্ধ্যা হইল। ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। আজ ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী। ৬।৭ দিন পরে পূর্ণিমার দোলমহোৎসব হইবে।

ঠাকুরবাড়ির মন্দিরশীর্ষ, প্রাঙ্গণ, উদ্যানভূমি, বৃক্ষশীর্ষ—চন্দ্রালোকে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা এক্ষণে উত্তরবাহিনী, জ্যোৎস্নাময়ী, মন্দিরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরমুখ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া নিঃশব্দে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। উৎসবান্তে এখনও দু' একটি ভক্ত রহিয়াছেন। নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। মাস্টারও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আহা, নরেন্দ্রের কী গান!

মাস্টার—আজ্ঞা, 'নিবিড় আঁধারে' ঐ গানটি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ। ও গানের খুব মানে। আমার মনটা এখনো যেন টেনে রেখেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আঁধারে ধ্যান, এইটি তন্ত্রের মত। তখন সূর্যের আলো কোথায়?

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

মা কি আমার কালো রে!
কারো রূপ দিগম্বরী হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে!

ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিরিশের গায়ে হাত দিয়া গান গাহিতেছেন—

১। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়......

২। এবার আমি ভাল ভেবেছি......

(স্বামীজী-গীত পূর্বোদ্ধৃত 'যে-দেশে রজনী নাই' গানটি এরই অংশ),

গিরিশকে দেখিতে দেখিতে যেন ঠাকুরের ভাবোল্লাস আরও বাড়িতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার গাহিতেছেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।"

(কথামৃত—পঞ্চম খণ্ড)

কথামৃতের বর্ণনা চিত্রবৎ, ঐতিহাসিক বাস্তবতায় অসাধারণ, কিন্তু এই খণ্ড-চিত্রগুলি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময়, বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্ব অনেকসময় পাই না, যা পাওয়া যায় সারদানন্দের রচনা থেকে। কোন্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঙতেন, গড়তেন—সেই দিব্য শিল্পীকে বুঝবার জন্য এখানে স্বামী সারদানন্দের নয়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনার মাত্র কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি—

"সেই জ্যোতির্ময় পরিবেশে এখনো আমার মন ভাসিতেছে। অপরূপ মানুষটি! —যেখানে যখনই থাকিতেন ঐ আলোক-বিচ্ছুরিত পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন। যখনই

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহার মধ্য হইতে যে রহস্যময়, অনির্ণেয় সকরুণ যাতনা উচ্ছলিত হইয়াছে—সে সম্মোহন হইতে আমার মন এখনো মুক্তি পায় নাই।" (অনুদিত)]

২৭ অক্টোবর, ম্যাকলাউডকে

আমার একান্তবাসের মধ্যে গত রবিবার রাত্রে স্বামীজী এসে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন। প্রতিটি মুখ্য অবতার প্রকাশ্যে বা গোপনে মাতৃ-উপাসক—এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জানালেন। "নইলে তাঁরা শক্তি পাবেন কিভাবে?" শিব ও কালী তাঁদের আরাধ্য হতে বাধ্য। তারপরে রামায়ণের কথা। একটা বিচিত্র কথা তোমাকে বলি—যখন সদানন্দ রামায়ণের কথা বলেন, তখন আমার নিতান্ত বিশ্বাস হয় যে, **হনুমানই** রামায়ণের নায়ক, আর স্বামীজী বললে **রাবণই** কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়।...

রামকে কমললোচন বলা হয়। সীতা-উদ্ধারে মায়ের সাহায্য পাবার প্রার্থনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু রাবণও মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান। রাম এসে দেখেন, রাবণ মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট। রাম বুঝলেন, তাঁর পক্ষে দারুণ কিছু করা দরকার। তিনি হাজার-এক পদ্ম দিয়ে মায়ের অর্চনা করার ব্রত নিলেন। লক্ষ্মণ মানসসরোবর থেকে পদ্ম নিয়ে এলে রাম তাঁর মহামাতৃযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। শরৎকাল তখন। মাতৃপূজার সময় বসন্তকাল। রামের এই অকালবোধনের স্মারক হিসাবেই অতঃপর শরৎকালে মহাপূজা আরম্ভ হয়। শ্রীরামচন্দ্র মায়ের শ্রীচরণে পদ্ম অর্পণ করতে লাগলেন—হাজার পদ্ম পর্যন্ত দিলেন ("এদিকে মা একটি পদ্ম চুরি করে নিয়েছেন!") —কিন্তু একি, শেষ পদ্মটি যে পাওয়া যাচ্ছে না! কিন্তু রাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি হার মানবেন না, ছুরিকা চেয়ে নিয়ে নিজের নয়ন উৎপাটন করতে যাচ্ছেন—তাঁর **নয়ন নীলকমল বলে কথিত—তখন মা তাঁর ভক্তির কাছে হার মানলেন,** আশীর্বাদ করলেন মহাবীরকে: তারই বাহুবলের জয় হবে। অবশ্য রামের বাহুবলের জয় ঠিক হয়নি, রাবণের ভাই-ই শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তারই ফলে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

রাজা বলেন, "কিন্তু ঐ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরও মহত্ত্বের একটি ক্ষেত্র ছিল। রামের রাজসভায় তিনি বসেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে রাবণের বিধবা পত্নী এলেন দেখতে—কে সেই যোদ্ধা যে তাঁকে স্বামী ও পুত্রহারা করেছে! রাজসভাসুদ্ধ রামচন্দ্র সঙ্গিনী পরিবেষ্টিত রানীকে অভ্যর্থনার জন্য উত্থিত—কিন্তু কোথায় রাজকীয় ঐশ্বর্য-ভূষিতা মহারানী? হিন্দুবিধবার অনাড়ম্বর পোষাকে এক নিতান্ত সাধারণ নারী! 'মহিলাটি কে?' রামচন্দ্র বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন রাজভ্রাতাকে। উত্তরে তিনি বললেন, 'এই সেই সিংহিনী যাকে তার সিংহ ও শাবকদের থেকে আপনি বঞ্চিত করেছেন। তিনি এসেছেন আপনাকে দেখতে!"

ওগো য়ুম, নারীত্বের কী সমুচ্চ আদর্শই না স্বামীজীর! নিশ্চয়ই আর কোথাও এই **প্রচণ্ড আদর্শ** নেই, শেক্সপীয়ারে নেই; অ্যাসকাইলাসেও নেই যখন তিনি অ্যান্টিগনকে এঁকেছেন, কিংবা সফোক্লিস, যখন তিনি এঁকেছেন অ্যালসেসটিসকে। নারীত্বের আদর্শের বিষয়ে স্বামীজীর কথাগুলি পুনরায় পড়ার পরে (নিবেদিতা

আলোচনার সারাংশ লিখে রাখতেন) বুঝলাম, তার সব কিছু, প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত ভাবী পৃথিবীর নারী-আদর্শের রক্ষাকবচ, কিন্তু প্রথমত এবং প্রধানত নিজ দেশের জন্য; সে আদর্শের যথার্থ যোগ্য কেউ হতে পারল কি না, সেটা বড় কথা নয়।

মঙ্গলবার রাত্রে ধাপে ধাপে তিনি অপূর্ব ভক্তির আবেশে উন্মত্ত হতে লাগলেন। হৃষীকেশের কথা বললেন; সেখানকার প্রতি সন্ন্যাসীর স্ব-নির্মিত কুঠিয়া, সন্ধ্যায় ধুনির আগুন, সেই আগুনকে ঘিরে ছোট ছোট আসনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীরা, আর মৃদুস্বরে উপনিষদের আলোচনা; "কারণ ধরে নেওয়া হয়, সন্ন্যাসী হবার আগেই মানুষ সত্যকে পেয়েছে, তার বিচারবুদ্ধি শান্ত হয়েছে, এখন শুধু বাকি ঐ সত্যকে উপলব্ধি করা।" সুতরাং আলোচনা বা তর্কের প্রয়োজন নেই। হৃষীকেশে তাই পর্বতের অন্ধকার সানুদেশে, জ্বলন্ত ধুনির চারপাশ ঘিরে শুধু উপনিষদেরই আলাপ। তারপর ক্রমে নীরবতার মধ্যে হারিয়ে যায় কণ্ঠস্বরগুলি, প্রতিটি সন্ন্যাসী নিজের আসনে খাড়া হয়ে বসে থাকেন, তারও পরে একে একে নিঃশব্দে উঠে যান নিজের কুঠিয়ায়।

বুধবার একই ধরনের কথা বললেন নানা সময়ে। একবার এমন একটি বক্তব্যে উচ্ছ্বসিত হলেন, যার চেয়ে বড় কথা তাঁর কাছ থেকে শুনিনি—"হিন্দুধর্মের প্রধান ত্রুটি, তা একমাত্র ত্যাগের ভিত্তিতে মুক্তিপথ দেখিয়েছে। গৃহী এখানে নিজেদের নিম্নাবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। তার জন্য কর্মমার্গ, ত্যাগের কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু **আমি** প্রশ্নটির সমাধান অন্যভাবে করতে পেরেছি। ত্যাগ সকলেরই মূল জীবননীতি। যদি কেউ মনে করে যে এর বাইরে আছে—সেটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। আমরা সবাই বিরাট শক্তিপুঞ্জকে অনুভব করার জন্য সংগ্রাম করছি। তার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা সবাই যত দ্রুত সম্ভব মৃত্যুর দিকে ধাবিত—আমরা সকলেই। যে স্থূলদেহ ইংরেজটি মনে করে, পৃথিবীকে অধিকার করাই তার কাম্য, সে আসলে আমাদের অধিকাংশের চেয়ে তীব্রভাবে মরবার জন্য লড়াইয়ে মত্ত। আত্মসংরক্ষণেচ্ছা ত্যাগেরই বিশেষ চেহারা। মন্দ ভালোরই বিশেষ একটি রূপ। বাঁচার উৎকণ্ঠা মৃত্যুপ্রীতির অন্যতম আকার।"......

বুধবার রাত্রে রাজা পবিত্রতা সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলেন,—কিভাবে পবিত্রতার অনুশীলন ও সঞ্চার করতে হবে। প্রসঙ্গটি যখন গভীর থেকে গভীরতর স্তরে অবতরণ করছিল, তখন নির্বোধের মত কি একটা করে তাঁর ভাব ভঙ্গ করলাম। পরে আমি তাঁর সঙ্গে একলা রইলাম, যখন সকলে চলে গেল। এমন একটি ব্যাপার নিয়েও বেশী মুহ্যমান হতে চাইছি না, যেহেতু আমার **নিশ্চিত** বিশ্বাস প্রসঙ্গটি আবার ফিরে আসবে, তখন যদি আমি নাও থাকি, **অন্য কেউ** সেটা লাভ করবে—সেটি বিলম্বিত হওয়ার জন্য মহত্তর রূপে বিদীর্ণ হবে। "ব্রহ্মচর্য যেন ধমনীতে ধমনীতে ঈশ্বরাগ্নির মত জ্বলতে থাকে"—তাঁর শেষ কথা বিষয়টি সম্বন্ধে।

গতরাত্রে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনি কিছুসময় শিখদের ও তাদের দশ গুরুর বিষয়ে বললেন। গ্রন্থসাহেব থেকে গুরু নানকের এক কাহিনী শোনালেন। তিনি মক্কা গিয়েছিলেন, সেখানে কাবা মন্দিরের দিকে পা করে শুয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ মুসলমানেরা এসে তাঁকে জাগিয়ে প্রায় মেরেই ফেলে আর কি—ঈশ্বরের আবাসের দিকে পা করে শোয়ার স্পর্ধা! তিনি ধীরে চোখ মেলে শুধু বললেন, 'কোন্ দিকে

ভগবান নেই, সেই দিকে আমার পা-টি ঘুরিয়ে দাও।' সেই মধুর উত্তরই যথেষ্ট হল; অনেকে তাঁর মত গ্রহণ করল।......

একটি বিচিত্র জিনিস তোমাকে বলবার জন্য সংগোপনে রেখেছি। কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে ওলিয়ার কাছে সমালোচনা করে বলেছে—স্বামীজী কথা বলার সময়ে তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। যথাসময়ে সেটি আমার কানে এসেছে। সুতরাং তারপরে তাঁর কথা বলার কালে ঐ কথাগুলি আমার মনে পড়েছিল, এবং আমি অন্যত্র তাকাতে চেষ্টা করেছিলাম। তখনই আমি বুঝলাম, আমি কেন মিসেস জনসনের দৃষ্টি এড়াতে চাই। যেহেতু স্বামীজীর মুখ ছাড়া প্রতিটি মুখের দিকে চাইলে একটা বাধা অনুভব করি, চোখ সরিয়ে নিতে হয়, বাড়ির বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়, আর যদি তাঁর দিকে তাকানো যায়, মনে হয়, মুক্ত দ্বারপথে সোজা তাকিয়ে আছি অনন্তের দিকে। তাঁর মধ্যে আত্মসচেতনতা একদম নেই, এইজন্যই কি এরকম হয়!

৪ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

তোমাকে বলা উচিত, যদিও বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—জগৎ থেকে অব্যাহতির জন্য আবার তাঁর সেই ব্যাকুল কথা, পুরনো রীতিতে। সারা জীবন ধরে ধন-মানের বিরুদ্ধে ঘৃণার স্তোত্র উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু এখনই তার যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে শুরু করেছেন। এ পৃথিবী অসহ্য। 'এ আমি কোথায়!'—হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—মুখে সব হারানোর সে কী অপরিসীম শূন্য দৃষ্টি! তারপর বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—"রামকৃষ্ণ, তোমারই জন্য—(একটু থেমে)—ঠাঁই দাও, ঠাঁই দাও, শুধু তোমার চরণেই যে মানুষের আশ্রয়।' কী মুহূর্ত—কাতর ক্রন্দন,—তোমার উপস্থিতি আমি কতই চেয়েছি এইকালে।

"এ শরীর চলে যাচ্ছে। কঠোর তপস্যায় এর ক্ষয় হোক। প্রতিদিন উপবাস করে দশহাজার 'ওঁ' মন্ত্র জপ করব—শুধু একলা, গঙ্গাতীরে, হিমালয়ে—'হর হর' ডাকব—মুক্তি! মুক্তি! আবার আমার নাম বদলাবো; এবার আর কেউ সন্ধান পাবে না। আবার নতুন করে সন্ন্যাসের দীক্ষা নেব—আর ফিরব না,—না—না—না।"

তারপর আবার সেই হারানো দৃষ্টি, আর দারুণ ভাবনা—ধ্যানের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন! "আমি সব হারিয়েছি—সব হারিয়েছি—ম্লেচ্ছ! তোমাদেরই জন্য।" তারপর মধুর হাসি—দীর্ঘশ্বাস—এবং প্রস্থান।

১১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

গত রবিবার—ভাবো একবার!—স্বামীজীর সঙ্গে একই বাড়িতে আছি আমরা। গত শনিবার স্বামীজীর 'এ আমি কোথায়'-জাতীয় দারুণ শূন্য ভাবের বিষয় তোমাকে লিখেছি বলেই মনে হয়। সে ভাব কিছুটা গেলেও হতাশা সম্পূর্ণ যায়নি,—মুখে তার ছাপও রয়েছে।......

রবিবার প্রাতরাশের পরে আগ্নেয়গিরির বিদারণ! সকলের মাঝে তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, আর কতদিন এভাবে ঝুলে থাকব আমি? রীতিমত গালাগালির মেজাজে। তারপরেই আর্দ্র কোমল কণ্ঠে মৃদু কয়েকটি শব্দ,—তার রূপ তুমি

জানোই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতখানি মনের কথা এগুলি? তাঁর রূঢ়তায় সদাশয়তা ছিল না। তাছাড়া এর প্রয়োজনই বা কি ছিল, আমি তো অনেক দিন ধরেই কাজে লাগবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। এখানে যদি থাকি সে তাঁরই সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী। স্বামীজী তা সমঝে বুঝলেন। ওলিয়া ঘর থেকে উঠে যাবার সময়ে, তার ও অ্যালবার্টার সঙ্গে চিকাগো যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। এই আমন্ত্রণ আমাকে গ্রহণ করতে হবে—স্বামীজী বিধান দিলেন। তারপরেই মহাগৌরবের বিস্ফারিত আকার। জানালেন, যদি আমার স্বাস্থ্য তাঁর থাকত, তাহলে পৃথিবী জয় করে ফেলতেন। আমি ক্ষত্রিয়—তাঁরই **পরিবারের** লোক, তা কি জানতাম? আমি ব্রাহ্মণ নই। কৃচ্ছ্রসাধনাই পথ, ইত্যাদি ইত্যাদি।—প্রচণ্ড, সন্দেহ নেই। পরিশেষে আশীর্বাদ করলেন, যার মধ্যে গুরু হারিয়ে পিতা জেগে উঠল, যখন তিনি বললেন, "পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার জন্য লড়াই কর। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে আমি যেন এই পাই।" ও! য়ুম!

সুতরাং আমার যাত্রা ঠিক হয়ে গেল, ওলিয়া আমার আশ্রয়দাত্রী, অ্যালবার্টার সঙ্গে।......রবিবার বিকালে জিনিসপত্র......বাঁধাছাদা করছি—তিনি কয়েকটি সিল্কের পাগড়ি নিলেন বালিকাদের দেবার জন্য। তারপর দু'টুকরো কাপড়, গেরুয়া রঙের, মিসেস বুলের জন্য। তিনি আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন জিনিসগুলি দেবার জন্য। সেখানে মিসেস বুল বসে লিখছিলেন। পাগড়িগুলি স্বামীজী একপাশে রাখলেন।

প্রথমে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর গেরুয়া কাপড়টি মিসেস বুলের কোমরে জড়িয়ে দিতে দিতে তাঁকে সন্ন্যাসিনী বলে সম্বোধন করলেন, এবং এক হাত তাঁর মাথায় রেখে অন্য হাত আমার মাথায় রেখে, বললেন : "রামকৃষ্ণ পরমহংস আমায় যা দিয়েছিলেন, আমি সে **সব কিছু** তোমাদের দিলাম। এক নারীর কাছ থেকে আমাদের কাছে যা এসেছিল, আমি তা দিলাম দুই নারীকে। এর দ্বারা যা সম্ভব তাই করো। আমি আর নিজেকে বিশ্বাস করি না। আগামীকাল কি করব জানি না, যাতে আমার কাজ হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। এক নারী—জগন্মাতার—কাছ থেকে যা এসেছিল, নারীরাই তাকে শ্রেষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারবে। তিনি কে, কি, জানি না; তাঁকে দেখিনি; কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁকে দেখেছিলেন, স্পর্শ করেছিলেন—(আমার জামার হাতা স্পর্শ করে)—ঠিক এইভাবে। আমি এইটুকু জানি, তিনি হয়তো এক বিরাট বিমূর্ত শক্তি। যাই হোক, তোমাদের উপর ভার চাপিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি শান্তি পেতে। আজ সকালে আমি প্রায় পাগলের মত—কী করবো—কী করবো—সেই চিন্তায় আর চিন্তায়—যখন লাঞ্চের আগে ঘুমোতে যাচ্ছি। তখন এই কাজটি করার কথা মাথায় এল, ভারী আনন্দ পেলাম তাতে। এ একটি পরিত্রাণের মত। এতদিন ধরে একে বহন করেছি, এখন ত্যাগ করলাম......"

তিনি কি এই কথাগুলিই বলেছিলেন! মনে হয় তাই। ঘটনাটা ঘটেছিল, আমার ধারণা, নিশ্চয় তিনটে নাগাদ, বা সামান্য কিছু পরে, কারণ তখনো দিবালোক ছিল, এবং তার অনেক পরে তাঁর সঙ্গে বাঁধা-ছাদার কাজে আবার ফিরে গিয়েছিলাম, তাই মনে হচ্ছে; তিনি বিস্মিত হলেন, যখন তাঁকে নীচে অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে যেতে বললাম; বাকি কাজ আমি একলাই সেরে নিতে পারব,—তিনি নিশ্চিন্ত

বালকের মত চলে গেলেন।......তিনি বললেন—কী যে আনন্দবোধ হচ্ছে।......

সুতরাং য়ুম, এইভাবেই আমার জীবনের "চরম ঘটনা" ঘটল—জীবনের বিরাট সন্ধিলগ্ন—আমার এবং সারার।

পরদিন তিনি রিজলিতে এলেন। মিসেস লেগেট, মিসেস আর স্মিথকে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলেন, কেননা তাঁর বাণীর জন্য তিনি তৃষার্ত। সে বাণী মিসেস স্মিথ প্রার্থনা করলে স্বামীজী বললেন—"আমার কোনো বাণী নেই। আগে মনে হত তা বুঝি আছে, কিন্তু এখন জেনেছি, এ পৃথিবীর জন্য আমার আর কিছু নেই। যা আছে—সব নিজেরই জন্য। এ স্বপ্নমায়া আমাকে ভাঙতে হবে।" কথাগুলি আমি যখন পুনরাবৃত্তি করছি কী দুর্বল নিষ্প্রাণ আর খঞ্জ বোধ হচ্ছে—যখন তিনি বলেছিলেন, কী না ছিল তার শক্তি ও মহিমা!

তারপরে মিসেস বুল, মিসেস ব্রিগস্ ও আমি তাঁকে পেলাম কয়েক ঘণ্টার জন্য। তিনি শিবের বিষয়ে বলছেন,—এই কয়মাস যার বিষয়ে নিরন্তর বলে এসেছেন, —এবং শুকদেবের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীর কালী-দর্শনপূর্ব দিনগুলিতে তাঁকে 'শুক' বলে ডাকতেন। শুকের কাছে জগতের সবটাই খেলা, জীবন খেলা, ব্রহ্মাণ্ড খেলা। "আমি জানি, শুক জানে, এবং হয়তো ব্যাস কিছুটা জানলেও জানতে পারে"—শিবের উক্তি।

সুপবিত্র—সুমহান—বাক্যমনাতীত ক্ষণ। গোড়ায় মায়ের কথা বলতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব দুষ্টু ছেলের ভঙ্গিতে : মা তো নয়, শয়তানী; তার কিছু পরে সে ভাব ভুলে গেলেন, কোমল হয়ে এল কণ্ঠ, আর পূজায় পূর্ণ :

> সর্ববস্তুতে বিরাজমানা মাতা যিনি
> তাঁকে নমস্কার!
> যাঁকে মহামায়া বলে জগৎ ঘোষণা করে
> তাঁকে নমস্কার!
>
> তুমি দাও সকল আশীর্বাদ,
> তুমি দাও সকল শান্তি,
> তুমি দাও সকল বাসনা,
> তুমি পরম করুণাময়ী—তোমাকে নমস্কার, নমস্কার!
> তুমি মহারাত্রি, তুমি মোহরাত্রি,
> তুমি মৃত্যুরাত্রি—ভয়ঙ্করী!
> তোমাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার!

তারপর শোনালেন :

> বাতাস বইছে বিবেকের,
> সমুদ্র বইছে আশীর্বাদ,
> স্বর্গের পিতা মধুময়,
> মধুময় অরণ্যের বৃক্ষ, মধুময় গবাদি পশু,

মধুময়, জ্যোতির্ময় পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা পর্যন্ত,
ওঁ মধু! মধু! মধু!

[একই জাতীয় স্তোত্র উচ্চারণের ঘটনার উল্লেখ নিবেদিতা আরও করেছেন। যেমন Wanderings গ্রন্থে : (১৩ জুন, ১৮৯৮) "বাস্তবিকই সেই অপরাহ্নটি যেন শুধু অনুবাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হইল; তিনি হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির একটির কতিপয় স্থল আমাদের নিকট অনুবাদ করিয়া দিলেন :

মধুময় পবন সুমধুর আমাদের কাছে।
সমুদ্রসকল মধু বহিতেছে আমাদের জন্য।
আমাদের ক্ষেত্রের শস্যসকল মধু আনয়ন করুক।
মধু আনুক উদ্ভিদ ও ওষধিসকল।
গবাদি পশু মধু দান করুক।
আমাদের আকাশরূপী পিতা মধুময় হোন আমাদের কাছে।
মধুময় পৃথিবীর ধূলি।
(তারপর তাঁর কণ্ঠ ধ্যানের গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল)—
ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!"

সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণসহ আশীর্বাদের ঘটনার আর একটি সুগভীর বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দে'র দ্বিতীয় খণ্ডে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের 'পিকাডিলিতে রয়েল ইনস্টিটিউটের ওয়াটার পেণ্টিং গ্যালারিতে' স্বামীজী রাজযোগের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সমাপ্তিতে যা ঘটেছিল, সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে দেখা যাক :

"রাজযোগের নানাপ্রকার স্থূল অঙ্গের ও বহুপ্রকার সমাধির বিষয় কয়েকদিন লেকচার দিয়া উহা সমাপ্ত করিতে স্বামীজী মনস্থ করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে লেকচারের বিষয়টি শেষ হইলে, তিনি ক্ষণিক স্থির, নির্বাকভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি রূপান্তরিত হইলেন। পূর্ব ব্যক্তি, পূর্ব ভাবভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, নেত্রের দৃষ্টি ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন হইল, এবং তৎপরিবর্তে একটি অভিনব স্বতন্ত্র ব্যক্তি এখন তাঁহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইল। এইবার তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল :

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

সংস্কৃত শ্লোকটি উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিতে স্বামীজীর প্রায় আট দশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। এক একটি চরণ উচ্চারণ করিতেছিলেন, আর কি যেন স্থির নেত্রে লক্ষ্য করিতেছিলেন ও নির্বাকভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। পুনরায় আর একটি পংক্তির উচ্চারণ ও পূর্ববৎ নিস্পন্দ ও নির্বাকভাবে অবস্থান। এইরূপে সমুদয় শ্লোকটি শেষ হইল। সংস্কৃত ভাষায় উহা বলা হয়, কেহই উহার অর্থ বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল না, কিন্তু নাদব্রহ্ম এরূপ প্রত্যক্ষ বা শক্তিমান বস্তু যে, স্বামীজী যখন ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই ঐ গৃহমধ্যে গালিচার উপর চেয়ারে উপবিষ্ট বিশিষ্ট শ্রোতাগণ (প্রায় ১৫০/২০০ জন) নিঃশব্দে চকিতে স্বীয় চেয়ার সরাইয়া গালিচার উপর নতজানু হইল, এবং করজোড়ে ও নতমস্তকে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাত্র চেয়ার সরাইবার শব্দ প্রথমে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর গৃহটি সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। শুধু দেওয়ালগাত্রে গ্যাসের আলোটার সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছিল। উক্ত শ্লোক উচ্চারণকালে প্রত্যেক শব্দ, মাত্রা, যতি, ছন্দ ইত্যাদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, এবং কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সাম্যস্পন্দনটি কিরূপ, তাহা তিনি সকলকে দেখাইয়াছিলেন।......সংস্কৃত শ্লোকটি বলিবার পর তিনি ইংরাজিতে উহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আশীর্বচনটি শেষ হইলে পূর্বের মত এই রাত্রে স্বামীজীর সহিত বাক্যালাপ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহাকে তখন বোধ হইতেছিল যেন তিনি স্বতন্ত্র জগতের লোক, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। আশীর্বাদ শেষ হইলে তিনি গম্ভীরভাবে গৃহত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে অতি সসম্ভ্রমে সকলে চলিল।"]

কিন্তু তাঁর গোপন ভাবনার বিষয়ে চোখ বুজে থাকতে পারছি না। তাঁর আচার্য তাঁর উপর শক্তি অর্পণ করার পরে মাত্র এক-দেড় বছর বেঁচেছিলেন; ঠিক তেমনি তিনিও অল্পদিনই বাঁচবেন। জীবন তাঁর কাছে যন্ত্রণা। আমাদের সুখের জন্য এ জীবন সহ্য করতে তাঁকে বলতে পারব না—কিন্তু ওঃ য়ুম—য়ুম—যদি তোমার প্রার্থনার কোনো মূল্য থাকে চিরন্তনের কাছে—তাহলে দেখো, তাঁর অবশিষ্ট সময় যেন জয়শ্রী ও লীলায় পূর্ণ থাকে। আমার সহস্র মরণ হোক, সহস্র জ্বলন্ত নরকে আমি যেন নিক্ষিপ্ত হই পরবর্তীকালে, তার আগে, আমি প্রার্থনা করি—না, আমি দাবি করি পরম পুরুষের কাছে—পরিবর্তে যেন তাঁর জীবিতকালে আমি তাঁর শ্রীচরণে দু'একটি জয়মাল্য অর্পণ করে যেতে পারি। ঈশ্বরের যদি মায়ের প্রাণ হয়,—নিশ্চয় এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হব না।

[নিবেদিতা এখানে স্বামীজীর যে মনোভাবের কথা বলেছেন, সে ভাবটি এইসময়ের কিছু পরে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকেও পাই। তিনি ১৭ জানুয়ারী, ১৯০০, চিঠিতে ওলি বুলকে লিখেছেন—"আমি এখন আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনার উপরে বেশী বিশ্বাস করি। জো এবং মার্গট মহাপ্রাণ, কিন্তু আমাকে চালিয়ে চলার আলোক এখন 'মা' আপনার হাতেই অর্পণ করছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন?......আমি শিশু বই আর কিছু নই। আমার আবার কাজ কি?

আমার শক্তি—সে তো আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছি। পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছি। বক্তৃতামঞ্চে বাণী প্রচার করতে আর পারব না। এসব কথা কাউকে বলবেন না— জো-কেও নয়। আমি খুশী। বিশ্রাম চাই আমার। আমি যে ক্লান্ত, তা নয়, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় হবে **বাণী নয়, অলৌকিক স্পর্শ**—রামকৃষ্ণের মতো! **শব্দ** গেছে আপনার কাছে, আর **স্বর** গেছে মার্গটের কাছে। ওসব আর আমার কাছে নেই। আমি খুশী। সব ছেড়ে দিয়েছি। শুধু আমাকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।"

স্বামীজীর কাছ থেকে 'শক্তি' লাভ করার পরম আনন্দ ও গৌরবের পরেও নিবেদিতার হৃদয় আতুর হয়েছিল একটি আশঙ্কায়—নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র এক-দেড় বৎসর বেঁচেছিলেন। এক্ষেত্রেও কি তাই ঘটবে! নিবেদিতার আশঙ্কা বাস্তব হয়েছিল। স্বামীজী কিছু বেশী বেঁচেছিলেন—আড়াই বৎসর!]

২২ নভেম্বর, মিসেস ওলি বুলকে

পাশ্চাত্যে তাঁর আগমন সূর্যোদয়ের মত, কিংবা ঈশ্বরাবির্ভাবের মত। তিনি যেন **গতি ও শক্তির দুই পাখায় ভর করে উড়ে এসেছেন।**

২৫ নভেম্বর, মিসেস ওলি বুলকে

স্বামীজী যা ঠিক, ভারত সেই ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করেছে—মুক্ত পুরুষরূপে। "জনৈক আমেরিকান কথিত স্বামীজীর গোমাংসাহারের" গল্প, এবং মাদ্রাজ সেই পরীক্ষায় কিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে—সে কথা বললাম। সকলে তাতে অভিভূত হয়ে গেল—ভারত তার গোমাংসভোজী সন্তানকে তুলে নিয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়েছে!

৪ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

মধুর বা নিষ্ঠুর, স্বামীজী যাই বলুন, সব কিছুকে তোমার ভালবাসার মনোভাব অধিকাংশের কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার। ভাল ও মন্দের মধ্যে ঈশ্বরের সর্মাবকাশের, সমদৃষ্টির, বেদনাবহনের এবং ঐ জাতীয় অজস্র জিনিসের একমাত্র ব্যাখ্যা ওর মধ্য থেকে আমি করতে পেরেছি। কিন্তু অনেকেই ব্যাপারটাকে অবাঞ্ছিত মনে করে সরে গেছে।

কিন্তু মেরী হেল* ও আমি আজ বিকালে একটি গুরুতর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। যে-লোকের স্বভাব বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যময়, সে যন্ত্রণার উপর আধিপত্য, স্ফূর্তি বজায় রাখা ইত্যাদি 'ক্রীশ্চান সায়েন্সের' সাধারণীকরণ নীতিতে সহজে বেড়ে উঠতে পারে, আর অপরদিকে তোমার আমার মত উৎসাহী স্বভাবের মানুষের পক্ষে যে-ভূমিকা নেওয়া যায় তাই নিয়েছি,—তুমি নিয়েছ "জীবনের বার্থতাকে" ভালবাসার ভূমিকা, আর আমি যন্ত্রণাকে অর্চনার। আমরা আমাদের বিপরীত অবস্থাকে কামনা করি।—বুঝতে পারছ! মেরী হেল সম্বন্ধে আগে যে-কথা বলেছি তা ঠিক—তার

---

* মেরী হেল স্বামীজীর "প্রিয় ভগিনী", হেল-ভবন আমেরিকায় স্বামীজীর নিজ গৃহ, কিন্তু মেরী হেল স্বামীজীর বেদান্তকে গ্রহণ করেননি, তিনি ক্রীশ্চান সায়েন্সের ভক্ত ছিলেন।

সহনের শক্তিতেই সে মহান। কিন্তু ব্যাপারটা সে নিজে জানে না। সে 'ক্রীশ্চান সায়েন্সের' মামুলী নীতিতে আসক্ত, এবং উল্টোদিকে আমাদের বিষয়ে বলে, আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। সে কিন্তু সদাই গৌরবময়।

খুব অদ্ভুত নয় কি—দু'জন মানুষ (নিবেদিতা ও মেরী হেল) পাশাপাশি বসে স্বপ্ন দেখছে যে, একজনের প্রতি (স্বামীজীর প্রতি) ভালবাসার সূত্রে তারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, অথচ সেই একই ভালবাসা দুইরূপে, দুই ধর্মের মধ্যে দিয়ে দু'জনের কাছে ভাববহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন স্বামীজীর ক্ষেত্রে—এই ভয়ঙ্করের অর্চনা কি তাঁর কাছে **নূতন** কিছু? আমার তা মনে হয় না। এখন মনে হচ্ছে, আমি তাঁর মধ্যে একেবারে সূচনা থেকেই কোনো একটা জিনিসের সম্ভাবনা দেখেছিলাম,—সে সম্ভাবনার অর্থ তিনি কিছু একটাকে পেয়েছিলেন তারই সঙ্কেত,—এবং আমি মনে করেছিলাম, তার চাবি তিনি আমাকে দেবেন। পরে সে কথাই সত্য হল। ভয়ঙ্করের অর্চনা ইদানীং আরও প্রবল হয়েছে—অতীব অতীব—সম্প্রতি সেই 'চাবি' এবং পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন—কিন্তু সে জিনিস তাঁর মধ্যে প্রথম থেকে ছিল। আমার প্রতিটি কথা সত্য তুমি বুঝবে, কিন্তু মেরী হেলের কাছে যখন বলি তখন তার পক্ষে স্বামীজীর অতি সহজ ও সাধারণ ভাবগুলির অর্থ বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই সব বিরাট ভাবরাজির পাশে সাধারণ জীবন কী যে **সাধারণ** মনে হয়, কি বলবো!

হিন্দুর সেই বক্তব্য : বন্ধ আত্মা আর মুক্ত আত্মা; নদীতটে বাঁধা নৌকা আর সূর্যালোকে দ্রুত ধাবমান নৌকা; ঘটনাচক্রে ও স্বার্থে বাঁধা জীবন; সর্বোত্তমেরই সাধ্য পরম স্বাধীন জীবন! কী **সত্য,** কী গভীর ও সহজাত এই তত্ত্ব—স্তব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করি নিজেকে : **আমি** মুক্ত তা কি সত্য? একি সত্য যে আমি মুক্তই আছি চিরদিন, শুধু তা জানি না......।

অবশ্য মুক্তি পূর্ব থেকে ছিল। কিন্তু আর এক দিক থেকে সে মুক্তি পেয়েছি যেদিন আমাকে ও সারাকে ব্রহ্মচারিণী করা হয়েছে। তুমি যেহেতু আগে থেকেই মুক্ত আছ, তোমাকে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়নি।

১৪ ডিসেম্বর, মিস ম্যাকলাউডকে

বালক ত্যাগানন্দ আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল। সে বলল, স্বামীজীর বহির্জীবনের বিষয় সে কিছুই মনে করতে পারছে না,—কেননা তাঁর কাছে থাকার সময়ে সে সর্বসময় সচেতন থাকত যে, সে ঐশী শক্তির সান্নিধ্যে রয়েছে।

১৫ ডিসেম্বর, স্বামী বিবেকানন্দকে

"মিসেস বেল"-এর বাড়ি থেকে,
চিকাগো, শুক্রবার

আমাদের প্রিয় পিতা,

সারাদিন আপনার কাছে চিঠি লেখার ইচ্ছার আনন্দে আছি। গতরাত্রে এত ক্লান্ত ছিলাম যে, একটি শব্দও লিখতে পারিনি।

মেরী খুড়ী* আমাকে শিকড়সুদ্ধ তুলে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন, একেবারে আরাম বিলাসের মধ্যে, কয়েক দিনের জন্য, এবং এখানে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝলাম গত কয়েক সপ্তাহ আমি কি রকম গুরুগম্ভীর হয়ে কাটিয়েছি। বুঝলাম, হাসি কি উপাদেয় জিনিস! বুঝতেই পারছেন মিস হ্যারিয়েট ম্যাকিণ্ডলি এখানে আছেন।

তারপর মেরী খুড়ী ডিনারে রইলেন, সন্ধ্যাটা কাটালেন, সুন্দর লাগল। আজ তাঁর জন্মদিন।

সোমবার সকাল।—আমি কি আপনার খুব বদ মেয়ে নই—আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার কাছে? তবে শুনেছি পিতা আমার খুব দরিদ্র নন, আর ইদানীং বৃদ্ধও নন; তিনি নাকি রীতিমত তরুণ আর উৎফুল্ল ক্রীড়াশীল হয়ে উঠেছেন, সত্যি! সুতরাং প্রিয় পিতা, প্রতি হাত আমরা কোনো না কোনো পুরাতন প্রবাদ উল্টে ব্যবহার করি, সেটা এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে : যখন ইঁদুর থাকে দূরে, তখন বেড়াল নাচে জোরে!

স্বামীজী—স্বামীজী—স্বামীজী—যদি কথাটা সত্য হয়—হয়—হয়! যদি 'মা' আপনার স্বাস্থ্য ফিরে দেন, নিজেকে আবার শরীরে শক্তিমান বলে অনুভব করতে পারেন, যে ভার বইতে চাইছেন তার সামর্থ্য পেয়ে যান—তাহলে এ জীবনে আর কিছু চাই না। শুধু 'মা' যেন আপনাকে পুরাতন গহ্বরে পুনরায় নিক্ষেপ না করেন। আমার মস্ত আশা, তিনি তা করবেন না।

পরের শনিবার পর্যন্ত আমি এখানে আছি। ঐদিন এখানে যারা জমেছে তাদের যে-যার জায়গায় চলে যাওয়ার কথা। আমিও নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে পারব। অতীব চমৎকার সময় কেটেছে; এর দ্বারা মেরীর মত অন্যান্যদেরও বিশেষ করে জানবার সুযোগ হয়েছে বলে। ইসাবেলকে অপর তিনজনের মধ্যে আমার উপর সবচেয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন মনে হল, যেটা আমার আশার অতীত ছিল।

কিছু মহিলা একদিন এসেছিলেন কনভেন্ট-সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তাঁদের একজন বললেন, 'আমি কখনো ক্যাথলিক হতে চাইনি, তবু কোনো একটা কনভেণ্টে প্রবেশ করার কামনা করেছি সারাজীবন—সেকথা কিন্তু প্রকাশ করার কথা কখনো ভাবিনি। কার্যগতিকে বিয়ে করলাম, এখন দুটি শিশু নিয়ে আমি বিধবা; ভারতের বালবিধবাদের বিষয়ে সেদিন রাত্রে আপনি কিছু বলেছিলেন, তার দ্বারা গোটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হয়েছে, আমার নিজের প্রতি অসন্তোষের রূপও।' অপর মহিলাটি এখনো বিবাহিত নন; তিনি বললেন—'আমি বৈরাগ্যের বিষয়ে জানতে চাই, আমাকে আরও কিছু বলুন।' আমি তাদের দুজনকেই বললাম, কিভাবে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কিছুই বিশ্বাস করতাম না, আমি কিভাবে সেদিন কেবল একটি শব্দই আপনার কাছে শুনেছিলাম—'বৈরাগ্য'—কিভাবে আজ পর্যন্ত ঐ শব্দটি ছাড়া আর কিছু না শুনে চলেছি। আমরা উভয়ে

---

* মেরী হেল। স্বামীজী মেরী হেলকে বোন বলতেন, সেইজন্য কন্যা নিবেদিতার কাছে মেরী হেল 'খুড়ী'।

যে-মুহূর্তটিকে কল্পনায় দেখেছি তা যেন মনে হল আমার কাছে এসে গেছে—ঐ শব্দটির জন্য প্রতীক্ষমান সত্তাগুলির কয়েকটি যেন সঙ্কেতে সাড়া দিয়েছে। ছোটখাট মানুষটি প্রিয় মিসেস অ্যারো এ নিয়ে এমন প্রতিবাদের হৈ চৈ তুলেছেন যে, ব্যাপারটার যৌক্তিকতা বোঝাতে আমাকে গভীরে প্রবেশ করতে হচ্ছে। আমি তাঁকে ভালবাসি,—আর আপনার সুন্দর চিঠিখানি শব্দটির ('বৈরাগ্য') উপরে স্থায়ী মুকুট।

আপনার কন্যা,
মার্গট

......অভয়ানন্দের চিঠি স্বর্গীয়—নয় কি? ইসাবেল আপনাকে হৃদয়ভরা ভালবাসা পাঠিয়েছে।

॥ ১৯০০ ॥

৬ মে, ম্যাকলাউডকে

এখন এখানে। হ্রদের দিকে চোখ মেলে আছি। নত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে নিম্নের বৃক্ষশীর্ষের উপর দিয়ে। কয়েকদিন এখানে আছি। মিসেস কুনলী ওয়ার্ডের সঙ্গে বাস করছি। বিরাট জানালার পাশে একাকী বসে। Pavlo এবং Francesca পড়ছি ঘণ্টাখানেক। কী সুন্দর! স্বামীজীর মুডকে যেন আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছি, যে-মুড থেকে তিনি বলেন : আমরা সকলে, এই বিশ্বসৃষ্টি, এমনকি ঈশ্বর পর্যন্ত শব্দের অর্থবিকাশ ছাড়া কিছু নয়। একদিন আমি মুক্তিতে উত্তীর্ণ হব; তখন আমি নিশ্চয় জানি, এক বিশাল ধ্বনি আমার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সেদিন আমার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে স্ফুরিত হবে মানবপ্রাণ। তখন আর কাহিনীর চারিদিকে ছবির মালা গেঁথে যাওয়া নয়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিঝলকে চকিত অভ্রান্ত বেগে আবর্তিত হবে জীবন-নাট্য—পরিণতির দিকে যা দ্রুত ধাবিত। তারও পরে, আরও পরে, একটি দিব্য শব্দপ্রতিমা, সুপ্রাচীন......অথচ ভাবী-গর্ভ বাণীমূর্তি, যার মধ্যে সকল নাট্যের নিশ্চিত মহামিলন।

দেখছ, এখনো প্রতীক-পূজক রয়ে গেছি—অনন্ত অনির্বচনীয়তাকে শব্দে প্রকাশের এই আকৃতি!

চেয়ে দেখছি, নীল বিশাল জলরাশির অশান্ত চূর্ণ তরঙ্গ—আমার জানালার কয়েক পা নীচেই যেন জলরাশি ছড়িয়ে আছে, নিষ্পত্র বৃক্ষশাখায় মাঝে মাঝে তাতে ছেদ পড়েছে, শাখাগ্রের শরতীক্ষ্ন কোরকের আঘাতে এখানে ওখানে কম্পমান বারি, শাদা পাখী নীল জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে উত্তরে দক্ষিণে, দেখে মনে হচ্ছে মর্মরিত বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়ে গলাগলি করে তারা ছুটছে।

তোমাকে শুধাব ভাবছি—মুক্তির মহাদিনে তুমি কি চাইবে! না, তুমি 'শব্দ' চাইবে না, বিদারণধ্বনি নয়—আমি জানি। তুমি চাইবে সকলকে ভালবাসতে হয়তো, কিংবা সকলের বেদনাভার নিতে, সকলের জন্য দগ্ধ হতে, কিংবা চাইবে—কোনো 'ভিশন্' না-দেখার অধিকার,—এই হবে তোমার প্রার্থনা, যদি সত্যই নিজের জন্য কিছু চাইছ, এইভাবে আমি তোমাকে কল্পনা করতে পারি!

আমার এ স্বপ্ন খুবই স্বার্থপর—কি বল! কিন্তু শব্দের শক্তির মধ্যে এমন কিছু একটা রহস্যময় শক্তি আছে, যা আত্মাকে নাড়া দেয়—যেমন দুলছে ঐ সম্মুখের জলরাশি, বৃক্ষরাজি, যেমন পাভলো ও ফ্রানসেসকো।*

১৮ মে, ম্যাকলাউডকে

গত রাত্রে একটি চমৎকার চিন্তা মাথায় উঠেছে। স্বামীজী কি অর্থে কালী-পূজাকে মৃত্যুপূজা বলেন তা তুমি জানো! আমি কালীকে সেই দৃষ্টিতেই ভাবছিলাম—এমন সময়ে মনে হল, একটি ক্ষুদ্র রক্তপথ তাঁতে গিয়ে পেঁাছেছে। কিন্তু তাঁর নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করলেই তিনি আরও পেছিয়ে যান, আরও, আরও, শেষে এক বিশাল ঘনকৃষ্ণ দ্বারে রূপান্তরিত হন। সেখানেই পথের শেষ। তারপরেই অনন্তের সমুদ্র। **কালীই** মৃত্যু।

তাঁর নাম স্মরণমাত্রে এখন ঐ বিশাল ঘনকৃষ্ণ দ্বারের ছবি আমার মনে জাগে।

['Reminiscences of Vivekananda' নামক গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার

---

* নিবেদিতা যে-শব্দতত্ত্বের কথা বলেছেন, তা বহুলাংশে স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া। স্বামীজীর বাণী ও রচনার নানাস্থানে এই শব্দতত্ত্ব উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর 'দেববাণী' থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করছি :

"(১৮৯৫, ১৯শে জুন, স্বামীজী নিউ টেস্টামেণ্টের 'জনের গ্রন্থখানি' নিয়ে ছাত্রদের বললেন, 'তোমরা সকলেই খ্রীষ্টান বলে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র দিয়ে আরম্ভ করাই ভাল')—"জনের গ্রন্থারম্ভে এই কথাগুলি আছে—'আদিতে শব্দ মাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিত বিদ্যমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।' হিন্দুরা এই 'শব্দ'কে মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, কারণ এটা ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন এই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি তখন তাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলে থাকি। শব্দের দুটো বিকাশ, একটা এই 'প্রকৃতি'—এইটেই সাধারণ বিকাশ। আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ।"

পুনশ্চ (৩০শে জুন)—"প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে,—একটি হচ্ছে ভাব, দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক 'শব্দ'—আমাদের এই দুটিকেই নিতে হবে। কি আইডিয়ালিস্ট, কি মেটিরিয়ালিস্ট, কারও মত খাঁটি সত্য নয়। ভাব ও তার প্রকাশ, দুই-ই আমাদের নিতে হবে।"

পুনশ্চ (১২ই জুলাই)—"এই জগৎ-প্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দ-রাশিমাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগৎ-প্রপঞ্চকে সৃষ্টি করতে পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কর্মীদের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টিকর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন, 'ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি'।"

পত্র থেকে সংকলিত যে-স্মৃতিকথা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে নিউইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতার অপূর্ব ভাবাবহের বর্ণনা পাই। এই চিঠি আমরা পাইনি। তাই বর্ণনাটি উদ্ধৃত হচ্ছে :

স্বামীজী সদ্য বক্তৃতা করেছেন।

আগে-ভাগে গিয়ে দ্বিতীয় সারির বাম প্রান্তে আসন নিয়েছিলাম, যে-আসন আমি সর্বদা নিতাম লন্ডনে, যদিও এক্ষেত্রে তা তখনি মনে পড়েনি।

তারপর যখন বসে তাঁর আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, এক বিরাট স্পন্দন, শিহরণ, ঢেকে দিল আমায়, কারণ আমি অনুভব করলাম, বাইরে বিশেষ কিছু মনে না হলেও আমার জীবনের এক পরীক্ষা-মুহূর্ত সমুপস্থিত! শেষবার যখন এইভাবে বসেছিলাম, তারপরে কত কি এল গেল, কত কি ঘটল! আমার ব্যক্তিগত জীবন—দাঁড়িয়ে কোথায়? হারিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত পরিচ্ছদের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে, যাতে করে এই মানুষটির চরণতলে নতজানু হতে পারি। ভুল হয়ে দাঁড়াবে কি তা—মরীচিকা? না কি তা হবে পরম নির্বাচন?—কয়েক মুহূর্ত বাকি, তারপরেই তা ঘোষিত হবে!

তিনি এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আগমন, শুরু করার আগে তাঁর নীরবতা—সমস্তই অতি মহান এক স্তোত্রসঙ্গীত। এক সুবিশাল আরাধনা।

অবশেষে কথা বললেন। খুসীতে হাসিতে তাঁর নীরবতা ভঙ্গ। জিজ্ঞাসা করলেন : বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি হবে? কে একজন বলল, বেদান্ত-দর্শন। তিনি আরম্ভ করলেন :

অভেদ, সর্ববস্তুর একত্ব।......'সুতরাং সকল জিনিসের পরিণতি একত্বে। যাকে বহুরূপে দেখি,—কাঞ্চন, প্রেম, দুঃখ, পৃথিবী—সবই আসলে ঈশ্বর।...... বহুকে দেখি আমরা, যদিও যথার্থত বর্তমান আছেন সেই এক-বস্তুই।...... অভিব্যক্তির মাপের পার্থক্য অনুযায়ী নামগুলির পার্থক্য হয়। আজকের জড়, আগামীকালের চেতনা। আজকের কীট, কালকের ঈশ্বর। এই যে-সব পার্থক্যকে এত সমাদরে আমরা বরণ করি, এ সব কিছুই পরম ও চরম এক অস্তিত্বের অংশমাত্র—সেই চরম ও পরম অস্তিত্বের নাম—মুক্তি।

আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য—আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না, মুক্তি চাই।......মানুষের জ্বলন্ত অশান্ত, অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরো আরো আরো—আরো চাই। তোমরা আমেরিকান, তোমরা আরো চাইছ। গভীরে দেখলে এই বাসনা মানুষের অসীমত্বের দ্যোতক। অসীম মানুষ একমাত্র তৃপ্তি পেতে পারে অসীম কামনায়, এবং—অসীম প্রাপ্তিতে।'

অপরূপ বাক্যগুলি, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আছড়ে পড়তে লাগল, আমরা উত্থিত হলাম অনন্তে, সাধারণ মানুষ আমরা, হয়ে গেলাম আশ্চর্য শিশুর মত, যে শিশু আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—সেগুলিকে শিশুর খেলনা ভেবে।

অসাধারণ কণ্ঠ বেজেই চলল :

'অসীমকে সাহায্য করতে পারে কে?......অন্ধকারের মধ্যেও যে-হাত তোমার কাছে পেঁছেছে, সে হাত তোমারই, আর কারো নয়।'

তারপর, সে-ই বুকে বাণ-বেঁধা সকরুণ বিলম্বিত যাতনা, পৃথিবীর অতি বড় লেখনীও যাকে আভাসে প্রকাশ করতে অসমর্থ : 'আমরা—অনন্তের স্বাপ্নিকেরা—আমরা দেখব সীমার স্বপ্ন—হায়!'

আহা, কী ভুল তারা করে যারা বলে কণ্ঠস্বর কিছু নয়—ভাবই সব। স্বরের উত্থান পতনেই শব্দের কবিতায় সঙ্গীতের সঞ্চার হয়— জীবনের হাটের কোলাহলে আনে মাত্রা ও যতি, সেই সঙ্গে যেন ধ্বনিত হয় গীর্জার অর্ধালোকিত পার্শ্বদেশে কোনো এক স্তবমন্ত্রগান—সে সুর এসেছে, সে গান বেজেছে আজ এই প্রহরে।

অবশেষে—সব কিছু নেমে এল—থেমে এল—আর মিলিয়ে গেল একটি ভাবনায় : 'যদি এই অনন্ত একত্ব মুহূর্তের জন্যও বিঘ্নিত হয়, যদি একটি পরমাণুকেও চূর্ণ ক'রে স্থানচ্যুত করা হয়—তাহলে **আমি** দেখতে পাব না, কথা বলতে পারব না **তোমাদের** সঙ্গে, যে-আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কথা বলছি......হরি ওঁ তৎ সৎ!'

আর আমি! জীবন যে-অনন্ত গভীর জিনিস আমাদের জন্য ধরে আছে তার সাক্ষাৎ পেলাম। আগের মতই ঐ জায়গায় বসে শোনা,—কিন্তু বুদ্ধির সে অস্থির জ্বালা, অভিনবের জন্য কম্পন-শিহরণ আর নয়।

ঐ যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন—ওঁর মুঠিতে ধরা আমার জীবন। তিনি একবার যখন আমার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টিতে দেখলাম লেখা আছে—যে-লেখা আমার হৃদয়েও : পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আদর্শের স্থায়ী বোধ,—ভাবাবেগ নয়।]

৯ জুন, ম্যাকলাউডকে

তোমাকে চিঠি পাঠিয়ে, অন্য কাজ করার জন্য বেরিয়ে তুরীয়ানন্দের কাছে হাজির হয়ে শুনি—স্বামীজীর দেড়টায় আসার কথা!! তিনি এলেন। বিকালটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে [অনেকখানি] হেঁটেছেন—বাইরে ক্লান্তির সামান্যতম লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর অসুখ ছিলই। ছোট একটা অপারেশন হয়েছিল, যেটা সম্পূর্ণ সারেনি এখনো। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুবই সতর্ক, প্রতিটি পেনী পর্যন্ত বুড়ো কৃপণের মত গুণে গুণে খরচ করছেন—দেখে হেসে বাঁচি না!

২৪ জুন, ম্যাকলাউডকে

ধীরা মাতাকে (মিসেস ওলি বুল) অতি মিষ্টি এক চিঠি পাঠিয়ে আমার আমেরিকাবাসের ইতি করছি বর্তমানের মত। স্বামীজীর ভাগ্য কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁকে তা লিখেছি। স্বামীজীকে দেখাচ্ছে দেবতার মত—কিংবা শ্রেষ্ঠ দেবদূত গেব্রিয়েলের মত। এর দ্বারা ধীরামাতা অনুমান করে নেবেন—সারা পৃথিবীর মাথা স্বামীজীর পদতলে আনত।......

যুম, যুম—এসব কথাই সত্য—অতি সত্য। তিনি যে-রূপে এখন দৃশ্যমান—তাতে সারা পৃথিবীর কিছুই তাঁর প্রতিরোধ করতে পারবে না। সত্যই ঐশ্বরিক। আজ সকাল এগারোটায় মাতৃপূজার বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ তোমরা পাবে—সেটার নোট নেবার জন্য যদি ১০ ডলার খরচ করতে হয়—তবুও। বিরাট ঘটনা হবে। তাঁর সামনে কেউ একজন বক্তৃতার বিষয়টি প্রস্তাব করলেন। তিনি ফিরে হাসলেন : 'মাতৃপূজা? ঠিক! ঐ বিষয়েই বক্তৃতা করব, করতে গভীর আনন্দ পাব'—সেই পুরনো জ্যোতির্ময়, স্বতঃস্ফূর্ত, মুক্তস্বরূপ।

সেদিন সকালে তিনি ৩৪-তম রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিছু সংবাদ নিয়ে। আমি যে-পরামর্শ দিলাম, তা তাঁর কাছে অনুচিত মনে হল। আহা—যুম!—যদি তাঁর চেহারা তখন দেখতে! এমন একটা ঝলক দেখতে দুষ্টুমি করাও চলে। তিনি বললেন, "মনে রেখো! আমি মুক্ত! মুক্ত! **মুক্ত হয়ে জন্মেছি!**" তারপর মার কথা বলতে লাগলেন—কিভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তার কথা। পৃথিবী চূর্ণ হয়ে যাক, কিন্তু তিনি হিমালয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। ইউরোপীয়েরা কখনই ধর্মের প্রচার করতে পারেনি, কারণ তারা সবসময় **পরিকল্পনা** করেছে। তার মধ্যে দু'একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী শুধু ধর্মের কাছে পেঁছেছে। **তিনি** নন, **মা-ই** সব করেন। মা **যাই** করুন, সবই সমান বাঞ্ছনীয়। একদা শিব উমার সঙ্গে কৈলাসে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ উঠে পড়লেন; উমা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমার এক ভক্ত প্রহৃত হচ্ছে, তার সাহায্যে আমি যাচ্ছি।' পরমুহূর্তে ফিরে এলেন। উমা তখনি ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'আমার সাহায্যের দরকার হবে না—সে নিজের সাহায্য নিজেই করছে।'

তারপর তিনি যাবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, তুমি মায়ের সন্তান।' আমি সরে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললাম—কেন জানি না মনে হল, সেটি একটি মহাক্ষণ!

[Reminiscences থেকে :

জুলাই ১৫। আজ সকালে গীতার উপর পাঠ অপূর্ব। শুরু হয়েছিল—সর্বোচ্চ আদর্শ সকলের জন্য নয়—এই বিষয়ে সুদীর্ঘ ভাষণসহ। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সাধু ক্ষত থেকে স্খলিত কীটটিকে পুনরায় ক্ষতে স্থাপন করে বলেছিলেন, ভ্রাতঃ তোমার আহার্য তুমি গ্রহণ করো। এই জিনিস যার কাছে বীভৎস ও অশ্রদ্ধাকর, তার জন্য অপ্রতিরোধের আদর্শ নয়। অপ্রতিরোধ বা অহিংসা পালন করতে হয় ক্রুদ্ধ শিশুর প্রতি মায়ের ভালবাসার মনোভাব নিয়ে। কাঁপুরুষ যখন অহিংসার অভিনয় করে, কিংবা সিংহ তা করে মুখব্যাদান ক'রে—তখন ব্যাপারটা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে।

এস, আমরা খাঁটি হই। আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় আমরা যা নই, অন্যের কাছে নিজেদের সেইভাবে তুলে ধরার চেষ্টায়। আমরা যা হতে চাই, তাই হওয়ার চেষ্টায় ঐ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত। এইভাবে কথা বয়ে চলল—এক অবতারের কাছে নমস্কার দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল।

তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মাণ্ডের তুমি গুরু,
যাঁর পাদপীঠ পূজিত হয় দেবগণের দ্বারা।
অখণ্ড আত্মা তুমি,
তুমি ভবরোগবৈদ্য,
তুমি দেবগণেরও গুরু,
তোমাকে নমস্কার করি,
তোমাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার—!

ভারতীয় সুরে এই স্তোত্র—স্বয়ং স্বামীজীর কণ্ঠে!

সমস্ত ভাষণটির মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছিল : খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পশ্চাদ্‌গামী। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সর্বোচ্চ নীতিকেই পৃথিবীর অনুসরণীয় পথ বলেছেন, অপর পক্ষে কৃষ্ণ সবকিছুর ধ্রুব রূপকে দেখেছেন, সর্বাঙ্গে, সর্বাংশে, বিরোধী আদর্শসমূহকে নিয়েই। যাঁরা স্বামীজীর এই চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়—স্বামীজী কেন সরবে বলে উঠেছিলেন : " 'দি সারমন্ অন দি মাউন্ট' মানুষের আত্মার উপরে নূতনতর আর একটি বন্ধন।"

এখনকার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে স্বামীজী জীবনকে তার বাস্তবরূপে বুঝে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের মনোভাব দেখাচ্ছেন। তিনি 'এটা নয়, এটা নয়' মনোভাব কম দেখাচ্ছেন; বেশী ফুটছে—'এই দেখছি, যার পরিণতি এই'—মনোভাব।......

মধ্যাহ্নভোজের পরে বাংলা কবিতার বিষয়ে বললেন। তারপর জ্যোতিষের বিষয়ে। আকাশের তারকারা কি চোখের ভ্রম—খেয়ালী সন্দেহ হাজির করলেন সে-বিষয়ে; কেননা মনুষ্য-অধ্যুষিত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী থেকে—তেমন পৃথিবী সমূহের অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব—কোনো সংকেত আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না কেন?

হিন্দুশিল্পের উদ্ভট চেহারা প্রসঙ্গে কারণ দেখিয়ে বললেন, এর মূলে আছে আত্মিক চেতনাকে দেহবস্তুতে পরিবেশনের জাতীয় প্রবণতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, অধিকাংশ দেহগত বা বস্তুগত জিনিসের আত্মিক প্রতীক রয়েছে, বস্তুর বাইরের চেহারার তুলনায় প্রতীকের চেহারা নিতান্ত পৃথক ও উদ্ভট।

গতকাল বললেন, শিশুকালে সচেতনভাবে ঘুমোতে যাচ্ছেন, এব্যাপার প্রায় তাঁর ঘটেনি। রঙিন আলোর একটি গোলক তাঁর কাছে আসত, সেটিকে নিয়ে তিনি যেন সারারাত খেলতেন। কখনো কখনো সেটি তাঁর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফেটে যেত বিপুল আলোক ছড়িয়ে, আর তিনি হারিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে এ-বিষয়ে প্রশ্নও ছিল : 'ঘুমোবার সময়ে তুমি কি কোনো আলো দেখ?' 'হাঁ,'—তাঁর সবিস্ময় উত্তর— 'কেন, সবাই কি ঘুমোবার সময়ে তাই দেখে না?'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন বললেন, এই অতি-মানসিক বিষয়টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতা জন্মলব্ধ, পরে অর্জিত জিনিস নয়। একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত, অভিজ্ঞতার প্রতিটি স্তরকে স্মরণ রাখায় স্বামীজীর সহজাত ক্ষমতা অতিমানবিক ক্ষমতা; বুদ্ধের সেই শেষ দর্শনেরই এক অংশ এটি, সন্দেহ নেই।

আমরা যখন শেষপ্রান্তে পৌঁছব, তখন আর আমাদের অতীত অবতরণগুলির

বিষয়ে জানতে চাইব না। ম্যারিয়া, টেরেসা, পেট্রার্ক, এবং লরার কোনো তাৎপর্যই আমাদের কাছে থাকবে না, কিন্তু আমাদের উপলব্ধির পর্যায়গুলির মূল্য বজায় থাকবে। **এই জিনিসটি** তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমি এখন তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি; সবকিছুই বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এত স্বতঃসিদ্ধ লাগছে, যা ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্রে অপ্রাপণীয় মনে হয়। আমি নিজেকে বলি : 'অতীতে কী না কালো মেঘ আমাকে ঢেকে রেখেছিল? এত অন্ধ আর অজ্ঞান কেউ হতে পারে!' তুমি যখন আমাকে কঠিন ও শীতল ভেবেছিলে—ঠিকই ভেবেছিলে। আমি নিশ্চয় তাই ছিলাম, এবং তা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে অনুভূতিকে বর্জন করে শুধু মনের দ্বারা কোনো জিনিসকে দেখার ধারাবাহিক চেষ্টার জন্য।

স্বামীজী এখন ভক্তি ও আবেগের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর; তাকে তাড়াতে হবেই—বলছেন তিনি। কিন্তু যে-ভূমি থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, সেখানে মন ও হৃদয়ের কি অসাধারণ একত্ব! যেহেতু তাঁর মন ও হৃদয় উভয়ই পূর্ণ বিকশিত, তাই কোনো একটিকে বাদ দিয়ে চলতে অসুবিধা হয় না।...]

১৩ অগস্ট মিসেস ওলি বুলকে

...বুদ্ধ বলেছিলেন, জীবন তার মূল স্বভাবে নরক। জীবনের অনেকখানি পথ না মাড়িয়ে মানুষ কেন একথা উপলব্ধি করে না তা বুঝতে পারি না। যৌবনে কেন আশার সোনার স্বপ্ন সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে! বহু বহু দিন আগে কি বুঝতে পারা যায়নি যে, সহসা বিস্মিত করে দিয়ে ঐ জ্ঞান বর্ষিত হবে! ব্যক্তিগত কষ্টের জন্য জীবনের রূপকে ভয়ংকর বলছি না,—সে কষ্ট আমার কিছুই নেই। ভয়ংকর হল, প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে মানুষের জীবন চূর্ণ করতে হয়। মিষ্টির দোকানে ভূতের মত খাটে কিছু লোকে যাতে অন্যে সুখ পায়। এই হল সত্য চিত্র। ঈশ্বরকে পর্যন্ত কামনা করতে পারি না, কোনো কোনো মানবিক কামনাকে নিপীড়িত না করে। এমন কোনো আনন্দ আমাদের কাছে আসে না যা যন্ত্রণায় পরিবর্তিত না হয়। 'মানবজীবন নিত্য স্বর্ণ-ক্রুশে গাঁথা আছে।'

কোটিপতি সম্মোহিত হয়ে শুধু চেয়েই থাকে তার স্বর্ণভান্ডারের দিকে। তারপর দারুণ আতংকে একদিন দেখে, সে সব কিছুই পাপের পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। এ ভীষণ দুঃস্বপ্নের কি ইতি নেই? 'স্থান' ধ্বংস হয় প্রলয়ে, তখন সব একাকার, কিন্তু 'কালে'র সমাপ্তি কোথায়?

কিন্তু এসবই তো শূন্য কথা মাত্র। আমাদের গভীরতম প্রকৃতিতে, স্বভাবের গহনে গহনে বাসনার শিকড় প্রবিষ্ট হয়ে আছে। মৃত্যু কি জীবনের মতই? আমি ভাবতাম—আমি তাই জেনে গেছি। ভেবেছিলাম, ওকথা ভাবা খুবই সহজ। কিন্তু তা নয়। এমনকি সুখ ও দুঃখকেও সমভাবে দেখতে পারি না। যেটুকু অংশে তা পারি, তার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র।

শুধু কি **একটি** স্বপ্ন ভাঙতে হবে—হাজার হাজার স্বপ্ন! পর্দার পর পর্দা সরাই—তার পিছনে উদ্‌ঘাটিত হয় দৃশ্যের পর দৃশ্য। শক্তির লোভ জেগে থাকে দূরতম দিগন্তে। সত্যে মানুষ পৌঁছবে কি করে?

দম্ভ, পরচর্চা, আত্মবিজ্ঞাপন, গর্ব, অপরের সম্বন্ধে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা কখনো

মরে না। এগুলি হয়ত বিলাসবাসনার চেয়ে কম নোংরা কিন্তু এগুলিকে মারা বিশ হাজার গুণে শক্ত।

এসব কথা মনে আসছে কেন? জানি না। কিন্তু মন উন্মুক্ত করতেই হবে আমাকে।

আমরা যেন আলোআঁধারির কণ্টক বনে আটক পড়ে আছি—আমরা সকলেই—বের হওয়ার পথ নেই কোথাও। এই শূন্য প্রান্তরের আলেয়া হল অপরকে সাহায্য করার স্বপ্ন, যা আমাদের নূতনতর প্রহেলিকার দিকে নিয়ে যায়। নরকের মধ্যে **আনন্দ কিভাবে সম্ভব?** আর যদি আনন্দ না থাকে, সাহায্যই বা থাকে কি করে? না-পেতে চাইতে পারে মানুষ (অন্তত আত্মপ্রবঞ্চনা করে ভাবে—সে পেতে চায় না!) —কিন্তু **দেওয়ার** স্বপ্ন যে মরে না! দেওয়ার কথা এখানে ছেড়ে দেওয়া যাক, কিন্তু অন্যের জন্য **যন্ত্রণা সহন** তো করা যায়! কী তুচ্ছ এই পরিকল্পনা। কিন্তু অন্যের জন্য সহনের আকাঙ্ক্ষা যে রয়েছে, তা-ই অনুভব করতে হবে। বিরাট একটা কিছু **আছে**। আমরা আমাদের অশক্তি ও নৈরাশ্যের মধ্যেও নিজের প্রেমের বিষয়ে সচেতন। আমাদের সচেতন হতে হবে, এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার পারে কি আছে তার বিষয়ে। হয়তো তাই। কিন্তু তার রূপ জানি না। আমি নিজস্বভাবে সেখানে পৌঁছতে পারব না, যদি না স্বামীজী আলৌকিক শক্তিতে তা আমাকে দেন। সেটা এখন বেশ বুঝেছি।......তিনি কি আমাকে তা দেবেন? হায়, ওগো মহীয়সী সারা! তোমাকে চুপি চুপি বলি—তিনি দিতে পারেন না। আমি যে তাঁকে দিতে চেষ্টা করতে দেখেছি আগে। যদি পারতেন, আগেই দিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর আছে—এই দেবার শক্তি আছে। কিন্তু পাওয়ার ব্যাপারে অনেকখানি যে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করে। তা যে আমার নেই—সত্যই নেই। এমন দারুণভাবে কি আমি পেতে চেয়েছি যার জন্য সব কিছু হারাতে প্রস্তুত? আমি কি মনপ্রাণ, সর্ব স্বাচ্ছন্দ্য (**আসল** স্বাচ্ছন্দ্য; বহিরঙ্গ স্বাচ্ছন্দ্য ভিন্ন জিনিস; বিছানা নরম হোক বা শক্ত হোক, নিদ্রাই আসল জিনিস—সেটাই স্বাচ্ছন্দ্য), স্নেহ মমতা এর জন্য বিসর্জন দিয়েছি? আর ওঁরা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী—কি ত্যাগ করেছেন!—কী না ত্যাগ করেছেন?

স্বামীজী নিজে আমাকে বলেছেন, উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা 'জ্বরের মত' তাঁকে অধিকার করেছিল,—তিনি যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকুন ঐ সংগ্রাম চলছিল,—চব্বিশ ঘণ্টা একটানা বসে, একই আসনে, তারই জন্য। এ আকাঙ্ক্ষা কার আছে?

মুখে এসব কথা বলা কত সহজ যে, আমি **মুক্তি** চাই না, আমি সেবা করতে চাই, বলি দিতে চাই নিজেকে; সেবার প্রয়োজন যখন থাকবে না তখন আত্মবলির কথাও উঠবে না—তখনই মুক্তির সাধনা করা যাবে।

এ চিঠির কথা কাউকে বলো না। এসব কথা কেন লিখে পাঠালাম নিজেই জানি না।......এসব কথা গভীর বাস্তব ও অবাস্তব একই সঙ্গে—কি বল?

[এই পত্রটি আত্মবিশ্লেষণমূলক সুগভীর একটি রচনা। নিবেদিতার আধ্যাত্মিক আকূতি এবং মানবপ্রেমের দ্বন্দ্ব গাঢ় রেখায় অঙ্কিত এখানে। ব্যক্তিমুক্তি ও মানব-সেবার যে-দ্বন্দ্ব গুরু বিবেকানন্দের জীবনে, সেই একই দ্বন্দ্ব শিষ্যার জীবনেও।

বোধহয় এ দ্বন্দ্ব সকল সমৃদ্ধ চেতনার অধিকারী মানুষের জীবনেই ঘটে। বিবেকানন্দ তাঁর গভীরতর জিজ্ঞাসা, যাতনা ও প্রাপ্তির মহিমায় যে জীবনযন্ত্রণার উপরে কখনো কখনো বিরাজ করতে সমর্থ ছিলেন, সেই সমুচ্চ লোকের অধিবাসিনী না হওয়ার জন্য শিষ্যাকে এই জীবনের হিসাব মেটাতেই হয়েছে বারে বারে, এবং সেইজন্যই হয়তো বাইরের জগতের কাছে তাঁর মূর্তি স্পষ্টতর—সেবা ও প্রেরণা প্রত্যক্ষ। নিবেদিতাকে বলা যায়, বিবেকানন্দের মহাজীবনের সংগ্রামক্ষেত্রের বহু পতাকার একটি, সর্বোচ্চ একটি আন্দোলিত পতাকা, বাইরের বাতাসে যার বস্ত্রখণ্ড দুলেছে, কিন্তু যার প্রোথিত দণ্ড শিহরিত হয়েছে নিরন্তর ভিত্তি-পৃথিবীর আলোড়নে।

এই পত্র রচনার অল্প পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী দেশের ব্রিটানী থেকে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একাকী ইংলণ্ড যাত্রা করেন 'ভারতীয় কাজের জন্য সহায় ও সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে'। নিবেদিতা কতদিন ইংলণ্ডে থাকবেন, কিভাবে কাজ করবেন তার কোনো স্থির পরিকল্পনা ছিল না। পুরনো বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কি ভারতীয় কাজের দায়িত্ব আর বোধ করবেন ভবিষ্যতে? বহু বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে স্বামীজীকে, আর একটি নূতন দলত্যাগের জন্যও তিনি প্রস্তুত। শিষ্যার জীবনেও এটি একটি সংকটক্ষণ। স্বামীজী তা জানতেন। এর পরে কি ঘটল তা নিবেদিতার বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাক :

> ব্রিটানীতে আমার অবস্থানের শেষ সন্ধ্যায় নৈশ আহার সমাপনের খানিক পরে যখন আঁধার নেমেছে, লতাপাদপমণ্ডিত আমার ক্ষুদ্র পাঠগৃহের দ্বারে সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বাগানে যাওয়ার জন্য আমাকে ডাকলেন। আমি বেরিয়ে তাঁকে দেখলাম—তিনি এসেছেন তাঁর একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে, যাঁর কুটীরে একত্র তিনি ছিলেন—কুটীরে যাওয়ার পথে এসেছেন আশীর্বাদ জানাতে।
>
> আমাকে দেখে বললেন, 'মুসলমানদের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে, যারা এতই গোঁড়া যে, প্রত্যেক নবজাত সন্তানকে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে দিয়ে বলে : যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে মরো, আর যদি আলি সৃষ্টি করে থাকেন, দীর্ঘজীবী হও। শিশুকে তারা যে-কথা বলে থাকে, আমি তাই তোমাকে বলছি আজ রাত্রে, তবে উল্টো করে : পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ো; আর—যদি **আমি** তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি ধ্বংস হও! যদি **মা ব্রহ্মময়ী** তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, বেঁচে থাকো!'
>
> পরদিন প্রভাতে, ঊষার পরেই, তিনি আবার এলেন বিদায় দিতে। ইউরোপে তাঁর সর্বশেষ স্মৃতির দিকে যখন ফিরে তাকাই, দেখি : আমি বসে আছি কৃষকের পণ্যবাহী গাড়িতে—গাড়ি চলেছে—ওদিকে প্রভাতের আকাশের পটে তাঁর মূর্তি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন লানিয়ঁ-তে আমাদের কুটীরের বাহিরের পথে, ঊর্ধ্বে উত্থিত হস্ত—প্রাচ্যের অভিবাদন—আশীর্বাদও।]"

॥ ১৯০২ ॥

[মহাপ্রলয় এবং পৃথিবীর নবজন্ম—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাইয়ের পরে নিবেদিতার মানস-পৃথিবীর কথা বলতে গেলে বলতে হয়। স্বামীজী ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করেন। এ মৃত্যু নিবেদিতার জীবনে মহাপ্রলয়েরই তুল্য। মুহূর্তের জন্য 'মহানৌতিতে' আচ্ছন্ন হয়েছিল নিবেদিতার অন্তর। কিন্তু স্বামীজীর ভাষার, 'সৃষ্টিগর্ভ মহানৌতি'—নিবেদিতার নবজন্মও হয়েছিল—বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের কুমারী জননীরূপে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে ব্যবহারিক জগতে নিবেদিতার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন—বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। বিষয়টি বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে, এবং তারও পরে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে বলব।

দেহত্যাগের পূর্বে স্বামীজীর উক্তি ও আচরণের বিষয়ে নিবেদিতার অপূর্ব রচনা পাওয়া যাবে 'The Master' গ্রন্থে। সেই রচনা সুপরিচিত। এখানে পুনঃ-উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারণ্যে বলেন নি এমন অনেক তথ্যও নিবেদিতার ব্যক্তিগত পত্রে আছে; তার অল্পবিস্তর পাঠক এখানে পাবেন।]

১৬ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

কী অসাধারণ মহান হয়েছিল শেষ দৃশ্য তা কি জানো? শত্রুরাও এমনকি রুদ্ধশ্বাসে পূজা করেছে! সান্ধ্য ধ্যানের অন্তে নিঃশব্দ দেহত্যাগ—জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত। 'আমার মরণ মহামরণ হবে; হর! হর! হর! বলতে বলতে চলে যাব'—বহুদিন আগে তিনি একদা বলেছিলেন মনে পড়ে। সেকথা সত্য হল। মালা এখনো শুকোয়নি, বর্ম অটুট, সবই ঠিক আছে—তিনি চলে গেলেন। স্বামীজী! স্বামীজী! আপনার অন্তরের অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ করতে পারি—আপনার ব্যক্তিগত খেয়াল বা দুর্বলতার অনুসরণের পরিবর্তে।* মহান শিষ্যত্বের সঙ্গে দুর্বল শিষ্যত্বের পার্থক্য হল, প্রথম ক্ষেত্রে আচার্যের নৈর্ব্যক্তিক দিকেরই—ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয়—ব্যাখ্যা করা হয়।......যা হওয়া উচিত ছিল তার থেকে কত বদলে গেল। দু'মাস আগে স্বামীজী কত রুষ্ট হয়েছিলেন। আর সন্ন্যাসীরাও কত নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেছেন তাই আমার পালন করা উচিত। কিন্তু এখন যা করছি, তা না করে

---

* এই সময়ে নিবেদিতা রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন; তাতে স্বামীজী নানা সময়ে কঠোর নিষেধ করেন। স্বামীজীর এই নিষেধাজ্ঞাকে তাঁর ব্যক্তিগত খেয়াল বলেই নিবেদিতা এই সময়ে মনে করেছিলেন, এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করাকে মনে হয়েছিল তাঁর দুর্বলতার পরিচয়। কিছুদিনের মধ্যেই নিবেদিতা কিন্তু স্বামীজীর কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ২১. ১২. ১৯০২ তারিখের এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—"বিচিত্র কথা হল, এই গোষ্ঠীর (বালীগঞ্জ গোষ্ঠী—সরলা দেবীদের) সর্ববিধ সংস্রব থেকে আমাদের ছেলেদের দূরে রাখার জন্য আমার ইদানীং উৎকণ্ঠা, যা পূর্বে আমার সংস্রবাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর বিরক্তি ও উদ্বেগ ব্যাখ্যা করে দেয়।" এই চিঠিটি পরে অন্য প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হবে।

পারলাম না। আমি এখন ভাব-রূপ; আমার পক্ষে অন্য কিছু মেনে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যু সহজ।

আর বেশী লিখব না। সমস্ত পৃথিবীটাই পূজারত। কিন্তু জানি, তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজামন্দির তোমার হৃদয়। তুমি পীড়িত, আর তোমাকে ক্লান্ত করব না।

২৮ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

সদানন্দ অতীব চমৎকার। আমার কাছ থেকে প্রথম পেলেন তাঁর (স্বামীজীর) অবস্থার বিবরণ। ৪ মে তারিখে চলে যাবার আগেই সদানন্দ বুঝেছিলেন কিছু ঘটবে, কারণ স্বামীজীর 'করুণা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল', খুব নত কোমল লাজুক ভাবে তিনি তাকাতেন, নিজের মনে হাসতেন,—ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন,'এবার ও চলে যাবে, ঠাকুরের মতই, কারণ প্রতিদিন ঠাকুরকে দেখছি ওর মধ্যে।'

......**সদানন্দ জানেন**, তিনি সর্বদাই আমাদের মধ্যে আছেন। যদি আমরা অন্যায়ও করতে চাই 'তিনি রক্ষা করবেন।' সদানন্দ তাঁর কাছে সন্ন্যাস নেন হৃষীকেশে। তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজী, যদি আমার পতন হয়?' তিনি বলেছিলেন, 'হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায় না, **আমারই** দায়িত্ব, **আমিই তোমাকে বেছেছি,** তুমি আমাকে বাছো নি।'......

শেষের তিন বা চার মাস তিনি ভোর সাড়ে তিনটে, চারটের সময় সকলকে ডেকে তুলতেন ধ্যানের জন্য। নদীতে ডুব দিয়ে সাড়ে চারটের সময়ে মন্দিরে সবাই হাজির হত। বহুদিন প্রভাতে যেন আমিও জেগে উঠতুম, তারপরে বসে শুধু প্রণাম করতুম—মিনিটখানেকের জন্য। কিন্তু এখন আবার সকালে ক্লান্ত বোধ হয়, তাই ঘুমিয়ে থাকি।

২৮ অগস্ট, মিসেস হ্যামন্ডকে

তুমি নিশ্চয় শুনেছিলে, গোটা শীতকাল ধরে স্বামীজী খুবই পীড়িত ছিলেন। বারাণসী থেকে ফিরলে পরে তাঁকে দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। তবু কারো মনে হয়নি তিনি দেহত্যাগ করবেন। তাঁর যে অনেক কাজ বাকি। সেই সময়কার প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেছিলেন, তিনি চলে যাবেন, আমরা ভেবেছিলাম তিনি জাপান যাবেন।*......এরপর তিনি নিরাময়ের জন্য কঠোর প্রয়াস পান। উক্ততম তিন মাস তাঁকে জল খেতে দেওয়া হয়নি, পরিবর্তে শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হয়েছিল। তাঁকে জ্যোতির্ময় দেখাত, লন্ডনে যেমন দেখেছি। এই মাসগুলিতে তিনি সকলকে রাত সাড়ে তিনটে-চারটেয় উঠবার জন্য তাগিদ দিতেন। গঙ্গাস্নান করে ধ্যানের জন্য তাদের মন্দিরে বসতে হত সূর্যোদয়ের পূর্বেই। কিন্তু তাঁর স্নায়ু জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল—উন্নতি যদি কিছু হয়ে থাকে বাইরের শরীরের। মন

---

* এই সময়ে স্বামীজীর জাপানে যাবার কথা চলছিল। ওকাকুরা তাঁকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন।

বা স্নায়ুর অবস্থা যাই হোক না কেন, অপরূপ ঐশ্বরিক আলোক অপ্রতিহতভাবে দীপ্ত হতে দীপ্ততর হয়েছে। শেষের প্রায় দশ দিন আগে থেকে পরিবর্তন দেখা গেল। আট দিন পূর্বে ফিরে আমি তাঁর কাছে গেলাম; তিনি বললেন; 'মনে হচ্ছে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি; আর বিরাট তপস্যা ও ধ্যান আমার উপর নামছে; মন্দিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই এখন।'

তাঁর কথার মাঝখানে একটি টিকটিকি ডেকে উঠল। এখানে সকলের কুসংস্কার, টিকটিকির ডাক সত্য হয়। কিন্তু স্বামীজী আরও অন্তত তিন চার বৎসর আছেন, এবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে, ব্যাপারটার কল্পনাও মনে জাগেনি। এ ঘটনা রবিবারের। শুক্রবার তিনি ছেড়ে গেলেন।

বুধবার আমি আবার গেলাম। সকাল ন'টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিলাম। আহা, কী মধুরতা! মনে হয় তিনি জানতেন, আর দেখা হবে না। কী আশীর্বাদ! কী মধুরতা! বলে তা বোঝানো যাবে না। কিন্তু যদি আমি জানতাম—যদি! তাঁকে বেশ ভাল দেখাচ্ছিল বলে আমার মাথায় তখন একটিই চিন্তা—কি করে তাঁকে যত্নে, সাবধানে রাখা যায়! তাই এমন কোনো বিষয় উত্থাপন করিনি যাতে উত্তেজনাবৃদ্ধি ঘটতে পারে—বেশী সময় থাকতেও আমি ভয় পেয়েছিলাম পাছে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যদি জানতাম—তাহলে প্রতিটি মুহূর্ত কত মূল্যবান—অথচ কী অসহ্য হয়ে উঠত!

জোর করে আমার পরিচর্যা করলেন, একথা কাউকে বলো না যেন। খাওয়ার সময়ে বাতাস করতে লাগলেন। খাওয়ার পরে হাত ধুইয়ে দিলেন। আমি বললাম— 'অসম্ভব—এ কাজ আপনি আমার জন্য করবেন!—এ তো আমার কাজ।' তিনি হাসলেন। তারপর নিজস্ব বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন—'কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' আমার ঠোঁটে এসে গেল বলে ফেলি—'সে তো তাঁর শেষ ক্ষণে—।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে কথা বলিনি।

চলে এলাম। শুক্রবার তিনি কলকাতায় সংবাদ পাঠালেন—'এখন সবচেয়ে ভালো।' মন্দিরে কাটালেন দুপুর পর্যন্ত, তারপর তিনঘণ্টা ধরে ছেলেদের সংস্কৃতের এক পাঠ দিলেন। সমস্ত বিকেল ধরে বহু লোকের সঙ্গে অনির্বচনীয় মধুরতায় কথা বললেন। সাড়ে চারটের সময়ে তাঁর পাঠানো সংবাদ কলকাতায় পৌঁছল। ঐ সময়ে এক কাপ গরম দুধ ও জল পান করলেন। তারপরে বেড়িয়ে এলেন দু'মাইল। ফেরার পরে সকলকে সরিয়ে দিলেন যাতে একাকী ধ্যানে বসতে পারেন, সন্ধ্যালগ্নে। অদ্ভুত কথা বলি, সেদিন প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে উত্তরপশ্চিম দিকে মুখ করে ধ্যানে বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ফিরে শুয়ে পড়লেন। এক বালক ব্রহ্মচারীকে ডেকে বাতাস করতে ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। ঘুমোলেন প্রশান্তভাবে।

সহসা ঘুমের মধ্যে শিহরণ, কান্না যেন, গভীর এক শ্বাস, অনেকক্ষণ বাদে আর একটি শ্বাস—সেই শেষ। আমাদের প্রিয়তম আচার্যদেব আর নেই। জীবনের সন্ধ্যাসঙ্গীত স্তব্ধ, পৃথিবী নীরব, আর মুক্তির অরুণোদয়।

শেষের দিনগুলিতে কী মাধুর্যের আর আশীর্বাদের ছায়া আমাদের উপর বিস্তার করেছিলেন—সে কথা বলার শক্তি কার আছে!

নিশ্চয় জেনো, প্রিয় তোমরা, তাঁর বিরাট হৃদয় হিসাব নেবার সময়ে তোমাদের বিস্মৃত হয়নি। আ—হাঁ, এখনো আমাদের তিনি মনে রেখেছেন, তার অনেক অনেক ইঙ্গিত পেয়েছি। চিরসমাধির অর্থ যাই হোক না কেন, তার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর বিশাল শক্তি—উদ্ধারের, পরিত্রাণের!

কিন্তু আমার কামনা—সবাই ভুলে যাক তাঁকে, যাতে তিনি সচ্চিদানন্দের মধ্যে বিলীন থাকতে পারেন, এ জীবনযন্ত্রণার স্মৃতি যেন তাঁকে সেখানে বিক্ষুব্ধ করে না তোলে।

ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর মূল সাধনার উত্তরাধিকার নিতে আমার প্রাণ কী যে ব্যাকুল কি বলব! দীর্ঘ—দীর্ঘ যদি হয় ভয়ংকর পথ, তবু সে আনন্দের যাত্রা। আমি যেন এই ব্রতের শক্তি পাই, জ্ঞান পাই, যেন বিশ্বস্ত থাকি,—এই প্রার্থনা করো। আমার জন্য আর কিছু চেয়ো না। না না না—আর কিছু চাই না। প্রিয় নেল, তিনি নেই—একথা সত্য নয়; তিনি আছেন—সর্বদা আছেন আমাদের মধ্যে। শোক পর্যন্ত করতে পারছি না—শুধু কাজ করতে চাই।

৪ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

দিন চলে যায়। প্রতিদিনের শেষে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে দেখি যে, আমি সত্যই আমার পিতার নিজস্ব কাজই গ্রহণ করেছি।......

১৪ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

শেষ বুধবার সকালে পিছনের বারান্দায় বসে কথা বলার সময়ে শেষ যে-প্রসঙ্গ তিনি করেছিলেন তা তোমাদের বিষয়ে পূর্ণ।—লেগেটের* মত ভালবাসতে কোনো পুরুষ পারেনি; তাঁর সুগভীর ব্যবসায়িক সাধুতা, চরিত্রের শুচিতা, লেডী বেটীর জন্য উদ্বেগ—ইত্যাদি। লেডী বেটীর (মিসেস লেগেট) বিষয়ে: তাঁর ভাবালুতা-হীনতা, নিজ পছন্দের বিষয়ের সঠিক নির্বাচনে তাঁর বিশেষ বুদ্ধি। আর তুমি!—নিতান্ত শিশুসুলভ বিশ্বাসের সঙ্গে (কথাটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিলেন) উদ্ভট সন্দেহের—ডাঃ এলমার গেটস্-এর বিষয়ে—বিচিত্র মিশ্রণ! যথার্থত তাঁর মন তোমাদের নিয়েই ছিল—অতীতের স্মৃতিচর্বণায় নিমগ্ন, যে-অতীত তাঁর কাছে নিত্য বর্তমান। আর—এমনকি তাঁর চলতি কোনো ভাবনার ছোঁয়া পেয়েছে কেউ, সেও তো মহা আশীর্বাদ!

জীবজন্তুগুলির গল্প তিনি করলেন। পুরনো মজার ভঙ্গিতে 'গেজেট' শব্দটি বললেন, যা হেল-কন্যাদের উদ্দেশে আমার দীর্ঘশ্বাস এবং চিন্তাকে উদ্রিক্ত করল—সুতরাং তাদেরও তিনি স্মরণ করেছিলেন।

শেষ শুক্রবারে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে পুরনো মিষ্টভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেছিলেন। কথার সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতাও ছিলেন। সেই অপরাহ্ণে স্বামীজী ছেলেদের বলেছিলেন: 'কেউ যদি কখনো আমাকে নকল করে, তাকে

* মিস ম্যাকলাউডের ভগিনীপতি মিঃ লেগেট, স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী ও আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলনের সহায়ক।

পদাঘাতে দূর করে দেবে। আমাকে নকল করতে চেয়ো না।' হাওড়া রোড পর্যন্ত তিনি বেড়িয়ে এসেছিলেন—যে-পর্যন্ত তুমি প্রায়ই ভ্রমণ করতে।

তোমার জন্য আসল বার্তা কিন্তু এসেছিল চিতাগ্নি থেকেই। দুটোর সময়ে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি—বিছানার উপর পাতা একটি বস্ত্রখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ওটাও কি পোড়ানো হবে? ওটাই যে শেষবার আচার্যকে আমি পরতে দেখেছি।' সারদানন্দ সেই কাপড়টি আমাকে দিতে চাইলেন। আমি নিতে পারলাম না, শুধু বললাম, 'যদি য়ুমের জন্য পাড়ের কাছে কোণের একটুকু কেটে নিতে পারি—।' কিন্তু ছুরি বা কাঁচি কিছুই ছিল না আমার কাছে। তাছাড়া কাজটা দেখতেও ভাল হত কি না সন্দেহ। সুতরাং কিছু করলাম না। ছ'টার সময়ে—পাঁচটার সময়ে কি?—আমার প্রথম চিঠিতে সময়টি ঠিক লেখা আছে, মনে হয় ছ'টাই হবে,—হঠাৎ কে যেন আমার জামার হাতায় টান দিল। চোখ নামিয়ে দেখি—অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে আমার পায়ের কাছে উড়ে এসেছে ঠিক সেই দুই-তিন ইঞ্চি বস্ত্রখণ্ড—আমার প্রার্থিত। সমাধির অপর পার থেকে সে যেন তাঁর পত্র, তোমার জন্য—আমার ধারণা। তাই আমার মনে হয়, সে জিনিসটিকে তিনি হারিয়ে যেতে দেবেন না ডাকের গোলযোগে।

ব্যাপারটা গিরিশবাবুকে শোনালে তিনি শুধু শান্তভাবে বললেন, 'এ জিনিস অপরিচিত নয়।' তাঁর কাছে এ জিনিস খুবই স্বাভাবিক—কারণ স্বামীজী—আমাদের স্বামীজী **মারা যাননি**।—প্রিয় য়ুম! দেখতে পাচ্ছ না—এখন তিনি **স্বয়ং তিনি**—তিনি মৃত নন— জীবিত জীবিত চিরজীবিত। আর একটু কথা আছে। আমি জানি, কোনো বিশেষ ভাবে তিনি কিছু সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে বদ্ধপরিকর। সে ব্যাপারটি কি? তা কি—কোনো বিষয় থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করতে চাইছেন ঘিরে রেখে? নাকি তিনি আমাদের বেগে চালিত করে বিজয়শ্রী দান করবেন? প্রিয় য়ুম, তিনি **তখন** এটা-সেটার বিষয়ে কী বলেছিলেন, সেকথা তোমার জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। **এখন** তিনি কী বলছেন, সেটাই আসল কথা। তাঁর প্রকাশ কি স্তব্ধ হয়েছে!

[স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও তাঁর অশরীরী উপস্থিতিকে নিবেদিতা নানাভাবে অনুভব করেন। আরও কেউ কেউ তাই করেন। এর পর থেকে নিবেদিতা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান তত্ত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হন। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহান্তের পরে যীশুখ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়ে ভক্তদের দর্শন দিয়েছিলেন, এমন কথিত আছে। স্বামীজীর "পুনরুত্থান" সম্বন্ধে নিবেদিতা এমনই স্থিরপ্রত্যয় হয়েছিলেন যে, The Master গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যোগ করেন। নিবেদিতার মত যুক্তিবাদী মনস্বিনী কোনো কিছুর পক্ষে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ না পেলে তাকে মেনে নেবেন এমন ভাবাই যায় না।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের পত্রে নিবেদিতা এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবের কথা লিখেছেন—

"সেদিন ১৩ ডিসেম্বর, শনিবারের সন্ধ্যা; সদানন্দ বললেন, খণ্ডগিরিতে ক্রীসমাস ইভ উদ্‌যাপন করতে গেলে কেমন হয়! মর্মরিত বৃক্ষসহ দক্ষিণে

খাড়া পাহাড়, তাতে জনহীন গুহাগুলি—আর আমরা নীচে ঘাসের উপরে বসে আছি দীর্ঘ-শিখা কাঠের আগুনকে ঘিরে। সদানন্দ ও ভাইপো (স্বামী শঙ্করানন্দ) রাখালিয়া সাজে—দীর্ঘ দণ্ড নিয়েছে, কম্বলে আধখানা ঢেকেছে মাথা। আমরা পড়তে লাগলাম প্রাচ্যের জ্ঞানী মানুষদের কথা, মাঠবাসী রাখালদের কাছে রাত্রে দেবদূতগণের আগমনের কথা।

পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে এগিয়ে গেলাম। সেই শেষ অধ্যায়ের সত্যতা ও সরলতা কী অপূর্বভাবে অনুভূত হয়ে উঠল—যার মধ্যে ফেলে-যাওয়া শিষ্যদের কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈশ্বরপুত্রের আকৃতির ইতস্তত রেখাঙ্কন।......

'পুনরুত্থান' আর আমার কাছে স্পষ্ট স্থূল অলৌকিকতা নয়। অতি গভীর আধ্যাত্মিক মানুষের কাছে যা প্রায়শঃ অনুভূত হয় এমন বাস্তব সান্নিধ্য,—একবার সে অনুভূতির সূচনা হলে তা একেবারে সর্বগ্রাসী চেতনা। পাকা সন্দেহবাদীর ক্ষেত্রেও একই ঘটে। পুনরুত্থিত জীবনের চল্লিশটি দিন—ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্বেকার তিন বৎসরের অপেক্ষা বহু বহু গুণে ঘনিষ্ঠতর, মধুরতর, পবিত্রতর, অথচ অধরা ও অতীন্দ্রিয়।

আমার কি মনে পড়েনি যে—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সপ্তাহমধ্যে স্বামীজী 'একটি জ্যোতির্ময় রূপ দেখেছিলেন!' আমার নিজ ক্ষেত্রেও—তাঁর জ্বলন্ত চিতা থেকে উড়ে-আসা বার্তা—অন্য একজনের কাছে পাঠানোর জন্য! মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হল, সেই গোড়ার দিনগুলিতে এইসব মুহূর্ত কি আমাকে স্মরণ করতে হয়নি? এ-ই পুনরুত্থানের সত্যতা কি বুঝিনি! এবং সেই কালে 'পুনরুত্থান'-লেখকের দুর্গতি কি **আমি স্বয়ং উপলব্ধি** করিনি, যে-লেখককে এখানে-ওখানে ফুটে-ওঠা ইশারাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, কিন্তু দেখছেন, তাঁর নিজ লেখনীতেই ইশারাগুলি স্থূল অবয়বে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে!

মেরী ম্যাগডালেনের গল্পটি। 'এই লোকটি যদি প্রফেট হয় তাহলে এর জানা উচিত এই নারী কে এবং কি জাতীয়?' একেবারে সঠিক ঘটনা। আমরাও কি অনুরূপ ক্ষেত্রে হাজারবার ছিদ্রান্বেষী সমালোচনা শুনিনি?

মনে উদিত ভাবনার তৎক্ষণাৎ উত্তরও এসেছিল—প্রত্যক্ষ উত্তর, একইসঙ্গে অপ্রত্যক্ষও এবং সুমহান। অপরূপ কথা—প্রাচ্যের প্রাণবাণী যেন উন্মোচিত হয়েছিল একটিমাত্র ভাষণে! আমিও শুনেছি ঠিক একই ধরনের উত্তর একই জাতীয় ভাবনার ক্ষেত্রে।

প্রান্তরবাসী রাখালদের বিষয়ে সদানন্দ বললেন, দেবদূতেরা **নিশ্চয়ই** তাদের কাছে এসেছিলেন, কারণ তারা সাদা-মাঠা লোক। সদানন্দের মতে, রাখালদের অমার্জিতভাব কাহিনীর সত্যতা দেখিয়ে দেয়, কারণ তাদের পক্ষে কথার কারুকার্য করা সম্ভব নয়। 'কিন্তু মেরী এই সমস্ত জিনিস অন্তরে ধরে রেখেছিলেন এবং তার অনুধ্যান করতেন......'

The Story of Mary and Martha.

The Last Judgment, 'In as much as ye did it unto one of the least of these, ye did it unto the—' India itself!

The three Disciples who Offered themselves . . .

অতএব খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের পুরাণ-কথা পুনরায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে পুনঃ-নির্ধারিত, পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত—এই প্রাচ্য দেশের প্রজ্ঞা, চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের দ্বারা আলোকিত হয়ে।"

খণ্ডগিরিতে এই ক্রীসমাস ইভ উদ্‌যাপনের বিবরণ নিবেদিতা তাঁর The Master গ্রন্থে দিয়েছেন—একথা আগেই বলেছি। ঐ বিবরণীতে পাই, তাঁরা Gospel of St. Luke পাঠ করেছিলেন। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে দেবদূতগণের যে-গীতির কথা তিনি বলেছেন তা হল :

Glory to God in the highest,
And on earth peace,
Goodwill toward men!

উদ্ধৃত পত্রে নিবেদিতা যে কথা লিখেছেন, তাকে আরও সুসংবদ্ধ চিন্তায় গ্রথিত করেছেন গ্রন্থমধ্যে। অংশটির অনুবাদ দিচ্ছি :

"যীশুর মহাজীবন সমগ্রতঃ আলোচিত হল। তারপর তাঁর মহামৃত্যু এবং পুনরুত্থান। গ্রন্থের চব্বিশ-এর অধ্যায়টি থেকে একের পর এক ঘটনা পড়ে যেতে লাগলাম।

এই কাহিনী এই সময়ে কানে যেভাবে বাজতে লাগল আগে তেমন কখনো হয়নি। সন তারিখযুক্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণসিদ্ধ আইনসঙ্গত দলিল-বিশেষ নয়, যার বিশ্বাসযোগ্যতা বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জলতা ও সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল,—তার পরিবর্তে অস্পর্শ ও অনির্বচনীয়ের দ্রষ্টার প্রায়-রুদ্ধশ্বাস, আকূতিপূর্ণ অর্ধব্যক্ত উচ্চারণতুল্য মনে হল। পুনরুত্থানের ঘটনা আমাদের কাছে গ্রহণ বা বর্জনযোগ্য এক বিশেষ ঘটনার বিবরণ না হয়ে তা চিরকালের আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির রূপ নিল, যাকে একজন কেউ অনুভূতিতে পেয়েছেন, শব্দে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সব সময়ে সফল হননি। সমস্ত অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ, ইঙ্গিতপূর্ণ, বিশ্বাস উৎপাদনের এক ব্যাকুল প্রয়াসের মত—শুধু পাঠকের জন্য নয়, কিছু পরিমাণে স্বয়ং লেখকের জন্যও।

কারণ, আমরাও কি অনুরূপ পুনরাগমনের চকিত ঝলক পাইনি, 'পুনরুত্থান'-কাহিনীর পাশেই যাকে স্থাপন করা যায়! স্বয়ং আচার্যদেব সচেতন স্পষ্ট ভাষায় যে-কথা বলেছেন তা কি সহসা মনে পড়েনি এবং তার তাৎপর্য কি উপলব্ধ হয়নি : 'আমি অনেকবার লোকান্তরিত আত্মাদের এ জগতে ফিরে আসতে দেখেছি, এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরের সপ্তাহে দেখেছি সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে।'

আমরা এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালাম : অদৃশ্য প্রভুকে পুনর্দর্শনের জন্য শিষ্যরাই শুধু ব্যাকুল হন না, গভীরতর আকৃতি বোধ করেন স্বয়ং অবতার তাঁর ছেড়ে-আসা শিষ্যদের কাছে ফিরে আসতে, সান্ত্বনা দিতে ও আশীর্বাদ জানাতে।

'পথিপার্শ্বে তিনি যখন আমাদের সংগে কথা বলিতেছিলেন, তখন কি আমাদের হৃদয় শিখাময় হয় নাই?'—এমনই উদ্দীপ্ত ক্ষণ আমরা কি বহুবার পাইনি, জানিনি? —আচার্যদেবের মহাসমাধির পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে—যখন আমরা প্রায় বিশ্বাসই করেছিলাম যে তিনি সত্য সত্যই আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আছেন!

'রুটি-প্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার সময়ে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল'। —এও ঠিক। কোথাও একটু স্পর্শ, বা একটি শব্দ, মধু মুহূর্ত, কিংবা সহসা আলোকে উদ্ভাসিত অন্তর, জ্ঞানের লব্ধ দ্যুতি,—নানা সময়ে প্রাপ্ত এর যে-কোনো একটিই সেই গোড়ার সপ্তাহগুলিতে 'হাঁ তিনি আছেন', এই অনুভূতিতে হৃদয়কে মথিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; সেইসংগে সংশয়ও ছিল, ঐ 'দর্শন' হয়ত আমাদেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষার রচনা; সেইসংগে ছিল নিশ্চয়তা—আমাদের প্রার্থনার টানেই ঐ আবির্ভাব।

পুনরুত্থানকাহিনীর আপাদমস্তকে বিশ্বাসী কেউ যেভাবে পরবর্তীকালে গল্পটির পুনর্গঠন করেছেন—আমরা সে-রাত্রে খণ্ডগিরিতে পাঠকালে সেই অংশে মনোযোগ দিলাম না। পরবর্তীকালে চুনকাম করা কাহিনীর ভিতর থেকে ঝলসে-ওঠা সহজ সরল পুরাতন বিবরণীর দিকেই আমাদের মন গেল, যার মধ্যে সহসা-দর্শনের হর্ষ, অদর্শনের বিষাদ, একাদশ শিষ্যের একত্র হয়ে পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি— 'সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হইয়াছেন',—এবং আশীর্বাদপ্রাপ্তি অন্তে বিদায়।

পাঠকালে আমাদের বোধ হল, পুরাতন কাহিনী কোনো শারীরিক প্রত্যাবর্তনের কথা বলেনি। তার পরিবর্তে—প্রভু ও শিষ্যগণের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির সহসা অভাবিত সম্মিলন, প্রভুর ইচ্ছা ও ভালবাসার প্রত্যাবর্তন, শিষ্যের প্রার্থনার চকিত ঊর্ধ্বগমন প্রভুর উদ্দেশে, যিনি, বৈদিক উক্তি অনুযায়ী এখন জ্যোতির্ময় স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, আমাদের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম এবং গভীর জগতে ক্রিয়াশীল—যে-বিষয়ে ইন্দ্রিয়-ভূমিতে আবদ্ধ আমরা কোনই ধারণা করতে সমর্থ নই।

আবার সেগুলি এমন বস্তুগত ব্যাপার ছিল না যে, সকলেই সমভাবে এইসব অর্ধ-শ্রুত, অর্ধ-দৃষ্ট ক্ষণিক আভাসগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে সমর্থ। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্নেরা সেগুলি ধরতেই অপারগ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্নের কাছেও ঐগুলি সংশয়সাপেক্ষ, উদ্গ্রীব আলোচনা সাপেক্ষ, ক্রমপরম্পরায় গ্রন্থনযোগ্য, এবং হৃদয়ের কোমল অনুভূতিমধ্যে ধারণযোগ্য বিষয়। খ্রীষ্ট-শিষ্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম এবং সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্যদের মধ্যেও কেউ থাকতে পারেন যিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু তবু...তবু...সেই রাত্রে আমরা যারা পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় খ্রীষ্টীয় পুরাণকথা পাঠ করেছিলাম খণ্ডগিরির গুহাগহনে ও আরণ্য পরিবেশে —আমরা অনুভব না করে পারিনি যে, ঐ কাহিনীর ভিতরে ও বাহিরে একটি সত্য ঘটনার সূত্র ওতপ্রোত হয়ে আছে; কোনো একজন মানব পলাতক অভিজ্ঞতার ক্ষণ-উদ্ভাসিত জ্যোতি-রেখাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কোনো এক স্থানে এবং কোনো এক সময়ে—আমরা তাঁরই পদচিহ্ন সন্ধান করছিলাম। আমরা

তেমনই বিশ্বাস করেছিলাম, তেমনই অনুভব করেছিলাম, কারণ যতই ক্ষণকালীন হোক অনুরূপ সময়ে অনুরূপ উন্মোচন আমাদের কাছেও হয়েছিল।"

পুনরুত্থান সম্বন্ধে নিবেদিতার বিশ্বাসের পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়াও তাঁর পরম বিশ্বাসভাজন একজনের 'দর্শনে'র সমর্থনও ছিল। বৎসরখানেক পরে লেখা একটি চিঠি এখানে আগেই উদ্ধৃত করছি : (মিস্ ম্যাকলাউডকে—১৪ জানুয়ারী ১৯০৪)—

'জাপানের কর্মক্ষেত্র যদি তুমি স্বয়ং আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে না দিতে, তাহলে সদানন্দ কখনোই সেখানে যেতেন না—তাঁর দেহে স্বামীজী সেই ভূমিতে যেতে চান, এই আমার বিশ্বাস। এরপর যে-কথা বলতে যাচ্ছি সেকথা ভবিষ্যতে আমার কাছে বা-অপর কারো কাছে কখনোই তুলবে না; অত্যন্ত পবিত্র গোপন বস্তুর মত একে রক্ষা করবে। **স্বামীজী সদানন্দের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।** সেই আবির্ভাবের কালে সদানন্দের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সদানন্দ পূর্ণ হয়ে আছেন এই বিষয়ে। তিনি অনুভব করছেন—চরম সিদ্ধি পেয়ে গেছেন। তিনি জানেন যে সবই সত্য এবং আমরা পেঁৗছে গেছি।]

১৯ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

তুমি রিজলিতে। সবই কেমনভাবে না মনে পড়ছে!...আঃ সেই ঘরটি, মহা আশীর্বাদের ঘরটি...।

তোমাদের হলঘরের আগুনের পাশে বসে আছি—এই ছবি অগণ্যবার দেখি—বসে আছি আর তিনি বলে যাচ্ছেন—বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যায়—

সবই মনে হচ্ছে ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থ নয় সেই সেই মহাজীবন। তার পূর্ণ বিজয়।

॥ ১৯০৩ ॥

২০ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

(বিকেল তিনটে, মাদ্রাজের ক্যাসল কারনেন থেকে)। আজ স্বামীজীর জন্মতিথি, সুতরাং তোমাকে কিছু লিখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারা সকাল পূজায় কেটেছে। এখন ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিচ্ছি। আগামী কাল সকালে কলকাতা যাত্রা করব। বাড়ি পেঁৗছে তৃপ্তি পাব।...স্বামীজীর প্রতিটি মতকে এখন ফিরে ফিরে অনুভব করতে পারি। আমি যেন অনুভব করছি দশহাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারি, যাদের কথা তিনি সর্বদা বলতেন,—যেমনভাবে তিনি রামকৃষ্ণ তৈরী করার কথা বুঝতেন, ভাবতেন।

২৮ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

আমি শুধু শক্তি চাই—সর্বপ্রকার শক্তি। শক্তি আর আলোক। দশ বছরই তাহলে যথেষ্ট।......

সত্যই আমি একাকী কাজ করে আনন্দ পাই, স্বামীজীর মতই। প্রিয় য়ুম, তিনি 'মানুষ চাই' বলে আর্তনাদ করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, যবনিকাপাতের পূর্বে কোন্ ভাবের জন্য তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন তা পরিষ্কার হবে না। সেই সেই ভাব যখন উন্মোচিত হবে, তখন তার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে সমবেত হবে। রামকৃষ্ণের মত তিনিও অসচেতন, যদিও তিনি যে অসচেতন হতে পারেন একথা ভাবতেই পারতেন না।

মানুষ নিজেরাই আসবে—কারও সাহায্যের দরকার নেই। তিনি চুম্বক—যার টানে ইস্পাত টুকরো হয়ে ছুটে আসে।

২৩ এপ্রিল, সেন্ট ডোরাকে

(সেন্ট ডোরা গুরুতর অসুস্থ)

প্রিয় সেন্ট ডোরা, যদি তুমি সত্যই এত শীঘ্র ছেড়ে চলে যাও, এবং যদি তুমি তারপরে তাঁর সাক্ষাৎ পাও (পাবেই জানি), যাঁর উদ্দেশে আমার সকল প্রার্থনা নিবেদিত, তাঁকে বলো, তিনি যেন আমার হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখেন, সেখানে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততার কোনো হানি ঘটেছে কি না—যে-বিশ্বাস তিনি পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁকে অন্ততঃ একথা বলো—একমাত্র তিনিই ভাঙেন বা ভাঙতে পারেন। এই আশিসই তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই। তাঁকে আরও শুধিয়ো, অবতারই তো শুধু পৃথিবীকে বলতে পারেন—'আমাকে যেভাবে পারো ভালবাসো, **আমাকে ভালবাসাই মুক্তি।'** (এই কথাগুলি স্বামীজী বলেছিলেন।)।......

তুমি তাঁকে কোন্ সংবাদ দেবে? তিনি পিছনে একটি ভাব রেখে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, কোনো ভাবকেই তার শুদ্ধ স্বরূপে কাজে পরিণত করা যায়নি। সুতরাং মানুষ লড়াই করতে বাধ্য;—যদি তার সংগ্রাম সফল হয়, সে সাফল্যই সম্ভবতঃ হবে চরম পরাজয়। কিংবা যদি সাফল্য না ঘটে—সেই যে প্রত্যক্ষ পরাজয়—তাকে বরণ করার মত সাহস আমার নেই।

'তাঁর ভালবাসা চিরন্তন—আমাদের তরে।'

সত্য নয় কি?

...আমাদের মধ্য থেকে চলে যাবার পরেও তিনি আবার স্পর্শ করতে, সাহায্য করতে, পথ দেখাতে চেয়েছেন। তোমার রোগের ও নিঃসঙ্গতার ক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ কি এখনো তোমার সাথে আছেন? তাঁর সঙ্গে একলা আছ—তোমার হৃদয়ভরা কী না কৃতজ্ঞতা! কোনো উৎকণ্ঠা নেই—দায়িত্ব নেই—রোগে তুমি মুক্ত-প্রাণ।

প্রিয় সেন্ট ডোরা, তুমি কি বুঝতে পারো—কী তোমার অসীম ভাগ্য!......

তোমার 'দর্শনে'র সৌভাগ্যে কতই না ঈর্ষা হয়! 'চির শান্তি'র সঙ্গে তুমি আমাদের সংযোগসূত্র—আমাদের কাছে তোমার অস্তিত্বের মূল্য কতখানি তুমি

জানো না। জীবন ব্যর্থ মনে হয়। অথচ এখনো, যদি তুমি বলো যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন—আমি তা বিশ্বাস করব।

২৯ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

তুমি নিঃসঙ্গ। তোমাকে কাছে পেতে কত না চাই! কিন্তু তা আমি পেতে পারছি না। কেন তা তুমি বুঝবে, আমি জানি। ব্যর্থতা বা সফলতা,—**বিশ্বস্ত** থাকতেই হবে আমাকে। যদিও ব্যর্থতাই প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে, তবু **তিনি** তাঁর বিরাট হৃদয় নিয়ে যখন আমাদের চেয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিতে এইসব জিনিস দেখেন, তখন হয়ত আমরা যেখানে নৈরাশ্য ও নিঃসহায়তা দেখছি—তিনি দেখেন সাফল্য।......

ঈশ্বর শক্তি দিন! তাঁর (স্বামীজীর) নামে যেন সাহসদীপ্ত সত্যবাণী উচ্চারণ করতে পারি। আমার সেই বাণীতে যেন প্রবাহিত হয় তাঁর অবিকৃত অব্যাহত জীবন। তার ফলে আমি যেন দেখি—আবার প্রদীপ্ত হয়েছে তাঁর মুখ শেষ বিশ্বাসে; তিনি অনন্তে প্রস্থান করছেন এই জেনে যে, আমি তাঁকে নিরাশ করিনি! এই—এই—এই—আমার প্রার্থনা।

২০ মে, ম্যাকলাউডকে

নিজের মধ্যে বিরাট আত্মবিশ্বাস বোধ করেছিলাম—পৃথিবীকে উল্টে দিতে পারে এমন জীবনীশক্তি যেন আমার মধ্যে! অথচ আমি শূন্যে আর্তনাদ করছি—বাতাসেই তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! আঃ—স্বামীজী! আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস কী গভীরই ছিল!

কিন্তু তাঁদের আমি ক্ষমা করতে পারি না; 'তাঁদের' বলতে—শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী। কিন্তু তাহলেও, পৃথিবীর বিনিময়েও, আমি স্বামীজীর শান্তি বিঘ্নিত করব না। আমি শুধু তাঁর বোঝা তাঁরই জন্য বইতে চেয়েছি!—যদি আমাকে সরে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হত! তুমি জানো, আমি বিশ্বস্ত থাকতে **চেয়েছি**! তাঁরা এক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করতে, ঠিকপথে রাখতে পারতেন! হাঁ, ঠিক, তবে কিনা আমাকে তো কখনোই ঠিকভাবে চালানো সহজ নয়!

১৮ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে

আমার মধ্যে বিরাট শক্তিকে অনুভব করছি—দর্শনের, অনুভবের, ভক্তির,—দেখছি এমন শক্তি যা অতীব অতীব বিরল। পুরুষের বিচারশক্তিতে যেন নৈতিক পক্ষাঘাত এসে গেছে। যারা মানুষ হিসাবে ভালো, তারা আজেবাজে জিনিসে ব্যস্ত—যখন ধর্মযুদ্ধের হুঙ্কারে তাদের চারিদিক বিদীর্ণ করার কথা! আর যারা মন্দ তারা তো তাতেই ডুবে আছে।

২৩ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

মনে হয় তুমি জানো এই শীতে পাশ্চাত্ত্যে যাচ্ছি না। মিঃ স্টেডকে লিখে দিয়েছি, তাঁর প্রস্তাব নিতে পারব না, যদিও তাঁর প্রস্তাব আমার যে-কোনো

কল্পনার অতীত ছিল।* কিন্তু এত বেশী পথ এখানে খুলে যাচ্ছে,—বেট-এর স্কুল, মুসলমান-সংযোগ, আমাদের সঙ্গে মিস লকউডের যোগদানের সম্ভাবনা, বিজ্ঞানের কাজ, পল্লীর জন্য হাজারো পরিকল্পনা,—এইসব দেখে মনে হচ্ছে স্বামীজীর ইচ্ছা আমি এখন এখানে থাকি। আর এখানে থেকে কাজ করাই তো শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রধান ও স্থায়ী ইচ্ছা। 'আর তাঁর ইচ্ছাই আমার শান্তি।'...তাঁর জীবন সম্বন্ধে সর্বদা অনুধ্যান করে যাব, ইতিমধ্যে বহু ভাব সেই ধ্যান থেকে মনে জেগেছে।

॥ ১৯০৪ ॥

২১ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী বিষয়ে চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। তিনি তাঁর শেষ অসুখে বিছানায় শায়িত। সহসা তিনি আমাদের সকলকে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করলেন। খুব মৃদু মধুরভাবে কিছু বললেন। তারপর—'মার্গট, তোমার এত চুপচাপ থাকার দরকার নেই, পরের বার এই দরজায় এসো কোনো গাড়িতে, আর খুব **পাজি** গাড়ি হোক তা,'—তিনি বললেন। স্বপ্ন কত উদ্ভট হয় জানোই, কিন্তু আমার ধারণা হল—এই স্বপ্নটি, আমি যে স্বামীজীর ব্যক্তিগত ভালবাসাকে স্মরণ করেছিলুম, তারই ছদ্মবেশ। তিনি মুখরতা অপছন্দ করবেন না। তিনি খুবই জানতে চাইবেন কেন মানুষ তাঁর কাছে এসেছে!

১৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

বছরের চাকা ঘুরে আমরা আবার একই দিনে ফিরে আসি। পরের শুক্রবার, ২৫শে মার্চ—এইদিন আমার 'নিবেদিতা' নামের জন্মদিন। তাহলে আমি সাত বৎসরে পড়লাম। তাঁর সেবায় ধন্য হোক ঐ দিন। নির্দোষ, নিখুঁত হোক আমার সেবা—কিন্তু সে যে বড় বেশী আকাঙ্ক্ষা।

তোমার কি মনে পড়ে কিরো† ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—আমি ৪২ থেকে ৪৯-এর মধ্যে মরব। এখন ৩৬ চলছে। সুতরাং বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে মনে হয়। মনে হয় মারা যাব ১৯১২-তে।

[নিবেদিতা ১৯১১-র অক্টোবরে মারা যান। ১৮৯৯-এর মার্চে 'নিবেদিতা' নামে

* উইলিয়ম স্টেড 'রিভিউ অব রিভিউজ্' নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাময়িক পত্রের সম্পাদক, নিবেদিতাকে সাংবাদিক জীবন গ্রহণের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব করেছিলেন। ভারতে আসার আগেই মিঃ স্টেডের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল।

† বিশ্ববিখ্যাত হস্তরেখাবিৎ। ইনি নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গেও।

দীক্ষালাভের পরে ১২ বৎসরের ব্রত সত্যই সম্পূর্ণ হয়েছিল। ব্রত পূর্ণ হবার পরে নিবেদিতা মাত্র ৬ মাস বেঁচেছিলেন।]

য়ুম, এই বৎসরগুলিতে সত্যই কি ভারতের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটবে? আমি কি **দেখে যেতে পারব**—আমি সত্যই স্বামীজীর কিছু কাজে লেগেছি! আমি তাই চেয়েছি—শুধু তাই চাই। চাইবও ভবিষ্যতে। শুধু চাইব—যেন তাঁর কোনো বোঝা তাঁর পক্ষে আমি বয়ে যেতে পারি। যদি আমি শুধু অনুভব করতে পারি যে, পৃথিবীর এপারে আমি তাঁর কাজে আছি বলে ওপারে তাঁর বিরাট আত্মা দায়মুক্ত,—মুক্ত—আনন্দে ও লীলায়, তাহলে সেই অনুভূতিতেই আমার সবকিছু—আমার স্বর্গ, আমার নিত্য, শাশ্বত। মুক্তি আমার কাছে তুচ্ছ। এমনকি, কথাটা **আমার মুখে** উদ্ভট ঠেকবে তবু বলছি,—এমনকি আমি চাই না যে তিনি আমার পাপ ক্ষমা করুন, তিনি মধুর হোন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করি না, আমি শুধু তাঁর দায় বইতে চাই, যাতে তিনি মুক্ত থাকেন—ঈশ্বরানন্দ-ভোগে। সে কোন্ আত্মা যাঁর বিষয়ে এমন স্বপ্ন দেখা যায়, এবং সে স্বপ্ন যে সত্য তাও অনুভব করা যায়! সে আত্মা কি স্বয়ং ঈশ্বরের নয়?

৪ মে, ম্যাকলাউডকে

এখন বৎসরের সেই সময়টি চলছে যে-সময়ে একদিন বেলুড়ের কুটীরে সুখময় দিনগুলি কেটেছে। রাঙা আগুনের মত ফুলে ভরে গেছে গাছ। লীচুও খাচ্ছি প্রতিদিন। মনে পড়ে তোমার—কলকাতার দোকানে কেনাকাটা করে দিন কাটানো, নৌকায় এসে **সমস্ত** ফলগুলি খেয়ে ফেলা, আর সারাকে বলা যে, সেই ভোজনের গন্ধটুকুই তার জন্য বাকি আছে এখন! আজ অনেকটা ঠাণ্ডা, ঝড় ঘনিয়ে আছে বলে। সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে—বারান্দায় এপাশ থেকে ওপাশে পায়চারি করছেন স্বামীজী, আর বলছেন ঈশ্বরপ্রেমের কথা!

আ—হা—! **তিনি** যা আমাদের দিয়েছেন তা আমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যদের দিতে পারত!

আমার দীক্ষার দিনে মস্ত নীল একটি নৌকা-আকারের ফুলের কথা তোমার মনে পড়ে, যা আমরা অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলুম? ফুলটির নাম অপরাজিতা (যে পরাজিতা হয়নি); ফুলটি আলো সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একথা জেনে কি সুন্দর লাগছে না!

সেইসব দিনের বিমিশ্র চেতনা কী অপূর্ব আর মনোরম, কারণ সে চেতনা তাঁর প্রতি ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বোনা। আর এখন কখনো কখনো আমার চিন্তা শীতল, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে—সে সব নিয়ে আমি এত ক্লান্ত হয়ে উঠি! ক্লান্ত! ক্লান্ত! ভাবগুলিকে কাজে পরিণত করার মানুষ এত অল্প! কত অল্প তুমি জানো না। দিন দিন ক্রমেই শিখছি—কাজের নিখুঁত যন্ত্র প্রায় বিরল, আর শিখছি—এক ধরনের নৈতিক কুটতা থাকে, যা আত্মাভিমান, আন্তরিকতা-হীনতা, অগভীরতা ও আবেগশূন্যতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে; আর যার ওবস্তু আছে, সেই **বালক বা লোকটিকে** আহ্বান করে লাভ নেই, কারণ সে কিছুই করবে না।

এক এক সময়ে মনে হয়, আমার যেন একথা বলার অধিকার এসে গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতই,—'সদ্‌গুরু যথেষ্ট পাওয়া যায়, উত্তম শিষ্য পাওয়াই দুষ্কর।'

৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

সেই রাত্রি! স্বামীজীর মহাপ্রস্থানের মহারাত্রি! 'ঈশ্বরের সকল সন্তানের পক্ষে বিশেষ স্মরণের এক রাত্রি।'

৪ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

তোমার সেই চিঠিগুলি বড় ভাল লাগে যাতে তুমি তাঁর কথা কিছু কিছু বল যা আগে শুনিনি। এবারকার তেমন কথা : আমার শিক্ষার জন্য তিনি বছরের পর বছর ব্যয় করেছেন যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করেননি। এমন কথা শোনার পরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

১৫ অক্টোবর ম্যাকলাউডকে

খ্রীষ্টীয় মত নিঃসন্দেহে চিরন্তন সত্য, কিন্তু সে কেবল মূল সম্ভাবনায়। তাকে গতিশীল হয়ে উঠতে হলে কালোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। স্পেনস্ যে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘে প্রবেশ করেছে, সে আর কিছু নয়, প্রস্তর ও কণ্টকের পথে হাঁটার ব্রত নিয়েছে। ভয়ের সূচনা তার পর থেকে।

স্বামীজী একদা আমাকে বলেছিলেন, 'মার্গট, তোমার শিষ্যদের ধর্ম তুমি তৈরী করে দাও, আর যদি পারো তাতে কিছু সার্বভৌমিক ভাব প্রবেশ করিয়ে দিয়ো। কিন্তু মনে রাখবে, গোটা পৃথিবীতে ৬ জন লোকও ঐ ধর্মের জন্য প্রস্তুত নয়।' আমার মনে হয় একথা মোটামুটি সত্য। কিন্তু আর একটি জিনিস সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত। তা হল : সাম্প্রদায়িকতার (sectarianism) অতি গভীরে প্রবেশ করার পরেই তবে মানুষ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে পারে।......যদি এই পথে আমি কিছু পেয়ে থাকি তার কারণ একদা আমি অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলাম। আর তোমাকে মনে রাখতে হবে—কালীপূজাও সাম্প্রদায়িক ব্যাপার।

স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কালে আমার মূল প্রয়োজন ছিল—সংস্কার-সমূহ (superstitions) কি অর্থে সত্য তাই জানা। সুতরাং অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে সার্বভৌমিক তত্ত্ব শিখতে পারে—আমার মূল শিক্ষার বিষয় ছিল, কিভাবে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে প্রতিটি পুরাণ-কথা বা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। সেই কালে আমি সকল বিশ্বাসের **মিথ্যাত্বে** অপরিবর্তনীয়ভাবে নিঃসংশয় হয়েছিলাম। তবু আমার ভক্ত-স্বভাব আমাকে বলেছে—এই শেষ কথা নয়। আমি নিদারুণ দোটানায় ছিলাম। তারপর পেলাম **শিক্ষা**।

কাশ্মীরের অরণ্যমধ্যে সেই রাত্রির কথা তোমার মনে পড়ে—যখন তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং আমি যখন বলেছিলাম, "সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে"—তখন কি রকম দ্রুত তিনি সায় দিয়েছিলেন!

প্রিয় য়ুম,......আমার জন্য প্রার্থনা করো, কেবলই প্রার্থনা করো—আমি যেন তাঁর ইচ্ছাপ্রবাহের শূন্য ধারাপথ হতে পারি। তোমার সমস্ত জীবনও যেন আত্মসাৎ

করে নিতে পারি, আর তার দ্বারা ঐ প্রার্থনা সফল করতে পারি। আমার সমগ্র জীবন এবং শক্তিও অপ্রচুর মনে হয়। সেবা করতে, দিতে, এত সময় চলে যায়—গ্রহণের, সঞ্চয়ের সময় যে পাই না। আমাকে ঐভাবে তুমি পূর্ণ করে তোলো যাতে গতি না স্তব্ধ হয়!

৮ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

ওঃ য়ুম, এক ছোকরার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক হল এখনি। এখানকার মানুষের মনের মধ্যে 'সেকুল্যার' জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা কী গভীরে প্রবেশ করে আছে কী বলব! আধ্যাত্মিক অহমিকা এদের চিন্তা করতে উৎসাহ দেয়—খুব বড় বাসনা মানেই বিরাট মহত্ত্ব। জীবনপথের প্রতি পদক্ষেপে প্রাণপণে প্রচণ্ডভাবে কাজ করার এবং আত্মত্যাগ করার প্রয়োজন যেন নেই! সন্ন্যাসী বেশধারী যে-কেউ, তার থেকে অনেক সাহসী ও মহৎ যে-কোনো মানুষ সম্বন্ধে ঘৃণাভরে কথা বলবে, যে-হেতু অন্য মানুষটি সন্নাসী নয়!

তবু আমি নিজের উপর বা নিজের বুদ্ধির উপর এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছি না কারণ স্বামীজী অনেক সময়ে এটা-ওটা বিষয়ে আমাকে ধমকাতেন, কিন্তু তবুও তিনি সেইসঙ্গে আমাকে সর্বমনপ্রাণ দিয়ে নিজের পথ বেছে নেবার জন্য সজোরে চালিত করেছেন। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে অন্য কোনো পথ নেই।

হাজার হাজার শিষ্য জোগাড় করতাম—যদি পারতাম! ভবিষ্যতে আত্মত্যাগে সমর্থ সেই হাজার হাজার আত্মাকে হাটে-বাজারে, বিদ্যালয়ে, ল্যাবরেটরীতে, স্টুডিয়োতে ছড়িয়ে দিতাম শিষ্যরূপে এবং যদি দেশের সেক্যুলার জীবনকে গঠন করতে পারতাম, তাহলে সেক্ষেত্রে ভগবান ও শয়তানের মধ্যে সন্ন্যাসীকে নিয়ে লড়াই বাধিয়ে দিতাম। অথচ আমি নিশ্চয়ই ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন নই।

॥ ১৯০৫ ॥

১১ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

আমি এখন জানার অধ্যায়ে পৌঁছে গেছি—আর অনুমানের মধ্যে নেই। তুমিও কি—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আঃ! স্বামীজী আমাকে যা দিয়েছেন—যদি ঈশ্বর সকলকে তা দিতেন! যদি তিনি (স্বামীজী) শুধু দিয়েই যেতেন—সর্বোচ্চ দান! কারণ এখন আমি আর কোনোমতে ভিক্ষা করতে, প্রার্থনা করতে, দাবি করতে লজ্জিত নই। অধিকাংশ লোককে এখন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে আমি পরাস্ত করতে পারি! আমি যা চাই তা দারুণভাবে চাই। তাঁকে আমি **পাবই!** প্রত্যাখ্যান?—নৈব চ। যে-খুঁটিতে নিজেকে বেঁধেছি তার নাম ঈশ্বর। সুতরাং পাওয়ার বস্তু পাবই।

আমার এই শক্তির বোধ কী বিচিত্র! কারণ আমরা দুই অন্ধকারের মধ্যবর্তী একটা বিন্দু ছাড়া আর কি—অনন্তের তিমিররাত্রে ধূলির এক পরমাণু—অসীম

শূন্যের গহ্বরে পতিত ঘূর্ণ্যমান পালক বই তো নই—তবু প্রত্যেক মানবসত্তায় সমগ্রের শক্তি। কিন্তু তাই ঠিক—সর্বসময় ঠিক—অন্য কিছু হতে পারে না। সেটা জানাই রহস্যের বস্তু। কে যেন বলেছেন: 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভার একটি তুষারকণাকে নিজ স্থানে স্থির রাখে'—তুষারকণাটি যদি তা জানত—জেনে উপভোগ করত!

৮ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

ঝিলামের উপরে যাপন করা দিনগুলিতে কিভাবে না ফিরে যেতে চাই! রাত্রিগুলি —তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়া। 'আ-হা! হারিয়ে যাওয়া হাতের ছোঁয়া, নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের শব্দ—তারই জন্য!'

কিন্তু চল! চল! সে দিনগুলি যেমনভাবে চলে গেছে, আমরাও তেমনি চলে যাব—তারকার নীচে ঘুমিয়ে পড়া পার্বত্য সানুদেশের শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে অন্তর।

১৬ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

প্রিয় য়ুম, আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি হয়ত ভারতে আর আসবে না, আমি হয়ত যাব না পাশ্চাত্ত্যে। যদি তাই হয়—আমরা আর কখনো মিলব না! অদ্ভুত! অদ্ভুত! পৃথিবী রইল, জীবনও রইল, তবু তোমার সাক্ষাতে এলাম না—বিচিত্র বটে! তবু তা ঘটতেই পারে। তবু—মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপারের জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতই সহজ হয়ে আসে! মৃত্যুর একেবারে পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজী কিভাবে 'তাঁর বুড়ো লোকটির' সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার ভাবে বিভোর থাকতেন, আমি তা দেখেছি। তা যদি সত্য হয়—সত্য না হবে কেন—তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রেও পুনর্মিলন ও হিসাব-নিকাশ থাকবে না কেন? যেমন, তিনি সেই প্রথম ভারতীয় সন্ধ্যায়—সাত বছর আগে—আমাকে বলেছিলেন—এক পক্ষকাল আগে সে দিনটি গেছে: 'বৎসে! তুমি খুবই ভাল করেছ, খুবই ভাল।' এই হিসাব-নিকাশের জন্য কত না তৃষার্ত ছিলাম।......

আমি নিশ্চিত অনুভব করি, তিনি যা ছিলেন আরও বেশী করে তাই হয়ে উঠবেন—কতখানি, তা সহজে কল্পনা করা শক্ত। তাঁর মধ্যে **ছোটখাট** জিনিসগুলি তাঁর চরিত্রের গভীরতম, বিশিষ্টতম লক্ষণ।......কিন্তু য়ুম,—ওঃ য়ুম—মনে হয় আরও কোথাও না কোথাও আসফোডেল এবং ক্রোকাসের প্রান্তর থাকবে, তার মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিতও হয়ে যাবে—সেখানে তুমি এবং আমি তাঁর জ্যোতির্মণ্ডলে বাস করব, আর তাঁরই সঙ্গে ঘুরব ফিরব।

কাশ্মীরের স্বপ্নদর্শন—কী অপরূপ! আমার আরও মনে হয়, মৃত্যুর পরে সেই সময়ে অপার্থিব শান্তি ঘনাবে, তারি মধ্যে সমস্ত জীবনের সংস্কারকে সঞ্চিত করে নির্মাণ করা হবে নূতন চরিত্রের, নূতন প্রাণের। তখনকার প্রার্থনা—ঈশ্বরের হাতে যেন সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়ে ওঠার গলিত ধাতু হয়ে উঠতে পারি—যেন বিগলিত হই তাঁরই সঞ্চারিত ইচ্ছার তাপে—যেন আমাদের আমিত্ব কোথাও নির্মাণের কাজে বাধার সৃষ্টি না করে।

তারপর প্রত্যাবর্তন—অবকাশের অন্তে ভৃত্যের মত, শান্তির অন্তে সৈনিকের মত—নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে। এমনি আমার উপলব্ধি—ইচ্ছাশক্তির বোধ—যা বিস্তারিত হবে ভবিষ্যৎ নানা জীবনে, আর আচ্ছন্ন ও উৎসর্গ করবে তাদের—সকলকে।

১২ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী অতীতের লুথার বা মহম্মদের মত। জাতীয় মনের হর্ম্যনির্মাণে তাঁর বিশ্বাস রূপ নেবে। সর্ব মত ও জাতির ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনের উপরেই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। সেইসঙ্গে হয়ত, পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নূতন যুগের অভ্যুদয়।......

সেই মন্দিরভবনের নির্মাণে আমি যেন একটি ইঁটও বহনের যোগ্য হই।

জ্বরে পড়ে থাকার সময়ে নানা অপূর্ব চিন্তা জাগত। যেমন, ইতিহাসে এই প্রথম একজন পুরুষ তাঁর 'মিশন্' দিয়ে গেলেন এক নারীকে। কিন্তু এখন আমি ভবিষ্যতে দেখছি শান্তি ও অবসর—আমার মূল্য আর বেশী মনে হচ্ছে না। দেখা যাক কি হয়।

৪ মে, ম্যাকলাউডকে

সেদিন সন্ধ্যায় সহসা নদীতে ঝড়ে পড়ে সারদানন্দ প্রায় ডুবে মরছিলেন—খুব বেঁচেছেন। সেই ঝড়ের কথা কি মনে পড়ে তোমার—ঝড়, অন্ধকার, বারান্দা, আর স্বামীজীর এপাশ-ওপাশ পায়চারি! ওঃ য়ুম, তোমাদের সঙ্গে তখন থাকতে পেয়েছিলাম—তার জন্য কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

হাঁ, একথা সত্য যে, নূতন আনন্দ, নূতন অভিজ্ঞতা ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। শুধু অতীতের উপর বাঁচা যায় না। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতেই বেঁচে ছিলেন না। প্রতিদিন তিনি নূতন শিক্ষা দিতেন, জীবনকে নূতনভাবে তৈরী করতেন। সবই সত্য। আমি আর লিখতে পারছি না—বড় ক্লান্ত।

১৬ মে, ম্যাকলাউডকে

বাইরে ঝড়ের রাত্রি। ঘরে ঘরে ধাক্কা খেয়ে ঝড়ের ক্রন্দন। যেন মনে হয়, অনন্তের জন্য আত্মার ক্রন্দন।

২১ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

শুনলাম, স্বামীজী যখন মঠ (বরাহনগর) ত্যাগ করে চলে যান, যার পরে চিকাগো-ব্যাপার সমাপ্ত না করে ফিরে আসেন নি—যাবার সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন—দশহাজার লোককে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দীক্ষিত না করে তিনি ফিরবেন না। এখন তুমিও সেই কাজই করছ—সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ আর মানুষকে তাঁর (স্বামীজীর) নাম দিচ্ছ।

ওঃ প্রিয় য়ুম, একটি অতুলনীয় বৎসর সে-কি নয় যখন তুমি আর আমি বেলুড়ের ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতাম, যখন আমরা পাহাড় পর্বত দেখেছি—কাশ্মীর, অমরনাথ—এবং আমি একাকী বাস করেছি একটি ক্ষুদ্র গলিতে। অপূর্ব বৎসর—যতই দিন

যাচ্ছে, যতই সে-বিষয়ে চিন্তা করছি, মনে হচ্ছে তাই—অপূর্ব! আর তুমি হৃদয়কেন্দ্রে আসীন। তিনি যা তাই ছিলেন, নিজ স্বরূপেই, কিন্তু তুমিই শিখিয়েছিলে কেমন করে অহংকে দমন করে সেই গৌরবের আলোকরেখা দর্শন করতে হয়। এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

১৫ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

খুবই মনে হচ্ছে, তুমি এই শীতে আমেরিকায় থাকবে। তোমার আশ্রয়ের শান্তি ও মধুরতা, আর শুধু স্বামীজীর স্মরণ—অনেক কিছুর বিনিময়ে এ জিনিস পেতে আমি ব্যাকুল। তবু একথা বলাও যেন অন্যায়—অকৃতজ্ঞতা!—যখন মনে পড়ে কী পরম দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে! নিজ জীবনের সামনে সম্ভ্রমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে,—বিশেষ পর্দাটির সামনে, যার উপরে নিজস্ব ঈশ্বর-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে—সেই দর্শনকে বাস্তবে, বহিরঙ্গে জীবনদান করবার দায়িত্বে। স্বামীজী যে-সব কথা বলেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য বোধ হয় তাঁর নিরন্তর সচেতন করানো আমাদের : যেখানে সেবা করেছি আমরা, সেখানে আসলে আমরা পূজার অধিকার পেয়েছি।

বহু জিনিস আবিষ্কার করতে পারছি : সর্বসময় **স্বাধীনতার** সন্ধান,—স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক হলে মধুরতম সুখের সঙ্গেও মুহূর্তমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার ক্ষমতা—এই হল সত্যের সেরা প্রকাশ। উত্তম ও অধম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার সামর্থ্য, বরং ক্ষুধার্ত থাকব তবু কদাপি অখাদ্য গ্রহণ করব না—এ জিনিস **মুক্তির** অধিক নিকটবর্তী—যা আগে এমনভাবে আমার কল্পনায় আসেনি।

আর একটি জিনিস—সেই অপূর্ব সরলতাই যথার্থ ধীরতার অঙ্গ। দার্জিলিঙ ত্যাগের কালে...... আমার টেবিলের উপর থেকে Burne Jone-এর আঁকা Holy Grail-এর একটি ছবি আমি নিয়ে আসি। সেই সময়ে আমার মনে হল—Holy Grail-এর Angel হতে পারলে কী অপূর্ব না হয়! এক্ষেত্রে যদি কেউ বুঝতে পারে যে, ঐ রকম একটি অখণ্ড পূজাই একজনের সমগ্র কর্তব্য এবং সেই বুঝে সম্পূর্ণ আত্মদান করতে পারে! তারপর দেখলাম—আমাদের প্রত্যেকেরই পূজার Holy Grail আছে, এবং তাঁকে পাওয়ার পরে থাকে অতন্দ্র নয়নে তাঁর অর্চনার অখণ্ড কর্তব্য।

মসীময় যখন দিন তখন ঈশ্বর ঘোষিত হন মানুষের ভালবাসার ও আত্মদানের সামর্থ্যে। তারপর সহসা যবনিকাপাত, প্রিয়তমের আবির্ভাব ও বাঙ্ময় কণ্ঠ। সত্য নয় কি?

৬ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

পুরনো চিঠি উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। তোমার অনেক চিঠিই আবার পড়ে ফেললাম। দেখলাম, তুমি কোনো একটা জায়গা, 'এমনকি কোনো মানুষকেও' দুবার দেখতে প্রায় চাও না। দেখলে ভালবাসার আবেগ নাকি শুকিয়ে যায়। কিন্তু আমি তো হাসতে হাসতে তোমার কাছে ফিরে যাই—পূর্বের মতই! এই রহস্যময়

সম্পর্কের সূত্র কি? আমি কখনোই মানবো না স্বামীজীর স্মৃতির সূত্রে আমি বাঁধা আছি, কারণ আমি কখনোই মানবো না স্বামীজী কখনো স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হতে পারেন, কিংবা আমরা যারা তাঁকে ভালবাসতাম তাদের কাছে নিত্য গরীয়ান্ **উপস্থিতি** ভিন্ন আর কিছু হতে পারেন! তবু পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিতে তোমার আমার সম্পর্ক ডাক-মারফৎ!!

কত না ইচ্ছা করে, আবার মিলিত হয়ে কোনো শান্ত স্থানে দীর্ঘদিন কাটাই। সেখানে থাকবে বৃক্ষরাজি, প্রবাহিত তটিনী, তৃণদল, আকাশের তারকা এবং **বিশ্রাম**—সেখানে আমরা স্বর্গকে পাব, ইন্দ্রিয়ের স্বর্গ নয়—আত্মার স্বর্গ। তুমি বোধহয় এখন আর নির্জন জায়গা অপছন্দ করো না! কিন্তু আমি এমন একজনের সঙ্গে থাকতে চাই, যে এই নির্জনের শান্তিতে তৃপ্তি পাবে নিশিদিন—চিরদিন। আমি এত ক্লান্ত! বছরের পর বছর বিশ্রাম কাকে বলে যেন জানিনি।...সদাই রণশব্দ, যখন আমাকে ঘিরে নয় তখন দু' পা দূরে। অসুখে পড়েও ব্যস্ত হতে হয়েছে নিরাময়ের জন্য—যাতে শীঘ্র কাজে যেতে পারি। আর কাজ?—সে কাজের চেহারা অযোগ্য, জঘন্য, ইচ্ছা ও বিষাদের নানা রেখায় আঁকা বাঁকা।

॥ ১৯০৬ ॥

১২ জানুয়ারী, ওলি বুলকে

বাড়ির চারদিকে ঝড়ের হা-হা স্বর। শুনলে তোমার মনে হত—ওপার থেকে ভেসে-আসা রোদনভরা কণ্ঠস্বর, এই পৃথিবীর জন্য। শান্তি! শান্তি! মহাপ্রাণ! রাত্রি আঁধার—তবু 'দর্শন' জেগে আছে। মায়ের ডাকে সাড়া আসবেই। বলিদান তিনি পাবেন। নতুন যুগের অরুণোদয় হবে।

[এখানে উল্লেখযোগ্য—১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মতারিখ।]

১৫ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

ইউরোপের অনেক কিছু দেখতে চাই, অনেক মানুষের সঙ্গে আবার সাক্ষাতের বাসনাও আছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিশেষভাবে মনে হচ্ছে যে, সেখানে আর কখনো যেতে পারব না। ভারতে যে-প্রতিটি মুহূর্ত আমি ব্যয় করেছি তাতে স্বামীজীর অভিপ্রায়মত কাজ হচ্ছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

১২ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে

স্বামীজী আমার জীবন কিভাবে কল্পনা করেছিলেন, আর তা কত পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এসব যখন ভাবি তখন বুক ভেঙে যায়। যদি সর্বক্ষণের উক্ত

আবহাওয়া সহ্য করা সম্ভব হত তাহলে তাঁর ইচ্ছামত মেয়েদের নিয়ে বাস করা সম্ভব হত। কিন্তু গরম সহ্য করা অসম্ভব, সত্যই অসম্ভব,—আমার এই অসুস্থতাতেই তার প্রমাণ হয়েছে। এই কারণের জন্য, স্বার্থপরতার জন্য নয়, কাজের বদল হয়েছে।

ইংলণ্ডে যাবার আগের রাত্রি ব্রিটানিতে—মনে পড়ে তোমার! আমি তোমাকে বলেছিলাম—অজানার উদ্দেশে যাত্রা করছি—শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের দিকে—কিন্তু মধুময় 'পিতা'র থেকে সরে যাচ্ছি—তখন তুমি সহৃদয়তার সঙ্গে আমার কথাকে নিয়েছিলে!

কখনো কখনো মনে হয়, এই তো প্রথম প্রয়াস,—আবার, বহুবার, কাজের সুযোগ আমি পাব। এগারো শো বছর কাটার আগে খ্রীষ্টধর্ম সেণ্ট ফ্রান্সিসকে সৃষ্টি করতে পারে নি, পনের শো বছর কাটার আগে সেন্ট থেরেসাকে। কে জানে **তাঁরা** কতবার চেষ্টা করেছিলেন!—এবং নিজেদের ব্যর্থতাকে অনুভব করেছিলেন! পুনশ্চ—আমি কিন্তু ঐরকম কীর্তির কোনো লক্ষণ দেখছি না আমার ক্ষেত্রে, বরং কিছু নিম্নাবতরণ! তবু—তবু—আমি আঁকড়ে থাকব—চেষ্টা করে যাব। কিন্তু এখানে পথ খোলা নেই মনে হচ্ছে। যেখানে নিজের পথ বেছে নিয়ে নিজ আদর্শ প্রয়োগ করার অনিবার্য প্রয়োজন—সেখানেও নীরবতা ও আনুগত্যই একমাত্র পথ! কিন্তু—কিন্তু—আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করছি—তা কি সত্য? তা কি সত্য? আমার হয়ে উত্তর দেবে কে?—কে!

॥ ১৯০৭ ॥

২৮ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

বছরের এই সময়েই তোমার কাছে বেলুড়ে প্রথম এসেছিলাম। সে কথা কি মনে পড়ে? সে সব দিনের কথা সদাই মনে জাগে। কারণ এখন আমি আবার এক বিস্তীর্ণ সবুজ স্থানে রয়েছি—সন্ধ্যায় ঝড় ওঠে—স্মৃতিতে ভেসে আসে সেই সন্ধ্যা —এবং 'ভগবানের প্রতি ভালবাসা।' ঈশ্বরপ্রেম যদি কেউ দেখে থাকে—তাঁর মধ্যেই দেখেছে। অন্যত্র আমরা ঈশ্বরপ্রেমের যে-রূপ দেখি তা আসলে মানবপ্রেমের দুর্বল নিষ্কাশন ছাড়া কিছু নয়।

সময় দ্রুত ছুটছে। কাজে আর পুণ্যে ভরা দিন ক্যালেন্ডারের পাতায় কাড়াকাড়ি করে ছুটছে—সচেতন হবার আগেই বছর কেটে যায়। একটি বছর!—যাকে আর ফেরানো যাবে না। ফেরাতে চাইও না—কারণ সমাপ্তি হবে মধুতম, মহত্তম। কিন্তু যাওয়ার পথে তার মূল্য এমনভাবে স্বীকার করা হয় যে চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ করা উচিত হবে না। আমাদের সোনার বছরটির সম্বন্ধে আমি তাই ভাবি। সে সময়ে আমাদের আনন্দ এতই তীব্র হয়েছিল যে, তার থেকে বেশী কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। তাই নয় কি? আর সেই চিন্তাতেই তো সান্ত্বনা।

৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

ইউরোপে দীর্ঘ ভ্রমণ-সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে ভাবছি—এর ফল কী হবে! কিভাবে না প্রার্থনা করছি বিশ্বস্ত থাকতে—থাকতে—থাকতে! শেষের এই বছরগুলি এত আনন্দ ও মধুরসে ভরা যে, ভয় হয় পাছে জীবনের মধুমায়ায় আটকে পড়ি, এর লুতাতন্তুতে বাঁধা পড়ে যাই। সুখের ও আসক্তির বন্ধন। আমি আদর্শকে উপলব্ধি করতে চাই, ঘটনার ঘটা নয়। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছি। অনেক ছোট, সংকীর্ণ জিনিসের মধ্যে বড় হয়ে উঠলে ত্যাগের অর্থ হারিয়ে যায়। এখানেই সৌভাগ্যবান পায় তত্ত্ব বা নীতির পরিবর্তে মানবদেহে মূর্ত আদর্শ পূজার জন্য। 'আমার নিজস্ব যারা এসো আমার কাছে।' যতই যা হোক, আমাদের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা 'তাঁর নিজস্ব'।

২৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

যদি স্বামীজী চান আমি একটা-কিছু করি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার যাত্রার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং তিনি আমাকে ফিরিয়েও আনবেন। এখন তাঁর হাতেই সব ছেড়ে দিতে পারি সহজে।

১৭ জুন, ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী অবশ্যই সারা পৃথিবী জয়ের জন্য জন্মেছিলেন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কত সীমাবদ্ধ! যেমন আমি—আত্মার ফসল সংগ্রহ করতে পারি না!

॥ ১৯০৯ ॥

৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

ব্রিন্দিসি ছুঁয়ে আছি। মহাবেদনার সপ্তম স্মৃতি-বার্ষিকীতে তোমার জন্য দু'এক কথা : যিনি ছিলেন বুদ্ধ এবং শঙ্কর, না—প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে যিনি স্বয়ং আলোকস্বরূপ—তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমরা পড়ে আছি মাটিতে। কিন্তু তাঁর থেকে আমরা তো বিচ্ছিন্ন নই, কারণ তিনি দেহবস্ত্র ত্যাগ করেছেন কিন্তু হারাননি কিছু—আমাদের দৃষ্টি শুধু বিভ্রান্ত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য। সাতটি বছর—ধ্বনিময়—যেন তার মধ্য দিয়ে পরবর্তী পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। তুমি যে উত্তীর্ণ হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সেই আলোককে অনির্বাণ রাখতে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়েছ। সে আলোক জ্বলুক, জ্বলুক বাতায়নে যেখানে তুমি তাকে স্থাপন করেছ, অনন্তকালের জন্য।

[এখানে উল্লেখযোগ্য ৪ জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগের তারিখ।]

॥ ১৯১০ ॥

৭ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

এখনো ঊষার আলো ফোটেনি—তুষারে আচ্ছাদিত সর্বদিক। চা-এর পরে দীর্ঘ-সময় শুয়ে আছি আর প্রার্থনা করছি—আমরা যেন **সকলে** আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে ক্ষুদ্র গোপন স্থান রক্ষা করতে পারি যেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, আর আমরা অন্যের প্রভাব বা সম্মোহন এড়িয়ে অব্যাহতভাবে বেড়ে উঠতে পারব। আমি জানি এ দাবি সঙ্গত, কারণ স্বামীজী পূর্ণ ছিলেন এতে, আর একেই তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের আধার করে তুলেছিলেন। এই বেষ্টনীর বাইরে অনেকের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, নিজ সীমান্তের বাইরে তাদের প্রতি তিনি মনোযোগ দিতেন, কিন্তু এর ভিতরে পদক্ষেপের ন্যূনতম সম্ভাবনা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল, এবং এই অন্তর্লোকের অবিঘ্নিত বিস্তারকেই তিনি বলতেন 'স্বাধীনতা'।

এই স্বাধীনতা—পরিসর এর যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, প্রিয় য়ুম,—একে কি অখণ্ড রাখতে পারব! সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য যেন দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে বজায় রাখতে পারি।

২৮ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

......এইসব কথা তোমার কাছে অহঙ্কার বলে ঠেকবে, মনে হবে যেন, শুধু আমারই, আমারই কাজে সত্য আছে! কিন্তু এক অর্থে কথাটি সত্য। স্বামীজী আমার হাতে সূত্রের এক প্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তাই ধরেই চলেছি।......

[নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী-প্রসঙ্গের শেষে গুরু ও শিষ্যার অলৌকিক সম্পর্কের একটি ব্যাখ্যা অংশতঃ উপস্থিত করছি। ব্যাখ্যাকার মোহিতলাল মজুমদার। মোহিত-লালের কেবল মনীষাই ছিল না, বিপুল হৃদয়াবেগও ছিল, যার দ্বারা তিনি চিন্তা বস্তুকে মর্মগোচর করাতে পারতেন। গুরুর নিকটে নিবেদিতার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মহা আধ্যাত্মিক কাহিনীর তাৎপর্য মোহিতলালের মত আর কেউ উদ্ঘাটিত করতে পারেননি বলে তাঁর রচনার কিছু অংশ উপস্থিত করার দায়িত্ব বোধ করেছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতার উপরে লিখিত প্রবন্ধ থেকে নিম্নের অংশ সংকলিত :

"গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে-সম্পর্ক—অধ্যাত্মজীবনের সেই এক অভিনব আত্মীয়তার তত্ত্ব......, তেমন আত্মনিবেদনকাহিনী আমাদের কোনো ভক্তমাল গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়া-ছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিজেই তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে (*The Master as I saw Him*) লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গুরুবাদের একটি শাণিত খড়্গ—যেমন দিব্য প্রভাসমুজ্জ্বল, তেমনই নির্মম; সেই খড়্গের

নীচে নিবেদিতা তাঁহার আত্মাভিমানী দেহটাকে—তাঁহার যতকিছু পূর্ব সংস্কার, এবং প্রাণ ও মনের যতকিছু কামনাকে—বলি-স্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে ভারতের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার কালে বলিয়াছিলেন—'যদি আমার নিজের কোনো অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।'

ইহার পর নিবেদিতার যে-জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনই সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাহার জয়ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে-অগ্নি তিনি আপন হৃদয় পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোকটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন।......

এমন কত মহাজীবনের মহান আত্মোৎসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির সাধনাকে সংবর্ধিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে; ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, সন্ধান চায়ও না। তাহার কারণ ইতিহাসের লক্ষ্যই অন্যরূপ। যাহারা ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা সেই গড়ার উপাদান হইয়া বা সেই গঠনশিল্পীর যন্ত্র হইয়া শিল্পীর কীর্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে, তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই যাহাকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গঠন-শিল্পী; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন—একজনকে যেমন দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইয়াছিল, অপরকে তেমনই সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে হইয়াছিল।

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। গুরুর নিকট শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু তো নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ। ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণভাবে, যে-সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ দুঃসাধ্য নয়—নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীতগুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়,—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার অনুষ্ঠানগত পরিবর্তন মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তরগ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনও বিশ্বাস করিত না। এই একটি দিক দিয়াও তাঁহার জীবন অনন্য-সাধারণ—এমন বোধহয় আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া গিয়াছে; তাঁহার রক্তেও যেন বাঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে। ভারতের সেবায় এই

শিষ্যাকে উৎসগীকৃত করিবার সময়ে গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে তোমার পূর্ব জীবন, পূর্ব সংস্কার, পূর্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইবে; দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, এই জাতিই তোমার জাতি।' গুরুর ঐ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? এ কোন্ যাদুশক্তির খেলা! নিবেদিতার বয়স তখন আটাশ বৎসর—তিনি য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন— আশ্চর্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার। সেই ধীশক্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীনচিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্বেই একটা তত্ত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তর-গ্রহণের রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়।......

স্বামীজীর নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; সেই গ্রন্থ (*The Master as I Saw Him*) জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে এবং অন্যত্র গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি—আমাদের জ্ঞানে তাহার কোনো নাম-নির্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই সম্পর্কে যত প্রকারভেদ আছে—সাধনমার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চরিত্র অনুসারে, তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু স্বামীজীর সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঐ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্ত লীলা একটা নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। একদিকে স্বামীজীর সেই দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী—সে তেজও যজ্ঞবেদীর হোমানলশিখার মত। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই—ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।......

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দমনীয়তা ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই ছিল তাঁহার নিজ আত্মার মূলধন। গুরু বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা তো কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। যুবক নরেন্দ্রের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তুই দেখিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রও ঠিক সেই কারণে বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অতএব গুরু ও শিষ্যের প্রথম দর্শনে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—উভয় ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে নরেন্দ্র যেমন

বলিয়াছিলেন,—'আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার অদ্ভুত প্রেম', ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম,......—পর্বতের মত অটল এবং পাষাণের মত কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে-প্রেমের সুধানিস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রেমের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধহয় আর কেহ করে নাই; কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে অগ্নিশিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি যে-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতিসুলভ কোনো আকূতি মর্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্যবলে তাঁহার গুরুর সেই ব্যক্তিসম্পর্কহীন মহাপ্রেমের (যে প্রেমের আমরা ধারণাই করিতে পারি না) অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা জানি, স্বামীজীর পুরুষ-আত্মা প্রকৃতির বশ্যতা আদৌ স্বীকার করে নাই; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, বশ করিয়া, তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্যাণী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারীপ্রকৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা তাহাতেই তাঁহার নারীহৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।......

তাঁহার গ্রন্থে (*The Master as I Saw Him*) তিনি গুরুর শেষ-জীবনের শেষ দিন কয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সর্বশেষে স্বামীজীর তিরোধানকথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের সেই ঘটনা—একটি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে তাঁহার নিজ প্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করার পর পাঠকমাত্রেই ঐখানে পৌঁছিয়া যতটুকু উদ্বেল না হইয়া পারে না, এবং সেইজন্য যে সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে, লেখিকা তাহাতেও বিমুখ। আমারও রীতিমত আশাভঙ্গ হইয়াছিল! তারপর যখন স্বামীজীর পৃথক জীবনকাহিনীতে তাঁহার সেই তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের বিমূঢ়তাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা—২টা পর্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল; নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ায়, এবং অন্ত্যেষ্টি-কালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাহা বুঝিবে? বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজীর সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা

হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে মূর্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ; চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। তখনও সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন না! বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্য সহচর আনন্দের কথা মনে পড়িল। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্বাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন, এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাঁহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক, তাহা আমি জানি না।

উপরে আমি যে-প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ—এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাকে এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাঁহার জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার গুরু যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেমন করিয়া?...... গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা। এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নরনারীর যত মহাবস্ত্বদান-কাহিনী আছে—প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। ঐ প্রেমের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব—আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে আমরা একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনও বা সেই সাধারণ বস্তুর একটী বিশেষ রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরম রূপ—সেই অপর রূপ—আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত; ভগবদ্‌প্রেমই বলো, আর গুরুভক্তিই বলো, কোনো নামেই তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য—এ সকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোষকমাত্র; প্রেম এক রূপ, তাহার দুই রূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা কীর্তন করে; তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়—বৃহতের বেদীমূলে মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞ-যূপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দস্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র, এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈতবিলাস; ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা মানবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, ততদিন ঐ হীনযান অপেক্ষা এই মহাযানই তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়া থাকিবে, এবং 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' নয়—ভগিনী নিবেদিতার ঐ জীবন এবং তাঁহার অপূর্ব সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বস্ত করিবে।"

মোহিতলাল গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের এই যে ব্যাখ্যা করলেন, এর সত্যতার পক্ষে অন্য কোনো প্রমাণ দেবার প্রয়োজন নেই, নিবেদিতার একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করলেই চলবে। ১৭ অগস্ট, ১৮৯৯-তে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

'তাঁর কাছে কার কি স্থান, তা এক কথায় নির্ণয় করার চেষ্টা বৃথা। নামে তা কন্যা, ভগিনী বা বন্ধু—যা হোক হতে পারে—কারণ পৃথিবীর কাছে কোনো একটি আখ্যা বুঝবার পক্ষে সহায়ক; কিন্তু যদি কেউ তোমাকে বা আমাকে পরজীবনে স্পর্শ করে, তখন আমরা চিরন্তন স্মৃতিতে জেগে উঠে বলতে পারব স্বতঃই—'প্রিয়তম! প্রিয়তম!'—পুনর্মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।'

স্বামীজী বিষয়ে নিবেদিতার প্রবন্ধ

স্বামীজী সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান আমরা করে উঠতে পেরেছি। এর মধ্যে তিনটি প্রবন্ধকে আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি। একটি প্রবন্ধ বিশেষ পরিচিত ও বিখ্যাত—যেটি *Complete Works of Vivekananda* -এর ভূমিকারূপে লিখিত। অসাধারণ সেই রচনা। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর মনোজগতে বিবেকানন্দের ভূমিকার তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিবেদিতা যে গভীরতা ও সংহত মহিমার সঙ্গে উদ্ঘাটন করেছেন—সে জিনিস অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। এই রচনায় বহু বাক্য আছে যা ধ্রুব বাক্যের মর্যাদা পাবার যোগ্য। রচনাটির অনুবাদ পাওয়া যাবে 'বাণী ও রচনার' প্রথম খণ্ডের গোড়ায়। সেইসঙ্গে সেখানে 'চিকাগো বক্তৃতা' পুস্তকের বিশেষ ভূমিকারূপে লিখিত নিবেদিতার রচনাটির অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। রচনা দুটি সহজে প্রাপ্তব্য বলে আমরা এখানে দিচ্ছি না।

তবে প্রথম রচনাটি থেকে কিছু অংশ মূলে উদ্ধৃত না করে পারছি না :

> "We have (in these volumes of the Works of the Swami Vivekananda) what is not only a gospel to the world at large, but also, to its own children, the Charter of the Hindu Faith. What Hinduism needed, amidst the general disintegration of the modern era, was a rock where she could lie at anchor, an authoritative utterance in which she might recognise herself. And this was given to her, in these words and writings of the Swami Vivekananda.
>
> For the first time in history. . . . Hinduism itself forms here the subject of generalisation of a Hindu mind of the

highest order. . . Long after the English language has disappeared from India, the gift that has here been made, through that language, to the world, will remain and bear its fruit in East and West alike. What Hinduism had needed, was the organising and consolidating of its own idea. What the world had needed was a faith that had no fear of truth. Both these are found here.

Of the Swami's address before the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak it was of 'the religious ideas of the Hindus', but when he ended Hinduism had been created. . . . .

. . . . It was the religious consciousness of India that spoke through him, the message of his whole people, determined by their whole past. And as he spoke, in the youth and noonday of the West, a nation sleeping in the shadows of the darkened half of earth, on the far side of the Pacific, waited in spirit for the words that would be borne on the dawn that was travelling towards them to reveal to them the secret of their own greatness and strength. . . .

The Swami Vivekananda would have been less than he was, had anything in this Evangel of Hinduism been his own. . . . He stands merely as the Revealer, the interpreter of India of the treasures that she herself possesses in herself. The truths he preaches would have been as true, had he never been born. Nay more, they would have been equally authentic. The difference would have lain in their difficulty of access, in their want of modern clearness and incisiveness of statement, and in their loss of mutual coherence and unity. Had he not lived, texts that today will carry the bread of life to thousands might have remained the obscure disputes of scholars. He taught with authority, and not as one of the Pundits for he himself had plunged to the depths of realisation which he preached, and he came back, like Ramanuja, only to tell its secrets to the pariah, the outcast and the foreigner.

['The many and the One are the same Reality, perceived by the mind at different times and in different attitudes'—the doctrine realised and preached by Vivekananda].

It is this which adds its crowning significance to our Master's life, for here he becomes the meeting-point, not only of the East and West, but also of past and future. If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and to avoid."

দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ আমরা দিয়েছি, *The National Significance of the Life of the Swami Vivekananda* এবং *Swami Vivekananda as a pariot*। দুটি প্রবন্ধই স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে লিখিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি ২৭শে জুলাই মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতে পুনর্মুদ্রিত হয় ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২-তে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যশোহরের 'ব্রহ্মচারিন্' নামক ইংরাজী পত্রিকাতে প্রকাশিত হবার পরে পুনর্মুদ্রিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের নিউ ইন্ডিয়াতে ২রা অক্টোবর, ১৯০২-তে। এই দুটি প্রবন্ধই *Vivekananda in Indian Newspapers* নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেখান থেকেই এখানে গৃহীত।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তাঁর বিষয়ে নিবেদিতা-প্রদত্ত অনেকগুলি বক্তৃতার সংকলন *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে রয়েছে। সেগুলিও প্রায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মূল্য পাবার যোগ্য, বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাটি। কিন্তু গ্রন্থস্ফীতির ভয়ে সেগুলির অনুবাদ দেওয়া যায়নি।

পূর্বোক্ত *The National significance* নামক প্রবন্ধটি ভাবগুণে ও সাহিত্যগুণে উচ্চাঙ্গের এবং প্রকাশমাত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বামীজীর দেহ-ত্যাগের পরে প্রকাশিত রচনাদির মধ্যে এইটিই সর্বোত্তম সন্দেহ নেই, এবং ভারতীয় পটভূমিকায় বিবেকানন্দের মহাজীবনের গুরুত্ব এমনভাবে পূর্বে উদ্ঘাটন করা হয়নি। পরবর্তীকালে নিবেদিতা এবং রোমা রোলাঁ এই বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত-ভাবে উপস্থিত করেছেন, তবু বলা যায়, পরবর্তী বক্তব্যসমূহের অধিকাংশের বীজ এই কয়েক পৃষ্ঠার প্রবন্ধের মধ্যেই রয়েছে। নিবেদিতা তাঁর মনীষা ও হৃদয়-বত্তাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন এই রচনার মধ্যে।

প্রবন্ধটি রচনার পিছনে একটি ব্যক্তিগত দিকও ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগে বেদনার্ত বহু দূরের একটি মানুষকে সান্ত্বনা দেবার জন্যও প্রবন্ধটি রচিত—যাঁর

কাছে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব নিবেদিতার লেখনীতে কিছু জীবন্ত হয়ে পুনশ্চ আলোক-বর্ষণ করতে সমর্থ। নিবেদিতা ৯ নভেম্বর, ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—'হাঁ, 'হিন্দু'র ঐ প্রবন্ধটি! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই ওটি লিখিত, আর শুধু তুমিই বুঝতে পারবে, কত মন্দ হয়েছে লেখাটি!'

লেখাটি 'কত মন্দ হয়েছে!'—তা যে মিস ম্যাকলাউডই কেবল বুঝবেন, মাত্র তিনিই, তাতে সন্দেহ নেই, কারণ তাঁর কাছে বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময় স্বরূপের প্রকাশ কোনো লেখনীরই সাধ্য নয়। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে এটি একটি অনবদ্য রচনা, সহস্র কণ্ঠে এর জয়ধ্বনি উঠেছিল, নিবেদিতার পত্রেই তার প্রমাণ আছে। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"বলে নিই, নিগু (ওকাকুরা) পর্যন্ত লেখাটিকে 'একেবারে ভালবেসে ফেলেছে'। সেই কথাই সে বলল। বোম্বায়ের বৃহৎ সভাগুলি (নিবেদিতা যাতে স্বামীজী সম্বন্ধে ও ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন) এই লেখার জন্যই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধটি নিজের কাজ করেছে—সন্দেহ নেই!"

জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ভূমিকা

[*The National Significance of the Life of the Swami Vivekananda*]

পৃথিবীর কাছে 'বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত মানুষটির দৈহিক অস্তিত্ব এখন এক মুষ্টি ভস্মমাত্র! পাঁচ বৎসর ধরে আমাদের নদীতীরে যে-আলোক নিঃসঙ্গে জ্বলেছে—তা এখন নির্বাপিত। দেশে দেশে প্রতিধ্বনিত সুমহান স্বরধ্বনি মৃত্যুতে নীরব। এই বিশাল আত্মার কাছে জীবন এনেছে ঝঞ্ঝা, হেনেছে আঘাত,—সমাপন কিন্তু শান্তি! শান্তি! সান্ধ্য আরাত্রিকের শেষ শব্দ যখন মিলিয়ে গেল—ঘনিয়ে এল মহাকালীর মহারাত্রি—তখনই এল মৃত্যুর আশীর্বাদ, নিঃশব্দে। আহত ক্লান্ত দেহ শায়িত রইল, বিজয়ী আত্মা ফিরে গেল 'নিজ নিকেতনে'—চির সমাধিতে।

তিনি চলে গেলেন—প্রথম সাফল্যের মালা কণ্ঠে এখনো অম্লান। তিনি চলে গেলেন—যখন নূতনতর, বৃহত্তর আহ্বান কর্ণে ধ্বনিত। মধ্যে দু'একবারের কথা বাদ দিলে অসুস্থতার বেশী সময় তাঁর কেটেছে নদীতীরের সুদৃশ্য আবাসে। অবহেলায় বিশাল খ্যাতিকে উপেক্ষা করে তিনি সেখানে থাকতেন—উদ্যানের বৃক্ষলতা, পশুপাখীর মধ্যে—আর শিক্ষা দিতেন সমবেত শিষ্যদের সহজ ছন্দে। নিজের করণীয় কর্তব্যকে কঠোরভাবে সংহত করে বলতেন—'মানুষ তৈরীই' আমার ধর্ম। আর সেই মানুষ তৈরীর কাজ করেছেন দিনের পর দিন, অব্যাহত পরিশ্রমে—গুরুরূপে, পিতারূপে, শিক্ষকরূপে—যখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে। তাঁর বিদায় দিনের অপরাহ্ণে পর্যন্ত কি তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষাদান করেননি তিন ঘণ্টা ধরে? এমন মানুষের কাছে বাইরের সম্মান বা নেতৃত্বের গৌরবের মূল্য কিছুই নয়। পাশ্চাত্ত্যবাসের সময়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী অনেক বন্ধু তাঁর হয়েছিল—তাঁরা পারলে সানন্দে তাঁকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতেন। কিন্তু তাঁর কাছে সমস্ত বিলাস ঐশ্বর্য সত্ত্বেও প্রতীচ্য-পৃথিবী আকর্ষণহীন। ভিক্ষুকের জীর্ণ কন্থা,

কলকাতার নোংরা গলি, স্বজাতির অক্ষমতা অনেক বেশী প্রিয় তাঁর কাছে বিদেশীয় গৌরবময় জীবনের তুলনায়। প্রাচ্য-অভিমুখে এই চিরযাত্রী—এঁকে পাশ্চাত্ত্যে যাঁরা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, মুষ্টি তাঁদের আলগা করে দিতে হয়েছিলই।

পাশ্চাত্ত্য তাঁর কাছ থেকে কোন্ বার্তা পেয়েছিল যার জন্য অত মানুষ তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদের অন্যতম বলে বন্দনা ও বরণ করেছিল? নিজের সপক্ষে বিশিষ্টতার দাবি তিনি করতেন না; ব্যক্তিগত জীবনকথা বলতে চাইতেন না। গুরুভাইদের অপেক্ষা অধিক-বিশিষ্টতা তিনি দাবি করেছেন, এমন কথা তাঁর মুখে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত ও আস্থাভাজন একজনও কখনো শোনেননি। বাইরের মানুষের কাছে কোনো বিশিষ্ট ধর্ম, বা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ নাম, বা কোনো বিশেষ গুরুর পক্ষে প্রচার করতেন না। অপরপক্ষে, তাঁর মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের বেগবান ধারা প্রবাহিত হত। যেন হিমালয়ের মহারহস্যরাজ্য থেকে প্রত্যক্ষ আহৃত নির্মল পুণ্যবারি তিনি বুদ্ধিজীবী, অধ্যাত্মরসপিপাসু পৃথিবীর মানুষের উপর বর্ষণ করতেন। ভারতের বিরাট বিচিত্র ধর্ম-সংস্কৃতিকে ও পুণ্যাত্মাদের প্রত্যক্ষে দর্শন অবশ্যই তিনি করেছেন। তথাপি তিনি উপনিষদ ছাড়া প্রামাণ্যরূপে আর কিছু উদ্ধৃত করতেন না, বেদান্ত ভিন্ন প্রচার করতেন না। আর মানুষের অন্তরাত্মা তাঁর কথা শুনে শিহরিত হয়ে উঠত, কারণ এই একজন ধর্মাচার্যের কথা তারা প্রথম শুনল যিনি সত্যে ভীত নন।

শিবের সেই গানটি আমাদের জানা আছে : 'শিব পথ দিয়ে যাচ্ছেন, কেউ বলে তিনি পাগল, কেউ বলে দানব, আর কেউ বলে—উনি কে জানো না? স্বয়ং ঈশ্বর!' এইভাবে ভারত জানে—প্রত্যেক বিরাট চরিত্র বিরোধী আদর্শের মিলনভূমি। শিষ্যদের কাছে বিবেকানন্দ চিরদিন সন্ন্যাসের সর্বোচ্চ আদর্শ—তাঁর সকল প্রেরণার মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রকাশই মুখ্য।—'আমার গুরু যেমন, তেমনি আমিও যেন বিদায় নিতে পারি খাঁটি সন্ন্যাসীরূপে, কামকাঞ্চন ও খ্যাতিতে নির্বিকার থেকে,'—তিনি একদা তীব্র আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন।—'ঐ তিনের মধ্যে খ্যাতির প্রলোভন দূর করাই সবচেয়ে কঠিন,'—তিনি যোগ করেছিলেন। অথচ যে-নিয়তি তাঁকে তীব্র বৈরাগ্যের জ্বলন্ত তৃষ্ণায় অস্থির করেছে, সেই নিয়তিই তাঁর মধ্যে গৃহীর আদর্শকে মূর্ত করেছিল; পালনে ও রক্ষণে ব্যগ্র, পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন অনুধাবনে ও অনুধাবন করানোয় উৎসুক, জীবনের সংগঠন ও ইতিহাস রচনায় অগ্রসর—আদর্শ গৃহী। এই দিক থেকে তিনি বাস্তবিকই Benedict, Bernard, Robert de Citeaux এবং Loyola -র সগোত্র। একথা বলা যায়, ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসে সেণ্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির মধ্যে যেমন একবার ভারতীয় সন্ন্যাসের গৈরিকচ্ছায়া পড়েছিল, তেমনি অপরদিকে বিবেকানন্দের মধ্যে নবজন্ম নিয়েছিল পাশ্চাত্ত্য সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মহান সেণ্ট-অ্যাবটগণ।

তিনি যেমন অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্বচেতনার সুবিরাট প্রকাশ, তেমনি আবার একই সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিকদের একজন। জাতীয় চিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগে তাঁর আবির্ভাব এবং তিনি প্রগতিতে নির্ভয় ছিলেন। ঐতিহ্যে বিশ্বাস হারিয়েছে যখন মানুষ, তখন তিনি পুরাতনকে নমস্কার করেছেন। তিনি জাতির নিয়তি-পুরুষ; নবপ্রত্যয়ের নেতাদের মতই তিনি চেতনার নূতন তরঙ্গাঘাত

করেছেন। তাঁর মত পুরুষের মধ্যে প্রকাশিত হয় ভবিষ্যতের পূর্ণ 'বেদ'। একথা অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে—বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মহিমা বুঝবার সময় এখনো আসেনি। ধর্মের প্রাণপূর্ণ বীজ তিনি বপন করেছেন, কিন্তু ফসলের সময় হয়নি। অপরদিকে, 'দেশপ্রেমিক' বিবেকানন্দকে দেশ পেয়ে গিয়েছে এখনি—তাঁর মৃত্যুর শঙ্খধ্বনিতে! আচার্য যখন শিষ্যবৃন্দের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন, শ্মশানের অগ্নিশিখার সামনে সমালোচকের গুঞ্জন যখন স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন শোনা গেল —স্বাধীনতার বিশাল কণ্ঠ অব্যাহত মহিমায় নিনাদিত,—আর সারা জাতি সাড়া দিল এক স্বরে।

নানা দেশের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার বিরল সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে দেখেছেন। উচ্চ নীচ সকলে তাঁকে গ্রহণ করেছে। তাঁর অসাধারণ দীপ্ত মনস্বিতা সব কিছু দৃষ্ট বস্তুরই পরিমাপ করতে পেরেছে। 'আমেরিকা শূদ্র-সমস্যার সমাধান করবে কিন্তু কি ভয়ঙ্কর আলোড়নের মধ্য দিয়ে,' —তিনি বারবার বলতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণকালে পাশ্চাত্ত্যের ধনলোভ ও পীড়নলালসা দেখে তাঁর মত বদলে গেল। এর বিপরীত দিকে তুলনামুখে তাঁর মনে জাগল বহু শতাব্দী পূর্বে চীন-প্রবর্তিত এশিয়ার পুরাতনী নৈতিক সভ্যতার শান্ত মহিমা ও স্থিতিশীলতার কথা। তাঁর অসাধারণ মনীষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপূর্ব মানবতা। আফ্রিকার জাতিগুলির বিরুদ্ধে একবার জনৈক আমেরিকান ঘৃণা প্রকাশ করলে তিনি তাকে যেভাবে নাজেহাল ক'রে তোলেন—তাতে প্রকাশিত হয়েছিল নিগ্রোদের সম্বন্ধে মানবতার অপূর্ব আশ্বাস! যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে যখন তাঁকে কখনো কখনো নিগ্রো বলে মনে করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (যে-ভুল ধরা পড়া মাত্র সেখানকার সর্বাধিক দায়িত্বশীল পরিবারগুলি প্রচুর সমাদরের মধ্যে তা সংশোধন করেছে)—তখন তিনি কখনো প্রতিবাদ করে নিজের পরিচয় দেননি।—'তা করলে আমার ভাইকে কি অসম্মান করা হত না?'—পরিচয় না দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সহজভাবে বলতেন। তাঁর কাছে প্রতি জাতিরই নিজস্ব মহিমা ছিল—তারই দ্বারা উজ্জ্বল দেখতে চাইতেন তাকে। তুর্কী জাতি ভিন্ন ইউরোপ, আদিম সন্তানগণ ছাড়া মিশরের অস্তিত্ব যেন তাঁর কল্পনায় ছিল না। ইংলন্ড তাঁর কাছে এমন এক দেশ যেখানে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে মানুষ আনুগত্যের রহস্য শিক্ষা করেছে, এবং জাপানীর দেশপ্রেম?—অন্য কারো সঙ্গে তার তুলনা করাও পাপ।

নিজ দেশবাসীর জন্য বিবেকানন্দ কোন্ উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন? যে-গৈরিক বহির্বাস তিনি ত্যাগ করে গেলেন, তাতে জাতির কোন্ জীবনমন্ত্র লিখিত ছিল? সেই গৈরিক বস্ত্রখন্ডকে কি ঊর্ধ্বে কেতনরূপে উড়িয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে?—নিশ্চয়ই। কারণ তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন ব্যর্থতা যাঁর স্বপ্নেও আসত না। সেই এক পৌরুষ, যা 'শক্তি' ভিন্ন কিছু উচ্চারণ করেনি। ভাবালুতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্রোহী এই মানুষের বিষয়ে মিশনারী-কুৎসাগুলি কি এখনো কানে বাজছে না? তার কয়েকটিকে কি বিপরীত পক্ষে গর্বের বস্তু বলে ঘোষণা করব না? বিদেশীর সামনে তিনি শিক্ষাদাতা আচার্য-রূপেই দাঁড়াতেন—অন্য কোনো চেহারায় নয়।—'স্বামীজীর বিরাট প্রতিভার ভিত্তিতে

আছে তাঁর মহান মর্যাদা—এক কথায় তা মহারাজোচিত !'—তাঁকে বিশেষভাবে জানতেন এমন একজন ইংরাজ বলেছিলেন। প্রাচ্য সম্মুখীন হবে পাশ্চাত্ত্যের কাছে চাটুকার রূপে নয়, ভৃত্যরূপে নয়—সম্মুখীন হবে গুরুরূপে, আচার্যরূপে। তিনি নিজে কখনো ব্যক্তিগত প্রভুত্বের পতাকা নত করেননি সেখানে। 'ইউরোপীয়রা আমাদের ধর্মে নেতৃত্ব দেবে??—দিক!!!'—তাঁর কণ্ঠের ঘৃণার তীব্রতা গোটা কথাটাকে হাস্যকর করে তুলত।—'আমি কখনো প্রতিশোধের কথা বলিনি,'—তিনি একবার বলেছিলেন—'আমি বলেছি আত্মশক্তির পক্ষে। আমরা কি সমুদ্রের জলকণার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কল্পনা করতে পারি? সেটা কিন্তু একটা মশার পক্ষে মস্ত কিছু।'

ভারতীয় কোনো কিছুর জন্য তিনি কুণ্ঠিত বা ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন না। বিদেশীর অতি-মার্জিত বুদ্ধিতে হয়ত ভারতীয় কিছু জিনিস স্থূল বর্বর ঠেকেছে। সে সব জিনিস তিনি অস্বীকার করলেন না, কমাবার বা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করলেন না, পরন্তু নিজের বিরাট শক্তিকে প্রয়োগ করলেন সেই বস্তুটির সমর্থনে, আর তার ফলে হতভাগ্য সমালোচকটি নিজের যুক্তির দড়ি গলায় আটকে অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগল। যেমন একটি ঘটনা : জনৈক ইংরাজ জাহাজে তাঁকে হিন্দু পুরাণ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক প্রশ্ন করেন। তারপর যা ঘটল ভুলবার নয়। স্বামীজী খৃস্টীয় ধর্ম-কাহিনীর তুলনায় হিন্দু পুরাণকে সমুচ্চে স্থান দেওয়ার পরে বেদ বা উপনিষদকে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় স্থাপন করলেন, এমন প্রচণ্ড যুক্তির সঙ্গে যে, উক্ত ইংরাজ একেবারে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেলেন। এমনই সব ক্ষণে, যখন জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করছেন, তখন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কোনো মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। এমন মনোভাবকে সবসময়ে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে তা যথার্থই অপ্রীতিকর। কিন্তু কী প্রচণ্ড পৌরুষ!—শত্রুরাও স্বীকার করবে। পুনশ্চ বলা যায়, বিবেকানন্দের কাছে ভারতের সব কিছু সমানভাবে, সম্পূর্ণভাবে পবিত্র;—'মুক্তিকামী সকলকেই এই ভূমিতে জন্ম নিতে হবে!'—তাঁর ধর্মবোধ স্নিগ্ধ নির্ঘোষে জানিয়েছে। চিকাগোর বিশ্বমেলায় আগত যে-কোনো ভারতীয়কে—ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান-পার্শী যাই হোক না কেন—যে-বাড়িতে তিনি অতিথি সেখানে আপ্যায়নের জন্য হাজির করতে পারতেন, আর গৃহস্বামী জানতেন, যদি সমাদরে কোনো ত্রুটি হয়—বিবেকানন্দকে তদ্দণ্ডে হারাতে হবে।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি তিনি—তবু যখন দেখলেন ভারত-উদ্ভূত এক ধর্মের প্রতিনিধি নিজ ধর্মের পক্ষে বক্তব্য সুচারুরূপে প্রকাশ করতে পারছেন না, তখন তিনি তাঁর জন্য ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন, যে-ধরনের উচ্চাঙ্গের বক্তব্য নিজ ধর্মের পক্ষে হাজির করা উক্ত প্রতিনিধির পক্ষে কদাপি সম্ভব ছিল না।*

হাতে করে খাওয়ার মত হিন্দুজীবনের সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্যগণকে শেখাতে তিনি অসম্ভব যত্ন নিতেন।—'মনে রাখবে, যদি ভারতকে ভালবাসতে চাও, তাহলে সে যেমন আছে সেইভাবে তাকে মেনে নিয়ে ভালবাসবে, নিজের মনোমত ভেবে নিয়ে নয়,'—তিনি প্রায়ই বলতেন। বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্যাদার পক্ষে তাঁর প্রচণ্ড দৃঢ়তা পর্বতের মত উন্নত মহিমায় বর্তমান থেকে তাঁর

---

* এখানে নিবেদিতা বৌদ্ধ-প্রতিনিধি অনাগারিক ধর্মপালের কথা বলতে চেয়েছেন।

অনুরক্ত ইউরোপীয় শিষ্যগণের নিকটে যে অপরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তিকে উন্মোচন করেছে, তার নাম ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সদ্য দাঁত-ওঠা কোনো মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন জানানোর মত ব্যাকুলতা তাঁর কখনো ছিল না। প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি পুরনো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন; সরল জীবনের সৌন্দর্যে এতই গর্বিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেন নি।—'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী'—মৃত্যুর প্রায় দু'দিন পূর্বে বলেছিলেন। ঐ কথা বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বললেন : কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত ধুতি-চাদর গায়ে, খড়ম ঠক্‌ঠক্ করতে করতে ভাইসরয়ের আলোচনাকক্ষে হাজির হয়েছিলেন, এবং তাঁর বেশবাসে আপত্তি করা হলে বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলেছিলেন—'যদি আমার চালচলন এত অপছন্দ তাহলে আমাকে ডাকা হয়েছে কেন?'

স্বামীজীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এইসব ঘটনার আকর্ষণ আছে। গুরুতর কথা হল—এই কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে কোন্ বিশ্বাসের মূর্তি উন্মোচিত? তা কী, তার লক্ষ্য কী?—উত্তরে বলা যায়, তাঁর সমস্ত জীবন এক কথায় হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কারের সাধনা। দু'পয়সার ডাক টিকেট, সস্তার রেল-ভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। যদি ভারতের সত্যই কোনো মৌল ঐক্য থাকে, তাহলে ঐ সমস্ত জিনিসগুলি বড় জোর তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে, তার ফলে যে-ভারতের দর্শন পেলেন তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক। এই মহাসন্ধানের সিদ্ধিগৌরবে মহীয়ান হয়েই তিনি ধর্মমহাসভায়—এবং তার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে—নিশ্চিত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন : হিন্দুধর্ম একটি পরম সত্য ঘোষণা করেছে—'মুক্তি!' —আর হিন্দুধর্মের সেই বাণী যে-কোনো ধর্মের বিরোধী আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ। তাঁর স্বদেশবাসী অন্য দেশীয় মানুষের সমকক্ষ নয়—একথা তাঁর কখনোই মনে হয়নি। ভারতের কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে ধর্মের মধ্যে, একথা মনে রেখেও তিনি মনে করতেন, ভবিষ্যতে ধর্মশক্তির সঙ্গে আরও বহু শক্তির অভ্যুত্থান হবে এদেশে।

বর্ণাশ্রম প্রথার সুগভীর অনুশীলন তিনি করেছিলেন। কথাবার্তার সময়ে ঐ প্রথার আত্মবিরোধ কিংবা বৈশিষ্ট্যের বহু রূপ তিনি উন্মোচন করতেন। তিনি দেখেছিলেন—ভারতের ঐক্যের সূত্র আছে তার আত্মসংরক্ষণে! সকল মুসলমানই এক জাতি, সকল খ্রীষ্টান তাই, কিংবা সকল পার্শী। এদের মধ্যে পার্শীদের বাদ দিলে, মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা জাতিপ্রথায় অবিশ্বাসের দ্বারা এক জাতি। সেই কথাই বলা যাবে ব্রাহ্মসমাজ বা সেই ধরনের অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই পশ্চাৎপট রচনা করে আছে সাধারণ মৃত্তিকা, প্রাচীন সভ্যতার সুন্দর ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন, আর জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনগুলি—যা সাধারণ প্রেম বা ঘৃণার সৃষ্টি করে।

প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি কেবল শিক্ষা করেননি—তাদের গৌরবস্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দু পল্লীর এই সন্তান কলকাতার গঙ্গাতীরেই জীবন সমাপন করবার জন্য ফিরে এসেছিলেন—তবু পাঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত পাঞ্জাবই বুঝি তাঁর জন্মস্থান, কিংবা একই কারণে রাজপুতনা, বা হিমালয়খণ্ড—এমনই অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাঈয়ের, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কণ্ঠে। পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ সিংহের বীরকাহিনী, দিল্লী বা চিতোরের ইতিহাসকথা, শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বুদ্ধের জীবনগাথা জড়াজড়ি হয়ে থাকত তাঁর মুখে। বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত। তাঁর প্রাণ-মন-আত্মা এক জ্বলন্ত মহাকাব্য, যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্যব্যাকুল।

বেলুড়ের বিশ্রামকক্ষে বসে বিবেকানন্দ সর্ব পৃথিবীর মানুষকে গ্রহণ করতেন, প্রত্যক্ষে বা পত্রে। বাইরের কোলাহল নীরব হয়ে এলেও ভারতের হৃদয়ের গভীরে তাঁর অটল আসন। তাঁকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, কিংবা কম ক্ষেত্রেই তেমন অভিপ্রায় ছিল। এমন কোনো আশার বাণী ছিল না যা তাঁর কানে বাজেনি, এমন কোনো বেদনা ছিল না যা তিনি জানেননি,—তিনি চেয়েছেন এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে, উদ্দীপিত করতে। ধর্মনেতাদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তাঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল—তাঁর দেখা ভারতের সঙ্গে অন্যের দেখা ভারতের কোনই ঐক্য ছিল না। কারণ তিনি মুঠিতে ধরেছিলেন, যা অখণ্ড, মূলীভূত, প্রাণগত। প্রাণের উৎস-রহস্য তিনি জানতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়স্পর্শ করার ভাষা তিনি জানতেন। আর এই সকল জ্ঞানের দ্বারা তিনি নিশ্চিত স্পষ্ট আশাবোধ করতে পেরেছিলেন।

অন্যেরা যে-যাই ভুল করুক, তাঁর কাছে এদেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত, সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে। যন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে আজ যে-নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাবী পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র। তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি। একথা সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে অন্যের সাহায্যভিখারী ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয়। বাহির থেকে তিনি আশাও করতেন না, আশঙ্কাও নয়। ভারতের আত্মিক স্বরূপের পুনর্ঘোষণা, সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঙ্গাকে নবপ্রবাহে সঞ্জীবিত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলাই তাঁর সন্ন্যাসের তাৎপর্য। তাঁর কাছে সন্ন্যাস মানে পরিপূর্ণ সেবা ও আত্মদান। ভারত তাঁর কাছে হিন্দু, আর্য, এশীয়। সে ভারতের যৌবনকামনা আধুনিক সভ্যতার বিলাসদ্রব্য নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয় তার আছে—কিন্তু প্রত্যাবর্তন সে কি করবে না? করবেই, কারণ তার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা আর আধ্যাত্মিকতা। গঙ্গাতীরে প্রশান্ত চিত্তে যে-জাতি মৃত্যুপ্রতীক্ষা করে, তার পক্ষে দীর্ঘদিন যান্ত্রিক ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত থাকা সম্ভব নয়।

বুদ্ধ ত্যাগধর্ম প্রচার করেছিলেন—তার ফলে ভারত দুই শতাব্দীর মধ্যে বিশাল

সাম্রাজ্যের রূপ ধরল। সে ভারত আবার সকল ধমনীতে তীব্র জীবন-স্পন্দন অনুভব করুক। তাহলে জগতের কোনো শক্তিই নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখীন হতে পারবে না। শুধু দেখতে হ'বে, ভারত যেন তার নিজস্ব জীবনের মধ্যে জীবনলাভ করে—অন্যের অনুকরণে নয়; বিদেশীর কাছ থেকে আদর্শ ধার না করে সে যেন নিজের অতীত ইতিহাসের সত্যরূপের থেকে প্রেরণা পায়।

যে নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বল হয়ে যায়। যে নিজেকে শক্তিমান মনে করেছে, সে দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তাই জাতির জন্য, প্রতিটি মানুষের জন্যও বটে, বিবেকানন্দের একটি মাত্রই বাণী ছিল—তাঁর কণ্ঠে নিশিদিন মন্দ্রিত সেই মন্ত্র :

ওঠো! জাগো! শ্রেয়োলাভ না করে নিবৃত্ত হয়ো না!

দেশপ্রেমিকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ

[*Swami Vivekananda as a Patriot*]

স্বামীজীর দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—তা দেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। 'দেশ' কি নিয়ে গড়ে উঠেছে সে-বিষয়ে ভারতের সকল ধর্মাচার্যের মত তাঁর ধারণাও জটিল ও ব্যাপক। বিদেশীদের চরিত্র ও রীতিনীতি থেকে তিনি বেশী কিছু পাবার আশা করতেন না। মাঝে মাঝে তিনি ইউরোপীয়দের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের মনে কঠোরভাবে মুদ্রিত করিয়ে দিয়েছেন একটি কথা—'তাদের কাজ করতে হবে কালা আদমীর অধীনে।'

ভারতে পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ আন্দোলন থেকে যা-কিছু পাওয়া সম্ভব সবই তিনি পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে। রামকৃষ্ণ-দর্শনের পরে তাঁর জীবন হয়ে দাঁড়াল—জাতীয় ভাবধারার প্রগতিশীল পুনরুদ্ধার-সংগ্রাম। অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের নিষ্ঠাবান ছাত্র তিনি ছিলেন না কিন্তু তাঁর প্রাচ্য সহজবুদ্ধি ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির কাছে একথা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল যে, পাশ্চাত্ত্যে যেখানে বিশাল ভূমিখণ্ডকে একলা হাতে চাষ করতে হয়, সেখানকার শ্রম-বাঁচানো যান্ত্রিকতাকে, প্রাচ্যদেশে যেখানে ছোট একটি ভূমিখণ্ডের উপর একটি গোটা পরিবার বেঁচে থাকে—সেখানে প্রবর্তন করলে অর্থনৈতিক সর্বনাশকে ডেকে আনা হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকৃতি তাঁর নিজ দেশের মানুষেরা অবলম্বন করুক—এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা ঘটুক চিন্তাক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ চিন্তাপদ্ধতি সঞ্চারিত হোক ভারতে, কিন্তু পরিবেশের ওলট-পালট না ঘটে। পাশ্চাত্ত্যের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রের মত করে তিনি বুঝেছিলেন (বিদ্বজ্জনেই জাতীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যার চরিত্র বোঝে—রাজনীতিকেরা নয়!)—ঊর্ধ্বশ্বাসে নূতনের পশ্চাদ্ধাবনের পরিবর্তে আজ এশিয়ার প্রধান দায়িত্ব যে-কোনো মূল্যে তার পুরাতন সামাজিক সংগঠনের সংরক্ষণ। মহত্তম দেশপ্রেমিক তিনি,—তিনি রাজনীতিক নন।

এই ভারতের মৃত্তিকা পর্যন্ত তাঁর কাছে অপরূপ—'শ্যামা জননী।' এ-দেশের সর্বপর্যায়ের শ্রম-সংগঠন, আদর্শের বিকাশ, চিন্তা ও কর্মের, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক

শক্তিসমূহের ফল-পরিণতি— এ সকলই তাঁর কাছে রত্নসমুদ্রতুল্য; এর ভিতর থেকে তাঁর শ্রদ্ধাদীপ্ত বিশাল মনস্বিতা নিরন্তর নূতন ও গভীর ভাবরত্ন আহরণ করত —যা সাধারণের কাছে আদর্শ ও আলোকরূপে বিরাজিত। বিশাল বিশ্বের সামনে এই মহান আচার্য শুধু ধর্মে বা দর্শনে বা 'সমাধি'র মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেননি—তিনি ভারতী চেতনার সাক্ষীপুরুষ, ভারতের প্রচণ্ড নিজস্ব প্রতিভা-প্রবাহের নির্গমন-গুহাস্বরূপ। তাঁর বিরাট ক্ষত্রশক্তি নিযুক্ত ছিল আক্রমণে নয়, আত্মরক্ষায়। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা যায় সে সবই তাঁর নখদর্পণে ছিল। বর্ণাশ্রমের পক্ষেও অন্যের অনায়ত্ত সর্বোত্তম যুক্তিও তাঁরই অধিকারে। কিন্তু এইসকল যুক্তিতর্কের বিবাদ যখন চলত, তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত অন্য ক্ষেত্রে—মৌল প্রয়োজনে :— আগে চাই শক্তি, যে-শক্তি নিজ প্রশ্নের সমাধান নিজেরা করবে, নিজ প্রয়োজনে নিজেদের 'জাতি' ভাঙবে বা গড়বে নিজেরাই।

ভারতীয় জনগণের নৈতিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাদের অবস্থার গুণগান করলে তাঁর কাছে ফল পাওয়া যেত না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলতেন—শবদেহের চেয়ে সচ্চরিত্র কে? জীবন—জীবন চাই। তা শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা যাই আনুক। শক্তি চাই— তাতে যদি যন্ত্রণা আসে, বিক্ষোভ আসে—তবুও। 'জীবন' আর 'শক্তি'—এই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের লক্ষ্য—তুচ্ছ কতকগুলো সমাজসংস্কারের কাকুতি নয়। আকাঙ্ক্ষিত 'জীবন' কিন্তু ঐতিহ্যপটে সংগঠিত জাতীয় জীবন হওয়া চাই। ভারত এশিয়ার সন্তান—তারই অঙ্কে তার স্থান; সে স্থান যেন নির্ধারিত না হয় অর্বাচীন 'জার্মানীতে নির্মিত' ইউরোপের কুক্ষিতে। ভবিষ্যৎ অবশ্যই অতীতের প্রতিচ্ছবি হবে না, কিন্তু অতীতের প্রতি সুগভীর সজীব শ্রদ্ধাতেই তার ভিত্তি দৃঢ় হতে পারবে।

এই কারণেই জাতীয় চৈতন্যের মূলানুসন্ধানে স্বামীজীর নিরন্তর, নিরলস আপোষহীন প্রযত্ন। এই জন্যই সামান্যতম গাথা-কাহিনী, ব্যক্তিজীবন ও তার রীতি-নীতি সম্বন্ধে তুচ্ছতম সংবাদও তাঁর বুদ্ধিজালকে এড়াতে পারত না। এই কারণই রয়েছে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসন্ধানে তাঁর বিরাট প্রয়াসের মূলে। সুমহৎ অতীতের উপরে গড়ে উঠুক মহত্তর ভবিষ্যৎ। প্রতিটি মানুষ মহাভারতীয় চরিত্র হোক—হোক ভীষ্ম, হোক যুধিষ্ঠির। তাঁর দিগ্‌দিগন্তরব্যাপ্ত আহ্বানের আর্তনাদ : 'সম্মোহিত হয়ে আছি আমরা। আমরা ভাবছি আমরা দুর্বল—তাই আমরা দুর্বল। একবার যদি ভাবি আমরা শক্তিধর—কে আমাদের জয় করবে?' এই কথার ধর্মীয় ও জাতীয়—উভয় অর্থই আছে। কতকগুলি নির্বোধ প্রগল্‌ভ সমালোচকের বাচালতাকে যেমন তিনি সহ্য করতেন না, তেমনি অপরদিকে তাঁর দেশবাসীর পরাভবের চিন্তা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুরাতনী ভারতবর্ষ তাঁর কাছে সর্বদেহে নবীনা—কারণ তার প্রাচীন সভ্যতায় সঞ্চিত আছে ভাবী বহু যুগের নব সৃষ্টির প্রেরণা। সে ভারতে মানুষের ভাগ্য তার নিজের মাটিতে। আর সে মাটির ভাগ্য মানুষেরই হাতে।

নিবেদিতার রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। নিবেদিতার ভারতে আসার ১২ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্ত হয়। নিজ গুরু বিবেকানন্দের কাছ থেকে, সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তগণের কাছ থেকে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বহু কথা শোনেন। একথা তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন, যে-সকল অগ্নিশিখা দেখছেন চতুর্দিকে, সে সবই সেই রামকৃষ্ণ-নামক কেন্দ্রীয় অগ্নি থেকে নির্গত। তাই নিজ গুরুর প্রতি অখন্ড নিষ্ঠাপূর্ণ ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কেবল 'বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলতে পারেন নি, বলেছিলেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।'

নিবেদিতার অধিকাংশ লেখার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। যেখানে তিনি জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পতাকাতলে সমবেত হতে বলা হয়েছে, কারণ ঐ দুই ব্যক্তিত্ব ভারতীয় সাধনার এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূস্বরূপ। সরলাবালা সরকার লিখেছেন, "তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটি আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি, 'তাঁহার নাম বীরেশ্বর; তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন; পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে।'" আর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কোন্ চোখে দেখতেন তা একদিনের ঘটনায় বোঝা যায়—

"মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। তাহার অপর দিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত।'"

বর্তমান পর্যায়ে আমরা নিবেদিতার রচনা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রচনাগুলিই উপস্থিত করছি।

প্রথমেই অনুবাদ করে দিচ্ছি একটি অ-নামা রচনা, যেটি 'সম্ভবতঃ' নিবেদিতা-লিখিত রামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রথম মুদ্রিত রচনা। দুই কলমব্যাপী এই লেখাটি স্টেটসম্যান পত্রিকায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯। লেখাটিতে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সুপরিচিত গ্রন্থ *Ramakrishna: His Life and Sayings* -এর আলোচনা করা হয়।

লেখাটিতে রচয়িতার নাম ছিল না। না থাকায় কোনো ক্ষতি হয়নি বরং সুবিধা হয়েছিল, কারণ মিস্ মার্গারেট ই নোবল যে বিবেকানন্দের শিষ্যারূপে ভারতবর্ষে এসেছেন, একথা মোটামুটি সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙালীর জানা হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ-শিষ্যার পক্ষে রামকৃষ্ণ বিষয়ে অনুকূল প্রবন্ধ রচনা খুবই

স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে রচনাটি লেখক-নামহীন অবস্থায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হওয়ায় রচনার বক্তব্যকে অনেকাংশে সংবাদপত্রের অনুমোদিত বক্তব্যরূপে ধরে নেওয়া হয়। এই ব্যাপারটিই নিবেদিতার অভিপ্রেত ছিল। তিনি কতখানি খুশী হয়েছিলেন তা বোঝা যায় ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯-তে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি থেকে :

'My review of Max Muller's book came out in the *Statesman* on Saturday—2 columns, leader page. I think that fine'.

এই রচনাটির পটভূমিকায় কিছু তথ্য আছে, যা সমসাময়িক ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাক্সমুলার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে ইংলণ্ডে বিখ্যাত *Nineteenth Century* পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে *The Real Mahatman* নামক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি দেশে-বিদেশে বহু চাঞ্চল্য ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। পরাধীন ও অশ্রদ্ধেয় ভারতবর্ষের অশিক্ষিত এই ঈশ্বরপ্রেমিকের জীবন যখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মহাপন্ডিতের আকর্ষণ ও পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ রচনার বিষয় হয়েছিল, তখন সর্বত্রই কৌতূহল,—ভক্তমহলে আনন্দ এবং বিরোধীদলে বিদ্বেষ। এই রচনাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের প্রথম প্রধান বৈদেশিক সমাদর বলা যায়। ম্যাক্সমুলার এখানেই থামেননি; শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণীকে অবলম্বন করে তিনি গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা করেন এবং দু' বৎসরের মধ্যে সে গ্রন্থটি লিখিত ও প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের মত গ্রন্থও চাঞ্চল্য জাগায়। এই বইটিরই সমালোচনা নিবেদিতা করেছিলেন কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায়। স্মরণ রাখতে হবে কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী এবং স্টেটসম্যান ইংরাজ সম্প্রদায়ের প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র।

লেখাটির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়, এটি কোনো ভারতভক্তের লেখা এমন চিহ্ন এর মধ্যে দেখা যাবে না। এমনভাবে এটি লেখা হয়েছে যাতে মনে হয়— শ্বেতাঙ্গ সমাজের পক্ষেই কেউ লিখেছেন, যিনি হয়ত সম্পূর্ণ ভারতবিদ্বেষী নন, কিন্তু না হলেও নিঃসংশয়ে শাসকসম্প্রদায়ের মানুষ। একজন বিবেচক ইংরাজ লিখলে যা লিখতে পারত, নিবেদিতা সেইভাবেই লিখেছেন। ১৮৯৯-এর স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অনামা রচনায় তিনি নিশ্চয় বিবেকানন্দ-শিষ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না—ঐ পত্রিকা তাঁকে সে সুযোগও দিত না। সে সুযোগও নিবেদিতা নেননি, নিতে চাননি, স্পষ্ট কারণেই। কোনো ভক্ত ইংরাজ নয়, একজন বিচারশীল প্রভু-ইংরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন বিষয়ে কিছু কৌতূহল ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন—অন্য কোথাও নয়—স্টেটসম্যানে!! বলাই বাহুল্য সেটা ইংরাজের পক্ষে যদি কিছু নাও হয়, ভারতবাসীর পক্ষে অনেক কিছু!

অতিশয় সংযতভাবে লিখিত এই প্রবন্ধে নিবেদিতা সযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের শ্রেষ্ঠ বক্তব্যের সারসংকলন করেছেন এবং সূক্ষ্ম অথচ নির্মমভাবে ম্যাক্সমুলারের বক্তব্যের অসঙ্গতিকে উদ্ঘাটন করেছেন। **দি রিয়েল মহাত্মন্** প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তির জন্য বহু মহলে তিরস্কৃত হয়ে ম্যাক্সমুলার এই গ্রন্থে প্রশংসার ব্যাপারে অতি সংযম দেখিয়েছেন এবং অলৌকিক প্রভৃতি ব্যাপারের বিরুদ্ধে কঠোর যুক্তিবাদের তরবারি চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে অপর দিকে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-

চরিত্রের অলৌকিক দিব্য মহিমা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বা অবতারশ্রেণীর পুরুষ বলে বিশ্বাস না করলে তিনি নিশ্চয় এই গ্রন্থ লিখতেন না (বিবেকানন্দের কাছে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলেই স্বীকার করেছেন); কিন্তু নানা কারণে (রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক) তা বাইরে ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিবেদিতা অধ্যাপকের রচনায় অন্তর্নিহিত এই স্বতোবিরোধের অংশটুকু খুলে ধরে সুচারু কৌশলে নিজের অভিপ্রেত বক্তব্যের দিকে পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেছেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে নিবেদিতাকে 'জন্ম-সাংবাদিক' বলেছেন, তার কিছু পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

এই লেখাটির পরে আমরা নিবেদিতার Kali the Mother বই থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা উপস্থিত করেছি। Kali the Mother প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃীস্টাব্দে। এইটিই নিবেদিতার প্রথম প্রকাশিত বই। এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা— 'Two saints of Kali'-এর মধ্যে রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের জীবন চিত্রিত। আমরা 'রামকৃষ্ণ' অংশটির অনুবাদ দিচ্ছি; এটি অনুবাদ করেছেন শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত।

রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী

(স্টেটসম্যান, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯)

সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেইজাতীয় অন্যান্যদের প্রসঙ্গে সেদিন হ্যাভলক এলিস বলেছেন : 'প্রাচ্য দেশে ফুলের মতই সহজে ধর্ম ফুটে ওঠে।' যদি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সর্বশেষ বইটি নির্ভুল হয়, যা করতে তিনি স্পষ্টতঃ চেষ্টা করেছেন (তিনি বলেছেন, 'ভারতে কি ঘটছে তার নির্ভুল বিবরণ পাওয়া সর্ব সময়েই কঠিন'), তাহলে এক্ষেত্রে আমরা হ্যাভলক এলিসের বক্তব্যের সমর্থনে বিচিত্র অথচ নানাভাবে আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাব। প্রতিদিনই আমরা চৌরঙ্গীতে হলদে বা ছাই রঙের পোষাকপরা সন্ন্যাসী বা যোগীদের দেখি, যখন তারা দেশীয় লোকদের এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যায় চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে। তারা যে-ধরনের মানুষই হোক না কেন, এইসব লোকের বিশেষ চেহারাই তপশ্চর্যার প্রতি হিন্দুর অনুরাগের সাক্ষ্য, এবং প্রত্যাশা করা যায়, বউবাজারের অপরদিকে যে রহস্যময় সমাজজীবন বর্তমান, তার মধ্যে নিঃস্বার্থ ও খাঁটি সাধু মিলবে যিনি ধর্মজীবনের সুগভীর অনুভূতির বিষয়ে কিছুটা বলবার অধিকারী। রামকৃষ্ণের মধ্যে যেন তেমনই এক মানুষকে দেখা যাচ্ছে। কলকাতার উত্তরে পাঁচ মাইল দূরে 'গঙ্গাতীরে, ভারতবর্ষের সুন্দরতম মন্দিরগুলির অন্যতম' দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে তিনি তেত্রিশ বছরের পূজারী, তপস্বী, যিনি অধিকন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিচিত হবার কারণ রাখেন, যেহেতু তিনি অল্পবিস্তর পরিজ্ঞাত স্বামী বিবেকানন্দের গুরু। যাইহোক,

কাহিনী শুরু করার মুখে অধ্যাপক অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছেন; যে-কাহিনী তিনি পেয়েছেন, তার উপর কি কঠোর তদন্তকাজ চালিয়ে তিনি কেবল সেই তলানি অংশটুকুই প্রকাশ করবেন যার বিষয়ে তিনি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারেন, না কি, যেভাবে কাহিনী তাঁকে বলা হয়েছে সেইভাবেই বলে যাবেন তিনি, যার ফলে আমরা হিন্দুবিশ্বাসের যথার্থ কিছু অংশ দেখতে পাব, এবং সেইসঙ্গে জানব—মৃত্যুর তের বৎসরের মধ্যে (শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন) আলোচ্য বিবরণের বিষয়ী-চরিত্র ভারতবর্ষে ঈশ্বরপুরুষরূপে সত্যই অর্চিত হয়েছেন! সৌভাগ্যবশতঃ লেখক শেষোক্ত পথই নিয়েছেন, অতীব সাধু অভিপ্রায়ে।

"এই বিশেষ কারণের জন্যই (oral tradition-এর dialogic working এর উদাহরণ দেবার জন্যই), এবং এই পদ্ধতির ক্রমবিকাশ সমসাময়িককালে খুব বিরল ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় বলে, ও সাধারণতঃ পরবর্তী ফল থেকেই এর রূপ দেখে নিতে হয় বলে—সত্যভাষণের সম্পূর্ণ অভিপ্রায়সহ রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য গুরুর এই যে সংক্ষিপ্ত চরিতচিত্র দিয়েছেন, আমাদের কাছে এর কিছু আকর্ষণ আছে, নিজস্বভাবে এই কাহিনীর বিষয়বস্তুর জন্য, এবং তদুপরি, প্রত্যেক ধর্ম কোন্ পরিবেশে গড়ে ওঠে ও তার ইতিবৃত্ত কিভাবে লিখিত হয়—সে বিষয়ে আলোকপাত করবার জন্য।"

পুনশ্চ—"আমি বিবেকানন্দের কাছে সবিশেষ পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলুম—তাঁর গুরুর বিষয়ে এ-পর্যন্ত যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি ভক্ত ও শিষ্যগণের কাছে যতই শিক্ষাপ্রদ মনে হোক, জিজ্ঞাসু ইউরোপীয়ের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ভট মনে হয়; যথা, তাঁর বাল্যকালের অলৌকিক ঘটনাসমূহ, দেবী কর্তৃক তাঁকে এমন এক ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানদান, বাস্তবজীবনে মোটেই যার বিষয়ে তিনি জানতেন না—এসব ঘটনা আমাদের মত দুর্ভাগ্য অবিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং উক্ত মহাত্মা যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে তার সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হলেও শেষপর্যন্ত এগুলি অভিপ্রেত ফলের বিপরীত বস্তুই উৎপাদন করবে। বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকাকে ঘনিষ্ঠ জানেন; আমার কথার তাৎপর্য তিনি সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন। তথাপি তাঁর আচার্যদেব সম্বন্ধে তাঁর রঙ-না-চড়ানো বর্ণনাতে পর্যন্ত যাকে dialogic process বলি, তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই; সেইসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের অনিবার্য অলৌকিকীকরণের প্রবণতা। এমন যে হয়েছে এতে আমি খুশী, কারণ এ ধরনের ঘটনা থেকে আমাদের এই শিক্ষা হয় যে, ঐতিহাসিকরা ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে যথার্থ সত্যকে নয়, নিজস্ব (বা পূর্বাচার্যপ্রাপ্ত) সত্যকেই প্রকাশ করেন।"

এই বিবৃতির দ্বারা ম্যাক্সমুলার যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাঁর নিম্নের কথাগুলিতে—

"প্রাচীন যোগীদের যেসব ক্ষমতার কথা বলা হয়, তার সবগুলি বিশ্বাস করা কঠিন। আধুনিক যোগীদের কার্যাবলীও প্রায়শঃ চমকপ্রদ শোনায়। কিন্তু স্বীকার করি, এসবগুলিতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে সমভাবে কঠিন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদের মারফৎ শোনা গেছে—এইসব যোগীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাসও অনাহারে থাকেন, যতক্ষণ ইচ্ছা একাসনে

নিশ্চল থাকতে পারেন, তাঁদের বেদনাবোধ নেই, দৃষ্টিশক্তিতে সম্মোহিত করতে পারেন, ও অন্যের মনের কথা বুঝতে পারেন। এসবই আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু যদি একই ব্যক্তিরা বলতে চান, যোগীরা আকাশপথে ভ্রাম্যমাণ দেবদেবীদের দেখতে পান, কিংবা তাঁদের আরাধ্যদেবতা তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, তাঁরা আকাশবাণী শুনতে পান, দিব্যগন্ধ পান, কিংবা সর্বশেষে, বিনা অবলম্বনে তাঁদের শূন্যে অবস্থান করতে দেখা গেছে—তাহলে সেন্ট টমাসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, যদিও আমি বলতে বাধ্য, শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমার কাছে যে-সাক্ষ্য উপস্থিত আছে, তা সত্যই চমকপ্রদ।”—এক্ষেত্রে আমাদের বলতে হয়, অধ্যাপক মহাশয় কর্তৃক মেনে-নেওয়া জিনিসগুলি না-মেনে-নেওয়া জিনিসগুলির মতই বিমূঢ়কর ঠেকে।

কিন্তু সে যাই হোক, শেষপর্যন্ত আমরা সকলে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সমান আগ্রহী নই; অধীনস্থ জাতিসমূহকে সহানুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা করে এমন কোনো কিছু সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের আগ্রহ আছে বা থাকা উচিত। এবং সে রকম কিছু পেলে আমরা আনন্দিত হই। আমাদের গ্রন্থকার বলেন,—‘(ভারতীয় সন্ন্যাসীদের) একজনের প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপকতর জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে,—সে প্রয়োজন আছে রাজনীতিকের, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়ে যাঁদের নাড়াচাড়া করতে হয়;—সে প্রয়োজন আছে মিশনারীদের, যাঁরা ঐ দেশের অধিবাসীদের জীবন বুঝতে ও তাদের প্রভাবিত করতে উৎসুক;—এবং শেষতঃ, সে প্রয়োজন আছে ধর্ম ও দর্শনের জিজ্ঞাসু ছাত্রদের, যাঁদের অবশ্যই জানা উচিত কিভাবে পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন বেদান্তকে একেবারে একালে ঈশ্বরভক্তরা শিক্ষা করে।’

আর ধর্মীয় কাহিনীগুলি (religious myth) জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে, বিক্ষিপ্ত ও বিবদমান মনুষ্যগণকে একীভূত করাকে চরম কাজ বলে গ্রহণ করেছে, প্রায়ই দেখা যায়। ল্যাটিন ও টিউটনিক জাতিগুলির উপরে খ্রীষ্টধর্মের জীবন্ত প্রভাব, কিংবা সেমিটিক, আর্য বা তাতার জাতির উপর মুসলমান ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করলেই এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়; সেইসঙ্গে এও দেখব যে, ধর্মের এই ধরনের কার্যাবলী তার অন্তর্নিহিত সত্য বা অসত্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, এবং এমনকি যারা তাকে স্বীকার করে না, তাদেরও মনের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। সম্রাট কনস্টানটাইনের কালে রোমের যেসব রাজনীতিকরা খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছিল, তারা সবাই তা উৎসাহের সঙ্গে করেছিল—একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কল্যাণকর্ম করেছিল সেইসব মানুষদের জন্য, ধ্যান ও মননই যাদের অবলম্বন ছিল। একই নিয়মে, আমাদের প্রতিবেশী দেশীয় প্রজাবৃন্দের ক্ষেত্রে যে আবরণকে আমরা দুর্ভেদ্য মনে করি, তা হয়ত সত্যই দুর্ভেদ্য নয়। হয়ত তা ক্ষণমধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে যদি আমরা তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি দেখাই। এই-ক্ষেত্রে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এবং তাঁর সহযোগী পণ্ডিতগণ (ইংলণ্ডের) রাজকীয় স্বার্থের যে-পরোক্ষ সেবা করেছেন, তার বিষয়ে কোনো সাধুবাদই যথেষ্ট নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করা কঠিন। প্রভূত শক্তি বা সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি অধ্যায় থেকে তা উপলব্ধি করতে পারি—

'আন্তরিকতায় সদা পূর্ণ তিনি; প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা থেকে কোনো কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিংবা তিনি এমন কিছু করেন নি যাতে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নেই। তিনি এখন কালী প্রতিমাকে নিজ মাতা এবং জগন্মাতারূপে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, তিনি যেন জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস সমন্বিত—তাঁর হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ করছেন। নিয়মিত পূজার পরে মায়ের কাছে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন, গানে, কথায়, প্রার্থনায় পূর্ণ হয়ে, মায়ের কাছে ছেলে যেমন করে,—যে পর্যন্ত না তাঁর বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত হয়ে যেত। কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত অশান্ত ক্রন্দন—মা কেন দেখা দিচ্ছেন না ইচ্ছামত—কেন? তাঁর বিষয়ে লোকজনের মধ্যে নানা ধারণার সৃষ্টি হল। তরুণ পুরোহিতকে কেউ ধরে নিল পাগল বলে, কারো কাছে তিনি অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, যার বহিরঙ্গ পাগলামি-গুলি ঈশ্বরপ্রেমের অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়।"

এই কাহিনী সেই যুগের অদ্ভুত রমণীয় পরিবেশের কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়, যে-সময়ে, আমরা শুনি, এডমণ্ড রিচ নাকি 'গোপনে, সম্ভবত সন্ধ্যায়, যখন সেণ্ট মেরীর গির্জার উপরে ছায়া ঘনিয়েছে, শিক্ষক ও ছাত্রদল চলে গেছে 'আইল'* ত্যাগ করে,—তখন বালকটি কুমারী মাতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপরে তাঁর আঙুলে এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে নিজ বধূ বলে ধরে নিল।' আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, লোকজন তরুণ পুরোহিতকে পাগল বিবেচনা করল না, যা ধর্মীয় প্রতিভাসমূহের সাধারণ ভাগ্য হয়ে থাকে,—বরং তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষেরা এইসব আচার-বৈলক্ষণ্যকে গভীর ঈশ্বর-প্রীতির লক্ষণ বলে গ্রহণ করল।

যথাসময়ে ভক্ত হয়ে উঠলেন আচার্য বা পরমহংস। দক্ষিণেশ্বর তখন কালীপূজার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হল, যে-কালীপূজা ক্রীশ্চান মিশনারীদের এবং অধিকাংশ ইউরোপীয়ের কাছে এত অরুচিকর মনে হয়। সিদ্ধপুরুষের জীবনের এই পর্যায়ের সঙ্গেই তাঁর 'বাণী'গুলির যোগ। আলোচ্য গ্রন্থের বড় অংশ 'বাণী'গুলি অধিকার করে আছে। ম্যাক্সমূলার বলেন—

"'গোলাপ ফুটলে চারিদিকে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তখন মৌমাছিরা নিজেরাই ছুটে আসে; মৌমাছিরাই গোলাপ খোঁজে, গোলাপ মৌমাছি খোঁজে না,'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির সার্থকতা তাঁর নিজ জীবনে বারবার দেখা গেছে। সকল মত ও সম্প্রদায়ের অজস্র লোক তাঁর কাছে এসেছে শিক্ষা নিতে, তাঁর জীবনের তীর্থবারি আহরণ করতে। প্রত্যুষ থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁর কোনো বিশ্রাম থাকত না, খাওয়ার সময় পর্যন্ত না,—এই সব হাজার হাজার তৃষার্ত আত্মার শিক্ষায়, সেবায় ও উদ্দীপনাবিধানে তিনি এতই ব্যাপৃত থাকতেন। অপূর্ব যৌগিক শক্তি ও বিরাট পাণ্ডিত্যযুক্ত মানুষেরা—সবাই আসত দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর পরমহংসের কাছে শিক্ষা নিতে; তারপর তারা তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু বলে স্বীকার

---

* স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা বিচ্ছিন্ন, গির্জার পার্শ্ববর্তী অংশ।

করত যখন দেখত অপূর্ব পবিত্রতা, শিশুর সরলতা, সম্পূর্ণ অহংশূন্যতা, এবং সহজতম ভাষায় ধর্ম ও দর্শনের গভীরতম সত্যের স্বরূপমোচন—তাঁর মধ্যে।”

জীবনের এই পর্যায় থেকেই ‘বাণী’-গুলি যে সংগৃহীত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অনেক উক্তিই কাব্যসৌন্দর্যে, নিসর্গ-নিরীক্ষায় কিংবা চতুর বাস্তববোধে অসামান্য। অন্যান্য উক্তিগুলি আমাদের সেই অদ্ভুত জগতে আকর্ষণ করে যেখানে ঈশ্বরকে ‘মা’ বলা হয়। তেমন একটি অদ্ভুত উক্তির নমুনা : ‘জীবের মৃত্যুশ্মশানে ঈশ্বরের আবির্ভাব। আবার ঈশ্বরের বিলয়ের পরে আনন্দময়ী জগন্মাতার আবির্ভাব। শবাকার ঈশ্বরের বুকের উপরেই নিত্যানন্দময়ী জননীর ভাবনৃত্য।’

পুনশ্চ : ‘জগন্মাতাকে দেখতে পাই না কেন? মা বড়-ঘরের গৃহিণীর মত, পর্দার আড়ালে থেকে সব কাজ চালান; তিনি সকলকে দেখেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় না কেউ। শুধু ভক্ত ছেলেরা তাঁর দেখা পায়; তারা মায়ার পর্দা সরিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারে।’

পুনশ্চ : ‘কী লজ্জা! মা কাছে রয়েছে—তবু মন্দ চিন্তা, মন্দ কাজ তাড়াতে পারো না?’

সরলতার জন্য আকর্ষণীয় : ‘তৈলহীন প্রদীপ যেমন জ্বলে না, তেমনি মানুষও বাঁচতে পারে না ঈশ্বর ছাড়া,’ এবং ‘জলে ডোবানো কলসীর ভিতরে বাহিরে জল থাকে, তেমনিভাবে ঈশ্বরসায়রে নিমজ্জিত সত্তা ভিতরে বাহিরে ঈশ্বরকে দেখে।’ কিন্তু রামকৃষ্ণ-পুরাণের প্রধান সত্যবাণী এই সংগ্রহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যার বক্তব্য : ‘ঈশ্বরের কত নাম, কত রূপ—যাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে জানা যায়। যে-নামে, যে-আকারেই তুমি তাঁকে ডাকো না কেন, তাতেই তিনি ধরা দেবেন।’ ‘বিভিন্ন ধর্ম সেই এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ।’ কখনো কখনো এই সমন্বয়তত্ত্ব ঘরোয়া কথা গল্পের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, যথা, ‘একই চিনি থেকে যেমন নানা-রকম পশুপাখীর চেহারা বানানো হয়, সেইভাবে সেই একই মধুর বিশ্বজননী নানা কালে ও দেশে নানা নামে অর্চিত হন।’ ‘বাড়ির কর্তা যেমন কারো কাছে বাবা, কারো কাছে ভাই, কারো কাছে স্বামী,—বিভিন্ন লোক যেমন তাঁকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে, তেমনি একই ভগবানকে ভক্তরা নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে ডাকে।’

এই ধরনের মনোভাব অস্পষ্ট ভাবালুতায় ভর্তি হয়ে আজকাল সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু একজন অশিক্ষিত ভক্ত তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে ঐ কথাগুলিকে প্রবল সত্যে যেভাবে পরিণত করেছেন—সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়। আমাদের কাছে ‘নানা মত নানা পথ’—এই সিদ্ধান্ত সর্বমতের সমন্বয়ের চেষ্টায় অগ্রসর না হয়ে সাধারণতঃ কোনো একটি বিশেষ ধর্মের দুর্বলতার ক্লান্ত বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য-গুলির বিষয়ে ঔদাসীন্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত পথে যাত্রার সুস্পষ্ট সুর শোনা যাচ্ছে। পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরও এগিয়ে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত : ‘ভক্তিসাধনার এক পর্যায়ে ভক্ত সাকার ভগবানকে নিয়ে তুষ্ট থাকে; নিরাকার ভগবানও তার সঙ্গেই আছেন; তিনিই সাকার হয়েছেন, আবার নিরাকার।’ তার মানে কলকাতার নিকটবর্তী এক মন্দিরের অখ্যাত কালীপূজক কুড়ি কি তিরিশ বছর আগে এমন এক সর্বজনীন ধর্মীয় সত্যে উন্নীত হয়েছিলেন, যা

বর্তমান কালের সকল আগ্রহী ভাবুক-পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকের মনোযোগের বস্তু। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সূত্র আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন,—রামকৃষ্ণ কিভাবে বিভিন্ন ধর্মকে গ্রহণ করে, ঐসব ধর্মের আচার-বিচার অবলম্বন করে, তাদের মর্মসত্য উপলব্ধির সাধনা করতেন, যার পরিণতি ঘটত নিম্নোক্ত প্রকারে, লেখকের ভাষায়,—

'বিভিন্ন ধর্মের এইসকল দর্শন ও উপলব্ধির পরে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, সকল ধর্মই সত্য, যদিও সকল ধর্মই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের এক একটি দিককে ধরেই আছে। ধর্মগুলি সেই এক ঈশ্বরে পৌঁছবার নানা পথ বলেই তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল।'

'কালী দি মাদার' গ্রন্থে রামকৃষ্ণ-কথা

রামপ্রসাদের মত ঈশ্বরের জন্য মানুষের আকুতির কবিরূপে নয়, মানবসন্তানের জন্য স্বয়ং বিশ্বমাতার ভালবাসার অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব। তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তাঁর কথা এবার শুরু করব।

এই মানুষটির তিরোভাব ঘটেছে মাত্র কিছুকাল আগে। কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে তাঁর শিক্ষাদান স্তব্ধ হবার পরে বিশ বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। তাঁর মধ্য দিয়ে দেবতা এত বেশী স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন যে, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালবাসতেন, তাঁদের অনেকেই আজও তাঁর কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলেন, 'প্রভু আমাদের!'

রামকৃষ্ণের জীবন অসীম প্রার্থনা ও অশ্রুতপূর্ব কৃচ্ছ্রতার ফলে এমন এক গভীর উপলব্ধিতে এসে পরিণতি লাভ করেছিল যে, অহং-এর সামান্যতমও অবশিষ্ট ছিল না। শিষ্যদের সম্মুখে যে-মানুষটি ছিলেন এবং চলাফেরা করতেন, সেটি একটি খোল বই আর কিছু নয়, তাঁর হৃদয়াসীনা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভিন্ন তার পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব ছিল না। শোনা যায় তিনি কখনও 'আমি' বা 'আমার' শব্দ ব্যবহার করতেন না। (নিজের হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে) বলতেন 'এর মধ্যে যিনি আছেন, তাঁর,' কিম্বা সচরাচর 'আমার জগন্মাতার।'

প্রথম জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভাল ছিল, কারণ যে-আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড় তাঁর মধ্যে প্রবলবেগে বয়ে গেছে পঞ্চাশ বৎসর ধরে, তার ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশী আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজেরই সমস্যা। আধুনিককালে সম্ভবতঃ তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব,—সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী। তথাপি সব কিছুই সেখানে এমন এক ঐক্যে পরিণতি পেয়েছিল যে,

তার প্রশান্তি আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, যে-ঘরটিতে একদা তিনি বাস করতেন, এবং সেই বিরাট ধ্যানতরুর নীচে আজও তা বিরাজ করছে এক পরাক্রান্ত উপস্থিতির মত। সেই ছোট ঘরটি শেষ যেদিন দেখে এসেছিলাম, কী নিঃস্বই না বোধ হয়েছিল—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

তখন রাত হয়েছে, একটি ক্ষুদ্র তেলের দীপের আলোয় বিছানার একান্ত পবিত্র আচ্ছাদনটি এবং প্রভুর প্রতিকৃতির সম্মুখে বিশ্বস্ত হস্তে সজ্জিত নবীন পুষ্পরাজি উজ্জ্বল। প্রদীপটি তুলে ধরা হয়েছিল, অমনি দীর্ঘ ছায়াগুলি ছড়িয়ে পড়ল, মনে হল কোনো এক অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসে তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন সব কিছু সেইরকমই আছে—শয্যার পাশে বিশ্রামের সেই ছোট চৌকি, এক কোণে জলের একটি বড় জালা, দেয়ালে কয়েকটি ঠাকুর-দেবতার ছবি—আর কিছু নয়। বাইরে জুন মাসের প্রবল বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারা, চত্বরের নীচে গঙ্গার কলক্রন্দন ধ্বনি ও দ্রুত প্রবাহ। আবার অন্য পরিবেশেও এই স্থানকে আমি দেখেছি; দেখেছি যখন উদ্যানের করবীরা আন্দোলিত হয়ে গোলাপের কানে কানে কথা বলত, পিছনের আম্রকুঞ্জ সর্বাঙ্গে মুকুলিত হয়ে উঠত, যখন সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনিতে স্থানটির নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হয়ে প্রার্থনাকালীন প্রসন্ন হাসির মত প্রতিভাত হত। ভারতীয় নিদাঘ-মধ্যাহ্নের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও আমি একে দেখেছি—তখন এখানে অপার স্নিগ্ধ শীতলতা ও পুষ্পসুগন্ধে চারিদিক ভরপুর। কিন্তু গত জুন মাসের রাত্রির মত এই ঘরটিকে এত নিঃস্ব আর কখনও মনে হয়নি এবং অকিঞ্চনের এত সৌন্দর্যও আর কখনও দেখিনি।

বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এখানে এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন—'এবং প্রভুর কাছে তাঁদের মনে হত যেন শিশু',—সেখানে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন।

সম্পদ ও বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীতে যে কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হতে পারে একথা তিনি একেবারেই জানতেন না। জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে ভ্রূকুটি করে সম্মুখ থেকে বিদায় করে দিলেন, কেননা ধনসম্পদ ও নামযশের অহঙ্কার নিয়ে সে এসেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করে হয়তো দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত সাধারণ নারীর ঘরের কথা মন দিয়ে শুনতেন, কিংবা কোনো অখ্যাত বালককে শিক্ষা দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতেন। তাঁর স্পর্শ কোথাও গভীর দাগ না রেখে যায়নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে সুপরিচিত একজন ধর্মপ্রচারক* তাঁর সংস্পর্শে আসার পরেই ঈশ্বরের মাতৃভাবকে সাধনার ও প্রচারের বিষয় করেন। বর্তমান ভারতের অনেক শক্তিমান ব্যক্তিই বাল্যকালে তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন। গ্রাম্য কৃষিজীবী ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে আগত, প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের হিসাবে বিরাট পণ্ডিত। কারণ তাঁর ছিল এক অসামান্য তীক্ষ্ণ কান এবং স্মৃতিশক্তি, যার বলে তিনি অনুবাদসহ সংস্কৃত শব্দগুলিকে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ তাঁর

---

* কেশবচন্দ্র সেন

কাছে পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসাধারণ বিরাট হয়ে উঠেছিল।

যে সময়কার কথা আমরা বলছি, জীবনের এই শেষ কুড়িটি বছর তিনি ছিলেন একটি মহান আলোকবর্তিকার মত; সারা বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি ও নেপালে সিদ্ধপুরুষরূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেসব জায়গা থেকে বহু লোক তাঁর সাক্ষাতে আসত, অনাড়ম্বর প্রাচ্য রীতিতে। তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন এক শক্তি, যার কুলকিনারা তারা করতে পারত না; এমন জ্ঞানরাশি তাঁর থেকে সমুদ্ভূত হত, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাঁদের। তিনি যেন একটি মহান সঙ্গীত; ঐ সঙ্গীত যার স্পর্শ বয়ে আনছে, তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তার আভাস যেন পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেত তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই সমস্ত সময়টিতে তাঁর প্রকৃত জীবন কেটেছে একদল যুবকের মধ্যে, যাঁরা পৃথিবীর পরিচিত সুখ-সুযোগ ত্যাগ করে তাঁর শিষ্য বলে নিজেদের আখ্যাত করেছেন। তাঁদের দু'একজন সব সময়েই সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যা করতেন, অনেকে আবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমন কি মাসের পর মাস তাঁর কাছে কাটিয়ে যেতেন।

তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নেহাৎ-ই বালক। সুতরাং এই স্বাভাবিক যে, জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে সেখানে ছিল হাসি ও রঙ্গ। তাঁদের গুরু কখনও নিরানন্দ হয়ে থাকতেন না। তাঁর নিঃশ্বাসবায়ুতে যেন বিরাজ করত এক প্রশান্ত প্রফুল্লতা। সেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটত মুহুর্মুহু আনন্দ-উদ্বেল সমাধিতে এবং সমাধিভঙ্গের পর ভাবের এক অপূর্ব উদ্দীপনে। 'সকল প্রাণীর কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমীর কাছে তা দিন; আর যখন সকল প্রাণী জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সুপ্ত'—এই বক্তব্যের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তিনি সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে দিতেন, তারপর বাইরে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধ্যানে বসাতেন; তেমনি আবার কত দিন কেটে গেছে তাঁর নিজের হাতে লাগানো সুন্দর লতা গাছে দোলা খেয়ে, হাসি তামাশার মধ্যে, এবং বাগানে চড়াইভাতি করে। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, যেন কোন পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যই তার নেই,—অথচ এদিকে সকলের অলক্ষিতে কয়েকটি যুগান্তকারী ভাবধারা সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাঁর সাধনজীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি,—পরম শান্তিপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী দারুণ সংগ্রামের রূপকে যা উদ্ঘাটিত করত,—সেই কাহিনীগুলি শিষ্যদের মনে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি রচনা করে দিচ্ছিল। পার্থিব বস্তু ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার তারা লক্ষ্য করেছিল, সর্বোপরি তারা সেই পরম সত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে যেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার পেত তারা। এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে মূল সত্য জাগিয়ে বাকি কাজের ভারটুকু তার মনের উপর ছেড়ে দেওয়াই কি সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নয়—যেভাবে বীজ থেকে চারাগাছ বড় হয়ে ওঠে? একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি,—যে-নিয়ম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটা বড় জোর 'জ্যামিতিক' হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা নিজেরা যে-নিয়মের সৃষ্টি করি,

তা অবশ্যই হয় আঙ্গিক। প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল, গুরুর সঙ্গে বনবাস করে তাঁরই ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করা।

'জগন্মাতা'র উদ্দেশ্য ও আদর্শ (কারণ স্বপ্নেও তিনি সে সকলকে নিজের বলে ভাবতেন না) রামকৃষ্ণ পরমহংস যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন, তাঁরা প্রধানতঃ ছিলেন আশপাশের কলেজগুলির স্নাতক; এঁদের অনেকে আবার ছিলেন পাশ্চাত্ত্যের রঙে গভীরভাবে রঞ্জিত, কারণ যুগের হাওয়া ছিল সেদিকেই। তাঁরা আজকের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের অনেক নিকটবর্তী ছিলেন। ঐ ধর্মের পবিত্রতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সুবিচারের দৃষ্টান্তে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিউ টেস্টামেণ্টের প্রতি তাঁদের ছিল এক গভীর ও আন্তরিক অনুরক্তি। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তাঁদের মধ্যে উপ্ত করেছিল দেশপ্রেমের বীজ, হিন্দুদের স্বভাবে যা প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। অধিকতর ইউরোপীয় রুচি ও জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করে তাঁরা একটা বড়-কিছু সম্পাদন করার আশা করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা এই ধারণা করে বসেছিলেন যে, পৌত্তলিকতা ভারতবর্ষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে, তাই তাঁদের নিজেদের মধ্যে যা কিছু ছিল তাই ভেঙ্গেচুরে দেওয়াই ছিল তাঁদের একমাত্র করণীয় কাজ;—অন্ধ কুসংস্কারজাত প্রতিটি মূর্তি ও প্রতীক নির্মূল করে দেওয়া, জাতিভেদ প্রথা, জেনানা প্রথা, ও এহেন যাবতীয় কিছু থেকে দেশকে মুক্ত করা—যা আজ পর্যন্ত হিন্দুর বিশিষ্ট প্রথা বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সেকালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উজ্জ্বল রত্নই এরকম ভাবতেন এবং রামকৃষ্ণের এই যুবক শিষ্যেরা ছিলেন তাঁদেরই অনুগামী।

অকস্মাৎ তাঁরা প্রাচীন, রক্ষণশীল, হিন্দুধরনের এই তপস্বী সাধুর মুখোমুখি হলেন। ধীর, অনাড়ম্বর ও ভানশূন্য, হাস্যপরিহাসে পরিপূর্ণ, নগ্নপ্রায় হয়ে উদ্যানে যিনি দিনাতিপাত করেন, ইংরেজ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র শোনা-কথা জানেন যে, তারা সমুদ্র পারের অদ্ভুত সব জীব,—এমন একটি বৃদ্ধ ঐসব যুবকদের উপর এহেন যাদুবিস্তার করেছিলেন, যাকে তাঁরা না পারতেন ব্যাখ্যা করতে, না পারতেন ভাঙতে।

তাঁর পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও অমোঘ পবিত্রতার স্পর্শ যুবকের দলও অনুভব না করে পারতেন না, কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে কেউ কেউ রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। বহুদিন পরে তাঁদেরই একজন বলেছিলেন, 'আমি সব সময়ই এমন কিছুর অন্বেষণে থাকতাম যা প্রমাণ করবে যে তিনি ছিলেন পবিত্র! ছয় বৎসর লেগেছিল আমার একথা বুঝতে যে, **তিনি পবিত্র ছিলেন না,—তিনি ছিলেন স্বয়ং পবিত্রতা!'**

এঁরা বাইবেল সম্বন্ধে যা কিছু বলতেন, তা শুনে তিনি আনন্দ পেতেন। সেকালে খ্রীষ্টধর্ম বাতাসের সঙ্গে মিশে ছিল, এবং যুবকের দল তাঁর কাছে আসার অনেক আগেই তিনি যীশুখ্রীষ্টকে ভালবেসে পূজা করেছেন, কিন্তু তাতে কালীর প্রতি ভক্তির কিছুমাত্র হানি হয়নি। 'চিনি দিয়ে যেমন নানারকম পশু-পাখীর মণ্ডা তৈরী হয়,' তিনি বলতেন, 'তেমনি একই প্রেমমধুর জগজ্জননী ভিন্ন

ভিন্ন জাতিশ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানা নামে ও আকারে পূজিত হন। এক একটি ধর্ম সেই চরম সত্যে পৌঁছাবার এক একটি পথ মাত্র।'

বর্তমান ভারতবর্ষে একমাত্র কালীপূজার অনুষ্ঠানরীতির মধ্যেই পশুবলির বিধান আছে। ইহুদীদের প্রায়শ্চিত্তকরণের ধারণা থেকে এ জিনিষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাপস্খালনের কোনো অভিপ্রায়ই এর মধ্যে নেই; এখানে মূলভাব হল, মাংসভোগ মাকে সব প্রথম নিবেদন করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা। নিষ্ঠাচারী হিন্দুরা কখনো বলিদান না-দেওয়া মাংস গ্রহণ করেন না—তিনি কালী-উপাসক হোন বা না হোন। কিন্তু ইংগভাবাপন্ন হিন্দুরা এ ধরনের বহিরংগ অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করে থাকেন, এবং তাঁদের সমস্ত নজর গিয়ে পড়েছে ধর্মের এই দিকটাতেই, পৌত্তলিকতা মানে যেন এই মহা আতংককর ব্যাপারটি!—যদিও তাঁদের রক্ষণশীল ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা অনেক বেশী মাংসাহার তাঁরা করে থাকেন! গুরুর 'জগন্মাতা' সম্বন্ধে এমনই বিরূপ ধারণা নিয়ে শিষ্যরা এসেছিলেন।

শুধু কালীমূর্তিই নয়, ভারতবর্ষের এমন কোনো প্রতীকই ছিল না যাকে তিনি ভালবাসেননি বা পূজার্পণ করেননি; এমন কোনো পূজা ছিল না, তা সে যে-প্রথারই হোক, যার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজ জীবনে অনুভব করেননি। সব পূজাকেই নিয়ে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণ উপলব্ধি পর্যন্ত। এমন কোনো প্রার্থনা, আনন্দানুভূতি ও রূপাদি-দর্শন ছিল না যাকে তিনি শ্রদ্ধা করেননি বা যার তত্ত্ব উপলব্ধি করেননি—জ্ঞানলাভের পথে প্রত্যেকটির যে যথাযোগ্য স্থান আছে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন।

ধর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা করা সম্ভব তিনি দিলেন তারই পূর্ণ সিদ্ধি। 'বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছাবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র', এই মতবাদ সাধারণভাবে ভারতবর্ষে নূতন নয়; কিন্তু তিনি যেভাবে এই মত প্রচার করে গেছেন, তাঁর সেই দৃঢ় ধারণা—নিজের ধর্ম অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র থাকলে পৃথিবীর মঙ্গল; তাঁর সুগভীর প্রত্যয়—'ঈশ্বরকে যে নামে বা যে আকারেই জানতে চাও না কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে;' তাঁর সেই আশ্বাস—ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, যেমন খোসার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বীজ; সর্বোপরি, একান্ত প্রেমের সংগে সর্ব ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা—'অন্যেরা যেখানে নতজানু হয়ে ভক্তি নিবেদন করছে সেখানে তুমিও নত হও, নমস্কার কর, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে'—পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না।

ধর্মীয় অনুভূতির সত্যতা সম্বন্ধে যার সামান্য জ্ঞানও হয়েছে, বুদ্ধিযোগে তার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন নয় যে, সমকালীন বিভিন্ন ভাষা যেমন একই বক্তব্যকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই এক চৈতন্যময় পুরুষকেই নানা ভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বেশী কিছু দিলেন, তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় শিক্ষা দেবার এবং সিদ্ধিতে পৌঁছাবার পথ দেখাবার মহান প্রেরণার পরম মূর্তি ছিলেন। এই মানুষটির ভালবাসায় কোথায়ও কোনো সীমারেখা ছিল না। কারুর যদি আন্তরিকতা থাকত,

তবে তার জাতি, পূর্ব ইতিহাস বা মানসিক স্তর তাকে সরিয়ে রাখতে পারত না তাঁর কাছ থেকে। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্থান ছিল, এবং তাঁরা তা রক্ষা করতেন। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের আত্মার মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। যে-বিশ্ব থেকে একটি প্রাণীও বাদ যাবে, যতই অকিঞ্চন সে হোক না কেন, সেই বিশ্ব তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ বলে প্রতিভাত হত।

এই ভালবাসা শেষ পর্যন্ত সকলের হৃদয় জয় করে নেয়। একমাত্র এহেন ভালবাসাই 'মাতৃরূপিণী ঈশ্বর' নামের যোগ্য।

এই মহান ভালবাসার আবেগে তিনি ছিলেন আত্মহারা। অন্য কিছু ভাববার মত তাঁর অবস্থা ছিল না। আত্মসংযমের সাধনায় অতিবাহিত সেই সুদীর্ঘ দিন-গুলিতে তিনি কতবার অতি দীনের কাছে নতজানু হয়ে পূজার্পণ করেছেন, তাদের জন্য নিজের হাতে কত ছোট কাজ করেছেন, জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন গলার ক্যান্সারে তিনি প্রয়াণের পথে চলেছেন, কথা বলাই যখন যাতনাদায়ক, তখনও সমাগত উপদেশপ্রার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিল না।

এই সত্য-রহস্যটি তাঁর শিষ্যবৃন্দ ক্রমে ক্রমে বুঝতে শিখলেন। কিন্তু বাইরে তার সমারোহের কোনো চিহ্ন ছিল না।

বৃদ্ধ মানুষটি ছেলেদের সঙ্গে বসে শান্তভাবে খোসগল্প করতে থাকেন। এই ক্ষণে হয়তো চোখের ইসারায় তিনি একজনকে জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন—'ফোঁস করবে, কিন্তু কামড়াবে না!' অন্য কোনো গভীরতর মুহূর্তে আবার বলছেন—'বর্ণমালায় ছত্রিশটি অক্ষর আছে, তার মধ্যে তিনটি অক্ষরই (শ ষ স) বলছে 'সহ্য কর'।'

স্থানীয় লোকগাথা থেকে আরম্ভ করে অশিক্ষিতদের অদ্ভুত কুসংস্কার পর্যন্ত, সব কিছুর মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষা পরশপাথরের কাহিনীতে গিয়ে পৌঁছেচে; মানুষ আগে ঈশ্বরপদের পরশ-পাথরকে স্পর্শ করুক, তারপর দেখবে, তার সব কিছু সোনা হয়ে গেছে। ছোটখাট যেসব ঘটনা ঘটত, সবই হয়ে উঠত তাঁর মন্তব্যের সূত্র, যার তাৎপর্য প্রায়ই হত সুগভীর। এমনকি একটি অর্ধসিদ্ধ সব্‌জি পর্যন্ত তাঁর কাছে অলঙ্কারের বিষয় হয়ে উঠত—আধাসিদ্ধ সব্‌জি যেন সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মত, পূর্ণতায়, উপনীত হতে না পেরে যে এখনও সম্পূর্ণ বিনীত ও নম্র হয়ে ওঠেনি। নিকটবর্তী মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি যখন ক্রমে অনুরণিত হতে হতে নির্বিশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, তখন তাঁর মনে জাগত, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুইই এবং দুয়েরই ঊর্ধ্বে।

এর উপর হাসি ও রঙ্গও ছিল। সেই ব্যক্তির প্রতি পরিহাসে তিনি হয়তো মুখর হয়ে উঠতেন, যে জাগতিক বিষয়ের উপর এত উদাসীন যে স্ত্রীকে দান-ধ্যান কমাতে মোটেই বাধা দেয়নি! পৃথিবীর কোনো ঋষিভাবই এহেন হাস্য পরিহাস থেকে তাঁকে বিরত করতে পারত না।

তারপর তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবার কিসের টানে চলে যেতেন গভীরতর এক রাজ্যে। তাঁর মুখমণ্ডলে নেমে আসত এক অপূর্ব জ্যোতি, তাঁরা ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে বসে দেখতেন, তিনি চলে গিয়েছেন এক স্বর্গীয় আনন্দময় লোকে—জগন্মাতার আন্তর রূপদর্শনের অনুভূতিতে।

এভাবে দিনে দিনে এক অপূর্ব ভালবাসা এবং ত্যাগের জ্বলন্তভাব শিষ্যদের মানব-জমিনে বয়ন হয়ে চলেছিল। সে সম্বন্ধে একজন সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন, 'যে কথা তিনি বলেছিলেন, তাই আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার তাঁর সঙ্গে আমরা যে জীবন যাপন করেছিলাম! সে জিনিষ কখনোই বর্ণনা করা যাবে না।'

অবশেষে এল শুক্লপক্ষের এক গ্রীষ্মকালীন রাত্রি, তাঁর চারপাশে শিষ্যেরা সমবেত, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এবার সময় হয়েছে সেই পরম লোকে প্রস্থানের, যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন ঘটবে না কোনোদিন।

এমনকি সেই মুহূর্তেও একজনের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তারই উত্তর দেবার জন্যে তিনি উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। এবং তারপর—একজনের গান তাঁর বড় ভাল লাগত, সে ঈশ্বরের নামগান করতে লাগল—তিনি এ'দের ছেড়ে চলে গেলেন।

পরে রাত্রির অন্ধকারে এলেন একজন স্ত্রীলোক, তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁকে "মা" বলে ডেকে মৃদুস্বরে রোদন করতে লাগলেন। সেই শিষ্যা—তাঁরই স্ত্রী।

পরবর্তীকালে সেই সব ছেলের দল যখন বড় হয়ে উঠে মহান গুরুর বার্তা দূরদূরান্তে বহন করে নিয়ে যেতে শুরু করলেন, তখন তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল, তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের সাধনার সংগ্রাম ও প্রাপ্তির কাহিনীর মত মূল্যবান আর কিছু নেই। তাঁর আত্মীয় ও গ্রাম্য প্রতিবেশীরা যখনই দক্ষিণেশ্বর দর্শনে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে তাঁর বাল্যজীবনের বাইরের ঘটনাবলী তাঁরা জেনে নিয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে একজন মানুষ শিশুকাল থেকেই কুসংস্কারের বোঝা না বয়েও জীবনের অর্থ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারে। কুসংস্কার অবশ্যই আছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারেই তা ঝরে যায়; রামকৃষ্ণের কথায় বলতে গেলে,—ফল যখন পাকে শুকনো পাপড়ি তখন আপনি ঝরে পড়ে।

জীবনের গভীর অর্থ সম্বন্ধে মনে হয় তিনি প্রথম থেকেই সজাগ ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নিজ জাতির দীর্ঘকাল-সঞ্চিত এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন যে, ধর্ম প্রচলিত বিশ্বাসের বস্তু নয়—ধর্ম অভিজ্ঞতার বস্তু। বিরাট সম্পদ-দেবতার পূজাতে তিনি ছিলেন একান্ত বীতশ্রদ্ধ; ছেলেবেলাতেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মাধুর্য উপভোগ করার অভিলাষ পোষণ করতেন। বর্ণাশ্রম রীতিকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে তিনি রক্ষা করতেন।

বিশ বৎসর বয়সে এই সবকিছু ডুবে গেল এক চরম আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। ঘটনাক্রমে তাঁকে কালীমন্দিরের 'ছোট পুরুতের' কাজ গ্রহণ করতে হল। একজন ঐকান্তিক আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের পক্ষে ভগবৎ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার এই সুযোগ কতখানি কাজ করেছিল তা আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। আমাদের এও স্মরণ রাখতে হবে যে, রামপ্রসাদ প্রমুখ শক্তিসাধকদের উক্তি ও রচনা এদেশের দৈনন্দিনের ভাষা। সুতরাং এবার যেন তাঁর নির্বাচিত পথ তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হল। এখন বাকি রইল শুধু পথ-পরিক্রমণ। তাঁর কাজ ছিল সন্ধ্যারতির সুন্দর অনুষ্ঠানে পুষ্পে-প্রদীপে প্রতিমাকে আরতি করা। প্রতিমা নয়—স্বয়ং জননীর জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠল তাঁর অন্তর। 'তিনি কি সত্য? তিনি কি

সত্য?'—নিরন্তর ধ্বনিত এই প্রশ্ন। ফলে আরতির সাধারণ কাজটিও তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতেন না। কখনও-বা সারাদিন ধরেই প্রদীপ নিয়ে আরতি করতেন, কখনও বা বেদনার্ত আকুতির পীড়নে একেবারেই ভুলে যেতেন সে সব ব্যাপার।

চারিদিকে রব উঠে গেল তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন, এবং সর্বত্র যেমন ঘটে থাকে, মানুষ জাগতিক বিষয়ের প্রয়োগ করে পরাজাগতিক বিষয় দূর করতে সচেষ্ট হয়—তাঁর আত্মীয়েরাও স্থির করেছিলেন যে, একমাত্র বিবাহের দ্বারা মনের মোড় ফিরিয়ে তাঁকে সুস্থ করা যাবে। এইভাবেই একটি ছোট্ট বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, বহুদিন পরে যিনি তাঁর কাছে এসে তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্যে পরিণত হন।

কিন্তু সেই দারুণ ও সর্বগ্রাসী, একান্ত বাস্তব সংগ্রামের কিছুমাত্র লাঘব হল না বিবাহানুষ্ঠানের দ্বারা। এবং পরিণামে, নির্দিষ্ট কাজ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিতে হল। মন্দির থেকেও তাঁর বিদায় স্বাভাবিক, কিন্তু মন্দিরের মালিকেরা তাঁর প্রতিভাকে চিনে তাঁকে সযত্নে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

তাঁর এই সময়কার স্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিরাট বটগাছ এবং একটি কুঠিয়াকে কেন্দ্র করে। কুঠিয়াটি এখন নেই। উদ্যানের ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অংশে নদীতীরে অবস্থিত এই বটবৃক্ষমূল উদ্যান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পাঁচটি কান্ড একসঙ্গে নেমে গুঁড়িটিকে জড়িয়েছে—সেই গুঁড়িটিকে ঘিরে বসবার জন্য একটি বাঁধানো চাতাল। উত্তর পশ্চিম কোণে চাতালটির বরাবর ছিল বোধিবৃক্ষের মস্ত এক ডাল, প্রচলিত মতে এই ডালটি পরম উপলব্ধির আসল জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছিল। সে যাই হোক স্থানটি ছিল বহু বছরের নিরন্তর উপাসনা ও কৃচ্ছ্রতার সাক্ষীস্বরূপ। এই তপঃ-কঠোরতা হিসেব করে আসেনি, তা গভীরতর আকুতির অবশ্যম্ভাবী বাহ্যিক ফল। রামকৃষ্ণ ইচ্ছে করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেননি, কোনোটাই করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। জোর করে তিনি শরীরের প্রতি অবহেলা করেননি, তাঁর শরীরবোধই চলে গিয়েছিল।

নিজের স্বভাবে চালিত হয়ে, যেজন্য তাঁর শরীরধারণ, তারই অদম্য তাগিদে, বিনা বিশ্রামে, বিনা বিরতিতে তিনি নিরত ছিলেন সুদীর্ঘ ১২ বৎসর ধরে আত্মার সংগ্রামে। অবশেষে সিদ্ধি এল একদিন। মা উন্মোচিত করলেন নিজেকে। সেই ক্ষণ থেকে তিনি হয়ে গেলেন একেবারে শিশু—সর্বদা মা'র হাত ধরে আছেন।

একটি মহারহস্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। কোনো সংস্কার ভাঙতে হলে, নিজেকে সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে তার সঙ্গে লড়াই করতেন। এইভাবেই মেথরের যে-কাজকে তাঁর ব্রাহ্মণবৃত্তি ঘৃণা করেছে—সেই কাজই তিনি করে গেছেন বহুরাত্রি ধরে।

শাশ্বত মিলনের আনন্দলোক থেকে ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন, দেখলেন বিশ্বের অনুপরমাণু পরমেরই অঙ্গ;—তখনই তাঁর প্রখর অনুভূতিতে মানব-জীবনের বহু জিনিষ ধরা পড়ল, যার পথ-পরিক্রমণ তিনি করেননি। সুতরাং সেগুলি সহজ জিজ্ঞাসায় গ্রহণ করলেন। শুরু করলেন কৃষ্ণের উপাসনা থেকে (ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে প্রোটেস্টান্টদের যেরকম সম্বন্ধ, তাঁর নিজস্ব কালী-উপাসনার সঙ্গেও

কৃষ্ণ-উপাসনার তেমনি সম্পর্ক), এবং সকল রকমে সেই ভাবের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে নিলেন। আহারে, বেশভূষায় এবং কথাবার্তায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপী হয়ে গেলেন, যার পরিণতিতে কৃষ্ণভক্তি ও কালীভক্তিকে একই জিনিষ বলে অনুভব করলেন। এভাবে মুসলমান ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের সাধনার পথও তিনি অতিক্রম করলেন। এসব তিনি করেননি, করেছিল সেই মহাপ্রেম, যাকে বলতেন—"মা"। অর্থাৎ যাকে বলে নিরহংকার, তিনি তাই ছিলেন? না, তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে রামকৃষ্ণ নামে কেউ কোনোকালে ছিল।

তারপর এল সবচেয়ে বিস্ময়কর অধ্যায়। তিনি ঈশ্বরকে জানবেন—নারী হয়ে!! নারীর সম্বন্ধে বরাবরই তিনি যে সুকোমল মনোভাব পোষণ করতেন, এটা ছিল তারই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ক্ষণ; এরই ফলে তাঁর জীবন ভারতীয় নারীর প্রকৃত মুক্তির কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বত্র তাঁর রীতি যেমন, এখানেও তাই, নিজের অতীতকে ভুলে যাওয়া, এবং ভুলে যাওয়ার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা। সুতরাং তিনি নারীজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে গ্রহণ করলেন, গ্রামে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, যাতে শুধু স্ত্রীর পরিচিত মহলের মধ্যেই সখী খুঁজে নিয়ে তাদের হৃদয়ের সুখদুঃখের অংশভাগী হতে পারেন। এর দ্বারা শেষে তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে, নারীত্বের সরল পথেও বিজয়রহস্য লাভ করা যেতে পারে।

এখানেই নিশ্চয় নিহিত আছে তাঁর জীবনের সার। মায়ের ভালবাসা যেমন সকল সন্তানের প্রতি ব্যাপ্ত, অন্যেরা তাদের প্রতি যত নির্দয় হোন বা অবিচার করুন না কেন, তেমনি বিশ্বমাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটি সমগ্র জীবলোককে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের পরিপূর্ণ ঐকতানের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এটি কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সান্ত্বনার কারণ হয় না—যখন শোনা যায় : 'যে যেখানে আছ, সেখানে থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই, তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরে হৃদয় করো নিবিষ্ট, আর উন্মুক্ত রাখ দৃষ্টি সত্যের দিকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার নির্দিষ্ট মুদ্রাঙ্কন হল—পরবর্তী কালে তাঁর কাছে যিনিই এসেছেন, ফিরে যাবার সময় অনুভব করেছেন এক গভীর সাহস, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের শক্তির উৎসকে জাগিয়ে দিতেন, যার ফলে স্পর্শপ্রাপ্ত মানুষটি সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করে পাখা মেলে দিত ঊর্ধ্বাকাশে।

কোনো সামাজিক প্রথা বা সাধারণ রীতির ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যের মূলোৎপাটন করেননি। মানুষ যাতে অন্তরে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে তিনি সবকিছু করেছেন। সংস্কারপন্থী নেতাদের তিনি বিনা দ্বিধায় সঙ্গদান করতেন এবং তেমনি আগ্রহে রঙ্গমঞ্চের ধিক্কৃত শিল্পীদেরও; অথচ তা সত্ত্বেও রক্ষণশীলেরা পর্যন্ত তাঁকে পূজা করতেন।

তথাপি যা কিছু তিনি করেছেন সবই যেন অসজ্ঞানে। দিব্য প্রেরণায় কাজ করতেন, শিশুর মতই, এবং শিশুর মতই তিনি অপূর্ব ও অভ্রান্ত। নিজ অস্তিত্বেই তিনি পরিতৃপ্ত, পূর্ণ,—সে অস্তিত্বের ব্যাখ্যার দায়িত্ব অন্যের। বহুদিন পূর্বে

প্রথম যৌবনে গুরু হবার ইচ্ছা তাঁর কিছুমাত্র ছিল না, সত্যকে জানবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে চালিত করে নিয়ে গেছে পরমের সন্ধানে। প্রতি মানুষের অবর্ণনীয় ব্যাকুলতার তৃপ্তিসন্ধানে তিনি ঈশ্বরলাভের প্রতিটি পথের সন্ধান করেছেন। একটি পথও পরিক্রমা বাকি থাকলে তাঁর আত্মা এগিয়ে যেত সন্ধানের পথে। কখনও তিনি কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাননি, পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেকে গুরুরূপে কল্পনা করতে পারতেন না, তাঁর জ্ঞানরাশি তিনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে যা পেরেছে কুড়িয়ে নিয়েছে।

তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে,—মহত্ত্ব, সুসংগতি এবং সৌন্দর্য—সবই হল ফল-পরিণাম। এগুলি নিয়ে নয়,—সারল্য, আন্তরিকতা ও প্রাণঢালা ভক্তির মৌলিক উপাদানগুলি, যা আমাদের অত্যন্ত কাছেই পড়ে আছে,—তাই নিয়ে আমাদের সত্যিকারের কাজ।

প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথাবস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষীস্বরূপ। একথা অবশ্য সত্য, আর কোনো দেশেই তাঁর জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে, তিনি প্রধানত বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিন্তা এসে মিলিত হয়েছিল এবং সেই কালীগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ মানবতার প্রতিনিধি।

'দি মাস্টার' (আচার্যদেব) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

[*The Master* গ্রন্থ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গগুলি সংকলন ও অনুবাদ করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। নিবেদিতা এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, নিজ আচার্যেরই চরিতকথা বিবৃত করেছেন। তাই এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ তাঁর গুরুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ কৃত। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিষয়ে যেসব তথ্য দিয়েছেন, সেগুলি প্রধানত স্বামীজীর কাছ থেকেই পাওয়া, তা সহজেই বোঝা যায়। এইজন্য এই অংশের উপযুক্ত নামকরণ হতে পারত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।'

পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন—নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে 'অখন্ড ব্যক্তিত্ব' বলেই গ্রহণ করেছেন। তথাপি উভয়ের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, সে বিষয়টিকেও আলোচনার বিষয় না করে পারেননি। নিবেদিতা জানতেন—বিবেকানন্দ যে-পর্বতের সমুচ্চ গিরিশিখর, ভূগর্ভভিত্তিক সেই হিমালয়ের নাম রামকৃষ্ণ, তবু যে বিশেষ বহিরঙ্গ প্রকাশে বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবলের 'নিবেদিতা' রূপান্তরের কারণ হয়েছিলেন, সেই প্রকাশের উদ্দেশে নিজের বিশেষ নমস্কার নিবেদন না করে পারেন নি। এমন করা স্বাভাবিক, এমনকি সঙ্গতও বটে, কারণ, নিবেদিতার সাক্ষাৎ গুরু বিবেকানন্দ, এবং নিবেদিতা আর যাই হোন, প্রথমতঃ গুরুবাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভগিনীর মন্তব্যগুলি

পরবর্তীকালে মনীষী মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সশ্রদ্ধ সমালোচনার কারণও হয়েছিল। বিবেকানন্দের মানবপ্রেম যে শ্রীরামকৃষ্ণেরই দান, একথা ব্যাখ্যা করার পরে মোহিতলাল লিখেছেন :

"মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দকে তাঁহার গুরুর 'direct antithesis' বলিয়াছেন তাহা সত্য। তাঁহার পূর্বে ভগিনী নিবেদিতাও এই ধরনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই ভেদের মধ্যে অভেদ-তত্ত্বের—'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'-রূপ যুগ্মসত্তার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি না হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। বিবেকানন্দের সেই বিপরীত প্রকৃতিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া অবতারকল্প মহাপুরুষ 'আত্মানং সৃজাম্যহম্' সংকল্প করিয়াছিলেন। ধ্যানী মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রেমের যে-উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল তাহার উপযুক্ত দেহ-মন তিনি পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দে। আবার যুগধর্মের প্রবল প্রভাব যাহার প্রকৃতিগত জ্ঞানপিপাসা ও আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিলেও, 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'-কে লাভ করিবার জন্যই যে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, সেও সেই মহাপুরুষের মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেবায় নিজের সকল শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে যে-প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার উল্লেখ ভগিনী নিবেদিতা ও মঃ রোলাঁ উভয়েই একটু বিশেষভাবে করিয়াছেন—

(এর পরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি পুষ্পের মত......আধুনিক পৃথিবীর জিজ্ঞাসা ও উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধানের উপরে' অংশটি উদ্ধৃত। পাঠক এই অংশটি কিছু পরেই পাবেন।)

—অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই চিন্তাব্যাধিগ্রস্ত, শঙ্কাসংশয়ক্লিষ্ট আধুনিক সমাজে—নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত আনন্দের উৎসস্বরূপ ছিলেন—একটি ফুলের মত তিনি এই কণ্টকারণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি ছিলেন আত্মানন্দ পুরুষ, বাহিরের অন্ধকার তাঁহার অন্তর্গহনের জ্যোতিঃশিখা ম্লান করিতে পারে নাই। সেই আলোকে বিবেকানন্দও চক্ষু মেলিয়াছিলেন—কিন্তু কেবল চক্ষে আলো নয়, এ যুগের অনলকুণ্ড তাঁহার বক্ষে অহরহঃ জ্বলিয়াছিল—তাঁহার চক্ষের সেই আলোক জগতের সকল সমস্যা ও সংশয়-সংকটের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁর কথাগুলি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। উভয়েই গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, গুরু-শিষ্যে এখানে প্রভেদ নাই। একজন জীবনের ভিতর দিয়া, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাবনা-বেদনা দিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া কর্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন,—আর একজন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে উপলব্ধি আরও গূঢ়, আরও গভীর; এবং গভীর ও সীমাহীন বলিয়াই তাহা কোনো কর্মবিধিকে আশ্রয় করিতে পারে নাই; সেইজন্যই একটি নদীপ্রবাহে নিজের সেই তটহীন প্রেমকে প্রবাহিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের উদ্ধত জ্ঞানাভিমান ও প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল;

কিন্তু তিনি আপনার কথাটি তাহাকে বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'নরেন যেদিন জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য স্ব-চক্ষে দেখিবে সেইদিন উহার সব অভিমান চূর্ণ হইবে, সারা প্রাণ অসীম করুণায় গলিয়া যাইবে।' ......শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যৎ-বাণী এবং পরে তাহার সার্থকতা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, বিবেকানন্দের জীবনে গুরুর অভিপ্রায়ই পূর্ণ হইয়াছিল! ......বিবেকানন্দরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা-গহনেই নিহিত ছিল। ভাবনা, চিন্তা, আবেগ ও কল্পনা, ভূয়োদর্শন ও মনীষা, এই সকলের সাহায্যে একজনের জীবনে যে-বাণীকে আমরা বীরবীর্য ও কর্মশক্তিতে মূর্ত হইতে দেখি, সেই বাণীর এক অলৌকিক অপৌরুষেয় অভিব্যক্তি আর একজনের মধ্যে পূর্বেই হইয়াছিল। বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, তাহার মূল উৎস যিনি, তিনি পাণ্ডিত্য, প্রতিভা বা মনীষার কোনো পরিচয় দেন নাই; অথবা আমরা যাহাকে কর্মানুষ্ঠান বলি, তাহাও করেন নাই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি ভেদ-রেখা টানিবেই। উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' একটি অখণ্ড অভিন্ন তত্ত্ব হইয়া আছে। মানুষের দৃষ্টি—সে যত বড় মানুষই হউক—পূর্ণ নহে; জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়ের কোনোটাই শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়দৌর্বল্য হইতে মুক্ত নহে। তাই ভগিনী নিবেদিতার মত মহীয়সী মহিলাও তাঁহার নিজের গুরুর জন্য একটু পৃথক গৌরব দাবি করিয়াছেন—

> I see in him the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world, and at the same time the pioneer and prophet of a new and future order of development.

—কে বলিবে এ গৌরব তাঁহার গুরু বিবেকানন্দের প্রাপ্য নয়, কিন্তু বিবেকানন্দ কি শ্রীরামকৃষ্ণের হইতে স্বতন্ত্র? তবে তাঁহাকে আড়ালে রাখিলেন কেন? বুঝি তাঁহারও দোষ নাই; গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধ সত্যই রহস্যময়, আরও রহস্য এই যে, সে সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও বারবার ভুল হয়,—বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এত প্রবল যে, মানুষ আমরা এইরূপ প্রকট ব্যক্তিত্বের মহিমায় অভিভূত না হইয়া পারি না।"

একই বিষয়ে মোহিতলাল অন্যত্র লিখেছেন—

"বিবেকানন্দের সেই শৈব-শক্তির মূলে যে এক গভীরতর বৈষ্ণবীশক্তির প্রেরণা ছিল, একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'স্থিতি'-রূপের মধ্যেই যে কী প্রচণ্ড 'গতি'-বেগ ছিল, এবং তাহাতে ঐ দুইয়ের যে কী সমন্বয় হইয়াছিল, সে তত্ত্ব আজিও আমাদের জ্ঞানগোচর হয়

নাই। ভগিনী নিবেদিতাও......তাঁহার গুরুর অন্তরালে এই মহাগুরুকে সর্বদা দেখিতে পান নাই।......

......একজন (বিবেকানন্দ) চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, এবং দেখিলেও হয়ত তাহাকে আর এক রূপে দেখিত—কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জাগতিক ব্যাপারের মূল্যই অন্যরূপ; অপর পুরুষ (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেন জ্ঞানের উপরে প্রেমের দৃষ্টিকে জয়ী করিয়া সাক্ষাৎ-দর্শন ব্যতিরেকেই তাহাকে (মানব-জীবনের অসীম দুঃখকে) অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং আর একজনের জ্ঞানচক্ষুতে সেই প্রেমের অঞ্জন কবে কেমন করিয়া লাগিবে তাহা জানিতেন বলিয়াই জ্ঞান ও পৌরুষের বজ্র-বিদ্যুৎরূপী সেই মহাশক্তিমান শিষ্যকে এমন একটি সজল শ্যামল মেঘখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন যাহা অচিরে গগনব্যাপী হইয়া উঠিবে; এবং শেষে সেই অন্তর্গূঢ় বিদ্যুতের অসীম বেদনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সেই মেঘ গলিয়া যাইবে—তাহারই অপর্যাপ্ত ধারাবর্ষণে তপ্তধরণী শীতল হইবে। ওই Eastern Wisdom -এর পূর্ণ! ঘনীভূত! বিগ্রহ যিনি—বিবেকানন্দ যাঁহার স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝর-রূপ, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রতীচ্য-সংস্কারবশে তাঁহার সেই স্থিরতাকে গতির তুলনায় সমান প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।"

ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির অংশবিশেষ সম্বন্ধে মোহিতলালের এই সমালোচনা উপস্থিত করার কারণ এই নয় যে, আমরা তাঁর মতকে গ্রহণ করি। আবার করি না, একথাও বলছি না। আমাদের মতামতের প্রশ্ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্পর্ক প্রথম শ্রেণীর ভাব ও ভাবনাকে উদ্রিক্ত করেছে দীর্ঘদিন ধরে, এবং মতপার্থক্যের মধ্য দিয়ে, লেখকেরা একটি রহস্যময় বিরাট বিষয়কে নানাভাবে স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছেন—আমরা এখানে তারই কিছু নমুনা পাঠককে উপহার দিলাম। অতঃপর 'আচার্যদেব' গ্রন্থ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ সংকলিত হচ্ছে—]

বৌদ্ধ প্রচারক-সন্ন্যাসীদের মতই স্বামীজীর ক্ষেত্রেও এক মহাজীবনের প্রচণ্ড শক্তি তাঁকে আকর্ষণ করে বিদেশভূমিতে নিক্ষেপ করেছিল। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের পাদমূলে উপবিষ্ট থেকে তাঁর লীলায় স্বামীজী অংশ নিয়েছিলেন বছরের পর বছর।

প্যারিসে একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন,......'প্রাচীন হিন্দুধর্ম যেখানে এককেই সৎ এবং বহুকে অসৎ বলেছে, সেখানে কি বুদ্ধ বহুকে সৎ এবং (তাতে অধিষ্ঠিত) অহং-কে অসৎ বলেন নি?' স্বামীজী উত্তরে বলেছিলেন, 'হাঁ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছি—বিভিন্ন সময়ে, মনের বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত এক ও বহু, সবই চিরন্তন সত্য।'

স্বামীজী তাঁর বৃদ্ধ গুরুদেবের প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন। তাঁর কথা সেই প্রথম (লণ্ডনে, ১৮৯৬) শুনলাম, এবং বালিকাটির কথা, যিনি এঁর সঙ্গে বিবাহিত হবার পরে যখন এঁর মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, তখন বেদনাশ্রুর মধ্যেও স্বামীকে সাধনার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সে কথা বলতে বলতে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে একসময়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল যেন। ভাবের গোপন সঞ্চরণে অভিভূত চেতনাকে যেন নাড়া দিয়ে নিজেকে জাগ্রত করার চেষ্টায় সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলেছিলেন—'হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, এসব ব্যাপার একদা ঘটেছে, আবার ঘটবে। যাও বৎসে—শান্তি! শান্তি! তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পূর্ণ করেছে।'

'বেদান্তের তত্ত্বকথা তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিছুই জানতেন না—কিছু না! তিনি যাপন করেছিলেন তাঁর মহান জীবন। তাকেই দান করে গেছেন। অন্যেরা ব্যাখ্যা করুক তাকে,'—স্বামীজী তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রসঙ্গে একবার একথা বলেছিলেন। বিরাট জীবন যাঁরা যাপন করেন, তাঁদের কাছে স্বীয় জীবনের কোনো কোনো তাৎপর্য অজ্ঞাত থেকে যায়—এই সত্য স্বামীজীর কথায় ফুটে উঠেছিল, এবং এই কথাগুলি স্বয়ং স্বামীজীর জীবন আলোচনাকালে বারবার আমার মনে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকার প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় স্বামীজী সদাই সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিন্ন নিজস্ব কোনো ভাব বা বাণীর উচ্চারণ তাঁর কাছে অপরাধ বলে মনে হত। তাছাড়া তিনি মনে করতেন ভাবপ্রবণতায় শক্তির বৃথা ক্ষয় হয়, শক্তি সংহত হলেই তবে তা কর্মে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তিনি (স্বামীজী) নিজেই আবার সর্বস্ব দানের আবেগে অধীর হয়ে উঠতেন এবং সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবার আগেই তিনি নিজ দেশ ও জাতির জন্য আশা ও প্রেমের ভাবরাজি বিকীর্ণ করে দিতেন, যা প্রস্তুত ক্ষেত্রের উপর বীজরূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে বৃক্ষরূপে নির্গত হত—যা হয়েছে ভারতের দিকে দিকে—দূরতম প্রান্তে পর্যন্ত—যাতে জন্ম নিয়েছে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি সন্তানের হৃদয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কোনো শাস্ত্র না পড়েই বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ—বিবেকানন্দও সেইভাবে মূর্তিমান জাতীয় জীবন। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি অসচেতন ছিলেন। গুরুর বিষয়ে যে-কথা তিনি বলেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও তাই বলা চলে : 'তিনি শুধু মহাজীবন যাপন করেই তৃপ্ত ছিলেন—অন্যেরা খুঁজে নিক তার ব্যাখ্যা।'

হিন্দুধর্ম যে এইসকল আধুনিক পদ্ধতির (নগর ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত) প্রেরণা ও সারসংগ্রহের ক্ষমতা ধরে, তা প্রমাণিত হয়েছে রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ে, যাঁরা জাতীয়তা-চিন্তায় নিজস্ব বিশিষ্ট দান রেখে গেছেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় স্বামীজীর জীবনগঠনে তিনটি প্রভাব সক্রিয় : ইংরাজী ও সংস্কৃত জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ, গুরুর বিরাট চরিত্র, যা সকল ধর্মশাস্ত্রের ধ্রুবলক্ষ্যকে

প্রমাণিত ও দৃষ্টান্তযুক্ত করেছিল; তৃতীয়তঃ—আমার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী—ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যার দ্বারা এ-দেশ ও জাতিকে তিনি সুবিশাল ধর্মশরীর বলে বুঝেছিলেন, সকল বিরাটত্ব সত্ত্বেও তাঁর গুরুদেব যার বাণী ও ব্যক্তিবিগ্রহ। এই তিন প্রভাবের লক্ষণ স্পষ্টভাবে স্বামীজীর উক্তিসমূহে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি বেদান্তবক্তা, বৃহত্তর পৃথিবীতে ভারতীয় দর্শনের প্রচারক, তখন তিনি মুখ্যতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল, যদিও তিনি যে-স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে তা উপস্থিত করেছিলেন, অপূর্ব এক জীবনের মধ্যে তাকে সংহত আকারে দর্শন না করলে কখনোই তা করতে পারতেন না। যখন তিনি বলেন, 'প্রেমেই ভক্তির উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিসমাপ্তি,' কিংবা যখন কর্মরহস্যের বিশ্লেষণ করেন,—তখন তাঁর গুরুদেবকেই আবির্ভূত দেখি সামনে। তখন অনুভব করি, শিষ্য গুরুর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যের সত্যকেই প্রকাশ করতে ব্যাকুল, যাকে আবার ঐ গুরু পেয়েছিলেন অন্য এক চরণতলে (জগজ্জননীর) উপবিষ্ট থেকে। কিন্তু যখন আমরা চিকাগো সম্মেলনে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণ পাঠ করি, কিংবা সমান চকমপ্রদ 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর' পড়ি, কিংবা ১৮৯৭-তে লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ পড়ি, যাতে তিনি হিন্দুধর্মের মূলগত সাধারণ সত্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন,—এসব ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু পাই যা তাঁর নিজ পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত। এইসকল ভাষণের প্রাণশক্তি তাঁর ভারতীয় পরিব্রাজক জীবনে সংগৃহীত হয়েছিল। এই পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী কখনো সম্পূর্ণ সমাপ্ত হবে না। ভাসা-ভাসা আবেগ কিংবা ইচ্ছাকৃত অন্ধতা থেকে নয়, পরিব্রাজক জীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই নিজ জাতি ও দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসার উদয় হয়েছিল। বলিষ্ঠ ও বর্ধনশীল যুক্তি ও বুদ্ধিতে পরমাগ্রহে নূতন সত্যের সন্ধান করেছেন, বিচার করেছেন, এবং সর্বদাই বিরূপ সমালোচনার মুখে অদম্য ও নির্ভয় থেকেছেন।—'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ কি, তাই হবে আমার সমগ্র জীবনের অনুশীলনের বস্তু'—তিনি একদা বলেছিলেন। তদুপরি এই সর্বাঙ্গীণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তিনি যখন নিজ দেশ ও জাতির বিষয়ে ধারণা গঠন করতে গেলেন তখন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন ও সহজ উপাদানগুলি তাঁর চোখে বৃহৎ মহিমালাভ করতে পেরেছিল। নিজ দেশে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল বলে গণ্য হবার যোগ্য আধুনিক শিক্ষা তাঁর ছিল, তবু তিনি কোনো কোনো প্রগতিপন্থীর মত, সন্ন্যাসী বা কৃষক, মূর্তিপূজক বা জাতিভেদ-পীড়িত—কাউকেই বাদ দেননি ভারত নামক বিশাল সামগ্রিক সত্য থেকে। এই প্রতিজ্ঞাদৃঢ় স্বীকরণক্ষমতার উৎস তাঁর পরিব্রাজক জীবন—যে-জীবনে বৎসরের পর বৎসর তিনি সমগ্রের মধ্যে সমাহিত ছিলেন।

আমি শুনেছি যে, অতি শৈশব থেকেই বিবেকানন্দ নিজ গোপন সংস্কারে অনুভব করতেন যে, দেশের কল্যাণ করতে তাঁর জন্ম। আমেরিকা-জীবনের সূচনায় যখন অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে আছেন, জানতেন না যে, পরবর্তী আহার কোথায় জুটবে—তখনও ভারতের শিষ্যগণের কাছে পাঠানো চিঠিতে তাঁর ঐ অন্তর্নিহিত বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি দেখা যায়। স্বামীজী পরবর্তীকালে গর্বের

সঙ্গে একথা স্মরণ করতেন। এই পৃথিবীতে যাঁরা কোনো বিশেষ কার্যসাধনের জন্য আসেন, তাঁদের মধ্যে এমন অদম্য আশার অমোঘ প্রকাশ ঘটেই। গভীর অকথিত মহত্ত্বের এই চেতনা উদ্ঘাটিত হয় সমগ্র জীবনে। হিন্দুর ধারণায়, এই ধরনের মহত্ত্ব-চেতনার সঙ্গে আত্মাভিমানের আকাশপাতাল প্রভেদ।* স্বামীজী তা প্রকাশ করেছিলেন যখন প্রথম সাক্ষাতের পরে (আসলে দ্বিতীয়) তাঁর বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলিকে বৃদ্ধের অত্যুক্তি ও পাগলামি মনে করে তাঁর প্রতি আকর্ষণ তো দূরের কথা, অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ করেছিলেন।

আঠারো বছরের ছোকরা, একটা দলের সঙ্গে জুটে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। দলের একজন তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীতজ্ঞানের কথা ভেবে তাঁকে গান গাইতে বলেন। তিনি রামমোহনের একটি গান গাইতে শুরু করেন, যার শেষ ছত্রের অর্থ : চির অবলম্বনরূপে পবিত্রতাকে গোপনে হৃদয়ে রেখো।†

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেন সহসা আবির্ভাবের সংকেতবাদ্য হল।—'বাবা, তুই এতদিনে এলি! তোর জন্য যে এই তিন বছর অপেক্ষা করে আছি!'— তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিলেন। সেইদিন থেকে বয়স্ক মানুষটির কাজ হল—বালকদের নিয়ে একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করা, যার মধ্যে 'নরেনে'র প্রতি আনুগত্য অটুট থাকবে চিরদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের ভাবী বিরাট খ্যাতির ঘোষণায় ক্লান্ত হননি, ক্ষান্ত হননি কখনো তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনে। যদি অন্য লোকের দুটো, তিনটে, দশটা, বারটা গুণ থাকে সেখানে নরেন্দ্রের সহস্র গুণ। 'নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম।' উচ্চাধিকারীদের মধ্যেও যেখানে হয়ত দুই কি তিনটি শিবের শক্তি রয়েছে, সেখানে নরেন্দ্রের শক্তি অন্ততঃ আঠারোটি।

কপটতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এতই স্পর্শকাতর ছিল যে, তিনি যেন তার সংস্পর্শে শারীরিক যন্ত্রণা পেতেন; একবার এক ব্যক্তিকে তিনি কিছুতে সাধুস্বভাব বলে স্বীকার করলেন না, যদিও অন্যদের কাছে তার সাধুত্ব অবিসংবাদিত। তিনি বললেন, 'বাইরের ভড়ং সত্ত্বেও লোকটি আসলে চুনকামকরা কবর, রাতদিন নিজেকে ধোয়া-মোছা করছে তবু ও কাছে এলে নোংরা লাগে, আর নরেন যদি বিলিতী হোটেল থেকে গোরু খেয়েও আসে তবু সে পবিত্রই থাকবে, এমন পবিত্র যে, তার স্পর্শে অপরে পবিত্র হয়ে যাবে।' এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর

* বিবেকানন্দের তথাকথিত 'অহমিকা' যা অনেক সময়ে সমালোচনার কারণ হয়েছে, সে-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হিন্দু যোগী শ্রীঅরবিন্দের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"মাদ্রাজী পণ্ডিতের প্রতি বিবেকানন্দের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই ধরো। তাঁর কী একটা কথায় সংশয় প্রকাশ করে পণ্ডিত বলেছিলেন, 'কিন্তু শঙ্কর তো তা বলেন না!' তাতে বিবেকানন্দের জবাব,—'না, আমি বিবেকানন্দ, তা বলছি।'

'আমি বিবেকানন্দ'—তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে হিমালয়প্রমাণ অহমিকার মত শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কিছু ভূয়ো বা ঝুটো ছিল না। আর ও তাঁর অহমিকা নয়, এ একটি অতি-মহতের বোধ; যে-জন্য তাঁর জীবন, যাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর সংগ্রাম—তাঁকে কেউ খর্ব বা তুচ্ছ করবে, তা তাঁর সহ্য হত না।"

† নিবেদিতা কোন্ দর্শনকালে কোন্ সঙ্গীতের কথা বলেছেন বলা শক্ত। তবে যত-দূর মনে হয়, নিবেদিতা যে দর্শনের উল্লেখ করেছেন, সেইকালে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী রচিত 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি স্বামীজী গেয়েছিলেন। অন্তত স্বামী মাধবানন্দের তাই মত।

এই শিষ্য ও অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্ককে মৌল উপাদানের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন,—কেননা শিষ্যটি নেতৃত্ব দেবে এবং অন্যান্য শিষ্যরা তাঁকে আনুগত্য দেবে, সমর্থন করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের রীতি ছিল, যখন নূতন কোনো শিষ্য আসত, তাকে তিনি মানসিক ও শারীরিক সর্বদিক থেকে সর্বপ্রকারে যাচাই করে নিতেন। দক্ষ বৈজ্ঞানিক-পর্যবেক্ষকের চোখে কোনো যন্ত্রের মডেলের প্রতিটি অঙ্গ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুশিক্ষিত চোখে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব পরীক্ষার মধ্যে নবাগতকে ঘুম পাড়িয়ে তার অবচেতন মনের মধ্যে প্রবেশের পদ্ধতিও ছিল। আমি শুনেছি যে, বিশেষাধিকারীরা এই অবস্থায় নিজ কাহিনী নিজেই বলে যাওয়ার সুযোগ পেত, অল্পাধিকারীদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে তা জেনে নেওয়া হত। এমনই এক পরীক্ষার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ 'নরেন' সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন : নরেন যখন জানতে পারবে সে কে, কোথা থেকে এসেছে, তখন আর দেহবন্ধন এক মুহূর্তও সহ্য করবে না,—সংকীর্ণ জীবনের শিকল ছিঁড়ে উধাও হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি শিষ্যদের সর্বদা স্মরণে ছিল; তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বর্তমান চৈতন্যের পশ্চাদ্বর্তী অতীত জীবনের বোধ এই বালকটির মনে সদা জাগরূক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই বিশেষ শিষ্যটির হাত থেকে কোনো সেবা নিতে চাইতেন না। তামাক সাজা, বাতাস করা জাতীয় যে-সব ছোটখাট কাজ নিয়তই গুরুর জন্য শিষ্যরা করে থাকে, সে-সব কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য শিষ্যদের দ্বারা করিয়ে নিতেন।

প্রাচ্যের বহু অদ্ভুত আচারের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় প্রোথিত হল পতিত লোকের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ভোজনের বিরুদ্ধে সংস্কার। আর এই ব্যাপারে স্বামীজীর গুরুদেব নারীর মতই স্পর্শকাতর ছিলেন। কিন্তু যা তিনি নিজে খেতেন না, তা স্বচ্ছন্দে দিতেন প্রিয় শিষ্যটিকে, কারণ তিনি বলতেন, 'নরেন জ্বলন্ত আগুন',—সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করে ফেলবে। আবার বলতেন, ঐ বালকের ঈশ্বরীয় সত্তা পুরুষের, তাঁর নিজের—নারীর। এইভাবে যথার্থ শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রশস্তির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ এই বালকটির মহান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন,—তাঁর অবর্তমানে এঁর কার্যের সমর্থনে ও তার প্রামাণিকতা স্বীকারে যা প্রভূত সাহায্য করেছিল, কেননা স্বামীজী ছিলেন সর্ববিধ বন্ধন-অসহিষ্ণু। এক্ষেত্রে তাঁর চারিপাশের মানুষগুলির পক্ষে জানা দরকার ছিল—স্বামীজীর লোকাচার-লঙ্ঘনের সঙ্গে নিছক সুখসন্ধানীর আচার-লঙ্ঘনের মধ্যে কী আকাশপাতাল প্রভেদ! সংঘের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁদের উপর ন্যস্ত এই বিশেষ দায়িত্ব যে-অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন, সেই জিনিসটি আমার ভারতবাসের প্রথম দিকে আমার মনে সবচেয়ে দাগ কেটেছিল। যে-সব ব্যক্তির জীবন হিন্দুরক্ষণশীলতার কঠোরতম আচারের মধ্যে, ততোধিক তপশ্চর্যার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তাঁরাও তাঁদের নেতা যে-সব ইউরোপীয়কে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আহারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। জনৈক ইংরাজ দম্পতির সঙ্গে স্বামীজী নাকি মাদ্রাজে একত্রে আহার করেছিলেন, তিনি নাকি পাশ্চাত্ত্যে গোমাংস ও মদ্য স্পর্শ করেছিলেন—এসব কথায় গুরুভাইদের মুখে সামান্যতম কুঞ্চনরেখাও দেখা যায়নি। এসকলের বিষয়ে প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা

করা, বা সমর্থনের ওজর আবিষ্কার করা—কোনো কিছুই তাঁদের কাজ নয়। যা তিনি করেছেন, যেখানে তিনি নিয়ে গেছেন, নিয়ে যাবেন,—তাঁদের কাজ অবিচলিত আনুগত্যে তাঁর পাশে স্থান নেওয়া। এই মহান দৃশ্যের সম্মুখীন যিনি হবেন, তাঁর মনে একথা না উঠে পারবে না যে, যেমন বিবেকানন্দ ভিন্ন রামকৃষ্ণ সংঘ অর্থহীন, তেমনি রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পিছনে না পেলে বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনা অসার্থক হয়ে দাঁড়াত। প্রাচীনতর গুরুভাইদের একজন সম্প্রতি আমাকে বলেছেন, 'বিবেকানন্দের নির্মাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ করেছিলেন।' কথাটি কি এইভাবে সত্য? না, বলা উচিত, জগন্মাতার হৃদয়োদ্ভূত অখণ্ড বিশাল ঐ উচ্চারণের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অংশ ভাগ করা সম্ভব নয়? এইসব জীবন অনুধ্যানের সময়ে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে একটিই আত্মা বিরাজমান, যার নাম —'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ',—এবং সেই অস্তিত্বের রহস্যান্ধকার থেকে নানা মূর্তি আবির্ভূত হয়েছে, যার কোনো কোনোটি এখনো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, এবং একথা কখনোই কারো সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাবে না যে, এখানে তার প্রকাশ শেষ হয়ে গেল এবং শুরু হল অন্যের প্রকাশ।

স্বামীজী একদা বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি পুষ্পের মত',—মন্দির-উদ্যানের একান্তে প্রস্ফুটিত, সরল, অর্ধনগ্ন, প্রাচীনপন্থী, পুরনো ভারতের আদর্শ জীবন,—অকস্মাৎ তিনি যেন ফুটে উঠেছেন এমন এক পৃথিবীতে, যে-পৃথিবী ঐ জীবনের স্মৃতিকে পর্যন্ত মুছে ফেলতে ব্যস্ত। অপরপক্ষে আমার আচার্যদেবের জীবনের মহিমা ও দুর্ভাগ্য এই—তিনি ঐ ধরনের ছিলেন না। তাঁর ছিল সর্বাত্মক আধুনিক মন। যে-ভাবাবেশে মানুষ ঈশ্বরের মুখোমুখি হত অতীতে, তার আলোকে নিশ্চয়ই জ্যোতির্ময় ছিল তাঁর চৈতন্য, কিন্তু সে চৈতন্যের আলোক একই সঙ্গে প্রসারিত ছিল আধুনিক পৃথিবীর জিজ্ঞাসা ও উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধানের উপরে। তাঁর আশা-বিশ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের আশা-বিশ্বাসকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত কিন্তু তাকে বিনা মনোযোগে লঙ্ঘন করতে পারত না। ভৌম জ্ঞানের অর্জন, সংকলন ও সর্বসমক্ষে উপস্থাপনের প্রথম ফলস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির যাতনা ও সংগ্রামের সহসা যে-উদ্‌ঘাটন ঘটেছিল এই যুগে—তা ইউরোপীয় মানসের মত তাঁর মনেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। এ বিষয়ে ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানি। ইউরোপের সুকুমার কলা, বিজ্ঞান, কাব্য গত ৬০ বছর কিংবা তারো বেশী সময় ধরে শুধু হতাশার ক্রন্দনে পূর্ণ। এ পৃথিবী কী হয়ে দাঁড়িয়েছে! একদিকে অধিকার-ভোগীর স্থূল ভোগতৃপ্তির স্ফীতি, অন্যদিকে সেই পাপনাশের ব্যাপারে মহাপ্রাণের সমুচ্চ আশা অথচ ক্ষীণ দুর্বল প্রয়াস!—এই তো পৃথিবীর ছবি যা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কেরা দেখছেন। যদিও অনিচ্ছুক, যদিও অনুতাপের মর্মযাতনায় অধীর, তবু উপায়ান্তরহীন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বিদীর্ণ চীৎকার: 'যার আছে—সেই পাবে; যার নেই—কেড়ে নিতে হবে তার শেষ সম্বলটুকুও; সাবধান! সাবধান! পরাজিত হলেই সর্বনাশ!'

প্রাচ্যপ্রজ্ঞার সিদ্ধান্তও কি একই? যদি তাই হয়, মানবের আশা কোথায়? আমার আচার্যদেবের জীবনে এর এক উত্তর খুঁজে পেয়েছি আমি। তাঁর মধ্যে

অতীত ভারত ও পৃথিবীর অগণিত গুরু ও ঋষির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারকে আমি দর্শন করেছি একদিকে, অন্যদিকে একই সঙ্গে তিনি ভাবী নূতন অভ্যুন্নতির প্রবর্তক ও ঋষি।

স্বামীজী একদিন তাঁর মহাপুরুষ-দর্শন বিষয়ে বলেছিলেন। বিষয়টির সূচনা হয়েছিল নাগমহাশয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে।......তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন, 'নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম।' নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত ভক্তি, যে-শরীরে ঈশ্বরপ্রেম জাগল না সেই হতভাগা শরীরকে আর কি আহার দেব বলে অন্ন-জল ত্যাগ প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। একবার অতিথির জন্য রাঁধার কাঠের অভাব হওয়ায় কুটীরের খুঁটি পর্যন্ত উনুনে দিয়েছিলেন, সে কথাও।

তারপর সেই বালকটির কথায় চলে গিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পাবার পরে যে 'প্রিয়ং' এই কথাটি ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি,—যে-দশ বছর এর পরে সে বেঁচেছিল সেইকালে এই শব্দটি ছাড়া আর কিছু তার মুখে শোনা যায়নি।

শ্রীগুরুর জীবনকালে দক্ষিণেশ্বরে আগত কত মানুষ কিভাবে তাঁর স্পর্শে তখনি সমাধিলাভ করেছিল, তার বিষয়ে সাধুদের জানা নানা কাহিনী শুনলাম। অনেক ক্ষেত্রেই আগন্তুকদের বিষয়ে ঐ ঘটনাটি ছাড়া বেশী কিছু জানা যায়নি। একথা জনৈকা মহিলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যিনি গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন এবং যাঁকে দেখা মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'এ যে জগন্মাতার অংশ!' জগন্মাতার নামে ঐ নারীকে নমস্কার করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, মহিলাটিও ব্যাপারটি যেন অদ্ভুত কিছু নয় এইভাবে তৎক্ষণাৎ গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সে সমাধিভঙ্গ করা যখন কঠিন হল তখন সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দু'তিন ঘণ্টা কাটার পরে যখন তিনি সমাধি থেকে উত্থিত হলেন তখন তাঁর সমস্ত চেহারা বদলে গেছে—একেবারে পাগলের ভাবভঙ্গি। যা হোক সমাধি যে ভেঙেছে এতেই সকলে খুশী, কারণ ভয় হয়েছিল যে, তা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষে (তাঁরা যেখানেই থাকুন) দুশ্চিন্তার কারণ হবে। সকলেই তৎপর হয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তাঁর নাম কি, নিবাস কোথায়, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসার চিন্তা কারও মাথায় জাগল না। মহিলাটি আর কখনো আসেন নি। তাঁর স্মৃতি একটি মনোহর কাহিনীর আকারে সংঘের চিন্তাভাণ্ডারে সুরক্ষিত হয়ে রইল, যা কল্যাণসুন্দর পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নমস্কারের স্মারক। শ্রীরামকৃষ্ণ কি এই মহিলাটির বিষয়ে বলেন নি—'ইনি নিত্য মাতৃত্বের অংশ?'

ধর্মীয় ব্যাপারাদি সম্বন্ধে আমার সাধারণ অজ্ঞতার জন্য আমার মন বারবার ফিরে যেত আদ্যাশক্তির এইসব নামহীন অজ্ঞাত সন্তানগণের দিকে, যাঁরা নক্ষত্রের মত নিজ কক্ষে সুন্দর দীপ্তিতে আবর্তিত কিন্তু আর কখনো আমাদের মধ্যে আপতিত হলেন না;—তাঁদের জীবন অপরূপ, সত্য, তবু আমি জানতে চাইতাম, বহু বর্ষ পূর্বেকার ঐ মহতী অনুভূতি কি তাঁদের জীবন থেকে মুছে যেতে পারে না? আচার্যবরিষ্ঠের স্পর্শস্মৃতি কি তাঁদের কাছে একটি বহুদূরের ঘটনা, স্বপ্নদৃষ্ট

কাহিনীর মত অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না, যেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঐসব ঘটনার স্মৃতি আজ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে! আসলে আমি নানা জিনিসের আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করতে চাইছিলাম এবং সেই প্রয়াসে সেইকালে আমার দৃষ্টির অগোচর থেকে গিয়েছিল একটি জিনিস (যা আমার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি তখনো),—এই ধরনের ব্যাপারকে সহজে স্বীকার করবার মত মানসিক প্রস্তুতি হিন্দুর মধ্যে তার স্বজাতি-স্বভাবে স্বতঃই আছে। আমার মনের সংস্কারের প্রকৃতি স্বামীজী সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি। তিনি বললেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস কাউকে স্পর্শ করেছেন, একি তামাসার কথা নাকি? **নিশ্চয়** তিনি নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এইসব ক্ষণিকের স্পর্শেও।' এর পরেই তিনি বিভিন্ন শিষ্যের জীবনের কাহিনী বলে যেতে আরম্ভ করলেন। একজন বারবার আসত, উপলব্ধির জন্য অধীর হত, সহসা একদিন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আগে কিছু টাকা কর, তারপর এসো।' সেই লোকটি আজ পার্থিব ব্যাপারে সাফল্য পেয়েছে কিন্তু তাঁর প্রতি স্বামীজীর পুরনো ভালবাসা এখনো উচ্ছল। স্বামীজী এঁদের বা অন্যদের দোষের বিষয়ে কিছু বললেন না। তাঁর কথা শুনতে মানুষের সংগ্রামের গরিমা ও মহত্ত্বের অনুভূতিই আমরা পেতাম। সব মানুষকে জোর করে সন্ন্যাসী হতে হবে কেন? তা সে **পারবেই** বা কেন জীবনের অন্য কাজ মিটিয়ে না এলে? কিন্তু শেষে ভুল হবে না; শেষে সব কিছুই তাঁর হয়ে যাবে।

(স্বামীজীর উক্তি—) সুতরাং আমি উপনিষদ শিক্ষা দিই। খেয়াল করলে দেখবে, আমি উপনিষদ ভিন্ন অন্য কিছু উদ্ধৃত করি না। আর উপনিষদের মধ্যেও সেই ভাবটি, যা **শক্তির** কথা বলে। বেদ-বেদান্তের সার কথা ঐ একটি শব্দে। বুদ্ধ অপ্রতিরোধ ও অহিংসা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেই একই শিক্ষা দেবার উচ্চতর উপায় এখানে আছে। অহিংসার মধ্যে একটি দারুণ দুর্বলতা আছে, আর দুর্বলতা থেকেই প্রতিরোধের ইচ্ছা জাগে। এক ফোঁটা সাগর-জলের আঘাতের ভয়ে পালিয়ে যাবার বা তাকে শাস্তি দেবার কথা আমরা ভাবি না, ওটা আমাদের কাছে গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়, কিন্তু একটা মশার কাছে জলের ঐ সামান্য ছিটেই মারাত্মক। সকল আঘাতকে অমন তুচ্ছই করতে হবে। শক্তি ও অভীঃ। আমার নিজের কাছে আদর্শ হলেন সেই সাধুটি, যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বুকে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে দেহ-ত্যাগের সময়ে মাত্র মৌনভঙ্গ করে বলেছিলেন,—'তুমিও তিনি!'

'জিজ্ঞাসা করতে পারো, এই কাঠামোয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়!

'তিনি যেন একটি প্রণালী—অপূর্ব অসচেতন প্রণালী! তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝতেন না। ইংরেজ বা ইংলন্ড সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানতেন যে, তারা সমুদ্রপারের বিচিত্র লোক। কিন্তু তিনি ঐ বিরাট জীবনযাপন করে গেলেন, যার তাৎপর্য আমি অনুধাবন করে যাচ্ছি। তাঁর মুখে কখনো কারো বিরুদ্ধে নিন্দার একটি শব্দও নয়! একবার বীভৎস আচারের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমি উগ্র সমালোচনা করছিলাম, তিন ঘণ্টা ধরে,—তিনি চুপ করে শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হলে 'বুড়ো লোকটি' বললেন—হাঁ, সব বাড়িতেই মেথর ঢোকার পিছনের দরজা থাকে—**এও সেইরকম আর কি!'**

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে হতবাক হয়ে যেতেন, সেই সঙ্গে বিশেষ অস্বস্তিও বোধ করতেন যখন দেখতেন, তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুগভীর গবেষণার সিদ্ধান্তগুলিকে জীবন্ত সত্যের মত দর্শন করে স্বামীজী অনর্গল বলে যাচ্ছেন ধর্মব্যাখ্যাতার ওজস্বিতার সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের কিছু করারও ছিল না, কেননা তাঁরা যে-ভাবেই যাচাই করার চেষ্টা করুন না কেন, এই ধর্মপ্রচারকের পাণ্ডিত্য হেলায় সবকিছু অতিক্রম করে চলে যেত। দর্শনের ধরাবাঁধা তত্ত্বালোচনা কিংবা বিশুদ্ধ ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না তাঁর মতবাদ,—একটি প্রাণবান জাতি আড়াই হাজার বছর ধরে জীবনে মরণে ক্রমাগত যে-সত্যকে লাভ করার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে—তারই বিশ্বাসের ঘোষণা তাঁর মধ্যে। ধর্মগ্রন্থসমূহকে জ্ঞানের আধার বা উৎস হিসাবে তিনি দেখতেন না, এক মহাজীবনের টীকা-ভাষ্যরূপেই তাদের মূল্যকে তিনি স্বীকার করতেন,—যাদের সহায়তা ভিন্ন ঐ জীবনের অত্যুজ্জ্বল ছটা তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে বিশ্লেষণশক্তি নষ্ট করে ফেলতে পারত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই মহাজীবনই শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতকে তাঁর কাছে চরম সত্য বলে প্রতিপন্ন করে তুলেছিল। এবং ঐ মহাজীবনই—অবশ্য তার সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতিও যুক্ত হয়েছিল—তাঁর এই বিশ্বাসকে অমোঘ করে তোলে : দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদগুলি আপাততঃ অদ্বৈতবাদে না পৌঁছলেও ঐ চরম সত্যের পথে সেগুলি বিভিন্ন স্তরবিশেষ।

ঐ চরম লক্ষ্যের জন্য উদ্দিষ্ট প্রত্যেকটি আন্তরিক বিশ্বাসই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যে-কোনো পূজাস্থানে প্রণাম করবে, কারণ মানুষ যে-রূপে তাঁকে চায়, তিনি সেইরূপেই আবির্ভূত হন।' সূর্যের দিকে যাওয়ার পথে আমরা ক্রমাগত ফটো তুলে গেলে কোনো ছবিই একেবারে একরকম হবে না, কিন্তু কোন্ ছবিকেই বা ভুল বলতে পারা যাবে?—এই উক্তির দ্বারা স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধী মতসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের আচার্যদেব যখন নারীর পক্ষে সর্বোচ্চ সত্যলাভের সম্ভাব্যতা প্রমাণীকৃত করার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন, তখন আসলে তিনি যে-সব বিষয়কে আমরা নিতান্ত সামাজিক ও ঐহিক বলে সাধারণতঃ জানি, তাদের অন্তর্লীন পবিত্রতার মহিমা সম্বন্ধে নূতন ধারণাসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রতীকে পূর্ণ জগৎ—এই জগতে ঈশ্বরলাভের পক্ষে সংসারের সেবাজীবনকে পূজামন্দিরের সাধকজীবনের মতই সত্যসাধনার পথ বলে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। মন্দিরে ভোগ নিবেদন করেন পুরোহিত, গৃহে আহার্য পরিবেশন করেন মাতা ও পত্নী—ঈশ্বরের কৃপা উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে বর্ষিত। 'সবই মায়া, ভগবানের নাম পর্যন্ত',—শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন,—'কিন্তু কোনো কোনো মায়া আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, আবার কেউ কেউ আরও জড়িয়ে বাঁধে।' যে-সাধ্বী নারীর কাছে গৃহ মন্দিরস্বরূপ, শিষ্টাচার ও অতিথিদের প্রতি কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে যিনি প্রতিদিনের জীবনকে প্রতি মুহূর্তের পূজায় পরিণত করেন—তাঁর জীবনের পবিত্র অধ্যাত্মমহিমা দেখিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মহান শিষ্যের এক মুখ্য চিন্তার ভিত্তি ও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কয়েক বৎসর ভারত ভ্রমণকালে অসংখ্য সামাজিক

গোষ্ঠী ও তাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান। নিজ আচার্যের জীবনে যার পূর্ণ জ্যোতি দর্শন করেছিলেন, ঐসব সম্প্রদায়ের মধ্যে তারই খন্ড কিরণ। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবহির্ভূত পাশ্চাত্ত্য দেশ-সমূহের পর্যবেক্ষণ শুরু হল, তখন সেখানকার জনসমষ্টিকে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে ঐক্যবন্ধরূপে দর্শন করলেন। এই দর্শন এবং তাঁর নিজ দেশ-দর্শন—সব ক্ষেত্রেই তিনি দেখতে লাগলেন ঈশ্বরলীলা মানবশরীরে। অনেক বৎসর ধরেই তাঁর মধ্যে অজ্ঞাতে এই ব্যাপারটি ঘটছিল, তথাপি তাঁর সান্নিধ্যের মানুষেরা সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলি অনুধাবনে তাঁর ব্যাকুলতায় অভিভূত না হয়ে পারেনি।

একদিন যখন তিনি পরমানন্দে তুর্কীদের শিষ্টাচার ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতার গুণগান করছিলেন, তখন আমি তাঁর বিস্ময়কর উৎসাহের বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। জাহাজের খালাসীদের শিশুতুল্য আন্তরিক ভালবাসায় ও ভক্তিতে তিনি মুগ্ধ ছিলেন—তখন আমার বিস্ময় তাঁকে সচকিত করে তোলে এবং অনেকটা দোষীর মত ভঙ্গিতে বলেন,—'কি জানো, আমি মুসলমানদের ভালবাসি।' 'জানি,' আমি বললাম, 'কিন্তু আসলে আমি জানতে চাইছিলাম, প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলি দেখবার এই মনোভাব আপনি কোথা থেকে পেলেন—কোনো বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে এ জিনিস দেখেছেন কিংবা পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে?'

বিমূঢ় বিস্ময়ের ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মুখ থেকে সরে গেল : 'রামকৃষ্ণ পরম-হংসের কাছে শিক্ষাকালে, নিশ্চয়ই,' তিনি বললেন, 'আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে তাঁর পথে চলেছি; অবশ্য তিনি যেভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাতে আমাদের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হয়নি; যে-জাতির মানুষদের তিনি বুঝতে চাইতেন, তাদের মত করে তিনি খেতেন, পরতেন, তাদের ধর্মদীক্ষা নিতেন, তাদের ভাষায় কথা বলতে চাইতেন; তিনি বলতেন, 'অন্য মানুষের একেবারে আত্মায় প্রবেশ করতে শিখতে হবে।' এটা তাঁরই নিজস্ব! তাঁর আগে ভারতে কেউ ক্রমান্বয়ে ক্রীশ্চান, মুসলমান ও বৈষ্ণব হয়নি।'

বুদ্ধজীবনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাই কেবল তাঁকে বিমোহিত করে রাখেনি, এক্ষেত্রে সমান জোরালো আর একটি ব্যাপার ছিল—তিনি তাঁর গুরুর যে-জীবনকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আড়াই হাজার বছর আগেকার জগতের দ্বারা স্বীকৃত জীবনের সাদৃশ্য না দেখে পারেননি। বুদ্ধের মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখতেন, রামকৃষ্ণের মধ্যে বুদ্ধকে।

এক ঝলকে একদা তাঁর এই মনোভাব আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল যখন তিনি বুদ্ধের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করছিলেন। বুদ্ধের জন্য বৃক্ষতলে কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল; পুণ্যপুরুষ তার উপরে 'শয়ন করেছিলেন দক্ষিণপার্শ্বে, সিংহের মত' মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, তখন হঠাৎ একজন ছুটে এল তাঁর কাছে,—সে উপদেশ চায়। শিষ্যরা সেই লোকটির ইচ্ছাকে অনুচিত বোধে তাকে সরিয়ে দিতে চাইল; মৃত্যুশয়নে আচার্য, তাঁর শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। কিন্তু পুণ্য-পুরুষ তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলেন : 'না না, আসতে দাও, তথাগত সদা

প্রস্তুত!'—বুদ্ধ বললেন। তারপর কনুয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে তাকে শিক্ষা দিলেন। এমন ঘটল পরপর চারবার, তারপরেই মাত্র বুদ্ধ নিজেকে মুক্ত ভাবলেন—নির্বাণের জন্য। 'কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে আনন্দকে ক্রন্দনের জন্য তিরস্কার করলেন। বুদ্ধ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, অবস্থাবিশেষের নাম; যে-কেউ সেই অবস্থায় পেঁছিতে পারে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন—তখনো কাউকে পূজা করতে নিষেধ করে গেলেন।'

স্বামীজীর কণ্ঠে অমর কাহিনী শেষ হল অবশেষে। যারা শুনছিল তাদের কাছে সবচেয়ে অর্থ-গভীর হয়েছিল সেই ক্ষণটি যখন 'কনুইয়ের উপরে ভর করে উঠে শিক্ষা দিলেন'—এই কথা বলার কালে একটু থেমে স্বামীজী সংক্ষিপ্তভাবে যোগ করেছিলেন—'এ জিনিস আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনেও দেখেছি!'—তখন অনিবার্যভাবেই মনে পড়েছিল ঘটনাটি,—বহুশত মাইল দূর থেকে আচার্যবরিষ্ঠের কাছে শিক্ষা দেবার জন্য কাশীপুরে আগত মানুষটির কথা; এক্ষেত্রেও আচার্য মৃত্যুশয্যায় এবং শিষ্যরা আগন্তুককে নিকটে যেতে দিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে আসতে দিতে বললেন—তাকে শিক্ষা দিলেন!

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কৈবর্ত (মাহিষ্য) কুলোদ্ভবা ধনশালিনী রাণী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হয় এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের অন্যতম পূজারী ব্রাহ্মণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাটি বিবেকানন্দের মনে প্রভাব বিস্তার করে, সে প্রভাবের গভীরতা হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উদ্ভূতা জনৈকা নারী কার্যতঃ একটি সমগ্র আন্দোলনের জননীস্বরূপা হলেন—গুরুভ্রাতাগণসহ বিবেকানন্দ যে-আন্দোলনের অংশ। বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির না থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাওয়া যেত না, রামকৃষ্ণ ছাড়া বিবেকানন্দকে, এবং বিবেকানন্দ ছাড়া তাঁর পাশ্চাত্ত্য প্রচারকে। সমস্ত ব্যাপারটিই কলকাতার কয়েক মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে নির্মিত একটি মন্দির-সৌধের উপর নির্ভরশীল। আর সে মন্দির নিম্নশ্রেণীভুক্ত একজন ধনী মহিলার ভক্তির সৃষ্টি। এ জিনিস কিন্তু ব্রহ্মণ্য প্রাধান্যরক্ষায় দায়বদ্ধ খাঁটি হিন্দুরাজত্বে ঘটা সম্ভবপর ছিল না—স্বামীজী সত্বর জানিয়ে দিয়েছিলেন তা। এবং এরপর থেকে স্বামীজী সিদ্ধান্ত করেন—ভারতে একচ্ছত্র শাসনের বিভিন্ন সময়ে জাতিভেদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি।......

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের ইতিহাসে বড় হয়ে আছে। যখন সকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্ম-খ্যাপা বলে ধরে নিয়েছিল, তখন তিনি এই মহাসাধককে রক্ষা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মন্দিরের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ, তখন ইনিই তাঁর বাসস্থান ও বৃত্তি বজায় রাখেন। এইসব কাজে মথুরবাবু তাঁর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ধারা বজায় রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় প্রতিভা প্রথম থেকেই রাণী রাসমণি বুঝেছিলেন, এবং অতঃপর অব্যাহত নিষ্ঠায় তার পরিপোষণ করে যান।

কামারপুকুরের তরুণ ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যখন প্রথম এসেছিলেন, তখন

কিন্তু তিনি এতই প্রাচীনপন্থী ছিলেন যে, নিম্নশ্রেণীর এক নারী মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ-উদ্দেশ্যে সম্পত্তিদান করেছেন—এ জিনিস তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠাদিবসের পূজার্চনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহায্য করতে হয়েছিল। কিন্তু পূজার কোনো প্রসাদ তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। কাজকর্ম চুকে যাবার পরে, সকলে চলে গেলে গভীররাত্রে বাজার থেকে একমুঠো ছোলাভাজা কিনে নিয়ে এসে তিনি উপবাসভঙ্গ করেন।

এই ঘটনাটির পটভূমিকায় পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তিনি যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার তাৎপর্য গভীরতর হয়ে ওঠে। কার্যগতিকেই তিনি পরবর্তীকালে কৈবর্তবংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়ে ওঠেন নি। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি তাঁর জীবনোদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেন তখন দেখেন যে, শৈশবের গ্রাম-জীবনে অভ্যস্ত কঠোর রক্ষণশীলতা তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক নয়, বরং প্রতিবন্ধক। তাঁর জীবন, একথা আমরা বলতে পারি, সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর নারী ও পুরুষের ধর্মব্যাপারে সমানাধিকার ঘোষণা করেছে।

আমার আচার্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে-সংঘভুক্ত সেই সংঘকে নারী ও সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য চিরদিনের দায়বন্ধ মনে করতেন। খেতড়ির রাজাকে ফনোগ্রামে নিজ বাণী পাঠাবার কালে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কণ্ঠে স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যে যখনই তাঁর মনে হয়েছে মৃত্যু হয়তো সন্নিকট, তখনই শিষ্যদের কাছে ডেকে বলেছেন—'মনে রেখো—ঐ কথাটি—নারী ও জনগণ!'

শাস্ত্রে চিত্তৈকাগ্রতার সর্বোচ্চ প্রকাশ বলে যাকে নির্দেশ করা হয়েছে, তার অজস্র অভিব্যক্তির রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর বাসকালে বছরের পর বছর ধরে শিষ্যগণ দেখেছিলেন। তাঁর চেতনা এতই উদ্দীপ্ত-উন্মুখ ছিল যে, তিনি এগিয়ে গিয়ে দ্বারদেশে বিনা জিজ্ঞাসায় শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন—যে-প্রশ্নগুলি শিষ্যদের পকেটে লেখা থাকত। এতই সূক্ষ্ম ছিল তাঁর অনুভূতি যে, স্পর্শমাত্র তিনি কিরূপ চরিত্রের লোকের দ্বারা তাঁর খাদ্য, বস্ত্র বা বিছানা স্পৃষ্ট হয়েছে, তা বলে দিতে পারতেন। কখনো হয়ত কলুষিত স্পর্শে তাঁর শরীর সংকুচিত হয়ে গেল যন্ত্রণায়, তা 'পুড়িয়ে দিল' তাঁকে। অন্যসময়ে তিনি হয়ত বললেন, 'এই দেখ—এসব জিনিস খেতে পারি কারণ যে-পাঠিয়েছে সে ভাল লোক।' তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ ভাবসংস্কার এতই দৃঢ় ছিল যে, নিদ্রাতেও ধাতুস্পর্শে শিউরে উঠতেন; কিংবা জাগ্রত অবস্থায় ফলমূল বা বইপত্র যদি মালিককে ফিরিয়ে দেবেন বলে থাকেন, পরে তা ভুলে গেলে নিদ্রার মধ্যেও উঠে পড়তেন সেই জিনিস ফেরৎ দিয়ে আসার জন্য।

জগতের ঋষি-পদবীভুক্ত মহাপুরুষদের কারো বিষয়ে কোনো ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদই বলবেন না যে, তিনি দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন; তাঁরা শুধু বলবেন—তিনি এমন একটি মানসিক অবস্থায় উপনীত হতে পারতেন যেখানে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হত যে তিনি দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন (অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকেরা যাকে স্ব-সংবেদ্য ব্যাপার বলে থাকেন)। এই অবস্থায় অজস্র দৃষ্টান্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা এখনো বলেন, কী অদ্ভুত অনুভূতি হত যখন তাঁরা কথোপকথনের এক দিকের কথনই শুনে যেতেন, যা হয়ত চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের গুরুদেব সেইকালে অন্য সকলের কাছে অদৃশ্য দেবদেবী-গণের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে অজস্র দর্শনাদি সকলকে এক মহাজীবনে গ্রথিত করে তুলেছিল—এর পিছনে ছিল মানবজাতিকে সেবা করায় তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ তাঁর বিষয়ে বলেছেন : অন্ধকারে যন্ত্রণায় মাটিতে মুখ ঘষতে ঘষতে তিনি প্রার্থনা করতেন—আবার যেন পৃথিবীতে আসতে পারি, কুকুরজন্ম নিয়েও, যদি তাতে একটি জীবেরও উপকার হয়। অন্য সময়ে, যখন তাঁর পক্ষে নিজের মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব হত, তখন শিষ্যদের উচ্চতর উপলব্ধির প্রলোভনের কথা বলতেন, যা সেবা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর সঙ্গে তাঁর শিষ্যগণ যুক্ত করে দিতেন গভীর সমাধিভঙ্গের পরে জগন্মাতার সঙ্গে গুরুদেবের আবদার অভিমানের কথাগুলিকে : তোর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে খেলা করব; আর একটিমাত্র সেবার কাজ করব—মাত্র একটি, তার বেশী নয়; ছোটখাট জিনিস একটু ভোগের ইচ্ছে—যাতে মনটা নেমে থাকে ইত্যাদি। সমাধি থেকে এই 'নেমে আসার' সময়ে তাঁর সঙ্গে আসত ঈশ্বর-নিমজ্জিতের অনন্ত প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টি। হারভার্ড বক্তৃতাকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন মৃগী রোগের বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার সঙ্গে সমাধির বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার পার্থক্য নির্দেশ করছিলেন, তখন তাঁর উক্তির প্রতিটি বর্ণে যে প্রত্যয়ের উচ্চারণ ছিল তা যে স্বীয় আচার্যদেবের সমাধি ও সমাধি থেকে ব্যুত্থানের নিত্য-সাক্ষী হবার অভিজ্ঞতা থেকে জাত, সেকথা সহজেই বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তাঁর চরম আধিপত্য ছিল। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, শেষ অসুখের সময়ে কণ্ঠে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে তিনি সেখান থেকে সমস্ত মন সরিয়ে নিয়ে জায়গাটিকে অসাড় করে দিয়েছিলেন—যে-কাজ অস্ত্রোপচারের পূর্বে ঔষধযোগে করা হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তিও অসাধারণ। দেহগঠনের খুঁটিনাটিও তাঁর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ,—কোনো না কোনোভাবে তা আভ্যন্তর স্বভাবের প্রকাশক। নবাগত শিষ্যকে তিনি যোগ-নিদ্রাভিভূত করে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মগ্নচৈতন্যের ভিতর থেকে অতীত সংস্কারের কথা জেনে নিতে পারতেন। ছোটখাট কাজ বা কথা, অন্যের কাছে যার কোনো মূল্যই নেই হয়ত, সেগুলি তাঁর কাছে মানবচরিত্র-প্রবাহিণীর গতিনির্দেশক তৃণখণ্ডের মত বোধ হত। এক এক সময়ে মানুষকে কাঁচের মত স্বচ্ছ দেখতেন—তার স্বভাবের শেষ প্রান্ত অবধি তাঁর দৃষ্টি চলে যেত অবাধে।

সর্বোপরি স্পর্শমাত্রে মানুষের মধ্যে দিব্যজ্ঞানের ঝলক প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন—যা তাদের পরবর্তী জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করত। তাঁর স্পর্শে সমাধিলাভের কথা সকলেরই জানা আছে। দক্ষিণেশ্বরে আগত নারীদের ক্ষেত্রে এ জিনিস বিশেষভাবে ঘটত। এসব ছাড়াও, একটি ঘটনার কথা জনৈক সরল-প্রকৃতির মানুষ আমাকে বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের মাত্র কয়েক সপ্তাহ

পূর্বে যা ঘটেছিল। কাশীপুরের বাগানবাটীতে তিনি একদিন রোগশয্যা থেকে নেমে আসেন; সেখানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মাথায় হাত দিয়ে কয়েক ক্ষেত্রে বলেন, 'আজ থাক!' আবার কখনো—'চৈতন্য হোক!' এই ঘটনার পরে আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রত্যেকের জীবনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে। অনন্ত বেদনার জাগরণ হয় একজনের ক্ষেত্রে; সবকিছুই প্রতীকতুল্য ও ভাবসংকেতপূর্ণ বলে মনে হতে থাকে অন্য একজনের ক্ষেত্রে; তৃতীয় ব্যক্তির কাছে সবই অপার আনন্দ—উপ্‌চে-ওঠা আনন্দ-ধারা। এঁদের একজন এক মহাজ্যোতি দেখেছিলেন, যা পরবর্তী জীবনে কখনো তাঁকে ত্যাগ করেনি, যেখানে যেতেন সেখানেই সাথী হয়ে থাকত তা; ফলে যখনই কোনো মন্দির বা পথিপার্শ্বের পূজাগৃহ দেখতেন, তখন তার অভ্যন্তরে জ্যোতির্মণ্ডলবর্তী এক মূর্তি দেখতেনই—সে মূর্তি তাঁর তাৎকালিক সুখ বা দুঃখের অনুভূতি অনুযায়ী কখনো সহাস্য, কখনো বিষণ্ণ। ঐ মূর্তিকে তিনি 'বিগ্রহাধিষ্ঠাতা চৈতন্য'রূপে জানতেন ও বলতেন।

মানুষকে তার সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠভাবে জাগরিত করে, কিংবা তার পক্ষে এককালে যতখানি অনুভূতি ধারণ করা সম্ভবপর তাই দান করে শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর ন্যায়পরতা এবং দৃঢ় বিচারবোধের মানদণ্ড স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যগণও এই বিচারের ধারা অনুসরণ করে গেছেন। শিষ্যদের অন্যতম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেন—'বিনা বিচারে আমরা কোনো কিছুই বিশ্বাস করি না; আমাদের সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।' ঠিক কিভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সে-বিষয়ে প্রশ্ন করায় অন্য আর এক শিষ্য গভীর চিন্তার পরে বলেছিলেন—'নিত্যবস্তু সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ঘটিয়ে দিতেন, তার থেকে যে-জ্ঞানোদয় হত, তা কখনো প্রতারিত হবার নয়।' স্বামীজী তাঁর গোড়ার দিককার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—'আমাদের নিজ চেষ্টায় **কিংবা কোনো পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিরাট ব্যক্তির কৃপায়** আমরা নিত্যবস্তুর ধারণালাভ করি।'

এই গুরুর জীবন ছিল শিষ্যের করায়ত্ত সম্পদ। মানবীয় বৃত্তিসমূহের কতদূর ব্যাপ্তি সম্ভবপর তা শিষ্য গুরুর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন; গুরুর মারফৎ নিজেও লাভ করেছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবিলম্বে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন বলে স্বামীজীর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পরে জ্ঞানকে 'মগ্নচৈতন্যভূমি' (subconscious), 'চৈতন্যভূমি' (conscious) এবং 'অতিচৈতন্যভূমি' (superconscious) —এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা সহজেই সম্ভব হয়েছিল। প্রথম দুটি শব্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রচলিত; তৃতীয় শব্দটি অসাধারণ প্রাতিভ অন্তর্দৃষ্টিবলে, নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রামাণ্যে তিনি মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে যোগ করে দেন। 'মগ্নচৈন্য ও অতিচৈতন্য—এই দুই সমুদ্রের মধ্যে ব্যক্ত-চৈতন্য পাতলা পর্দার ব্যবধান মাত্র'—তিনি বলেছিলেন। আর একবার তিনি বিস্ময়-প্রখর কণ্ঠে বলে ওঠেন: 'ব্যক্ত-চৈতন্য! পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা যখন অবিরত ব্যক্ত-চেতনার কথা বলে, আমি নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না! ব্যক্ত-চেতনার কী মূল্য! মগ্নচৈতন্যের সীমাহীন নিম্নরাজ্য—এবং অতি-চৈতন্যের অত্যুচ্চ ঊর্ধ্বলোকের তুলনায় ব্যক্ত-চেতনার পরিধি অতি সামান্য! এসব ব্যাপারে আমি বিভ্রান্ত হতে পারি না কখনোই, কারণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি

রামকৃষ্ণ পরমহংস দশ মিনিটের মধ্যে মানুষের মগ্ন-চৈতন্য থেকে তার সমগ্র অতীতের কথা জেনে নিয়ে তার ভিতরের শক্তি এবং ভবিষ্যতের আকার নির্ণয় করে দিতেন।'

রাজযোগ গ্রন্থে স্বামীজী যে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে নির্দেশ করেছিলেন, 'প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কখনোই যুক্তিবিরোধী নয়,'—এর পিছনেও অবশ্যই তাঁর একই ধরনের ব্যাপক ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণেশ্বরের সাধক অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন সত্য, কিন্তু যেসব জিনিসের সত্যনির্ণয় সাধারণ উপায়েই করা যেতে পারে, সেখানে অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার মত বৃথা অভিমান তাঁর ছিল না। একদা যখন এক অদ্ভুত সাধু দক্ষিণেশ্বরে এসে বলেন, তিনি বিনা আহারে বেঁচে থাকতে পারেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য কোনো অলৌকিক উপায় নেন নি, শুধু সাধুর পিছনে কয়েকটি চতুর চর লাগিয়ে বলে দেন—ঐ ব্যক্তি কখন কোথায় কিভাবে খায়, তার খবর যেন তাঁকে পেঁৗছে দেওয়া হয়।

পরীক্ষা না করে কোনো জিনিসকেই স্বামীজী মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং সাধারণ লোকে স্বপ্ন, ভাবী ঘটনার পূর্বজ্ঞান, ভবিষ্যৎবাণী প্রভৃতির দ্বারা অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, সে সব বিষয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর গভীর আতঙ্ক ছিল। অনিবার্যভাবে এসব জিনিস তাঁর কাছে প্রচুর হাজির হত, আর তিনি সেগুলিকে নির্ঘাত অগ্রাহ্য করে বলতেন—ওসব যদি সত্য হয় তো হবেই, তাঁর মানা, না-মানায় কিছু এসে যায় না। তাঁর বক্তব্য; কোনো বিশেষ একটি ভাগ্যগণনা পরে সত্য হবে কি না হবে তা বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তিনি একটি জিনিস বলতে পারেন—যদি একবার ও-গুলিকে মান্য করেন তাহলে কোনোদিন মুক্ত হতে পারবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অলৌকিক দর্শনাদি সদাসর্বদা পারমার্থিক বিষয়েই ঘটত। বেদেদের মত হাত গণনার কাজ তাঁর নয়। তাঁর শিষ্যগণের মতে, এই ধরনের ভবিষ্যৎ-বলার চেষ্টা শক্তির কম-বেশী অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়।—'এ সবই অবান্তর ব্যাপার; আসল যোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই'—স্বামীজী বলেছিলেন—'এসব ক্ষমতার যদি কিছু সার্থকতা থাকে তা হল, এর দ্বারা আমাদের বক্তব্যের সত্যতা পরোক্ষভাবে কিছু প্রমাণিত হয়; স্থূল বস্তুসত্যের বাইরে আরও কিছু আছে তার ক্ষণিক আভাস হয়ত এসবের দ্বারা পাওয়া যায়, কিন্তু যারা এদের মধ্যে ডুবে থাকে তারা দারুণ বিপদকে ডেকে আনে।'—'এসব সীমান্ত-সমস্যা'—তিনি অধীর চীৎকারে অন্যত্র বলেছিলেন—'আমি কি বলিনি যে, সীমান্তরেখা সদাই পরিবর্তনশীল! ওসবের দ্বারা কখনই নিশ্চিত ও স্থায়ী জ্ঞানরাজ্যের অভ্যন্তরে পেঁৗছান যায় না!

আর একটি ঘটনা স্বামীজী কখনই ভুলতে পারেন নি—রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরের সপ্তাহে তাঁর চকিতে দর্শনলাভ। কাশীপুর-বাটীর বাইরে বসে যে-বিষয়ে তাঁদের মনপ্রাণ পূর্ণ—কয়েকদিন আগে গুরুদেবের সেই মহাপ্রয়াণের বিষয় নিয়ে তিনি ও তাঁর একজন গুরুভাই রাত্রে কথা বলছিলেন,—সহসা স্বামীজী দেখলেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বাগানে প্রবেশ করে তাঁদের দিকে আসছেন। কয়েক মিনিট পরে

বন্ধুর অবরুদ্ধ গোঙানি—'ও কে—! ও কে—!' দুই ব্যক্তি একই সঙ্গে একই ছায়ামূর্তি দেখেছে—এ তেমনই এক বিরল ক্ষেত্র।

এই ধরনের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্য দিয়ে যিনি গেছেন, তাঁর মনে কতকগুলি বিশ্বাস না জেগে পারে না। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক থেকে ১৮৯৫-এর অগস্টে স্বামীজী তাঁর বিশ্বাসের কথা এক পত্রে লেখেন: 'বয়স যত বাড়ছে, ততই হিন্দুদের ধারণার সত্যতা অনুভব করছি—**মানুষই** সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। পরলোকবাসিগণই তথাকথিত উচ্চতর জীব—কিন্তু তাঁরা অন্য রূপধারী মানুষ ছাড়া কিছু নন। তাঁদের সূক্ষ্মতর দেহ, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা হস্তপদাদিসমেত **মানবদেহ**। তাঁরা এই পৃথিবীতেই, তবে অন্য **আকাশে**, বাস করেন, এবং তাঁরা সম্পূর্ণ অদৃশ্যও নন। আমার বিশ্বাস, তাঁদের চেতনা প্রভৃতি সবকিছু আছে—আমাদেরই মত। তাঁরা মানুষই। দেবতারাও তাই। কিন্তু মানুষই কেবল ঈশ্বর হতে পারে, তাই ঈশ্বর হবার জন্য দেবতাদের মানুষ হতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রথম দর্শনেই বালক নরেনকে 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চিনেছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার যেমন নদীস্রোতের গতিবেগ নির্ণয় করেন, তেমনিভাবে তিনি বালকের তৎকালীন মানসিক উচ্চাবস্থাও নির্ণয় করেছিলেন। বৃদ্ধ সাগ্রহে শুধিয়েছিলেন, 'বল দিকি শোয়ার সময়ে তোমার জ্যোতিদর্শন হয় নাকি?' 'কেন, সকলেরই তা হয় না?'—বালক সবিস্ময়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিল। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি তিনি প্রায়ই উল্লেখ করতেন আমাদের কাছে এবং কি ধরনের জ্যোতি দেখতেন তার বর্ণনা করতেন। কখনো তা বলের আকার, এক বালক সেটা পায়ে মেরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাঁর দিকে; সেটা ছুটে এসে তাঁর মধ্যে ঢুকে যেত, তারপরে আর কিছু মনে থাকত না। কখনো তা অগ্নিরাশি—যার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে যেতেন। তাঁর এই যে নিদ্রা—একি সত্যই সাধারণতঃ যাকে নিদ্রা বলা হয়—তাই?—সবিস্ময়ে আমাদের ভাবতে হয়। যাই হোক, বিবেকানন্দের বয়ঃকনিষ্ঠরা বলেন, তিনি নিদ্রাগত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের রূপ লক্ষ্য করে প্রায়ই অন্যদের ডেকে বলতেন, বাইরে ঘুমের মত মনে হলেও তা আসলে ধ্যান,—এবং ধ্যানের কোন্ অবস্থায় তিনি আছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে পীড়িত অবস্থায় আছেন, সেই সময়ে একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে শুয়ে আছেন; বাইরে থেকে মনে হয়েছিল নরেন্দ্র বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুমোচ্ছেন, এমন সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রিতে তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—'আমার শরীর গেল কোথায়?' গোপালদাদা ছুটে এলেন; তারপর গা-হাত-পা টিপে নানাভাবে যে-দেহসংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সফল হলেন না; বালকের যন্ত্রণা ও আতঙ্ক যখন কিছুতে প্রশমিত হল না, তখন গোপালদাদা গুরুদেবের কাছে ছুটে গিয়ে নরেন্দ্রের অবস্থার কথা জানালেন; গুরু সেকথা শুনে হেসে বললেন, 'বেশ হয়েছে। ঐ অবস্থায় থাক, কোনো ক্ষতি নেই। আমাকে চেয়ে চেয়ে বড্ড জ্বালাচ্ছিল।' পরে তিনি অন্যদের বলেন, 'নরেনের নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপার এখন চুকে গেছে, এরপর সে কাজ করবে।' স্বামীজী স্বয়ং গুরুভাই সারদানন্দের কাছে এই নির্বিকল্প সমাধির প্রথমাবস্থা বর্ণনা করেছিলেন

—মাথার মধ্যে একটা আলো জ্বলে উঠেছিল; তা এতই তীব্র যে, তাঁর মনে হয়েছিল কে যেন সত্যি সত্যি একটা দারুণ জোরালো আলো জেলে দিয়ে গেছে মাথার পিছনে। তারপর, আমরা ধরেই নিতে পারি, বাইরের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং স্বামীজী এমন এক জগতে পৌঁছান যা অবাঙ্মনসোগোচরম্।......

আমার আচার্যদেবের মত উচ্চাধিকারীর ক্ষেত্রে দেহবোধের উপরে ওঠাই ভাবোন্নতির একমাত্র লক্ষণ নয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, নিত্যশক্তির চরম বিকাশের জন্য প্রথমে অতি তীব্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার পরে তাকে সম্পূর্ণ সংবৃত রাখার প্রয়োজন হয়। এই জিনিসটি এমন এক অভিজ্ঞতা পরম্পরার কথা বলে, যা আমাদের অধিকাংশের কল্পনাবহির্ভূত; তবে শিষ্য নরেনের জীবনের একটি ঘটনা ঐ ব্যাপারটির কিঞ্চিৎ আভাস আমাদের দেয়। তখনো নরেন্দ্র অল্পবয়সী যুবকমাত্র; এমন সময়ে সহসা পিতার মৃত্যুতে পরিবারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটল। জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে দিনের পর দিন পরিবারের অন্নের চিন্তায় তাঁকে অস্থির হতে হয়েছে; প্রিয়জনদের কষ্টে তাঁর হৃদয়তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে গেছে—ঐশ্বর্য থেকে চরম দারিদ্র্যে পতন বিভ্রান্ত করেছে তাঁকে। সর্বনাশের পরিমাণ যেন তাঁর ধারণাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মর্মবেদনা সহ্যাতীত হওয়ায় একদিন গুরুদেবের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করতে লাগলেন। বৃদ্ধ শান্তভাবে তাঁর কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'যাও বাবা যাও, মন্দিরে মায়ের কাছে প্রার্থনা কর গিয়ে; তুমি যাই চাওনা কেন, সবই তিনি তোমাকে দেবেন।'

বাইরের দিক থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে দারুণ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল না। কারণ তাঁর অনেক ধনী মাড়োয়ারী ভক্ত ছিল, যারা তাঁর কথায় যে-কোনো খরচ করতে প্রস্তুত ছিল। বালক তাঁর প্রশান্তি ও প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে তাঁর নির্দেশমত কালীপ্রতিমার কাছে প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেলেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেন, কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরলেন তখন তাঁর বিহ্বল আকার এবং যেন চেষ্টা করে কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধোলেন—'প্রার্থনা করেছিলি?'

'হাঁ'—শিষ্য উত্তর দিলেন।

'মার কাছে কি চাইলি?'

'সর্বোচ্চ জ্ঞান ও ভক্তি,'—নরেন্দ্রের উত্তর।

'আবার যাও',—শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে বললেন।

নরেন্দ্র আবার গেলেন। কিন্তু ঘটনা পূর্ববৎ। তিনবার যথেচ্ছ প্রার্থনা করবার জন্য প্রেরিত হলেন, তিনবারই একই কথা বলে চলে এলেন। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সব ভুল হয়ে গেল। কিসের জন্য এসেছেন, তা কিছুতে মনে পড়ল না। আমাদের মধ্যে কেউ কি ঐ উচ্চ অবস্থায় উঠতে পেরেছি, যেখানে আমাদের প্রিয়তমের জন্য প্রার্থনার সময়ে আমাদের অহং সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়? যদি সে অবস্থায় পৌঁছে থাকি, তবেই এই সাধারণ ভেদবৈচিত্র্যময়, আপেক্ষিক জগতের সঙ্গে ঐ অনুভূতির অনন্ত দূরবর্তিতা কিছু পরিমাণে আভাসে উপলব্ধি করতে পারব।......

কাজ শেষ হলেই নির্বিকল্প সমাধির আমটি আবার খেতে পাবে—নরেন সম্বন্ধে

গুরুদেবের এই ভবিষ্যৎবাণী নরেন্দ্রের বাল্যসঙ্গীরা কখনোই ভুলে যাননি। কখন সেই কাজ-শেষের ক্ষণটি আসবে কেউই ঠিকভাবে জানত না, যদিও চরম অনুভূতির দিকে অগ্রগতি কেউ কেউ কিছুটা হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন। শেষ বছরে কয়েকজন বাল্যসঙ্গী একদিন অতীত দিনের পর্যালোচনা করছিলেন, 'নরেন যেদিন জানবে সে কে এবং কী, তখনই আর শরীর রাখবে না'—এই ভবিষ্যৎবাণীও উল্লিখিত হয়েছিল; এমন সময়ে একজন কিছুটা হাস্যচ্ছলে স্বামীজীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে ছিলে, এখন কি জানতে পেরেছ?' তখনই সহসা অপ্রত্যাশিত উত্তর, 'হাঁ, এখন জেনেছি'—স্তব্ধ করে দিল সকলকে, নিবিড় গাম্ভীর্যে, আর প্রশ্ন করতে সাহস রইল না কারো।

শেষের দিন যতই ঘনাতে লাগল—অধিকাংশ সময় ছেয়ে রইল ধ্যানে ও তপস্যায়। যে-সব জিনিস অতিশয় প্রিয় ছিল, তাদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে গেল মন। চরম অনুভূতির শেষ পর্ব এল যখন, তখন ঐ বিরাট অতীন্দ্রিয়শক্তির দু' একটি কিরণ-রেখা নিকট ও দূরের অনেক প্রিয়জনকে স্পর্শ করে গেল। একজন স্বপ্ন দেখলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ আবার সেইরাত্রে দেহত্যাগ করেছেন—প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে শুনলেন সংবাদ নিয়ে এসেছে দ্বারে সংবাদদাতা। অন্যজন, বাল্যের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, 'দর্শন' পেলেন : বিজয়োল্লাসে তিনি বলে গেলেন—'শশী! শশী!* শরীরটাকে থু থু করে ফেলে দিয়েছি।' আর একজনকে সন্ধ্যায় কে যেন জোর করে মন্দিরে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তাঁর আত্মা যেন অসীম জ্যোতির সম্মুখীন হয়েছিল, লুটিয়ে পড়েছিল তার সামনে—'শিব গুরু! শিব গুরু!'

[*The Master* থেকে এই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ অনুবাদ করার সময়ে উক্ত গ্রন্থের স্বামী মাধবানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'—কে সহায়করূপে গ্রহণ করেছি।]

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ডাক নাম।

শ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং তাঁর প্রধান শিষ্যা সারদাদেবীর জীবনকথা মোটামুটি পরিচিত বলে সে সম্বন্ধে অধিক তথ্য দেবার দরকার নেই। লোকলোচনের সামনে আসতে সারদাদেবী কখনই চাননি, রক্ষণশীল হিন্দু রমণীর মতই জীবন কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের পক্ষে তাঁকে 'জননী' ও 'বিশ্ব-জননী' না বলে উপায় থাকেনি। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাই 'সম্ভবতঃ' প্রথম ইউরোপীয় মনুষ্য যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন।[১] কিন্তু প্রাচীন সংস্কারে লালিত এই নারী প্রথম সাক্ষাতেই যে অসাধারণ উদারতা ও চরিত্রমহিমা দেখিয়েছিলেন, তা নিত্য স্মরণীয়। ওলি বুল, ম্যাকলাউড বা নিবেদিতা সারদাদেবীর চরিত্রে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁদের বিবেকানন্দ-ভক্তির জন্য নয়—সারদাদেবীর বিচ্ছুরিত চারিত্রশক্তির জন্যই। এখানে মনে রাখতে হবে, এই তিনজন বিদেশী মহিলার প্রত্যেকেই অতি বিদগ্ধ, শিক্ষিত, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অগ্রণী বহু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।[২] এঁদের দু'জন আবার আমেরিকায় অভিজাতমণ্ডলীভুক্তা। সারদাদেবীর সাক্ষাৎ-দর্শনের পরে মিসেস বুল তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু কথা অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লৌকিকভাবে সারদাদেবীকে পত্নীভাবে গ্রহণ না করায় ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ যখন সারদাদেবীর কষ্ট কল্পনায় বেদনার্ত, তখন ম্যাক্সমুলার এই অহেতুক সমবেদনার যোগ্য সান্ত্বনারূপে মিসেস বুলের পত্রটিকে উপস্থিত করেছিলেন। মিসেস ওলি বুল ১৮৯৮-এর ১১ জুলাই, শ্রীনগর থেকে ম্যাক্সমুলারকে লেখেন :

> "আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করলেন। বললেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখলেন না। গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কি বোঝায়, একথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল,—তাঁর ক্ষেত্রে আবার নিজ স্বামীই গুরু—তিনি জানালেন : কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই—সে কাজ যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবুও—গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।

---

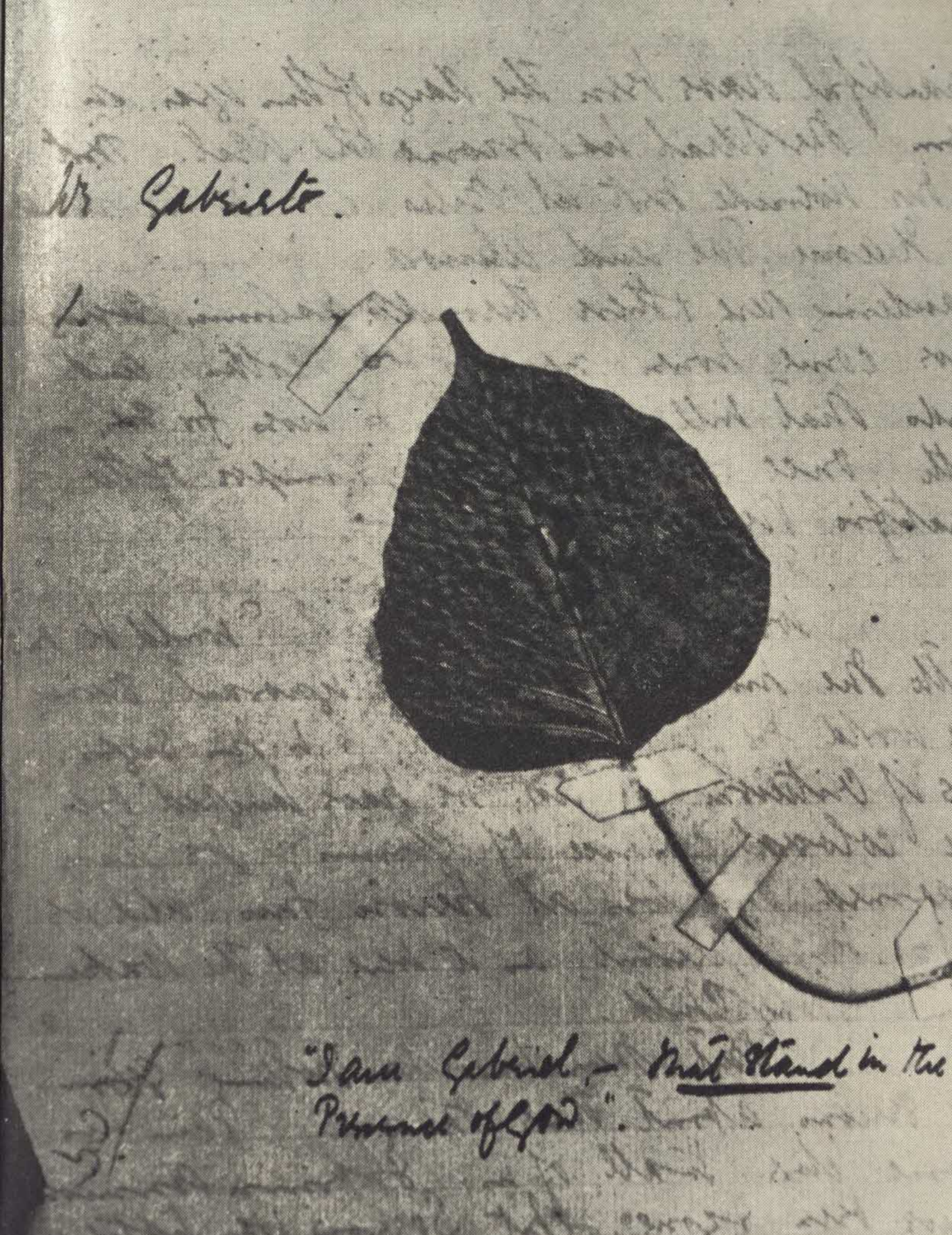
১ এই তিনজনের ভারতে আসার বছরখানেক আগেই মিস মুলার ও মিসেস সেভিয়ার স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তাঁরা সারদাদেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। সম্ভবতঃ পাননি।

২ মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের বিস্তৃত পরিচয় এই খণ্ডের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।



শ্রীমা সারদাদেবী ও নিবেদিতা

ছবিটির বিষয়ে তথ্যের জন্য গ্রন্থের ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত নিবেদিতার 'নোটস্ অব সাম ওয়াণ্ডারিঙস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবনা-পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এতে অশ্বত্থ পাতার যে-ছবি দেখা যাচ্ছে, তা আঁকা পাতার ছবি নয়, নিবেদিতা সত্যই একটি অশ্বত্থ পাতা

[পরপৃষ্ঠায়]

ওখানে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ঐ পাতাটি নিশ্চয় কোনো বিশেষ স্মৃতিবাহী, সম্ভবতঃ স্বামীজীর সঙ্গে ভারতভ্রমণকালে সংগৃহীত। চিত্রের উপরে লেখা আছে "De Gabriete" ; তলায় লেখা— "I am Gabriel *that stand* in the presence of God." এটি বাইবেলের নিম্নোক্ত কথার সূত্রে লিখিত—

"And the angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God ; and am sent to speak unto thee, and to shew these glad tidings".

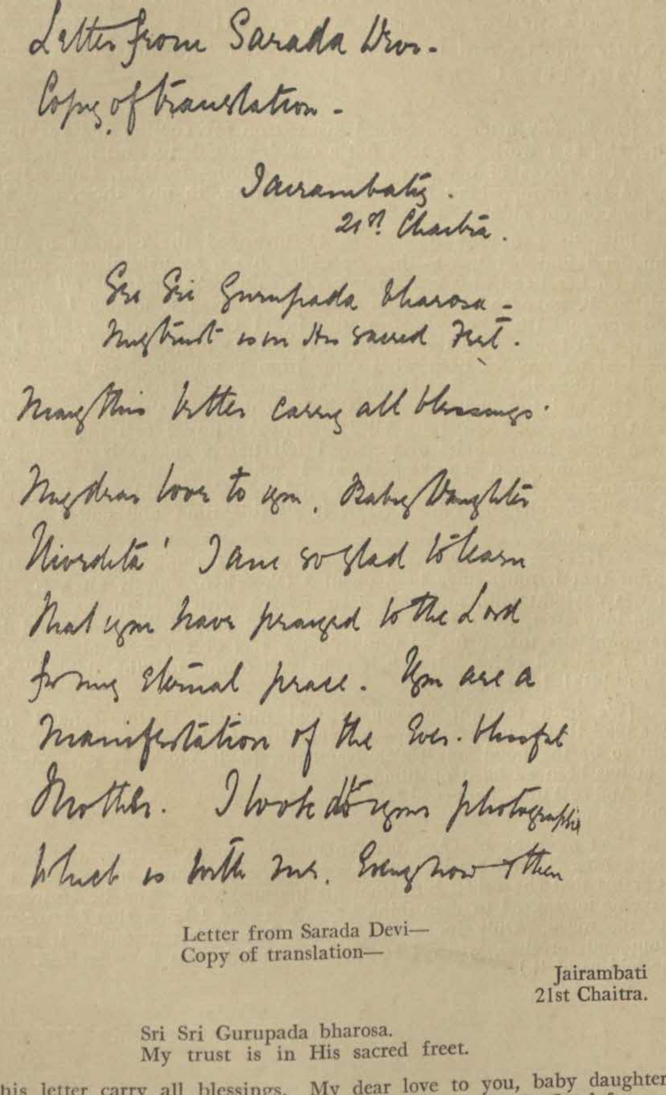
নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ১৯ জুলাই, ১৮৯৯-র চিঠিতে জানিয়েছিলেন, স্বামীজীকে তিনি 'গ্যাব্রিয়েল' মনে করেছেন, যিনি ঈশ্বরসান্নিধ্যে নিত্য অবস্থিত। গ্যাব্রিয়েল যেভাবে ঈশ্বরের বার্তা জ্যাকেরিয়াস, মেরী প্রভৃতির কাছে ঘোষণা করেছিলেন, স্বামীজীও সেইভাবে ঈশ্বর-বার্তা নিবেদিতাদির কাছে উদ্ঘাটন করেছেন।

নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন,

"I have called it (the Diary) "De Gabriete"—"of Gabriel"—referring to —"I Gabriel *that stand* (even now, as someone writes, while I speak) in the Presence of God".

Gabriel would seem to me a beautiful name for our Master—the Angel of strength and vision who brings to Humanity the grand white lilies of Purity".

(গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)


Letter from Sarada Devi-
Copy of translation-
Jairambaty.
21st Chaitra.
Sri Sri Gurupada bharosa-
My trust is on His sacred Feet.
May this letter carry all blessings.
My dear love to you, Baby Daughter
Nivedita! I am so glad to learn
that you have prayed to the Lord
for my eternal peace. You are a
manifestation of the Ever-blissful
Mother. I look at your photographs
which is with me, every now & then

Letter from Sarada Devi—
Copy of translation—

Jairambati
21st Chaitra.

Sri Sri Gurupada bharosa.
My trust is in His sacred freet.

May this letter carry all blessings. My dear love to you, baby daughter Nivedita! I am so glad to learn that you have prayed to the Lord for my eternal peace. You are manifestation of the ever blissful Mother. I look at your photograph which is with me, every now and then. . . . .

নিবেদিতাকে সারদাদেবী একটি চিঠি লেখেন, যার ইংরাজী অনুবাদ করে (সম্ভবতঃ মূল বাংলা চিঠিসুদ্ধ) স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দেন। শ্রীমার কাছ থেকে চিঠি পাবার সৌভাগ্যে নিবেদিতা এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে, ঐ চিঠির নকল করে অন্তরঙ্গমহলে পাঠিয়ে দেন। তারই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত হল।—২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১১ নভেম্বর, ১৮৯৯-এর এই চিঠি থেকে দেখা যায়, স্বামীজী কিভাবে নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুলের উপর তাঁর দায়ভার অর্পণ করেছেন। এই পত্র দেখিয়ে দেয়, নিবেদিতা, স্বামীজীর সাধারণ একজন শিষ্যা নন, কর্মভার বহনের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত শিষ্যা।—গ্রন্থের ৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[On Sunday afternoon Swami insisted on my coming and packing] with him, and as I worked he took out a couple of silk turbans to give the girls. Then two pieces of cotton cloth—gerrua colour—for Mrs. Bull. He called me to my room, where Mrs. Bull sat writing, to give these, and left the turbans on one side.

First he shut the door—then he arranged the cloth as a skirt and chudder round her waist—then he called her a sannyasini and putting one hand on her head and one on mine he said: "I give you *all* that Ramakrishna P. gave to me. What came to us from a woman I give to you two women. Do what you can with it. I cannot trust myself. I do not know what I might do tomorrow and ruin the work. Women's hands will be the best anyway to hold what came from a woman—from Mother. Who and what She is, I do not know, I have never seen Her, but Ramakrishna P. saw Her and touched Her, like this (touching my sleeve). She may be a great disembodied spirit for all I know. Anyway I cast the load on you. I am going away to be at peace. I felt nearly mad this morning, and I was thinking and thinking what I could do, when I went to my room to sleep before lunch. And then I thought of this and I am so glad. It is like a release. I have borne it all this time, and now I have given it up. . . . . .

Were these exactly the words he used? I think they were. It seems to me that it must have been about 3 O'clock or shortly after, for I think it was daylight still, and then I went back with him to the packing and long long after, as it seems now, he seemed surprised when I told him to go downstairs to the fire—I could do the rest of the work alone—and went like a relieved child. Just before he called me to "the Robing" he had said: "Oh! I feel so gay!"

[We both thought of you at that moment Darling—and I for one was glad that you were away—for your life is his personality—and you are still to be the good star which could not be if you were entangled in all that has been so hard on him.]

And so Yum—happened "the event of my life"—the great turning point—and the dear St. Sara's.

Next morning he came over to Ridgely and Mrs. Leggette managed to throw Mrs. R. Smith with him, knowing that [she was hungry for a word. It seems that she asked him what his message was. And he answered: "I have no message. I used to think I had, but now I know that I have nothing for the world. Only for myself, I must break this dream". It sounds so limp and forceless, when I repeat it! And it was so great and stern as he told us of it.]

[এই বিষয়বস্তুর প্রতিলিপি পরের পৃষ্ঠায়—]

with him. & so I watched he took out a couple of silk turbans to give the girls. Then two pieces of cotton cloth — Gerua color — for Mrs Bull. He called me to dining room, where Mrs Bull sat waiting to give these. & left the turbans on one side.

First he shut the door. then he arranged the cloth as a skirt & shoulder round her waist. then he called her a Sannyasini & putting one hand on her head & one on mine he said "I give you all that Ramakrishna P. gave to me. What came to me from a Woman I give to you two women. Do what you can with it. I cannot trust myself. I do not know what I might do tomorrow & ruin the work. Woman's hands will be the best anyway. Behold what came from a Woman — from Mother. Who & what She is, I do not know. I have never seen Her. but Ramkr. P. saw Her & touched Her — like this (touching my sleeve). She may be a great disembodied Spirit for all I know.
Anyway I cast the load on you — I am going away to be at peace.
I felt nearly mad this morning. I was thinking & thinking what I could do — when I went to my room to sleep before lunch — And then I thought of this

& I was so glad. It is like a miracle.
I have borne it all this time - & now
I have given it up - - - - - "

Were these exactly the words he used?
I think they were - It seems to me that
it must have been about 3 o'clock
or shortly after - for I think it was
daylight still. & then I went back with
him to the packing. Long long after - at
dinner now he seemed surprised to see
I told him to go downstairs to the fire -
I could do the rest of the work alone -?
Went like a relieved child - And before
he called me to "the Rotunda" he had
said " Oh I feel so gay!" -
[We both thought of you at that moment.
Darling - & for me I was glad that
you were away - for your life is his
personality - & you are still like the Good
Star - which could not be if you were
entangled in all that has been so hard
on him.]
And so, Yum - happened 'the event of
my life' - the great turning - point -
And the dear St. Sara.
That morning he came over to Ridgely
& Violet Leggett managed to throw Mrs
R Smith with him - knowing that

স্বামীজীর 'বিশ্বস্ত' জে জে গুডউইনের একটি চিঠির দুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা গোটা চিঠিটি এইসঙ্গে মুদ্রিত করা হল। প্রতিলিপি থেকে পাঠক দেখবেন—স্বামীজীকে গুডউইন কী চোখে দেখতেন ("স্বামীজী আমার কাছে খ্রীস্টের রূপ নিয়ে বর্তমান")। গুডউইন কেন বিবেকানন্দের সেবায় জীবনদান করেছিলেন, এর থেকেই বোঝা যায়।—গ্রন্থের ২১-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Sharon, Mass
Sunday

Dear Miss McLeod,

I thought perhaps you would like to know that it is decided that I go to England by the Teutonic on Wednesday. Mrs. Bull cannot go. It was hardly possible, but she wants the Swami and Mr. Sturdy to come over here. I don't think I shall be in New York until Wednesday morning, by the [. . . . .] between the Swami and myself, but, at the same time, I should be laid (bow?) down indeed if it were not an inspiration for good to me. Shall I shock you very much if I tell you that the Swami takes the place of Christ to me? I think not, for you will understand what I mean.

If it will be convenient—or rather not too inconvenient—I will call upon you at 9 O'clock on Wednesday morning.

Mrs. Bull wishes me to send her kind regards with my own. She intends to write you herself, I believe.

Very truly yours

J. J. Goodwin.

The enclosed reference to the Swami and Prof. Deussen is very Good news—from Deussen.

আর একটি পৃষ্ঠায় লেখা—

This is from a letter from Swami Vivekananda to Fox—"I will be very glad to see you, and am really anxious to see you before you start for U. S. To-morrow Prof. Deussen, myself, Miss Muller and some of her friends are going to have a little picnic at Hampton Court Castle Hotel at 12-30. You are very welcome. There you will meet us all. Deussen and we have become great friends; we travelled together from Germany to London."

[এই বিষয়বস্তুর প্রতিলিপি পরের পৃষ্ঠায়—]

between the Swami & myself,
but, at the same time,
it I should be low
down indeed if it were
not an inspiration for
good to me. Shall I
shock you very much
if I tell you that the
Swami takes the place
of Christ to me! I think
not, for you will understand
what I mean.

If it will be convenient
— or rather not too
inconvenient — I will
call upon you at
9 o'clock on Wednesday
morning.

Mrs Bull wishes me
to send her kind regards,
with my own. She intend
to write you herself, I believe.

Very truly yours,

J. J. Goodwin.

The enclosed reference to the
Swami & Prof Deussen —
is very good news — For
Deussen.

স্বামীজীর শেষ সপ্তাহ সম্বন্ধে নিবেদিতার দিনলিপি

স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্ববর্তী কয়েকটি দিনের বর্ণনা নিবেদিতা তাঁর প্রকাশিত লেখায় নানাভাবে করেছেন দেখতে পাই। গ্রন্থমধ্যে (১০২-১১০ পৃষ্ঠায়) পাঠক দেখবেন, মিস ম্যাকলাউডকে ও মিসেস হ্যামণ্ডকে লেখা অনেকগুলি পত্রে নানা সংবাদ দিয়েছেন। ৭ অগস্ট, ১৯০২ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা যে-পত্রে সর্বাধিক সংবাদ আছে, সেটিকে গ্রন্থের ধারাবাহিক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথকভাবে এখানে প্রতিলিপিসুদ্ধ উপস্থিত করলাম, কারণ আমাদের বিশ্বাস, বিবেকানন্দ-জীবনীর পক্ষে পত্রটি বিশেষ মূল্যবান। পত্রমধ্যে লিখিত সংবাদের অনেকগুলি পরবর্তীকালে স্বামীজীর জীবনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে লিখিত বলে এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক। পত্রমধ্যে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের চাপা ইঙ্গিত আছে, যা পরে, নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে আমরা ব্যাখ্যা করব।

দু'একটি ক্ষেত্রে আমরা পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইনি।

পত্রমধ্যে 'Caste' এর উপরে একটি পুরস্কার-প্রাপ্তির কথা আছে। এর পশ্চাৎপট হল—যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু যদুনাথ মজুমদার, এম এ, বি এল—যিনি 'হিন্দু পত্রিকা' ও 'ব্রহ্মচারিণে'র সম্পাদকও ছিলেন—'জাতি' সম্বন্ধে একটি সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। 'জাতি'র পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনি একশত টাকা করে দুটি পুরস্কার দেবেন বলেন। সারা ভারত থেকে বহু ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। বিচারক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম এ', 'বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এটর্নী-অ্যাট-ল' এবং বাবু যদুনাথ মজুমদার। 'জাতি'র পক্ষে নিবেদিতার প্রবন্ধ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়, কিন্তু 'জাতি'র বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখে রাজসাহীর 'বাবু রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বি এ', পুরস্কার পেলেও তাঁর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়নি; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত নির্মলানন্দ ভারতীর রচনাকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে তথ্যগুলি Vivekananda in India Newspapers নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। সেখানে এ বিষয়ে আরও কিছু সংবাদ আছে।

Now for all the questions you ask. tho' most of them must be already answered in other letters. Still, I cannot tell.

1. To go out as He went is held to be the triumphant way - the Saviour's death. The whole country has thrilled to it. It was on the Dark Night of Holy Week too, wh. means

that the body is not necessarily maimed, unless He will. He had never dreaded it even while in it.

2. I think He continuously desired - not the minute, the hour, the day - but I think on Wednesday morning He knew that I wd. never see Him again. Remember the "JESUS washed the feet of His disciples" & a pained young smile He gave me without a single word, when I told Him it wd. be 8 or 10 days before I cd. have the honour next brought for Him & the Godfather to meet.

3. He left everything in order. On Sunday he told me that the lawsuit with the family that had been hanging over him for 3 years was compromised by them voluntarily in his favour - & he was satisfied at last! It was the same with everything. Here I am on my feet. He blessed the house & the work-tree. Everything. No loose ends of Karma. No Karma at all. Three wishes. Japan.

wh. he expressed the very day he went. "I want to do something for Japan. A nightly worship of the Mother - wh. was carried out by the men last Saturday. And Mr Watt. Wh. will surely bring them together somewhere in the universe.

And now let me give you a drawing of that last week. First telling you that it is my infinite joy that when my wings came "fit to act" I sent it straight to him with a little note & I think that was his assurance that I was the same "little Margot" as ever. "Dear little Margot" he called me that Sunday

June 26.
Thursday night late. Reached Calcutta.
Sw. Saradā? brought us in & gave me a little mat as a gift from the Math & a large deer skin mat from Swamiji (it is a meditation rug (). "Is He then glad I am come?" I asked — in surprise... "Oh yes!" said S.

June 28.
Saturday morning. I was going to the Math but a note came early, saying He was coming to Town. He came at 9. Went over the whole house. Explaining everything. Examined everything. Sat down on His own rug here. Played with some Lucknow figures I had brought. Expressed delight with the microscope & magic lantern

& camera. Told me to bring Him the microscope next day.
Asked me what I planned. I said University Settlement work rather than School. He said "Right". As He went, I said
"Swami you must come back. & bless the work". & He said
"I am always blessing you!"
As the door closed... I said to Bert "all the old sweetness. Bert!"

June 29.
Sunday. Went early. reached Math 8 or 8.30. Stayed till 5. He talked

brings out a good deal. Esp. about Sugar. He said He loved that boy! Such greatness & goodness He had never seen! — That was the Morning. In the afternoon, He grew very worn, being tired, & I cried bitterly. Then He gave me a beautiful blessing. holding my head & blessing me twice — in that caressing way. I only asked Him to tell me when He doubted or disapproved. not to make up His mind apart from me.

Oh I am sure He will!

That day, I think, I must have told you. He said a great tapasya was coming over Him. Had I not been there... at near noon He w'd still have been in the Chapel. He felt that Death was drawing near. Not these words. He spoke Greek. Don't you remember? "That's true"! But still I never dreamt of less than 3 or 4 years. He was wildly interested in experiments on the making of bread [illegible]

I brought the microscope away.

July 3rd
Wednesday morning. I went again. But was ill. I told you about that

July 3rd
Thursday. Swami S: brought me a whole

taking of brown bread that He sent me. & I ate every crumb of it finishing it on Friday Evening.

July 4th:

Friday Evening. At ½ past 6 or so I c'd not resist the longing to go to the roof & be alone. I left Bart for an hour. On the roof I f'd a corner where, quite invisible I c'd always meditate. I planned to do it so much always - & sat down there. for the strange sweetness that ~~[illegible]~~ was irresistible

Then my mind w'd fly to [illegible] though I had taken another subject..

I know now that that last meditation Samadhi must have held a benediction for us He left. He called us to meditate. Everything about Him did that at the end. And He faced the North west as He sat.

And so came the end. He went out - as one drops a worn garment without a struggle. "Conqueror of Wrath" - But He has not left us for my part, He has been

with me far far more since that light than for 2 years before - & I trust & pray that this may not cease to be. For oh Lynn I have only one desire really, & that is to act so that, were He back again in the toils of human ignorance He wd have no right to feel anxiety or distress. But I do not know - I feel so much power inside - But I do nothing. Tell me that He may indeed be pleased with us all! One must so live that one justifies Him

in singing "A great man has to make his workers & then leave them. If he stays in the same place with them, he cramps them!"

As for you dear Lynn - I feel sure that peace will come to you in the thought that you have indeed accomplished that for which you were born. I trust you will stay with us to blossom & gather the harvest - for a little while. But if not, if you go to Him, one must be ready to give you up. Only tell Him that

Now for all the questions you ask, tho' most of them must be already answered in other letters. Still, I cannot tell.

1. To go just as He went is held to be *the* triumphant way—the Sannyasi death. The whole country has thrilled to it. It was on the Dark Night of Kali too, wh. means

that the body is not necessarily resumed unless He will. He had risen beyond it, even while in it.

2. I think He certainly knew, not the minute, the hour, the day—but I think on Wednesday morning He knew that I wd never see Him again. Remember His "JESUS washed the *feet* of *His* disciples!" and a pained sorry smile He gave me without a single word, when I told Him it wd be 8 or 10 days before I cd have the house neat enough for Him and the god father (Ramesh Ch. Dutt) to meet.

3. He left every thing in order. On Sunday He told me that the lawsuit with the family that had been hanging over Him for 3 years, was compromised by them voluntarily in His favour—and He was satisfied at last! It was the same with everythings. Here I am, on my feet. He blessed the house and the work and me. Everything. No loose ends of Karma. No Karma at all. Three wishes—Japan,

wh. he expressed the very day He went—"I want to do something for Japan". A night's worship of the Mother—wh. was carried out by the men last Saturday. And Mr. Dutt, wh. will surely bringing them together somewhere in the Universe.

And now let me give you a diary of that last week, first telling you that it is my infinite joy that when my prize came for 'Caste', I sent it straight to Him with a little note, and I think that was His assurance that I was the same "little Margot" as ever. "Our little Margot" He called me that Sunday.

June 26.

Thursday night late. Reached Calcutta. Sw. Sarada. brought us in and gave me a little mat as a gift from the Math and a large deerskin mat from Swamiji (it is a meditation. . . . . .)! "Is He then glad I am come?" I asked in surprise. "Oh *Yes*!" said S.

June 28.

Saturday morning. I was going to the Math, but a note came early, to say He was coming to Town. He came at 9. Went over the *whole* house explaining everything examined everything. Sat down on His own

[. . . . .] here, played with some Lucknow figures I had brought. Expressed *delight* with the microscope and magic lantern

and camera and told me to bring Him the microscope next day, asked me what I planned, I said University. (?) Settle [. . . .] work rather than school. He said "right", as He went. I said, "Swami, you must come back, and bless the work", and He said "I am *always* blessing you!" As the door closed, I said to Bet, "all the old sweetness Bit!"

June 29.

Sunday. Went early. Reached Math 8 or 8.30. stayed till 5. We talked

things out a good deal, esp, about Nigu (okakura). He said He "loved that boy! Such greatness and goodness He had never seen!" *That* was the blessing. In the afternoon, He grew very cross, being tired, and I cried bitterly. Then He gave me a beautiful blessing—holding my head and blessing me twice—in that caressing way. I only asked Him to tell *me* when He doubted or disapproved, not to make up His mind apart from me. Oh I am *sure* He will!

That day, I think I must have told you, He said a great topasya was coming over Him. Had I not been there, at near room He wd still have been in the Chapel. He felt that Death was drawing near and at these words, the greko cried, don't you remember? "That's true!" But still I never dreamt of less than 3 or 4 years. He was wildly interested in experiments, on the making of bread.

I brought the microscope away.

July 2nd

Wednesday morning. I went again, tho' but was ill. I told you about that.

July 3rd

Thursday. Swami Sa. brought me a whole

baking of brown bread that He sent me and I ate every crumb of it, finishing it on Friday evening.

July 4th

Friday evening. At ½ past 6 or so I cd not resist the longing to go to the roof and be alone. I left but for an hour. On the roof I fd a corner where, quite invisible I cd always meditate. I planned to do it so much always and sat down there for the strange sweetness that drew one was irresistible.

Then mind *wd* fly to "Siva Guru", though I had taken another subject. I know now that that last meditation and Samadhi must have held a

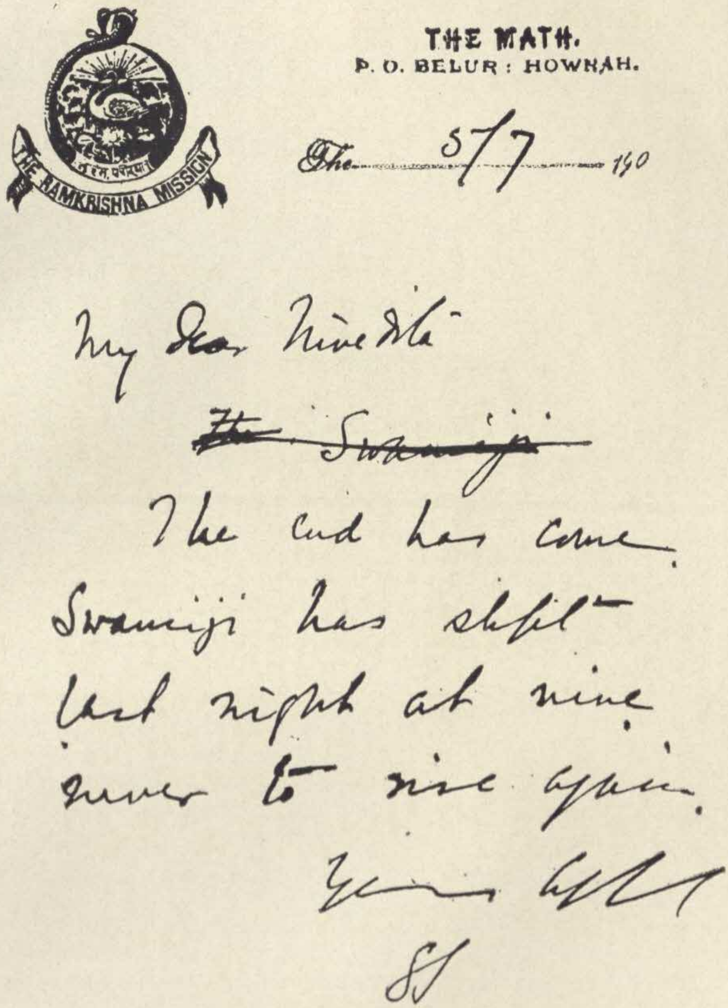
benediction for us He left. He called us to meditate. Everything about Him did that at the end. And He faced the North West as He sat.

And so came the end. He went out, as one drops a loose garment. Without a struggle. "Conqueror of Death." But He has *not* left us for my part, He has been

with me far far more since that night than for 2 years before and I trust and pray that this may not cease to be, for oh Yum I have only one desire really and that is to act so that, were He back again in the toils of human ignorance He wd have no right to feel anxiety or distress. But I do not know—I feel so much power inside—But I *do* nothing. Bless me that He may indeed be pleased with us all! One *must* so live that one justifies Him

in saying "a great man has to make his workers and then leave them. If he stays in the same place with them, he cramps them!"

As for you dear Yum—I feel sure that peace will come to you in the thought that you have indeed accomplished that for which you were born. I trust you will stay with us to bless and gather the harvest, for a little while. But if not, if you go to Him, one must be ready to give you up, only tell Him that [His blessing is needed still—that one is faithful]



THE MATH.
P. O. BELUR : HOWRAH.

The 5/7 190

My dear Nivedita

~~The Swamiji~~

The end has come.
Swamiji has slept
last night at nine
never to rise again.

Yours affly

SS

নিবেদিতার জীবনে 'যুগান্তকারী' এই পত্রটি। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ এই চিঠিতে স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতাকে জানিয়েছিলেন। চিঠি পাবার পরে নিবেদিতার অনুভূতির রূপ বর্ণনাতীত তো নিশ্চয়ই, আমাদের পক্ষে কল্পনাতীতও। সারদানন্দ লিখেছিলেন—

My dear Nivedita,

The end has come, Swamiji has slept last night at nine, never to rise again.

Yours affy.
S.S

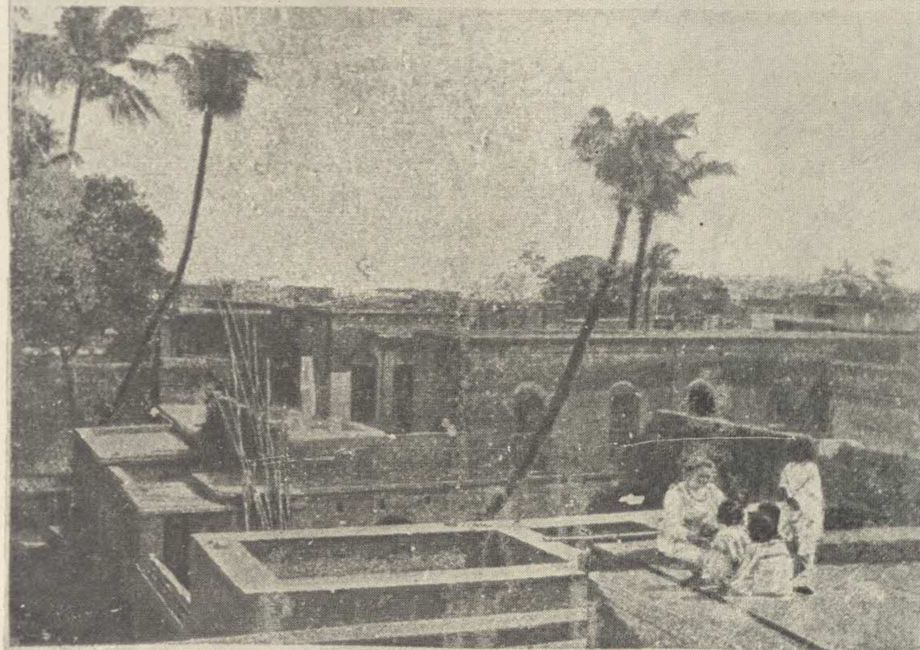
THE EMPRESS



"THE OTHER ARCHITECTURAL BEAUTY OF MY HOME IS ITS ROOF.

LIFE IN THE NATIVE QUARTER.

ভারতে আসার অব্যবহিত পরেই নিবেদিতা An English Woman এই ছদ্মনামে মার্চ, ১৮৯৮-এ কলকাতার বিখ্যাত সচিত্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাময়িক পত্রিকা 'এমপ্রেস্'-এ Life in the Native Quarter নামে প্রবন্ধ লেখেন। এইসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, পূর্ব থেকেই সাংবাদিকতা তিনি করছেন। প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি ছবি ছিল, তার তিনটি ঐ পত্রিকা থেকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। নিবেদিতার কলকাতায় আদি বাসস্থান এবং একবোরে প্রথম দিকের ছাত্রীদের ছবি এখানে পাচ্ছি, যা অন্য কোথাও আমরা পাইনি।



"AWAY IN ALL DIRECTIONS STRETCH SUCH HOUSETOPS."

et us not forget the radiant purity of this upper air and the large minousness of moon and stars.

To the Hindu woman, cooped up for the most part in her zenana

supply them, and ...
ing thousand ...
we hold it or not, shall
Almighty ... who
not? But maybe ...
to sing a song, and thus
for a whole ...
ness and power ...
of these beggars, and
all that most ...
ballad councils of Ram ...
Bauls of Bengal, had ...
just such sources as
is always supposed to
name in the last coup...
seen at once how usefu
would prove to the call
of a particular song ...
a tiny pinch of ...
the smallest of ...
friend, but ...
when the claims are ...
no stigma in the mind ...
ever, attaching to the ...
"Mother, give me food,"
"the starving man has
his neighbour's bread," would rouse no responsive thril
where something very like it is taken as a fundament

study. Roughly, they seem to correspond to the Celtic notion of "wishing" people into illness or bad fortune or evil doing. No doubt they are extremely ancient, but the curious thing is that they presuppose



In the [illegible] Yard.

courts, with plants grouped against their ste
in rich men's houses, must be as beautiful a
Pompeii. Mine is no floor of pure white mar

I discovered th
that I took in o
my return in the
that it was the
sky and the st
of coolness and
and a temple of
ground of merr
sundial, who wo
a courtyard?

The other
home is its root.
oneself in Syri
stretch such h
green of trees a
by colonnades a
stone staircase
beauty of Laho
flats of Bengal.
of breadth and
tufts, and the
at dawn or su
one can feel al
verse. Down b
the cosy rural
England! And

"স্বামীর সঙ্গে বাল্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ তিনি। স্বামীকে যখন সানন্দে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে অনুমতি দিলেন, তখন স্বামীর গভীর বন্ধুতা পেলেন ও তাঁর শিষ্যারূপে গৃহীত হলেন। স্বামী তাঁকে দিন দিন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললেন। অপরপক্ষে পতি-সান্নিধ্যে অতিবাহিত বৎসরগুলিতে ইনি স্বামীর পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন, আমার বাসনাকে শুদ্ধ ক'রে তোলো, যাতে চিরদিন তোমার যোগ্য হতে পারি। দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।"°

সেই 'বহু সন্তানের' এক শ্রেষ্ঠ সন্তান ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সুগভীর স্নেহসম্পর্কের রূপ বর্ণনার অসাধ্য। বিদেশিনী 'খুকী'টির জন্য সারদাদেবীর মাতৃহৃদয় সদাই উচ্ছলিত থাকত। অপরদিকে নিবেদিতার কাছে তিনি চিরজননী মেরী-মাতার দেহধারিণী প্রতিনিধি। শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে শান্তিসায়রে অবগাহন করে নিবেদিতার জ্বালাময় সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ জীবন পরমের আনন্দস্পর্শ পেত। নিবেদিতা তাঁর ধাবমান জীবনের নানা পর্যায় থেকে বারবার ফিরে আসতেন শ্রীমায়ের কাছে—আলোকের, আনন্দের ও শান্তির সন্ধানে। নিবেদিতার নানা রচনায় ও বহু চিঠিতে সেই প্রাপ্তি-সঙ্গীত বিকীর্ণ হয়ে আছে।

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ ১৭ মার্চ, ১৮৯৮। 'ঐ বৎসর শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আগমন করিয়া বাগবাজার ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।'

শ্রীমায়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণের জীবনে সুগভীর হয়। ভারতীয় নারীদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীরূপে নিন্দা ও কুৎসা তাঁরা শুনে এসেছেন, এই একটি সাক্ষাৎকার বহু দিনের সেই অন্ধকারের উপর বিপুল আলোকবর্ষণের তুল্য। মিসেস বুলের মানসিক প্রতিক্রিয়া ম্যাক্সমুলারকে লেখা চিঠি থেকে আগেই দেখা গেছে। কিছু পরেই নিবেদিতার লেখা চিঠি থেকে তাঁর প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখব।

নিবেদিতার জীবনীকার মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, এই দিনটি সম্বন্ধে মার্গারেট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'Day of days ।' "বাস্তবিক শ্রীমায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতের এই দিনটি প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করিত।"

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎ ১২ মে, ১৯১১। প্রথম সাক্ষাৎ ও এই শেষ সাক্ষাতের মধ্যে ১৩ বৎসরের অল্পকিছু বেশী সময়ের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে শ্রীমায়ের সঙ্গে একত্র বাস ও অগণিত সাক্ষাৎকার ঘটেছে নিবেদিতার। নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব উল্লেখ পাই সেগুলি তুলে

° ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে পাই—স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে মিসেস বুল শ্রীমার সেবায় নিয়মিত অর্থসাহায্য করেছেন। তিনি মাসে ৬০, টাকা করে দিতেন।

ধরছি। এখানে বলা দরকার, শ্রীমায়ের আরও বহু উল্লেখ নিবেদিতার পত্রাবলীতে আছে, যার সবগুলি চয়ন করা সম্ভব নয়।

নিবেদিতার পত্রাবলীতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা

[নিবেদিতার যেসব চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে ১৮৯৮-এর ২২ মে তারিখে নেল হ্যামন্ডকে লেখা চিঠিতেই শ্রীমায়ের প্রথম উল্লেখ পাই। এই চিঠি লেখার আগে শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতাদির প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী আর একটি সাক্ষাতের সংবাদ পাই। বর্তমান বেলুড় মঠের নির্মাণকাজ শুরু হলে শ্রীমাকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠে নিয়ে আসা হয় নৌকা করে, ১৮৯৮-এর ৯ই এপ্রিল। বিকালে ফিরে যাবার আগে তিনি সেখান থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে বর্তমান মঠের জমিতে পদার্পণ করলে 'নিবেদিতা, ধীরামাতা ও জয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্গে করিয়া সমস্ত জমি দেখাইয়া দেন।']

২২ মে, ১৮৯৮, নেল হ্যামন্ডকে

অনেকবার ভেবেছি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা নাম্নী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। শুরুতে বলি, তিনি পঞ্চাশ-পেরোয়নি এমন হিন্দু বিধবার মত সাদা কাপড় পরেন।[৪] পরার ধরন : কাপড় প্রথমত কোমরে স্কার্টের আকারে জড়ানো থাকে, তারপরে শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে—অনেকটা nun-দের অবগুণ্ঠনের মত। পুরুষ মানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটা সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে নামিয়ে দেন; সরাসরি কথা বলেন না; বেশী বয়সী কোনো মহিলাকে মৃদু স্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন, সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এই জন্য মনে হয় আচার্যদেব (স্বামীজী) কখনো এঁর মুখ দেখেননি। এই সঙ্গে কল্পনায় দেখে নাও, ইনি সব সময়ে মেঝেয় ছোট একটি মাদুরে বসে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হচ্ছে না নিশ্চয়; কিন্তু এঁকে একটু ভালভাবে জানলেই

---

[৪] এখানে নিবেদিতা সম্ভবতঃ শ্রীমায়ের সরু লাল-পাড় সাদা শাড়ির কথা বলতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে সারদাদেবী যখন আয়তিচিহ্ন হাতের বালা খুলতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে তাঁকে বলেন, তিনি সতত সান্নিধ্যেই রয়েছেন, দেহের মৃত্যু কোনো ব্যবধানই সৃষ্টি করেনি। এই দর্শনের জন্য সারদাদেবী হাতের বালা বর্জন করেননি এবং সরু লাল-পাড়ের শাদা থান পরতেন। বৈধব্যের সম্পূর্ণ শুভ্রবাস গ্রহণ না করার জন্য কিছু লোকনিন্দা হয় এবং কয়েকবার তিনি প্রচলিত বৈধব্য-বাস গ্রহণ করতে চান কিন্তু প্রতিবারই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান ও নিষেধ শোনেন। নিবেদিতা যখন শ্রীমায়ের কাপড় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন বোধ হয় তাঁকে ঐসব দর্শনাদির কথা না বলে সহজবোধ্য একটি কারণ বলে দেওয়া হয়; বাংলা দেশে অল্পবয়সী বিধবারা অনেক সময় সরু পাড় থান পরে থাকেন, শ্রীমাও তেমনই কিছু করেছেন, এই রকম বোঝানো হয়।

দেখা যাবে, সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এ'র চূড়ান্ত, প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে এ'র পরামর্শ সর্বদা নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা এ'র উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন। অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কি স্নিগ্ধ ভালবাসা এ'র! অথচ বালিকার মতই হাসি-খুশী। সেদিন যখন আমি জোর করে বললুম, স্বামীজীকে এখনি এখানে আমাদের মধ্যে আসতে হবে, নইলে আমরা চলে যাব—সেই শুনে তাঁর কী হাসি—তুমি যদি দেখতে! আচার্যদেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন,—এই খবর নিয়ে যে-সন্ন্যাসীটি এসেছিলেন, তিনি আমাকে সত্যই চলে যাবার জন্য জুতো পরতে উঠতে দেখে রীতিমত ভড়কে গেলেন, এবং দ্রুত স্বামীজীকে ডেকে আনতে ছুটলেন—তখন সারদার উচ্ছ্বসিত হাসির রূপ যদি দেখতে! আর কি যে মিষ্টি তিনি!—আমাকে বলেন, 'আমার খুকী।' আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল—সব কিছ সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। এ'দের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত! আমরা গেলেই ফল খেতে দেওয়া হয়; তাঁকেও দেওয়া হল—সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।[৫] খুব মজার, না! তাঁর মহিমার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত দিই—কলকাতায় তিনি যখন থাকেন, তখন সদাসর্বদা ১৪-১৫টি উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন, যাঁরা রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি করে সকলকে অস্থির করে মারতেন, যদিনা তিনি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতার দ্বারা এ'দের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে চলতেন! তাই বলে সত্যই আমি ঐসব মহিলার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কটাক্ষ করছি না, আমি নারীজাতির সাধারণ স্বভাব অনুমান করে এই কথা বলছি।

তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সর্বদা 'মা' বলে ডাকা হয়,—তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময়ে বলা হয় "শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী"; প্রতি-ব্যাপারে তাঁকে স্মরণে রাখা হয়, সব সময়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে দু'একজন হাজির থাকেন; তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক। তুমি যদি তাঁকে কিছু লেখো, আমি আনন্দ করে সেকথা তাঁকে জানাবো। একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হয়ে বাংলা করে তাঁকে Magnificat (যীশুজননী মেরীর গান) পড়ে শোনালেন—তিনি কী ভাবে না তা উপভোগ করলেন—দেখবার মতো! সত্যি করে বলতে গেলে, তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।

২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে

......কলকাতায় ফিরে গেলে সারদার কাছে থাকতে হবে, যতদিন না বাড়ি পাই।...

---

[৫] এই ঘটনায় উল্লসিত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮, মার্চে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন : "শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন!...ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?"

[নিবেদিতা স্বামীজীর দলবলের সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ১৮৯৮-এর মে মাসে; কলকাতায় ফিরে আসেন ১লা নভেম্বর। সারদাদেবী তখন ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে বাস করছিলেন। ঐ বাড়ির 'প্রবেশপথে দুইদিকে দুইটি ঘর ছিল; একটি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করিতেন; অপরটিতে নিবেদিতার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।'

নিবেদিতা সারদাদেবীর নিকট থাকার ইচ্ছা করেছিলেন এবং শ্রীমা সাদরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি তখন সমাজ-দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত বলে বোধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণকন্যার ঘরে ম্লেচ্ছ বিদেশিনীর স্থান!! তখনকার দৃষ্টিতে 'শ্রীমা বস্তুতঃ সমাজবিরোধী কাজ' করেছিলেন যার ফল 'সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মীয়স্বজনের উপর পর্যন্ত' বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা ছিল, কিছুকালের মধ্যেই নিবেদিতা তা অনুভব করেন। তাছাড়া নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্যও স্বতন্ত্র বাড়ির দরকার ছিল। বাগবাজারের মত গোঁড়া জায়গাতে বাড়ি পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক চেষ্টায় 'বোসপাড়া লেনেই শ্রীমার বাড়ির অপরদিকে, অতি নিকটে ১৬ নম্বর বাড়িটি পাওয়া গেল।' শ্রীমার বাড়িতে আট-দশ দিন কাটাবার পরে নিবেদিতা ঐ বাড়িতে চলে যান।

নিবেদিতা ক্রমে নিজগুণে ঐ রক্ষণশীল বাগবাজার পল্লীতে কন্যাবৎ গৃহীত হয়েছিলেন, সেবিষয়ে বিবরণ নিবেদিতার জীবনীসমূহে এবং অবলা বসুর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।]

৪ জানুয়ারী, ১৮৯৯, নেল হ্যামন্ডকে

তাঁরা (ওলি বুল ও ম্যাকলাউড) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর ফটো তোমাকে দেখাবেন। ইনি আমাদের 'নিজের মেয়ে' বলে দেখেন আর সদাসর্বদা আশীর্বাদ করেন। তাঁর ফটো কিন্তু সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।

[শ্রীমায়ের যেসব ফটোর উল্লেখ এখানে নিবেদিতা করেছেন, তার একটি অন্ততঃ ঐতিহাসিক ফটো, যেটি এখন সর্বত্র পূজিত হয়। এর আগে শ্রীমার কোন ছবি তোলা হয়নি, যদিও পরে তোলা অনেকগুলি ছবি পাওয়া যায়। মিসেস ওলি বুল প্রভৃতিরা প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা শ্রীমার দর্শন পান, একথা আগেই বলা হয়েছে, আবার মিসেস ওলি বুলই প্রথম শ্রীমার ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন, যেটি দেশ-বিদেশে প্রচারিত ও অর্চিত। এক্ষেত্রে মিসেস বুলের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ-যোগ্য। অতীব বিস্ময়ের কথা এই ছবি তোলার সময়ে শ্রীমার বয়স প'য়তাল্লিশ— শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত 'পূজিত' ছবিটিও প'য়তাল্লিশ বৎসরে তোলা। 'মায়ের কথা' (২য়) থেকে পাই শ্রীমা তাঁর এই ফটোটিকে 'ঠিক' বলে অনুমোদন করেছিলেন :

"(২৫-৯-১৯১০) জিজ্ঞাসা করিলাম—'মা এ ফটো কি ঠিক?'

"মা—হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম, যখন ছবি ওঠায়, তখন যোগীনের (স্বামী যোগানন্দ) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভাল নয়। যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে

তো ভাল থাকছি। সারা মেম (মিসেস ওলি বুল) এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।"

শ্রীমার এইকালীন ফটোর বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের (আমেরিকান সন্ন্যাসী; পূর্বাশ্রমে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জন ইয়েল) একটি প্রবন্ধে আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায় :

"ঈশারউড তাঁর গ্রন্থে (রামকৃষ্ণ-জীবনীতে) স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমায়ের একটি প্রতিকৃতি দিতে চেয়েছেন। স্থির হয় যে ঠাকুরের ৪৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে তোলা 'পূজিত' ছবির সমজাতীয় মাতাঠাকুরাণীর একটি ছবি দেওয়া হবে। শ্রীমায়ের ঐ ধরনের ছবিটির পরিচয় সন্ধানকালে কতকগুলি আকর্ষণীয় তথ্য পেলাম। এই ভঙ্গির ছবিটি কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার আবাসে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে অন্য দুটি ছবির সঙ্গে একই সময়ে একই অবস্থানে তোলা হয়। ঠাকুরের দেহান্তের ১২ বৎসর পরে শ্রীমায়ের এই ছবি তোলা হয় এবং এইটি তাঁর প্রথম ছবি। শ্রীমার প্রতিকৃতি আমেরিকায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে মিসেস ওলি বুল ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায় যে, একজন ইংরাজ ফটোগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পশুচর্মের আসন বিছিয়ে, সামনে কয়েকটি টব বসিয়ে দেওয়ার পরে শ্রীমা আসন গ্রহণ করেন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল তাঁর শাড়ি ঠিকঠাক গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেন। শ্রীমা ফটোগ্রাফারের সামনে বসতে খুবই লজ্জাবোধ করেন, কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাতে চান না, নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হলেও ক্যামেরাম্যান প্রথম ছবিটি তোলেন, যেটি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের 'নতদৃষ্টি চিত্র'। এরপর শ্রীমা সপ্রশ্ন আঁখি তোলেন—'শেষ হয়েছে কি?' ফটোগ্রাফার তখন দ্বিতীয় ছবি তোলেন—সেইটিই সুপরিচিত 'পূজিত' ফটো।...

ঐ সময়ে গৃহীত তৃতীয় ফটোটির বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত বক্তব্য আছে। এইটি হল শ্রীমা ও নিবেদিতার মুখোমুখি বসে থাকার ছবি। ভারতে থাকাকালে আমি কয়েকবার শুনেছি, এটি খাঁটি ছবি নয়, সাজানো ছবি; শ্রীমা ও নিবেদিতার ঐরকম একত্রে ফটো নাকি কখনো তোলা হয়নি; দুজনের দুটি ছবিকে কেটে মুখোমুখি জুড়ে কেউ হয়ত আবার নেগেটিভ তৈরী করে এই ছবি বানিয়েছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। এই তৃতীয় ছবিটির অস্তিত্ব ১২ বছর আগেও অজ্ঞাত ছিল। ১৯৫২ সালে ভারতে আসার পথে আমি ইংলন্ড ঘুরে আসি; সেখানে আমি আর্ল অব স্যান্ডউইচের বাড়িতে ছিলাম। এঁর প্রথম পত্নী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান বন্ধু লেগেটদের আত্মীয়। লর্ড স্যান্ডউইচের বাড়িতে দ্বিতীয় লেডী স্যান্ডউইচ শ্রীমা-নিবেদিতার এই ছবিটির পুরাতন একটি মূল প্রিন্ট দেখতে পান। ছবিটি তিনি আমাকে দেন ভারতে নিয়ে যাবার জন্য, এবং বলেন 'তিনি অন্ততঃ আগে এই ছবিটি দেখেননি, সম্ভবতঃ এটি সুপরিচিত ছবি নয়।'—'সুপরিচিত নয়'—বললে অল্পই বলা হয়। বেলুড় মঠে পৌঁছে ছবিটি স্বামী শঙ্করানন্দকে দিলে তিনি রীতিমত অবাক এবং অতীব উল্লসিত! সহর্ষে বললেন, 'এ ছবি আগে কখনো

দেখিনি তো! এমন কোনো ফটো আছে জানতামই না!' বর্তমানে এই ছবিটির যেসব প্রিন্ট দেখা যায়, সে সবগুলিই লর্ড স্যান্ডউইচের বাড়ি থেকে পাওয়া মূল ছবির পুনর্মুদ্রণ।"

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে পাই—ঐ ফটোগ্রাফারের নাম হ্যারিংটন। "ফটো তুলিবার সময়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। পদাঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া একখানি ফটো তোলার প্রয়োজন মিসেস বুল অনুভব করেন, দেশে নিয়া পূজা করিবেন বলিয়া। মাকে সেইকথা জানাইয়া, অনেক বলিয়া কহিয়া দ্বিতীয়বার ফটো তুলাইতে সম্মত করানো হয়। গোলাপ মা-র মুখে এই ঘটনা অনেকেই শুনিয়াছেন—তিনি মার সঙ্গে ছিলেন।"

ফটো তিনটি সম্বন্ধে নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই (মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডকে লেখা, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৯)—

'By next week's post I send to London 10 photographs of her (mother). The two negatives are to be 40 Rupees and expenses 3·4—total 43·4 and my proof and negative cost nothing. So unless you write to the contrary we shall keep the 3 negatives here.'

এখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রীমার সঙ্গে নিবেদিতার ছবি বাড়তি তোলা হয়েছিল, এবং তুলতে কোনো খরচ হয়নি।]

১৫ জানুয়ারী, ১৮৯৯, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডকে

মাতাঠাকুরাণী জানালেন, স্বামীজীর কাছে বৈদ্যনাথে তাঁর এক সম্পর্কের মাসী আছেন। স্বামীজী যে পরে আবার পাশ্চাত্ত্যে যাবেন, এ বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, স্বামীজীর আরও অনেক কিছু করার আছে। গত কাল মা'র জন্মদিন গেছে, তোমরা মনে হয় তা আমাদের টেলিগ্রাম থেকে জেনেছো।

মা হঠাৎ আমাকে গত রাত্রে বললেন, আমি যদি এলাহাবাদে যাই, তিনিও সঙ্গে যাবেন। তিনি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকতে চান! আমি জানতাম না যে, তিনি এলাহাবাদের ব্যাপারটা জানেন। ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর কথার পিছনে মিসেস বুল আছেন কি—কি জানি! তুমিই বলতে পারবে। যাই হোক জিনিসটি সুন্দর। পরের সপ্তাহের ডাকে লণ্ডনে তাঁর দশটি ফটোগ্রাফ পাঠাবো।......

৩ মার্চ, ১৮৯৯, নেল হ্যামণ্ডকে

ভালো কথা, মাতাঠাকুরাণীর কাছে তোমার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। উক্ত এক সন্ধ্যায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে বসেছিলেন, সেখানে তোমার চিঠি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম। তাঁরা প্রায়ই তৃপ্তিতে 'আহা!'—বলে উঠছিলেন, আর আনন্দ প্রকাশ করে নিজেদের ডানদিকের কাঁধে চুমু খাচ্ছিলেন। (অর্থাৎ আনন্দে ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে, কাঁধ একটু উঁচু করে কাঁধে মুখ ঠেকাচ্ছিলেন, যা নিবেদিতার কাছে নিজ কাঁধে

চুমু খাওয়ার মত মনে হচ্ছিল)। শুধু অমন একটি চিঠি লিখে তুমি তাঁদের মন কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছ তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।......

শ্রীমাকে তোমার জন্য কিছু বলতে বললাম। তিনি তাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদ জানালেন—তোমাকে নিজের সত্যিকারের মেয়ের মত তিনি দেখেন। এর বেশী তুমি কিছু আশা করো না যেন। কারণ অভিজ্ঞতা ও বাস্তববোধের বাইরে, চিন্তারাজ্যে, এই মহিলাদের পরিধি ব্যাপ্ত নয়। অনুভূতিরাজ্যেই এঁদের যত শক্তি। বুঝতেই পারছ, এঁরা এমন কোনো শিক্ষা পাননি যার দ্বারা নিজেদের চিন্তাকে অপরিচিতের কাছে আবেদনযোগ্য করে তুলবার মত করে গঠন করতে পারেন।

কিন্তু অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য। জেনে রেখো, তাঁর ঐ ফটো তোলার অর্থ—এক্ষেত্রে তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোনো আত্মসচেতনতা তাঁর ছিল না—এক বিন্দুও নয়। স্বামীজী কিংবা এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে (বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ!) অবগুণ্ঠনহীন দেখেন নি।[৬] পুরুষেরা তাঁকে পূজা করবার জন্য অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্ত, কিংবা কখনো তার ভিতর পর্যন্ত এলেই অবিলম্বে তাঁর মুখের উপর লম্বা ঘোমটা নেমে আসে, যদিও কখনো কখনো প্রান্তে একটু ফাঁক থাকে, যাতে নিম্নচোখে তাকানো যায়। এই নিয়ে আমি এত মজা করেছি যে, পুরুষেরা বাইরে অপেক্ষা করার কালে সারাক্ষণ তিনি হেসে লুটোপুটি কিন্তু কোনো চাকর কিংবা সন্ন্যাসী যেমনি সিঁড়ির উপরে উঠে এসে চেঁচিয়ে জানালেন—অমুকচন্দ্র অমুক শ্রীমাকে প্রণাম জানাতে আসছেন—অমনি সমস্ত ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে ঘনীভূত, সমস্ত কথা স্তব্ধ, হাত-পাখার নাড়াচাড়াও বন্ধ, ঘোমটা মুখে নেমে আসে নিঃশব্দে, সারা গা কাপড়ে ঢেকে যায়, ঘরের মাঝখানে বসে থাকলে আধখানা শরীর দরজার দিকে ঘুরে যায়—সব কিছু ঘটে যায় নীরবে। তারপর আগন্তুক বাইরে এসে দাঁড়ায়, চৌকাঠে মাথা ঠেকায়, কিংবা ভিতরে এসে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করে এবং বলে : সে এই এই কাজ করতে যাচ্ছে। লোকটি হয়ত সদ্য কলকাতায় এসেছে, মায়ের জন্য কিছু প্রণামী এনেছে, কিংবা সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, তাই মায়ের আশীর্বাদ চায়। শ্রীমা তখন পার্শ্ববর্তিনীর কাছে অতি মৃদুস্বরে সস্নেহে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন, সেগুলি উচ্চতর স্বরে লোকটির কাছে শোনানো হয়।

---

৬ বালক নরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত সারদাদেবীকে অবগুণ্ঠনমুক্ত দেখেননি কেন, এ বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা ও মিস্ ম্যাকলাউডের এক কথোপকথন তুলে দেওয়া হয়েছে নিবেদিতা গার্লস স্কুল প্রকাশিত Sister Nivedita's Works-এর প্রথম খণ্ডে, *Notes on some wanderings*-এর সংযোজনীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালীর অবতার, স্বামীজী এই কথা বলেন। তারপর বলেন—

"এই সব অবতারের সঙ্গে একদল মানুষ আসেন, যাঁদের বলা হয় ঈশ্বরকোটী, যাঁদের প্রধান লক্ষণ—তাঁরা কখনো নিজেদের স্বার্থে কোনো কাজ করতে পারেন না—অপরকে সেবা ও সাহায্যই তাঁরা করে যান, তাঁরা সহায়তা করেন ভাবপ্রচারে।

"এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা? হাঁ, রামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন, ঐ অবতারের 'নর' আমি!

"'সেই জন্যই কি আপনি কখনো সারদার মুখ দেখেন নি, তিনিও দেখেন নি আপনার?'—জয়া (ম্যাকলাউড) জিজ্ঞাসা করলেন।

"আচার্যদেব সমর্থনে মাথা নাড়লেন।"

সব শেষে লোকটি আবার প্রণত হয়, শ্রীমা হাত জোড় করেন, যার দ্বারা বোঝা যায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। তখন লোকটি চলে যায়। এতক্ষণে আবহাওয়ার ভার কমে। আগেকার ভাবভঙ্গি ফিরে আসে, কথা শুরু হয়, পাখা নড়তে থাকে, ঘোমটা খসে পড়ে— ।

তাঁর মত স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো কখনো উদিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয় —ইনি তাও চান নি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!

১২ মার্চ ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

আগামী সোমবার সকালে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মোৎসবের (অর্থাৎ জন্মতিথির) জন্য মঠে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি 'না' বলায় স্বামীজী খুশী হলেন। তখন ভাবলাম, যদি মাকে দিয়ে [প্রিয়তমা য়ুম (ম্যাকলাউড), তুমিই এঁকে মা ডাকতে শিখিয়েছ—আমার ছেড়ে-আসা বাড়ির ছোট্ট মায়ের দাবির সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই] খোকাদের জন্য (জগদীশ বসুদের জন্য) বিশেষ পূজা করিয়ে নিতে পারি, সেটাই আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের চেয়ে অনেক বড় কিছু হবে।......

আগামীকাল সেণ্ট প্যাট্রিক দিবস।...এক বছর আগে ঐ দিনটিতে আমরা সকলে মাকে দর্শন করেছি, তুমিই আমাকে ঐ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলে।......

সোমবার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মদিন। শ্রীমা এসে পূজাঘরে তাঁর প্রতিকৃতির কাছে বিশেষ পূজা করেছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গিনীরা ফলমূল আনলে তিরিশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি বসে প্রসাদ পেলাম। খাবার আগে বাচ্চাদের লম্বা হয়ে প্রণাম করার মধুর দৃশ্য যদি দেখতে— আর তাদের কলকাকলি! সুন্দর, ছোটখাট Holy Eucharist-এর (যীশুর নৈশভোজ) তুল্য ব্যাপারটা, সেই সঙ্গে বড়দিনের ভোজ। বিকালে শ্রীমা, তাঁর সঙ্গিনীরা, বাচ্চারা আর আমি— সকলে মিলে সাতটা গাড়ি করে চ্যাটার্জি নার্সারির অর্কিড দেখতে গেলাম,— নার্সারিতে মেয়েদের দিন ঐটি। কদাপি মনে করো না, এর দ্বারা বাড়াবাড়ি খরচ হয়েছে কিছু। দু'বার চল্লিশ জন করে লোক নিয়ে গেল—কিন্তু গাড়িভাড়া ১২৲ টাকারও কম!......

চুপিচুপি য়ুম তোমাকে বলি, শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীমায়ের কাছে। কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকব আমি।

১৬ মার্চ, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করতে ভালবাসি, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কথাই তাঁকে বলেছিলেন : স্বামীজী জাতীয় দেবতার সাক্ষাৎ অবতার; আর

তিনি কালীর অবতার।[৭] বুঝতে পারছ!......সুতরাং কোনো এক দিক থেকে স্বামীজী উপরে আছেন! তোমাকে চমৎকার কিছু দিলুম, কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকতে হবে।

২৬ এপ্রিল, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

যোগানন্দের মৃত্যু শ্রীমা ও যোগীনমার কাছে দারুণ বেজেছে। মৃত্যু কথাটি শ্রীমা যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা।—'জানি জানি সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সে কথা জানি আমি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!'

২ মে, ১৮৯৯, নেল হ্যামন্ডকে

চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে, এখন যে সন্ধ্যারতির কাল। ছাতের উপরে উঠে যাব এখন, চুপ করে শুয়ে দেখব তারকাদের ফুটে ওঠা আকাশ-অঙ্গনে।......একে আমি বলি শান্তি-লগ্ন।......সন্ধ্যাদীপ জ্বলতে শুরু হয়েছে...... অন্তঃপুরের মহিলারা প্রণত হয়েছে বিগ্রহের সামনে; এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সারদাদেবীর গৃহে, ঠিকভাবে বলতে গেলে আশ্রমে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছে, আর মা উপস্থিত কারো সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছেন।[৮]

১৮ জুন, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

মধুময় রামকৃষ্ণ!—আজ সকালেই তোমার ডাক এসে পৌঁছল। আমি একাদশী করছি—মজা করে। সাদা শাড়ি পরেছি—আর সারাদিন মায়ের কাছাকাছি আছি।

মা যে কী—সবে বুঝতে পারছি। সেদিন সদানন্দ সম্বন্ধে বিকট মিথ্যা দুর্নামের বিরুদ্ধে সদানন্দকে সমর্থন করতে যদি তাঁকে দেখতে! আর আমার 'জেনানা' প্রবন্ধ বেরুবার পরে তিনি যখন শান্তভাবে বললেন, সন্তোষিণীর মা (প্রবন্ধের জন্য) তার ছবি তুলতে দিয়ে আসলে তাঁকেই সাহায্য করেছেন—তখন এর মূল্য আমার পক্ষে কতখানি ছিল—নিশ্চয় বুঝবে।

[নিবেদিতা কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজ-পরিচালিত বিখ্যাত সচিত্র পত্রিকা 'এম্‌প্রেস'-এ ভারতীয় অন্তঃপুরজীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের জন্য

---

[7] The Mother says the Sri R. K. told her that Swami was even as I have loved to think him, a direct incarnation of the National God, and He Himself of Kali..............

[৮] শ্রীমায়ের কক্ষখানি নিবেদিতার চিরদিনের শান্তিমন্দির। শিল্পী শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর কাছে লেখা এক চিঠিতে আচার্য নন্দলাল জানিয়েছিলেন, রামচন্দ্রের বনগমনের শোকে দশরথের মৃত্যুদৃশ্য এঁকে তিনি নিবেদিতাকে দেখিয়েছিলেন; নিবেদিতা ছবিটির অংশবিশেষের বিরূপ সমালোচনা করলেও শেষে বলেছিলেন—'তবে ছবিটিতে শান্ত নির্জন পরিবেশ আছে; ঠিক শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়; তাই আমার বড় ভাল লাগছে।'

সদানন্দ ও সন্তোষিণীর মা নিজেদের ছবি তুলতে দেন। এ বিষয়ে ১৬ই মার্চের পত্রে নিবেদিতা লেখেন—

"Yesterday morning Mr. and Mrs. Parkar came to photograph the house and children for the Empress. They also photographed Sadananda, got up as a typical beggar."

পত্রিকা থেকে কয়েকটি ছবি সংগ্রহ করে আমরা পুনর্মুদ্রিত করেছি।]

৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

[মেরী হেল ও সারদাদেবী একই ধারার নারী, এই কথা বলার পরে—]

দুজাতীয় নারী আছে। এক ধরনের নারীতে অপ্রতিরোধী সহন, যেমন সারদাদেবী, যেমন (মনে হয় ঠিকই বলছি) পুণ্যবতী মেরী। মেরী হেলও এই ধারায়।......

২৫ ডিসেম্বর, ১৯০০, ম্যাকলাউডকে

[নিবেদিতা এই সময়ে পাশ্চাত্ত্যে ছিলেন।]

তুমি যথাসময়ে (কলকাতা গিয়ে) মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, আর মাতাঠাকুরাণীর কাছে যেতে পারবে—আমার কী যে ভাল লাগছে!......

উঃ! তুমি সদানন্দকে দেখবে, স্বরূপানন্দকে দেখবে, আর সেই সঙ্গে মাতাঠাকুরাণীকে !!! প্রায় বিশ্বাসই হচ্ছে না!

৪ জানুয়ারী, ১৯০১ ম্যাকলাউডকে

কী কান্ড! তুমি ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে মাতাঠাকুরাণীকে দেখবে! ভাবতেও অপূর্ব লাগে!

১১ জানুয়ারী, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

অনেক দিন ধরে মাতাঠাকুরাণীর জন্য উদ্বিগ্ন। গত মেলে পাওয়া চিঠিগুলিতে উদ্বেগের সমর্থন আছে। তাঁর কাছে ফিরে যেতে খুবই ব্যস্ত।

১৭ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

তোমার গতবারের চিঠি পড়লাম; শ্রীমা জোর দিয়ে বলেছেন—আমাকে ফিরে যেতেই হবে;—পড়ে খুবই আনন্দ হল। সারা (মিসেস বুল) যদিও উল্টো কথা বলছেন তবু ধরে নেওয়া যায় আমি বেরিয়ে পড়েছি।

২২ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মন-প্রাণ ব্যাকুল।

২৯ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারলে খুশী হব। তোমার মতই আমিও অনুভব করি, শ্রীমায়ের ইচ্ছা সব সময়েই ধ্রুব।

৩ মে, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

বিশেষ করে আমি শ্রীমায়ের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। শুনেছি তিনি বড় রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছেন।

১০ জুন, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

সারদাদেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কি করে বোঝাব? যত সব আজেবাজে কাজ নিয়ে আছি।

৩ অক্টোবর, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

[অ্যাংলিক্যান সিস্টারহুডের এক আশ্রমে নিবেদিতা কিছু সময় ছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা বিষয়ে—]

এটি অ্যাংলিক্যান ভগিনী-আশ্রম, রোমান নয়, সুতরাং সব কিছু ইংরাজীতে, ল্যাটিনে নয়। আবেগ সম্বন্ধে এখানে সংযম আছে, আমার কাছে যা সুন্দর মনে হয়। তবু এদের সমস্ত জীবনটি যেন প্রার্থনামন্দির—দেওয়ালের প্রতিটি পাথর যেন ঈশ্বরভক্তি ও শান্তির পবিত্র প্রভাবে পূর্ণ।

'গেস্ট মিসট্রেস' আমাকে বললেন, এই সম্প্রদায় ভক্তিসাধনার ব্যাপারে কঠোর নিয়মব্রতী। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমায়ের পূজা-অর্চনার পরিমাণের চেয়ে বেশী কিছু নয় দেখে গভীর তৃপ্তি পেলাম। এদের আরাধনা শুরু হয় সকাল ৬টায়, দিনের শেষ অনুষ্ঠান ৯॥ টায়। সব জড়িয়ে প্রতিদিন সাধারণ উপাসনা ৪॥ ঘণ্টার। অবশ্য ব্যক্তিগত উপাসনাও সেই সঙ্গে আছে।

আহারাদির ব্যাপারে এদের আরও বাস্তববাদী দেখলাম। এঁরা বলেন, অনাহারে কাজ ও ধ্যান চলে না, এবং আমি কোনো খাওয়াই বাদ দিতে সাহস করিনি, কারণ যথেষ্ট না খেলেই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারে প্রাচ্যরীতির চেয়ে এঁদের বেশী প্রাজ্ঞ বলে মনে হয়নি। অবশ্য ব্যাপারটি আকর্ষণীয়। আমি এর থেকে সাহস পেয়েছি—যেহেতু স্কুলের কাজের জীবনের সঙ্গে ধ্যানের জীবনকে মেলাবার উপায় দেখা গেছে শারীরিক সামর্থ্যকে না কমিয়ে......

অপরপক্ষে স্বামীজী ও শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই—আমার আকাঙ্ক্ষা তাতে কেন্দ্রীভূত।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, মিসেস র‍্যাটক্লিফকে

[র‍্যাটক্লিফদের সন্তান-সম্ভাবনা হলে নিবেদিতা লেখেন—]

খুকী যখন জন্মাবে, আমি প্রথম তাকে নিয়ে যাব সারদাদেবীর কাছে আশীর্বাদের জন্য। সারদাদেবীকে আমরা 'হোলি মাদার' বলি; খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী তিনি, কিন্তু তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।

[নিবেদিতার প্রত্যাশামত র‍্যাটক্লিফদের মেয়ে হয়নি, ছেলে হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য মিঃ র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন।]

২১ জানুয়ারী, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

সপ্তাহখানেকের মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর কলকাতায় আসার কথা। স্বামী সারদানন্দের বিশ্বাস, তিনি আর কখনও আমাদের কাছ থেকে সরে যাবেন না। একথা সত্য হবে—তাই বিশ্বাস করি।

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

মাতাঠাকুরাণী এখন এখানে আছেন। কী ছোট্ট, রোগা আর কালো হয়ে গেছেন—গাঁয়ে থাকার কষ্টে শরীর যেন একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের মতই সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল। তাঁকে কত রকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে! একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার। সব সময়ে ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই।...... তাঁকে একটি সুন্দর রঙিন ছবি দেবার ইচ্ছা। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। ক্রিস্টিন তাঁকে তেমন বুঝতে পারে না। এতে আমি মজা পাই, কারণ ক্রিস্টিন আন্তরিকভাবেই সেকথা বলে। তবে ক্রিস্টিনের এ মনোভাব স্থায়ী হবে না। একদিন নিশ্চয় সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

কথায় কথায় জানাই, একটা কথা শুনে তুমি খুব খুশী হবে, যথার্থ মহত্ত্বের চেহারা আমি ক্রমেই বেশী করে ধরতে পারছি।

৩ মার্চ, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

মা-ঠাকরুণ এসে গেছেন। তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন—আমাদের আশ্রয় থাকে।

১৭ মার্চ, ১৯০৪, ওলি বুলকে

জানো, আজ থেকে ঠিক ৬ বছর আগে আমি মাঠাকরুণের চরণদর্শনে গিয়েছিলাম।

২৪ মার্চ, ১৯০৪

তোমার কথা মা-ঠাকরুণ সব সময়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে নিরন্তর ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাঠান। মা-ঠাকরুণ, আমাদের সেই চিরকালের মা-ই আছেন—সেই অবর্ণনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্ঝর।

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁর একটি সদ্য-দর্শনের কথা বললেন; তিনি আমাকে গেরুয়া বস্ত্রে দেখেছেন। মনে হয়, যে কোনো সময়ে তিনি আমাকে গেরুয়া দিতে

পারেন। কিন্তু আমি তো নিতে পারব না। স্বামীজী আমাকে একটি জিনিস দিয়ে গেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত যা রক্ষা করতে হবে—ব্রহ্মচর্য।

১৩ নভেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমাকে বললাম, তুমি এখনো তাঁর 'গণ্ডার কন্যা' রয়ে গেছ; তারপর এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের সুমহৎ উক্তিও শোনালাম। শ্রীমা আমার—মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—কী যে মিষ্টি! সব সময়ে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

[বুদ্ধের মহাশক্তিপূর্ণ বাণী যে, স্বামীজী প্রায়ই উচ্চারণ করতেন, এবং বুদ্ধ-কথিত 'গণ্ডারবৎ' নিঃসঙ্গ বিচরণের কথা স্বামীজীর একান্ত মণ্ডলীমধ্যে যে সুপরিচিত কথা ছিল, তা 'আচার্যদেব' গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারা যায়। বুদ্ধের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনাকালে স্বামীজী বলেছিলেন, 'মহর্ষি কপিলও এই দর্শনই প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁর মহান শিষ্য (বুদ্ধ) ঐ দর্শনের মধ্যে হৃদয় সঞ্চারিত করে তাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।' বুদ্ধের মহাবাণীতে আলোড়িত-হৃদয় স্বামীজী ক্ষণকাল নীরব থেকে ধর্মপদের মধ্যে মানবাত্মার প্রতি যে অমর আদেশ ঘোষিত, আবৃত্তি করেছিলেন সেই কথাগুলি—

পথহীন পথে অগ্রসর হও!
নির্ভয়ে, বিনা ভ্রূক্ষেপে
একাকী বিচরণ করো গণ্ডারের মতো।
শব্দে ভীত নয় সিংহ,
জালে বদ্ধ নয় বায়ু,
জলে লিপ্ত নয় পদ্মপত্র—
নিঃসঙ্গ এদেরি মতো, বিচরণ করো গণ্ডারের মতো।]

৮ ডিসেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমায়ের চরণদর্শনে সদ্য গিয়েছিলাম। সেই ধ্রুব মন্দির থেকে তাঁর আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি তোমাকে।

৫ মার্চ, ১৯০৫, ওলি বুলকে

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু—শিশু ভগবান। শিশুর কাছে কেউ কিছু চায়! দিতে হয় সব কিছু তাকে। আকাশ বাতাস তাই পূজায় পূজায় পূর্ণ। সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে, মধু! মধু! জীবন কর্মহীন, অর্থহীন—আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি! সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—এ সব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মত। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতই তাঁর সঙ্গ—বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!

[পূজার আসনে শ্রীমায়ের মূর্তি নিবেদিতাকে এমনই অভিভূত করত যে এ বিষয়ে তিনি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন—"১৯০৫ সালে মা বাগবাজারে ছিলেন। ঐ বৎসর ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে নিবেদিতা সকালে

উঠিয়াই মঠে গিয়াছিলেন। মঠ হইতে ফিরিয়া শ্রীমার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূজায় বসিয়াছেন। সেই পূজারতা মূর্তির দিকে চাহিয়া নিবেদিতার অন্তর এক প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, 'শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন, তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি!'"]

৫ এপ্রিল, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে

[নিবেদিতা এই সময়ে মারাত্মক অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের পথে—]

গতকাল শ্রীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমার বিপদমুক্তিতে কত না খুশী। এমন ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি।

৪ মে, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে

প্লেগের গতিক মন্দ, শ্রীমা শীঘ্রই কলকাতা ছেড়ে যাবেন শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি খুব শীঘ্র যাবার সম্ভাবনা কম। এটা বুদ্ধির কাজ নয়। মাকে ঘিরে থাকে নানা মানুষ, যারা তাঁর ভালোত্বের সুযোগ নেয়, আর সারাক্ষণ সেইসব তাঁকে সইতে হয়।

[মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই, "১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'উদ্বোধন'-বাটীতে শ্রীমার শুভ পদার্পণ হয়। পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ম্যাকলাউডকে লিখিলেন, 'বহুদিন পরে নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ও শ্রীমার সান্নিধ্যলাভ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত।"]

১১ ডিসেম্বর, ১৯০১, সারদাদেবীকে

[মিসেস ওলি বুলের (সারা সি বুল) অসুখে মরণাপন্ন অবস্থার কথা শুনে নিবেদিতা দ্রুত আমেরিকা যান। সেখান থেকে শ্রীমাকে নিম্নের পত্রটি লেখা—]

আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গীর্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা; সব কিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। আর মাগো, জানো কি, ভাবলাম—সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই করতাম! কেন বুঝিনে যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি—কয়েক মাস আগে, পুণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে

ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে! প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বৈকি! সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

বেচারা সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে না কি তোমার ভাবনা! তা কি পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মত ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়—যা পৃথিবীকে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তমা মা আমার, তোমার চিরকালের বোকা খুকী, নিবেদিতা।

[একটি অখণ্ড গীতিকবিতার মত এই চিঠিটি লিখবার আশু কারণ,—"১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বস্টনে নিবেদিতা মিসেস বুলের জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করিতে যান। প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজের ডায়েরীতে লেখেন, 'গীর্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমাদের মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁহার (শ্রীমার মত হই।'"]

[শ্রীমা ও নিবেদিতার শেষ পর্যায়ের সংযোগ সম্বন্ধে নিবেদিতার জীবনী থেকে অল্প কিছু উদ্ধৃত করছি :

"৭ই এপ্রিল (১৯১১)......ধীরে ধীরে জাহাজ বোম্বাই আসিয়া থামিল। শেষ বারের মত নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিয়া পেঁছিলেন।......৯ই এপ্রিল তিনি অতি পরিচিত বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পদার্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।......১১ই এপ্রিল শ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুরী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ দিনই নিবেদিতা উদ্বোধনে গিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। শোকার্ত হৃদয় শ্রীমার স্নেহকরস্পর্শে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিল। মিসেস বুলের দেহত্যাগে শ্রীমা, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখ করিয়া শ্রীমা অনেক কথা বলিলেন।

শ্রীমার এবার কলিকাতায় বাস অল্পদিনের জন্য; মাসখানেক পরে, ১৭ই মে তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। শেষ বারের মত তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত কাজ ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া যাইতেন শ্রীমার নিকট। তাঁহার অন্তরে কে যেন সর্বদা বলিতেছে, 'আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর করিয়া লও।'......এবার গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় মায়াবতী। ১২ই

মে মায়াবতী রওনা হইলেন। সঙ্গে সস্ত্রীক ডক্টর বসু ও অরবিন্দ বসু। যাত্রার দিন তিনি উদ্বোধন-বাড়িতে গিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীমার সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ।"

নিবেদিতার রচনায় সারদাদেবী

['আচার্যদেব' (*The Master*) গ্রন্থে নিবেদিতা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে শ্রীমা সম্বন্ধে তাঁর মোট বক্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি এখানে সংকলিত ও অনূদিত—]

(ভারতীয় নারীদের শিক্ষার) এই পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্য আমি নভেম্বরের (১৮৯৮) শুরুতে একলা কলকাতায় ফিরে এলাম। স্টেশন থেকে শহরের উত্তরপ্রান্তে তখনি পেঁছে যেতে আমার অসুবিধা হয়নি। সেখানকার মেয়েদের মধ্যে বাস করবই, এমন একটা কঠোর জেদ ধরে বসলাম। ঘটনাক্রমে স্বামীজী তখন কলকাতায় সন্ন্যাসীদের স্থানীয় আস্তানারূপ এক ভক্তগৃহে বাস করছিলেন। তাঁর মারফৎ আমার থাকার বিষয়ে কথাবার্তা চলতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবী, যাঁকে নিজেদের মধ্যে আমরা মাতাঠাকুরাণী ('হোলি মাদার') বলি—সঙ্গিনীগণসহ নিকটেই বাস করছিলেন। তাঁর বাড়ির একটি খালি ঘরে সেইদিনই আমার ঠাঁই হল।

জীবনের কোনো কোনো ঘটনার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা অনুভব করি যে, ঐসব ক্ষেত্রে আমাদের সাহস আমাদের অজ্ঞতারই সৃষ্টি। আর তা বিধাতারই দান! নচেৎ সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধানই বা হত কি করে! কিন্তু তবু—যদি আমি সত্যই তখন অনুভব করতে পারতাম, আমার ঐ হঠকারিতার দ্বারা আমার নিরপরাধ আশ্রয়দাত্রী শুধু নন, তাঁর আত্মীয়গণও দূর গ্রামে কি রকম সামাজিক গন্ডগোলের সম্মুখীন হবেন—তাহলে তখন যা করেছিলাম, কদাপি তা করতাম না।* যেভাবেই হোক, আমি সেখান থেকে সরে যেতাম। উল্টোপক্ষে তখন কিন্তু আমার ধারণা ছিল, জাতিভেদ নির্বোধ ব্যক্তিগত কুসংস্কারমাত্র, জ্ঞানের দ্বারা তাকে দূর করা কর্তব্য, বিদেশীদের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন আচরণের সম্ভাবনা কল্পনা করে নিয়ে এ-ধরনের কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। এমনি বর্জনযোগ্য কুসংস্কারের অস্তিত্ব উক্ত ভারতীয় মহিলার মধ্যে রয়েছে—একথা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে তাঁর আতিথ্য আদায় করে নিলাম।

---

* শ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে 'সমাজের খুব বাঁধাবাঁধি' থাকায় ব্যক্তিগত শত উদারতা সত্ত্বেও জয়রামবাটী যাওয়ার জন্য নিবেদিতার ইচ্ছায় শ্রীমার পক্ষে সম্মতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে 'মায়ের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে পাই—

'একবার ভগিনী নিবেদিতা মার দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'না মা, আমি বেঁচে থাকতে তোমরা সেখানে যেও না; তাহলে আমায় তারা ঠেকো (একঘরে) করবে।'

সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব সর্বজয়ী হল। আমি সমাজে গৃহীত হলাম। সপ্তাহখানেক, কি দিন দশেকের মধ্যে কাছাকাছি একটি বাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল আমার জন্য। তাহলেও আমি শ্রীমার ঘরে সারা দুপুর কাটাতাম। তারপর গ্রীষ্ম এলে তাঁর স্পষ্ট আদেশে তাঁর বাড়িতেই শুতে হল আমাকে, যেহেতু সেখানে কিছু ভাল বন্দোবস্ত ছিল। অন্য কোনো ঘরে নয়, সকলের সঙ্গেই এক ঘরে শুতাম;—সাদাসিধে ঘরটি ঠাণ্ডা, লাল রঙের মেঝে তার, মেঝেয় সার সার মাদুর ও বালিশ পাতা, এবং মশারি টাঙানো।

অদ্ভুত এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলাম। নীচের তলায় সদর দরজার পাশের এক ঘরে এক সন্ন্যাসী থাকেন (স্বামী যোগানন্দ), আবাল্য কঠোর তপশ্চর্যার ফলে পরিণত যৌবনে যিনি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে উপনীত। তাঁর ঘরেই আমি বাংলা শিক্ষার জন্য যেতাম। পিছনের রান্নাঘরে তাঁর এক শিষ্য, ও একজন ব্রাহ্মণ পাচক কাজকর্ম করতেন। ছাত ও বারান্দাসমেত সমস্ত উপরতলাটা, আর নিকটের গঙ্গার দৃশ্য—মেয়েদেরই দখলে ছিল।

আমাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যিনি কর্ত্রী—তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তাঁর জীবনের ইতিহাস সর্ববিদিত। পাঁচ বৎসর বয়সে পরিণয়, আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁকে স্বামীর বিস্মরণ, তারপরে মায়ের অনুমতি নিয়ে গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামী সমীপে গমন, বিবাহবন্ধনের কথা স্বামীর স্মরণে আসা, কিন্তু যে-জীবন বরণ করেছেন তারই আদর্শের কথা পত্নীকে শোনানো, উত্তরে, ঐ জীবনপথের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনা করে স্বামীকে গুরুরূপে বরণ করে পত্নী কর্তৃক শিক্ষাপ্রার্থনা,—এ সমস্ত কথাই বহু কথিত। তারপর থেকে তিনি বহু বছর পরম আনুগত্যের সঙ্গে স্বামীর কাছে বাস করেছেন, দক্ষিণেশ্বরের বাগানেরই একটি কক্ষে থাকতেন,—একই সঙ্গে সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসিনী এবং শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিষ্যা। তরুণ বয়সেই শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। সে বিষয়ে শান্তভাবে জানাতেন, কতদিকে তাঁর শিক্ষা প্রসারিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিখুঁতভাবে কাজ করা পছন্দ করতেন; প্রদীপের সরঞ্জাম পর্যন্ত দিনের বেলায় কোথায় গুছিয়ে রাখতে হয় তাও শিক্ষা দিতেন। দুখ-চেটে ভাব ঠাকুরের সইত না; কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা সত্ত্বেও তিনি জীবনের লাবণ্য ও সৌন্দর্য ভালবাসতেন, আচরণের শান্ত মর্যাদার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময়ের একটি কাহিনী : পত্নী একদিন উৎফুল্ল শিশুর মত গর্বভরে স্বামীর কাছে এক ঝুড়ি ফল ও শাকসব্জী এনে হাজির করেন; তাতে স্বামী গম্ভীর হয়ে বলেন, 'এত বাড়াবাড়ি খরচ কেন?' 'অন্ততঃ আমার জন্য নয়', বলে নীরব অশ্রুতে নয়ন ভরে তরুণী পত্নী চলে গেলেন —তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা লুপ্ত হয়েছে সহসা আঘাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হয়ে পড়লেন। কাছের ছেলেদের ডেকে বললেন ব্যাকুলভাবে, 'ওরে, তোদের মধ্যে কেউ গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উড়ে যাবে।'

শ্রীমা এমনই প্রিয় ছিলেন ঠাকুরের কাছে। অথচ মায়ের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলবার সময়ে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস কখনো ফোটে না। স্বামীর প্রতিটি কথাকে সফল করবার জন্য তিনি

সর্বাবস্থায়, বিপদে বা সম্পদে সুমেরুবৎ অটল,—কিন্তু সেই স্বামীকে তিনি 'ঠাকুর' বা 'গুরুদেব' ছাড়া কিছু বলেন না, কখনো স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কসূচক আত্মগরিমাযুক্ত একটি কথাও তাঁকে বলতে শোনা যায়নি। তাঁকে জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনোমতে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য কারো থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে তাঁর দাবি অধিকতর বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর! শিষ্যার মধ্যে পত্নী হারিয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগে, যদিও পত্নীর পরম বিশ্বস্ততাটুকু রয়ে গেছে। তথাপি তাঁর প্রতি সকলের ভক্তির সীমা নেই, প্রতি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়, যেমন দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, তাঁর সঙ্গে ট্রেন-ভ্রমণকালে তিনি তলার বেঞ্চে থাকলে উপরের বাঙ্কে উঠবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। তাঁর উপস্থিতিই যে একটা দিব্য ব্যাপার।

সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী,—এই কথাই সর্বসময় আমার মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না, নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ? প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয় সরলতম নারীজীবনেও কিভাবে করা সম্ভবপর, তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার কাছে তাঁর অধ্যাত্মমহিমার মতই অপূর্ব ঠেকেছিল তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর উদার মুক্ত মনের মহিমা। যত নূতন বা জটিল সমস্যাই তাঁর কাছে উপস্থিত করা হোক, আমি কখনো তাঁকে উদার ও মহৎ সিদ্ধান্তজ্ঞাপনে কুণ্ঠিত দেখিনি। এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মত তাঁর সমগ্র জীবন। ব্রহ্মণ্যশাসিত সমাজের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতি ক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশের উপরে উন্নীত করতে পারেন। অপকৃষ্ট আচরণে যদি কেউ পীড়িত করে থাকে তাঁকে—আর কিছু না করে এক সঘন বিচিত্র নীরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নেন। যদি কেউ তাঁর অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী সামাজিক সমস্যার যন্ত্রণার কথা জানায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ঘটনার মর্মে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে সমাধানের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে কোনোরকম বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হন না। যে-ব্রহ্মচারীকে আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে তদ্দণ্ডেই স্থানত্যাগ করে চলে যেতে হবে—তাঁর আদেশ। তাঁর দৃষ্টিতে সাধুর আচরণ যে লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে অনুমতি পাবে না। এই ধরনের দোষী এক ব্যক্তিকে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'দেখছ না, ওর ভিতরের নারীমহিমাকে আঘাত করেছ তুমি—সর্বনাশ!'

কিন্তু তবু তিনি 'সুরে সঙ্গীতে নিত্য পূর্ণ'—তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার আক্ষরিক পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর অধ্যাত্মসন্তানদের একজন বলেছিলেন, 'আর পূর্ণ মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়।' যে-ঘরে তিনি পূজাদি করেন, তা ভরপুর থাকে পরম স্নিগ্ধতায়।

শ্রীমা পড়তে পারেন। রামায়ণ পাঠে অনেক সময় কাটে। কিন্তু লিখতে পারেন না। তবু মনে করার কারণ নেই তিনি অশিক্ষিত নারী। সাংসারিক অথবা ধর্মীয় বিষয় পরিচালনায় দীর্ঘ কঠিন অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই শুধু, অধিকন্তু ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে।

সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মানবের পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব আত্ম-বিকাশের সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন। বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে পূর্ণোচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি যে-কোনো নূতন ভাব বা অনুভূতির মর্মভেদ করেন অবিলম্বে, অব্যর্থভাবে।

মাতাঠাকুরাণীর এই ক্ষমতার পরিচয় প্রথম ভালভাবে উপলব্ধি করি কিছুদিন আগে এক ইস্টার-দিবসে যখন তিনি আমাদের আবাসে এসে দর্শন দেন। এর আগে তাঁর সঙ্গ করার সময়ে তাঁর ভাবধারা অনুধাবনে আমি এত বেশী মগ্ন থাকতাম যে, বিপরীত ভূমিকায় তাঁকে লক্ষ্য করার কথা মনেই হয়নি। শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীরা সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখার পরে ঠাকুরঘরে বসে খ্রীস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হল। খ্রীস্টের পুনরুত্থান-স্তোত্র শ্রীমার কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যে-রকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হল—সারদাদেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কি বিরাট! এই একই ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ-পূত শ্রীমার সঙ্গিনীদের মধ্যে অল্পাধিক দেখা যায়। কিন্তু সারদাদেবীর মধ্যে তার প্রত্যয় ও শক্তি অসীম—সে এক সমুচ্চ শিক্ষার অভ্রান্ত ফলশ্রুতি।

এই গুণেরই বিকাশ লক্ষ্য করেছিলাম এক সন্ধ্যাকালে, যখন নিজ ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে আসীন মাতাঠাকুরাণী আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণনা করতে বললেন। প্রচুর হাসিখুশীর মধ্যে আমরা বর, কনে, 'খ্রীস্টান পুরুত' প্রভৃতির বর্ণনাসহ ব্যাপারটা কি বললাম। কিন্তু বিবাহ-প্রতিজ্ঞাটি শুনে তাঁর মনে যে ভাবোদয় হল, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। 'সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শক্তিতে অশক্তিতে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে,'—কথাগুলি শোনামাত্র সকলেই 'আহা—হা!' করে উঠলেন আনন্দে, কিন্তু শ্রীমার পরিতৃপ্তিই সর্বাধিক। বারবার কথাগুলি তিনি শুনতে চাইলেন; বারবার বললেন, 'কী অপূর্ব ধর্মকথা! কী অপূর্ব ধর্মকথা!'

শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যূষের অনেক আগেই সকলে একে একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে, বিছানার মাদুরের উপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে, তার উপরে স্থির হয়ে বসেন, মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকীতে গঙ্গাস্নানে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পূজায় বসেন। অল্প-বয়সীরা প্রদীপ জ্বালায়, ধূপ-ধুনা দেয়, গঙ্গাজল, ফুল ও পূজার জোগাড় করে। এই সময়ে গোপালের মা-ও এসে নৈবেদ্য তৈরীতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম; সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথালাপের মধ্যে; সকলে উঠে পড়ে; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি, গোপালের মা ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই, কিংবা

বাধ্য মেয়ের মত মায়ের সঙ্গে ছাতে উঠি গিয়ে, তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি; বহুভাগ্য তার, যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্য ধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়,—মায়ের সব পূজার শুরু ও শেষ যে গুরু-প্রণামে, সেই প্রণাম করতে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে সারদাদেবী

আমরা আগেই দেখেছি শ্রীমা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন—ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টিগুলি নীরব শান্ত, যেমন শ্রীমা। শ্রীমার অপার্থিব স্নেহ তাই কখনই 'শব্দমুখর' নয়। এবং নিবেদিতা সম্বন্ধে তাঁর মুখ থেকে বেশী কথা আশা করতেও পারি না। তবু 'মায়ের কথা' গ্রন্থে অল্প যা-কিছু সংগৃহীত হয়ে আছে তার স্নেহগভীরতার তুলনা নেই। শুধু স্নেহ নয়, মাতা তাঁর এই কন্যাকে শ্রদ্ধাও করেছেন। সারদাদেবী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেছেন 'যেন দেবী!'—এর থেকে বড় ভাগ্য অল্পই হওয়া সম্ভব!

'মায়ের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীমা ও নিবেদিতার এক সাক্ষাতের বর্ণনা আছে—

"সিস্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। মা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, 'আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।' সিস্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, 'কি সুন্দর, কি চমৎকার!' আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, 'কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!' মা বলিলেন, 'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী! নরেনকে কী ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!'

সিস্টার দার্জিলিঙ যাইবেন সেইকথা মাকে বলিতেছেন। রাধু আসিলে মা তাহাকে বলিলেন, 'দিদিদের প্রণাম কর, রাধু!' সুধীরা দিদি বলিলেন, 'না, না, থাক্। ও আবার আমাদের নমস্কার করবে কি?' মা বলিলেন, 'তোমরা দিদি, তোমাদের নমস্কার করবে না?'"......

এর পরে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর সারদাদেবীর বিদ্যালয়-দর্শনের একটি বিবরণ পাই :

"একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, 'মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।' সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মার গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি

দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ ত শিখেছে মেয়েরা!' পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।"

সরলাবালা সরকার ঐ ঘটনাটি এবং শ্রীমার সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের রূপ তাঁর নিবেদিতা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

"বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী (সারদাদেবী) কখনো কখনো আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপ-ভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধুলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।

"মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল; ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্র-পুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মত অকারণ কেবলই

হাসিতেছেন, আবার কখনও-বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।”

‘মায়ের কথা’ গ্রন্থে পাই—

মা—......নিবেদিতা বলেছিল, ‘মা, আমরাও বাঙালী, কর্মের ফেরে খ্রীস্টান হয়ে জন্মেছি।’ ওদেরও এই শেষ জন্ম। (২৪-৪-১৯১২)

মুক্তিপ্রাণার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি :

“শ্রীমাকে নানা জিনিস উপহার দিবার প্রবল বাসনা নিবেদিতার হৃদয়ে জাগিত, কিন্তু উহা পূর্ণ হইবার পথে বাধা ছিল অর্থাভাব। পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে (১৯০৯) তিনি শ্রীমা ও রাধুর জন্য নানা দ্রব্য কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যে সামান্য জিনিস উপহার দিতেন, শ্রীমা তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন। একবার তিনি একটি জার্মান সিলভারের কৌটা দিয়াছিলেন। শ্রীমা উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন। বলিতেন, ‘পূজার সময় কৌটাটি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে।’ নিবেদিতাপ্রদত্ত একখানি এণ্ডির চাদর জীর্ণ হইয়া গেলেও মা ফেলিয়া দিতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, ‘ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল; ওখানি থাক।’ তিনি সেই ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে ভাঁজে কালাজিরা দিয়া তুলিয়া রাখিলেন; বলিলেন, ‘কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল, বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না। ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাংলা শিখে নিলে।”

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে (সম্পাদক, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে; নিবেদিতার মূর্তিটি তাতে সুন্দর ফুটেছে। তার মধ্যে পাই—

“শ্রীশ্রীমাকে দেখেই ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত উচ্চ হয়েছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বুঝি তাঁকে বলেছেন, ‘আমাদের মেয়েরা তো ignorant— অজ্ঞ—’ কথার মাঝখানে মহা উত্তেজিত নিবেদিতা প্রতিবাদ করলেন, ‘ভারতবর্ষের মেয়েরা অজ্ঞ কখনই নয়—ওদেশের (তিনি নিজের জন্মভূমিকে ওদেশ বলতেন) মেয়েদের মুখে এমন সব জ্ঞানের কথা কখনও শোনা গেছে কি?’ ”

নিবেদিতার অকালে দেহত্যাগ শ্রীমার মাতৃহৃদয়কে কতখানি আঘাত করেছিল, তা অনুমেয়, কিংবা ঠিক ভাবে বলতে গেলে, আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তাঁর বেদনাকাতর হৃদয়ের যে অল্পকিছু প্রকাশ আমরা পেয়েছি, তাই উপস্থিত করছি। নিবেদিতার দেহান্তের অব্যবহিত পরেই সরলাবালা সরকার লিখিত ‘নিবেদিতা’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি থেকে কিছু অংশ, বিশেষতঃ শ্রীমায়ের প্রতি নিবেদিতার অসীম ভক্তির বর্ণনাটুকু শ্রীমার কাছে পাঠ করা হলে মাতা-

ঠাকুরাণী স্নেহে ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। এ সম্বন্ধে 'মায়ের কথা'র প্রথম খণ্ডে পাই—

"(১লা আষাঢ় ১৩১৯) বেলা প্রায় চারটা, শ্রীশ্রীমা অনেক স্ত্রী-ভক্তসঙ্গে বসে আছেন।......আমি গৌরীমাকে দিয়ে নীচে অফিস ঘর হতে 'নিবেদিতা' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই দুখানি আনালুম। আমার ইচ্ছা, মা 'নিবেদিতা' বইখানির কিছু শুনেন। মাও বই দেখে বলছেন, 'ওখানি কি বই গা?' আমি বললুম—'নিবেদিতা।' মা বললেন, 'পড়ত মা, একটু শুনি সেদিন আমাকেও একখানি ঐ বই দিয়ে গিয়েছে, এখনও শোনা হয় নি।' যদিও অত লোকের মধ্যে পড়তে লজ্জা করতে লাগল তথাপি নিবেদিতার সম্বন্ধে সরলাবালা কেমন সুন্দর লিখেছেন, তা মাকে শোনাবার আগ্রহে ও মায়ের আদেশে পড়তে আরম্ভ করলুম। শ্রীশ্রীমা ও সমবেত স্ত্রী-ভক্তেরা সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। নিবেদিতার ভক্তির কথা পড়তে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম, মায়ের চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঐ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, 'আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্য যে কি করবে ভেবে পেত না! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও সংকুচিত হচ্ছে।' কথাগুলি বলেই মা নিবেদিতার কথা ভেবে স্থির হয়ে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা যা জানতেন বলতে লাগলেন। দুর্গাদিদি বললেন, 'ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন।' অপর একজন বললেন, 'তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বলতেন। সরস্বতীপূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।' পুস্তকপড়া শেষ হল। শ্রীশ্রীমা তখনও মাঝে মাঝে নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান, মা?'

অনুরূপ আর একটি বর্ণনা ('মায়ের কথা' দ্বিতীয় খণ্ডে)—

"যেবার সিস্টার নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়, সেবার সুধীরা দিদির খুব অসুখ হয়। তাঁহার জন্য মার কি ভাবনা!...সুধীরা দিদি আরোগ্যলাভ করিলে, তিনি, আমি ও সিস্টার ক্রিস্টিন একদিন সন্ধ্যার সময় মার বাড়িতে যাইলাম। আরতির পর আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা সুধীরা দিদিকে বলিলেন, 'সেরেছ মা?' সুধীরা দিদি বলিলেন যে, অনেকটা সারিয়াছেন, তবে সাবধানে আছেন। মা বলিলেন, 'তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল।......এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ—শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে? (সিস্টার ক্রিস্টিনকে লক্ষ্য করিয়া) আহা, দুটিতে একসঙ্গে ছিলে, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে। আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার ত আরও বেশী হবে মা। কি লোকই ছিল! তার জন্য আজ কত লোক কাঁদছে!' বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন।"

লিজেল রেম'কে স্বামী অসিতানন্দ যেসব তথ্য পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে শ্রীমা ও নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে সংবাদ আছে। অসিতানন্দ লেখেন—

"ভগিনী সম্বন্ধে আমার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আমার ধারণা গড়ে উঠেছে স্বয়ং শ্রীমা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, এবং স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে শোনা কথার উপরে। ভগিনী এ'দের সঙ্গে বহু সময় কাটাতেন, সুতরাং আমি যে তথ্য দেব, তার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত।

আপনি হয়ত জানেন, হিন্দু মেয়েরা সিন্দুর ব্যবহার করে। একদিন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী নিবেদিতার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে তাতে ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীমা খুব খুশী হলেন। পাঁচ বছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায়, তেমনি চুমু খেয়ে আদর করলেন। শ্রীমা নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীরভাবে ভালবাসতেন। 'আমার প্রাণের সরস্বতী' বলে প্রায়ই ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।

প্রায় প্রতি বিকালে নিবেদিতা শ্রীমার কাছে এসে পদধূলি নিতেন। প্রতি রবিবার অবশ্যই আসতেন শ্রীমার ঘর পরিষ্কারের জন্য। বিছানা ঝাড়া, মেঝে পরিষ্কার করা, সাবান জলে দরজা জানালার কাঁচ ধোওয়া—এইসব করে চারদিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলতেন। এ-কাজকে নিবেদিতা পরম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত অনুগত সন্তানের মত তিনি সেবা করতেন। শ্রীমার সামান্যতম সুখসুবিধার জন্যও ব্যস্ত থাকতেন।

নিবেদিতা বাংলা জানতেন না বলে শ্রীমার সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার পক্ষে গোড়ায় গোড়ায় অসুবিধা হত। তখন আভাসে ইঙ্গিতে কথা চালাতে হত। দুজনই অসীম বুদ্ধিমতী বলে তাঁরা চালিয়ে যেতে পারতেন। এইসব অসুবিধা কাটাবার জন্য, ভালভাবে শ্রীমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ চেষ্টায় নিবেদিতা বাংলা শিখে নেন। এর পর শ্রীমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতা ধর্মোপদেশ নিতেন, যোগীন-মা বা গোলাপ-মার কাছ থেকেও, যাঁরা নিবেদিতাকে হিন্দু পুরাণ-কাহিনী শোনাতেন।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কালে নিবেদিতা অবশ্যই স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিলেন। দারুণ অসুবিধার সম্মুখীনও তাঁকে হতে হয়েছিল। তখনকার হিন্দু সমাজ বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় উৎসাহী ছিল না, বিশেষ করে স্কুল বা কলেজের শিক্ষায়। নিবেদিতা খালিপায়ে পথ হেঁটে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের ধরতেন, যাতে তাঁরা বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠান। সেলাই শেখবার জন্য তিনি মেয়েদের বিনামূল্যে কাপড় দিতেন—কাপড়ের উপরে শিল্পকর্ম করতে হত; শিল্প ও উপযোগিতা, দুইই যাতে সম্পন্ন হয়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। কাটবার সময়ে বা কাজ করবার সময়ে কাপড় যদি নষ্ট হয়ে যেত, তিনি বিন্দুমাত্র রাগ না করে নতুন কাপড় দিতেন। ছুঁচ সুতোও তিনিই দিতেন। অর্থাৎ মেয়েদের সূচীশিল্পে দক্ষ করবার জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি করতেন। ওদিকে রক্ষণশীল পরিবারের লোকেরা ম্লেচ্ছ অহিন্দুর সঙ্গে এই মেলামেশা

পছন্দ করত না। কিন্তু নিবেদিতার অপূর্ব ভালবাসায় এইসব বাধা ক্রমে দূর হয়ে গেল। তিনি মোটামুটি সব বাড়িতেই আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন।

একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমার কাজের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, 'নিবেদিতা আমার মেয়ে; ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।' "

নিবেদিতার উদ্দেশ্যে লিখিত শ্রীমায়ের একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। স্বামী সারদানন্দ ১১ই এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের এক পত্রে নিবেদিতাকে লেখেন, 'শ্রীশ্রীমা কুশলে আছেন। তোমাকে এক সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন। আমি মূল পত্রের সহিত উহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতেছি। মনে হয় পত্রের ইংরাজী অনুবাদ পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে।'*

মূল বাংলা চিঠিখানি পাওয়া যায়নি, সারদানন্দকৃত ইংরাজী অনুবাদই পাওয়া গিয়েছে। মুক্তিপ্রাণা ঐ ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ করেছেন দু'এক লাইন বাদ দিয়ে। আমরা বর্জিত অংশ যুক্ত করে অনূদিত পত্রটি তুলে দিচ্ছি :

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহের খুকী নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার নিত্য শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার কাছে তোমার যে ফটোটি রহিয়াছে, তাহার দিকে অনেক সময় চাহিয়া থাকি; তখন মনে হয়, তুমি যেন আমাদের মধ্যেই রহিয়াছ। তুমি কবে, কোন্ বৎসরে ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি। ব্রহ্মচর্যপূত হৃদয়ে আমার জন্য যে প্রার্থনা জাগিয়াছে তাহা যেন পূরণ হয়। আমার শারীরিক কুশল। আমি আনন্দে আছি। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন, এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয় ভালয় ফিরিয়া এস, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূরণ করুন; ভাবী আশ্রমটি যেন সকলকে যথার্থ ধর্ম শিক্ষা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করে।

---

* শ্রীমায়ের চিঠি যেমন স্বামী সারদানন্দ বাংলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে নিবেদিতার কাছে পাঠিয়েছেন, তেমনি নিবেদিতার ইংরাজী চিঠিও তিনি বাংলায় অনুবাদ করে শ্রীমাকে শোনাতেন। ২৭শে জুন, ১৮৯৯-তে সারদানন্দ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—'মার্গটের চিঠি নিয়ে সারদাদেবীর কাছে গিয়েছিলুম, অনুবাদ করে পড়ে শোনাবার জন্য।'

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণবায়ুস্বরূপ—তিনি নিজের বন্দনামন্ত্র নিজেই গান করিতেছেন, তুমি সেই নশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই সেই নিত্যসংগীত শুনিতেছ। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত সকলই প্রভুর স্তোত্র গাহিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষ মা কালীর গান করিতেছে নিশ্চয় জানিও, যার কান আছে সে শুনিতে পায়।

শ্রীমতী ওয়াটারম্যানের গভীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া খুশী হইলাম। যে অনুভব করে দেহ গত হইলেও তাহার প্রিয়তম হারাইয়া যায় নাই—সেই যথার্থ আলোক পাইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সে বল পাইয়াছে, একথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সে যেন তোমার কাজের সহায় হয়। শ্রীমতী মে রাইট সীওয়েলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে।

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ কর, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম ও লীলা উভয়ই কত সুন্দর!

তোমার
মাতাঠাকুরাণী

নিবেদিতা লিখেছেন, যখন তিনি শ্রীমায়ের চিঠিটি মিসেস ওয়াটারম্যানের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন তিনি গভীর আনন্দে বলে ওঠেন—'আহা! কি মধুময় প্রাণ!' মিসেস ওয়াটারম্যানের এই উক্তিকে নিবেদিতা মনে করেন, পত্রের গুণ সম্বন্ধে সুন্দরতম উক্তি।

নিবেদিতা শ্রীমায়ের চিঠি পেয়ে এতই উল্লসিত হন যে, চিঠিটির নকল মিসেস ওলি বুলকে পাঠিয়ে লেখেন (১৩-৫-১৯০০)—'মাতাঠাকুরাণীর চিঠির এই নকল পেয়ে তুমি নিশ্চয় খুশী হবে।' এই চিঠি আমাদের বিশ্বাস মিস ম্যাকলাউড প্রমুখ অন্তরঙ্গদেরও নিবেদিতা পাঠিয়েছিলেন, কারণ গভীর তৃপ্তিকর কোনো প্রাপ্তি ঘটলে তার অংশ তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলীকে না দিয়ে পারতেন না।

এই চিঠির নিবেদিতাকৃত নকলের একটি রেম-সংগ্রহে রয়েছে।

গোপালের মা ও নিবেদিতা

গোপালের মা'র সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর শেষজীবনে তাঁকে সেবা করতে পাওয়াকে নিবেদিতা পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করেছিলেন। গোপালের মা সিদ্ধ-তাপসী, বালগোপালের দর্শনে ও লীলায় তিনি মগ্ন থাকতেন, সে গোপালকে ও শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অভেদ দেখেছিলেন। বাৎসল্যরসমধুর তাঁর কাহিনী একালের ভক্তি-সাহিত্যের মহাসম্পদ, শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক রচনার তুল্য, অথচ সমস্ত ব্যাপারটিই বাস্তব। 'গোপালের মা' নামক ক্ষুদ্র জীবনী-পুস্তিকাটি নিবেদন করতে গিয়ে ভূমিকায় এর বাস্তবতার পক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—

"আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গোপালের মা'র অদ্ভুত দর্শনাদির কথা পাঠককে এখানে উপহার দিতেছি। যাঁহারা মনে করিবেন, আমরা উহা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ইহাতে মুন্সীয়ানা কিছুমাত্র ফলাই নাই।...... উহা সংগ্রহ করিয়াছি এমন সব লোকের নিকট হইতে, যাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ যথাযথ বলিবার প্রয়াস পান, না পারিলে অনুতপ্তা হন, এবং 'কামারহাটির বামনীর' স্তাবক হওয়া দূরে যাউক কখনও কখনও তদনুষ্ঠিত কোনো কোনো আচরণের তীব্র সমালোচনাও আমাদের নিকট করিয়াছেন।"

নিবেদিতার সঙ্গে গোপালের মা'র সংযোগের কথা বলবার আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করছি। এক্ষেত্রে স্বামী সারদানন্দকে অনুসরণ করব।

গোপালের মা'র আসল নাম অঘোরমণি দেবী, বালবিধবা হওয়ার জন্য ভাই নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামারহাটির বাড়িতে বাস করতেন। নীলমাধব কলকাতার পটলডাঙার সম্পন্ন মুৎসুদ্দি গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাড়ির পুরোহিত, সেইসূত্রে উক্ত দত্ত মহাশয়ের বিধবা গৃহিণীর সঙ্গে অঘোরমণির পরিচয় ঘটে, এবং তিনি কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে গোবিন্দচন্দ্র দত্তের যে বৃহৎ ঠাকুরবাড়ি ছিল, তার একান্তে আশ্রয় নেন, ধর্মজীবন যাপনের সুবিধার জন্য।

অঘোরমণি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা, এবং অতীব নিষ্ঠাবতী। দিবারাত্র জপে ও পূজায় রত। তিরিশ বছরের উপর কঠোর তপশ্চর্যার পরে, তাঁর বয়স যখন ষাট, তখন তাঁর জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের হেমন্তকালে, কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে। প্রথম সাক্ষাতের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাবভক্তির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। অপরদিকে গোপালের মাও অব্যক্ত টান বোধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। তারপর—

> "প্রথম দর্শনের অল্পদিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'এসেছ, আমার জন্য কি এনেছ দাও।' গোপালের মা বলেন, 'আমি তো

একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে 'রোঘো' (খারাপ) সন্দেশ বার করি —এ'কে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছে—আবার তাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!' ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুর উহা মহা আনন্দ করিয়া খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আনো কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চাড়, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।' গোপালের মা বলেন, 'ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হতে লাগল, আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি,—কেবল খাইখাই; আমি গরীব কাঙ্গাল লোক— কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক, আর আসব না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন! কোনমতে এগুতে আর পারি না! কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে-হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি।' ইহার কয়েকদিন পরেই আবার 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' চচ্চাড় হাতে করিয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরও পূর্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া 'আহা! কি রান্না, যেন সুধা, সুধা!' বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোপালের মা'র সে আনন্দ দেখিয়া চোখে জল আসিল। ভাবিলেন —তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন।

এইরূপে দুই-চারি মাস ঘনঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইতে লাগিল যেদিন যা রাঁধেন, ভাল লাগিলেই তাহা পরের বারে ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার সময় ব্রাহ্মণী কামারহাটি হইতে লইয়া আসেন। ঠাকুরও তাহা কত আনন্দ করিয়া খান, আবার কখনো-বা কোনো সামান্য জিনিস, যেমন সুষনি শাকচচ্চাড়, কলমী শাকচচ্চাড় ইত্যাদি আনিবার জন্য অনুরোধ করেন। কেবল 'এটা এনো, ওটা এনো', আর 'খাই খাই'-র জ্বালায় বিরক্ত হইয়া গোপালের মা কখনো কখনো ভাবেন, 'গোপাল, তোমায় ডেকে এই হলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসবো না। কিন্তু সে যে কী এক বিষম টান! দূরে গেলেই আবার কবে যাব, কতক্ষণে যাব, এই মনে হয়।'......

এইভাবে কিছুকাল কাটার পরে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে এমন একটি ব্যাপার ঘটল, যা গোপালের মা'র ব্যক্তিজীবনকে অধ্যাত্মরসপিপাসু সর্বমানবের আকর্ষণের বস্তু করে তুলল (এবং শিল্পীর আকর্ষণের বস্তুও; আমরা নন্দলালের আঁকা কয়েকটি স্কেচ এইসঙ্গে দিয়েছি) :

"'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময়ে জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে

আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠো করার মত দেখা যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন, এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট, জীবন্ত! ভাবিলেন, 'একি! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে, কেমন করে হেথায় এলেন!' গোপালের মা বলেন, 'আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐকথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশমাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এতবড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখ পানে চেয়ে (সে কী রূপ! আর কী চাউনি!) বললে, 'মা, ননী দাও।, আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়—বাড়িতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হত! কেঁদে বললুম, 'বাবা, আমি দুখিনী কাঙালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা।'

কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে শিকে থেকে শুকনো নারকেল-নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম, 'বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।'

'তারপর জপ সেদিন আর কে করে! গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমনি সকাল হল, অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চললো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর দুলছে।'

অঘোরমণি যে-দিন ঐরূপ সহসা নিজ উপাস্যদেবতার দর্শনলাভে ভাবে-প্রেমে উন্মত্তা হইয়া কামারহাটির বাগান হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট প্রত্যুষে আসিয়া উপস্থিত হন, সেদিন সেখানে আমাদের পরিচিতা অন্য একটি স্ত্রীভক্তও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিব। তিনি বলেন—

'আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করছি—বেলা সাতটা কি সাড়ে-সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম বাহিরে কে 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসছে। গলার আওয়াজটা পরিচিত—ক্রমেই নিকট হতে লাগল। চেয়ে দেখি গোপালের মা!—এলো-থেলো পাগলের মত, দুই চক্ষু যেন কপালে উঠেছে, আঁচলটা ভুঁয়ে লুটোচ্ছে, কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নেই—এমনি ভাবে ঠাকুরের ঘরে পুব দিক্‌কার দরজাটি দিয়ে ঢুকছে। ঠাকুর তখন ঘরের ভেতর ছোট তক্তপোশখানির উপর বসেছিলেন।

'গোপালের মাকে ঐরূপ দেখে আমি তো একেবারে হাঁ হয়ে গেছি—এমন সময়ে তাঁকে দেখে ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে গোপালের মা এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়লো এবং ঠাকুরও ছেলের মত তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন। গোপালের মা'র দুই চক্ষে তখন দর দর করে জল পড়ছে, আর যে ক্ষীর সর ননী এনেছিল, তাই ঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে। আমি তো দেখে অবাক আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, কারণ ইহার পূর্বে কখনও তো ঠাকুরকে ভাব হয়ে কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখিনি। শুনেছিলাম বটে, ঠাকুরের গুরু বামুনীর কখনও কখনও যশোদার ভাব হত, আর ঠাকুরও তখন গোপালভাবে তার কোলে উঠে বসতেন। যা হোক, গোপালের মা'র ঐ অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো একেবারে আড়ষ্ট। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে ভাব থামলো, এবং তিনি আপনার চৌকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সে ভাব আর থামে না। আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে' ইত্যাদি পাগলের মত বলে, আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায়। ঠাকুর তাই দেখে হেসে আমাকে বললেন—'দেখ, দেখ, আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।'......

অঘোরমণি ঐরূপভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ভাবের আধিক্যে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন কত কথাই না বলিলেন। 'এই যে গোপাল আমার কোলে'; 'ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভেতর ঢুকে গেল'; 'ঐ আবার বেরিয়ে এল—আয় বাবা দুখিনী মা'র কাছে আয়'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখনো-বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখনো-বা উজ্জ্বল বালক-মূর্তিতে তাঁহার নিকট আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব বাল্যলীলাতরঙ্গ-তুফান তুলিয়া তাহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল!

অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই 'গোপালের মা' হইলেন, এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মা'র ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন, এবং ঘরে যতকিছু ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী ছিল, সে-সব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল, 'বাবা গোপাল, তোমার দুখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে, পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েছে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করছো!' ইত্যাদি।

সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া, স্নানাহার করাইয়া, কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন; কিন্তু সেদিন আর কি জপ করা যায়! যাঁহার জন্য জপ, যাঁহাকে এতকাল ধরিয়া ভাবা,—সে যে সম্মুখে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে!

ব্রাহ্মণী শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তপোশের উপর বিছানায় শয়ন করিল। ব্রাহ্মণীর যাহাতে-তাহাতে শয়ন—মাথায় দিবার একটি বালিশও ছিল না। এখন শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই—গোপাল শুধু-মাথায় শুইয়া খুঁত খুঁত করে! অগত্যা ব্রাহ্মণী আপনার বাম বাহুপরি গোপালের মাথা রাখিয়া তাহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া ভুলাইতে লাগিল—'বাবা, আজ এই রকমে শো; রাত পোয়ালেই কাল কলকেতা গিয়ে ভূতোকে (দত্ত গৃহিণীর বড় মেয়ে) বলে তোমায় বিচি ঝেড়ে বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেব' ইত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন, সকাল-সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। এইরূপে মায়ে-পোয়ে কাঠকুড়ানো হইল—তাহার পর রান্না। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখনো কাছে বসিয়া, কখনো পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবদার করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণীও কখনো মিষ্টকথায় তাহাকে ঠান্ডা করিতে লাগিলেন, কখনো বকিতে লাগিলেন।"

গোপালের মার অপূর্ব কাহিনী আরও বলেছেন সারদানন্দ। আমি আর একটু মাত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করব, যেখানে সংশয়ী ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের সামনে ভাবের ও বিশ্বাসের এই প্রতিমাকে দাঁড় করিয়ে দিব্য কৌতুক বোধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

"এই সময়ে একদিন গোপালের মা ও শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ, উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথের তখনও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদে বেশ ঝোঁক; ঠাকুরদেবতা, পৌত্তলিকতায় বিশেষ বিদ্বেষ; তবে এটা ধারণা হইয়াছে যে, পুতুল, মূর্তি-টুর্তি অবলম্বন করিয়াও লোক নিরাকার সর্বভূতস্থ ভগবানের কাছে পেঁাছায়। ঠাকুরের রহস্যবোধটা খুব ছিল। একদিকে এই সর্বগুণান্বিত সুপন্ডিত, মেধাবী, বিচারপ্রিয়, ভগন্ডক্ত নরেন্দ্রনাথ, এবং অপরদিকে গরীব কাঙ্গালী, নামমাত্রাবলম্বনে শ্রীভগবানের দর্শন ও কৃপা-প্রয়াসী সরলবিশ্বাসী গোপালের মা, যিনি কখনও লেখাপড়া জ্ঞানবিচারের ধার দিয়াও যান নাই—উভয়কে একত্র পাইয়া এক মজা বাধাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী যেরূপে বালগোপালরূপী ভগবানের দর্শন পান এবং তদবধি গোপাল যেভাবে তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, সে সমস্ত কথা শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকট গোপালের মাকে বলিতে বলিলেন। গোপালের মা ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?' পরে ঐ বিষয়ে ঠাকুরের আশ্বাস পাইয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে গদ্‌গদস্বরে গোপালরূপী শ্রীভগবানের প্রথম দর্শনের পর হইতে দুইমাস কাল পর্যন্ত যত লীলাবিলাসের কথা আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন—কেমন

করিয়া গোপাল তাঁহার কোলে উঠিয়া, কাঁধে মাথা রাখিয়া কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সারাপথ আসিয়াছিল, আর তাঁহার লাল টুক্‌টুকে পা দুখানি তাঁহার বুকের উপর ঝুলিতেছিল, তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন; ঠাকুরের অঙ্গে কেমন মাঝে-মাঝে প্রবেশ করিয়া আবার নির্গত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়াছিল; শুইবার সময় বালিশ না পাইয়া বারবার খুঁতখুঁত করিয়াছিল; রাঁধিবার কাঠ কুড়াইয়াছিল এবং খাইবার জন্য দৌরাত্ম্য করিয়াছিল—সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে বুড়ী ভাবে বিভোর হইয়া গোপালরূপী শ্রীভগবানকে পুনরায় দর্শন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাহিরে কঠোর জ্ঞান-বিচারের আবরণ থাকিলেও ভিতরটা চিরকালই ভক্তিপ্রেমে ভরা ছিল—তিনি বুড়ীর ঐরূপ ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির কথা শুনিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। আবার বলিতে বলিতে বুড়ী বারবার নরেন্দ্রনাথকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙ্গালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—তোমরা বল, আমার এসব তো মিথ্যা নয়?' নরেন্দ্রনাথও বারবার বুড়ীকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, 'না মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য।' "[১]

গোপালের মা'র সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের তারিখ নিবেদিতার জীবনীকার আত্মপ্রাণা ও মুক্তিপ্রাণার মতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে। মিস্ মুলার ও জনৈক রাখালবাবুর সঙ্গে মিস্ নোবল দক্ষিণেশ্বর পরিদর্শনের পরে পূর্বোক্ত স্থলে যান। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, "ঘাটে অবতরণের পূর্বেই উৎসবের কোলাহল শোনা গেল।......শত শত বাঙালী যুবক অপেক্ষা করিতেছে কখন স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিবেন।...... মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন।......এখানেই সঞ্চরণশীল জনতার মধ্যে তাঁহারা জীর্ণ বস্ত্র-পরিহিতা, জপে মগ্ন গোপালের মার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। গোপালের মা'র কথা ইঁহারা পূর্বেই অবগত ছিলেন। ......গোপালের মা চিবুক স্পর্শ করিয়া বিদেশিনীগণকে সস্নেহ চুম্বন করিলেন। কেহ কাহারও ভাষা বোঝেন না, সুতরাং আলাপের প্রশ্ন ওঠে না, প্রয়োজনও ছিল না। গোপালের মা'র স্পর্শে তাঁহারা এক আন্তরিকতা অনুভব করিলেন। কোন কথা না বলিয়া গোপালের মা তাঁহাদের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরিকাগণের নিকট

---

[১] এই ঘটনাটি নিবেদিতা স্বয়ং স্বামীজীর মুখেও শুনেছেন। Sister Nivedita's Works-এর প্রথম খণ্ডে (পৃ ৩৬৫-৬৬) পাই—

"And he told us of old Gopaler-Ma,—of how she came with her stories of visions and images, and Sri Ramakrishna sent her to 'that youngman who has had an English education and taken a degree. He is a university man—you can trust his decision'—And she came, with tears, saying 'O Sir, tell me if they are true or not!' And what could he say? From that moment his opposition was broken down, and he knew, as he put it to us later, that 'Kali and Shivas are not mere imagination. They are the forms that the Bhaktas have seen."

লইয়া গেলেন। এখানেও বিস্ময়ের সহিত সাদর অভ্যর্থনা। মার্গারেটের মনে হইল, এইরূপেই ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মনীষার পরিমাপ করা যাইতে পারে।[২]

মুক্তিপ্রাণা গোপালের মা'র বাড়িতে নিবেদিতা, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডের এক যাত্রা-বিবরণ দিয়েছেন :

"স্বামীজীর নিকট গোপালের মা'র কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, একরাত্রে (১৮৯৮) তাঁহারা তিনজনে বাগবাজার হইতে নৌকা করিয়া কামারহাটি যাত্রা করেন।......পাশ্চাত্ত্য মহিলারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—গোপালের মার আনন্দের সীমা রহিল না।"

এখানে লেখার ভঙ্গিতে যদিও মনে হয়, এই রাত্রেই গোপালের মা'র সঙ্গে উক্ত তিন পাশ্চাত্ত্য মহিলার প্রথম সাক্ষাৎ, তথাপি লেখিকা-প্রদত্ত পূর্বোদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী একে পরবর্তী এক সাক্ষাৎ বলেই ধরে নেব। এখানে এই সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চাই—গোপালের মা'র বাড়িতে এই নৈশ অভিযানে 'সম্ভবত' নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন না, মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডই গিয়েছিলেন, এবং প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের অপূর্ব অভিযানের কথা নিবেদিতাকে বলেন। সে বর্ণনা নিবেদিতার মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে পরেও অনেক সময়ে চিঠিপত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"দক্ষিণেশ্বরে বড়দিনের রাত্রির কথা মনে পড়ে—কিংবা গোপালের মা'র বাড়িতে তোমার অভিযানের কথা, যাতে আমি না থাকলেও ছিলাম বলেই অনুভব করি।" (ম্যাকলাউডকে—১৮ মে, ১৯০০)

"তোমার কি মনে পড়ে—তুমি এবং ধীরা মাতা চাঁদনি রাতে গোপালের মাকে তাঁর গঙ্গাতীরের আবাসে দর্শন করতে গিয়েছিলে!" (ম্যাকলাউডকে—১৮ জুলাই, ১৯০৬)

নিবেদিতা The Master গ্রন্থে চাঁদনি রাতে এই ভ্রমণ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মনে হয়, তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তা ঠিক নয়; এখানে ধরে নিতে হবে, ম্যাকলাউড প্রভৃতির মুখ থেকে শুনে ব্যাপারটিকে তিনি কল্পনায় বাস্তববৎ দর্শন করেন, এবং তদনুযায়ী বর্ণনা করেন, যা করতে তাঁর কোনই

২ স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'সাধিকামালায়' প্রথম সাক্ষাতের ভিন্ন বিবরণ পাই—"গোপালের মা নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম দেখেন, সেদিন স্বামী সদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারের রাস্তায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। গোপালের মা সদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও গুপ্ত, এটী কে রে? এ কি নরেনের মেয়ে যে তার সঙ্গে এসেছে?' তখন ব্রাহ্মণী নিবেদিতাকে সস্নেহে দু'একটি কথা বলিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার ডান হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। নিবেদিতা পরে বলিতেন—'যখন গোপালের মা আমার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আমার দেহ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চ হইল, প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ বহিল, নূতন প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিলাম।'" কোন্ সূত্রে জগদীশ্বরানন্দ এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা জানান নি, আমাদেরও জানা নেই।

অসুবিধা হয়নি যেহেতু পরবর্তীকালে গোপালের মা'র বাড়িতে তিনি অনেকবারই গিয়েছেন।[৩]

নিবেদিতা, মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডের একত্রে একবার গোপালের মার দর্শনে যাত্রার কথা স্বামী সারদানন্দও জানিয়েছেন, কিন্তু সেটি ঠিক কবে ঘটেছিল তা আমরা জানি না—

"শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর সারা (মিসেস বুল), জয়া (ম্যাকলাউড) ও নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহারা একদিন গোপালের মাকে কামারহাটিতে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হন। আমাদের মনে আছে, গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, আপনার বিছানায় সাদরে বসাইয়া মুড়ি, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন, ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা সানন্দে ভক্ষণ ও তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন।"

বর্ণনা-ভঙ্গিতে মনে হয়, এই সাক্ষাৎকারকালে স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি দোভাষীর কাজ করেন।

গোপালের মা'র বিষয়ে নিজের সমগ্র মনোভাবকে নিবেদিতা সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন 'আচার্যদেব' গ্রন্থের মধ্যে :

"গোপালের মা অতি বৃদ্ধা রমণী। পনের কি কুড়ি বছর আগে, যখনই তিনি যথেষ্ট প্রাচীনা, সেই সময়ে একদিন দুপুরে তাঁর কামারহাটির গঙ্গাতীরের ছোট ঘরটি থেকে পায়ে হেঁটে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন।[৪] শোনা যায়, ঠাকুর যেন তাঁরই প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা করছিলেন।

[৩] এখানে মুক্তিপ্রাণা-প্রদত্ত আর একটি তথ্যের সম্পূর্ণ সত্যতা স্বীকারে বাধা আছে। তিনি লিখেছেন—"যে মালায় জপ করিয়া গোপালের মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেটি নিবেদিতা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখিয়া দেন।" কিন্তু স্বামী সারদানন্দ বলেন, গোপালের মা'র গোপাল-সিদ্ধির পরে তাঁর অতিরিক্ত জপের প্রয়োজনীয়তা নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলায় গোপালের মা 'থলি মালা সব' গঙ্গার জলে ফেলে দেন; পরে পুনশ্চ আর একটি জপের মালা নেন, কারণ 'একটা কিছু তো করতে হবে! চব্বিশ ঘণ্টা করি কি? তাই গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।' এখানে মুক্তিপ্রাণার পক্ষে জানানো দরকার, জপের মালার ব্যাপারে তিনি স্বয়ং নিবেদিতাকে অনুসরণ করেছেন, এবং নিবেদিতার উক্তির সঙ্গে সারদানন্দের উক্তির পূর্বোক্ত প্রকারের পার্থক্য আছে।

[৪] নিবেদিতার এই বিবরণের সঙ্গে সারদানন্দের বিবরণের পার্থক্য আছে। সারদানন্দ জানিয়েছেন, গোপালের মা কামারহাটির গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাড়ি থেকে বিধবা দত্ত-গৃহিণী ও কামিনী নাম্নী দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার সঙ্গে নৌকাযোগে (পায়ে হেঁটে নয়) দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। এখানে আমরা নিবেদিতার চেয়ে সারদানন্দের বিবরণকেই নির্ভরযোগ্য মনে করি। প্রথম দর্শনের পরে অবশ্য গোপালের মা একলা পায়ে হেঁটেই শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে যেতেন।

অপরদিকে এই ব্রাহ্মণীও—গোপালকৃষ্ণের আরাধনা যিনি এতদিন করে এসেছেন—ঠাকুরের মধ্যে সেই বালগোপালকে দর্শন করে অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হন।[৫] ঠাকুরের প্রতি তাঁর এই গোপালভাব এতই গভীর সত্য হয়ে উঠেছিল যে অতঃপর আর কখনো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন নি—কেননা ঠাকুর তাঁকে মা বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি মাতাঠাকুরাণীকে কখনো 'বৌমা' ভিন্ন বলেছেন, এমন শুনিনি।

শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে থাকাকালে আমি গোপালের মাকে কলকাতায় কখনো শ্রীমায়ের কাছে থাকতে, বা কয়েক সপ্তাহ একাদিক্রমে কামারহাটিতে কাটাতে দেখেছি। সেখানে, কামারহাটিতে, তাঁর দর্শনে আমাদের মধ্যে কয়েকজন গিয়েছিলেন এক পূর্ণিমা রজনীতে। অপরূপ সুন্দর গঙ্গার মধ্য দিয়ে নৌকা ধীরে ধীরে বয়ে গিয়েছিল। নদীজল থেকে উঁচু চত্বরের দিকে উঠে-যাওয়া দীর্ঘ সার সার সিঁড়িগুলি—তাও কত অপূর্ব!—সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে, ঘাসে-ঢাকা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে, দক্ষিণে আবৃত অবরোধতুল্য বারান্দায় ছোট্ট একটি ঘর, হয়তো সেটি বৃহৎ অট্টালিকাপ্রান্তে ভৃত্যদের জন্যই নির্মিত হয়েছিল—সেই ঘরেই গোপালের মা'র ঠাঁই, সেই ঘরেই বছরের পর বছর ধরে জপ। অট্টালিকা এখন শূন্য। তাঁর ছোট ঘরটিতেও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ব্যবস্থা নেই। পাথরের মেঝে, সেই মেঝেতেই শয়ন। অতিথিদের বসবার জন্য যে মাদুর পেতে দিলেন, তা তাকে তোলা ছিল—সেখান থেকে পেড়ে এনে মেঝেয় বিছিয়ে দিলেন। তাঁর সঞ্চয়ের মধ্যে দুটি মুড়ি আর কিছু বাতাসা, একটি মাটির হাঁড়িতে করে শিকেয় ঝোলানো ছিল, শুধু তাই দিয়েই হল অতিথি সৎকার। জায়গাটি কিন্তু ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। গঙ্গাজল কষ্ট করে তুলে এনে অবিরত ধোয়া-মোছা করেন। কাছের এক কুলুঙ্গীতে এক খণ্ড রামায়ণ, ভাঙাচোরা বড় চশমাখানি, জপের মালার সাদা ছোট ঝোলাটি। এই মালা জপ করেই গোপালের মা সিদ্ধ হয়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—কত বছর!—দিবারাত্র এই মালা হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে কাটিয়েছেন!

সিত উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মাথা নাড়িয়ে কানাকানি করছে কৃষ্ণচ্ছায়াবৎ বৃক্ষ লতা পুষ্পাদি—সে যেন কোন্ মর্মরশুভ্র স্বপ্নলোকে। কিন্তু সুগভীর শান্তির চিরমন্দিরের মত গোপালের মা'র ক্ষুদ্র কক্ষটির চেয়ে বড় স্বপ্নলোক আর কী হতে পারে আমাদের দ্রুত ধাবমান জীবনের কাছে! 'আ—হা!—এই হল পুরাতনী ভারতবর্ষ—তোমরা যা দেখে এলে!' স্বামীজী এই স্থানদর্শনের কথা শুনে বলেছিলেন,—'এই হল বেদনা ও প্রার্থনার ভারতবর্ষ! উপবাস ও নিষ্ঠার ভারতবর্ষ! এ ভারত চলে যাচ্ছে—আর ফিরবে না কোনোদিন!'

কলকাতায় এসে জনৈক ইউরোপীয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে অবস্থানের ব্যাপারে গোপালের মা'র আশী বছরের সংস্কার হয়তো কিছু বেশীই আহত হয়েছিল। কিন্তু একবার তা কাটিয়ে ওঠার পরে তিনি উদারতার প্রতিমূর্তি। অবশ্যই তিনি রক্ষণশীল, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বদ্ধমূল গোঁড়া কদাপি নন। দৈনন্দিন

[৫] এই দর্শন ও অনুভূতি প্রথম সাক্ষাৎকালে হয়নি, পরে হয়েছিল।

জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে শ্রীমায়ের বাড়ির পূজার্চনারীতির সঙ্গে তাঁর গঙ্গাতীরের তপস্যাকুটীরের কোনো পার্থক্যই তাঁর মনে ওঠেনি।"[৬]

গোপালের মা'র তপস্যায় বাঁধা কঠোর নিষ্ঠার জীবনে বহু তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে,—তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। 'ভাঁতের হাঁড়ির' ব্যাপারে একদা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শকে পর্যন্ত ডরিয়েছেন,[৭] তিনিই পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের বাড়িতে ম্লেচ্ছ বিদেশীর সঙ্গে একত্র থেকেছেন এবং আরও পরে উক্ত ম্লেচ্ছ মহিলার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন জীবনসন্ধ্যায়।[৮]

মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই—গোপালের মা অসুস্থ, ও বার্ধক্যে অশক্ত হয়ে পড়লে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন পর্যন্ত কলকাতায় শ্রীমায়ের নির্দিষ্ট বাসস্থান ঠিক না হওয়ায় নিবেদিতা প্রস্তাব করেন, তাঁর বাড়ির একটি পৃথক ঘরে গোপালের মা বাস করতে পারেন। তদনুযায়ী ১৯০৩ ডিসেম্বরের গোড়ায় ('মাঝামাঝি' নয়, মুক্তিপ্রাণা যা লিখেছেন) গোপালের মা নিবেদিতার বাড়িতে আসেন, পৃথক একটি কক্ষে বাস করতে থাকেন এবং কুসুম নামক এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর পরিচর্যার ভার নেন।[৯]

---

[৬] স্বামী নির্লেপানন্দ লিখিত 'দেবী অঘোরমণি' পুস্তিকায় পাই—"স্বামীজী একবার বলেন, 'আমার সব সাহেব-মেম চেলারা আছে, তাদের তুমি কাছে আসতে দেবে কি—না তোমার জাত যাবে?' তাহাতে অঘোরমণি উত্তর করেন, 'সে কি বাবা, তারা তোমার সন্তান; তাদের আমি আদর করে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেবো গো!'" (কুসুম দেবী কথিত)

[৭] "অঘোরমণি কড়ে রাঁড়ী—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে, 'ওরা সব যন্ত্রী রাঁড়ী, নুনটুকু পর্যন্ত ধুয়ে খায়।'...বেজায় আচার-বিচার! আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্‌নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।"—সারদানন্দ রচিত 'গোপালের মা'।

[৮] লেডী অবলা বসু লিখেছেন, নিবেদিতার চরিত্রগুণে অতি রক্ষণশীল স্নিগ্ধ তাপসীও তাঁর আতিথ্য নিয়ে খুশী হয়েছিলেন। এখানে শ্রীমতী বসু গোপালের মা'র কথাই বলেছেন।

[৯] গোপালের মা'র সেবিকা কুসুম দেবীর কাছ থেকে স্বামী নির্লেপানন্দ যে স্মৃতি-কথা সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাঁর 'দেবী অঘোরমণি' পুস্তিকায়, তাতে গোপালের মা ও নিবেদিতার সম্পর্ক বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথ্য পাই—

"কামারহাটী বাগানে থাকাকালে (স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে) গোপালের মার একবার কঠিন আমাশয় পীড়া হইল। এই সময় সেবিকা (কুসুম) তিনমাস একাদিক্রমে সেবা করেন। পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ, নিবেদিতা ও আর একটি মেমকে (নিবেদিতার পরিচারিকা বেট?) লইয়া প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। হোমিওপ্যাথি ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গণেন ব্রহ্মচারী ঔষধ দিয়া আসিতেন। একটি ঝি ছিল। রাত্রে ঘরের কোলে চওড়া দালানে একটি লণ্ঠন জ্বলিত। যে-ঘরে তিনি শয়ন করিতেন, সে ঘরে কাহাকেও শয়ন করিতে দিতেন না।"

পরবর্তীকালে শেষ অসুখের সময়ে যখন নিবেদিতার বাড়িতে ছিলেন, তখন—"ভাত, জলখাবার ইত্যাদির জন্য মাসিক দশ টাকা ব্যয়ভার নিবেদিতা বহন করিতেন। মাথার চুল বড় হইলে মেনীর মা আসিয়া ছাঁটিয়া দিতেন। নিবেদিতা অঘোরমণিকে দুই তলার উপরই রাখিতেন। ক্রমশঃ যখন অথর্ব হইয়া পড়িলেন তখন নাওয়ানো ধোয়ানো, শিশুর

নিবেদিতার কাছে গোপালের মা 'শ্রীমায়ের মতই আর একটি আশ্চর্য আত্মা'রূপে প্রতীয়মান—সুতরাং তাঁকে কাছে পেয়ে নিবেদিতার আনন্দের সীমা থাকার কথা নয়। সে আবেগ তিনি অনেকবারই চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। ৯ই ডিসেম্বর ১৯০৩, বান্ধবীকে লিখেছেন,—"গোপালের মার কাছে থাকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে। সেন্ট এলিজাবেথের কথাগুলো কানে বাজে : 'কী এমন আমি যে আমার ঠাকুরের মা আমায় দেখতে আসবেন!' গোপালের মা'র যে পরমহংস অবস্থা, এ আমি বিশ্বাস করি। মনে হয়, যদি শুধু ওঁকেই পূজা করতে পারি, তাহলেই যাদের ভালবাসি, তাদের 'পরে বিধাতার আশীর্বাদ অজস্র হয়ে ঝরে পড়বে। এর বেশী আর কী বলব!" (নারায়ণী দেবী অনূদিত রেম'র নিবেদিতা জীবনী)। ১৭ ডিসেম্বর মিসেস বুলকে—"গতবার তোমায় লিখে উঠতে পারিনি কারণ গোপালের মা এসে হাজির হয়েছিলেন; তিনি এক সপ্তাহ এখানে আছেন। কী অসাধারণ লাগছে—অনুভব করতে পারো!" ম্যাকলাউডকে—"গোপালের মা এখানে আছেন। আমার কী যে আনন্দ! স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, তিনি আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেন—আমাদের আদরের ছোট্ট ঠাকুরমা!"

গোপালের মার নিকট-সান্নিধ্যের সৌভাগ্যে নিবেদিতা নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। সেবায় শুশ্রূষায় নিজের নিত্য প্রণাম নিবেদন করেছেন এই সিদ্ধ নারীর প্রতি। উভয়ের সম্পর্কের একটি অনবদ্য ছবি এঁকেছেন লিজেল রেমঁ—

"ভোরবেলায় নিবেদিতা তাঁর দোরগোড়ায় গিয়ে বসে থাকেন, কখন বুড়ি ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলবেন, এই প্রতীক্ষায়। এমনি প্রতিদিন। গোপালের মা হয়তো স্তব পড়ছেন কি জপ করছেন। নিবেদিতাকে দেখলেই তাঁর বলিকুঞ্চিত মুখ খুশির হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে। নিবেদিতাকে কাছে টেনে এনে একটু ফল-মিষ্টি মুখে তুলে দেওয়া চাই-ই রোজ।

গোপালের মা'র ঘরে ঠাকুরদের আনাগোনা চলে, কিন্তু তাঁদের কথা বুড়ি মুখেও আনবেন না। কথা কইলেই তাঁরা নাকি ভয় পান। ঘরের বাতাস ভরে আছে গোপালের বাঁশির সুরে, সে-সুরও যায় থেমে। এ খবর নিবেদিতার অজানা নয়, তাই তিনি চুপ করে থাকেন।

রাতে যখন গোপালের মা কষ্ট পান, নিবেদিতা গা-হাত-পা টিপে দেন। মা

মত সব কিছুই একজন ঝি করিয়া দিত। ইহার জন্য স্বতন্ত্র আট টাকা নিবেদিতার মাসিক খরচ হইত।

তাঁহার শরীর যাইবার পর তাঁহার প্রিয় জপমালাটি পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ সেবিকা কুসুমকে দেন। নিবেদিতার কিন্তু সেটির উপর ভারী ঝোঁক। সেটি লইবার জন্য চমৎকার-ভাবে নিবেদিতা বলিলেন—'ওঁকে (কুসুমকে) যা দেবার, তা তো পূর্ণ করে দিয়েছেন, যথেষ্ট,—আমার জপমালাটি চাই।'...

নিবেদিতার ছবিতে তাঁহার কণ্ঠে যে জপমালা দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ ইহাই।"

গোপালের মার পাদমূলে উপবিষ্টা নিবেদিতার যে ছবি দেখা যায়, তাহা নিবেদিতার ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তোলা, গোপালের মার শেষ অসুখের সময়ে, সময় আনুমানিক জুন, ১৯০৬। গোপালের মার মাথার দিকে পাখা হাতে মহিলাই কুসুম। ছবিটি তাঁর কাছ থেকেই সংগৃহীত। ছবির বিষয়ে কুসুম দেবী বলেন—"চোখ বুজেই শুয়ে থাকতেন। ছবি তোলার সময় নিবেদিতা বারবার চোখ চাইতে বললেন। তিন-চারবার 'মা, চোখ খুলুন' বলা হল। কিছুতেই চোখ চাইলেন না।"

যেমন রুগ্ন মেয়ের যত্ন করে তেমনি যত্ন করেন তাঁর। জগদীশ্বরী যেন অসহায় দুর্বল সেজে সেবা নিতে এসেছেন, এমনি মনে হয় নিবেদিতার। নিজের মায়ের কোনো সেবাতেই তো লাগেননি, গোপালের মা যেন নিবেদিতার সেই মা-জননী।"

নিবেদিতার বাড়িতে গোপালের মা'র আড়াই বছর কাটে। নিবেদিতার চোখের উপর দিয়েই তাঁর জীবনদীপ ক্রমে নিভে আসে। ১৬ জুলাই, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"গোপালের মা'র স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ছেলেমানুষ হয়ে উঠছেন।" প্রায় এক বছর পরে ৪ মে, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকেই—"গোপালের মা আমাদের সঙ্গে আছেন, জানো তো! ভারী মিষ্টি—আবার কখনো-কখনো খুব ঝঞ্ঝাট বাধান। কিন্তু তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়া নিত্য আনন্দের কারণ।" ২৯ জুন, ১৯০৬, একই মহিলাকে—"আমাদের বাড়ির পিছন দিকে নিজের ঘরে শুয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গোপালের মা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন।" এবং ১২ জুলাই মৃত্যুসংবাদ—"গোপালের মা'র দেহ গেছে। গত রবিবার ঊষাকালে গঙ্গাতীরে তাঁর নির্বাণ হয়েছে—অতি পবিত্র এবং শান্ত প্রয়াণ। এখন মুক্ত আত্মা।"

এর পরে ১৮ জুলাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সংবাদ—"গোপালের মা রবিবার ঊষাকালে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছেন, আজ তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সকাল দশটায় কোনো কোনো আমন্ত্রিত এসেছেন, যাঁরা রাত আটটায় ফিরবেন বলে গাড়িকে বলে দিয়েছেন!......এখন কীর্তনসম্রাজ্ঞী যন্ত্রবাদ্যাদিসহ তলায় অপেক্ষমাণা। হাসিম খাঁ ও তার দলবলকে তোমার মনে আছে?"[১০]

৮ জুলাই, ১৯০৬ গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মমুহূর্তে গোপালের মা'র প্রয়াণ ঘটে। এর দু'দিন আগে তাঁকে 'গঙ্গাযাত্রা' করানো হয়। যাত্রাকালে নিবেদিতা পুষ্প-চন্দন-মাল্যাদি দিয়ে নিজে তাঁর শয্যা সাজিয়ে দেন, ও 'স্বয়ং অনাবৃতপদে সাশ্রুনয়নে' তাঁর সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়ে মৃত্যু অবধি দুইরাত্রি কাটান। গোপালের মা'র যথাবিহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও কীর্তনাদির ব্যবস্থাও নিবেদিতা করেছিলেন।

---

[১০] উদ্বোধন পত্রিকায় ১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৩-তে গোপালের মা'র মৃত্যু উপলক্ষে লেখা হয়—

"বিগত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, রবিবার 'গোপালের মা' নামে পরিচিতা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক পরম ভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বর্ষ হইয়াছিল। ইনি পূর্বে কামারহাটিতে কলুটোলার গোবিন্দ দত্তর ঠাকুরবাড়িতে থাকিতেন। ইনি পরমহংসদেবকে আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং তাঁহাকে গোপাল বলিতেন। এই কারণেই তাঁহার নাম 'গোপালের মা' হইয়াছিল। ইঁহার সাধননিষ্ঠা অদ্ভুত ছিল। শুনা যায়, কলিকাতায় যেবার প্রবল ভূকম্প হয়, সেবার ইনি কামারহাটির নিজ গৃহ দোদুল্যমান হইতে থাকিলেও একমনে জপে নিমগ্ন ছিলেন। ইদানীং শরীর অতিশয় রুগ্ন হওয়ায় কলিকাতা বোসপাড়ায় সিস্টার নিবেদিতার নিকট থাকিতেন। নিবেদিতাও প্রাণপণে ইঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। বিগত ২রা শ্রাবণ ইঁহার স্মরণার্থ সিস্টার নিবেদিতা নিজ গৃহে এক মহোৎসব করেন। প্রায় দেড়শত দুইশত মহিলার সমাগম হয়। সিস্টারের যত্নে ও আতিথ্যে সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ ব্রোমাইড ফটো নানাবিধ ফলফুলে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং নিকটে গোপালের মারও একখানি ফটো রাখা হয়। সুমধুর কীর্তন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরিত হয়।"

গোপালের মা'র প্রসঙ্গ শেষ করছি তাঁর দেহান্তের পরে লিখিত নিবেদিতার একটি রচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করে।[১১] ঐ রচনার গোড়ার দিকে নিবেদিতা ভারতীয় ভাষার নানা শব্দকে ভাষান্তরিত করা যে অসম্ভব, তার আলোচনাপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 'গোপাল' শব্দটির উল্লেখ করেন। 'গোপাল'-এর আক্ষরিক অর্থ গো-পালক, কিন্তু আসল অর্থ শিশু কৃষ্ণ—ইউরোপের ক্ষেত্রে যা হল Christ-Child. গোপালের মা ভারতবর্ষের Christ-Child-এর মাতা। এর পরে নিবেদিতা গোপালের মা'র মহাপ্রয়াণের ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা করেছেন। তারই অনুবাদ—

"সারারাত্রি ধরে আমরা মুমূর্ষুর ধীর গভীর শ্বাসের ওঠা-পড়া লক্ষ্য করছিলাম। গভীরে, আরো গভীরে, আরো আরো গভীরে—স্ফীত, পরিস্ফীত শ্বাস প্রবেশ করে যায়, মনে হয় ঐ অতি প্রাচীন দেহ বুঝি সব স্পন্দন হারিয়ে ফেলল—তারপরেই শ্বাসমুক্তি, পরপর কয়েকটি দ্রুত অন্তঃশ্বাস। এরকম শ্বাসগতি নাকি কদাচিৎ দেখা যায়—বহু বৎসরের প্রাণায়ামের ফলেই এ জিনিস হওয়া সম্ভব। জপমালা হাতে এই বৃদ্ধা 'গোপালমন্ত্র' জপ করে গেছেন দিবারাত্র; মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে, সেই সময়ে অসচেতনেই নিরন্তর ঘটে গেছে প্রাণায়াম।

কেন না—ইনি যে গোপালের মা। যাঁর পাশে বসে ছিলাম আমরা—যাঁকে দেখছিলাম—ইনি সেই সিদ্ধা তাপসী, যাঁকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মায়ের মত দেখতেন।

শায়িত তপস্বিনী—অণুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর, কোনোদিনই ছিল না তা। একটি ভাবে শুদ্ধ মন স্থির—যা তাঁর জীবনসর্বস্ব। সেই ভাবেরই আনন্দে ও পরমা শান্তির শেষ কিরণে উদ্‌ভাসিত আনন। এই ভাবেই গঙ্গাতীরে শুয়ে আছেন পূর্ণ এক রাত্রি ও এক দিন। পূর্ণিমার চাঁদ যখন আকাশে উঠেছিল, তখন আমরা তাঁকে দুয়ারের বাইরে এনেছিলাম। পার্থিব বন্ধনের প্রথম বেষ্টনী—গৃহবন্ধনকে যখন তিনি পেরিয়ে গেলেন জয়হর্ষের সঙ্গে—আমরা অনুভব করেছিলাম তাঁর আত্মার নীরব ধীর ঊর্ধ্বপ্রয়াণ। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে যখন এলেন, স্নিগ্ধ শীতল বাতাস যখন বয়ে গেল তাঁর দেহের উপর দিয়ে, তারই মধ্যে, উজ্জ্বল পূর্ণিমালোকের মধ্যে যখন তিনি রইলেন কিছুক্ষণ—তখন আত্মার পুনঃ প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যেন দেখা গেল তাঁর মধ্যে, মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে যা সচরাচর দেখা যায় না। তারপরে, পূর্ণ নির্বাপণের পূর্বে, আরও অনেক ঘণ্টা ধরে জীবনদীপ জ্বলতে লাগল জীর্ণ আধারে।

এইকালে সম্পূর্ণ চৈতন্যহারা কিন্তু হননি। তাঁর চাহনি যাদের উপর পড়েছে, তাদের মনে হয়েছে, তিনি যেন তাদের চিনেছেন। আর শেষ সকালে, পুরোহিত এসে যখন উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই সাড়া দিয়েছিলেন, যেন বিশেষ আবেগের সঙ্গেই। সারা জীবন তিনি গোপালভাবের সাধনা করেছেন, তাই নব্বুই-উত্তীর্ণ তাঁর প্রাচীন জীর্ণ দেহ যখন বিদায় নিচ্ছে, সেই শেষ ক্ষণে

---

[১১] রচনাটি প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, পরে Studies from an Eastern Home-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিশুর নির্ভরতায় ভরে থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। শুধু দেহের কাঁপন, কি মাথার একটু নড়াচড়ায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য প্রকাশ হয়তো ছিল!

কিন্তু সে অবস্থাও এখন অতীত। আবার রাত্রি ঘনিয়েছে। বহু ঘণ্টা ধরে শায়িত, স্থির—সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ। শান্তি! পৃথিবীতে যাঁর কোনো কামনাই নেই তাঁরই যোগ্য শান্তি!

প্রতীক্ষা করে আছি আমরা মেয়ের দল, কানে আসছে ঘাটের তলায় সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গার ছল্ ছল্ ছলাৎ শব্দ, কিংবা বর্ষার ঝড়ো হাওয়ার চাপা দীর্ঘশ্বাস, যখন তা নদীতরঙ্গের উপর দিয়ে ঝাপট দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তারই মধ্যে একবার—তখন মধ্যরাত্রি—মধ্যরাত্রির ঘণ্টাখানেক পরে কি?—হঠাৎ নীরবতাকে মথিত করে মেঘাবৃত পূর্ণিমাকাশের তলবর্তী নদীতরঙ্গ পাক খেয়ে ছুটল প্রচণ্ড বেগে, নোঙর করা নৌকাগুলি গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে লাগল, রব উঠল—'বান আসছে! বান আসছে!' সেই দেখে বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়েকজনের—এই বিদায়ী আত্মা যাদের কাছে সুহৃদ্ ও গুরু। তারা ভাবল—এই বন্যাই তো সংকেত—ঘনিয়ে আসছে বিদায়-ক্ষণ—স্বজন, স্বভূমি ছেড়ে এবার তিনি প্রস্থান করবেন অজানালোকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলেও এখনো একই প্রকার। বিশ্রাম ছেড়ে কেউ হয়ত উঠে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধাকোমল হাতে কিছু পরিচর্যা করলেন, অন্য কেউ কিছু বিশ্রামের প্রয়োজনে শুয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ কিছু চাঞ্চল্য, নিদ্রিতকে কার ছোট একটি হাত স্পর্শ করে জাগাল: 'বাহকদের ডাক! শেষ হয়ে আসছে!' তারা বসেছিল ঘাটের উপরের চত্বরে, সারারাত্রি বসে তারা পুরনো কথা বলছিল, এই বিদায়ী জীবনের সঙ্গে নানাজনের সম্পর্কের কথা আলোচনা করছিল সারাক্ষণ—সুতরাং ডাকা মাত্র তারা উঠে আসতে পারল, অবিলম্বে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মুমূর্ষুকে খাটিয়ায় তুলে গেরুয়া ও সাদা কাপড়-পরা ঐ সব বাহকেরা কাঁধে করে উত্তরের ঘর থেকে দ্রুত বাইরে নিয়ে এল—কয়েক পা নীচেই গঙ্গাতট, সেখানে পবিত্র বারিতে পাদস্পর্শ করে শায়িত হবেন গোপালের মা—তারপর চলে যাবেন।

শুয়ে আছেন সেখানে—শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে, এখন তার সহজ উত্থান পতন। আবাল্য গোপালের মাকে জানেন, এমন এক সন্ন্যাসী তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসানির সুরে মৃত্যুকালে হিন্দুর একান্ত ইচ্ছার মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন: 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ! ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!' তারপরে—শুধু এক মুহূর্ত—তারপরেই সমবেত কণ্ঠে—'হরিবোল!'—নির্গত হয়ে গেছে প্রাণবায়ু! গোপালের মা'র আত্মা ঊর্ধ্বপথে—পড়ে আছে দেহযন্ত্র।

'এখন কি ঊষাক্ষণ!'—মেঘের পিছনে স্বচ্ছতার আভাস দেখে খাটিয়ার মাথার দিকের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। পায়ের দিক থেকে উত্তর এল—'হাঁ, তাই বটে—ঊষা!' আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে দেখলাম, যে-বারিধারা মুমূর্ষুর চরণ স্পর্শ করে বয়ে যাচ্ছিল, তা সরে গেছে, নেমে গেছে কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই। গোপালের মা সত্যই ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেহত্যাগ করেছেন—নদীর স্রোত ফেরার ঠিক মুখে।

মাতৃমণ্ডলী মধ্যে

শ্রীমার আবাসে বহু সময় নিবেদিতা কাটাতেন বলে শ্রীমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী গভীর পরিচয় হয়েছিল। গোপালের মার প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করেছি। বাকিদের বিষয়ে নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে অল্প কিছু লিখেছেন।—

"এইকালে সারদাদেবীর আবাসে যে-সব মহিলা সর্বসময়ে থাকতেন তাঁরা হলেন—গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি, এবং আরও অনেকে। এঁরা সকলেই বিধবা—প্রথম ও শেষ জন বালবিধবা—সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা, তাঁদের দীক্ষা হয়েছিল যখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকতেন। লক্ষ্মীদিদি আবার তাঁর ভাইঝি, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী।"

যোগীন মা অর্থাৎ যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। শ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গিনী ইনি, উচ্চ বংশের কন্যা ও বধূ। স্বামী অতীব ধনী কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, তাই এঁর সংসার-জীবন বেদনাময়। সান্ত্বনা পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় এবং শ্রীমার আশ্রয়ে ও সান্নিধ্যে। মেধা ও মনস্বিতা ছিল অসাধারণ। নিজ চেষ্টায় সুবিশাল পুরাণসাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ও সমগ্র রামকৃষ্ণ-সাহিত্য আয়ত্ত করেছিলেন, যার অনেকখানি অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।*

ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমায়ের আবাসে থাকাকালে ভারতীয় পুরাণকথা সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা যোগীন মা'র কাছ থেকেই লাভ করেন, সেকথা তিনি তাঁর Cradle Tales of Hinduism নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

"এই গ্রন্থের প্রস্তুতিকালে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যোগীন মাতা নামক হিন্দু মহিলাকে—যে-সহৃদয়া প্রতিবেশীর ধর্মগ্রন্থাদি বিষয়ে গভীর ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একমাত্র তুলনা তরুণতর এক জিজ্ঞাসুকে সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর সদা-প্রস্তুত ও অব্যাহত চেষ্টা।"

দার্জিলিঙ-এ শেষ যাত্রার আগে নিবেদিতা বিদায় নেবার জন্য উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। সেখানে—"যোগীন-মাকে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন, 'যোগীন-মা. আমি বোধহয় আর ফিরব না।' যোগীন-মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'একি নিবেদিতা, তুমি একথা বলছ কেন?' নিবেদিতা বলিলেন, 'কি জানি যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এই বোধহয় শেষ।' যোগীন-মা তাঁহাকে ঐসব কথা বলিতে বা

---

* স্বামী নির্লেপানন্দের রচনা থেকে নেওয়া।

চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু তাঁহার মন নিবেদিতার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল।" (মুক্তিপ্রাণা)

'আচার্যদেব' গ্রন্থে **লক্ষ্মীদিদির** প্রতি নিবেদিতা বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। লক্ষ্মীদিদির আকর্ষণী ব্যক্তিত্বে নিবেদিতা মুগ্ধ ছিলেন। "লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রী।...বিবাহের অব্যবহিতকাল পরেই স্বামী লোকান্তরিত। তদবধি তাঁহার খুড়ীমাতা পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর (সারদাদেবীর) সহিত কামারপুকুরে, ও তৎপরে উভয়েই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উত্তরে নহবতে বহু বৎসর কাটান। পরমহংসদেবকে সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর খুব ঘনিষ্ঠ ও আপনজন-রূপে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"*

'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"লক্ষ্মীদিদির কাছে অনেকেই দীক্ষা ও ধর্মোপদেশ নিতে খুবই ব্যগ্র। ইনি অতীব গুণশালিনী মহিলা; এ'র সান্নিধ্য পরম আনন্দদায়ক। যাত্রা-গানের ধর্মভাব-মূলক সংলাপাদি তিনি কখনো ক্রমান্বয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করে যেতেন, কখনো-বা শান্ত নীরব ঘরটিকে ভরিয়ে তুলতেন স্নিগ্ধ আমোদে, যখন সকলকে নিয়ে পুরাণ-পালার সাজসজ্জা করাতেন,—কালী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী বা কদমতলায় কৃষ্ণ,—এইসব সাজের ব্যবস্থা এমনভাবে করাতেন যে, নাটকীয় উপাদান অল্প থাকলেও ফল হত অপরূপ।

শোনা যায়, এই ধরনের মজার ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের খুবই সায় ছিল। মহিলারা বলেন, ঠাকুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মীয় নাটক আবৃত্তি করে যেতেন, এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চরিত্র নিজেই অভিনয় করতেন,—তার দ্বারা উপস্থিত সকলকে ঐ সব স্তব-পূজার মর্ম অনুভব করিয়ে দিতেন।"

লক্ষ্মীমণির দেবী-সজ্জার বিষয়ে নিবেদিতা যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার চিত্রাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর 'দেবী অঘোরমণি' নামক পুস্তিকায়। অঘোরমণির (গোপালের মা) সেবিকা কুসুমের কাছ থেকে স্বামী নির্লেপানন্দ তথ্য সংগ্রহ করেছেন।—

"২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের উপর শ্রীমার ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বৈকালে এক বিরাট আনন্দের হাট ঠাকুরঘরেই বসিত। মা স্বয়ং উপস্থিত। চতুর্দিক হইতে বাবুরাম মহারাজের মা, বলরাম-গৃহিণী, যোগীন মা ও তাঁহার মা, গোলাপ মা, অসীমের মা, মেনীর মা, মাস্টার-গৃহিণী, গৌর মা প্রভৃতি আরও অনেক মহিলা ভক্তবৃন্দ পরস্পর মিলিতেন। অঘোরমণিকেও মধ্যে মধ্যে ইহার ভিতর একজন প্রধানারূপে দেখা যাইত।...নিবেদিতাও তাঁহার নিকটস্থ স্কুলবাটী হইতে এই আসরে যোগদান করিতেন।

* স্বামী নির্লেপানন্দ লিখিত—'শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি' পুস্তিকা।

এক সময় কয়েকদিন উপরি উপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরম পবিত্রাত্মা লক্ষ্মীমণি দেবী সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন।...গোলাপ মা তাঁহার জামাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী হইতে নানারূপ পিতলের গহনা—বালা, হার, অনন্ত, বাজু, রূপার পাঁইজোর প্রভৃতি জোগাড় করিয়া সুন্দর নববস্ত্রে লক্ষ্মীমণিকে বৃন্দের ভূমিকায় সুসজ্জিতা করিতেন। লক্ষ্মীদেবী বালবিধবা, তাঁহাকে এমনই দেখিতে সোনার গৌরীর মত, কোনো অলঙ্কার আভরণের প্রয়োজন ছিল না, তবু বৃন্দের ভাবটি স্পষ্ট ও চাক্ষুষ করিবার জন্য ঐ সজ্জা। তিনি চমৎকার নকল করিতে পারিতেন। গলাও মিষ্ট। অসম্ভব রকমের স্মরণশক্তি ছিল। পালাকে পালা এক একদিন দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্মীদেবী গাহিতেন।...

নিবেদিতা রামপ্রসাদের গান শুনিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বাংলা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। রামপ্রসাদী শুনিবার জন্য তাঁহাকে পালার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে লক্ষ্মীদেবী ফরমাসমাফিক প্রসাদী সুর ধরিতেন।

নিবেদিতা বালিকার ন্যায় আমোদ ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি নিজে থাবা গাড়িয়া মেঝেতে চতুষ্পদ সিংহ হইয়া গেলেন, এবং পিঠের উপরে লক্ষ্মীদেবীকে চাপাইয়া জগদ্ধাত্রী বানাইলেন। মুখে ঠিক সিংহের মত তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য সকলে হাসিয়া লুটোপুটি।

ইহা ছাড়া মালকোঁচা বাঁধিয়া বলরামের নৃত্যানুকরণেও লক্ষ্মীদেবীকে চমৎকার মানাইত।"

এই আনন্দময়ীকে নিবেদিতা ভালবাসতেন, আর পূজা করতেন অধ্যাত্মময়ীকে। লক্ষ্মীদিদি জীবন্মুক্ত—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন (৪. ২. ১৯০৫)—

"সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীদিদি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিষয়ে (লক্ষ্মীদিদির বিষয়ে) কী কথা বলেছিলেন জানালেন—'তুই এখনই অপরপারে—জীবন্মুক্ত।' লক্ষ্মীদিদি সুখদুঃখের অতীত। এসবই খেলা। কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে। এ সমস্ত কথাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য—কিন্তু কী অদ্ভুত লাগল তাঁর নিজ মুখ থেকে শুনতে—অথচ একেবারে অহংশূন্য।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ বিদায় নেবার আগে নিজের জায়গায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিংবা বলা যায়, নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রে অন্তত—ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের মধ্যে। নিবেদিতা এক চিঠিতে (ম্যাকলাউডকে লেখা—১৯. ২. ১৯০৩) তাই লিখেছেন—

"যদি জাপানে কয়েক মাস কাটাবার পরে স্বামী সারদানন্দের পথ আমেরিকার জন্য পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, খুবই খুশী হব। সারদানন্দ আমেরিকায় ক্রিস্টিনের কাজের জন্য (শিক্ষা-কাজ) টাকা তুলতে চান। আমার মতে তাঁর সর্বত্র যাওয়া উচিত, কেননা ভবিষ্যতে পৃথিবীর চারিদিকে তরুণবয়স্কদের স্থাপন করবার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তাবে। আমি তাঁকে খুঁটিনাটি কাজের মানুষ অপেক্ষা মূল সংগঠক ও দায়িত্ববাহকরূপে দেখি।

আর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখি অধ্যাত্মকেন্দ্র-রূপে এবং কর্তা-রূপে।"

এই চিঠি নিবেদিতা লিখেছেন—রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কয়েক মাস পরেই। গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে এই বিচ্ছেদ হয়েছিল। যে-সংঘের সঙ্গে গুরু যুক্ত করে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিবেদিতাকে মর্মান্তিক বেজেছিল।* অপরপক্ষে সংঘের পক্ষেও এই ক্ষতি দারুণ, এবং যাঁরা নিবেদিতাকে স্নেহ করতেন, তাঁদের কাছে দুঃখদায়ক। সংঘের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই এই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রকাশ্য অংশীদার হতে হয়। স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব অপসৃত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের গোটা দায়িত্ব মাথার উপরে, তদুপরি যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভরূপে জনসমাজে পরিচিত, তাঁদেরই একজন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন—এমন ইন্দ্রপাত এবং বজ্রপাত কোনো প্রতিষ্ঠানের জীবনে একসঙ্গে হয়েছে কি না সন্দেহ! অনুরাগীদের কী গভীর বেদনা, এবং বিরোধীদের কী দারুণ উল্লাস! এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, তখন বিরোধীরা অনুরাগীদের তুলনায় অন্ততঃ সংখ্যালঘু নন।

দ্রুত পরিবর্তমান ঘটনাধারার চেহারা এইরকম :

৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ।

অধিকাংশ সংবাদপত্রে সে সংবাদ প্রকাশিত হল ৬ই জুলাই।

৮ই জুলাই নিবেদিতা মঠে গেলেন। সঙ্গে ওকাকুরা। ইতিমধ্যে মঠের কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন। নিবেদিতা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু

* কতখানি যাতনা নিবেদিতাকে পেতে হয়েছিল, তার কিছু পরিচয় সিস্টার দেবমাতা তাঁর স্মৃতিকথায় দিয়েছেন। স্মৃতিকথাটি অল্প পরেই আমরা দিয়েছি।

রামকৃষ্ণ মিশন নীতিগতভাবে রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত। বিষয়টি নিয়ে বোঝাপড়া করার অভিপ্রায় ছিল নিবেদিতার, কিন্তু ওকাকুরা সঙ্গে থাকায় ৮ই জুলাই তা করা সম্ভব হল না।

১০ই জুলাই নিবেদিতা পুনশ্চ মঠে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। নিবেদিতা সম্পূর্ণ মনস্থির করতে পারলেন না, কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক বা অভিপ্রায় ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে বোঝা গেল।*

কয়েকদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতার অভিপ্রায় জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। ১৮ই জুলাই নিবেদিতার উত্তর এল।—

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সন্ধ্যায় আপনার যে চিঠি পাইলাম, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, আপনি সংঘের ও আমার পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করুন। ব্যাপারটি বেদনাদায়ক। তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

যাহা হউক, বিশ্বাস আছে, আপনি এবং সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমার শ্রীগুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধানিবেদন করিতে ভুলিবেন না।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে লিখিয়া যথাসম্ভব সহজভাবে তাহাদিগকে আমার নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানাইয়া দিব।

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততাসহ
রামকৃষ্ণের নিবেদিতা †

আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে নিবেদিতা একটি বাক্যকে অমর করে রেখেছেন— **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা**। উদ্ধৃত পত্রে তার অর্ধাংশের জন্ম : **রামকৃষ্ণের নিবেদিতা**; আগে লিখতেন : **রামকৃষ্ণ-সংঘের নিবেদিতা**। কিছুদিনের মধ্যে বিবেকানন্দ নামটি যুক্ত হয়ে দাঁড়াবে : **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা**।

১৯শে জুলাই অমৃতবাজারে প্রকাশিত হল :

"জনসাধারণকে এই কথা অবগত করাইবার জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের শোকদিবস সমাপনান্তে বেলুড় মঠের সদস্যগণ ও ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে স্থির হইয়াছে, অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার কার্যাবলী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, মঠ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।"

* এই বিষয়টি 'শিখাময়ী নিবেদিতা' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।
† প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা অনূদিত।

একটা আলোড়ন ঘটে গেল। স্বামী বিবেকানন্দের পরেই রামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত যাঁকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা—তিনি স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেই সংঘত্যাগী! স্বামীজীর উপর শোকপ্রবন্ধগুলির অধিকাংশের মধ্যে নিবেদিতার নামোল্লেখ ছিল, এবং স্বামীজীর ত্যক্ত দায়িত্ব যে তিনিই বহন করবেন, এমন কথাও লেখা ছিল।* সেই নিবেদিতা যখন সংঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তখন বেলুড় মঠের সর্বনাশের কল্পনায় আনন্দে শিহরিত হলেন বহুজনই! কী বীভৎস উল্লাস ফুটেছিল সরলা দেবীর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায়, তার পূর্ণরূপ আমরা সরলা দেবী প্রসঙ্গে উপস্থিত করব। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরও কিছু আমোদের রচনা। নিবেদিতার প্রতি সহানুভূতি উথলে উঠল নানা স্থানে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে। অযাচিত সহানুভূতিতে নিবেদিতা এমনই বিব্রত হলেন যে, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সেই স্নেহপ্রবাহ রোধ করার চেষ্টা করতে হল তাঁকে। সে বিবৃতি নিবেদিতার ব্যক্তিগত মহত্ত্ব এবং স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবৃতিটি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৩১শে জুলাই, ১৯০২।† নিবেদিতা লেখেন—

> "গভীরতম বেদনার সঙ্গে শুনেছি, কোনো কোনো মহলে বলা হচ্ছে—আমি নাকি আমার মহান গুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ হয়েছি! আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে যেন আমার নিম্নের বিবৃতিটিকে সর্বাধিকভাবে প্রচার করেন।
>
> ১। রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্র বেলুড় মঠ, হাওড়া। এই সংঘের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের উপর ন্যস্ত—যাঁদের তুল্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অল্পই দেখা যায়।
>
> ২। এই সংঘ তার গুরু ও প্রতিষ্ঠাতার (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) নিকট থেকে ধর্মদর্শন এবং ধর্মীয় উপলব্ধির সুনির্দিষ্ট ভাণ্ডার লাভ করেছে, অতঃপর যার সংরক্ষণ এবং বিস্তারসাধন করা এই সংঘের কর্তব্য হবে।
>
> ৩। এই ধর্মীয় সম্পদভাণ্ডারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক—দীন শিক্ষার্থিনীর, ব্রহ্মচারিণীর, পূর্ণব্রতী সন্ন্যাসিনীর নয়; আমি সংস্কৃতজ্ঞ এমন কোনো অভিমান আমার নেই; ধর্মব্যাপারে আমার ঊর্ধ্বস্থ কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাঁদের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের বহির্বর্তী সামাজিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাগত কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। বাস্তবিক-পক্ষে, আমার গুরুর দেহত্যাগের পরে গুরু-ভগিনী ভিন্ন গুরু-ভাইদের সঙ্গে অধিক যোগাযোগ না রাখাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

---

* যেমন অমৃতবাজার পত্রিকায়।

† *Vivekananda in Indian Newspapers* দ্রষ্টব্য।

৪। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুর জন্য ইউরোপীয় নেতৃত্ব প্রয়োজন—এর থেকে বেদনাদায়ক ভ্রান্তি, আমার মতে, সম্ভবপর নয়। উল্টোটাই হওয়া উচিত—আমার তাই ধারণা।

ভরসা করি আমার এই পত্র অনেক সংবাদপত্র লেখকেরই দৃষ্টিগোচর হবে,—এই পত্রটিকে তাঁরা তাঁদের রচনাপাঠের স্বীকৃতি এবং উত্তররূপেই ধরবেন।"

পত্রটির বিষয়ে মিরার-সম্পাদক লেখেন—

"সিস্টার নিবেদিতা সহযোগী হিন্দু কর্মীদের সম্বন্ধে আদর্শ ব্যবহার করেছেন। এ আচরণ তাঁরই যোগ্য—যদিও এ পত্রের প্রয়োজন ছিল কি না সন্দেহ। আমাদের এই উচ্চাশয়া ভগিনী বহু গুণান্বিত, প্রতিভাময়ী—যদিও তিনি নিজের বিষয়ে নম্রভাবে 'অতি দীন শিক্ষার্থিনী' লিখেই তৃপ্ত। মর্মস্পর্শী এই দীনতাবোধ ও অহংশূন্যতা—জনসেবায় ব্রতী কর্মীদের কাছে আদর্শ হোক এ জিনিস!"

নিবেদিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের যে দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনকে একদিন অহেতুক নিতে হয়েছিল, সে দায়িত্ব এবং তদনুযায়ী গঞ্জনা, অতীব দুঃখের বিষয়, এখন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিতে হচ্ছে, কারণ নিবেদিতার জীবনীসমূহ থেকে বাঙালী জনসাধারণ জেনে গিয়েছেন যে, ব্রহ্মানন্দই মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদের নিমিত্ত এবং বাঙালীরা রাজনৈতিক সত্যকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন! একথা সত্য, স্বামীজীর সম্পূর্ণ ভাবধারাকে রামকৃষ্ণ মিশন বহন করতে পারবে কি না, এ সন্দেহ নিবেদিতার ছিল—কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন কি কখনোই দাবি করেছে—স্বামীজীর সমস্ত ভাবকে রূপায়িত করতে সে ব্রতী? রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, স্বামীজী মিশনের জন্য যেটুকু দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, কালোপযোগী করে সেটুকু পালন করা। সাধারণ সামাজিক মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বহু উক্তি আছে—গৃহীর সেসব দায়িত্ব কি সন্ন্যাসী-সংঘ পালন করতে পারে? যে সংঘকে স্বামীজী রাজনীতির বাইরে স্থাপন করেছিলেন—সেই সংঘ নীতিত্যাগ না করে কিভাবে রাজনৈতিক কর্মের অভিলাষী নিবেদিতাকে ঠাঁই দিতে পারত?

যাই হোক, কোনো কোনো বাংলা জীবনীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্ক যেরকম তিক্ত ও সংঘর্ষময় করে দেখানো হয়েছে—সত্যই যে তা ছিল না, তার একটি প্রমাণ আমরা সূচনাতেই দিয়েছি—যেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্রাংশ উদ্ধৃত আছে। এখন আরও কিছু সংবাদ দেওয়া যাক। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কী চোখে নিবেদিতা দেখতেন, তার যথেষ্ট পরিচয় এইসব স্থান থেকে পাওয়া যাবে।

স্টেটসম্যানের র‍্যাটক্লিফদের যখন সন্তান-সম্ভাবনা হল, তখন নিবেদিতা মিসেস র‍্যাটক্লিফকে ১৯০৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিখলেন—

"সারা ও আমার পক্ষ থেকে আগামীকাল যে ছোট উপহারটি তোমার কাছে নিয়ে যাব, সেটি একটি ভারতীয় কবচ। তার মধ্যে শিশুর জন্য প্রার্থনা রয়েছে—সে প্রার্থনা স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন। ব্যাপারটি তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

"আমার বিশ্বাস, এই ছোট অলঙ্কারটি তুমি পছন্দ করবে—এটি এমন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়; আর, ভাবী প্রাণটিকে আবাহন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে যে পবিত্র ভাবনা এর মধ্য দিয়ে প্রেরিত হল—তার প্রভাব ও শক্তিও তুমি অনুভব করবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন চাইলেন নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী জীবনী রচনা করুন, তখন তাঁর সেই ইচ্ছাকে আদেশতুল্য জ্ঞান করে গভীর আনন্দ ও আবেগ নিবেদিতা বোধ করেছিলেন। নিশ্চয় ব্রহ্মানন্দের এই ইচ্ছাকে তাঁর প্রতি গভীর আস্থার নিদর্শন বলে নিবেদিতা ধরেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারী নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান, আমি স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী লিখি। সুতরাং যত শীঘ্র পার, এর জন্য উপাদান 'প্রার্থনা, ভিক্ষা ও হরণ' কর।"

বুদ্ধগয়ার পরিচালনার অধিকার নিয়ে এই সময়ে, পূর্ব থেকেও, পরিচালক হিন্দু মোহন্তের সঙ্গে নতুন দাবিদার ধর্মপাল প্রভৃতির সংঘর্ষ চলছিল। নিবেদিতা এই সংঘর্ষে অংশ নেন, এবং ধর্মপালের অবুঝ অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করেন। এই ব্যাপারে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা দুবার বুদ্ধগয়া যান। ১৯০৪-এর ২১ জানুয়ারী চিঠিতে তিনি লিখছেন—"এই যাত্রায় যেভাবে আশীর্বাদ পেয়েছি বলবার নয়—গোপালের মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও আর একজনের (স্বামীজী যাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে)।"

নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় একটি ইতিহাস-বিদ্যালয় খুলুন—ব্রহ্মানন্দের এই অভিপ্রায়ে নিবেদিতার পরম উৎসাহের রূপ—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ এখন আমাকে একদল ছেলে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় এক ইতিহাস-বিদ্যালয় খুলবার ভার দিচ্ছেন। এটা মনে হয় পরে বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষার এক কলেজ হয়ে দাঁড়াবে। এখানে আমি নিজের চিন্তাকে কার্যকর করবার আশা করছি। অন্যত্র আমি পরিকল্পনাকে সফল করবার চেষ্টা করি।"

(৩ মার্চ, ১৯০৪)

"শোনো, স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান, আমি জন ছয়েককে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ইতিহাস-স্কুল খুলি; সেখানে মাসে এক সপ্তাহ কাটাব—বাকি সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাজ করতে হবে। আইডিয়াটা দারুণ। এখনই কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করব।" (২০ মার্চ, ১৯০৪)

ঐ বছরেরই ৬ নভেম্বরে নিবেদিতার মনোভাব—

"প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কখনোই তাঁর হৃদয়কে আমার থেকে সরিয়ে নেননি।

কিন্তু অন্যদের কাছে, একেবারে সোজা ভাষায় বলতে গেলে, আমার নিজের স্থান সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় নই।"

পরের সপ্তাহেই, ১৩ই নভেম্বর লিখছেন—

"আমরা গতকাল মঠে গিয়েছিলাম। ফিরলাম নবীন চাঁদকে মাথায় নিয়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুতর পীড়িত হয়েছিলেন। এখন ভালো হয়ে গেছেন, যদিও তিনি তা ভাবেন না। আসল ব্রহ্মানন্দের সহসা আবির্ভাব দেখলাম—যখন গতকাল বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। তাঁকে মনে হল—স্বামীজী! ও'রা বললেন, এখন পাঁচ বছরের শিশুর মত স্বভাব তাঁর! অপরূপ! এর পরে সারা রাত ধরে স্বামীজীর স্বপ্ন দেখলাম: আমি পাশে বসে আছি; তাঁকে বললাম—আশীর্বাদ করুন! তিনি হাসলেন। আমার মাথায় হাতের চাপ দিলেন।—ব্রিটানীর দিনগুলির স্বপ্ন কী!—অনুপম সেই সপ্তাহ, যখন তাঁকে পেয়েছিলাম মানবের স্বর্গপ্রাপ্তির মত করে!"

ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে যিনি সর্বাধিক তথ্য জানেন, সেই লিজেল রেমঁ কিন্তু উত্তেজনাপ্রিয় বাঙালী লেখক বা বক্তাদের বিপরীত কথাই লিখেছেন। মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদকালে, যখন সম্পর্ক সবচেয়ে সংঘর্ষময় হওয়ার কথা,—রেমঁ সেই সময়কার কথা লিখেছেন—

"নিবেদিতার ধরনধারনে সায় না থাকলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। এই মন-কষাকষি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য নিবেদিতা আচমকা একদিন তাঁকে ধরে বসলেন। কিন্তু আলোচনাটা তলিয়ে গেল ধ্যানতন্ময়তায়। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে ব্রহ্মানন্দ চোখ মেলে চাইলেন। নিবেদিতা তখনো নিস্পন্দ, অক্ষুব্ধ শান্তির পারাবারে তাঁর মন ডুবে গিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় ঐক্যবোধ।"

এই বিবরণের উৎস নিবেদিতা-ভগিনীর স্মৃতিকথা। অনুরূপ আর একটি বর্ণনা—

"নিজের কার্যকলাপের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানানোতে তিনি সস্নেহে হাসলেন একটু। বেশী কথা বলেন না ব্রহ্মানন্দ। আলাপ আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ মা, খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা আর-কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা-একা যেভাবে নিবেদিতা কাজ করে চলেছেন, দেখে সন্ন্যাসীর চমক লাগে। এ-রুদ্রবীর্য কি চিরদিনই সমান থাকবে?

"নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিবেদিতাকে উৎসাহ দেন ব্রহ্মানন্দ, তাঁর অগ্রাভিযান যেন অব্যাহত থাকে। বলেন, 'তোমার সহযাত্রী অনেকেই তোমার মন ভেঙে দিতে চাইবে। বলবে, তোমার একাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের কাজ নয়। তাদের কথায় কান দিও না। সমস্ত জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও যা ঠিক বলে বুঝেছ, তা ছেড় না......'

নিবেদিতা কথা বলেন তাড়াতাড়ি, আর তারই তোড়ে নিজের বক্তব্যকে ছবির মত ফুটিয়ে তোলেন। ব্রহ্মানন্দ আর তাঁর মধ্যে বোঝাপড়া হওয়ার পক্ষে এই এক অন্তরায়। কারণ সন্ন্যাসী ইংরাজী ভাল জানতেন না, সব কথা যে বুঝছেন না,

তাও বলতেন না। এদিকে কথার তোড় ক্রমেই বাড়তে থাকে, শেষকালে ব্রহ্মানন্দের ধ্যানে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। প্রথমটা নিবেদিতা ধাক্কা খেয়ে চুপ হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর তন্ময়তার ছোঁয়া লেগে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখ হয়ে পড়েন। হঠাৎ-ঘনিয়ে-আসা এক স্তব্ধতায় কথা হারিয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দের নীরব আশীর্বাদে প্রীতিরসে গলে পড়ে নিবেদিতার মন।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, অধুনা বিখ্যাত স্বামী প্রভবানন্দ এই বিষয়ে লিখেছেন—

"আর মহারাজের (ব্রহ্মানন্দের) মুখে শুনেছি নিবেদিতার প্রশংসা। নিবেদিতা মহারাজের কাছে আসতেন, কথা বলতে বা শুনতে নয়—মহারাজের সন্নিধানে ধ্যান করতে। আর মহারাজ বলেছিলেন—নিবেদিতা কাছে এলে মহারাজের মনও হু হু করে উচ্চ স্তরে উঠে যেত।"*

সবশেষে উদ্ধৃত করছি স্বামীজীর পত্রের কিছু অংশ; পত্রটি ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ কাশী থেকে লেখা। এইটিই সম্ভবতঃ নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর শেষ চিঠি।† এতে নিবেদিতার বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে স্বামীজী লিখেছিলেন—

"তোমার চিঠি পেয়ে অতীব উল্লসিত। উল্লাসের অধিক কারণ, তুমি অখণ্ড ইচ্ছা এবং পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসহ ফিরে এসেছ।......"মা" যেভাবে চালান, ঠিক সেইভাবেই চলো; যদি সম্ভব হয়, তোমাকে সাহায্য করব, কিন্তু আমি এখন কম্বলবন্ত বই আর কিছু নই, তদুপরি এক-চক্ষু (এই সময়ে স্বামীজীর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে যায়)। কিন্তু তোমাকে আমার পূর্ণ, সম্পূর্ণ আশীর্বাদ—যদি আরও বেশী থাকে, তাও।

"আমার কোনো অভিযোগ নেই। যেভাবেই হোক, আমাকে বলি হতে হবে—স্বেচ্ছাবলি—কোনো সন্দেহ নেই।...তুমি ইস্পাতের মত খাঁটি এবং বিশ্বস্ত—নিজের ছায়ার মতই বিশ্বস্ত। ধনী বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া মাত্র তুমি বেশী এগিয়ে পড়নি, বা বিদ্রোহী হওনি। তোমার জন্য আমার সর্বশেষ আশীর্বাদ রইল।"

---

* এই অংশটি শ্রীব্রহ্মগোপাল দত্তকে লিখিত একটি পত্রের অংশ, নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (সম্পাদক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রকাশিত। স্বামী প্রভবানন্দ ঐ পত্রে আরও লিখেছিলেন—

"যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। গুপ্ত মহারাজের কাছে বাগবাজারে বসেছিলাম, নিবেদিতা এলেন গুপ্ত মহারাজের কাছে বিদায় নিতে, দার্জিলিঙ যাবেন। ঐবারেই দেহত্যাগ হয়।

"আমার মাথায় ছিল টেরী কাটা, আর পকেটে ছিল ঘড়ি চেন। এই দেখে নিবেদিতার চোট—

'Swamiji wanted boys who are strong, muscular, brave, not sissies.' আরও অনেক উপদেশ দিলেন, সে সব মনে নেই। কিন্তু স্মরণে আছে তাঁর cultured voice, diction ইত্যাদি—ইংরাজীতে যখন কথা বলছেন—যেন কবিতার মত সুন্দর।"

† এই পত্রটি পূর্বে আংশিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। বাণী ও রচনার মধ্যে এটি খণ্ডিত-ভাবে প্রকাশিত। পরে স্বামী নির্লেপানন্দের কাছ থেকে গোটা চিঠির নকল পেয়েছি।

এই চিঠিতেই স্বামীজী সর্বাধিক জোর দিয়ে লিখেছিলেন—

"আগে এক চিঠিতে আমার সামান্য যা অনুরোধ করার আছে তা লিখেছিলাম, —আমি আর কারো উপর নির্ভর করতে বলি না—আর কেউ নয়—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ। সেই 'বুড়ো লোকটি'র বিচারে কখনো ভুল হয় না*—আমার সর্বদাই হয়। যদি কোনো বিষয়ে তোমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়, কিংবা কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিতে চাও—তাহলে শুধু ব্রহ্মানন্দেরই নাম করব—অন্য কেউ নয়, কেউ নয়। এ বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার।"

I recommend you none—not one—except Brahmananda. That 'old man's judgement never failed—mine always do. If you have to ask any advice or to get anybody to do your business Brahmananda is the only one I recommend, none else, none else. With this my conscience is clear.

* 'That old man' কি ব্রহ্মানন্দ না শ্রীরামকৃষ্ণ? বলা শক্ত। পত্রের রচনাগতিকে মনে হয় ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু স্বামীজী 'old man' শ্রীরামকৃষ্ণকেই সাধারণতঃ বলতেন, এবং 'failed' শব্দের প্রয়োগে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণও হতে পারেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা শক্ত। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ হন, তাহলেও কার্যতঃ অর্থ একই দাঁড়ায়—ব্রহ্মানন্দের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা নির্ভুল, ইত্যাদি।

স্বামী সারদানন্দ—ভগিনী নিবেদিতা

'যাঁদের তুল্য আধ্যাত্মিক চরিত্র অল্পই দেখা যায়'—সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গেই বাইরের কর্মজগতে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর ছিল। ধ্যানের মানুষ ব্রহ্মানন্দের তুলনায় সারদানন্দ অধিকতর কর্মের মানুষ। সারদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন—শেষও করেছিলেন একই পদে অধিষ্ঠিত থেকে। মধ্যে ৩০ বৎসর কেটে গিয়েছিল, মঠ ও মিশনের সভাপতি হবার অনুরোধ তাঁর কাছে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু বিবেকানন্দ তাঁকে মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন, সেহেতু বিবেকানন্দের বন্ধু ও একান্ত অনুগত এই মানুষটি—ভাবুক, লেখক ও আধ্যাত্মিক এই মানুষটি—অন্য কর্ম স্বীকার করতে পারেননি।

এমন যাঁর চরিত্র, তিনি যে নিবেদিতা ম্যাকলাউড প্রভৃতি বিবেকানন্দে অনন্যনিষ্ঠ মানুষদের কাছে অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন, তাতে সন্দেহ কি! তা তিনি ছিলেনও। ম্যাকলাউড প্রভৃতি সারদানন্দকে 'দু নম্বর স্বামীজী' বলতেন।

সারদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করা যাবে না, কারণ বহুক্ষেত্রেই তা প্রায় দৈনন্দিন যোগাযোগের ব্যাপার। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগ মানে অনেক স্থলেই সারদানন্দের সঙ্গে যোগ। পাঠকদের এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে তথ্য এখানে পরিবেশিত হবে—তা ব্যাপক সংযোগের তুলনায় সামান্যই।

ম্যাকলাউডের সঙ্গে সারদানন্দের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। আর ম্যাকলাউড ও সারদানন্দ নিবেদিতাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। এঁদের চিঠিপত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্কের রূপ ফুটেছে। নিবেদিতা ১৮৯৯-এর ৩ জানুয়ারী ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"ইচ্ছে হয়, তুমি যদি দেখতে, দু' নম্বর (সারদানন্দ) আমার সঙ্গে চা খেতে খেতে তোমার চিঠিগুলি বদলাবদলি করে পড়ছেন! তাঁর চিঠিগুলি তিনি পড়ছেন চেঁচিয়ে, আমারগুলি আমি!"

দুদিন পরে ম্যাকলাউড ও ওলি বুলকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা জানালেন—"সারদানন্দ গতকাল দু' ঘণ্টা এখানে কাটিয়েছেন। তিনি আমার বিষয়ে বলেছেন—'আমার পশ্চিমী বন্ধু', এবং তোমার বিষয়ে কথা বলেছেন।"

সারদানন্দের উপরে স্বামীজীর কতখানি নির্ভরতা ছিল, তা ৯. ৪. ১৮৯৯ তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে বোঝা যায়—

"পাশ্চাত্ত্যযাত্রার বিষয়ে স্বামীজী বললেন, সারদানন্দ না ফেরা পর্যন্ত (তিনি তখন গুজরাটে) তিনি যাত্রাবিষয়ে কোনো চিন্তাই করতে পারবেন না, কারণ আর কারও উপর তিনি লোকজনের ভার বিশ্বাস করে দিয়ে যেতে পারেন না। তাঁর এইকথা তোমার ভাল লাগবে জানি।"

এই বছরেরই ৭ই জন্ন এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—"বেচারা সারদানন্দ মরতে পারলে বাঁচেন। পারিবারিক ব্যাপারে চাপ যথেষ্ট।......সেইসঙ্গে মঠের বিরাট দায়িত্ব।......"

১৯০৫-এর ৪ মে তারিখের এক চিঠিতে সারদানন্দের 'খ্নব বে'চে যাওয়া'র কথা—

"এক সন্ধ্যায় সারদানন্দ ডুবতে ডুবতে খ্নব বে'চে গেছেন। নদীতে হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়টির কথা তোমার মনে আছে—সেই অন্ধকার বারান্দা—স্বামীজীর এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি!*

নিবেদিতার সংগে প্রথম পরিচয়ের কিছ্নদিনের মধ্যে লেখা একটি চিঠিতে সারদানন্দ নিবেদিতার বড় স্নন্দর বিবরণ দিয়েছেন। কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভূস্বামী রাজা প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা সেই চিঠিটির অংশ উদ্ধৃত করছি। এটি কুর্নক্ষেত্র থেকে লেখা। সময়, রবিবার, ২৩।১০।৯৮।

মহাশয়—বহ্নকাল আপনাকে কোনো পত্রাদি লিখি নাই। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি (গত ফের্নয়ারীতে)। বোধহয় শ্ননিয়া থাকিবেন।......

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা একজন ব্রহ্মচারিণী সম্প্রতি ৺কাশীধাম দর্শনে যাইতেছেন। ইনি ইংলন্ড হইতে কয়েকমাস হইল আসিয়াছেন। বিবেকানন্দজী ই'হাকে শ্রীমতী নিবেদিতা নাম প্রদান করিয়াছেন। ই'হার প্নর্বনাম Miss Noble. ইনি ৺বিশ্বনাথের আরাত্রিক দেখিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাকে কাশীধামস্থ কোনো বন্ধ্নকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে লিখিতে অন্নরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমার তো কাশীধামে আপনি ছাড়া আর কোনো এমন বন্ধ্ন নাই, যিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। তজ্জন্য আপনাকে এ বিষয়ে লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি আপনি শ্রীমতী নিবেদিতাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

নিবেদিতাকে জ্নতা খ্নলিয়া বা অন্য যাহা কিছ্ন করিয়া ৺বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতে বলিবেন, ইনি তাহাই করিতে রাজী আছেন। ইনি সম্প্রতি দ্নর্গম তীর্থ ৺অমরনাথ (কাশ্মীরে) দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।......

---

* সারদানন্দ যে সত্যই বিপদে 'অন্নদ্বিগ্ন' প্নর্নষ ছিলেন, নদীতে ঝড়ের এই ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। এ বিষয়ে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত 'স্বামী সারদানন্দের জীবনী' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। ঘটনাটির বিষয়ে স্বয়ং সারদানন্দ বলেছিলেন—"কাঞ্জিলালের (ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল) সংগে মঠে যাচ্ছি মহারাজের (ব্রহ্মানন্দের) একটা ফোড়া অস্ত্র করতে হবে। আমি তামাক খাচ্ছি, এমন সময় মহাঝড় উঠল। নৌকা ডুব্নডুব্ন। আমার কোনই উদ্বেগ হচ্ছে না, বেশ নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাচ্ছিল্নম। কাঞ্জিলাল আমার এরকম নির্নদ্বেগ ভাব দেখে মহাক্রোধে ছিলিমটা গংগার জলে ফেলে দিলে। যা হোক তখন পালটা নামিয়ে দিতে বলল্নম। পাল নামাতেই অনেকটা নিরাপদ বোধ হল। ঝড়ও ক্রমশঃ থেমে গেল।" অক্ষয়চৈতন্য এ ব্যাপারে আরও একট্ন তথ্য যোগ করেছেন—"নিজের কথা বলিবার সময়ে শরৎ মহারাজ কতকটা রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল ছিলিমটা ফেলিয়া দিতেই হ্নঁকো দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'এটাও ফেলে দেবে নাকি?'"

শ্রীমান্ বিবেকানন্দ এখন কলিকাতায় আছেন। শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক ভাল আছে।......*

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে যখন প্লেগ-সেবার কাজ আরম্ভ হয়, তখন স্বভাবতঃই সারদানন্দের উপর সংগঠনের দায়িত্ব অনেকখানি ছিল। প্লেগ-সেবা করতে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে নিবেদিতা কিভাবে নিজ জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তা ১৮৯৯-এর ১১ মে তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা সারদানন্দের পত্র থেকে দেখতে পাই। নিবেদিতা সম্বন্ধে স্নেহ ও শ্রদ্ধা চমৎকার ফুটেছে এখানে—

"মার্গট দ্রুত তৈরী হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে একটা চুক্তি করা দরকার, যদি সে আমাকে সঙ্গে নেয়!! সে গতকাল, এবং তার আগের দিন এখানে এসেছিল। আমি তাকে সেই ছোট টেবিলটিতে চা খেতে দিলাম। স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দের বার্থ রিজার্ভেশন (পাশ্চাত্ত্য যাত্রার) বিষয়ে আমরা কথা বললাম, বাক্সপ্যাঁটরা কেনাকাটা বিষয়েও,—পরে স্বামীজীর সঙ্গে পরামর্শও হল। মার্গট আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, আর প্লেগ-সেবার বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি-উৎসাহ দেখিয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে প্লেগ-সেবায় নার্স যোগান দেবার প্রয়োজন হয়নি—কিন্তু 'প্রিয় বালিকাটি' দুবার জীবন বিপন্ন করে তা করেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে রক্ষা পেয়েছে—তাকে আরও বহুবছর আমাদের মধ্যে পাব। বর্তমানে প্লেগ কিছু কমতি—কিন্তু পরের শীতে আরও ব্যাপকভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। মার্গট এখন বুঝেছে, তার শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে—নিজের জীবনকে মূল্যহীন ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। তুমি এ বিষয়ে তাকে দু'এক লাইন লিখতে পারো।"

নিবেদিতার নানা কাজ সম্বন্ধে সারদানন্দের চিঠিপত্রে আরও যেসব টুকরো তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির উল্লেখের দরকার নেই,† কিন্তু নিবেদিতাকে লেখা সারদানন্দের একটি চিঠির কথা বলতেই হবে, যা নিবেদিতার জীবনের দারুণতম বেদনার কারণ। সে চিঠি এই—

প্রিয় নিবেদিতা,

সমাপন। গতরাত্রে ৯টার সময়ে স্বামীজী ঘুমিয়েছেন—সে ঘুম ভাঙার নয়।

তোমাদের
সারদানন্দ
(৫।৭।১৯০২)

---

* ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র রচিত 'স্বামী সারদানন্দ' দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা—১২২-২৩

† ১৬ই নভেম্বর, ১৮৯৯-তে নিবেদিতাকে লেখা সারদানন্দের একটি চিঠি পাই, যেটি পরে আমরা 'শিক্ষা সরস্বতী' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করব।

নিবেদিতাকে যিনি গভীরতম বেদনার সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি বেদনাতীর্থে নিবেদিতার সহযাত্রী ছিলেন। আমরা আগেই দেখে এসেছি, লোকান্তরিত স্বামীজীর দেহবস্ত্রের খানিক অংশ যখন স্মৃতিচিহ্নরূপে ম্যাকলাউডের কাছে পাঠাবার ইচ্ছা বোধ করছেন নিবেদিতা, তখন তাঁর সেই সংকুচিত ইচ্ছার কথা একমাত্র সারদানন্দের কাছেই প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

স্বামীজী অন্তর্হিত হলে, স্বামীজীর কথার সত্যতা প্রমাণ করে কয়েকজনের মধ্যে সহসা বিরাট শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়। একপক্ষে ব্রহ্মানন্দ-সারদানন্দ প্রভৃতি, অন্যপক্ষে নিবেদিতাদি। সারদানন্দের জাগ্রত-ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রম জানিয়ে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০২, তারিখে লিখেছেন—

"মিসেস রোয়েথলিসবারজার ঠিকই বলেছেন, স্বামীজীর দেহই তাঁর পথের প্রতিবন্ধক। স্বামী সারদানন্দ কী অসাধারণ শক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন, তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।"

অপরপক্ষে নিবেদিতা কোন্ অসাধারণ শক্তিতে পূর্ণ হয়েছিলেন, তা অকুণ্ঠে সারদানন্দ লিখেছেন নিবেদিতার মৃত্যুর পরে লিখিত এক রচনায়। সেটি উপস্থিত করার আগে, নিবেদিতার দুটি বইয়ের সূচনায় সারদানন্দের যে কটি কথা লিখিত আছে, সেগুলি উদ্ধৃত করছি।

নিবেদিতার The Master গ্রন্থ রামকৃষ্ণ মিশনই প্রথম প্রকাশ করেন—ভগিনীর জীবিতাবস্থাতেই। সারদানন্দ গ্রন্থ-সূচনায় লেখেন :

জগজ্জননীকে প্রণাম!

নিজ গুরুর প্রতি ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতার স্মারকরূপে লিখিত নিবেদিতার এই গ্রন্থটিকে বিশ্বসমক্ষে উপস্থাপনের সময়ে সমুদয় ভ্রাতৃগণ নিবেদিতাকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছেন।

বেলুড় মঠ সারদানন্দ
ফেব্রুয়ারী ১, ১৯১০

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে প্রকাশিত হয় *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda* বইটি। মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্'পত্রে নিবেদিতা এটিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। বইটির সম্পাদনা করেন স্বামী সারদানন্দ। অধ্যায়ের নামকরণ এবং দু'একটি তথ্যগত ভ্রান্তি সংশোধন ভিন্ন তিনি বেশীকিছু করেন নি। ভূমিকায় সে কথা জানিয়েছেন। তারপর লিখেছেন—

"সমাপ্তিতে সম্পাদক এই ভরসা করেন যে, যথার্থই যোগ্য এই বইটি জনগণের সোৎসাহ অভ্যর্থনা লাভ করবে, কারণ এই বইয়ের মধ্যে সুমহান

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত অংশে উজ্জ্বল আলোকপাত করা হয়েছে, এবং যে-ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণে আমরা শোকাভিভূত, যিনি ন্যায় ও সত্যের পক্ষে, ভারতের কল্যাণের পক্ষে অসাধারণ ধর্মযোদ্ধারূপে সাধারণের সমক্ষে এখন প্রতিভাত, তাঁর এহেন আত্মপ্রকাশের আগে নিজ আচার্যদেবের নিকট কি ধরনের শিক্ষা নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে পরিচয় মিলবে।"

'সমুদয় ভ্রাতৃগণের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা' পেয়েছিলেন যে নিবেদিতা, যিনি পরবর্তীকালে 'ন্যায় ও সত্যের পক্ষে এবং ভারতের কল্যাণের পক্ষে অসাধারণ ধর্মযোদ্ধারূপে' প্রতিভাত হয়েছিলেন—তিনি এই মহান ধর্মবীরের চোখে কী রূপে ধরা দিয়েছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত নিবেদিতার মৃত্যুর পরে রচিত প্রবন্ধটি—'সাহিত্য' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩১৯, সংখ্যায় যেটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাটিই খণ্ডিত আকারে সরলাবালা সরকার লিখিত 'নিবেদিতা' পুস্তকের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়েছে।—

"পূজ্যপাদাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য ত্যাগ ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রদর্শিত 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বস্বত্যাগরূপ 'পন্থা'র অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্ত্যের যে-সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন, এ কথা বলিলেও, এক হিসাবে অত্যুক্তি হয় না। ঐ ব্রতাবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শীত ঋতুর অবসানে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন, এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের পরমধামে উপনীতা হয়েন। ঐ ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি যে কিভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন—কি অপূর্ব একনিষ্ঠা, অনন্ত অধ্যবসায় ও তন্ময়ধ্যানে রত থাকিয়া তিনি সর্বদা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে কথা সাধারণে অবগত নহে। নিবেদিতাকে হারাইয়াই সে কথা জানিবার জন্য এখন সকলের প্রাণে একটা প্রবল বাসনা উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু ঐ বিষয়টি জানিতে হইলে আমাদিগকে নিবেদিতার বাহ্যজীবন-যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কেবল লোকনয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত তাঁহার বড় বড় কাজগুলি দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে—দৈনন্দিন জীবনে তিনি কিভাবে তাঁহার দরিদ্র অশিক্ষিত পাড়া-প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিভাবে তিনি তাহাদিগের সকলপ্রকার সুখ-দুঃখের সমভাগিনী হইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সাংঘাতিক ব্যাধি-গ্রস্তকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কিভাবে নিজ অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রত থাকিতেন; দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি নিজের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও কিভাবে মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর হইতেন; দুর্ভিক্ষের তাড়ন হইতে গ্রামবাসী-

দিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিভাবে তিনি অনশন অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া দিনের পর দিন পদব্রজে বন্যার জল ভাঙিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অক্ষুণ্ণ জ্ঞানসম্পদের সহিত বর্তমানযুগের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্য-সমূহের সম্মিলনে দেশের রমণীকুলের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার সম্প্রসারেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি একমাত্র সম্ভবপর—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া তিনি কি-ভাবেই বা এক নূতন স্ত্রী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া আমাদিগের কুলবধূগণের হৃদয়-মনে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকার স্থাপনে সমর্থা হইয়াছিলেন!—আর দেখিতে ও পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিত্যানুষ্ঠিত ঐ প্রকারের শত চেষ্টার পশ্চাতে বিরাজিত তাঁহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা, আয়-ব্যয়-হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত ভালবাসা—যে অসীম ভালবাসায় তিনি ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে কা কথা, প্রত্যেক উপলখণ্ডকেও পবিত্র ও আপনার হইতে আপনার বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন!

বাস্তবিক, মহতের মহত্ত্বের পরিচয় আমরা চিরকালই ঐভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন কার্যসহায়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। নতুবা দৈবাধীন ঘটনাচক্রের প্রবল প্রবাহে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া ভীরু কাপুরুষকেও অনেক সময় সংসারে বড় কাজ করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সকলপ্রকার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই আমরা ঐরূপ যথার্থ মহত্ত্বের নিত্য পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকই অদ্য তাঁহার অদর্শনে শোকে ম্রিয়মাণ, এবং সেইজন্যই সকলে আজি তাঁহার জীবন্ত শক্তিমতী মূর্তি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিত্যপূজা করিতেছে।"

নিবেদিতার প্রতি সারদানন্দের শ্রদ্ধা কেবল প্রবন্ধ রচনাতেই সমাপ্ত হয়নি। রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত থেকে নিবেদিতা যে বিদ্যালয়টি আরম্ভ করেছিলেন—সেটিকে চরম দুর্বিপাকের মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখার কাজে সারদানন্দ সাহায্য করেছেন, এবং তাঁরই চেষ্টায় বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ বিষয়ে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকায় (১৯৬৬) স্বামী সারদানন্দের প্রতি শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনকালে লেখা হয়েছে—

"নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সারদানন্দের আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণের পর ভগিনী নিবেদিতা যখন পুনরায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন, তখন থেকে তাঁর এই কাজে প্রধান সহায় ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ভগিনী ক্রিস্টিনের সহায়তায় যখন বিদ্যালয় সংলগ্ন পুরস্ত্রী বিভাগের উদ্বোধন হয়, স্বামী সারদানন্দই ছিলেন নিবেদিতার প্রধান পরামর্শ ও সাহায্য-দাতা। নিবেদিতার অনুরোধে তিনি ব্যবস্থা

করেন যে, যোগীন-মা বিদ্যালয়ে অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্য গীতার ক্লাস করবেন।*... ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগ হয় ১৯১১ খৃীস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভগিনী ক্রিস্টিনকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয় (তিনি জার্মান জাতিসম্ভূতা বলে)। অতঃপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার পড়ে ভগিনী সুধীরার উপরে। স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় সুধীরা এই সময়ে বিদ্যালয় সংলগ্ন কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য মাতৃমন্দির নাম দিয়ে (বর্তমানে 'সারদা মন্দির') আশ্রম বিভাগ খোলেন। প্রধানতঃ সারদানন্দের প্রচেষ্টাতেই ১৯১৮ খৃীস্টাব্দে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন থেকে ১৯২৬ সালে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদে আসীন।"†

---

* ২৬ নভেম্বর, ১৯০২-এর এক পত্রে নিবেদিতা লিখছেন—"পরের শনিবার সন্ধ্যায় চমৎকার আসর হওয়ার কথা। স্বামী সারদানন্দ উঠানে চৌকির উপর বসে চন্ডীপুরাণ থেকে মায়ের নাম গান ও কথকতা করবেন—মনোরম নয় কি?"

† ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দের জীবনী'র মধ্যেও এই বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যগণের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক

স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে আসার আগে রামকৃষ্ণ সংঘের সম্বন্ধে নিবেদিতার বহু বক্তব্যের মধ্যে অল্প কিছু উদ্ধার করা উচিত, কারণ, এই সংঘ মূলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যমন্ডলীকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল, সুতরাং সংঘের বিষয়ে মনোভাবকে শিষ্যসমষ্টির বিষয়ে সাধারণ মনোভাব বলেই ধরতে হবে। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল, জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য-বোধের নূতন আদর্শ সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দেশ্যে একটি সন্ন্যাসীসংঘ সংগঠিত হয়েছে। ইউরোপে, প্রত্যক্ষ ধর্মোপলব্ধি কম ঘটে বলে, সন্ন্যাসীদের পক্ষে এই ধরনের লোকসেবার কাজ পুণ্যকর্ম বলেই বিবেচিত হয়, কিন্তু ভারতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কাছে প্রথম ও শেষ দাবি, তা যেন ঋষি সৃষ্টি করে।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সর্বোচ্চ আদর্শের বিনিময়, এবং জীবনে তাকে সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে' রামকৃষ্ণ সংঘের যে সন্ন্যাসীগণ অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের নেতার কথায়, তাঁদের প্রতি নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে তিনি সুগভীর আনন্দের সঙ্গে স্বামীজীর প্রতি তাঁর গুরুভাইদের ভালবাসার বর্ণনা করেছেন, স্বামীজী যখন পরিব্রাজক হয়ে হারিয়ে যেতেন বারবার ভারতের নগরে প্রান্তরে, তখন গুরুভাইরা তাঁর অদর্শনে কাতর হয়ে কিভাবে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতেন, স্বামীজীর প্রচন্ড গঞ্জনা সত্ত্বেও, এবং পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য-প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দের অ-রক্ষণশীল আচার-আচরণের সমালোচনায় যখন নিন্দুকের কন্ঠ মুখর, তখন তাঁরা, ব্যক্তিজীবনে অতীব গোঁড়ারাও, বিনা ভ্রূক্ষেপে নেতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের প্রতি নমস্কার জানিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—'রামকৃষ্ণ সংঘ বিবেকানন্দ বিনা যেমন অর্থহীন, তেমনি বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেত যদিনা তিনি তাঁর পিছনে রামকৃষ্ণসংঘভুক্ত ভ্রাতৃগণকে পেতেন।'

'Meaningless as would have been the Order of Ramakrishna without Vivekananda, even so futile would have been the life and labours of Vivekananda, without behind him, his brothers of the Order of Ramakrishna.'

সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে নিবেদিতা যে সহৃদয়তা পেয়েছেন, তার বিষয়েও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন—

'বেলুড়ে স্বামীজীকেই কেবল আমরা দেখিনি। সমস্ত মঠই আমাদের অতিথি

জ্ঞান করত। মমত্বপূর্ণ সেবা ও সাহায্যের নানা কাজে অতিথিবৎসল সন্ন্যাসীদের ব্যস্ত দেখা যেত। নিজেরাই দুগ্ধদোহন করে আমাদের পাঠাতেন। রাত্রিবেলা পথের মধ্যে যখন গোখরো সাপ দেখা গিয়েছিল, এবং ভৃত্য সেই পথ দিয়ে ভয়ে আসতে অস্বীকার করেছিল—তখন সাধুদেরই একজন চাকরের কাজটি করলেন। আমাদের ভারতবর্ষীয় গৃহস্থালীর দৈনন্দিনের বিচিত্র সমস্যার সমাধানে এক ব্রহ্মচারীকে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। অন্য একজনকে দেওয়া হয়েছিল বাংলা শেখানোর কাজে। রীতিরক্ষার জন্য বা সহৃদয়তাবশে প্রবীণ সাধুরা প্রায়ই আসতেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ যখন কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেলেন, তখন সকালে চায়ের টেবিলে তাঁর স্থান কেউ না কেউ নিতেনই, অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব তাঁরা এমন-ভাবে বোধ করেছিলেন। এইসব এবং এহেন হাজারো ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই জ্বলন্ত স্মৃতিময় অতীত আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল, যার 'টানা'-র উপর এই ত্যাগীদের জীবন 'পোড়েনের' মত বোনা হয়েছিল।

কারণ এইসকল সন্ন্যাসীদের চিন্তার বা আলোচনার একটি বিষয়ই ছিল—তাঁদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর মহান শিষ্য বিবেকানন্দ।"

একথা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যের সঙ্গেই নিবেদিতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়। স্বামীজীকে বাদ দিলে ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দই তাঁর কাছে প্রধান দুই চরিত্র। তাহলেও বাকি অনেকেই নিবেদিতাকে যথেষ্ট স্নেহ-প্রীতির চোখে দেখতেন, তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলী যদি অনুমোদন নাও করেন। অপরপক্ষে সকলের সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা যদিও আমরা তেমন পাইনি (নিবেদিতার অজস্র চিঠির কটাই বা আমরা পেয়েছি!) তাহলেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক শিষ্যের জীবন ও বাণীর স্বতন্ত্র গৌরবকে তিনি স্বীকার করতেন, এবং সিস্টার দেবমাতাকে সেকথা বলেছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অল্পস্বল্প উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাও গিয়েছিলেন। নিবেদিতাদের উইম্বলডনের বাড়িতে স্বামীজীর সঙ্গে তুরীয়ানন্দ অতিথি হয়েছিলেন। আমেরিকাতেও পরে নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছে। শাস্ত্রীয় প্রশ্ন মীমাংসার জন্য নিবেদিতা তুরীয়ানন্দকে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন—দেখতে পাই।

ভারতে আসার পরে নিবেদিতা যখন শ্রীমায়ের আবাসে গিয়ে ওঠেন, তখন সেই বাড়িতেই মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী যোগানন্দ ছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। যোগানন্দের মৃত্যুর যে অপূর্ব বর্ণনা নিবেদিতা চিঠিতে করেছিলেন, তাও উদ্ধৃত করেছি আগে।

স্বল্প পরিচয়েও নির্মলানন্দকে নিবেদিতা শ্রদ্ধা করতেন।—"তাঁর স্বজনদের

সংস্রবে তুমি আছ—এ বড় সুন্দর। হাঁ, স্বামী নির্মলানন্দকে আমি মাত্র একবার দেখেছি, তাতেই তাঁকে অপূর্ব লেগেছে। স্বামীজীও আমার কথায় সায় দিয়েছিলেন”—নিবেদিতা ২১. ৭. ১৯০৫ সালের এক চিঠিতে লিখেছেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের একটি চিত্র, ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে—(৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯)—

“যখন সেদিন মৃত বালিকাটির ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কণ্ঠনিনাদ! সে ডাক যদি তুমি শুনতে,—শুনে মনে হল ‘বীর ক্ষত্রিয় এবং ভদ্রলোক।’—‘শুনলাম সিস্টার নিবেদিতা এখানে এসেছেন, সুতরাং অবিলম্বে আমি চলে এসেছি,’—তিনি বললেন। তারপরেই অবতরণ। চমৎকার। অতএব কখনো এ’র বিষয়ে মন্দ কিছু বলো না। সেই বলীয়ানের স্বর আর ক্ষত্রিয় মহত্ব। অতি চমৎকার।”

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এক অসাধারণ পুরুষ, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, কারণ সমস্ত বাধা বিপত্তি এবং আপত্তির মধ্যেও, ভাঙা বাড়িতে, অনাহার বা অনিশ্চিত আহারের মধ্যেও ‘ঠাকুর ঘরটিকে’ রক্ষা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে দাস্যভাবের প্রতীক তিনি, ‘মহাবীর’, বুক চিরে দেখাতে পারতেন শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে ত্যাগী শিষ্যগণ যখন বৈরাগ্যে পরিব্রাজক, তখন, নিবেদিতার ভাষায়, ‘একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, যাঁর নাম রামকৃষ্ণানন্দ, যিনি কিছুতে শ্রীগুরুর দেহ-ভস্মাবশেষ ত্যাগ করে যাবেন না, যিনি পর্বতের মত অটল ছিলেন একটি প্রতিজ্ঞায়—মাথার উপরে একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা তিনি রাখবেনই, যে-পর্যন্ত না গুরুভ্রাতৃগণ আবার একত্র হচ্ছেন ঠাকুরঘরটিতে।’

ঠাকুরের প্রধান শিষ্যই ঠাকুরঘর ও ঘণ্টানাড়ার প্রধান প্রতিবাদী ছিলেন। শশীর (রামকৃষ্ণানন্দের) আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে নরেন্দ্রের অজস্র আক্রমণের সঙ্গে ‘পত্রাবলীর’ পাঠকমাত্রেই পরিচিত। কিন্তু কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল বিবেকানন্দের ঐ নিষ্ঠামূর্তির প্রতি! রামকৃষ্ণ-আদিষ্ট কার্য কখনই সফল হতে পারে না—রামকৃষ্ণানন্দগণ সেই কাজে যোগদান না করলে! স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, শশী একদিন দলপতি নরেন্দ্রের চুল ধরে টেনে তাঁকে ঠাকুরঘরের বার করে দিয়েছিলেন—ঠাকুরঘরের নিন্দা করায় তিনি এতই উত্ত্যক্ত হয়েছিলেন! তার দারুণ প্রতিশোধ বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন—যে শশী পৃথিবীর বিপর্যয়েও ঠাকুরঘর ছাড়তে রাজি নন, তাঁকেই উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করেছিলেন মাদ্রাজে—প্রচার ও সংগঠনের কাজে। শশী মহারাজ গিয়েছিলেন—কারণ নরেন্দ্রনাথ কার্যের দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন—সুতরাং এবার ঠাকুরই শশীকে টান দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরঘর থেকে দূরে—নরেন তো উপলক্ষ মাত্র।

প্রেম ও অভিমানের রসায়নে প্রস্তুত কী অপরূপ দিব্য নাটক!—যখন সমস্ত দিনের কঠোর শ্রমের পরে ক্লান্ত, প্রায় মূর্চ্ছিত শশী মহারাজ মাদ্রাজের একটি সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়ে নরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করে বলছেন—তাঁর এই সমস্ত যন্ত্রণার মূল নরেনই—পরক্ষণেই ভালবাসায় অনুতাপে বিগলিত কণ্ঠের

ক্ষমা প্রার্থনা, প্রিয়তম ভাইটির কাছে। এইসব গুরুভ্রাতাদের মনে রেখে স্বামীজী নিবেদিতাকে যেকথা বলেছিলেন—আজ যদি তিনি অধঃপতিত হয়ে যান, তাঁর শিষ্যরা পর্যন্ত তাঁকে পদাঘাত করে বিদায় দেবে, কিন্তু গুরুভাইদের ভ্রূকুঞ্চিতও হবে না—আগেই তা আমরা দেখে এসেছি। স্বামীজীর প্রতি গুরুভাইদের ভালবাসার বর্ণনায়, বন্দনায়, নিবেদিতা মুখর তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে—তাও আগে দেখেছি আমরা।

রামকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন রামকৃষ্ণানন্দ। দেহটুকু উৎসর্গ করলেন তার পরে রামকৃষ্ণের ভাবের শরীররূপী বিবেকানন্দের কাছে। দেহকে ক্ষয় করলেন—আক্ষরিকভাবে—সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, তাতে ক্ষয়রোগ ঢুকল—জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবার জন্য ফিরে এসেছিলেন বাংলা দেশে। তাঁর সেই প্রস্থানের বর্ণনা আমরা নিবেদিতার চিঠি থেকে কিছু পরেই উপস্থিত করব। তার আগে, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিবেদিতা যখন মাদ্রাজে বক্তৃতা করতে গেছেন, তখনো তিনি রামকৃষ্ণানন্দের কাছ থেকে কী রকম আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছেন, নিবেদিতার চিঠিতে তার উল্লেখ আছে।—

২১. ১২. ১৯০২-এর চিঠি—

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—কী শক্তিমান! নিরন্তর পূজার পূর্ণতা থেকে যে শান্তি আসে, তার স্পর্শে আমার আত্মা পূর্ণ। শান্তি—এখানে! গৃহ—এখানে! মাধুর্যে পূর্ণ।"

২৯. ১২. ১৯০২-এর চিঠি—

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অত্যুত্তম। প্রতি বক্তৃতায়, বা কথাবার্তার কালে তাঁর শক্তিপূর্ণ অথচ শান্ত উপস্থিতি পেয়েছি।......সদানন্দের ভাইপো আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, নতুন ধরনের সন্ন্যাসে। এখানেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রস্তুত—তাঁর উৎসাহপূর্ণ সমর্থন নিয়ে।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দেহত্যাগের বর্ণনা, ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে (৪. ৭. ১৯১১)—

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিকটস্থ উদ্বোধন অফিসে বহুমূত্র ও ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী। আজ সকালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কোনো আশাই নেই বাঁচবার। আহা! কী অপূর্ব! সমস্ত সংগ্রাম আর অনিশ্চয়তা পিছনে পড়ে রইল, সামনে শুধু নিশ্চয়তা—ধ্রুবজ্যোতি।......

স্বামীজী কত দ্রুত সকলকে ডেকে নিচ্ছেন! স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নেই! আজ দুপুর একটায়, তাঁর ভাত বাড়া হয়ে গেছে, সমস্ত সকালটা ভাল কেটেছে, গায়ের তাপ স্বাভাবিক, এটা-ওটা খাচ্ছেন, ফলমূল, সবকিছু—সকলে ভেবেছিল তিনি একটু ঘুমোচ্ছেন, হঠাৎ দেখল—দেহ প্রাণহীন! কী শান্তি! অপরূপ মুখখানিতে সংগ্রামের এতটুকু চিহ্ন নেই, তা শক্তিতে পূর্ণ এমনই—যখন সাড়ে তিনটের সময়ে বিদায় নিতে যাচ্ছি, তখনও দেখলাম।

আমার সৌভাগ্য, ফুল পাঠাতে পেরেছিলাম। সাড়ে পাঁচটার সময়ে শবানুগমন করবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হল—গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হবে। বরাহনগরের পথে একটা ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েছিলাম; কিন্তু কয়েক মাইল হাঁটার পক্ষে আমার বার্ধক্য এসে গিয়েছে, ফিরে এলাম, শুধু একলা। বরাহনগরের ছেলেরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল, যদি সম্ভব হয় তাঁকে মঠে নিয়ে যাওয়া হবে, না হলে, শ্রীরামকৃষ্ণকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল, সেই ঘাটে তাঁর সৎকার করা হবে, যার নিকটেই মঠে তিনি বহু বহু বছর কাটিয়েছেন, যখন সংঘের মূল শিকড়ের মত তিনি ছিলেন। পরিপূর্ণ জীবন! শেষ তার। আহা—সেই শেষ, সেই তো বিজয়!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—দেহটি নিয়ে যাচ্ছে—যতক্ষণ না দৃষ্টির বাইরে গেল, চেয়ে রইলাম। মনে হল, হাঁ, ঐ তো তিনি আবার যাচ্ছেন এক মহাপুণ্য তীর্থযাত্রায়—যে-পথ দিয়ে তাঁরা সকলে গিয়েছিলেন যখন বালক ছিলেন, গুরুকে দর্শন করতে।......এখন এখানে আঁধার ঘনিয়েছে, আমার চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টাধনি, বাতাস প্রার্থনামন্ত্রে পূর্ণ—কিন্তু আমি ভাবছি চিতার রক্তশিখাগুলির কথা!

নিবেদিতা—স্বরূপানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্যদের অন্যতম স্বামী স্বরূপানন্দের পরিচয় রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল, কারণ তিনি সমসাময়িক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র বিখ্যাত সম্পাদক এবং ইংরাজীতে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদক। ভগিনী নিবেদিতা স্বরূপানন্দের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে স্বরূপানন্দের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বরূপানন্দের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাধুত্বের বিষয়ে তিনি অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বরূপানন্দ স্বামীজীর কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই, সাধারণ রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস দেন (২৯শে মার্চ)। এর থেকেই স্বরূপানন্দের বিষয়ে স্বামীজীর উচ্চ ধারণার পরিচয় মেলে। সে ধারণা তিনি প্রকাশও করেছিলেন,—মিসেস ওলি বুল প্রভৃতির কাছে সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন,—'আমরা একটি রত্নলাভ করেছি।'

রামকৃষ্ণ সংঘে প্রবেশের আগেই স্বরূপানন্দ বাংলার সংস্কৃতিজীবনে অংশ গ্রহণের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম ভবানীপুর অঞ্চলে, ১৮৭১-এর ৮ই জুলাই। তিনি 'আশৈশব বিদ্যানুরাগী; নিজ প্রতিভাবলে উচ্চশিক্ষা, উন্নত নীতিবোধ এবং মার্জিত রুচির অধিকারী;...... সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি,......বৈদিক ধর্ম ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে উৎসাহ অপরিসীম।' পল্লীযুবকদের নৈতিক জীবন সংগঠিত ও তাদের পরোপকারে প্রবৃত্ত করতে তাঁর উদ্যমের সীমা ছিল না, এবং সেই উদ্দেশ্যে 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কৃত অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে সেখানে শাস্ত্র দর্শনাদি চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই সকল তথ্য স্বামী অব্জজানন্দ তাঁর 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে স্বরূপানন্দ-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। সেখানে আরও পাই—"ছাত্রসমাজের মধ্যে উচ্চ আদর্শের পরিবিস্তার, তজ্জন্য নিয়মিত পাঠচক্র, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগার পরিচালনাও এই চতুষ্পাঠীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'ডন' (*Dawn*) নামে একখানি মাসিকপত্রও অজয়হরির সম্পাদনায় এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিল।......পরিশেষে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে, অজয়হরির অনুপ্রেরণায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হইলে 'ডন' পত্রিকা এই সমিতি দ্বারাই পরিচালিত হইতে থাকে। তৎকালীন সমাজে আদর্শবাদী 'ডন'-এর প্রভাব সর্বজনবিদিত। ভারতের জাতীয় শিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এই 'ডন' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অজয়হরি যতদিন গৃহত্যাগ না করিয়াছেন,

ততদিন সতীশবাবুর সহিত তিনিও 'ডন' পত্রের যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন।"*

রামকৃষ্ণ সংঘে স্বরূপানন্দের যোগদানকে স্বামীজী 'রত্নপ্রাপ্তি' বলেছিলেন দেখেছি। স্বরূপানন্দের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চরিত্রের জন্যই স্বামীজী একথা বলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাইরের দিক থেকেও রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে স্বরূপানন্দ এক অতি প্রয়োজনীয় রত্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন তার বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করার দরকার এখানে নেই, সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, মাদ্রাজ থেকে বিবেকানন্দ-আদর্শবাহী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা তার তরুণ সম্পাদক রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সে পত্রিকা অবিলম্বে পুনঃপ্রকাশ না করলেই নয়। ১৮৯৬-এর জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশের পরেই 'প্রবুদ্ধ ভারত' অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, এমনকি তৎকালীন ভারতবর্ষে 'সর্বাধিক প্রচারিত' মাসিক পত্রের গৌরব পর্যন্ত পেয়েছিল,—সেই পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়া রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পক্ষে মহা ক্ষতিকর। তাছাড়া সংঘের নিজস্ব মুখপত্রেরও বিশেষ প্রয়োজন। এইসব নানা কারণে 'ডন' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদককে সংঘে লাভ করে স্বামীজী স্বতঃই খুশী হয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়,—এক ইংরেজী মাসিক পত্রের শাস্ত্রজ্ঞ এক সম্পাদককে পাওয়াই নয়,—ঐ সম্পাদক অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, এই ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অজয়হরি ধর্মমতে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী। স্বামীজী সত্যই একজন খাঁটি অদ্বৈত-বাদীকে চাইছিলেন যিনি ভক্তিস্রোতে গা ভাসান দেবেন না, রামকৃষ্ণ-ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যিনি রামকৃষ্ণ-পূজক হবেন না, অভারতীয়দের কাছে যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন, এবং সেই আদর্শেই পত্রিকা পরিচালিত করবেন।

আরও একটি দিক থেকে স্বরূপানন্দের প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দেয়। স্বামীজীর অদ্বৈতবাদী ইংরাজ শিষ্যদম্পতি ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার হিমালয় অঞ্চলে একটি অদ্বৈত কেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ উৎসুক হন। এই আশ্রমের কর্তারূপে অদ্বৈতবাদী স্বামী স্বরূপানন্দকে এবং আশ্রমের লৌকিক কর্মরূপে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটিকে যুক্ত করে দেওয়ার সুযোগ তিনি পান।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়—মায়াবতী আশ্রমে অদ্বৈতবাদী মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজক সন্ন্যাসীদের সংঘর্ষ যে হয়েছিল, তার কথা স্বামীজীর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা জানেন। স্বামী বিমলানন্দ ও বিরজানন্দ প্রভৃতিরা মায়াবতী আশ্রমের একটি কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের পট পূজা করায় মাদার সেভিয়ার সে বিষয়ে স্বামীজীর কাছে অভিযোগ করেন এবং স্বামীজীও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর অভিপ্রায়মত শ্রীরামকৃষ্ণ পট অতঃপর সরিয়ে নেওয়া হয়। ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি এখানেই হয় না। স্বামীজীর অভিপ্রায় অভ্রান্ত কিনা,

* স্বামী অব্জজানন্দ তাঁর প্রদত্ত এই তথ্য শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত *The origins of the National Education Movement* নামক গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন এবং মূল উদ্ধৃতও করেছেন।

সে বিষয়ে স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যেও সন্দেহ থাকে এবং তাঁরা এ বিষয়ে শ্রীমা সারদাদেবীর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। শ্রীমা ঐ পত্রের একটি অপূর্ব উত্তর দেন—সে উত্তর স্বরূপানন্দের ডায়েরীতে লিখিত আছে।* সারদাদেবীকে যে কেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞানের দেবী সারদা বলতেন তা এই উত্তর থেকে বোঝা যায়। যেখানে নিজ স্বামীর পটপূজা করা হয়েছিল এবং সেই পট সরিয়ে নেওয়ার পরে তার ঔচিত্য বিষয়ে কাতর প্রশ্ন করেছিলেন ভক্তগণ, সেখানে বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামীর পটপূজা বন্ধ সমর্থন করে সহধর্মিণী পত্র লিখেছেন—

> "খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) মাতা ঠাকুরাণীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ অগস্ট, ১৯০২;—লিখিয়াছেন—
>
> 'আমাদের গুরু যিনি তিনি ত অদ্বৈত, তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'" (৭. ৯. ১৯০২ তারিখের ডায়েরী)

স্বামী স্বরূপানন্দের মঠে প্রবেশের সময় থেকেই নিবেদিতা তাঁকে জেনেছেন। নিবেদিতার ব্রহ্মচর্য দীক্ষার কয়েকদিন পরেই স্বরূপানন্দের দীক্ষা হয়, এবং স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রশংসা নিশ্চয় নিবেদিতা জেনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপানন্দ নিবেদিতার বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হন।† স্বরূপানন্দ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

'From morning of 28th April began to teach S. Nivedita Bengali'.

কলকাতায় থাকা কালেই স্বরূপানন্দের শিক্ষাদান শুরু হলেও তিনি যথার্থ শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন আলমোড়ায় যখন নিবেদিতা প্রতিদিন 'বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে' তাঁকে পেয়েছিলেন। ব্যাপারটিকে নিবেদিতা 'মহাসৌভাগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। এমন বলার যে বিশেষ কারণ আছে, তার প্রসঙ্গে আসার আগে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সঙ্গে নিবেদিতার যোগের বিষয়টি বলি।

---

* ডায়েরীটি স্বামী অব্জজানন্দের কাছে আছে। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে সেটি আমাকে দেখতে দিয়েছেন।

† স্বরূপানন্দ কিন্তু নিবেদিতার প্রথম বাংলা শিক্ষক নন। ভারতে আসার অব্যবহিত পরেই অন্য একজনকে মার্গারেটের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাঁর বিষয়ে নিবেদিতা ১৮৯৮-এর ৩১ জানুয়ারীর চিঠিতে লিখেছেন—"আমাকে বাংলা শেখাবার জন্য গতকাল যে ভদ্রলোককে পাঠানো হয়েছিল তিনি দুটি ছোট বই রেখে বললেন, 'এর মধ্যে আমাদের প্রভুর বাণী বাংলায় লেখা আছে; আপনি বাংলা শিখেই এগুলি অনুবাদ করবেন।' স্বামীজী কতখানি অসাম্প্রদায়িক তা তুমি বুঝবে আমার উত্তর থেকে—'প্রভু? কোন্ প্রভু?—কৃষ্ণ?' সৌভাগ্যবশতঃ আমার অসুবিধা কোথায় তিনি বুঝতে না পেরে বললেন—'হাঁ—আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ।'"

'স্বামীজী কতখানি অসাম্প্রদায়িক'—মার্গারেটের এই কথার অর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য হয়েও স্বামীজী 'আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ'—এই ধারণা মার্গারেট প্রভৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। সুতরাং 'আমাদের প্রভু' বলতে মার্গারেট স্বভাবতঃই হিন্দুর সাধারণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝেছিলেন।

'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহের বিষয়ে *Wanderings* গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"এই সময়ে (জুন—জুলাই, ১৮৯৮) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে মাদ্রাজ থেকে প্রবুদ্ধ ভারতের স্থানান্তর ব্যাপারটি আমাদের সকলের মন অধিকার করে ছিল। এই কাগজটির প্রতি স্বামীজীর সব সময়েই বিশেষ ভালবাসা ছিল—যে চমৎকার নাম তিনি এই পত্রিকাটিকে দিয়েছেন, তার থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া নিজস্ব মুখপত্র প্রবর্তনেও তিনি সর্বদা উৎসুক ছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষায় এই পত্রিকার মূল্য তাঁর কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর আচার্যের ভাবনা ও বাণী এর মারফৎ ছড়িয়ে পড়বে, যেমন তা ছড়াবে প্রচার ও কর্মের দ্বারা। সুতরাং নিজস্ব পত্রিকাদির বিষয়ে তাঁর দিনের পর দিন চিন্তা, যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজের বিষয়ে। দিনের পর দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির বিষয়ে কথা বলেছেন। এক অপরাহ্নে যখন আমরা একত্র বসে আছি, তিনি একটি কাগজ এনে হাজির করলেন, যাতে 'তিনি একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু রূপ দাঁড়িয়েছে—" (ঐ পত্র স্বামীজীর একটি বিখ্যাত কবিতার রূপ নিয়েছিল, নাম— *To the Awakened India;* কবিতাটি প্রবুদ্ধ ভারতের অগস্ট, ১৮৯৮, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)।

প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে নিবেদিতার যোগদানের কথাও উঠেছিল। নিবেদিতা গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে *Wanderings* গ্রন্থের পরিশিষ্টে নূতন সংযোজিত অংশে পাই—

'The *Prabuddha Bharata's* first number had just arrived, and there was some thought of despatching Nivedita to Almora to help the Editor'.

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ব্যাপারটি এইকালে নিবেদিতার মনকে কিভাবে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁর চিঠি থেকে। ১৮৯৮-এর ৭ অগস্ট তিনি মিসেস হ্যামণ্ডকে লিখেছেন—

"*Great Thoughts* (পত্রিকা) আশীর্বাদের মত এল।......কোনো সোসাইটি পত্রিকাকে এত পরিচ্ছন্ন ও চমৎকার ভাবাই যায় না। 'গ্রেট থটস্'-এর মত কোনো পত্রিকা তোমার কাছে থাকলে যদি তা পাঠিয়ে দাও, বিশেষ কৃতজ্ঞ হব। 'প্রবুদ্ধ ভারতে' যে ধরনের জিনিস যাওয়া উচিত বলে স্বরূপানন্দ এবং আমি মনে করি, তার চেহারা বুঝবার পক্ষে এই জাতীয় পত্রিকার নমুনার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।*

**Great Thoughts* পত্রিকাটি নিবেদিতার খুবই প্রিয় ছিল; এটিকে তিনি নিশ্চয় আদর্শভাবে সম্পাদিত পত্রিকা মনে করতেন। প্রবুদ্ধ ভারতের আগেই 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার জন্যও এটিকে আদর্শ নমুনারূপে সম্পাদকের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। ৬ জুন, ১৮৯৮, তারিখের এক পত্রে সেকথা পাই।

স্বরূপানন্দ আলমোড়ায় শুধু আমার বাংলা শিক্ষক ও গীতাপাঠে সহায়ক ছিলেন; এখন থেকে, যখন তাঁর উপর নতুন পত্রিকার দায়িত্ব পড়ছে—সে বিষয়ে তাঁর আকর্ষণও বিশেষ—তাঁকে আমি সেরা একজন সুহৃদ্ মনে করি।"

নিবেদিতা স্বরূপানন্দের গুণমুগ্ধ হলেও সব সময়ে তাঁর ইংরেজী ভাষা বা সম্পাদনায় খুশী হতে পারেন নি; আবার খুশী হয়েছেন, এমন ক্ষেত্রও যথেষ্ট।*

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা দেশাত্মবোধক নানা কাজে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনায় প্রত্যক্ষ যোগ রাখতে পারেন নি কিন্তু পত্রিকাটি তাঁর কাছে চিরদিনই গুরুর প্রিয়বস্তু বলে অতি প্রিয় ছিল, তাই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে স্বরূপানন্দের অকাল দেহত্যাগের পরে পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনার অনেকখানি দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন।†

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ অগস্টের এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—'স্বামীজীকে বাদ দিলে স্বরূপানন্দ হলেন তিন জন বাঙালীর একজন, যাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে আমি গর্বিত।' কয়েক মাস পরে, ১৮৯৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারীর এক চিঠিতে তিনি আবার লিখলেন—

'What marvellous men they (The Hindus) do produce! I have a group of 3 demigods now, Swarupananda, Mr. Padshah, and Dr. Bose.'

জগদীশচন্দ্র বা পাদশা-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হবে, এখানে জিজ্ঞাস্য—স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে এত গভীর ভাবাবেগের কারণ কি? নিবেদিতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে। তাঁর অতিবড় এক চিত্তসংকটের ক্ষণে স্বরূপানন্দের শিক্ষা মানসিক ভারসাম্যরক্ষার পক্ষে পরম সহায়ক হয়েছিল। সেই দারুণ সংঘাতের কথা নিবেদিতা *Wanderings* ও *The Master* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। *Wanderings* থেকে ঐ অংশটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি—নিবেদিতার দৃঢ়মূল জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে স্বামীজী-ঈপ্সিত ভারতবোধের সংঘর্ষ, তার তিক্ততা ও অপরূপ পরিণতি, যখন স্বামীজী আকাশে নবোদিত চন্দ্রের তলায় নবজীবন গ্রহণের জন্য নিবেদিতাকে আহ্বান ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই নিবেদিতা *The Master* গ্রন্থে লিখেছেন—'আমার আচার্যদেবের সঙ্গে আমার এই সময়ের সম্পর্ককে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু বলা

---

* "নভেম্বর সংখ্যা প্রবুদ্ধ ভারত, যা আজ এসে পৌঁছল—পেয়ে খুবই খুশী। খুবই শক্তিপূর্ণ। সদানন্দ অখণ্ডানন্দের কাছে ভাগলপুরে গেছে দুর্ভিক্ষের কাজে, আর স্বামী সারদানন্দ স্বরূপানন্দকে গুজরাটে পাঠাবার কথা বলছেন। কিন্তু তা যে কি করে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না। সে ক্ষেত্রে পত্রিকাটির হবে কি? (১৮৯৯, ২৬ ডিসেম্বরের চিঠি)

† নিবেদিতা অতঃপর প্রবুদ্ধ ভারতে 'Occasional Notes' লিখতে থাকেন। এই Notes-গুলি থেকেই পরে তাঁর *Religion and Dharma* বইটি প্রস্তুত হয়। তাছাড়া *The Master as I Saw Him*-সহ নিবেদিতার বহু লেখা প্রবুদ্ধ ভারতে বেরিয়েছে।

যাবে না। আজ বুঝতে পারছি, তখন কত কি শিখবার ছিল, আর শিক্ষার সময় কত না অল্প ছিল! আর প্রথম শিক্ষণীয় বস্তু ছিল, শিক্ষার্থীর মনের আত্মতুষ্টির ভাব নষ্ট করা। কিন্তু সেই সময়ে আমার বহুযত্নপোষিত ধারণা-সম্পদগুলির উপরে যে অবিরত বিদ্রূপ ও আক্রমণ বর্ষিত হচ্ছিল—তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের বহু যন্ত্রণাভোগই যুক্তিহীন। তাই এইকালে যখন আমার কল্পিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রিয়মুখ গুরুকে সরিয়ে আর একটি মূর্তি আত্মপ্রকাশ করল, যা বহুলাংশে উদাসীন এবং সম্ভবতঃ প্রতিকূল,—তখন আমি যে-কষ্টবোধ করেছিলাম, তার ঔচিত্য যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারব না।"

এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন মিস্ ম্যাকলাউড; সেজন্য তাঁর প্রতি নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। এক্ষেত্রে স্বরূপানন্দেরও কিছু দান ছিল। *The Master* গ্রন্থে সে বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—

'আমার মহাসৌভাগ্য, এই সময়ে আমি প্রতিদিন বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে তরুণ সন্ন্যাসী স্বরূপানন্দকে পেয়েছিলাম, যার ফলে আমার চতুর্দিকে যে ঘনীভূত ভাব ও অনুভূতির রাজ্য বর্তমান ছিল তার অনুধাবনে কিছুটা সমর্থ হয়েছিলাম; একাজ সম্ভব হয়েছিল স্বরূপানন্দ ও আচার্যদেবের মনের সংযোগপথে আসতে পেরেছিলাম বলেই, যেমন দর্পণ-সংকেতের কালে বৃহৎ দর্পণ ও ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে অবস্থিত কেউ সংকেতের ভাষা বুঝতে পারে।'

স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের রহস্য বুঝবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় যে অন্তর্মুখিনতা—তারই শিক্ষা নিবেদিতা এই সময়ে স্বরূপানন্দের কাছ থেকে লাভ করেন। —'স্বামী স্বরূপানন্দের প্রভাবেই আমি গভীরভাবে ধ্যানশিক্ষার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য না পেলে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বৃথা অতিবাহিত হত।' ('আচার্যদেব')

সমকালে লেখা একটি চিঠিতে ধ্যানশিক্ষার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মিসেস হ্যামণ্ডকে নিবেদিতা ৭ অগস্ট, ১৮৯৮-তে লিখছেন—

"জানিনা তুমি ধ্যানের জন্য বুদ্ধ-ভঙ্গিতে বসতে সচেষ্ট হয়েছ কি না! ইংলণ্ডে থাকতে ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি; কিন্তু ভারতে সকলেই সহজে, খুব স্বাভাবিকভাবে, এ রীতি নেয়। স্বামী স্বরূপানন্দ অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে আমাকে ধ্যানের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। ধ্যান আর কিছু নয়—মনঃসংযোগ, ধ্যেয় বস্তুতে অব্যাহত মনোনিবেশ। তবে কোনো কোনো বিশেষ অবস্থানে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক শক্তি ঐ মনঃসংযোগকে সহজতর করে। সুতরাং বহিরঙ্গ ক্রিয়ারীতির উপযোগিতা আছে বৈকি! যেমন ধরা যাক, উপবেশনের জন্য চর্মাসন নিশ্চিত সহায়ক, যা বিচ্ছিন্নতা আনে, ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে কোনো না কোনোভাবে বর্ধিত করে। স্বামীজী কিন্তু ব্যাপারটাকে সহ্য করতে পারেন না, যেহেতু তার দ্বারা বহিরঙ্গ বস্তু দারুণ গুরুত্ব পেয়ে যায়।

"স্বরূপানন্দ বলেন, 'যে মুহূর্তে তুমি তোমার **সমুদয়** শক্তি সংহত করতে পারলে, সেই মুহূর্তে তোমার করণীয় সব কিছু তুমি সম্পাদন করে ফেললে—

তার ফল স্বতঃই উন্মোচিত হবে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তার পূর্বে কিন্তু বিরাট বিরাট অনেক কিছু সাধকের কাছে আবির্ভূত হবে।' যাই হোক, অন্ততঃ যদি সম্পূর্ণ শান্তিও পাওয়া যায়, যাকে মেটারলিঙ্ক 'বিরাট সক্রিয় নীরবতা' বলেছেন—সেটাই কি অপূর্ব নয়?

"আমি কিন্তু এই 'বিরতির' অভিজ্ঞতার স্বাদ এখনো পাইনি, যদিও পাবার জন্য চেষ্টা করেছি কয়েকবার। তবে অনেকে পেয়েছেন শুনেছি।

"এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে অল্পদিন পূর্বে বলেছেন, গোড়ার দিকে মাত্র দুটি বিষয় নিয়ে আমার ধ্যান করা উচিত, আর তা করার সময়ে সামনে কোনো ছবি বা বিগ্রহ থাকা দরকার, যাতে সমস্ত মন তন্নিষ্ঠ হতে পারে। ধ্যানের প্রথম বিষয় নিজ গুরু; তারপর যে-কোনো একটি বস্তু-বিষয়। বস্তু-বিশেষ ধ্যান করতে সমর্থ হলে নির্বিশেষ ধ্যানের অধিকার আসবে। এইসব খবরের জন্য তোমার কি কোনো আগ্রহ আছে? আমার কাছে এগুলি মূল্যবান, যেহেতু সহজে পাই না। তবে মনে হয়, এসব ব্যাপার হয়ত তুমি অনেক আগে থেকেই জানো। আর একটি কথা তোমাকে জানাবো-জানাবো ভেবেছি—কিন্তু—বলেই ফেলি—ব্যাপারটা শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে। এক রাত্রে আমার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল—কিছুতে অস্থিরতা যাচ্ছিল না—অগত্যা আমি মনঃশক্তির প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলাম; কিছু পরেই লক্ষ্য করলাম—এঁরা যাকে অন্তঃশ্বাস বলেন তাই প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছে আমার অজান্তেই, আর আমি সমস্ত ব্যাপারটির উপর আধিপত্য এনে ফেলেছি। এক মুহূর্তে মানুষ হঠাৎ-ঝলক পেয়ে যায়—জীবনের কী বিচিত্র রহস্য! তখন সে বোঝে নির্জনতার মূল্য এবং আরও নানা জিনিসের, যার কথা সে শুধু লোক-শ্রুতিতেই শুনে এসেছে।"

স্বরূপানন্দ নিবেদিতাকে ধ্যান ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, অপরপক্ষে স্বরূপানন্দের নিজস্ব জীবনকথাই নিবেদিতার কাছে একটি মহৎ শিক্ষার রূপ নিয়েছিল। বাল্যে করুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী দ্বৈতবাদী স্বরূপানন্দ কিভাবে, কোন্ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠেছিলেন—সে কাহিনী নিবেদিতার জানার প্রয়োজন ছিল—অদ্বৈতবাদকে কেবল তত্ত্বরূপে নয়, জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের অঙ্গরূপে অনুভব করবার জন্য। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"স্বরূপানন্দের মনোবিকাশ-কাহিনী আমার কাছে অতীব আকর্ষণের বস্তু। এই মানুষটি বাল্যে বৈষ্ণব বিশ্বাসের মধ্যে লালিত হয়েছিলেন। এই মতে ঈশ্বর পরম দয়াল প্রেমময় রক্ষাকর্তা প্রভু; শ্রীকৃষ্ণ পরিত্রাতা, ঈশ্বরের অবতার। পাশ্চাত্ত্য খ্রীস্টানধর্মেরই অনুরূপ এই মত। এই ধারণা প্রায়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, এখানেও তাই হয়েছিল। তাঁর বয়স যখন বাড়ল, তরুণ বয়সের বীরভাবে ও হৃদয়-বত্তায় যখন দেহমন পূর্ণ হয়ে উঠল—তখন জীবনের অবিচারের দৃষ্টান্ত চোখে গিয়ে বিঁধল, দেখলেন তিক্ত বাস্তবের চেহারা; দেখলেন, এ জগতের লড়াইয়ে বলবানেরই জয়। তখন ভেঙে গেল বাল্যের মধুস্বপ্ন; আর বিশ্বাস রাখতে পারলেন না দয়াময় ঈশ্বরের কল্পনায়। তাঁর জীবনের তেমন একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

জনাকীর্ণ পথে যেতে যেতে একদিন দেখলেন, এক দরিদ্র নারী অনুচ্চে কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে পথের ধুলো থেকে খুঁটে খুঁটে চাল কুড়োচ্ছে—এক পথচারীর ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে চালগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দেখে ঐ মানুষটির বুক চিরে তীব্র যাতনার চীৎকার ছুটে গেল, গভীর দুঃখ ও করুণায় বলে উঠলেন —'রাক্ষস ঈশ্বর! এখন কী করছেন? যদি তিনি থাকেন—কোথায় তিনি? তিনি থাকলে এ জিনিস কী করে ঘটল?'

"এই ধরনের দুটি-তিনটি ঘটনা এক বছর ধরে তাঁকে এমন অন্তর্যাতনার মধ্যে রাখল যে, স্বাস্থ্য গেল নষ্ট হয়ে—আর কখনো ভালো স্বাস্থ্য কাকে বলে জানেন নি। কিন্তু এই আলোড়ন থেকে তিনি জীবন সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় লাভ করলেন, তা শান্তি দিল তাঁকে। **স্বপ্ন তাঁকে ভাঙতে হবে।** অর্থাৎ তিনি সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, বুদ্ধদেবের সময় থেকে, পূর্ব থেকেও, যাতে পৌঁছেছেন হাজার হাজার ভারতীয় জিজ্ঞাসু। অতঃপর তাঁর পক্ষে জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য 'উচ্চ সিংহাসনে আসীন ঈশ্বর এবং নিম্নে নতজানু মানব-আত্মা'—এই ধরনের কোনো কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হল না। বিপরীতপক্ষে তিনি দেখলেন, এই যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখে থাকি,—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিচার-অবিচারের স্বপ্ন-মাখা এই যে জগৎ-বোধ—এর মূলে রয়েছে আমাদের অজ্ঞান ও অহং। এই মায়াকে জয় করবেন—তিনি স্থির করলেন, প্রত্যয় ও প্রজ্ঞাকে অধিকার করবেন,—বিপরীত বোধসমূহের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তিলাভ করে, হিন্দু যাকে মুক্তি বলে সেই স্থায়ী অভেদ-চেতনার জগতে উন্নীত হবেন।

"এর পর থেকে সর্বোচ্চ অবস্থালাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন। অতঃপর যে কয়েক বৎসর তিনি পিতৃগৃহে কাটিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর কৃচ্ছ্র-সাধনা এমনকি পরবর্তী বিভিন্ন মঠজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনা অপেক্ষা কঠোরতর ছিল—তা নানা সূত্রে বোঝা যায়। বহুদিন পরে আলমোড়ায় যখন আমি তাঁর কাছে ভগবদ্‌গীতা পড়েছি, তখন তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম—কী দারুণ তৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে পারে ঈশ্বরপ্রেম!"

দ্বৈতবাদী স্বরূপানন্দ যখন অদ্বৈতবাদী হয়েছিলেন তখন সত্যই তা হয়েছিলেন; সুতরাং অবতারবাদ মানতেন না, এবং তদনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ববিধ মহিমা স্বীকার করেও তাঁকে অবতার বলে মেনে নেন নি। নিবেদিতা এক চিঠিতে (৫. ৪. ৯৯) লিখছেন—'স্বরূপানন্দের মত যিনি অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না তিনি নিশ্চয় তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) অবতার বলবেন না।'*

---

* লণ্ডনে বৈদান্তিক স্বরূপানন্দের যাওয়া উচিত এমন একটা ভাবনা নিবেদিতার মাথায় ঢুকেছিল।—"জানো, ইদানীং আমার মাথায় একটা কথা ঢুকেছে—মিসেস সেভিয়ারকে স্বরূপানন্দের সঙ্গে লণ্ডনে ফিরতে প্রণোদিত করা উচিত, সেখানে তাঁরা বেদান্ত প্রচার-কাজ আবার আরম্ভ করবেন! সে কাজ সম্ভব হলে স্বামীজী কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন—একথা না ভেবে পারছি না।" (চিঠি—৮।৬।১৯০৬)

স্বরূপানন্দের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ের পরে নিবেদিতা স্বভাবতঃই (তাঁর ইউরোপীয় বাস্তববোধে ও কৌতূহলে) স্বরূপের পরিবারের বিষয়ে সন্ধান নিয়েছিলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিল একটি বেদনাদায়ক চিত্র। স্বরূপানন্দ মঠে যোগদানের পূর্বে বিবাহ করেছিলেন। স্বরূপের পক্ষে এই বিবাহ লৌকিক অর্থে বিবাহ নয়। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে এ বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—'স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বিবাহের রূপ—যা তিনি তাঁর গুরুদেবের ক্ষেত্রে দেখেছেন, কিংবা গুরুভাই যোগানন্দের ক্ষেত্রে, কিংবা শিষ্য স্বরূপানন্দের—'। স্বরূপানন্দের পত্নীর অবস্থা বা মনোভাবের বিষয়ে আমরা কোনো তথ্য পাইনা, কিন্তু তাঁর মায়ের অবস্থার যে ছবি দিয়েছেন নিবেদিতা, তা মর্মান্তিক। ১৮৯৯, ৮ মে'র এক চিঠিতে পাই—

"গতকাল আমি আমার মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলাম। ফেরার পরে দেখি মিঃ মোহিনী (মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়) আমাকে ভবানীপুরে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বরূপের মাকে দেখবার জন্য। হৃদয়বিদারক দৃশ্য! স্বরূপ চলে যাবার পর থেকে তিনি অসুস্থ অর্ধোন্মাদ, আর যৎপরোনাস্তি অসহায়! সৌভাগ্যবশতঃ কিছু সাহায্য করবার মত অবস্থায় আমি ছিলাম।......কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিস হল, ক্ষণেকের জন্যও পুত্রকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এঁর হীন অক্ষমতা, যাতে সে তার মনোমত জীবন যাপন করতে পারে।

"সদানন্দ আমার সঙ্গে ছিলেন। এঁর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে প্রথমেই পুরনো ঘটনাগুলি বিবৃত করলেন : গৃহত্যাগের সময়ে স্বরূপ কত অসুস্থ ছিলেন, ট্রামে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন ইত্যাদি। তারপরে সদানন্দ এঁকে বললেন, 'এখন তাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে সে স্বাস্থ্য ফিরে পায় এবং আপনার জন্য রোজগার করবার অবস্থা পেতে পারে।' অবশেষে হতভাগ্য জননী আমাকে আশীর্বাদ করলেন—গভীর আশীর্বাদ। আর স্বরূপের জন্য প্রার্থনা। আজ সকালে স্বরূপকে সেকথা লিখে পাঠিয়েছি।"

স্বরূপের পরিবার পালনের বিষয়ে নিবেদিতার আগ্রহ এখানেই নিঃশেষিত হয়নি। বছর দেড়েক পরে, যখন নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্যে আছেন, ম্যাকলাউডকে লেখা তখনকার এক চিঠিতে পাই (২৫. ১. ১৯০১)—'মিঃ মোহিনীর মারফৎ তুমি কি স্বরূপানন্দের বাড়ির লোকজনের বিষয়ে সন্ধান নেবে—তাদের হাতে কোনো টাকা অবশিষ্ট আছে কি? স্বামীজী আমাকে যে দশ পাউন্ড দিয়েছেন, সেই টাকা তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

স্বভাবে সংযত স্বরূপানন্দের ডায়েরী অতীব সংক্ষিপ্ত, সুতরাং তাতে নিবেদিতা প্রসঙ্গ সামান্য থাকবে, তা আশ্চর্যের কি? নিবেদিতাকে বাংলা শিক্ষাদানের বিষয়ে ডায়েরীর অংশ আগে উদ্ধৃত করেছি। এখানে বাকি অংশ তুলছি :

28.5.1898 :—Nivedita lectured on India and England and their services.........

11.6.1898:—Swamiji and the ladies left this morning for Kashmere.

13.5.1902:—Nivedita, Okakura, Bet and Kalu arrived.

20.6.1902:—Nivedita and Bet left on Calcutta.

4, July, Friday at Belur Math in his own room while sleeping on the floor Swami Vivekananda suddenly died: Brojendra was in attendance. After the [. . . . .] of July Nivedita wrote to the Indian Mirror of Calcutta that her work would thenceforth be independent of the Math.

6.3.1903:—Met two Baroda people at N's.

16.5.1904:—Dr. and Mrs. J. C. Bose, his sister, Nivedita and Greenstidel arrive and go back on 16th June.

স্বামীজীর মৃত্যুর পরে কিছু সময়ের জন্য নানাকারণে স্বরূপানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কে কিছু কাঠিন্য দেখা যায়। নিবেদিতার রামকৃষ্ণ সংঘ ত্যাগ ও খোলাখুলি জন-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এর অন্যতম কারণ হতে পারে। স্বরূপানন্দ নিশ্চয় চেয়েছিলেন, নিবেদিতা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের কাজে নিয়োগ করুন—প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনাকর্মে সাহায্য করুন। এই কর্মপরিধি নিবেদিতার কাছে সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছিল, তাছাড়া স্বরূপানন্দের স্বভাবে যে কঠোর নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্যের ভাব ছিল, তাকে স্বয়ং আধিপত্যপ্রবণ ও স্বাধীনস্বভাব নিবেদিতার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ১৯০৪, ৩০শে জুনের এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—

"মায়াবতীকে, যেভাবেই হোক, সবসময়ে শ্বাসরোধী মনে হয়। স্বরূপানন্দ এতই ব্রাহ্মণ! এবং মিসেস সেভিয়ার সম্পূর্ণভাবে তাঁর দ্বারা অবনমিত! দেখা যাচ্ছে, ক্রিস্টিনের জীবনে এমন একটি সময় এসেছিল যখন তিনি বলেছিলেন—'কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কাজ করতে পারব না।' আর তাই ক্রিস্টিন এখানে এসেছেন।......এখানে আমি গুরু, আর সেখানে সম্পাদকমাত্র!"

কিন্তু এই সকল মানসিক সংঘর্ষ আত্মিক সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি—মৃত্যুর সহসা আঘাতে চৈতন্যমূলে নাড়া খেয়ে নিবেদিতা তা অনুভব করলেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত স্বরূপানন্দ সহসা দেহত্যাগ করলেন ২৭ জুন; ১৯০৬। নিবেদিতা চিঠিতে লিখলেন (২৯. ৬. ১৯০৬)—

"স্বরূপ নেই! আর কিছু ভাবতে পারছি না। স্বরূপ নেই!......

"স্বামীজীর 'জীবনী' নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু স্বরূপের সাহায্যের উপর কত না নির্ভর করেছিলাম!

"ছায়ান্ধকারের মধ্যে আছি—এখন। কিন্তু কী অদ্ভুত—স্বরূপ!—আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বছরের পর বছর শীতলতা গেছে; তারপর ইদানীং পুরনো ঘনিষ্ঠতা ও মিষ্টতার প্রত্যাবর্তন। তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছিলাম; ভেবেছিলাম, সে শক্তি পেয়েছে, তার প্রয়োগ করতে যাচ্ছে—কিন্তু **এ জিনিস** ভাবিনি। অপূর্ব পরিত্রাণ ঘটল, তার ক্ষেত্রে। তার উপরে চাপানো নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সে অধীর অস্থির, তারপরে—এখন সে খাঁটি সন্ন্যাসের অধিকারে বর্তমান;—এর দ্বারাই সর্বোত্তম কাজ করতে পারবে।"

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা শোকলিপিতে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার বহু কথাই প্রচ্ছন্ন ছিল।—

"গভীর বেদনার সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। তাঁকে হারিয়ে আমরা কতখানি হারালাম—সদ্য বিয়োগের এই পটভূমিকায় তা এখনই লিখে জানানো সম্ভব নয়। যদিচ এটুকু জানি যে, ক্ষতি অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস পান। সন্ন্যাসপ্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপর হিমালয় কেন্দ্রের ভারার্পণ করা হয়; সেই সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদকও হন। সেই অবধি এই দুই গুরু দায়িত্বের কার্যাবলী তিনি পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে এসেছেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বজাত নানা সম্পর্কের প্রতি কর্তব্যপালন করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতরা তাঁর পূর্ণ-পরিণত শক্তির কথা জানতেন,—যে-মহান জীবনদর্শনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন তারই প্রচারে ঐ শক্তি সদা-প্রস্তুত ছিল। সংস্কৃতে তাঁর সমূহ পাণ্ডিত্য, এবং তিনি একনিষ্ঠ শঙ্করপন্থী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। এঁর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি যে, বেলুড় মঠে যোগদান করার অব্যবহিত পরেই তিনি এঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন—অন্যান্যের মত প্রারম্ভিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়নি। স্বামীজীর এই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পরিপূর্ণ-ভাবে রক্ষা করেছিলেন পরবর্তী বৎসরগুলিতে, তাঁর উন্নত অবিচলিত নিষ্ঠাভক্তির অনুসরণে। যারা তাঁর কাছে 'ধ্যান' ও 'যোগ' শিক্ষা করতে আসত, তাদের কাছে তিনি সহৃদয়, ধৈর্যশীল শিক্ষকরূপে দেখা দিতেন—সাহায্য করার, উন্নীত করার অপূর্ব সামর্থ্য যাঁর ছিল। জীবনের সংকটক্ষণে যারা তাঁর উপর নির্ভর করত, তাদের দিতেন নিরন্তর স্নেহপূর্ণ আশ্রয়। আর যে ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাকুল অভিসার—তাঁর জীবন সে সকলেরই মূর্ত বিকাশরূপে প্রতীয়মান হত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে। তথাকথিত ত্যাগ-বৈরাগ্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিকতার আবরণে কাপুরুষতার প্রশ্রয়,—তাঁর ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশীল বুদ্ধি বাস্তব সমস্যার সম্পূর্ণ অনুধাবনে সমর্থ ছিল; তার সমাধানে অকুতোভয় ছিল তাঁর মন।

"আমরা যারা স্বামী স্বরূপানন্দকে জানতাম, বিরাট সম্ভাবনার শীর্ষে উন্নীত তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যান করবার সময়ে একথা ভাবতেই পারি না—সে জীবনের সমাপন হয়েছে মৃত্যুতে! খুলে গেছে দ্বার, গভীর নীরবের, পূর্ণ নৈঃসঙ্গ্যের। আত্মলয়ে চির আকাঙ্ক্ষী সাহসী আত্মা সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বরিত বেগে। এ জীবনের চরম ত্যাগে অর্জিত সেই মৃত্যুর মহাসন্ন্যাস নিশ্চয়ই আবার নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নূতন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে তাঁর আবির্ভাবের।"

(In Memoriam: *Prabuddha Bharata*, Sep. 1906).

স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা যখন মায়াবতী গেলেন—কী গভীর স্মৃতিতে আলোড়িত হয়েছিল তাঁর মন প্রাণ,—তার কিছু পরিচয় আছে তাঁর একটি চিঠিতে (জুন ২, ১৯০৭), সেই অংশটি দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি—

"দেওদারের নৈশ দীর্ঘশ্বাস! রাত্রি ও তারকার বিষয়ে উদাসীন মহান আত্মার তুল্য অপরূপ সুন্দর পর্বত। হায়—হায়—স্বরূপ! বিষাদে আচ্ছন্ন আমি। স্বরূপ নেই—সমস্ত জায়গাটিতে যেন কিছু নেই—কোনো মধুরিমা! উদাসীনতাকে সর্বোচ্চ ভাবাবস্থা বলে পূজা করতে শুরু করেছি। যখন কেউ মাতামাতি করে লড়াই করে, সে চারপাশে আলোর পথ বন্ধ করে দেয়। আশঙ্কা হয়, আমিও অনেক সময় ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।......"

নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশন

ধর্মসংঘ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন—শুধু এই কারণের জন্য নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। কিছু আগে 'ব্রহ্মানন্দ—নিবেদিতা' প্রসঙ্গে বিষয়টির উত্থাপন করে কিছু বক্তব্য আমরা বলেছি। এখানে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে নেওয়া যায়।

বহু মহল থেকে ইদানীং অভিযোগ উঠেছে, নিবেদিতার প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন তার দায়িত্ব পালন করেনি। অভিযোগের বহর থেকে দুটি সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি :

রামকৃষ্ণ মিশন সত্যই দায়িত্ব পালন করেনি;
জনসাধারণ সত্যই দায়িত্ব পালন করেছে।

যাচাই করে দেখা যেতে পারে এই দুটি সিদ্ধান্তের কোন্‌টি কী পরিমাণে সত্য!

প্রথম সিদ্ধান্ত—রামকৃষ্ণ মিশন দায়িত্ব পালন করেনি,—ধরা যাক, কথাটা সত্য। নিবেদিতার যে-মহাজীবন এবং বিরাট কীর্তি এই গ্রন্থে আমরা উপস্থিত করেছি, তার আলোকে দেখা যাবে, এমন একটি চরিত্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সত্যই কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব। সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেনি মিশন। তবে যদি কথাটা এই দিক থেকে বলা হয় যে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মিশন তার সংঘমধ্যে আশ্রয় না দিয়ে দায়িত্ব পালন করেনি, তার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে—মিশন তার মূল চরিত্র বদল করার আগে তা করতে পারত না,—করলে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখাবিশেষ হয়ে উঠত!*

তাছাড়া মিশন আর কোন্ দায়িত্ব পালন করেনি, সে বিষয়ে লেখক ও বক্তাগণ সুস্পষ্ট নন। একজন মাত্র এই অভিযোগ এনেছেন—দার্জিলিঙয়ে নিবেদিতার দাহক্ষেত্রে কোনো স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা মিশন করেনি। সে কাজ করেছে কে—নিবেদিতার সৎকারক্ষেত্রটুকু বাঁধিয়ে দেবার ব্যবস্থা?—করেছেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ, যাঁরা বৃহত্তর রামকৃষ্ণ সংঘেরই অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকাকে সম্মানিত না করে যদি রামকৃষ্ণ মিশন অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেই অন্যায় মিশন আরও অনেকের সম্বন্ধে করেছে; যেমন ধরা

---

* রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার কথা নিবেদিতা স্বয়ং এইভাবে লিখেছেন—

"Our Master (Vivekananda), at any rate, regarded the Order to which he belonged, as one whose lot was cast for all time with the cause of Women and People. . . . He ignored all the proposals that reached him which would have pledged him to one party or another as its leader. Only let Woman and the people receive education. All further questions of their fate, they would themselves be competent to settle".

যাক, সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে, (কিংবা জহরলাল সম্পর্কে, কিংবা গান্ধীজী সম্পর্কে) যিনি রাজনৈতিক ছিলেন, সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ভরসা করা যায়, সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা রামকৃষ্ণ মিশন কেন করেনি, এই অভিযোগ উত্থাপন করবেন না কেউ।

এমনও কোথাও কোথাও শোনা গেছে, নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার ব্যাপারে মিশন দীর্ঘদিন অবহেলা দেখিয়েছে। কথাটা সত্য। এই অবহেলা মিশন সংঘজননী সারদাদেবী, এবং প্রথম সভাপতি ও প্রথম সম্পাদক—যাঁদের রামকৃষ্ণ মিশনের মূল সংগঠক বলা যায়—সেই ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ সম্বন্ধেও দেখিয়েছে। সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দ সম্বন্ধে যে-অন্যায় মিশন করতে পারে, নিবেদিতা সম্বন্ধে তা করা অসম্ভব নয়, কারণ মিশনের কাছে তিনি নিশ্চয় সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দের চেয়ে বড় আসনে অধিষ্ঠিতা নন।

স্বাধীনতার আগে মিশনকে জীবনী প্রভৃতি রচনা অপেক্ষা লোকসেবামূলক কাজে বেশী মনোযোগী হতে হয়েছিল।

কিন্তু এই কালে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকেও নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় কেউ এগিয়ে আসেনি। এসেছিলেন বিদেশিনী এক মহিলা, লিজেল রেমঁ, দীর্ঘ কয়েক বৎসর যিনি নিবেদিতার উপরে গবেষণায় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেই নিবেদিতার উপরে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ এদেশে জেগেছে।* এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনও, বিলম্বে হলেও, তার দায়িত্ব যোগ্যভাবে পালন করেছে। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা আরও গবেষণা চালিয়ে দুটি তথ্যপূর্ণ জীবনী রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকেই প্রকাশ করেছেন। সেই জীবনীগুলি অতীব প্রশংসনীয়; কেবল মৃদু সমালোচনা করে এটুকু বলা চলে, নিবেদিতার বিপ্লবাত্মক রাজনীতি সম্বন্ধে লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা মানসিক অস্বস্তিবোধ করেছেন, এবং বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ যাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এঁদের সমালোচনা কিছু বেশী উষ্মাপূর্ণ হয়েছে।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়—দীর্ঘদিন ধরে নিবেদিতার বিষয়ে ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট যে পুস্তকখানি প্রচলিত ছিল (সরলাবালা সরকার লিখিত), সেটির প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশনই।

এবং—নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলী একত্রে প্রকাশে ব্রতী রামকৃষ্ণ মিশনই।

এর বিপরীত প্রশ্ন—জনসাধারণ নিবেদিতার জন্য কি করেছে—যে-জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য তিনি মিশন ত্যাগ করেছিলেন এবং তার জন্য দীর্ঘ অন্তর্যাতনা বহন করেছেন? জনসাধারণের কিছু অংশে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধী সমালোচনা দেখে মনে হয়—নিবেদিতা ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম স্থপতিরূপে স্বীকৃত হয়েছেন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সরকারী ভবনসমূহে তাঁর প্রতিকৃতি লম্বিত রয়েছে, সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলি তাঁর নিত্য নামগানে বিভোর! হায় কত অলীক

* এই বইটির বাংলায় অপূর্ব অনুবাদ করেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী। তাঁর কাছে সকলেই কৃতজ্ঞ।

সেই স্বপ্ন! আর বেসরকারী প্রচেষ্টা? কোনো স্পষ্ট কাজ অপেক্ষা তা 'অপরে কি করেনি,' তারি হিসাব গ্রহণের উত্তেজনায় কতখানি নিঃশেষিত!

একটি নিষ্ঠুর সত্য বলা যাক; ভারতবর্ষের সভ্যতার মহিমা খ্যাপনের সময়ে নিবেদিতা সত্যই সামঞ্জস্য হারিয়েছিলেন। তিনি বড় বেশী 'ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতা'র গুণগান করেছেন। নিবেদিতার অপরূপ রচনার উদ্দিষ্ট সেই ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতার বাষ্পমাত্র বর্তমান ভারতবর্ষে নেই। যদি থাকত, তাহলে নিবেদিতা গ্রন্থাবলী সুলভে দেবার জন্য অর্থসাহায্যের আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুষ্টিভিক্ষা এবং ভারত সরকারের সরাসরি প্রত্যাখ্যান—একমাত্র উত্তর হত না!* স্মৃতিরক্ষার অন্য ব্যবস্থা?—সেসব দাবি নিবেদিতার জন্য না করাই ভাল, কারণ তিনি নিজের অপেক্ষা ভারতবর্ষকেই বড় করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ছিলেন না, দেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং রাজনৈতিকদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অপেক্ষা তাঁর গুরুর অন্তর্দৃষ্টিই স্বচ্ছতর ছিল!

তথাপি সত্য নির্ধারণের জন্য যদি নিখিল কোনো বিচারালয় থাকে, সেখানে ভারত সরকার বা ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক সরকারসমূহকে একটি জবাবদিহি করতে হবে—তাঁরা তাঁদের বর্তমান স্বাধীনতার সৌভাগ্যের জন্য যাঁদের কাছে ঋণী—তাঁদের প্রতি দায়িত্ব কেন পালন করেন নি! যদি না করেছেন—তাহলে মিথ্যা কথা কেন বলেন—কেন বলেন যে, আমরা আমাদের জাতীয় সৌধের স্থপতিদের কাছে কৃতজ্ঞ! বিশেষতঃ নিবেদিতার কাছে ঋণ স্বীকারের দায়িত্ব আরও বেশী। কেননা তিনি বিদেশিনী। ভারতবাসী ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য প্রাণ দেবে, তাই স্বাভাবিক। যদি বিদেশী কেউ তা করে, এবং তিনি যদি নিবেদিতার মত বিরাট চরিত্রের মানুষ হন—তাঁর প্রতি হৃদয়-উজাড়-করা কৃতজ্ঞতাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে দেশ নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের মহান ভূমিকা গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

সরকার চিরদিনই যন্ত্র—জনসাধারণের ইচ্ছার বেগ তাকে সচল করে। জিজ্ঞাসা করা যায়, নিবেদিতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভাসমূহে নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় সরকারী ঔদাসীন্য কী পরিমাণে সমালোচিত হয়েছে? রামকৃষ্ণ মিশনের সমালোচনা যাঁরা নাটকীয় ভাবে সভাসমিতিতে করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ সংবাদ-পত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁদের পত্রিকাগুলি বহু ব্যাপারে রুদ্ধ আক্রোশে সরকারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভ বিদীর্ণ হা-হা ধ্বনি করে—এক্ষেত্রে নীরব কেন? এর একটি মাত্রই উত্তর সম্ভব, অতি তিক্ত উত্তর—আমরা কিছু গড়তে পারি না, কিন্তু যদি কিছু গড়ে ওঠে, তাকে ভাঙবার চেষ্টা করতে পারি। নিজেরা কিছু না করে রামকৃষ্ণ মিশন কি করেনি, তারই উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত হতে পারি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার তথাকথিত সম্পর্কচ্ছেদ যে কত বহিরঙ্গ, দীর্ঘস্থান ধরে তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি—বিচ্ছেদের পরেও রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে প্রভূত তথ্য দেওয়া হয়েছে। আরও দু' একটি তথ্য এখানে জানানো যায়। স্বামীজীর জীবনীর জন্য তথ্য সংগ্রহ, তাঁর গ্রন্থগুলি

* নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল এই উত্তরই পেয়েছে।

সম্পাদনার বহু দায়িত্ব নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। এ বিষয়ে লিজেল রেম'র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

"ইংলণ্ডে বসে লেখা 'রাজযোগ' ছাড়া স্বামীজী এলোমেলো এক গাদা খসড়া আর নানা ধরনের টুকরো লেখা রেখে গিয়েছিলেন। গুডউইন শর্টহ্যাণ্ডে একরাশ ভাষণ ধরে রেখেছিলেন, সেগুলোও খুব সাবধানে সম্পাদনা করা দরকার। এ কাজে যে-সাধুরা নেমেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতাও হাত মেলান।......'কর্মযোগে'র কাজ করে নিবেদিতা 'জ্ঞানযোগে' আর একবার তুলি বুলোলেন।......নিবেদিতা তাঁর যা-কিছু সব তুলে দিলেন মিশনের সাধুদের হাতে। তাঁরা যে বিরাট বইখানার মালমসলা যোগাড় করেছিলেন, তার জন্য আমেরিকায় পাওয়া অটোগ্রাফ চিঠিগুলো নিবেদিতা তাঁদের দিয়ে দিলেন। বইখানার নাম হবে 'দি লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ, বাই হিজ ইস্টার্ন এণ্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপল্‌স্‌।'"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকেই যে নিবেদিতা স্বামীজীর রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, তার পক্ষে একটি স্পষ্ট প্রমাণ আমরা সম্প্রতি সংগ্রহ করতে পেরেছি। স্বামী নির্লেপানন্দের কাছে নিবেদিতার একটি চিঠি আছে, যাতে নিবেদিতা মঠ-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গুডউইনের ভগিনীকে স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি মূলে উদ্ধৃত করছি :

To Mrs. Margaretta Edmunds
9, Englis Road, Southern Sportsmouth.

3 Oak . . .
Burling-in-Wharfdale
Feb. 12, 1909

Dear Mrs. Edmunds,

A letter which you wrote to the Swami Vivekananda, in 1898, on your mother's behalf regarding the death of your brother Mr. Goodwin has fortunately turned up. This gives me a little hope of reaching you, which otherwise I had failed to do, by writing to Bristol.

We have been trying to find you for some time, to ask if, amongst your brother's papers there might be any notes of talks or lectures by the Swami Vivekananda still unused. If so, would you feel that you could part with them? Would you mind writing to me on this point?

You probably know that the Swami himself died July 4th 1902. You will understand therefore how high a value his letters and

notes would have for us. I may say that I write with the authority of the monastery and his Brethren.

I am an English woman and the last of our little group who saw dear Mr. Goodwin. He met me at Madras and spent the whole day with me about the 21st of Jan. 1898.

Believe me dear Mrs. Edmunds,

Very Sincerely Yours,
Margaret E. Noble

নিবেদিতার দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী ও বাংলা দুই মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত ও উদ্বোধনে কি জাতীয় শোকপ্রবন্ধ বেরিয়েছিল, এই গ্রন্থের অন্যত্র সেগুলি আমরা অন্যান্য পত্র পত্রিকার শোকপ্রবন্ধের সঙ্গে উদ্ধৃত করব, এবং নিবেদিতার রচনাদি পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে কিভাবে প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ করে আসছে, তাও স্মরণ করিয়ে দেব, সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করব—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ককে নিবেদিতা কতখানি মর্যাদা দিতেন, এবং অন্য পক্ষও তাই। লিজেল রেম'র রচনা থেকে পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি। নিবেদিতার জীবনের একেবারে শেষ ক্ষণের কথা—যখন দার্জিলিঙয়ে মৃত্যুশয্যায় তিনি শায়িত—

"শেষ একটি আনন্দ বুঝি তোলা ছিল তাঁর জন্য। গণেন মহারাজের সঙ্গে জয়পুরে আচার্য বসুর আলাপ হয়, তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। মঠের বাগান থেকে এক ঝুড়ি ফল এনেছেন। সাধুরা পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, নিবেদিতা অসুস্থ, এবং যাওয়ার আগে এমনি-কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন। এ ফল যে নিবেদিতার কাছে যাবার বেলায় গুরুর প্রসাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বলেছিলেন, ছুটি হলে আম দেবেন। সেই কথা নিবেদিতার মনে পড়ে যায়। সামর্থ্য থাকতে থাকতে বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আরেকবার নিবেদিতা আনন্দ করে ফল খেয়ে নিতে চাইলেন।"

দেহত্যাগের ৬ দিন আগে, ৭ই অক্টোবর, নিবেদিতা উইল করেছিলেন। তা এই—

"বস্টন শহর নিবাসী উকীল মিঃ ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার নামে যে তিন শত পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, এবং আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে—সেই সকল আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামীজীর মঠের ট্রাস্টীগণকে দিতেছি। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহারা মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলের পরামর্শমত উহার আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন।" (মুক্তিপ্রাণা)

যে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতা যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন (রামকৃষ্ণ মিশনকেই দিয়েছিলেন!) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য—সেই মিশন কত সংকটের মধ্য দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করেছিল, তার বিষয়ে কিছু তথ্য অল্প পরেই স্বামী গম্ভীরানন্দের রচনাংশ থেকে পাঠক দেখবেন। এখানে শেষ কথা জানাই—স্বামীজীর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী যখন বেরুল, যে রচনাগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে গীতাতুল্য—সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লেখার ভার দেওয়া হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে দলত্যাগিনী নিবেদিতার উপরই!!

নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক সমালোচনার বিষয় হওয়াতে স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর *History of the Ramakrishna Math and Mission*-এর মধ্যে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তথ্যপূর্ণ, উষ্মাহীন, সামঞ্জস্যযুক্ত সেই অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি—

> "নিবেদিতা নিজের মনপ্রাণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষেই। ভারতে বৃটিশ শাসন তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত করত। জন্মে আইরিশ তিনি, বৃটিশ পীড়নের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্বদেশে হোম রুল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের জন্য একই পদ্ধতি প্রয়োগে স্বতঃই তিনি প্রণোদিত ছিলেন। কিন্তু আমরা গোঁড়ামির সঙ্গে একথা বলতে পারি না, তিনি বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, আমাদের মতে, কোনো মতের প্রতি সহানুভূতি, তা প্রকাশ্য বা গোপন যাই হোক, এক জিনিস, আর কাজে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমরা জানি, কোনো কোনো আধুনিক লেখক বলেন, তিনি যথার্থই বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এমনকি তার গুপ্ত নেত্রীও ছিলেন। এইসব বিতর্কমূলক বিষয়ে আমরা ইচ্ছাপূর্বক নীরব থাকতে চাই। আমরা যা সর্বাধিক জানি তা হল, স্বামীজীর মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অংশ ভ্রমণ করেন, এবং সেইসব স্থানে ভারতের রাজনৈতিক দাসত্বকে কঠোর ধিক্কার দেন। আমরা স্বীকার করি, এটি মহাবীরত্বের ভূমিকা এবং জাতীয় দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী। আমরা আরও জানি যে, নিবেদিতার প্রতিভা বহুমুখী,—মনে দাগ কাটবার মত লেখিকা, নাড়া দেবার মত বক্তা তিনি; কথাবার্তার সময়ে মোহিত করে রাখবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। এবং একথাও সম্ভবতঃ বলা যায়, মূলে ধর্মপ্রবণ হলেও তিনি 'আত্মপ্রকাশ' চাইতেন; তাঁর গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং আত্মোৎসর্গ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গন্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে না, এমনকি অনুরূপভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মধ্যেও নয়। সর্বত্রই তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিল—শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক, এক কথায় সেকালের ভারতবর্ষে যাঁরা সংস্কৃতিমান ও অগ্রগামী প্রগতিশীল—সকলের মধ্যেই তাঁর

সঞ্চরণ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য পেয়েছেন, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে সে একটা বিরাট লাভ, এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম অম্লান অক্ষরে লিখিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, মিশন কি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারে, কিংবা যিনি ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করেও সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেছেন—তাঁকে আশ্রয় দিতে পারে? সে বিষয়ে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট দৃঢ় নির্দেশ—এই সংঘ রাজনীতি এবং উগ্র সমাজসংস্কার চেষ্টা থেকে দূরে থাকবে।

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের নেতৃগণের নিকট কর্তব্য ছিল স্পষ্ট, যদিও বেদনাদায়ক; কারণ নিবেদিতা কি বিবেকানন্দের গুরুভাইদের পরম স্নেহ-পাত্রী ছিলেন না, এবং সংঘ কি স্বামীজীর এই গুণশালিনী অধ্যাত্মকন্যার নিকট অনেক কিছু আশা করত না? স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনীকে ডেকে রাজনীতি ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ভগিনীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মঠ ও মিশন থেকে নিজেকে বিমুক্ত করা ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য উপায় ছিল না। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাইয়ের এক চিঠিতে তিনি সেই কাজ করলেন। এখনকার রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু বাঙালী লেখক এই বেদনা-দায়ক ঘটনাটি নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। খুবই নাটকীয়ভাবে বলা হয়েছে, এ-হল মিশনের সঙ্কীর্ণ গন্ডী থেকে নিবেদিতার বিতাড়ন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর উত্তরণ। কোনো কথাই সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একদিক দিয়ে বলতে গেলে বিতাড়ন বলতে যা বোঝায় মিশন কখনই তা করেনি, বাইরের ব্যাপারে সম্পর্কচ্ছেদ মাত্র হয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। সে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার বিদ্যালয়কে আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করে গেছেন। মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে, এবং শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণে আত্ম-নিবেদিতা সেই চিরদিনের প্রিয় কন্যা 'নিবেদিতা'ই ছিলেন ; আর তিনিও জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই পরিচয়ই দিয়ে গেছেন। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতাই ১৯১১ সালে নিজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবুদ্ধ ভারতে (সেইকালে মিশন পরিচালিত একমাত্র ইংরাজী মাসিক পত্রিকা) মাসের পর মাস *Occasional Notes*-এর অধিকাংশ লিখেছেন। এইকালে তিনি একাধিকবার মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হিসাবে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারত তার নভেম্বর সংখ্যাকে 'সিস্টার নিবেদিতা স্মৃতি সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করে। তারপরে মিশনের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব, নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় তত-খানিই সে করেছে। এর পক্ষে প্রমাণরূপে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা থেকে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত করছি :

"গোড়ায় বিদ্যালয়টির নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। স্থানীয় লোকজন বলত 'নিবেদিতার স্কুল।' নিবেদিতাকৃত নামকরণ— 'The Ramakrishna

School for Girls'. কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্যবাসী বলেছেন— 'The Vivekananda School'। ভগিনী নিবেদিতার লোকান্তরের পরে ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়টি যখন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হল তখন বর্তমান নাম-করণ করা হয়— 'The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girl's School.' ”

আরও জানানো যায়, 'উদ্বোধন অফিস' থেকে নিবেদিতার কয়েকটি বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিবেদিতা বিদ্যালয় লাভ করবে। বাকি বইগুলি একই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা মেসার্স লঙম্যান, গ্রীন এন্ড কোম্পানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত কোম্পানী যখন বইগুলি 'আর লাভজনক নয়' বলে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলির পুনর্মুদ্রণে বিরত ছিল, তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পক্ষে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করে। পুনশ্চ, ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিতার স্মৃতিতে ভারত এবং লন্ডনে সভা আয়োজিত হয়েছিল, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করা হয় স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য। শেষতঃ উদ্বোধন অফিস প্রথমাবধি নিবেদিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত চালু রেখেছে এবং নিবেদিতার ছবিও। মঠ ও মিশনের সর্বত্র তাঁর চিত্র সম্মানের সঙ্গে টাঙানো থাকে।

অপরপক্ষে কেউ যদি একথা বলেন, এদেশে নিবেদিতা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছেন—সে ব্যাপারটা এখনো প্রমাণসাপেক্ষ। আমরা মিশনের প্রথম সাধারণ কার্যবিবরণীর (১৯১৩) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

'[ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে তাঁর বিদ্যালয়ের] আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, কারণ ভগিনী নিবেদিতা তাঁর উইলের দ্বারা তাঁর গ্রন্থাদির যে স্বত্ব দান করে গিয়েছিলেন, তা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্বাহের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। ভগিনী নিবেদিতার স্মরণার্থে কলিকাতা টাউন হলে ১৯১২ সালের মার্চ মাসে যে স্মৃতিসভা হয়, তাতে ভগিনীর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু স্মৃতি-ভান্ডারে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সংগৃহীত হয়নি। ভগিনী নিবেদিতার পরম পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য স্মৃতি সমিতি এ পর্যন্ত ২,৫২২ টাকা ৭ আনা ৯ পাই সংগ্রহ করেছে।......তার মধ্য থেকে ২,৩৮৪ টাকা ৭ আনা ৯ পাই রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির হাতে দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের জন্য।'

তাই বলে আমরা একথা বলতে চাইছি না, দেশ ভগিনীর কাছে ঋণ স্বীকার করেনি। যা বলতে চাই তা হল, এক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ উক্তির ব্যাপারে সংযত হওয়াই ভাল। এইসঙ্গে অবিলম্বে আমরা যোগ করে দিচ্ছি—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকে ভগিনীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনেক কিছু করেছেন। যে সরু গলিতে ভগিনীর বিদ্যালয় স্থাপিত সেটিও তাঁর নামাঙ্কিত।"

গম্ভীরানন্দের এই সংযত রচনাটি প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। ভগিনীর প্রতি সমূহ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত বাঙালী অতঃপর ভগিনীর স্মৃতিতে যথার্থ কিছু করার পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের তথাকথিত ঔদাসীন্যের সমালোচনা করবেন, এই আশা করা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বিজ্ঞানাগারের প্রবেশপথে নিবেদিতার মূর্তি বসিয়েছিলেন, এবং নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার জন্য নিজ উইলে এক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন—তিনি কিন্তু সমালোচকদের দলবৃদ্ধি করেননি।

গম্ভীরানন্দের রচনার শেষাংশে নিবেদিতা স্মৃতি সমিতির শোচনীয় কর্ম-শৈথিল্যের যে উল্লেখ আছে, যা আমাদের জাতীয় ঔদাসীন্যের স্মারক, সে বিষয়ে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেগুলি উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। ৯ই জুন, ১৯১৩, অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নের সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

It was shortly after the death of the late lamented Sister Nivedita in October, 1911, that a condolence meeting was held at the Town Hall. In that meeting it was resolved, amongst other things, to commemorate the hallowed memory of the Sister by providing funds for the maintenance and development of the Girls' School at Baghbazar which she had started and which she was rearing up with her heart's blood. The resolutions of course were moved with perfervid eloquence, of which there is never any dearth in our country, and surely no worthier way of perpetuating her memory than the one resolved upon could have been hit upon. But unfortunately, as is usually the case, as soon as the effervescence of the Town Hall speches subsided, the practical aspect of the thing was relegated to oblivion. To day, after 20 months have rolled by we are told, by the authoritative report of that school published by Swami Saradananda of the Rama-krishna-Vivekanand Mission, that the only subscriptions so far collected towards this noble object amount to Rs. 932-7-9 collected before and after that meeting. Of this, the report says, Rs. 784-7-9 are in hand. The balance having been spent in meeting the expenses of the meeting. Among the donations promised at the meeting and not yet realised may be mentioned: Rs. 1000 from Dr. Rash Behari Ghose, Rs. 500 from Mrs. J. C. Bose, Rs. 250 from Babu Bhupendra Nath Bose, Rs. 100 from Mr. C. C. Ghose and others. In the meantime, as we are told, the present conductors of the School are finding it rather uphill work to keep up the institution to the requisite level of efficiency. We

hope the donors and the office-bearers of the Memorial Committee will kindly see that such a noble and useful institution does not languish for that support which it has a right to expect of them. Apart from the sacred duty of commemorating the late Sister's memory to which they and others have pledged themselves, this school has an additional title to the warmest support from the Hindu section of the public at least. For, it is decidedly one of the very few institutions, if not the only institution of its kind, that has real access to Hindu middle-class ladies behind the Purdah and that imparts education on thoroughly oriental lines.

চাঞ্চল্যকর মন্তব্য। 'আপত্তিকর'ও বটে; কেননা দেশের নামকরা কয়েকজনের বিরুদ্ধে নাম করে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা নাকি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করেছেন, তাও সামান্য কয়েকটি টাকা! নিশ্চয় কানাকানি, আলোচনা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—হয়ত আইনের শাসানিও। অমৃতবাজার ভয় পেয়েছিল, যে-রকম ভয় পেতে সে অভ্যস্ত, এবং অকুণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছিল, যে-রকম ক্ষমা চাইতেও সে অভ্যস্ত। মধ্যবর্তীকালে অমৃতবাজারের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটির কৈফিয়ত দিয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরুল ১৩ই জুন সংখ্যায়। ঐ লেখাটির মধ্য থেকে মনোযোগী পাঠক অনেক কিছু ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারবেন। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে, প্রতিশ্রুত টাকা দেননি, (যাঁদের কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন), তার মূলে ছিল—টাকাটা অনভিপ্রেত সংগঠনের হাতে যাবে—এই অস্বস্তি। নচেৎ 'বিদ্যালয় পরিচালনার উপযুক্ত দায়িত্বশীল কমিটি গঠিত হয়নি বলেই' তাঁরা টাকা দিতে পারেননি, এই অজুহাত উঠত না। নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার ক্ষেত্রে এঁরা পছন্দসই প্রতিষ্ঠান চেয়েছিলেন—স্বামী সারদানন্দের পরিচালিত সংগঠন সে পছন্দের অংশ পায়নি। অথচ নিবেদিতা তাঁর উইলের সব টাকাই রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টিদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা মিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এঁদেরই দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, আগেই দেখেছি।

অমৃতবাজারের দ্বিতীয় মন্তব্য এই :

We very much regret our recent paragraph on the late Sister Nivedita's school has caused some misapprehension in some quarters. When we mentioned some prominent names from whom subscriptions to the Nivedita Memorial fund were promised but "not yet realised" nothing was further from our intention than to

apportion any blame to any quarter for the non-realisation. Indeed, the charity and patriotism of the persons referred to are too well-known to us—as to all the country—to lead us to insinuate, even remotely, that they were indifferent to the fulfilment of their respective promises. On the other hand, we are really glad to learn on enquiry that Mrs. J. C. Bose has, since the publication of the report we reviewed, paid down her quotum of Rs. 500. As regards Dr. R. B. Ghosh and Mr. C. C. Ghosh the matter stands thus, as our representative, who enquired into the matter, has gathered:

> "Both Dr. Ghosh and Mr. C. C. Ghosh were ever ready to pay the promised subscription as soon as a responsible committee had been formed to manage the school. No such committee has yet been formed, and Dr. Nilratan Sircar could not accept their subscriptions in the absence of such a committee. It is understood that steps are being taken to form such a committee then and then not only these two gentlemen but others also will pay their promised subscriptions."

We need hardly say that it gives us the greatest pleasure to be able to anounce this. In fact, one of our objects in mentioning the names was to remind the public that the institution counted amongst its supporters and patrons,—actual or prospective,—such worthy and distinguished personages."

দেবমাতার স্মৃতি

[সিস্টার দেবমাতা জাতিতে আমেরিকান। স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। ভারতেও ছিলেন অনেকদিন। ভারতে অবস্থানকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্নেহপুষ্ট বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী পরমানন্দের আনন্দ আশ্রমেই ইনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন।

সিস্টার দেবমাতা উল্লেখযোগ্য লেখিকা। কাব্যশ্রীমণ্ডিত রচনা, অথচ নাটকীয় গতি তাতে আছে। তাঁর লেখার প্রধান গুণ গভীর রহস্যানুভূতি, যা সাধারণ কথাকেও ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বহু গ্রন্থের এবং পুস্তিকার তিনি রচয়িতা, তার মধ্যে *Days in an Indian Monastery* এবং Sri Ramakrishna and St. Francis বিশেষ পরিচিত। প্রথম বইটি দেবমাতা তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন। এই বইটির বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯২৮) লেখা হয়েছিল—'বইটি ভারতের মূল প্রাণধর্মকে প্রকাশ করেছে। লেখিকা তাঁর বর্ণনাসমূহের মধ্যে ভারতের পরিবেশ, রঙ ও রস বজায় রাখতে পেরেছেন—যা সাধারণ একজন ভ্রমণকারীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ইনি পেরেছেন, কারণ এদেশকে ইনি ভালবেসেছেন, স্বদেশরূপে বরণ করেছেন।'

জিন হারবার্টের সহযোগিতায় লিজেল রেমঁ যখন নিবেদিতা-জীবনী রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হলেন, তখন তাঁরা নিবেদিতাকে জানতেন এমন সম্ভাব্য সকল ব্যক্তিকেই তথ্যদানে অনুরোধ করেন। এঁদের মধ্যে দেবমাতাও ছিলেন, কারণ *Days in an Indian Monastery* গ্রন্থে নিবেদিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা আছে। 'ভারতীয় সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে আপনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে,'—জিন হারবার্ট লিখেছিলেন ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮-এ।

দেবমাতা আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন, যদিও তাঁর 'স্বাস্থ্যশক্তি সীমাবদ্ধ এবং কাজের দায়িত্ব প্রচুর।'

জিন হারবার্ট ও লিজেল রেমঁ বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে, কারণ এ বিষয়ে 'মিশনের সন্ন্যাসীগণ খোলাখুলি আলোচনা করতে চান না।' পদত্যাগের পরেও নিবেদিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক কি ধরনের ছিল সে বিষয়েও এঁরা জিজ্ঞাসা করেন। 'মঠের সন্ন্যাসীরা কি তাঁর বাড়িতে আসতেন, এবং তিনি কি প্রায়ই মঠে যেতেন? তিনি কি বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন? ডাঃ বসুর সেক্রেটারী হওয়ার কাজ তিনি কখন নেন, পদত্যাগের আগে না পরে?'—এ-ধরনের বহু প্রশ্ন এঁরা করেন।

দেবমাতা যথাসাধ্য উত্তর দেন। 'কিভাবে জানি না' দুটো চিঠি থেকে গিয়েছিল, স্মৃতিকথাসহ তাদের নকলও পাঠিয়ে দেন, যার একটি নিবেদিতা-কর্তৃক তাঁকেই লেখা, অন্যটি মাস্টার মহাশয়ের লেখা, যেটিকে দেবমাতা 'অত্যন্ত মূল্যবান' বলেছেন।

দেবমাতাকে লেখা চিঠিটি আমরা রেমঁ-সংগ্রহে পেয়েছি, অতীব দুঃখের বিষয়. মাস্টার মহাশয়ের (শ্রীম) চিঠিটি পাইনি। দেবমাতাকে লেখা চিঠিতে কতকগুলি সাধারণ সংবাদ আছে, গুরুত্বপূর্ণ নয়, সুতরাং সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করারও দরকার নেই।

দেবমাতা এইসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন, কারণ তিনিই 'অন্য যে-কোনো মানুষের তুলনায় বেশিভাবে নিবেদিতার জীবনধারার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।'

প্রথমে আমরা *Days in an Indian Monastery* থেকে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করছি :

"বিদ্যালয়ের আসল অধ্যক্ষা ছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন। নিজের লেখার কাজে সিস্টার নিবেদিতা এমনই ব্যাপৃত থাকতেন যে, শিক্ষাকাজে বেশী সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইসঙ্গে তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বসুকে 'plant life সম্বন্ধে নূতন একটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করছিলেন। ডাঃ বসু প্রতিদিন স্কুলে কয়েক ঘণ্টা করে কাটাতেন, এবং কখনো কখনো দুপুরের আহারাদিও করতেন; সুতরাং তাঁকে জানবার আনন্দজনক সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও মনোরম সময় কাটিয়েছি কখনো কখনো—মিসেস বসুর সাহচর্যে এবং ডাঃ বসুর গবেষণাগার দেখে।

নিবেদিতার প্রদীপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ গুণশালী বক্তা ও লেখিকা তিনি। তাঁর চারদিকে দ্যুতি-বিকীর্ণ একটা পরিবেশ বিরাজ করত, সে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হত তাঁর কথাতেও, তার ফলে তিনি যা-কিছু বলতেন, লিখতেন বা করতেন—সব কিছুতেই প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার অনুভব করা যেত। কিছু বছর ধরে তিনি ভারতীয়দের মনের উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং ভারতীয় চিত্ত-জাগরণে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল এবং রাজনীতিতে আমার উৎসাহের অভাবকে তিনি কখনোই ক্ষমা করেননি। তবে তা ছিল প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ।"

রেমঁ-হারবার্টকে প্রেরিত দেবমাতার স্মৃতি

বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা গার্লস স্কুল বাইরে এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরী প্রশস্ত একটি বাড়িতে অবস্থিত। বাইরের উঠানের একপাশে, গাড়ি ঢুকবার উঁচু দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় একটি সরু লম্বা খিলান-যুক্ত ঘরের মধ্যে—সেইটেই সিস্টার নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সরু গলির উপরে ছড়িয়ে-থাকা বারান্দার দিকে,—এই দুই দিকে জানালা আছে। স্বল্পালোকিত এই ঘরটিতে আমরা দুজনে এক রবিবার গোটা বিকেল বসেছিলাম,—তিনি বলে গিয়েছিলেন মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী। ভারতকে

স্বাধীন করার জন্য রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবা করার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা—এই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দারুণ সংঘাতের ইতিহাস যখন বলছিলেন, তখন তাঁর কণ্ঠে গ্রীক ট্রাজেডীর নিয়তি-নিঃশ্বাস! স্বামীজী তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। মিশনকে কোনোভাবে রাজনীতিতে জড়ানো চলবে না। তারপরে মানসিক সংগ্রাম—কতদিনের—অবশেষে 'বেছে নিলেন'—ভারতের স্বাধীনতা চাই, চাই-ই। স্বামীজী নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের সভাপতি। তিনি বললেন, এক্ষেত্রে নিবেদিতা সংবাদপত্রে জানিয়ে দিন—অতঃপর তাঁর কথা বা কাজের জন্য মিশন দায়ী নয়। বলতে বলতে তিনি থামলেন, তারপরে নীচু স্বরে বললেন—'ছাপার অক্ষরে যখন কথাগুলি দেখলাম, মনে হল, এর আগে মরলাম না কেন!'

ঘরের আলো আরও কমেছে। আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম, মুখোমুখি। আমার দুই কাঁধে নিবেদিতা হাত রাখলেন। বললেন—'তুমি উত্তম শ্রোতা। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পেয়েছি।'

নিবেদিতা কথোপকথনের মানুষ অপেক্ষা শোনার মানুষ চাইতেন। সদ্য সমাপ্ত লেখা তৎক্ষণাৎ কাউকে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে তিনি অদম্য আগ্রহী। সিস্টার ক্রিস্টিন আমাকে বলেছেন, তাঁকে স্থায়ী শ্রোতার ভূমিকা নিতে হয়েছিল। কোনো নতুন প্যারাগ্রাফ বা অধ্যায় লেখা হওয়া মাত্র তাঁর ডাক পড়া অবধারিত। কখনো কখনো স্কুলের ক্লাস থামিয়েও—মেয়েরা চুপ করে অপেক্ষা করছে—ক্রিস্টিনকে শুনতে হয়েছে নিবেদিতার তখনি সমাপ্ত কোনো লেখা।

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়ের গোড়ার দিকটিতে দেখতাম, তিনি লেখার কাজেই ব্যাপৃত, স্কুলের ব্যাপারে খুবই কম সময় দেন। সুধীরার সাহায্যে সিস্টার ক্রিস্টিন প্রায় একাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ক্রিস্টিন দার্জিলিঙয়ে গেলে নিবেদিতা আবার ভার তুলে নিলেন। কাজে ডুবে গেলেন সেই একই উৎসাহে যা তাঁর সবকাজেই দেখা যেত। ইংরেজী পড়ানোর ভার দিলেন আমার উপর, এবং কতকগুলি নতুন পাঠের পত্তন করলেন, যেগুলি পাশ্চাত্ত্যে তাঁর মাথায় জেগেছিল।

আমাকে তিনি যতদিন পারেন কলকাতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন—তাঁকে আড়াল করার কাজ আমি করেছিলাম। আমি স্কুলে আসার কিছুদিন পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফেরেন। অবাক হয়ে দেখেছিলাম—ইউরোপের শেষতম ফ্যাশানে সজ্জিত তিনি, পরণে বহু যত্নে প্রস্তুত মহা পরিপাটী গাউন, মাথায় পালক-গোঁজা মস্ত সাদা টুপি। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার নিবেদিতা, আমি ভেবেছিলাম তুমি সন্ন্যাসিনীর আলখাল্লা পরো!' তিনি বললেন, 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে ভারতে না ফিরতে বলা হয়েছিল, কারণ যে-মুহূর্তে আমি ভারতে পদার্পণ করব, সেই মুহূর্তেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমি আসবই। আমি জানতাম, এই পোষাকে আমি কে তারা সন্দেহ করতে পারবে না।'

পুলিশের ব্যাপারে তাঁর ধারণা সত্য। কারণ যখন আমি বাগবাজারের সরু গলিতে হাঁটতাম, প্রায়ই আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করা হত—'আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?' আমি যখন 'না' বলতাম, তারা ভেবে নিত, তাহলে স্কুলে সিস্টার ক্রিস্টিন ছাড়া যে দ্বিতীয় সিস্টার এসেছেন বলে শোনা গেছে, তিনিই আমি। আর স্কুলে যিনি আছেন, তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন। যেহেতু আমার কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধির কথা জানা ছিল না, তারা স্কুলের ব্যাপারে মনোযোগ কমিয়ে দিল, এবং নিবেদিতাও উৎপাত থেকে বাঁচলেন।*

একদিন, যখন দক্ষিণেশ্বরে গেছি মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজী রূপান্তর আমি সম্পাদনা করে দিতে পারি কি না! বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিবেদিতাকে বললাম। দ্রুত তিনি বললেন, 'না, তুমি রাজি হয়ো না; আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ও-কাজটা আমি করি—আরম্ভ করতেও প্রায় প্রস্তুত।' সুতরাং মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধ আমি রাখলাম না, কিন্তু নিবেদিতাও কাজটা করলেন না। আমি জানি না কেন। তিনি যে করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তাঁকে লেখা মাস্টার মহাশয়ের নিম্নের পত্র থেকে বোঝা যায়। নিবেদিতা চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, মাস্টার মহাশয় এতে আমার উল্লেখ করেছিলেন বলে। [চিঠিটি আমি পাইনি]

একদিন যখন 'The Master as I saw Him' সম্বন্ধে আমরা কথা বলছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'স্বামীজী সম্বন্ধে যে-কাজ আমি করেছি, রামকৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে সেই কাজ তুমি অবশ্যই করবে। (শ্রীরামকৃষ্ণের) সব শিষ্যগণের বিষয়েই লেখা চাই। তাঁরা হারিয়ে না যান, দেখতেই হবে।'

নিবেদিতা রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর।

স্কুল বন্ধ হওয়া মাত্র নিবেদিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে আবিষ্কারাদি নিয়ে ডাঃ বসু নতুন গ্রন্থ রচনা করছিলেন, নিবেদিতা তাকে সাহিত্যিক রূপ দেবার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন। এই কাজে নিবেদিতার এমনই উৎসাহ যে, নিজের লেখার কাজ তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাঃ বসু ৯টার সময়ে আসতেন, সাড়ে বারটা পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপরে আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতাম। পরমানন্দের ভোজন। উদ্ভিদ জীবন, প্রকৃতির পরমাশ্চর্য রূপ সম্বন্ধেই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা কেন্দ্রীভূত থাকত।

ডাঃ বসু এবং লেডী বসু তাঁর ঘনিষ্ঠতম ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে পড়েন।

---

* ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আমরা 'শিখাময়ী' অধ্যায়ে পুনশ্চ আলোচনা করব। নিবেদিতার পত্রাবলীতে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে।

নিবেদিতা একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। লন্ডনে থাকাকালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে তাঁরা এক চুলের জন্য বেঁচে যান। পরে ডাঃ বসু যখন বললেন, 'আমরা একেবারে মারা যাচ্ছিলাম' নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাতে কি, আমরা সবাই তো একসঙ্গে যেতাম।'

প্রাতরাশের কালেই নিবেদিতার সঙ্গে আমার একত্র হবার আসল সময়, কিন্তু বেশীক্ষণ একসঙ্গে থাকতাম না। নিবেদিতা ডাঃ বসুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে ব্যস্ত হতেন, আমিও একই ভাবে ব্যস্ত হতাম মাতা ঠাকুরাণীর কাছে যাবার জন্য। শ্রীমার কাছেই আমার সারাদিন কাটত। দুপুরে শুধু খাওয়া ও অল্প বিশ্রামের জন্য আসতাম। বিকালে শ্রীমায়ের কাছে যখন যেতাম, নিবেদিতা মাঝেমাঝে আমার সঙ্গে আসতেন। নিবেদিতার প্রতি শ্রীমার বিশেষ রকমের ভালবাসা ছিল। নিবেদিতাকে দেখতে পেলেই বড় আদরের সঙ্গে তার নামটি বেশ কয়েকবার বলতেন, আর তার কাছে সরে ঘেঁষে বসতেন। নিবেদিতার বাংলা শুনে খুব হাসতেন; বলতেন, ও বাংলা বেদের সময়ের। নিবেদিতা সাধু বাংলা বলতেন, অত্যন্ত থেমে থেমে, যত্ন করে করে। সিস্টার ক্রিস্টিন অনেক দ্রুত বলতে পারতেন, চলতি ভঙ্গিতে। তবে শ্রীমা সকলের কথা বুঝতে পেরেই খুশী।*

ভারতবাসের সূচনায় নিবেদিতা শ্রীমার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেছিলেন। শ্রীমাকে খুবই আদরে যত্নে রাখতে চাইতেন তিনি। শ্রীমার পা (বাতে) পঙ্গু হওয়ার জন্য নিবেদিতা প্রায়ই তাঁকে কোলে করে উপরতলায় তুলতেন। আমাকে বলেছিলেন, 'মাকে তুলতে কিছুই ভার বোধ করতাম না, এত আনন্দ পেতাম।'

ভারতীয় যে-কোনো জিনিসের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসা মূল-প্রবিষ্ট। এক অপরাহ্নে শুনলাম, সমস্ত বাড়ি গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্রোচ্চারণে গম্ গম্ করছে। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করলাম। নিবেদিতা বললেন, 'আমার দুই ভৃত্য এবং

---

* দেবমাতার প্রতিও শ্রীমার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। ৮।৯।১৯০৯ তারিখে দেবমাতাকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে পাই, 'মাতাঠাকুরাণী তোমার কথা প্রায়ই বলেন। (তুমি চলে যাওয়ার পরে) প্রথম রাত্রে তোমার শূন্য স্থানটির দিকে তিনি দেখালেন, বড় বেদনার সঙ্গে।' *Days in an Indian Monastery* বইতে দেবমাতা শ্রীমায়ের অনেকগুলি চিঠি দিয়েছেন। স্নেহসুধাক্ষরা চিঠিগুলি। শ্রীমা এক চিঠিতে লিখেছেন, 'যে জায়গাটিতে তুমি বসতে, ধ্যান করতে, যখনি সেই জায়গাটিতে চোখ পড়ে, অমনি তোমার প্রেমময় চেহারাখানি মনে পড়ে যায়। বাড়ির সবাই তোমার কথা বলে।' আর এক চিঠিতে—'সারদানন্দ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সত্যকাম, কুসুম দেবী, গণেন, নিবেদিতা, সুধীরা, সবাই ভাল আছে। তারা সবাই প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।'

আমেরিকা থেকে যাত্রা করে মাদ্রাজে যখন দেবমাতা এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীমায়ের একটি চিঠি পেঁাছল, তাঁকে স্নেহের আহ্বান জানিয়ে। নিবেদিতা প্রভৃতি বিদেশিনীদের কিভাবে সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে শ্রীমা কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তার বিবরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি। এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীমার চিঠি—"আমার ভালবাসার দেবমাতা, আমাদের ঠাকুরের উপর তোমার গভীর ভক্তির কথা শুনে বড় ভাল লাগল। তুমি আমার মেয়ে। তোমার হৃদয়ে অফুরন্ত ভক্তি উঠুক—এই আমার আশীর্বাদ। ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। বেঁচে থাক মা! আমার অন্য সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুমিও অনন্ত ঈশ্বরানন্দে থাক।"

তাদের ভাইয়েরা বেদপাঠ করছে। প্রতি বিকালে এরা এই কাজ করে। ভৃত্য হিসাবে অপদার্থ, কিন্তু ভক্ত, আর জানে কি করে স্তোত্রপাঠ করতে হয়। শুধু এই জন্যই এদের তাড়াইনি।'

নিবেদিতা আমাকে বলেছিলেন, যখন তিনি মায়াবতীতে (আসলে আলমোড়ায়) স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন, তখন প্রায়ই তাঁকে কাঁদতে হয়েছে। স্বামীজী তাঁর ভিতরকার একটা জিনিসকে চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন—যা যাচ্ছিল না। নিবেদিতা আরও বলেছিলেন, সিস্টার ক্রিস্টিন স্কুলে আসার পরে তিনি বেলুড় মঠে খুব কমই যেতেন। ক্রিস্টিন প্রায় প্রতিদিন যেতেন, স্বামীজী যেন তাঁকেই শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছেন—মনে হয়েছিল। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। সুতরাং তিনি স্কুলেই থাকতেন, নিঃসঙ্গে, আঘাতে, যাতনায়। এক রবিবার স্বামীজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত দিন তাঁরই জন্য ব্যয় করলেন। ভারতবাসের সূচনার দিনগুলির একটি যেন ফিরে এসেছে! দুপুরে খাওয়ার সময়ে তিনি জল নিয়ে নিবেদিতাকে বললেন, তার হাত ধুইয়ে দেবেন। নিবেদিতা বললেন, 'স্বামীজী, এ কাজ আপনি করবেন সইবে না; আমারই আপনাকে সেবা করবার কথা।' স্বামীজীর উত্তর, 'খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'* এর পরে নিবেদিতা তাঁকে যখন দেখলেন—তিনি আর নেই—দেহখানি পড়ে আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার—তাঁর বক্তৃতা বা কথার রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে মিশনকে অব্যাহতি দেবার জন্য যা করা হয়েছিল। বেলুড় মঠের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। তিনি পূর্ববৎ মঠে যাতায়াত করতেন, সন্ন্যাসীরাও প্রায়ই যেতেন তাঁর স্কুলে। তাঁদের একজন (সদানন্দ) তাঁর বক্তৃতা-সফরের সময়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, এবং ভ্রমণের ঝঞ্ঝাট বইবার জন্য।†

---

* সময়ের ব্যাপারে এখানে অল্প কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, পাঠকেরা যদি ইতিপূর্বে নিবেদিতার স্বামীজী সম্বন্ধীয় চিঠিগুলি পড়ে থাকেন, তা বুঝতে পেরেছেন। নিবেদিতা সত্যই রবিবার গিয়েছিলেন, এবং স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানও, তাঁর সত্যই মনে হয়েছিল, পুরনো দিন যেন ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজন ও হাত ধোয়ানোর ঘটনাটি ঘটেছিল আরও দু'দিন পরে বুধবারে—সেই শেষ সাক্ষাৎ।

† রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে আলোচনায় অনিচ্ছুক কেন, সেই কারণ ব্যাখ্যায় দেবমাতা পত্রে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয়, তার কারণ, নিবেদিতা জনপ্রিয় জাতীয় চরিত্ররূপে গৃহীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে মিশনের কোনো সংঘর্ষের সম্পর্ক জনগণ ভাল চোখে নাও দেখতে পারত। আমি যখন ভারতে ছিলাম, তখন সরকারের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক মনকষাকষি, এবং নিবেদিতা যেভাবে খোলাখুলি কথা বলতেন, তাতে মিশন বেআইনী ঘোষিত হতে পারত। সেইজন্য সন্ন্যাসীরা সরকারীভাবে জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভিতরে সম্পর্ক অব্যাহত ছিলই।'

দেবমাতা এখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আংশিক সত্য। মিশন সুস্পষ্ট নীতি অনুযায়ী সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, বেআইনী হবার ভয়েই নয়। সে ভয় নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোমার মামলার আসামীরা যখন পূর্ব মত ত্যাগ করে মিশনে যোগদান করেছিলেন, তখন তাঁদের নিতে মিশন পেছপাও হয়নি, যদিও তার ফলে বিপদ যথেষ্টই বেড়েছিল। বিষয়টি 'শিখাময়ী' অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত হবে।

একবার ভ্রমণকালে যে বিরল অভিজ্ঞতার আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। প্রাচীন এক মন্দির দেখবার জন্য সংগীসহ তিনি গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে রাত্রিযাপনে তাঁরা বাধ্য হন। রাত্রে মন্দির-উদ্যানে বন্য জীবদের জীবনের রূপ তিনি সতৃষ্ণ কৌতূহলের সংগে লক্ষ্য করেন। ঊষার উদয়ে মন্দির-সরোবরে স্নান করে আসেন, সুদূর অতীতে পূজার্থীরা যেমন করতেন। দীপ্ত চোখে তিনি বর্ণনা করেছিলেন—কিভাবে উদীয়মান সূর্যের কিরণ উদ্যানের ঘন বৃক্ষলতা ভেদ করে অপূর্ব মহিমার আলোকে ভরিয়ে তুলেছিল মন্দিরটিকে। রাত্রির নানা অসুবিধা, আরণ্যক হিংস্র জীবদের থেকে সম্ভাব্য বিপদ—এসব কিছুই নয় তাঁর কাছে। তাঁর সমস্ত কথা বা কাজের মধ্যে বীররসপ্রবাহ তরঙ্গিত হত। মেজাজে এবং ভঙ্গিতে তিনি নর্স সাগার ব্রানহিল্ডার কথা মনে করিয়ে দিতেন। সেই একই বেপরোয়াভাব, একই সাহসের ছন্দ, একই কল্পনার বিশালতা।

নিবেদিতা, বিদ্যালয়ের সংগে যোগ কখনই ছিন্ন করেন নি। বিদ্যালয়ের অংশীভূত তিনি। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বা লেখা, এবং ডাঃ বসুর সংগে তাঁর কাজ—এ সবের জন্য পড়ানোর কাজে তিনি সব সময়ে নিযুক্ত থাকতে পারতেন না। তিনি কখনই ডাঃ বসুর চাকুরিয়া-সেক্রেটারী ছিলেন না—তিনি তাঁকে বন্ধুভাবে সাহায্য করতেন। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মে আমি যখন তাঁর সংগে মিলিত হলাম, তার আগে থেকেই তিনি ডাঃ বসুর সংগে কাজ করছিলেন। তারপর থেকে দেখলাম, বসুর সংগে তাঁর কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সময় ও মনোযোগ গ্রাস করে ফেলতে লাগল, এবং অন্য কাজ কমতে লাগল।

লেডী বসুর সংগে সাক্ষাতের জন্য তাঁর দার্জিলিঙ যাত্রাই শেষ যাত্রা। দারুণ আমাশয় ধরল সেখানে, দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেলেন। জীবনের শেষ রাত্রে চারটের সময়ে যাঁরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'তরী ডুবছে, কিন্তু সূর্যোদয় দেখবই।' সে সূর্যোদয় তিনি দেখলেন, প্রয়াণ করলেন ঊর্ধ্বতরলোকে। ডাঃ বসু ও দার্জিলিঙয়ের প্রধান হিন্দু নাগরিকেরা তাঁর দেহকে বহন করে নিয়ে গেলেন সৎকার স্থানে। বহু সংখ্যক বন্ধু ও অনুরাগীরা সার দিয়ে অনুগমন করলেন। তাঁর সৎকার সর্বসাধারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।*

তিনি কলকাতায় ১৯০০ খৃীস্টাব্দে আমাকে বলেছিলেন, তিনি ঠিক আরো এগারো বছর বাঁচবেন। মোটামুটি তাই ঘটেছিল।

---

* দেবমাতা জানিয়েছেন নিবেদিতার মৃত্যু ও সৎকারের বিবরণ তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য পরে দেওয়া হবে।

['রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—গ্রন্থের এই খণ্ডে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অনেকের সঙ্গেই নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে, আবার অনেকের বিষয়ই হয়নি। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দের নাম করা যায়; বিবেকানন্দ-শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে স্বামী সদানন্দ, সিস্টার ক্রিস্টিন প্রভৃতি। মিসেস ওলি বুল বা মিস ম্যাকলাউডের কথাও উঠবে। এঁদের কথা আমরা পরবর্তী নানা অধ্যায়ে উপস্থিত করব—'শিক্ষা-সরস্বতী' অধ্যায়ে ক্রিস্টিনের কথা, 'লোকমাতা' অধ্যায়ে অখণ্ডানন্দ ও সদানন্দের কথা, 'অন্তরঙ্গ' অধ্যায়ে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউডের কথা, ইত্যাদি।]

মৃত্যুরূপা কালী

এক মত থেকে অন্য মতে

নিবেদিতার বিষয়ে পরম বিস্ময়ে প্রশস্তি করে যে বলা হয়েছে, তিনি একই দেহে জন্মান্তর নিয়েছিলেন—এর পক্ষে চরম দৃষ্টান্ত, তাঁর কালীকে গ্রহণ করা। কালী বিশিষ্টভাবে ভারতীয় বা বাঙালী দেবী; পূর্বসংস্কার সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন না করতে পারলে বহিরাগত কারো পক্ষে কালীকে মেনে নেওয়া কঠিন। নিবেদিতা, বিবেকানন্দের (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের) আরাধ্যা দেবীরূপে কালীকে অগত্যা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই কথাটি একেবারেই সত্য নয়। স্বামীজী ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হরণ করার কথা ভাবতেই পারেন না, পাশ্চাত্ত্যে তিনি সর্বজনীন ভাবের উপরেই তাঁর বক্তব্য দাঁড় করিয়েছিলেন, এবং সবসময়েই অন্যের ভাষায় অন্যের নিকটে কথা বলতে চেয়েছেন ধর্মের ব্যাপারে। নিবেদিতা যদি কালীকে গ্রহণ করেন, তার কারণ তাঁর মানসিক বা আত্মিক প্রয়োজন কালীতত্ত্ব মিটিয়েছিল। সেইসঙ্গে একথাও সত্য, বিবেকানন্দের বিরাট আধ্যাত্মিক চরিত্র দেখেই তিনি কালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি; কেননা তাঁর মনে 'বিবেকানন্দকে সম্ভবপর করল কোন্ কোন্ বস্তু'—সে প্রশ্ন উঠেছিলই, এবং তার উত্তর পেয়েছিলেন : কালী এবং কালীর সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ।

নিবেদিতার নিকট 'কালী' কেবল একটি ধর্মীয় বা দার্শনিক সত্যই নয়, তাঁর পরবর্তী সর্বকর্মের ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। তা আমরা দেখতে পাই তাঁর সেবার মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে,* এক কথায় আত্মোৎসর্গের মধ্যে। মহাকালীর এক নন্দিনীর নাম নিবেদিতা।

কালীকে বরণ করে নিবেদিতা 'কী হলেন' তা আমরা বিস্তারিতভাবে দেখব। কিন্তু 'কী ছিলেন' তা না জানলে পরবর্তী পরিবর্তনের পরিমাণ বোঝা সম্ভব নয়। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নিবেদিতার মনোবিকাশ, তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ও তার সংঘাতমুখর পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তাঁরই আত্মকথা মারফৎ আমরা একেবারে গ্রন্থসূচনায় উপস্থিত করেছি। 'পূর্বজীবন' নামক পরবর্তী অধ্যায়ে নিবেদিতার ভাই ও বোনের সাক্ষ্য হাজির করব। নিবেদিতার প্রথম বয়সের নানামুখী দার্শনিক অভীপ্সার চিত্র সেখানে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নিবেদিতা যদিও প্রথম বয়সের খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের জগৎ থেকে অবিশ্বাস বা অজ্ঞেয়বাদের জগতে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে, তাঁর সেই স্বাধীন যুক্তিবিশ্বাসের, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৌন্দর্যচেতনার জগতে কালীর সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। কালী তারপরে যেন অকস্মাৎ এক প্রচন্ড বৈদেশিক আক্রমণের মতো তাঁর উপর এসে পড়েছিল, তাঁকে অধিকার করেছিল।

---

* কালী-তত্ত্বের সঙ্গে রাজনীতির যোগ পরে আলোচনা করা হবে।

কিন্তু কালীর আক্রমণ তো সত্যই বৈদেশিক অভিযানের মতো শারীরিক ব্যাপার নয়, তা মানসিক, সুতরাং মনে যদি কোনো পূর্বপ্রস্তুতি না থাকে, বিশেষতঃ নিবেদিতার মত দুর্ধর্ষ চিত্তবৃত্তিশালী মানুষের ক্ষেত্রে—তাহলে 'বিজয়' কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কালীর সম্মুখীন হবার কয়েক বছর পরে নিবেদিতা এক চিঠিতে (৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) লিখেছেন :

"এই ভয়ংকরের অর্চনা কি **নতুন** তাঁর (স্বামীজীর) কাছে? আমার তা মনে হয় না। মনে হচ্ছে, তাঁর মধ্যে সবসময়েই আমি কিছু জিনিসের সম্ভাবনা দেখেছিলাম, এমনকি একেবারে সূচনাতেও—'সম্ভাবনা' অর্থে 'ইঙ্গিত', যা তিনি পেয়েছিলেন, এবং তার চাবি আমাকে দেবেন—তাই মনে হয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়ালও। ভয়ংকরের অর্চনা তাঁকে ইদানীং বাস্তবিকই অনেক বেশী নিমজ্জিত করে রাখছে। আর...অতি অতি সম্প্রতি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চাবিটি আমাকে দিয়েছেন, আর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—কিন্তু জিনিসটি সব সময়ে তাঁর মধ্যে ছিলই।"

অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি কথা। পূর্বকথা রূপে নিবেদিতার পত্র থেকে আরও দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি, যাতে খ্রীস্টধর্ম থেকে নতুন ভাবগ্রহণের জন্য নিবেদিতার উন্মুখ মনের রূপ পাই। স্বামীজীর কাছে নিবেদিতা কী পেতে চেয়েছিলেন—সে কথাও। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর তারিখে ম্যাকলাউডকে যা লিখেছেন তা এখানে পুনরুদ্ধৃত করা হল :

"খ্রীস্টধর্ম অবশ্যই নিত্য সত্যের, কিন্তু সম্ভাবনায়। সক্রিয়ভাবে, গতিশীল-ভাবে তা হতে গেলে তার জন্য কালোপযোগী নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

স্পেনস্ খ্রীস্টসংঘে প্রবেশ করে নতুন কিছু করেনি—শুধু জানিয়েছে যে, প্রস্তর ও কণ্টকের পথে চলতে সে প্রস্তুত। ভয়ের শুরু এখন থেকেই।

স্বামীজী একদা আমাকে বলেছিলেন, 'মার্গট, তোমার ধর্ম তুমি তৈরী করে নিও—তোমার শিষ্যদের জন্য। আর যদি পারো, তার মধ্যে কিছু সর্বজনীন ভাব প্রবেশ করিয়ে দিও। তবে মনে রেখো, সমস্ত পৃথিবীতে ৬ জন লোকও তার জন্য তৈরী দেখতে পাবে না।' মনে হচ্ছে, কথাগুলো মোটামুটি সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি স্থির-প্রত্যয় যে 'সাম্প্রদায়িকতার' (Sectarianism) গভীরে প্রবেশ করেই কেউ তবে উপরের পুষ্পশোভা আশা করতে পারে। যদি আমি সত্যই কিছু অর্জন করে থাকি, তা করতে পারার কারণ, একদা আমি অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীস্টান ছিলাম। আর মনে রেখো, কালীপূজাও সাম্প্রদায়িক ব্যাপার।

স্বামীজীকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমার প্রধান প্রয়োজন ছিল এই জানা যে, কী অর্থে কুসংস্কারগুলি **সত্য**? অন্যরা তাঁর কাছ থেকে সর্বজনীন সত্য শিখতে পারে, কিন্তু আমার মূল শিক্ষা : কিভাবে প্রতিটি পুরাণ-কথা (Myth) বা অনুষ্ঠানরীতিকে কেন্দ্রীয় সত্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। তুমি জানো, আমি তখনই সকল বিশ্বাসের **মিথ্যাত্বে** কী অনপনেয়ভাবে বিশ্বাসী

হয়েছিলাম। অথচ আমার ভক্তস্বভাব বলত, এটাই শেষ কথা নয়। ফলে টানা-পোড়েনের শেষ ছিল না। তারপর পেলাম তাঁর শিক্ষা।

কাশ্মীরের অরণ্যে সেই রাত্রির কথা তোমার মনে পড়ে, যখন তিনি আমাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং যখন আমি বলেছিলাম—'একটি গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে'—তিনি কি রকম দ্রুত সায় দিয়েছিলেন!"

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বরের চিঠির অংশ :

"বিজ্ঞানপ্রীতি সত্ত্বেও ক্যাথলিক মতকে আমি ভালবাসতাম, একথা তুমি জানো। যখন খুব ছোট ছিলাম, সবে শৈশব অতিক্রম করেছি, তখন ভাবতাম, বোধহয় এখনো ভাবি—আমার মধ্যে একমাত্র প্যাশন্ হতে পারে—সত্যকে জানার প্যাশন্। সেই সত্যের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভাবের সংঘর্ষই আমার জীবন-যন্ত্রণার কারণ। কিন্তু স্বামীজী সে যন্ত্রণামোচন করেছিলেন, নতুন জগতে তুলে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সমস্ত পুরনো জগৎ অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। কী অদ্ভুত! জানো কি, একথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে, যখন তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—সর্বজ্ঞান, পরমতত্ত্ব, সবই আছে আমাদের ভিতরে—তখন নিজের মনে বলেছিলাম, 'বেশ, তাহলে এই পৃথিবীর প্রমাণ আছে বিজ্ঞানের মধ্যে—একে আমি কাজ-চলা মত রূপে গ্রহণ করলাম।' তারপরে এই পাঁচ বছর ধরে এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে পরীক্ষা করছি—তার সঙ্গে যুক্ত আছি।"

নিবেদিতা কী পেতে চেয়েছিলেন, এবং কী পেয়েছিলেন, তার আরও কিছু স্বীকারোক্তি মিলল। এখান থেকে আমরা ফিরে যেতে পারি পুরাতন ইতিহাসের ক্রম-উন্মোচনে, নিবেদিতার মধ্যে কালী-সংক্রমণের কিছু ধারাবাহিক বিবরণে।

কিন্তু এই ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। কালী নাম এবং কালীপুজো-কেন্দ্রিক তথাকথিত বীভৎস বস্তুগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ইংরেজতুল্য ধারণা নিবেদিতারও মনে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিপরীত ধারণার সূত্রপাত কবে থেকে? ১৮৯৫ এবং ১৮৯৬ সালের কোনো সময় থেকে নিশ্চয়, যখন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল; কিন্তু উল্টোদিকে দেখা যায়, ইংলণ্ডে ঐকালের প্রচারপর্বে স্বামীজী হিন্দুধর্মের সার্বভৌম ভাবকেই ব্যাখ্যা করছেন, দেবদেবী বা বিশিষ্ট ধর্মপদ্ধতির কথা বলছেন না। তথাপি ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিগত আলাপে অন্ততঃ তিনি জিজ্ঞাসিত হলে মাতৃপুজো সম্বন্ধে বলেছেন, এবং হিন্দুর কুসংস্কার ও বিকট পুতুলপুজোর বিরুদ্ধে পশ্চিমী কুৎসাকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন।*

* লুই বার্কের 'New Discoveries' -এর মধ্যে দেখা যায়, আমেরিকায় প্রথম অবস্থানকালে স্বামীজী ঈশ্বরের মাতৃভাবের কথা কখনো কখনো বক্তৃতাদিতেও বলেছেন। আনুমানিক ১৮৯৪ সালে শিকাগোয় জর্জ হেলের বাড়িতে থাকার সময়ে স্বামীজী পেনসিলে কিছু নোট লেখেন, বক্তৃতার বা গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে। তার মধ্যে আছে—'God as father, God as mother, God as the lover' ইত্যাদি। মিনিয়া-পোলিস জার্নাল-এ (২৭ নভেম্বর, ১৮৯৪) প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতা-বিবরণীতে পাই— "The Hindu faith recognized the motherhood of God as well as the fatherhood, because the former was a better fulfilment

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কালী

শ্রীরামকৃষ্ণের কালী

নিবেদিতা কেন কালীকে গ্রহণ করলেন, তার উত্তর সন্ধান করতে হলে ভূমিকা-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কালীকে দেখা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের সবটাই কালী, কালীদর্শন দিয়ে তাঁর সাধনার প্রথম সিদ্ধি, তাঁর মরজীবনের শেষ উচ্চারিত শব্দ 'কালী', এবং মধ্যবর্তী জীবন এই কালীর সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়ার। শ্রীরামকৃষ্ণের কালীর কথা জানাতে গেলে উপাদান বাহুল্যের সম্ভাবনা, তা ঘটাব না এখানে, আমি একটি খণ্ড বর্ণনা শুধু তুলে ধরব—তাঁর প্রথম সিদ্ধিক্ষণের—সারদানন্দের রচনা থেকে। ধর্মোপলব্ধির ইতিহাস যাঁরা রচনা করবেন, তাঁদের কাছে এই বর্ণনা পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার বস্তু হবে, কারণ আধুনিক পৃথিবীর অধ্যাত্ম-সমুত্থানের কেন্দ্রীয় চরিত্র কালীকে অবলম্বন করেই তরঙ্গসৃষ্টি করেছিলেন, কিংবা বলা যায়, ঐ ক্ষীণতনু মানুষটিকে দিয়েই কালী বিশ্বের আত্মাসাগর মন্থনের কাজটি করিয়ে নিয়েছিলেন।

---

of the idea of love". এখানে স্বামীজী পিতৃউপাসকদের দেশে প্রকাশ্য বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবে মাতৃউপাসনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানালেন। ভারতে অন্য উপাসনা পদ্ধতির তুলনায় মাতৃউপাসনার প্রতি প্রীতির কারণ বিশ্লেষণ করলেন এক বক্তৃতায় কিছুদিন পরে। ডেট্রইট ট্রিবিউনের ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় স্বামীজীর বক্তৃতাবিবরণে পাই—

"There were three different ways of looking at God. One was to look upon Him as a mighty personage and fall down and worship His might. Another was to worship Him as a father. In India the father always punished the children and an element of fear was mixed with the regard and love for a father. Still another way to think of God was as a mother. In India a mother was always truly loved and reverenced. That was the Indian's way of looking at their God."

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে 'নারীর আদর্শ—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে'—এই বিষয়ে স্বামীজী বিখ্যাত এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শুরুতে বলেন—আস্তাকুঁড় দিয়ে কোনো জাতির বিচার হয় না। জাতিকে গ্রহণ করতে হবে তার আদর্শরূপের দিক দিয়ে। আর্যজাতির মধ্যে নারীর উচ্চ স্থান এবং সেমেটিক ধর্মে নারীর নিম্নাবস্থার কথা তিনি বলেন। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে নারীর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায় বৌদ্ধযুগে, সন্ন্যাসের প্রতি অতি-পক্ষপাতে। নারী নরকের দ্বার—এইসব কথার চল তখনই হয়। পাশ্চাত্ত্যে একালে নারীর অধিকার ক্রীশ্চান ধর্মের দ্বারা যতটা না প্রতিষ্ঠিত, ততোধিক হয়েছে জন স্টুয়ার্ট মিল ও বিপ্লবী ফরাসী চিন্তানায়কদের দ্বারা। তারপরে স্বামীজী ভারতে নারীর অবস্থার কথা বিশেষভাবে বলতে গিয়ে মাতৃউপাসনার কথা বলেন, এবং প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব উপস্থিত করেন :

"In India the mother is the centre of the family and our highest ideal. She is to us the representative of God, as God is the mother of the Universe. It was a female sage who first found the unity of God, and laid down this doctrine in one of the first hymns of Vedas. Our God is both personal and absolute, the absolute is male, the personal, female. And thus that we now say: The first manifestation of God is the hand that rocks the cradle."

সারদানন্দের রচনার সামান্য অংশ :

"অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছিলেন, তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে °দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদপ্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করানো তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন, রামপ্রসাদপ্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন—জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন, 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ, কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে!' ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত, এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি °দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন। অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যূষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া °দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিতেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্ণে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে, একথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনে সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না!......

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্যলক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রবাহিত হওয়ায়, বক্ষস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে-মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব'—এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।"

এর পর সারদানন্দ সেই চরম ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ সাক্ষ্যে বর্ণনা করেছেন :

"তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এইসময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন, এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাকছি, তার কিছুই তুই কি শুনছিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?' তিনি বলিতেন—

'মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙ্ড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধহয় কোনোকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ-জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মা'র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কী যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপর দিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল, এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।'

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন—

'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিসমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি চারদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।'

ঐরূপ প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতি-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিসমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতর কণ্ঠে 'মা, মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

পরবর্তী দিব্যোন্মত্ততার আরও কিছু কিছু অংশ সারদানন্দের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

"পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল

উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত, এবং কখনো-কখনো এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে 'মা, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে' বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, 'চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে-আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত, এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না। ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম, এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মা'র বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি; দেখিতাম, ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।......

ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থি-সকলে, পায়ের দিক হইতে ঊর্ধ্বে, খট্‌খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে, এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতর হইতে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে।......ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোতপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখনো-বা কুয়াশার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম। আবার কখনো-বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম। আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতাম তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ, তাহাও জানিতাম না। সুতরাং মা'র নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম, 'মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তাহা আমাকে শিখাইয়া দে। তুই না শিখাইলে কে আমাকে শিখাইবে মা! তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় কেহই যে নাই!'......

পূজা-ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখিলেন, মার হাতখানি, বা কমলোজ্জ্বল পা-খানি, বা সৌম্যাৎ সৌম্য, হাস্য-দীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রমুখখানি; এখন পূজা-ধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস্ না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেছেন।

পূর্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মা'র নয়ন হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি লক্ লক্ করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যসমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে! এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবা মাত্র, এবং কখনো কখনো দিবার পূর্বেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে, ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা 'রোস্ রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি, তারপর

খাস্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্বে ধ্যান-পূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, যাঁহার চৈতন্যে জগৎ সচেতন হইয়া রহিয়াছে, তিনিই চিদ্ঘন মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া তথায় সর্বদা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, 'নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মা'র দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনো পতিত হইতে দেখি না। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপরতলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখনো কলিকাতা এবং কখনো গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন, তখন তো কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা ছম্ ছম্ করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে বিস্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত।......

দেখিতাম, জবা বিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমনকি নিজ পদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন।

দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগনিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন, এবং থাল হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মা'র মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—খা, মা খা, বেশ করে খা!' পরে হয়ত বলিলেন, আমি খাবো? আচ্ছা খাচ্ছি!—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মা'র মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তো খেয়েছি, এইবার তুই খা!'

একদিন দেখি, ভোগনিবেদন করিবার সময়ে একটি বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও-ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা 'খাবি মা, খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন।

দেখিতাম, রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা 'আমাকে কাছে শুতে বলছিস্, আচ্ছা শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ

শুইয়া রহিলেন।

আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন যে, বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না!

প্রত্যূষে উঠিয়া মা-কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, কখনও তিনি যেন কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর-আবদার, রঙ্গ পরিহাসাদি করিতেছেন।

আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই। যখনি জাগিয়াছি, তখনি দেখিয়াছি, তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন, বা পঞ্চবটীতে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ]

'দিগ্বিজয়ীর মত অধ্যাত্ম জগতের রাজ্যের পর রাজ্য যিনি প্রচণ্ড প্রতাপে অধিকার করেছিলেন,'—তাঁর লীলারাজ্যের অতি অল্পাংশের উপরই আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে, এবং তারও নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ আমরা উপস্থিত করেছি। কী যন্ত্রণায় ঈশ্বর দর্শন হয়, কিংবা ঈশ্বর দর্শনের পরে সামান্যতম বিরহেও কী যন্ত্রণা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একালে তার প্রধান দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীকারোক্তি সারদানন্দ পুনশ্চ উদ্ধৃত করেছেন—"শরীর সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐকালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনি-আপনি জট পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত। আবার সময়ে সময়ে ভগবৎ-বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখ ঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত।......সন্ধ্যা সমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত, দিবা অবসান হইল, আর একটি দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা এখনো দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ও ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই কাঁদিতেছে।"

জগন্মাতাকে দর্শনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই সীমাহীন হাহাকারের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সারদানন্দ নন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঐ সকল কথা শুনেছেন। স্বীকার করেছেন, "আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখ ঘর্ষণ করিতেন, দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও ঐ ভাবের বিরাম হইত না—তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না।" এই কথাগুলির মধ্যে স্বয়ং মহাসাধক সারদানন্দের আধ্যাত্মিক বিনয় কতখানি ছিল, তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সারদানন্দ যে অকপট চিত্তেই কথা বলছিলেন, তা অন্য প্রমাণে বোঝা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা

তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, স্তম্ভিত হয়েছিলেন তার রূপে, কিন্তু সে ব্যাকুলতা, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তাঁর নিজের তুলনায় 'সিকিও হবে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বাকুলতার সিকিও যা নয়, তার সামান্য বর্ণনা সারদানন্দের মুখে :

"ঈশ্বর লাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় শহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর-ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন-চারি মাসের অন্তেই নির্বিকল্প সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐসকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল।"

বিবেকানন্দের জীবনে কালীর আবির্ভাব

যে-ব্যাকুলতার শক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন, সেই ব্যাকুলতার কিয়দংশ নিজস্বভাবে নরেন্দ্রনাথের ছিল, বাকি অংশ পূর্ণ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা, যার ফলে যুক্তি ও সংশয়বাদী, নিরাকারপন্থী তরুণটি বাধ্য হয়েছিলেন মাতৃদর্শনে। সে এক চমকপ্রদ ইতিহাস, অধ্যাত্মজীবন এতখানি রক্তরসময়, মথিত, দহন-জ্বলন্ত হয়, তা প্রায় বিশ্বাসই হয় না। সেই মহারহস্যনাট্যের ভিতরে আমরা চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করতে পেরেছি, কারণ মুখ্য অভিনেতা স্বয়ং কিছু সময়ের জন্য যবনিকা সরিয়ে দিয়েছিলেন। সারদানন্দ-সংগৃহীত নরেন্দ্রনাথের আত্মকথা এইপ্রকার :

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকুরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নে প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই।

দেখিতাম, দুইদিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখনও কখনও সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময় একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই-এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি। শুনিয়া মনে হইয়াছিল, মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদিত হওয়ায় ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়-বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানা পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোনদিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোনদিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধু-গণের অনেকে পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ে জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল দুই-একজন কখন কখন বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্বল দেখিতেছি কেন, বল্ দেখি?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

যৌবনে পদার্পণপূর্বক যে-সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহা-দিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য হীন পথ

অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সত্যসত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব হইতেই আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপে প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি তো করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাকো।'

যাহা হউক, এত দুঃখকষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায়-অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যাত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান! —ভগবান ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আসিল, মঙ্গলময়ের রাজত্বে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া একসময় যাহা বলিয়াছিলেন— ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্য-কাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন তো তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা ও প্রয়োজন নাই—একথা হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্পদিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয় পর্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার

যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভোগী হইতে পারি, একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

কথা কানে হাঁটে। আমার ঐ সকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পোঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ-অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইশারায় জানাইলেন। আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া, দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্বলতা, একথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম, আমার অধঃপতন হইয়াছে, এ কথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করিলেন—বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম, এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদের মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐ কথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও আগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না!'

ঐরূপে অহঙ্কারে-অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে, জীবনে যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদিত হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; দুঃখ-কষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল। এখনও পূর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে, এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর

হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড়-পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবির তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তা-বিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য, এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী-অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—একথায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল—গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্বক সজল-নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়,
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রা-ই।

অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ-সংবরণ করিতে পারিলাম না—ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও-একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার

কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক।' ইহা বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিকটে বিদায়গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল, পূর্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটর্নির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন—তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া-পরার কষ্ট যাহাতে দূর হয়, এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব; আমার জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে, আমি যে ওসব কথা বলিতে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস না—সেই জন্যই তোর এত কষ্ট!' বলিলাম, 'আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন—বলতেই হবে—আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি—মা, নরেন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস না—সেইজন্যই ত মা শুনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন—তিনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন!'

দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। একপ্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল এবং মাকে সত্য-সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব, এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য-সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য-সত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও; যাহাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ করিয়া দাও।' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ-সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস তো?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তো, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম এবং মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্বক জ্ঞান-ভক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কি রে, এবার বলিয়াছিস তো?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কী এক দৈবশক্তিপ্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান-ভক্তিলাভের কথাই বলিয়াছি!—কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায় চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম, এ কী তুচ্ছ কথা আমি মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা'—এ যে সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান-ভক্তি দাও।' মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল, ইহা নিশ্চয় ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন বার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না! অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে ঐরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে—আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি; তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই, তা আমি কি করিব!' বলিলাম, 'তাহা হইবে না, মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐকথা বলিতেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' ঐরূপে যখন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না, তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'"

এই ঘটনার পরবর্তী অবস্থার কথা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীতারাপদ ঘোষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ :

"মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন, এবং নরেন্দ্র বাহিরে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মা-কে মানতো না, কাল মেনেছে। কষ্টে

পড়েছে, তাই মার কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম; তা কিন্তু চাইতে পারলে না, বলে, 'লজ্জা করলে!' মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে, মার গান শিখিয়ে দাও—'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে—না? তাঁহার ঐ কথা লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, 'হাঁ মহাশয়, বেশ হইয়াছে।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে —কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারংবার ঐকথা বলিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল, এইবার তিনি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া একপ্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া)—'দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বলছি— কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নাই, একটাই রয়েছে!— বুঝতে পারছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বলো—কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাবো।' আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা!' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সংকুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর তো ভারী হীনবুদ্ধি, তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাক খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত-দুখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিনবার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাক সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সেকথা শোনে কে? 'দূর শালা, তোর তো ভারী ভেদবুদ্ধি!' এইকথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগলেন। খাদ্য-দ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে-ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখনো খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অদ্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন!

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক পদব্রজে

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম-দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস-ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারে অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।"

এই 'দারুণ' ইতিহাস! নিবেদিতা এই ইতিহাস কবে সম্পূর্ণভাবে জেনেছিলেন? সঠিকভাবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনেই যে তিনি স্বামীজীর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণকথা শুনেছিলেন, তা নিজেই লিখেছেন 'আচার্যদেব' গ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা মানে একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা'র কথাও। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজী নিজের কথা কতটুকু বলেছিলেন? নিবেদিতার লেখা থেকে মনে হয়, সামান্যই। বিবেকানন্দের কালীকে তিনি 'সম্ভবতঃ' ভারতবর্ষে এসেই জানতে পারেন। এবং তা এক অভিনব, আলোড়নকারী অভিজ্ঞতার রূপ নেয়।

কালী কিন্তু রূপান্তরিত আকারে ধরা দিলেন এবার। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-কালীর নিত্য সন্তান—সে কালী আপাততঃ মধুরা, স্নেহময়ী, তাঁর সঙ্গে খেলায় লীলায় ঠাকুরের দিন কাটে। নরেন্দ্রনাথকে তিনি যে-কালী দেখিয়েছিলেন, তিনিও 'অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী।' কিন্তু যে-কালীকে বিবেকানন্দ অতঃপর দেখবেন ও দেখাবেন, তাঁর রূপ ভিন্ন—ভয়ঙ্করী তিনি। সেই ভয়ঙ্করীকে জননীরূপে দেখাবেন, রামকৃষ্ণের কালীর 'নব সাজ' হবে বিবেকানন্দের চেতনায়। এই 'নব সাজ' নিবেদিতার কাছে এতই বিস্ময়কর ঠেকবে যে, যতক্ষণ না তিনি কালীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্পর্কের রূপ নির্ণয় করতে পারবেন, ততক্ষণ তাঁর অশান্ত কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে না। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

এখানে শুধু পূর্বাহ্ণে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেব, মৃদু কোমল বিহ্বল হাসির রামকৃষ্ণ ভয়ঙ্করীকে দেখেন নি, একথা মোটেই সত্য নয়। বিবেকানন্দের তুলনায় তিনি অধ্যাত্মকেন্দ্রে অনেক বেশী পরিমাণে অবস্থিত। ভয়ঙ্করের সামনে বীরদাপে অগ্রসর হবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না, ঐ ভয়ঙ্করের অঙ্কেই তিনি সন্তানের আনন্দে উপবিষ্ট। বিবেকানন্দকে যেখানে ত্রিনয়নের অগ্নিতে জ্বলে উঠতে হয়েছে, সেখানে রামকৃষ্ণের চোখে শিব-ললাটের মধুচন্দ্রের হাসি। নচেৎ রামকৃষ্ণ—তিনিও কী সহজে কী ভয়ঙ্করই হতে পারেন—তাঁর দৃষ্টান্ত কি তাঁর জীবন থেকে পাই না? তাঁর বেদান্ত-সাধনের অংশ সারদানন্দের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। পশ্চিম ভারতীয় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্তসাধনের উপযুক্ত পাত্র দেখে এই মার্গে সাধনা করতে উৎসাহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকৃত হয়ে তোতাপুরীকে এই সাধনায় গুরুরূপে বরণ করেন। তদনুযায়ী বিরজাহোম অনুষ্ঠিত হয় এবং শিখা সূত্রাদি ত্যাগ করে, 'গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে ভূষিত' হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতার নিকট উপদেশ গ্রহণের

জন্য উপবিষ্ট হন। 'ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ নেতি নেতি উপায়াবলম্বন-পূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত' করতে লাগলেন। অতঃপর :

"ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি (তোতাপুরী) যেন সেদিন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈত-ভাবে সমাহিত করাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'দীক্ষাপ্রদান করিয়া ন্যাংটা (তোতাপুরী) নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া, আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনই হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নাম-রূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্বিকল্প সমাধিসম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম, এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কে'ও, হোগা নেহি?' অর্থাৎ—কী! হইবে না, এতবড় কথা! বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আনো!' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম, এবং **জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহাদ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম।** তখন আর মনে কোনোরূপ বিকল্প রহিল না। একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।" (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে উচ্চ কোনো মন্তব্য করবার অভিমান বা অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু এইটুকু বলা উচিত, অবলীলাক্রমে অতি ভয়ানক কথা এখানে বলা হয়েছে। যে-কোনো দ্বৈতবাদীর কাছে ধর্মদ্রোহিতাতুল্য ঐ ব্যাপারটি—মাতৃমূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করা—ভক্তি-লীলা সংহারের এমন মারাত্মক রূপক-কল্পনা! কোনো পূর্বাবধি বৈদান্তিক, যিনি জ্ঞানের অসি নিয়েই সাধনজগতে অবতীর্ণ—তিনি মাতৃ-পিতৃদায়হীন, তিনি নন, কিন্তু যিনি ভবতারিণীর উপর একান্ত নির্ভরশীল সন্তান—তিনি রূপকার্থেও মাতৃ-হননের দারুণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন! রামকৃষ্ণ ভয়ঙ্করকে দর্শন করেন নি!! তিনিই ফিরেছিলেন আবার তাঁর মায়ের কোলেই, যা চিরদিনের অদ্বৈতপন্থী তোতাপুরীর পক্ষে সম্ভব হয়নি—যার জন্য মায়াঘোরে আচ্ছন্ন তোতাপুরীর দুর্দশা দেখে রামকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত হাসি—

সন্ত্রস্ত করে তোলে আমাদের।* এই রামকৃষ্ণই সহজে ভয়ংকরীর সন্তান হয়ে থাকতে পারেন, বিবেকানন্দকে যেখানে মহাবীরত্বের কিছুটা অ-সহজ ভূমিকা নিতে হয়েছিল।

বিবেকানন্দের মাতৃভাবাবেশ : নিবেদিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে নিবেদিতা' অধ্যায়ে আমরা আগেই দেখেছি, মাতৃতত্ত্বের মধ্য দিয়ে মূল ঈশ্বরতত্ত্বে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পৌঁছেছিলেন, এবং মাতৃতত্ত্বের মধ্য দিয়ে

---

* তোতাপুরী ভক্তিমার্গের ধার ধারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে ও নৃত্য করতে করতে 'হরিবোল', 'হরি গুরু, গুরু হরি' ইত্যাদি বলতেন। তাতে তোতা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আরে কেঁও, রোটী ঠোক্‌তে হো?' উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হাতে চাপড়ে রুটি তৈরী করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির করতালি সেই ছবিটিই তোতাপুরীর বিদ্রূপপূর্ণ মনে এনেছিল। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, 'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি, আর তুমি কি না বলছ—আমি রুটি ঠুকছি!' এই ব্রহ্মজ্ঞ তেতার ব্রহ্মকে কিভাবে পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে কাঁদতে হয়েছিল, সারদানন্দ তার বিবরণ দিয়েছেন। বাংলা দেশের জলবায়ু তোতাপুরীর শরীরকে জীর্ণ করে দিয়েছিল, অজীর্ণের আক্রমণে। দেহের যন্ত্রণা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল, যাতে সমাধিবান তোতাপুরীর মনও সমাধিভূমি থেকে স্খলিত হয়ে 'হাড় মাসের খাঁচায়' নেমে এসেছিল। প্রচণ্ড শক্তিধর অভিমানী এই পুরুষ মনের পতনের জন্য গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দেওয়াই স্থির করলেন। তারপর—

"ল্যাংটা বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্যসত্যই শুষ্কা হইয়াছেন? অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুব-জল পাইলেন না। ক্রমে যখন রাত্রির ঘনান্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'এ কী দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! এ কী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা মা মা, বিশ্বজননী মা; অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা। শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই।...

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপুরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে গম্ভীর অম্বারবে দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন, এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি জল ভাঙিয়া ফিরিয়া চলিলেন।...

প্রভাত হইলেই ঠাকুর তোতার শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্য-প্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোনো রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'মাকে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা, 'ঝুট্' বলে তর্ক করতে! আমাকে তিনি পূর্বেই বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তাঁহার দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি!'

[লীলাপ্রসঙ্গ—প্রথম ভাগ]

এই সমস্ত অভিজ্ঞতাটিকে নিজের উপর তুলে নিয়ে সুগভীর রসিকতা করে স্বামীজী বলতেন, শরীর ভাল থাকলে ব্রহ্মচিন্তা করি, পেট কামড়ালে মা ডাকি!

যাওয়ার জন্য বিশ্বচ্ছন্দ কত সহজ সুরে তাঁর কণ্ঠে বাজতে পেরেছিল। এই বিষয়েই সেখানে নিবেদিতা আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখার জন্য তাঁর সব কথাই নিবেদিতার কাছে শ্রুতি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃচেতনাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। যে-কালী পূর্বে শুধু শোনা কথায় ছিলেন, তিনিই বিবেকানন্দ-মারফৎ যখন প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে ঝলসে উঠলেন, তখন সেই অভিজ্ঞতাকে জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য বলে নিবেদিতা নমস্কার করলেন। সে নমস্কার অব্যাহত রইল জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত এবং তাঁর অমর লেখনীর মধ্য দিয়ে বিস্তারিত হল ভাবী কালে।

বিবেকানন্দের কালীকে নিবেদিতা কিভাবে দেখলেন, তার কয়েকটি ক্রমিক খণ্ডচিত্র এবার আমরা উপস্থিত করব। অনেকগুলি সুগভীর ক্ষণের সাক্ষাৎ পাঠক ইতিপূর্বেই পেয়ে গেছেন নিবেদিতার পত্রাবলীতে। সেগুলি পুনরুদ্ধৃত না করে এখানে উল্লেখমাত্র করব।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে তারিখের একটি চিত্র *Wanderings* থেকে :

> "আমাদের দুজন শ্রীমার বাড়ীতে তাঁর (স্বামীজীর) সাক্ষাৎ পেলেন। রাজনৈতিক গগন কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। দীর্ঘ-প্রত্যাশিত ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ার মুখে। সন্ধ্যায় উদিত চন্দ্রকে ঘিরে লোহিতাভ কুয়াশা। মহাঅমঙ্গলের সংকেত—চারদিকে কানাকানি। ইতিমধ্যেই প্লেগ, তার আতঙ্ক ও দাঙ্গার বিভীষিকা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত। আচার্যদেব আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কিছু লোকে কালীর অস্তিত্ব নিয়ে তামাশা করে। মহাকালী আজ বেরিয়ে পড়েছেন জনগণের মধ্যে। পাগলের মত ভয়ে পালাচ্ছে তারা। সৈন্য ডাকতে হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে। কে বলে, ঈশ্বর শুভের মতই অশুভেও নিজেকে মেলে ধরেন না? কিন্তু শুধু হিন্দুই তাঁকে অশুভ রূপেও পূজা করতে সাহসী।"

১৮৯৮-এর মে মাসে নিবেদিতাদিকে নিয়ে স্বামীজী হিমালয় যাত্রা করেন। তার আগেই নিবেদিতা 'সম্ভবতঃ' কালীঘাট মন্দির দেখে এসেছেন। যদি সত্যই নিবেদিতা কালীঘাট দেখে আসেন, তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ খুশী হননি। ইউরোপীয়ের কাছে কালীর আকার এবং মন্দিরে বলিদান সাধারণভাবে আনন্দদায়ক না হওয়াই সম্ভব, তদুপরি সেখানকার ভাবাতিরেক। উল্টোপক্ষে স্বামীজী তাঁর কথায় ও আচরণে একটি বিরাট সত্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ধর্ম, শিব যার প্রতীক, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক হল শ্মশান—কালীই সেই মৃত্যুশ্মশান। স্পষ্টভাবে হোক, অস্পষ্টভাবে হোক, নিবেদিতার মন এই ভাবপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ৬ই জুন তারিখে তাঁর ডায়েরীর অংশ :

> "তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, ত্যাগের এই পতাকাই মহা-বিজয়ের পতাকা; চিরন্তনী বধূকে বিবাহের জন্য যাত্রাকালে আত্মার একমাত্র উপযুক্ত ভূষণ হবে দারিদ্র্য ও আত্মজয়। 'শুধু দাও'—জীবন তারি এক সুদীর্ঘ সুযোগ; যা নেওয়া হল—জীবনের সে অংশকে ব্যর্থ বলে অনুভব করো, দুঃখ করো তার জন্য। অনেক সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে তিনি যখন

একই ধরনের কথা আবার বলেছিলেন, তখন আমাদের মধ্যে একজন সাহস করে বলতে চেয়েছিলেন, যে-অনুভূতি তিনি জাগাতে চাইছেন, তা কি দুঃখ-পুজা নয়, য়ুরোপ যাকে মনোবিকার বলে ঘৃণা করে?

ঝলসে উঠেছিল উত্তর তৎক্ষণাৎ—'আর সুখের পুজাই বুঝি খুব মহৎ?' একটু থেমে তিনি যোগ করেছিলেন, 'কিন্তু আমরা সুখেরও পুজা করি না, দুঃখেরও নয়, আমরা চাই উভয়ের মধ্য দিয়ে সুখ-দুঃখের পারে যেতে।'

এবং ২০ জুনের ডায়েরীর অংশ :

"শ্রীনগরের দিকে পৌঁছতে দুই তিন দিন গেল। একদিন সন্ধ্যায় আহারের আগে ক্ষেতের উপরে আমরা বেড়াচ্ছি, আমাদের মধ্যে একজন কালীঘাট দেখে এসেছেন, তিনি আচার্যদেবের কাছে সেখানকার ভক্তির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, তা বড়ই বিসদৃশ। 'প্রতিমার সামনে এমন-ভাবে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন'—কিছুটা জোরের সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন। স্বামীজি সেইসময়ে একটি তিল ফুল দেখিয়ে (তাঁর মতে ইংলণ্ডের 'dill' তিল থেকেই হয়েছে) বলছিলেন যে, এই হল আর্যদের আদিতম তৈলবীজ, কিন্তু প্রশ্নটি শোনামাত্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, হাত থেকে ছোট্ট নীল ফুলটি পড়ে গেল, কণ্ঠে নামল সম্ভ্রমের সঘন গভীরতা, বললেন—ঐ প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর এই পর্বতমালার সামনে সাষ্টাঙ্গ হওয়া— একই জিনিস নয় কি?"*

২৬শে জুনের ডায়েরী-নোটে পাই, নিবেদিতা প্রভৃতি স্বামীজীর সঙ্গে **ক্ষীরভবানী** দর্শন করেছিলেন :

"আচার্যদেব আমাদের ছেড়ে একাকী কোনো নির্জন স্থলে প্রস্থানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনোভাবের কথা না জেনে তাঁর সঙ্গে ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণ দেখতে যাওয়ার জন্য আমরা জোর করেছিলাম। শুনলাম যে, আমরাই প্রথম ক্রীশ্চান বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করেছি। স্থানটির দর্শন করে আমরা কতদূর কৃতার্থ হয়েছিলাম, তা কিছুতে বর্ণনা করে উঠতে পারব না, **কারণ পরবর্তীকালে এই নামটি আমাদের কাছে সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম হয়ে দাঁড়াবে।"** (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

---

* নিবেদিতার এই রচনাংশের উপর নির্ভর করেই আমি সতর্কতার সঙ্গে বলেছি, তিনি সম্ভবতঃ আগেই কালীঘাট দেখেছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর বইয়ে কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'কলিকাতায় প্রথম আগমনের পরেই নিবেদিতা কালীঘাটে গিয়াছিলেন।' তাঁরও উৎস বোধহয় একই। যদি তিনি নিবেদিতার ডায়েরী থেকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কথা, নচেৎ নিবেদিতার উদ্ধৃত রচনা থেকে একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কালীঘাটে ভক্তদের ভাবাতিরেক সম্বন্ধে অভিযোগ তিনিই করেছিলেন, ওলি বুল বা ম্যাকলাউড করেননি। মুক্তিপ্রাণার লেখার ভঙ্গিতে মনে হয়, এইসময়েই পশুবলির বিরুদ্ধে নিবেদিতা আপত্তি করেন, এবং স্বামীজী তার উত্তর দেন। এই বিষয়টির উৎস 'আচার্যদেব' গ্রন্থ, সেখানে কিন্তু লেখা নেই কখন স্বামীজীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমাদের ধারণা, ঐ আলোচনা হয় পরে কলকাতায়, কালীঘাট মন্দিরে নিবেদিতার বক্তৃতার কিছু আগে।

ক্ষীরভবানী নামটি কেন সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার হেতু পাঠকগণ জেনেছেন, যাঁরা 'নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী' অধ্যায়টি পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে পুনরায় আসার আগে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যাক। মাতৃসঙ্গীতে স্বামীজী এইকালে কি রকম বিভোর থাকতেন, তার পরপর কিছু নমুনা দিচ্ছি।

২৯শে জুন স্বামীজী প্রচুর ভারতীয় কবিতা ও গান শোনান, তার মধ্যে এই গানটিও ছিল :

এসো মা, এসো মা, ও হৃদয়রমা, পরাণ পুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীনা, নিরখি তোরে গো।
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান গো জননী কি যাতনা সয়ে,
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো।

[Be seated, Mother, on the lotus of my heart,
And let me take a long long look at you.
From my birth up, I am gazing,
Mother, at your face—
Know you suffering what trouble, and pain?
Be seated, therefore, Blessed one
On the lotus of my heart,
And dwell there for evermore.]

১৬ই জুলাইয়ের ডায়েরীতে পাই :

"পরদিন স্বামীজীর সঙ্গে নদীপথে একটি ছোট নৌকায় যাত্রার ভাগ্য ঘটল তাঁর এক শিষ্যার। যাত্রাপথে তিনি একের পর এক গেয়ে চললেন রামপ্রসাদের গান, এবং প্রায়ই সেগুলির অনুবাদ শোনালেন :

ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,
(আমি) তবু কালী বলে ডাকি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।

[I call upon Thee Mother.
For though his Mother strike him,
The child cries, 'Mother! Oh Mother!']

মন কেন রে ভাবিস এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মত।

[Though I cannot see Thee,
I am not a lost child!
I still cry 'Mother! Mother!']

এবং তারপরে কুপিত শিশুর গর্ব ও অভিমান-ভরা একটি শেষের ছত্র :

আমি তেমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।

[I am not the son to call
Any other woman 'Mother!']

২০শে জুলাই নানাদেশের ধর্মশাস্ত্রের পাপতত্ত্ব নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করেন, যার সঙ্গে কালীতত্ত্বের যোগ আছে দেখা যাবে :

"সেদিন সকালের প্রশস্ত নদী অগভীর ও স্বচ্ছ। নদীর ধারে ক্ষেতের উপর দিয়ে আমাদের দুজন স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় তিন মাইল বেড়িয়েছিলেন। 'পাপবোধ' নিয়ে তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন। মিসরীয়, সেমিটিক ও আর্যদের মধ্যে পাপবোধ কিরকম তা বলেছিলেন। বেদে তা এসেই দ্রুত অন্তর্হিত। শয়তান সেখানে ক্রোধের অধীশ্বররূপে স্বীকৃত। বৌদ্ধদের মধ্যে পরে তা হল কামের অধীশ্বর 'মার'। বুদ্ধের সর্বপ্রিয় আখ্যার একটি—'মারজিৎ'।......কিন্তু শয়তান একেবারে বাইবেলের হ্যামলেট। বৈদিক ক্রোধের অধীশ্বর কিন্তু কখনো (বাইবেলের মত) সৃষ্টিকে দুভাগে ভাগ করে ফেলেনি। সে সর্বদাই অপবিত্রতার প্রতিভূ, কদাপি ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী, দ্বৈতত্ত্বের প্রতিনিধি নয়।

জরথুস্ট্র প্রাচীনতর এক ধর্মের সংস্কারক। তাঁর মতে অর্মাজ্দ্ এবং আহ্রিমান পর্যন্ত পরম শক্তি নন, পরমের বিকাশ মাত্র। ঐ প্রাচীনতর ধর্ম বৈদান্তিক না হয়ে যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মিশরীয় ও সেমাইটগণ পাপবাদ আঁকড়ে ছিল বা আছে, অপরপক্ষে আর্যগণ, যথা ভারতীয় ও গ্রীকগণ তা দ্রুত ছেড়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষে ন্যায় হয়ে দাঁড়াল 'বিদ্যা' এবং অ-ন্যায় বা পাপ—'অবিদ্যা।' এই দুইকেই অতিক্রম করতে হবে। আর্যদের মধ্যে পারসিক ও ইউরোপীয়রা ধর্মধারণায় সেমিটিকে ভাবকে গ্রহণ করে, তার ফলে তাদের মধ্যে পাপবোধের প্রাধান্য ঘটে।"

কালী বা মৃত্যুপূজারী বিবেকানন্দের একটি উদ্দীপ্ত মুহূর্তের আত্মউন্মোচনকে পাই ২০শে জুলাইয়ের ডায়েরীতে :

"সেদিন আসন্ন সন্ধ্যাকালে আপেল গাছের তলায় উপবিষ্ট ক্ষুদ্র দলের মধ্যে একজন (নিবেদিতা) হাজির হয়ে দেখলেন, বিরল ব্যাপার—আচার্যদেব নিজের বিষয়ে বলছেন ধীরামাতা ও জয়াকে। দু'টুকরো পাথর তুলে নিয়েছেন হাতে, বলছেন—যখন সুস্থ থাকেন, তাঁর মন এটা-ওটা নিয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হতে পারে কিছুটা, 'কিন্তু সামান্য পীড়া বা যাতনা আসুক দিকি, মৃত্যুর আভাস যদি পাই ক্ষণেকের জন্যও, তাহলে'—হাতের পাথর দুটো সজোরে ঠুকে বললেন—'তাহলে আমি এমনই কঠিন হয়ে যাই, **কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি।'**"

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

এর পরেই নিবেদিতার জীবনের চরম সৌভাগ্যের ঘটনা, জুলাইয়ের শেষে স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথ যাত্রা এবং ২রা অগস্ট অমরনাথের তুষারবিগ্রহ দর্শন এবং চিন্ময় অমরনাথের দর্শনপ্রাপ্ত বিবেকানন্দের আলোকিত রূপ দর্শন। এই সময়ে স্বামীজীর দিব্যরূপের কথা আগেই আমরা বিস্তারিত দিয়ে এসেছি (৭ অগস্টের নেল হ্যামন্ডকে লেখা চিঠি ও 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়' এবং 'আচার্যদেব' গ্রন্থ)। নিবেদিতাকে স্বামীজী নিয়ে গিয়েছিলেন শিবের কাছে উৎসর্গ করার জন্য, এবং নিবেদিতা নেল হ্যামন্ডকে লিখেছেন, 'তিনি সত্যই আমাকে উৎসর্গ করেছেন শিবের কাছে।' নিবেদিতা অধিকন্তু বিবেকানন্দকে এখানে শিব-সান্নিধ্যে দর্শন করেন, কয়েক মাস আগে নিজ দীক্ষাকালে তাঁর শিব সাজ দেখেছিলেন, এবং অনুভব করতে থাকেন—বিবেকানন্দ শিবের অবতার। এই বোধের সঙ্গে নিবেদিতার কালী-বোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

শৈব বিবেকানন্দ কয়েকদিনের মধ্যেই শাক্ত বিবেকানন্দ হলেন। কেন হলেন তার গূঢ় আধ্যাত্মিক হেতু নিবেদিতা তাঁর মহনীয় ভাষায় বিবৃত করেছেন 'আচার্যদেব' গ্রন্থের 'ক্ষীরভবানী' অধ্যায়ের সূচনায় :

> "অমরনাথ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জীবনের সবকিছু শিব-ভাবনার সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রতি পদক্ষেপ আমাদের নিকটবর্তী করেছে সুমহান তুষার পর্বতমালার, যা তাঁরই সাক্ষাৎ প্রতিমা, তাঁরই ভবন। রাত্রি নামলে নবীন চন্দ্র যখন উদিত হত ঢালু হিমবাহের শীর্ষে, বাতাস মাতামাতি করত আরণ্য দেবদারুতে—অনিবার্যভাবে মনে হত দেখছি মহাদেবের ললাটচ্ছবি।* সর্বোপরি, যে-ধ্যানরাজ্যের বহির্দেশে অবস্থিত ছিলাম আমরা, তার হৃদয়-কেন্দ্রে বিরাজিত ছিলেন স্বয়ং যোগেশ্বর—নীরব-শান্ত, সমাহিত, গুণাতীত, বাক্যমনাতীত। নিঃসন্দেহে, হিন্দু-কল্পনার এই শিব, মানবপ্রজ্ঞার পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা। সর্বোপাধিবর্জিত অথচ হৃদয়গম্য ঈশ্বর তিনি।
>
> চরম জ্ঞানের অন্বেষণে, অব্যক্তের উপর ব্যক্তিভাবের আরোপ করলে ঈশ্বর-বিষয়ক অপর ধারণাটি অনিবার্য হয়ে পড়ে—এই সকল ব্যক্ত-রূপের অন্তরালে অবস্থিত শক্তিও ঈশ্বরই। যে-ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এই দুই ধারণার গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের সকল প্রতীকের তাৎপর্য অনুধাবনে সমর্থ হবেন, কারণ সকল প্রতীকই উভয়ের (শিব ও শক্তি প্রতীকের) যে-কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবেই। পরব্রহ্মকে যদি মানুষ চিন্তার অধীন করতেই চায়, তাহলে হয় অনাদি অনন্ত পুরুষরূপে বা অনাদি অনন্ত শক্তিরূপে, যে-কোনো ভাবে চিন্তা করতে হবে। ব্যাপারটির অন্তরালে কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম আছে কিনা, তা অনুমানের বিষয় হয়ে থাকবেই। যাই হোক, কোনো অজ্ঞাত কারণে অগস্ট মাসের মধ্যেই স্বামীজীর চিত্ত শিব থেকে সরে গিয়েছিল শক্তির দিকে। সর্বদাই রামপ্রসাদের গানগুলি তিনি গাইছিলেন,

* উৎকৃষ্ট কল্পনা : শুভ্র হিমবাহ শিবললাট, শিহরিত দেবদারু তাঁর জটাবন্ধন এবং নবোদিত তরুণ চন্দ্র—চন্দ্রশেখরের শিরশ্চন্দ্র।

যেন নিজের মনকে শিশু-ভাবনায় ভরিয়ে তুলতে চাইছিলেন। আমাদের একজনকে একবার বলেছিলেন, যেদিকে তাকাচ্ছেন, সেদিকেই দেখছেন 'মা' —মা যেন ঘরেই রয়েছেন, ঘরেরই মানুষ। খুব সহজে, স্বাভাবিকভাবে 'মা' বলে ডাকবেন। সে ভাবটি আমাদের দলের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল যে, বয়স্কদের মধ্যে কেহ কেহ একই ভাবে বলতেন, 'মার ইচ্ছা মাই জানেন,' যখন প্রিয় কোনো অভিপ্রায় পরিহার করার প্রয়োজন হত।

ক্রমে তাঁর ভাবতন্ময়তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। চিন্তাব্যাধি, আগুনের মত যা পুড়িয়ে মারে মানুষকে, শান্তি দেয় না, স্বস্তি দেয় না, নিদ্রা কেড়ে নেয়, মানবকণ্ঠ নিয়ে যেন ক্রমাগত উত্ত্যক্ত উৎপীড়িত করে তোলে —এর বিরুদ্ধে তিনি তিক্ত ভাবে অভিযোগ করতে লাগলেন। আমাদের কাছে ইতিপূর্বে তিনি অবিরত দুই বিরোধী সত্য—সুখ ও দুঃখ, ভাল ও মন্দ— এদের উপরে উঠবার আদর্শকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন, এইভাবেই হিন্দুরা পাপবোধ-সমস্যার সমাধান করেছে, কিন্তু এখন তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পৃথিবীর যন্ত্রণাদায়ক, দুর্বোধ্য, অন্ধকার দিকটির উপর; তাঁর প্রতিজ্ঞা, এই বিশেষ পথে জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালবর্তী সত্যকে লাভ করবেন।"

স্বামীজি অতঃপর একাকী গিয়েছিলেন ক্ষীরভবানীর শক্তিতীর্থে। যখন ফিরেছিলেন, তখন তাঁর সেই 'পরিবর্তিত উদ্দীপিত, দিব্যরূপ' দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল স্বয়ং ঈশ্বর! এই আবির্ভাবের বিষয়ে বলতে 'আমার লেখনী যেন মর্মরিত স্বরে কথা বলতে শেখে', 'দূরে সরে গিয়ে নীরবে পূজা করাই একমাত্র কর্তব্য'—মনে হয়েছিল নিবেদিতার। পাঠকগণ এই অপূর্ব ক্ষণের সাক্ষাৎ পূর্বেই পেয়েছেন তাঁর পত্র মারফৎ, এবং ক্ষীরভবানী যাত্রার পূর্বে রচিত 'কালী দি মাদার' কবিতাটির পটভূমিকাকেও, যে-কবিতাটি স্বামীজীর 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি।'

'কালী দি মাদার' কবিতায় উদ্ঘাটিত ভয়ঙ্করীর রূপ* এবং ক্ষীরভবানী প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দের রূপ—নিবেদিতার দার্শনিক সংশয়কে নিবৃত্ত করে দিল চিরদিনের জন্য। বিষয়টি আর সংশয়ের, জিজ্ঞাসার মধ্যে নেই, সাক্ষাতের স্তরে এসে গেছে। সাক্ষাৎ সত্যকে নিবেদিতা প্রত্যাখ্যান করবেন কি করে? কালীকে গ্রহণ না করে উপায় রইল না। দার্শনিক বিবেকানন্দ যা করতে পারতেন না, আধ্যাত্মিক

---

* বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মহাকালীর উপরে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী 'নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে।' বিবেকানন্দ যে-মহাকালীকে ধ্যানে দেখেছেন ও ভাষায় বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন, তার সম্ভব্য উৎস সম্বন্ধে লেখিকা আলোচনা করেছেন। বাঙালী চিরদিন শক্তি উপাসনা করলেও "স্বামীজীর এই প্রলয়ঙ্করী মহাকালীকে বাঙালী চেনে কি? তার শ্যামাসঙ্গীতে ঠিক এ ধরনের রৌদ্ররস কোথায়?"— লেখিকার প্রশ্ন। তিনি বলেছেন—"'করালী', 'কপালিনী' বলে বিশেষণ যতই থাক— মায়ের 'সদানন্দময়ী', 'মনোমোহিনী', 'সুধাতরঙ্গিণী' রূপই আসলে আমাদের মন ভুলিয়েছে। সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদের লেখাতেও বিবেকানন্দের মহাভীমা রুদ্রানীকে আমরা পাই না। কথামৃত-তে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কত কালীকীর্তন ধরা রয়েছে, কোনোটিতেই কি 'কালী দি মাদারে'র অনুরূপ ছবি পাই? তাহলে এই কালিকাকে বিবেকানন্দ পেলেন কোথায়? এ কি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি?" (পরের পাতায়)

বিবেকানন্দ তাই পারলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নিবেদিতার মধ্যে নব বিশ্বাসের সূত্রপাত হল, এই প্রাপ্ত বিশ্বাসের সমর্থনে পরবর্তীকালে দার্শনিক বা অন্যবিধ যুক্তি সংগ্রহের চেষ্টামাত্র করবেন, এবং সেই বিশ্বাসকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়াসও পাবেন, যজ্ঞসিদ্ধি কিন্তু পূর্বেই ঘটে গিয়েছে। নিবেদিতা তাই এইকালের বিবেকানন্দকে নমস্কার করে বলেছিলেন :

নব বিশ্বাসের উদয়ক্ষেত্র দেখেছি,
দেখেছি বিশ্বাসের জন্মদাতা পুরুষকে।

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নারায়ণী দেবী বলেছেন, 'তা কিন্তু নয়।'—"সপ্তশতীতে চণ্ডিকার ভ্রূকুটিকুটিল ললাট হতে আবির্ভূতা চামুণ্ডার যে বর্ণনা আছে, স্বামীজীর 'টেরার ইজ দাই নেম' বলে সম্বোধিতা দেবীর আদি প্রভব তিনি।" এই প্রসংগে লেখিকা 'কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী', 'কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা', 'নিনাদৈভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা' প্রভৃতি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। "চামুণ্ডার ধ্যানে পাই, 'দ্রংষ্ট্রা কোটি বিসংকটা' এই দেবী 'সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা।' স্বামীজীর লেখাতেও ঘনান্ধকার ঝড়ের তাণ্ডব, ঘূর্ণিবাত্যায় গর্জে ফিরছে প্রমত্ত প্রেতপিশাচপাল।...(স্বামীজীর কবিতার The flash of lurid light ইত্যাদি অংশ) পড়লে আবার যেন চণ্ডীর ভয়াবহ পটভূমিই ভেসে ওঠে সামনে। নবমাতৃকার কর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি বিদ্যুৎ-ঝলকে ঝলসে উঠছে মুহুর্মুহু। আর মহাঝটিকার মত রক্তবীজের পিছনে তাড়া করে ফিরছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণা চামুণ্ডা। 'মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্'—অসুরের ক্ষতস্থান হতে লোলরসনায় রক্ত শুষে নিচ্ছেন কালিকা। প্রতি রক্তবিন্দু হতে যে-সব প্রাণী জন্মাচ্ছে, রাক্ষসীর মত করাল দ্রংষ্ট্রায় দেবী চর্বণ করে চলেছেন তাদের। চণ্ডীর এ চিত্র আবার মেলে গীতার একাদশ অধ্যায়ের (বিশ্বরূপ দর্শনের) সঙ্গে।" লেখিকার এক্ষেত্রে শেষ প্রশ্ন, যার উত্তরও প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত—"কালী দি মাদারের ধ্যানের উৎস তাহলে চামুণ্ডা আর গীতার মহাকাল বিগ্রহ?"

আলোচনাটি চমৎকার। স্বামীজীর দৃষ্ট কালিকামূর্তির তুলনামূলক বিচারকালে শাক্তসাহিত্য এবং ভারতীয় সাহিত্যের অন্যত্র উদ্ঘাটিত ভয়ঙ্করীর বিভিন্ন বর্ণনার কথা মনে আসবেই। লেখিকারও এসেছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়—সাধক কি কেবল ধ্যেয় বস্তুকেই দর্শন করেন? তা যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটা বহুলাংশে কল্পনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বিবেকানন্দও কি তাঁর অনুভূতিযোগে তাঁর ধ্যান বা কল্পনা-বস্তুকে জীবন্ত দেখেছিলেন? সেক্ষেত্রে দেবদেবীর অস্তিত্ব ব্যাপারটি প্রশ্নাধীন হয়ে পড়ে। অদ্বৈতবাদী আপত্তি করবেন না, কিন্তু দ্বৈতবাদী? এই কবিতাটি লেখার কাছাকাছি সময়ে স্বামীজী কিন্তু বলেছিলেন—দেবদেবীরা মিথ্যা নন, সত্য। সুতরাং আমাদের পক্ষে সহজ গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হল—ভয়ঙ্করী মহাকালী অনেকটা একইভাবে সাধকচিত্তে আবির্ভূত হন, এবং উপলব্ধিপ্রাপ্ত মনুষ নিজস্ব দর্শনাদির বর্ণনাই করেন, যে-বর্ণনা অন্যের বর্ণনার অনেকটা অনুরূপ হতে পারে।

এখানে আমরা আরও কিছু কথা যোগ করে দেব। বিবেকানন্দের বর্ণনাকে দুই দিক দিয়ে বিচার করা সম্ভব। এক সাহিত্যিক বিচার—সে বিচার আমরা আগে করেছি, বলেছি যে বিবেকানন্দের বর্ণনার একমাত্র তুলনাস্থল হতে পারে গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা—গীতার বর্ণনার সংগে স্বামীজীর বর্ণনার তফাতের কথাও আমরা বলে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ ভাবের দিক দিয়েও 'চণ্ডী' প্রভৃতির বর্ণনার সঙ্গে স্বামীজীর বর্ণনার কিছু প্রভেদ আছে। কেবল ভয়ঙ্করকে দর্শন বা ভয়ঙ্করতার দিক দিয়ে তার বর্ণনা বিবেকানন্দের অভিপ্রায় ছিল না—তিনি কেবল মহাকালীর রূপ আঁকতেই চাননি—গভীর আনন্দে, প্রেমে তাঁকে দেখেছেন—বরণ করেছেন। এ জিনিস আগেও বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মসাহিত্যে ছিল—কিন্তু বিবেকানন্দেই তার পূর্ণতা। এইজন্য স্বামীজীর এই দৃষ্টিকে ভক্তের—সন্তানের—দৃষ্টি বলতে নিবেদিতা রাজী হননি,—এ দৃষ্টি স্বয়ং শিবের।

কালী-বক্তৃতা

প্রথম কালী-বক্তৃতার পটভূমিকা

নিবেদিতা যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনে আছে স্বামীজীর সান্নিধ্যে কাটানো এমন কিছু সময়ের স্মৃতি 'যার উজ্জ্বল বিভায় সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন অতিবাহিত হবে,' এবং তাঁর কাছে 'সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম নাম ক্ষীরভবানী।' নিবেদিতা কালীকে মেনে নিয়েছেন, কারণ কালীকে পেয়ে গিয়েছেন। অতঃপর সেই চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটি ঘটল। কলকাতার প্রকাশ্য জনসভায় নিবেদিতা কালী-উপাসনার বিষয়ে বক্তৃতা করলেন।

পটভূমিকাটি কিছু বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করা দরকার।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা ভারতে আসার পরে কিছু-দিনের মধ্যেই ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে অল্পবিস্তর লেখা আরম্ভ হয়। *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে ঐসব লেখা যথাসম্ভব সংগৃহীত হয়েছে। নিবেদিতা এইসব লেখার জন্য ভারতের, বিশেষতঃ কলকাতার শিক্ষিত সমাজে নামতঃ পরিচিত হয়ে ওঠেন।

নিবেদিতা যখন প্রথম এলেন, তাঁর আগমন স্বামী বিবেকানন্দের আশ্চর্য কীর্তির দৃষ্টান্তরূপেই গৃহীত হয়েছিল। পরাধীন দেশের একজন মানুষ প্রভু-জাতির ভিতর থেকে শিষ্য সংগ্রহ করেছেন, যিনি এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করে এখানে শিক্ষা-বিস্তারে আত্মনিয়োগ করবেন—এই ঘটনার চমৎকারিত্বই সংবাদপত্রের সংবাদবিষয় হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ের সংবাদগুলি মূলতঃ অভ্যর্থনাসূচক এবং নিবেদিতার পরিচয়মূলক। পরিচয়-প্রসঙ্গে জানানো হয়, নিবেদিতা স্বামীজীর অবর্তমানে ইংলণ্ডে বেদান্ত-আন্দোলন সজীব রেখেছিলেন, এবং তিনি 'প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্' (ইণ্ডিয়ান মিরার ৮ ফেব্রুয়ারী)।

এর পরেই নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে আসার পরে, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়া থেকেই ঠিক ঠিক ভাবে নিবেদিতার ভারতীয় কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মসমাজীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাতও এই সময় থেকে।

১৮৯৮-এর শেষ ভাগে নিবেদিতার স্কুল আরম্ভ হয়। স্কুলের কাজ ছাড়াও তিনি নানা স্থানে, যথা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে এবং এক মিশনারী প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষামূলক বক্তৃতাদি করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ঘটে যায়। এবং তাঁর বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বের বিষয়ে সম্ভ্রমের সূত্রপাতও হয়।* এই সময়েই ঐ চাঞ্চল্যকর সংবাদটি ঘোষিত হল—নিবেদিতা অ্যালবার্ট হলে কালীর বিষয়ে বক্তৃতা করবেন।

* নিবেদিতার ব্রাহ্মসংযোগ বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হবে, যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিবরণ দেব।

কালীর বিষয়ে বক্তৃতা—শিক্ষিত ভারতের রাজনৈতিক এবং 'সাংস্কৃতিক' রাজধানী কলকাতার বুকের ভিতরে—সে বক্তৃতা করবেন ইংরাজ মহিলা!! কলকাতার 'সুশিক্ষিত' বিবেক শিহরিত ও আতঙ্কিত! সে আতঙ্ক নিশ্চয় উপভোগ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কারণ ঐ বক্তৃতাটি আসলে বিবেকানন্দের চ্যালেঞ্জ—সংস্কারপন্থী, একেশ্বরবাদী, মিশনারী ও ইঙ্গ-ভাবাপন্ন ভারতীয়দের কাছে। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজার বিরোধী, বিশেষতঃ কালীমূর্তির। মিশনারীরা রাশি রাশি গ্রন্থ ছেপে আর কিছু না পারুন, শিক্ষিত ভারতবাসীর একাংশের মনে বিদ্বেষ-সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন, (আমরা ডাঃ মার্ডকস্ লিখিত একটি কুৎসাগ্রন্থের কিছু চিত্র এ প্রসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করেছি)। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস কালীসাধনায় সিদ্ধ (বিস্ময়ের কথা, ব্রাহ্মসমাজের গুরু রাজা রামমোহনও তান্ত্রিক, এবং কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষ পর্যায়ে মাতৃভাবনায় ব্যাকুল)* এবং বিদ্রোহী অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দকে কালীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলই। ভারতীয় ধর্মজীবনেও কালী-সাধনা ওতপ্রোত। বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল, মিশনারী-পন্থায় কালীকে অগ্রাহ্য

---

* মিশনারী মার্ডকস্ তাঁদের মিশনারী নীতিতে জগন্নাথ, কালী ও গণেশের রূপচর্চা করার পরে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্তলিকতা-বিরোধী উক্তি উদ্ধার করেছেন। এই দুইজনের কথা বিশেষভাবে হাজির করার কারণ মার্ডকসের মতে এঁরা হলেন, 'The two most distinguished Indians of modern times'. হিন্দু-ধর্মের নিন্দাকারী রামমোহন-কেশবচন্দ্র অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, কিন্তু জানি না রামমোহনের শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে মার্ডকস্ সাহেবের কাছে বজায় ছিল কিনা যখন তিনি খৃীস্টতত্ত্বকে নানা স্থানে আক্রমণ করেছিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের আবেগপূর্ণ বক্তব্য কিছুটা উদ্ধৃত করছি মার্ডকসের বই থেকে, পাঠকের কাছে এটি আকর্ষণীয় লাগবে কেশবের পরবর্তী রূপান্তরের ইতিহাস মনে রাখলে :

"There can be no doubt that the root of all the evils which afflict Hindu Society, that which constitutes the chief cause of its degradation is idolatry. Idolatry is the curse of Hindustan, the deadly canker that has eaten into the vitals of native society. It would be an insult to your superior education to say that you have faith in idolatry, that you still cherish in your hearts reverence for the gods and goddesses of the Hindu pantheon, or that you believe in the thousand and one absurdities of your ancestral creed. But however repugnant to your understanding and repulsive to your good sense the idolatry of your forefathers may be, there is not a thorough appreciation of its deadly character on moral grounds. It will not do to retain in the mind a speculative and passive disbelief in its dogmas, you must practically break with it as a dangerous sin and an abomination: you must give it up altogether as an unclean thing. You must discountenance it, discourage it, oppose it, and hunt it out of your country. For the sake of your souls and for the sake of the souls of the millions of your countrymen, come away from hateful idolatry, and acknowledge the one Supreme and true God, our Maker, Preserver, and Moral Governor, not in belief only, but in the every-day concerns and avocations of your life." (Contd. to next p.)

করার মধ্যে আছে আত্মবমাননা এবং সেই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে তিনি আঘাত করতে চাইলেন। ইংরাজ মহিলা কালীর পক্ষে বক্তৃতা করবে, এইটাই বিবেকানন্দের সহাস্য ও সুগভীর প্রতিঘাত।*

নিবেদিতার এই বক্তৃতা কতখানি আলোড়ন ঘটিয়েছিল, তার বিষয়ে ডঃ যদুনাথ সরকার বলেছেন—

"আপনারা আজ অনুমানও করতে পারবেন না কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় শুনে কি রকম আঁতকে উঠেছিল! কালী সম্বন্ধে তাদের অতীব স্থূল ধারণা তখন, কালীঘাট-মন্দির থেকে সেই ধারণার সৃষ্টি, কেননা সেখানে প্রতিদিন শত শত পাঁঠাবলি হত এবং প্রাঙ্গণে মাংস-বিক্রয় হত, কসাইখানার মত। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ও পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার মনোজীবনে ছিলেন যুক্তিবাদী, অনেকটা নাস্তিকও বলা যায়, তিনি বলতেন, কারও কালীঘাটে যাওয়া বা কালীদর্শন করা উচিত নয়। বাস্তবিক নিবেদিতার বক্তৃতার কোনো সভাপতি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এন. এন. ঘোষ প্রথমে রাজি হয়ে পরে পেছিয়ে যান। নিবেদিতা অদম্য, তিনি বিনা সভাপতিতেই অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন।"†

(প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯৪৩, জানুয়ারী)

নিবেদিতার বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজে বেরোয় ১১ই ফেব্রুয়ারী :

Miss Margaret E. Noble (Sister Nivedita) will deliver a lecture at the Albert Hall on Monday, the 13th February, at 6 p.m. Subject—"Kali-Worship." Miss Noble is already well-known amongst the educated public of the city who have no doubt will

---

এই উদ্ধৃতি সমাজসংস্কারকদের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের তিক্ত উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে। স্বামীজী বলেছিলেন, সমাজসংস্কারকেরা নিন্দা-সাহিত্যের অতিরিক্ত বেশী-কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি। মূর্তিপূজা কেন ত্যাজ্য, সে বিষয়ে রামমোহনের কথায় কিছু যুক্তি ছিল হয়তো, কেশবচন্দ্র তার ধারে-কাছে বিশেষ যেতেন না। তাঁর ছিল সুন্দর ইংরাজীতে বিপুল উত্তাপ। মূর্তিপূজাকে যে-রকম পাপজনক বলে তিনি হাজির করেছেন, এবং জাতির প্রাণশক্তির ক্ষয়কারী করে নির্দেশ করেছেন—এক্ষেত্রে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কেশবচন্দ্রের উক্তির পরবর্তীকালে ভারতের শক্তিমানেরা মূর্তিপূজার ঘর থেকে কম আসেনি, অন্ততঃ মূর্তিপূজাবিরোধীদের ঘরের তুলনায়। 'আমি যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় না বসতাম, কোথায় যেতাম'—বিবেকানন্দ বলেছেন, এবং কেশব-চন্দ্রকেও সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পাদমূলে বসতে হয়েছিল (ভক্তিতে অথবা ভদ্রতায়)—ইতিহাসের এই বিচিত্র লীলা।

* এখানে বলা উচিত, স্বামীজী কদাপি নিবেদিতাকে কালী-বক্তৃতা করতে প্ররোচিত করেননি। এ ধরনের প্রচারে নিবেদিতারই বিশেষ আগ্রহ। তবে স্বামীজী যে রাজী হয়েছিলেন, সেটাই যথেষ্ট ব্যাপার এবং সেটাই প্রতিঘাত।

† বিনা সভাপতিতে অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার বক্তৃতা দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সভাপতি একজন ছিলেন, কিন্তু বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। পরবর্তী কালী বক্তৃতা নিবেদিতা সভাপতি ছাড়াই দেন। 'অকেজো সভাপতি' সম্বন্ধে নিবেদিতা চিঠিতে মন্তব্য করেছেন।

muster strong to hear an exposition of Hindu worship from the lips of an English lady, thoroughly imbued with Western Science and philosophy.

বক্তৃতার জন্য নিবেদিতা বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ৩ জানুয়ারীর এক পত্রে মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমার জন্য অ্যালবার্ট হল নেওয়া হয়েছে। বক্তৃতার বিষয় কালী ও কালীপূজা। যা বলতে চাই তা লিখে ফেলে রাজার কাছে নিয়ে যেতে চাই, তিনি মূল ব্যাপারটায় (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে) সাহায্য করবেন। **আমার সর্বোচ্চ প্রার্থনা এই, কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কালীপূজাকে সহানুভূতির আলোকে তুলে ধরতে যেন ব্যর্থ না হই।"**

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, নিবেদিতা অন্ততঃ এক মাস আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছেন। বক্তৃতার তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে আলাপও করেছেন। তবে ব্যাখ্যা-ভঙ্গি তাঁর সম্পূর্ণ নিজের।

৩০শে জানুয়ারী তিনি পুনশ্চ লিখলেন একই জনকে—

"রবিবারে বোধহয় আমার কালী-বক্তৃতা। সময় এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস—সব জিনিসেরই যেমন সময় আছে। মিসেস বুল Blessed Sacrament -এর সময়ে ধ্যানকে যেমন ভালবাসেন—সেই জিনিসটি কালী-বক্তৃতায় তুলে ধরব।"

৪ ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা হয়নি, হয়েছিল ১৩ ফেব্রুয়ারী, অ্যালবার্ট হলেই। হলে ঠাসা ভিড়, উপস্থিত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। মুক্তিপ্রাণা লিখিত নিবেদিতা-জীবনীতে পাই, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুর* ব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্তও ছিলেন। এঁরা সবাই কিছু কিছু বলেন। মহিলাদের মধ্যে সরলা ঘোষাল ও মিসেস সালজারও ছিলেন। "ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, আমরা এইসব কুসংস্কার দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা বিদেশীয়া আবার সেইসব প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছ।" তখন দর্শকদের মধ্য থেকে একজন উঠে আবার ডাঃ সরকারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন এবং হৈ-হৈ বেধে যায়। সভাপতি অসহায়; নিবেদিতাই উঠে গোলমাল নিবারণ করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে নিবেদিতা এই সভার বিবরণ দিয়ে ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"ভাল কথা, আমার কালী-বক্তৃতা হল সোমবারে। অ্যালবার্ট হল ঠাসা। প্রিয় বন্ধু ডাঃ সরকার (মহেন্দ্রলাল সরকার) আমার ও কালীর বিরুদ্ধে

* সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর? সমকালীন পত্রিকায় S. N. Tagore আছে।

বললেন; তাঁর দু'চোখ ভরা জল, ভারী মর্মস্পর্শী। এই সময়ে এক খ্যাপা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে নানা কথার সঙ্গে তাঁকে 'বুড়ো শয়তান' বলে সম্বোধন করলেন। তোমাকে বলতে সংকোচ হচ্ছে, ব্যাপারটার বিষয়ে যখনি ভাবি, হেসে বাঁচি না। স্বামীজী বক্তৃতায় মহাখুশী।...ব্রাহ্মরা বলল, তোমার ও **জিনিস** কালী-পূজা নয়; সাধারণ লোকের নিম্নতম প্রবৃত্তিকে যা চঞ্চল করে, কালীপূজায় তাতেই তারা সাড়া দেয়।...

যাইহোক, কালীঘাটের কর্তারা সেখানে কালী-বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে। স্বামীজী তাতে অতীব খুসী।...তিনি মনে করেন, এর দ্বারা গণ্ডীবদ্ধতার উপর প্রচণ্ডতম মার পড়বে।*

বলিদানের চরম কথাটা খুঁজে পেয়েছি; সেটা লিখে প্রকাশ করতে পারব কিনা জানি না। পশুবলি ততক্ষণই চলে, যে-পর্যন্ত না ভক্ত নিজেকে বলি দেবার মত মানসিক শক্তিসংগ্রহ করে উঠতে পারে, তারপর পেলিক্যানের† মতই নিজ রক্ত নিষ্কাশন করে তাতে পুষ্পার্পণ, মায়ের চরণখানি তার মধ্যে স্থাপন করে। এইভাবেই স্বামীজী এখন পূজা করছেন। আর এই জিনিসটি আমার কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে—সব কিছুর সমর্থন এনে দিচ্ছে। জানি না, এ বিষয়ে তুমি কি অনুভব করবে! স্বামীজী যখন ব্যাখ্যা করলেন, মনে হল, এতো সকলেরই জানা ব্যাপার, সবাই মেনে নেয় তত্ত্বটা!...

জানো কি, সোমবার রাত্রের প্রায় মুক্ত সংঘর্ষের পরে আমার যোদ্ধৃ-প্রবণতা পরিতৃপ্ত হয়েছে।

সভাপতি একেবারে অকেজো। যখনই সংকট ঘটেছে, আমি আসন নিয়েছি এবং শৃঙ্খলা সম্পাদন নিজেই করেছি। মহা মজার ব্যাপার।

পরের বক্তৃতা *Young India Movement,* কোনো সভাপতি থাকবে না।"

তাহলে, কলকাতার শিক্ষিত মহলে নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা কিছু সময়ের জন্য একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু এই বক্তৃতা যে-পরিমাণে নাড়া দিয়েছিল, ইংরাজী সংবাদপত্রে সেই পরিমাণে কিন্তু বিবরণ বেরোয়নি। তার কারণ, সংক্ষেপে, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজী যে-ধরনের আপোষ-বিরোধী মনোভাব দেখান, তাতে তাঁর প্রবর্তিত কোনো আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ দেখাতে সংবাদপত্রগুলি প্রস্তুত ছিল না। (সে এক দীর্ঘ ইতিহাস, অন্য গ্রন্থে আলোচনা করেছি)। 'বেঙ্গলী' রাজনৈতিক পত্র, এইসব বিতর্কমূলক ধর্মীয় ব্যাপারে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে

---

* এই প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের বিপরীত ব্যবহারের কথা ওঠে। সে কথা মনে রেখেই স্বামীজী 'গণ্ডীবদ্ধতা' কথাটি বলেছিলেন। অল্প পরেই এ-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

† বৃহৎ জলচর মোরগ-জাতীয় পক্ষীবিশেষ। পেলিক্যান-মুরগী নিজের ঠোঁট দিয়ে নিজের বুকে ক্ষত করে শিশুকে রক্তপান করায়।

করেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' এই সময়ের ফাইল আমরা পাইনি। 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর কালী-বক্তৃতার বিরুদ্ধে আপত্তি না থাকলেও কলকাতার ইঙ্গ-ভাবাপন্ন মহলের বিরোধিতা করতে এর সম্পাদক ভয় পেয়েছিলেন, তা ডাঃ যদুনাথ সরকারের কথায় দেখেছি। সম্পাদক যেখানে সভাপতি হতে স্বীকৃত হয়েও শেষে ভয় পেয়ে গররাজি হন, সেখানে তাঁর কাগজে বিবরণ থাকার কথা নয়। অপরপক্ষে অমৃতবাজারের নীরবতা আসলে প্রতিবাদ। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক অমৃতবাজার প্রেমতত্ত্বের প্রচারক হলেও শাক্তমতের দিকে সেই প্রেমকে প্রবাহিত করতে ঘৃণাবোধ করেছিল। শুধু তাই নয়, শাক্ত-বৈষ্ণবের পুরনো ঝগড়ার সূত্রপাতও করেছিল। ১২ জানুয়ারী, ১৮৯৯, তারিখে 'গৌরাঙ্গ সমাজে'র সেক্রেটারী 'বাবু রসিকমোহন চক্রবর্তী' অমৃত-বাজার পত্রিকায় কালী-দুর্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ যে পত্র লেখেন, কানাইলাল ঘোষাল ১৯ ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান মিরারে তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। রসিকমোহনের অবলম্বিত রীতিকে ইনি ক্রীশ্চান মিশনারী কৌশলের অনুসৃতি বলেন। রসিকমোহনের ঐ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষযুক্ত পত্রটি যে-পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে, সে পত্রিকা যে কালী-বক্তৃতাকে পাবলিসিটি দেবে না, সহজেই বোঝা যায়।

এইসব কারণে আমরা 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজের উদারতার প্রশংসা করতে বাধ্য। থিয়জফিস্টদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর প্রচণ্ড আক্রমণে ('আমার সমরনীতি' ইত্যাদি বক্তৃতায়) সবচেয়ে বেশী আহত হয়েছিল থিয়জফি-সমর্থক এই পত্রিকাটিই। তবু তাঁরাই নিবেদিতার বক্তৃতার সবচেয়ে বেশী প্রচার করেন। নিবেদিতার প্রশংসাসহ তাঁর বক্তৃতার যে বিজ্ঞপ্তি এঁরা ১১ ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করেন, তা অল্প পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি। তারপরে এঁরা হরিপাল-এর জনৈক শরৎচন্দ্র চৌধুরী লিখিত একটি দীর্ঘ পত্র ছাপেন, যাতে পত্রলেখক, ইংরেজ মহিলা কালীর বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, এই সংবাদ পাঠ করেই হর্ষোচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়ান মিরার থেকে পত্রটি উদ্ধৃত করছি :

AN ENGLISH WOMAN ON KALI WORSHIP

[To the Editor of 'Indian Mirror']

Sir,—The news of Miss Margaret Noble (Sister Nivedita) an English lady, intending to deliver a lecture on the worship of Kali fills me with joy. Hitherto my belief was that, whatever foreigners might say or think about Hinduism must be confined to its Universal and Catholic side; a true appreciation and thorough insight into the worship of the particular forms of the Mother of the Universe shall remain, perhaps, a sealed book to them. And I had my reason to believe so. You will agree with me that when the worship of the *Isthadeva* (in any particular form of the Deity, vouchsafed to a particular worshipper) does not

dive deep into the reality, but ends in a mere lip-profession, it is hard even for a Hindu to realise what such a worship is. About six years ago (in Oct. of 1893), I remember to have gone to a pundit of acknowledged sanctity in the hope of getting explained certain expressions which I could not then understand. But a few preliminary words convinced me of the futility of my attempt. Our conversation appeared like one carried on between two persons speaking in two different languages, and I had the art to make the conversation drift on to subjects foreign to my purpose. If a Brahman of some reputation as a religious man can question the fact of a God or Goddess appearing to mortal eyes in the *Kaliyuga*, what can we expect from one who has never had even the faintest approach to the spiritual culture of the Hindus? But the anouncement of Miss Noble's lecture disillusionises me, and it is a joyful disillusion. The noble lady must be in a position to speak from personal experience, otherwise I can not persuade myself to believe, that a non-Hindu speaker, however favourably disposed towards Hinduism, would venture on so delicate a subject. The *three orders* and *seven ways*, laid down in *Tantras* for the worship of the Universal Mother, covers the whole field of humanity, and a *Mlechcha* is as much welcome to the doctrine as a Brahman.

But I venture to suggest, that a public meeting is not the place suited for recounting one's experiences of a spiritual nature. Readers of the *Tantras* know how secrecy is enjoined almost in every chapter, and that is not done without reason. The language of experience to the ears of theory or indifference is always ineffectual, and is likely to bring discredit to the speaker and the principles he teaches ; though such language bears immense fruits, when it proceeds from the holy lips of the *Guru* and falls into the willing ears of the believing disciple. Such recountings to be of any advantage must be before a limited and select audience who can properly appreciate them. One word will suffice for one who has experience of the matter, while a thousand volume will fail to convince one whose mind feeds on theories, and has not an iota of experience. There the speaker speaks, and the audience hears a language which is not bound down with cannons of grammar and rhetoric, but consists of sighs, tears and sounds only half-uttered.

Such utterences as, however, come from the noble lips of those foreigners who have interested themselves in the cause of Hinduism, should not be permitted to loose themselves in the air like momentary evanescence, nor to be solely enjoyed by the mere favoured residents of the Metropolis, but measures should be adopted to preserve these noble thoughts on the noble religion of the Hindus given expression to the noble language of England, and to bring them within the reach of the poorest student of that language.

Haripal, the 12th February, 1899

SARAT CHUNDER CHOWDHURI
Your etc.,

বক্তৃতা হয়ে যাবার পরে মিরারে ১৮ ফেব্রুয়ারী নিম্নের সংবাদ প্রকাশিত হল যাতে সভাস্থলে মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিবাদের উল্লেখ আছে, এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা আছে নিবেদিতার বাগ্মিতা ও যুক্তিক্ষমতার, এবং অনুচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণের—

AN ENGLISH LADY ON KALI WORSHIP

A correspondent writes: 'The lecture on Kali-worship which Sister Nivedita (Miss M. Noble), the English lady disciple of Swami Vivekananda, delivered on last Monday at the Albert Hall, was a great success from an orthodox point of view. As it was a novel thing to hear an English lady speaking in support of Kali-Worship, people mustered in large numbers, and her explanation which was a most rational and philosophical one, was all that could be expected from a foreigner on a subject which was so serious and sacred for explanation in a public meeting. We are glad to note that the lecture was free from orthodoxy, and bigotry and it was the pure and rationalistic side of the Kali-Worship that the lecturess advocated. To her Kali-worship signified Motherhood of God. We are very sorry to learn that some discordent note was raised in the meeting by a few distinguished countrymen of ours noted for their vast learning and erudition in Western science. But the reply which it called

forth from the lecturer in her sweet eloquence was most convincing and even the opponent had to admire the lady-lecturer for her power of reasoning and eloquence. We hope, such useful discoureses will be given from time to time.

এর পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান মিরারে 'An English lady on Kali and Her worship' শিরোনামায় অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার চার কলম দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১ মার্চের সম্পাদকীয়তেও নিবেদিতার বক্তৃতার সপ্রশংস উল্লেখ আছে :

'Sister Nivedita (Miss M. Noble) whose very interesting, and in some ways, light-imparting lecture (Kali and Her worship) we published on Sunday last . . . . 'Etc.

আরও কিছু সংবাদ অন্যত্র পাওয়া গেল, তবে অবশ্যই বিপক্ষে। এইকালে স্টেটসম্যান খ্রীস্টধর্মভাব প্রচারে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছিল; সুতরাং 'হিন্দু রিভাইভ্যালকে' বিতৃষ্ণার সঙ্গে চিত্রিত করছিল স্বভাবতই। অ্যানী বেশান্ত সেই কারণে স্টেটসম্যানের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল। স্টেটসম্যানে ২ ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে অ্যানী বেশান্তের দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। ৫ ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যানের প্রধান সম্পাদকীয়তে তার তীব্র সমালোচনা করে খ্রীস্টান মতের শ্রেষ্ঠতার কথা বলা হয়। এর আগের দিন জনৈক পত্রলেখক India and Christianity নাম দিয়ে এক পত্র লেখেন, তাতে বিশপ ওয়েলডনের আগমনে ভারতে খ্রীস্টধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-কল্পনায় হর্ষপ্রকাশ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী এই পত্রিকায় পুনশ্চ বেশান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক সম্পাদকীয় লিখিত হয়। এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী একই বিষয়ে একটি পত্র বেরোয়।

এই পরিস্থিতিতে নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা কঠোরভাবে সমালোচিত হওয়ার কথা। কিন্তু সরাসরি তা করা হয়নি। কারণ, ইতিমধ্যেই নিবেদিতা বোধহয় স্টেটস-ম্যানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্ভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। নচেৎ ১৮ ফেব্রুয়ারী ম্যাক্সমুলারের শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থের উপরে নিবেদিতার (বেনামা) আলোচনা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দু-কলম জোড়া হয়ে প্রকাশিত হতে পারত না।

এই লেখাটি নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার পাঁচদিন পরে প্রকাশিত হয়। লেখাটি পূর্বেই আমরা উপস্থিত করেছি রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে। পাঠকগণ দেখেছেন, কালী উপাসনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবে ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনায় কী আশ্চর্য সিদ্ধি পেয়েছিলেন, তার বর্ণনা সেখানে নিবেদিতা করেছেন। লেখাটি নিবেদিতার কালী-বক্তৃতাদানের প্রায় অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে নিবেদিতার বক্তৃতাকে অবিলম্বে খোলাখুলি আক্রমণ করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। অথচ বিরোধী বক্তব্য হাজির করার তাগিদও ছিল নিশ্চয়। সুতরাং স্টেটসম্যানে ২২ ফেব্রুয়ারী

Mrs. Besant and idolatry নামে একটি সংবাদ বেরুল, যেটি আসলে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের *Unity and Ministei* পত্রিকার উদ্ধৃতি—তার মধ্যে নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার সমালোচনাও ছিল। মন্তব্যটি সম্পূর্ণতঃ আমরা উদ্ধৃত করছি; পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, স্বামী বিবেকানন্দের নামোল্লেখে *Unity and Minister* এর চিত্তে কি ধরনের দ্বিতীয় রিপুর প্রাবল্য ঘটত :

Unity and Minister, the organ of the Brahmo community writes: "The *Statesman* deserves the sincerest thanks of all thoughtful men for boldly exposing the unsoundness and unreality of neo-Hindooism under the leadership of Mrs. Besant and giving a timely warning to the Christian people and other thoughtful persons to withhold, on conscentious grounds, their sympathies, much more their active support, from the Hindu College to be started at Beneras. We shall be most glad to see a healthy revival of Hindooism, but we are the last persons to wish resurrection of idol-worship, superstiton, and the darker side of Hindooism in the name of our ancestral religion at the fag end of nineteenth century. Mrs. Besant's idea of amulgating Hindooism with modern thought is injurious morally, religiously, as well as politically. It is inconsistent with itself. It will foster disloyalty as well as caste distinction and many other evils from which the country is struggling to be free. It is wonder how our countrymen professing orthodoxy, hear with bended heads expositions of their religion from a *Mlechcha,* who is ignorant of the sacred Sanscrit language. The heart of a true Hindoo really weeps for the sad degeneracy of the Hindoo race, and secretly invokes the spirits of their devout forefathers to rescue their progeny from a mischievous delusion. The *Statesman* has truly observed that the very fact that Mrs. Besant, *Mlechcha*-born herself, affects to be a leader of the Hindoos, surely ought to convince her of the inconsistency of her pretensions. Affairs have come to such a miserable pass that a prophet's voice is needed to denounce them and warn the present generation of Hindoos of their danger. We are told, and we think our information is correct, that a regular scene was about to be enacted the other day at Albert Hall. One,

Miss Noble, a disciple of our old friend Norendra Nath Dutt, who has taken the name of Vivekananda, delivered an address at the Albert Hall, advocating the worships of Kali and other gods and goddesses. Dr. Mahendra Lal Sircar, the apostle of Science in India, with his usual repugnance to idolatry and superstition, as contrary to the spirit of Science, protested against the lecturer's advocacy of Kali Pooja ; he was supported by Mr. S. N. Tagore, who happened to be there. These protests would have resulted in violence from certain persons who were among the audience, had not the fair lecturer intervened and deprecated the spirit of violence by a declaration of the principle of toleration, which she said entitled every person to give out his honest opinion."

রোষ, বিদ্বেষ, আশাভঙ্গ এবং আত্মবিরোধে পূর্ণ এই রচনার অসঙ্গতির আলোচনা এখানে দরকার নেই। শুধু বললেই চলে, এঁদের কৌশল মজাদার, নানা মাপে নানা জনকে মাপার মনোরম দৃষ্টান্ত। ক্রীশ্চান-সাহেবদের সতর্ক করার জন্য হিন্দু-পুনরুত্থানের জুজু-দেখানো, শাসক-সাহেবদের ভয় দেখাবার জন্য 'লয়্যালটি'-নাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, রক্ষণশীলদের খোঁচাবার জন্য ম্লেচ্ছকে গুরু করায় গঞ্জনা, এবং অবতারবাদ-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও প্রফেটের অভ্যুদয়ের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা! সেইসঙ্গে হিন্দুজাতির অধঃপতনে বেদনায় প্রায় মূর্ছিতাবস্থা!! আর—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেও 'আমাদের পুরনো বন্ধু, যিনি ইদানীং বিবেকানন্দ নাম ধরেছেন'—এই বুকের জ্বালা!!!

নিবেদিতা-লিখিত ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থ সমালোচনা স্টেটসম্যানের ভিতর মহলে নিশ্চয়ই কিছু আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তার প্রমাণ, একই গ্রন্থের বিষয়ে ১৮ জুন তারিখে ঐ কাগজে আর একটি আলোচনা বেরোয়, যেটিও নামহীন, আকারে সংক্ষিপ্ত এবং কিয়দংশে কটাক্ষপূর্ণ।

নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা কেবল কেশবপন্থীদের মধ্যে নয়, অন্য মহলেও মর্মান্তিক বেজেছিল। মাদ্রাজের 'সোস্যাল রিফর্মার' কাগজ এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে ২১ মে, ১৮৯৯-তে—

Different men have different conceptions of the goal towards which the world is marching. Miss Noble, alias Sister Nivedita, believes that the nations are journeying on to the feet of the goddess Kali. There is evidently some illusion of spiritual optics here, for while we can easily

behold men moving away from the dread presence of the great goddess, we see no movement in the contrary direction. This pious lady preaches that "religion is for the heart of the people. To refine is to emasculate it. Every man must be able there to find bread. . . . The man who drives brutal satisfaction from life, or who sees no further than the surface of things, this man has a right to find these satisfactions, and to make for himself a worship which shall express these instincts. The man who is violent in his modes of thought, and vivid in his apprehension of life, the man who appreciates the struggle of Nature, and is strong enough to plunge into it fearlessly, that man has a right to offer to God that which he hourly demands from life." That man does all these things we know; but why he should be said to have a right to do them is more than we can understand. A worshipper of Kali, according to the doctrine, has a right to shed human blood, to violate the chastity of woman, to drink spirituous liquors and to indulge in all the disgusting rites of the tantrikas. This is revivalism with a vengeance.

মিশনারী পত্রগুলিও যে তিক্ত আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। Bombay Guardian নামক মিশনারী পত্রিকায় আমরা দেখেছি ১১ মার্চ, ১৮৯৯, সংখ্যায় অভয়ানন্দের বেদান্ত-বক্তৃতা ও নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার উপর বিষ-শর নিক্ষিপ্ত হয়, এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মিস মুলারের মোহভঙ্গে উল্লাস জানানো হয়। নিবেদিতার 'প্রাপ্তি' এই প্রকার :

> ". . . We also hear of a Miss Noble professing to be a disciple of Norendra Nath Dutt, who has taken the name of Vivekanand. She delivered an address recently in Calcutta advocating the worship of Kali and other gods and goddesses. Thoughtful Hindus, who long to rid India of idolatry and caste, deplore the course these women are taking, yet look upon them as sincere but deluded. Apart from religion, we cannot conceive of a sincere, cultured lady of any civilised land, who would not revolt from idolatry as debassing and barbarous. . . . We believe that two years will be long enough to give these ladies to finish their present career as Hindus, and the public can afford to wait. Their

insincerity will either develop into some scandal, as did Madame Blavetsky's, or they will leave for more congenial fields; or if sincere and humble seekers after truth, they will renounce their mistake. In the end God will cause the wrath of man to praise Him."

মিশনারী ও সংস্কারপন্থীদের এইসব আক্রমণ প্রত্যাশিত। নিবেদিতা সেগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপেও নিশ্চয় অনেকে আপত্তি জানান। এই সকল আক্রমণের উল্লেখ করে নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী মিসেস হ্যামন্ডকে যে পত্র লেখেন (৯. ৩. ১৮৯৯), তার মধ্যে এই বক্তৃতাকে তাঁর ইংলন্ডের পরিচিতজনেরা যে সুচক্ষে দেখবে না, সে সঙ্কোচও ছিল :

"আমার কালী-বক্তৃতা তোমাকে পাঠাবার ইচ্ছা আছে, যদি কোনো কপি অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এটিকে তুমি একেবারে ব্যক্তিগত করে রাখবে। কারণ গোঁড়া উইম্বলডনে এসব ব্যাপারে আমার ভাবভঙ্গি যদি জানাজানি হয়ে যায়—নিমকে (বোনকে) কষ্ট পেতে হবে। সময়ে সবই প্রকাশ পাবে, কিন্তু আমার একান্ত আশা, তার আগে নিম-এর অব্যাহতির ব্যবস্থা যেন হয়ে যায়।

অবশ্য আক্রমণ হচ্ছেই। কিন্তু লোকে একটা জিনিস ভেবে দেখেনি—গোড়ায় কালীপূজায় এই ইনভেস্টমেণ্ট—পরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির স্বাদ পাবার জন্যই—যদিও সে উপলব্ধি হয়ত আসবে বহু সহস্র বছর পরে। কালীকে আমরা পূজা করি তাঁর মূল স্বরূপে, অর্থাৎ ঈশ্বর ভেবে—ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কল্পনার, নানা নামের একটি, কালী—এবং প্রয়োজনে বা ভালবাসায় ডাক দিলে তুমি যেমন সাড়া দাও, তেমনি ঈশ্বর তাঁর কালী নামে সাড়া দেন, যেমন দেন তাঁকে যখন ডেকে বলি—হে আমার স্বর্গস্থ পিতা!

বলির কথা যদি বলো, আমাকে মানতে হবে, বলির সবটুকু অংশ অনভ্যস্ত মনের কাছে রুচিকর ঠেকবে না। তাতে প্রমাণ হয় যে, বলির ঐ অধ্যায়টি আমরা পেরিয়ে এসেছি। সেইসঙ্গে একথাও আবার জোর দিয়ে বলা যায়, খ্রীস্টীয়তার নামে বলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার কারো নেই, কারণ ইহুদী মত, ক্রুশবিদ্ধকরণ, একই ব্যাপার। আসল কথা, বিপুল সংখ্যক মানুষ যে এইভাবে পূজা করে, তার মানে নয়, এইটেই একমাত্র অনুষ্ঠান, যা করতেই হবে, কারণ যখন কোনো মানুষ পশুবলি ছাড়া অন্যতর পন্থায় অর্চনা করতে পারে, তখন সেটা উচ্চতর জিনিস বলেই গৃহীত হয়, এবং সেখানে বলির কোনো প্রয়োজন থাকে না।

মূল কথা, ভারতে ধর্মের নামে যে-কোনো কাজ করতে পারো, যদি সর্বপ্রকার বাসনা ও কর্মকে শ্রেণীবদ্ধ করে ফেলা হয়, যাতে তুমি বুঝতে পারো যে, তোমার বাসনার আকার অনুযায়ী আধ্যাত্মিকভাবে তুমি কোন্ স্তরে আছো!"

নিবেদিতার বক্তৃতাটির অনুবাদ এবার উপস্থিত করা যাক :

প্রথম কালী-বক্তৃতা

এখানে দাঁড়িয়ে কালীপূজার বিষয়ে বক্তৃতা করার অধিকার আমার অল্পই আছে এবিষয়ে আমি সচেতন। সংস্কৃত-জ্ঞান বা ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে এমন জ্ঞান আমার নেই, যার দ্বারা এই উপাসনার বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নানা মতের বিচার আমি করতে পারি। ভারতে মাত্র এক বছর আমি এসেছি, এবং আমাকে প্রায়শঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ যা আমার কাছে অবিসংবাদিত সত্য মনে হয়, এক বছর পরে তা ভিত্তিহীনরূপে প্রতীয়মান হতে পারে।

সে যাই হোক, কিছু দাবি আমার আছে। প্রথমতঃ, **সারা জীবন ধরে আমি কালীপূজার কথা শুনে আসছি,** কালী বা তাঁর পূজকদের সম্বন্ধে মোটেই স্তুতি-বাচক সেসব বক্তব্য নয়; এখন নিজে আমি সেই বস্তুটির সংস্পর্শে এসেছি, সুতরাং এখানে উঠে আমার একথা বলার অধিকার আছে যে, বাল্যকালে যে-কথা আমি শুনেছি, তা অর্ধসত্য, পূর্ণ সত্য নয়, এবং পূর্ণ সত্যের সন্ধানই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, একজন ইংরাজ রমণীরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করবার অধিকারও আমার আছে; আমার দেশের নরনারী অন্য একটি দেশের মানুষের—সমতুল মানুষের—প্রাণপ্রিয় ধর্মবিশ্বাসের কুৎসা করে যে অন্যায় করেছে, তার জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা আমি চাইতে পারি, এবং এই আশা পোষণ করতে পারি, পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহানুভূতির বিস্তারের দ্বারা এই ধরনের কুৎসাপ্রচার বন্ধ হবে। শেষ কথা, **সদ্য-লব্ধ কোনো ধারণাকে প্রকাশের অধিকারও আমার আছে।** অনেক সময়ে আমরা ভুলে যাই যে, প্রথম ধারণাসৃষ্টি যার দ্বারা হয়, সর্বশেষ ধারণাসৃষ্টিকারী জিনিসের মতই তা সত্য, উভয়েই সমগ্রের আবশ্যিক অংশ। সকল শ্রেয় এবং সকল সুন্দর সম্বন্ধে একথা খাটে। ধর্মচেতনার মত জটিল ও বিস্তারিত ক্ষেত্র সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। **ধর্মবোধ তার সকল অভিব্যক্তি-স্তরের দ্বারাই বিচার্য।** প্রতীক, সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ, যে অনুভূতিই সৃষ্টি করুক না কেন, তার কোনো কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। অবশ্যই সর্বোচ্চকে প্রধান স্থান দেব। অবশ্যই মনে রাখব, প্রতীককে সহজে মেনে নিলে মানুষ বন্ধ হয়ে পড়ে; যে প্রতীকের মধ্য দিয়ে দিয়ে যোগী উচ্চতর ঈশ্বরানুভূতি পেয়েছে, সেই জিনিসই নিতান্ত বাহ্যিক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই নিম্নতর পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার করার কালে বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান হতেই হবে, অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এটি ক্রমোন্নয়নের নিম্নতর পর্যায়, যাকে অতিক্রম করে সাধক সমুচ্চ দর্শনাদি লাভ করেছে।

আবার অনেক সময়ে সতেজ নতুন দৃষ্টির প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি। এখানে তার প্রয়োজন কতখানি, আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমরা

নিজেদের বিষয়ে বলতে পারি, বাল্যকাল থেকে খ্রীস্টধর্মের কথা গল্প শোনার মত মারাত্মক জিনিস খুব কমই হয়; তার ফলে গ্যালিলির সমুদ্রতীরে, জুডার শৈলশিরে যাপিত সেই অপূর্ব জীবনের সমস্ত তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায়—কোনো তাৎপর্যই আর বহন করে না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের জীবনের সামনে প্রথম আবির্ভূত হলে হয়তো তা পৃথিবীর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রাণবস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং বহিরাগত মনের উপরে আমাদের ধর্মের প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখলে অনেক সময়ে আমাদের উপকার হয়। আরও দুটি জিনিস একইভাবে সাহায্য করে—(১) অন্য ধর্মের অনুশীলন, যা তুলনার ও নব সিদ্ধান্তের সুযোগ দেয়; (২) এক দল মানুষ (কিংবা একটি মানুষ, তার জীবনের এক পর্বে,) কর্তৃক সমস্ত ব্যাপারটার সত্যতা অগ্রাহ্য করা, যার ফলে মতের ভিত্তিভূমি, তার তাৎপর্য, এবং জীবনের কাছে তার দাবির বিষয়গুলি পরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হতে পারে। কলকাতার এখনকার জীবনে একদল লোকের মধ্যে মাতৃরূপে ঈশ্বরারাধনার ভাবটিকে অশ্রদ্ধা ও অগ্রাহ্য করার যে মনোভাব রয়েছে, ধন্যবাদের সঙ্গে জানাতে পারি, মাতৃসাধনার ভাবকে শক্তিশালী ও পরিষ্কৃত করার ব্যাপারে তার চেয়ে 'সুপরিকল্পিত' উপায় আর কিছু হতে পারে না। আমরা যেন ভুলে না যাই, তাঁরাও আমাদেরই মত সত্য সন্ধানী; তাঁরা যা বলতে চান, সাবধানে তার বিচার-বিবেচনা করা দরকার, এই কথা জেনে যে, স্বয়ং জগন্মাতা তাঁদের কণ্ঠে আমাদের কাছে তাঁর কথা বলছেন, যাতে তাঁদের এবং আমাদের ভালবাসা ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা অনুভব করেন যে, ঈশ্বরসন্ধানই জীবনের সব-হওয়া সব-পাওয়ার লক্ষ্য, এবং তিনিই প্রাজ্ঞ, ও পূর্ণ জীবনবন্ত, যিনি সমগ্র আত্মাকে বিদীর্ণ করে চীৎকার করে উঠতে পারেন, 'তৃষার্ত প্রাণ যেমন নির্ঝরিণীর জন্য ব্যাকুল, তেমনি আমার আত্মা ব্যাকুল তোমারি জন্য, হে প্রভু!'—তাঁদের কাছে জাতীয় রীতি-নীতি, জাতীয় ইতিহাস, জাতির জীবনদৃষ্টি—এসব কিছুই ঈশ্বরোপলব্ধির প্রকাশ, ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে।

এইজন্য সেমাইটগণ ঈশ্বরধ্যানের সর্বোচ্চ ভাবাবেশের ক্ষণে ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে সম্বোধন করেন; এবং ইউরোপীয়েরা ঈশ্বরের প্রতি পুত্রভাব যোগ করার অভিপ্রায়ে দেখেছে—তাঁর উপরে আনত হয়ে আছেন মহিমান্বিত নারী (Glorified Maiden), যাঁকে তারা জানে, 'Our Lady' বলে।

ভারতে কিন্তু নারী সম্বন্ধে ধারণা সহজতর, অনেক ব্যক্তিগত এবং সুসম্পূর্ণ। কারণ ভারতের কাছে গৃহবন্ধনের হেতুস্বরূপ একটি সম্পর্কই আছে, যা দেহের প্রতি তন্ত্রীতে প্রবিষ্ট, যা শুচিতা সৃষ্টি করে, যা কিন্তু পিতৃত্ব নয়,—সুতরাং বিস্ময়ের কি আছে যদি ভারতবর্ষ সেই সম্পর্কের সূত্রেই মধুরতম নামে ঈশ্বরকে ডাকে—'মা' বলে?

ঈশ্বর—জননী! আশ্চর্য রহস্যের আকর্ষণ অনুভূত হয়, যে-আকর্ষণ ও রহস্য-বোধ 'ভারত' শব্দটিকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে, ভারতীয় ইতিহাস বা দর্শনের অনুশীলনকারীদের কাছে।

বহু প্রাচীনকালে, বৌদ্ধধর্মের জন্মের বহু পূর্বে, ভারত রত্নভাণ্ডার,—মূল্যবান পাথর, চন্দনকাঠ, হাতীর দাঁতের জন্য যার দ্বারস্থ হতেই হোত। তারপরে এক

সময় এল, গ্রীসের উপরে যখন পাশ্চাত্য পৃথিবীর দিনোদয় হচ্ছে—তখনো ভারতের বহুল তাৎপর্য ছিল সেই নূতন জীবনের কাছে। সেই বৌদ্ধযুগ, যখন ভারতের নাগা সন্ন্যাসীরা গ্রীক দার্শনিকদের শিখিয়েছিল তার প্রাচীন প্রজ্ঞার কথা,— 'প্রাচীন'? হাঁ, তখনো কালের হিসাবে সে প্রজ্ঞা প্রাচীন। তারপর এল ইউরোপে মধ্যযুগ, ভূমধ্যসাগরের চারপাশের দেশগুলি নিঃশ্বাস ফেলবার কিছুটা সময় পেয়েছে, ক্রুসেড বেধে গেছে। ক্রুসেড প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনভূমি—প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যস্বার্থ বাগদাদের দিকে প্রবল ধারায় প্রবাহিত, তারপরে সারাসেনদের দ্বারা সিরিয়ার মরুভূমে নিক্ষিপ্ত।

এই ক্রুসেডের কালে, পরে স্পেনে মুর-অধিকার কালে, এবং সেই চির আকর্ষণীয় ভেনিস ও জেনোয়ার প্রাচীন বন্দরসমূহের রাজপথে ও সংকীর্ণ গলিতে সর্বকালে —ভারত নামটি ঘিরে চিররহস্যের সূত্রপাত অবশ্যই হয়েছিল।

ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের কথিত অপূর্ব কাহিনীগুলি : ভারতীয় প্রাসাদ-সমূহ এবং প্রহরীগণের জাঁকজমক, যাদুকরদের অদ্ভুত খেলা এবং হঠযোগীদের শারীর সামর্থ্যের অসাধারণ প্রদর্শনী—এইসব কিছু 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণমাত্রে তাদের মনে জেগে উঠত, যারা কখনো নিজ জন্মভূমে তালীবনপথে হাঁটেনি, কিংবা বনময়ূরের কলাপবিস্তার দেখেনি।......

পরবর্তীকালে, ভারতে ইংরাজ-অধিকারের সূচনাপর্বে ভারতীয় দার্শনিক শব্দ-গুলিকে কেন্দ্র করে মোহসৃষ্টি হয়েছিল। 'মায়া' শব্দটির চলিত অর্থের চারিপাশে মায়ালোকের বিস্তার, এবং চেতনার শিহরণ 'মাতৃরূপী ঈশ্বর' সম্বন্ধেও।

তাই বলে, আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন কোনো ধর্মের পক্ষে কি এই মাতৃভাবকে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব? কদাপি নয়। গ্যালিলিয়ার আচার্যপ্রবর তা বিস্মৃত হননি। একটি ক্ষুদ্র শিশুকে সকলের মধ্যে স্থাপন করে তিনি বলেছিলেন, 'যে নিজেকে এই ক্ষুদ্র শিশুর মত নম্র কোমল করে তুলতে পারবে, সে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হবে।' সেণ্ট পল তাঁর শিষ্যদের কাছে চিঠি লিখতেন আতুর জননীর মত, যাতে তাদের মধ্যে খ্রীস্টের জাগরণ হয়। সেমিটিক ভাবের মধ্যে সাহায্য ও সদুপদেশের যথার্থ ও মধুর প্রতিটি শব্দ প্রবেশ করেছে,—'যেমন পিতার সকরুণ ভালবাসা সন্তানের প্রতি,' এবং আর্যদের মধুরতর ধারণার মতই— 'যেমন মাতার সকরুণ ভালবাসা সন্তানের প্রতি'।

খ্রীষ্টধর্মে কিন্তু ঐ ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়নি, আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এবং এখানে নারী সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় আদর্শের বিচিত্র পার্থক্যের কথা ওঠে—যা ইউরোপের ক্ষেত্রে অধিকভাবে ঈশ্বরারাধনায় মাতৃভাবের প্রবেশকে ব্যাহত করেছে।

মধ্যযুগের ইউরোপ থেকে ভক্তিসাহিত্যের সুন্দরতম একটি নমুনা আমরা পেয়েছি, একটি পুরাতন ক্ষুদ্র ফরাসী পাণ্ডুলিপি, যার নাম *"Our Lady's Tumbler."* এখানে, মনে হয় যেন, আমরা খাঁটি মাতৃ উপাসনায় উপনীত। আসলে কিন্তু তা নয়, কারণ বিশিষ্ট প্রয়োগটি হল, 'অয়ি নারী মহীয়সী, তুমি আমার আনন্দময়ী, সারা বিশ্বের আলোকস্বরূপিণী' (Lady, you are the *mon-joie* that lightens

all the world) –অর্থাৎ এখানে 'মাতাকে পূজার্পণ করা হল না, হল 'রানীকে'। ভারতে তা কখনো হয় না। প্রাসাদ-প্রাচীরের অন্তরালে, কিংবা পর্ণকুটীরে—সর্বত্রই ভারতীয় নারীর সেই একই সরল, সুন্দর জীবন, যা ছিল প্রাচীন আর্য গ্রামে। অপরিমেয় পরিচ্ছন্নতা এবং সরলতা, অনন্ত শুচি-সাধনা, এবং সর্বসময়ে একই সুগভীর মাতৃত্ব।

ভারতের কাছে নারী সম্বন্ধে 'Lady', –এই ধারণা বিজাতীয়। এমন যে হয়েছে, তার জন্য দেশপ্রেমিক মানুষেরা কৃতজ্ঞ না হয়ে পারবেন না। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় নারী যার দ্বারা মহৎ, মধুর এবং শক্তিমতী হতে পারে, তার থেকে বঞ্চিত হবে; আসল কথা, জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তারা যা পেয়েছে, বিদেশাগত ধারণার চেয়ে তা অধিকতর সুন্দর, কারণ অধিকতর মহৎ। ভারতীয় স্বার্থশূন্যতা, প্রজ্ঞা এবং সামাজিক শক্তিকে গভীর ও গতিশীল করতে পারলেই 'বন্ধনমুক্তি' আসবে।

বিলাস ও আত্মপ্রীতি থেকে এই মুক্তিই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শরূপ—এই জিনিসটি সুযোগ্য প্রতীক লাভ করেছে ভারতের ঈশ্বরভাবনার বিশিষ্ট রূপটির মধ্যে, যাকে বোধহয় পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান প্রতীক বলা যায়—মাতৃরূপিণী ঈশ্বর,—রাজ্ঞীরূপিণী ঈশ্বর নয়।

মাতৃরূপিণী ঈশ্বরের তিনটি রূপ : দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী।

দুর্গার মধ্যে রাজ্ঞীভাবের অনেকটা পাওয়া যায়, তবে রাজ্ঞীর শক্তিটুকু, অধিকারবোধ নয়।

দিগ্‌বাসিনী দুর্গা, তাঁর এক পদ সিংহের উপরে, অন্য পদ অসুরের স্কন্ধে, সর্পের দ্বারা আক্রমণরতা, হস্তে পূজার দ্রব্য এবং বিনাশের অস্ত্র,—এই দুর্গার কল্পনায় অপূর্ব কাব্যিক ব্যাখ্যার উপাদান রয়েছে। 'প্রকৃতি'রূপে বিকাশশীল মহাশক্তির তিনি প্রতীক, সৃষ্টিচক্রের কেন্দ্রীয় প্রাণচেতনা।

উপরে, অস্পষ্ট-আভাসিত চিত্রাবলী, দেবগণের দানচিত্র, তা এই মহাশক্তির সঙ্গে দেবগণের ও আমাদের আত্মার সম্পর্ক দৃশ্যমান করে তোলে।

নিম্নে সবকিছুই গতিময়, আলোড়ন-সংক্ষুব্ধ; উপরে অনন্ত ধ্যানের শান্তি। আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি চৈতন্যময়ী। এর বাইরে আছে যা, যা আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়রূপেই ব্যক্ত, তা হল ব্রহ্ম।

যেভাবেই দেখা যাক না কেন, এর থেকে দ্বৈত বিকাশের পূর্ণতর, সুন্দরতর চিত্র সম্ভবপর? কিন্তু দুর্গা আবার বিশ্বজননী। ঐশী অনিবার্য শক্তি—যিনি যেমন সৃষ্টি করেন, তেমনি ধ্বংস করেন, যিনি আযোগ্যকে বিনাশের ভয়ঙ্কর উপায়ের মধ্য দিয়ে পালন করে যান।—

> তাহলে কি ঈশ্বর আর প্রকৃতি সংঘাতে অবতীর্ণ,
> যার জন্য প্রকৃতি এমন অশুভ স্বপ্ন বিস্তার করেন!
> যে-প্রকৃতি সমষ্টিরক্ষায় এতই যত্নশীল
> অথচ ব্যষ্টির সম্বন্ধে এমন উদাসীন?

আমি বিবেচনা করেছি সর্বকিছু, তাঁর কীর্তির
রহস্যসন্ধান করেছি সর্বত্র,
দেখেছি পঞ্চাশটি বীজ নিয়েও অনেক সময়ে
ফুটিয়েছেন একটিকে মাত্র।

যেখানে দৃঢ়পদে যেতে চাই, পা যায় কেঁপে,
জীবনের দায় জমে আর তার ভারে
লুটিয়ে পড়ি বিশ্বপৃথিবীর বেদীমূলে,
গড়িয়ে পড়ি অন্ধকারে, ঈশ্বরের দিকে যা বিস্তারিত।

বিশ্বাসের ভাঙা হাত বাড়াই, আঁকড়াতে চাই,
মুষ্টিতে ধরা পড়ে ধূলি আর আবর্জনা—
মনে হয়, সর্বময় প্রভু যেন আছেন তারই ভিতরে,
তখন অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগে বৃহত্তর আশার উদ্দেশে।

[Are God and Nature then at strife
That Nature sends such evil dreams?
So careful of the type she seems,
So careless of the single life?

That I, considering everywhere
Her secret meaning in her deeds
And finding that of fifty seeds
She often brings but one to bear.

I falter where I firmly trod,
And falling with my weight of cares
Upon the great world's altar stairs
That slope through darkness up to God.

I stretch lame hands of faith, and grope
And gather dust and chaff and call
To what I feel is Lord of all,
And faintly trust the larger hope.]

মানবের কম্পমান স্নায়ু বেদনার রূপ জানে। দুর্গা কী চোখে দেখেন তাকে? যেসব দেবতাকে মানুষ নিজেরা নির্মাণ করেছে, বিশ্বজীবনের একই বাণীকে

তাঁরা উচ্চারণ করবেন না। কিন্তু মানুষের প্রাণবাসনার কোনো কোনো দিক উপবাসী ও ব্যাহত থাকবেই, যদি না সেই দেবমূর্তিকে ভক্তের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী-রূপে কল্পনা করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই ঈশ্বরকে দেখার একজাতীয় পথ—প্রতিটি কাজ বা অনুভূতি যেখানে অসচেতন পূজা। ঈশ্বরই মানুষের সত্য স্বরূপ; এবং যদি আমরা প্রেমের জন্য, সহানুভূতির জন্য, উৎসাহ বা সান্ত্বনার জন্য আতুর হই, মানুষের মধ্যে সে জিনিস আমরা পাব না—যদিও মানুষের মধ্যেই হয়ত সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে থাকে আমাদের আর্তনাদ। সুতরাং ঈশ্বরের মূর্তিনির্মাণের কালে এইসব ক্ষুধার্ত মানবপ্রাণের প্রতি আঘাত করা সম্ভব নয়। তার বাসনাকে চরিতার্থ করা যায়—করতেই হয়। দুর্গা কি তা করতে পারেন?

যদি না পারেন, যদি সেই বিরাট বিশ্বশক্তি আমাদের আনন্দ-বেদনায় নির্বিকার থাকেন,—তিনি মানবাত্মার মাতা হতে পারেন না।

জগদ্ধাত্রীর মধ্যে রক্ষয়িত্রীভাবের কিছু বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীর কাছেই—ভয়ঙ্করী, অগ্নিরসনা, অগ্নিবদনা, মৃত্যুশ্মশানের মধ্যে আসীনা যিনি—তাঁর কাছে আত্মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আর উচ্চারণ করে সেই পরম শব্দটি 'মাতা!'

শিশুদের কাছে, তাদের শৈশবের প্রয়োজন পূরণ করেই তিনি 'মাতা'। যিনি রক্ষা করেন, যাঁর কাছে আমরা আশ্রয় নিই, যিনি মানবসন্তানের কাছে বলেন, ঈশ্বরের কণ্ঠে : 'বাছা মোর, আমাকে খুশী করার জন্য তোমার অনেক কিছু জানার দরকার নেই, শুধু গভীরভাবে ভালবাসো আমায়',—সেই মাতা।

আর যদি তাঁর চারিপাশে এমন কিছু থাকে, যা বয়স্কের চোখে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হয়—শিশুদের চোখ কিন্তু সেদিকে রুদ্ধ থাকে, তারা সে রূপ দেখতে পায় না, তাদের জীবন এবং অভিজ্ঞতার পক্ষে বোধগম্য রূপটুকুই মাত্র তারা দেখে। প্রতীককে এই ভাবেই নানা জন নানা ভাবে দেখে।

আর, বয়স্ক মানুষের কাছে, তাদের প্রয়োজন অনুরূপে তিনি মাতা—যে মাতা 'রক্ষা' করেন না, কিন্তু বিজয়ী হবার মত শক্তিদান করেন, যে-মাতা আমাদের সর্বোচ্চ দানকে দাবি করেন, সন্তুষ্ট হন না তার অল্পে।

না, কালীর মধ্যে প্রতিটি ক্ষতের শুশ্রূষা নেই, প্রতিটি যাতনার উপর তিনি মধুবর্ষণ করেন না, সত্যের নগ্ন চেহারার সামনে চোখ বন্ধ করার ব্যাপার সেখানে নেই, কোনো একের রক্ষা-ব্যবস্থা নেই যাতে অন্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়! যদি তাই আমরা চাই—যে-পর্যন্ত আমরা তা চাইব, যে-পর্যন্ত আমরা শান্তির ছায়া কামনা করব আর অপরকে ঠেলে দেব বোঝা বইতে রৌদ্রতাপের মধ্যে, যে-পর্যন্ত আমরা পাওয়ার তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞ থাকতে চাইব, যে-পর্যন্ত আমরা আমাদের ভালবাসার মানুষদের ক্ষেত্রেও কাপুরুষের আচরণ করব—সে অবধি ঈশ্বরের মধ্যে কাপুরুষের পরিতৃপ্তিই চাইব, পাবও তাই।

কিন্তু যখন এ অবস্থাকে অতিক্রম করে যাব, তখন দেখব, উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ, সেইসঙ্গে বামহস্তে মৃত্যু। তখন বিশ্বের ধ্বংসক্ষণই হবে পরম

উপলব্ধির ক্ষণ। জীবন হবে উন্মাদনা ও কৃতজ্ঞতার মহাসঙ্গীত, কারণ চরম উৎসর্গ দাবি করা হয়েছে আমাদের কাছে।

[এইখানে নিবেদিতা স্বামীজীর *Kali the Mother* কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। মূল ইংরাজী রূপটি আর এখানে দেওয়া হল না, তবে পাণ্ডুলিপির মহামূল্য প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে]

ধর্ম, দেখা যাচ্ছে, সভ্য ভব্যের ব্যাপার নয়, তা মানুষের প্রাণের জিনিস। তাকে পরিস্রুত করতে গেলেই তার প্রাণবীর্য নষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রতি মানুষ যেন তার নিজস্ব আহার্য পায় ধর্ম থেকে। খ্রীস্টধর্ম থেকে দৃষ্টান্ত আমাকে দিতেই হয়। খ্রীস্টধর্ম যে, কিছু পরিমাণে স্থূলতা এবং কুসংস্কারকে রক্ষা করেছে, যা না থাকলে তা এমন সব জায়গায় পৌঁছেচে যেখানে যেতেই পারত না—এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

যে-মানুষ জীবন থেকে বর্বর ভোগের আনন্দ নিষ্কাশন করে, বস্তুর উপরের চেহারাটুকুই মাত্র দেখতে পায়, তারও পরিতৃপ্তির অধিকার আছে, এবং ঐসব প্রবৃত্তির প্রকাশ আছে এমন উপাসনা-পদ্ধতিও সে গ্রহণ করতে পারে। যে-মানুষ চিন্তা-রীতিতে উগ্র, জীবনবোধে স্পষ্ট কামনার অধীন, প্রাকৃতিক সংঘর্ষকে যে উপভোগ করে, এবং তার মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শক্তিমান—সে মানুষ নিজ অধিকারে ঈশ্বরকে দৈনন্দিন জীবনকামনার অনুরূপ উপাদানে অর্চনা করবে। অপরপক্ষে যে-মানুষ জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে করুণাপূর্ণ, সে ঈশ্বরকে দেখবে সর্বাশ্রয়রূপে, স্নেহময়ী, করুণাময়ী বিশ্বজননী রূপে। মাতার করুণাঘন ক্রন্দনকে সে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করবে পৃথিবীর পটে : 'হে মানব, মানবগণ! তোমরা ঈশ্বরদূতদের মেরেছ, পাথর ছুঁড়েছ প্রেরিত পুরুষদের উপরে, কতবার আমি তোমাদের সন্তানদের একত্র করেছি আমার পক্ষপুটে, যেমন মুরগী-মাতা করে থাকে তার বাচ্ছাদের,—তবু তোমরা পরিবর্তিত হওনি!'

কিন্তু মানবচৈতন্যের যাত্রা সমাপ্ত হচ্ছে না এইখানেই। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর—দৃশ্য বস্তুর ধ্বংসের—বীভৎসতা বা আতঙ্কের—অর্থ কি? অগ্নিদাহ, হত্যা ও অন্ধ নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ঐশী শক্তির প্রেম ও মুক্তিবাণী আমাদের নিকট বাহিত হয়ে আসে না কি? যে মানুষের কাছে একদা ধর্মের মহাবাণী ছিল : 'বাছা, আমাকে খুশী করবার জন্য তোমার অনেক কিছু জানার প্রয়োজন নেই, শুধু গভীরভাবে ভালোবাসো আমাকে; মা যখন তোমাকে কোলে তুলে নেন, তখন যেভাবে তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলো, সেইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো,'—সেই একই মানুষ এখন প্রতিটি কথা, কাজ ও চিন্তার দ্বারা বলতে পারবেন : 'যদিও মারছ আমাকে, তবু বিশ্বাস করি তোমাকে।'

তারপরে অতি দূর, অনন্ত দূর কোনো কালে যখন দ্বৈতত্বের বোধ চলে গিয়েছে, যখন পৃথক ঈশ্বরবোধ পর্যন্ত অবলুপ্ত, তখন হয়ত অন্যবিধ অভিজ্ঞতার অবতরণ ঘটবে, যার বিষয়ে আচার্যদেব বলেছেন : 'শবরূপী ঈশ্বরের বুকের উপরেই আনন্দময়ী মাতার দিব্য নৃত্য।'

একটি শিশু যেখানে সবসময় ব্যস্ত তার মহাসম্পত্তিগুলির গণনায়, সেখানে বয়স্ক মানুষ ব্যাপৃত থাকে উচ্চতর গণিতের সত্য নির্ণয়ে, যেখান থেকে সে মানসিক বৃত্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত হয় ঊর্ধ্বতর সত্যের জগতে,—তেমনি এখানেও প্রারম্ভিক প্রতীক শেষতম প্রতীকের মতই গুরুত্বপূর্ণ, সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়। শেষ স্তরে শিশুর গণনার মূল্য নেই, তবু গণিত থাকতেই পারত না তার ঐ গণনা না থাকলে। সুতরাং উপাসনাকে মাটিতেই পা রেখে দাঁড়াতে হবে, যদি স্বর্গে ছোঁয়াতে হয় তার মাথা। প্রতি স্তরেই আমরা এমন কিছু উপলব্ধি করি, যা থেকে যায় আমাদের সঙ্গে চিরদিন। **মায়ের সন্তানদের কাছে সকল মানুষই ভাই ভাই।** বিচ্ছেদ নয়, পার্থক্য নয়—সকলেরই এক মা। মানুষের মুখে তাঁরই বাণী, মানুষের হাতে তাঁরই বাহু, তার চোখে তাঁরই প্রেমদৃষ্টি, —মানুষের দায়িত্ব তাই মানুষের চির সেবা। ব্যক্তিমুক্তির কী প্রয়োজন যদি ঈশ্বর, অনন্ত ঈশ্বর, প্রেম ও সেবা আহ্বান করেন?

বস্তু-সত্য কী বিরাট! অনুভব করি আমরা। শুধু সুন্দর, সহজ, মধুর কোমলকে বিশ্বাস করা, পূজা করার চেয়ে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে? আমরা যেন স্বেচ্ছায়, সানন্দে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারি রূঢ় কঠিনের, বীভৎসের, ভয়ঙ্করের।

ঈশ্বর জীবন দিয়েছেন—সত্য। কিন্তু নিহন্তাও তিনি।

ঈশ্বর কালাতীত নিত্য,—এই ভাবের সঙ্গে জেগে ওঠে নাকি মহাকালের কৃষ্ণ-চ্ছায়া, যার শুরু ও শেষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে?

সুখের পরিবেশে জন্মেছি আমি। তিনিই তা দিয়েছেন। একই কথা বলার সাহস থাকে কি যখন অপরকে ক্লেশ, যাতনা আর দায়িত্বভার দেন? সেইজন্য, তাঁর ধ্বংস-লীলার মধ্যে কি তাঁকে অর্চনা করব না—সেই শ্মশানই কি একমাত্র স্থান নয় যেখানে নতজানু হয়ে আমরা বলতে পারি—মা, মাগো!

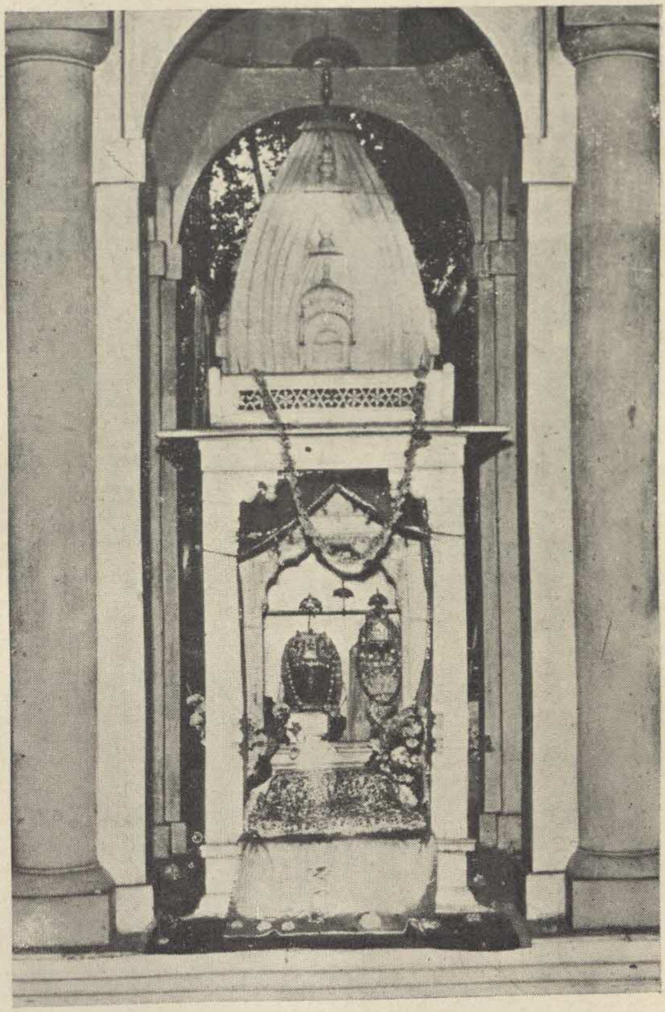
এর সঙ্গে অন্য ভাবেরও সংযোগ আছে, যা এর মধ্যে, বা এর পারে আমাদের চালিত করে। 'যদি তোমার হাত বা পা অসদাচরণ করে, কেটে ফেল তাদের। পঙ্গু, অঙ্গহীন হয়েও পৃথিবীতে আসা ভাল—অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই হস্ত-পদের চেয়েও।' যিনিই সত্যের দেবতা তিনিই বলির দেবতা। শেষ কথা, মাতৃ-উপাসনার মহাগৌরব হল—**পৌরুষ** দেয় তা। যুগে যুগে কালী ভারতকে **মানুষ** দিয়েছেন। প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, শিখেরা—এঁদের দিয়েছেন তিনি। যদি বাংলা দেশ, মাতৃপূজার এই আদিপীঠ, মাতৃসাধকদের এই জন্মভূমি—মাতৃপূজা ত্যাগ করে, তাহলে নিজ পৌরুষকেই ত্যাগ করবে। প্রাচীন পূজাকে দশ গুণ বেশী ভক্তির সঙ্গে এখন করতে হবে,—না করলে এ দেশের চির দুর্দশা ও অপমান।

বিস্তারিতভাবে না হলেও মনে হয় আমি কথাপ্রসঙ্গে কালীপূজার বিরুদ্ধে উত্থাপিত তিনটি অভিযোগের বিষয়ে বলেছি :

(১) এটি প্রতিমা পূজা;

(২) প্রতিমাটি আকারে বীভৎস;

(৩) এই পূজায় পশুবলি দেওয়ার দরকার হয়।



ক্ষীরভবানীর মন্দির ও মূর্তি। এখানে স্বামীজীর দিব্য মাতৃভাবের কথা নিবেদিতা চিরদিন মনে রেখেছিলেন।—গ্রন্থের ৩৯-৪৪, ২৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

HOW A CULTURED ENGLISH LADY BECAME A HINDOO.

We are so accustomed to think that missionary work in India can only operate in one direction, namely, that Indians become Christians, that when we hear of a Christian becoming a Hindoo, we are more than astonished —we can hardly credit the fact. Yet such a conversion has recently taken place. Miss Margaret Noble, an English lady of remarkable intellectual gifts, has voluntarily and from conviction embraced Hinduism, and now lives the life of an Indian lady in Calcutta. She has been admitted to the Order of Ramakrishna, and is known in that Order as Sister Nivedita. She wears a somewhat monastic-looking dress of white serge, which falls in long loose folds, and is drawn in at the waist by a cord; at her side, too, hangs a rosary, but here the monastic resemblance ends, for she does not live a merely contemplative life in a convent; she devotes her days to the service of her fellow creatures.

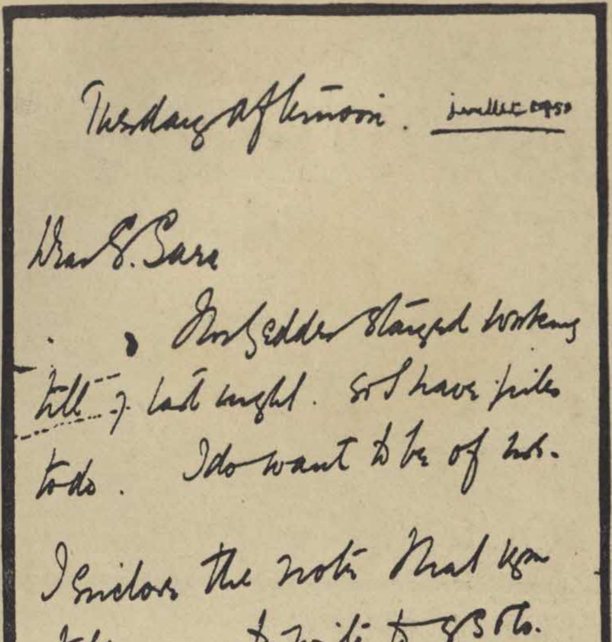
The story of her change of faith is simple. Born in England, Miss Noble, received up to the age of eighteen the ordinary education of an English girl; to her warm and fervid nature religion, especially the self-sacrifice of Christ, appealed very strongly. Her brilliant intellectual gifts brought her into notice in educational circles, and she was appointed to high and responsible positions. But with years came religious doubts, and she became the prey of torturing uncertainty. She sought as a panacea the study of natural science, and, to her mind, the great laws of the universe seemed more consistent than the principles of Christianity. The influence which came to her almost as a revelation, was that of a great Hindoo teacher, the Swami Vivekananda. Of this noble and spiritually-minded man I can only say that he is regarded with the deepest veneration throughout India. He lived the life of ancient tradition in the East; luxury had no attraction for him, the garb of a beggar and the needs of humanity, but especially of his own people, were more to him than material possessions. Heedless, as he said, of money, of women, and of fame, his aim was to make men worthy and noble. This powerful teacher died recently, and Sister Nivedita's appreciation of him and the significance of his work is one of the most touching tributes one can read to the memory of a great man. He was the representative of Hinduism at the Parliament of Religions held at the Chicago Exhibition some years ago, and such was the charm of his personality that many occidental friends would fain have kept him in the West; but India had his heart and to India he returned; a true patriot, "his whole heart and soul," says his enthusiastic disciple, "was a burning epic of his country; he was touched to an overflow of mystic passion by the very mention of India's name." He taught no creed; told no personal story, nor made an individual claim; but the hopes and fears of his countrymen were poured into his sympathetic ear, and in India to-day, deep in her heart, the Teacher is not forgotten.



Miss Margaret Noble.

This was the teacher who eventually brought rest to the perturbed soul of Miss Noble. Acting on his advice, she went to India, to study life and religion in that country. She did not join Anglo-Indian circles, but took up the life of a Hindoo lady in Calcutta. Being unmarried, she ranked as a widow; and it was with eyes desirous of looking beneath the outward aspect of Indian home life—that aspect which strikes Europeans as so strange, dull, and monotonous — and with the sympathetic mind of a student seeking the true meaning of what she saw, that Miss Noble made herself one with the secluded ladies of our Eastern dependency. She also occupied herself with the children, teaching them Kindergarten ways and leading them on to knowledge that makes strong without bias of Eastern or Western civilisation or religion.

In this way Miss Noble became imbued with Hinduism and Hindoo life; and there is no abler exponent of either the religion or life than she is. It was as a Christian that she was admitted to the Order of Ramakrishna, an Order which knows no religious distinction, but demands the dedication of its members to the good of humanity. After spending some considerable time in India, Sister Nivedita, as she likes to be called, went to America and then returned to England. She lectured constantly on her experiences in India, and presented a very different view of woman's position in that country from that popularly accepted in the West.


Tuesday afternoon. juillet

Dear S. Sara

Mrs. Geddes stayed working till ... last night. So I have piles to do. I do want to be of use.

I enclose the note that you told me to write to E.S. Ro.

Ly. Betty approves of the dedication. Vireshwar is Swami's real name. It is the name of the Siva in Benares to whom his mother prayed. Very few people know this

'কালী দি মাদার' গ্রন্থ 'বীরেশ্বর'কে উৎসর্গ করা। বাইরে থেকে মনে হয় বীরেশ্বর-শিবকেই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে, বিশেষতঃ বইয়ের বিষয় যখন কালী। নিবেদিতা কিন্তু 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে'ই উৎসর্গ করেছিলেন, যদিও সেকথা ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় লেখা হয়েছিল বলে বিরক্ত হয়েছিলেন। মিসেস বুলকে লেখা এই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মধ্যে নিবেদিতার স্বীকারোক্তি পাই—

"Ly. Betty approves of the dedication. *Vireshwar* is Swami's real name. It is the name of the Siva in Beneras, to whom his mother prayed. Very few people know this. . . . ."

—গ্রন্থের ৩৫২-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আদ্যাশক্তি কালীর সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক কিছু অবিস্মরণীয় কথা স্বামীজীর নিজের মুখ থেকে শুনে নিবেদিতা অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অধ্যাত্মরাজ্যের সেই গোপন দলিলটিকে আমরা প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

S. Do you remember the man who said "I believe in God & the angels & rest in nothing else".

K. Was it about "loafing about the Throne"?

S. Yes — a darned sight better business than loafing about the Throne".

Well. that's my position. I believe in Brahman & the Gods — & rest in nothing else."

They have put me down to preside at ye. lecture. But I shall not go, unless I am perfectly well. & must tell you plainly that I don't expect to be that. It will be awfully hot. & Sch. will not stand my excitement. For we have been Kali worshippers for centuries. Every bit of that place is holy time. Even the very blood on the ground is holy. Every drop of it. I cd. lick it all up out of reverence.

But I have given strict orders about ye lecture. There are to be no chairs. Everyone is to sit on the floor of the theatre at ye. feet. And all shoes shall are to be taken off. If Europeans & Brahmos are present you may have to insist on this yourself. You will be on the steps with a few of the greatest.

How hard to take Kali & all Her ways. That was my 6 years' fight. because I wd. not accept Kali

S. Do you remember the man who said, "I believe in God and the angels and not in nothin' else"?

N. Was it about "loafin' about the [. . . .]

S. Yes, "a damned sight better business than loafin' about the [. . . .]".

Well, that's my position. I believe in Brahman and the gods, and not in nothin' else.

They have put me down to preside at yr. lecture. But I shall not go unless I am perfectly well, and I must tell you plainly that I don't expect to be that. It will be awfully hot, and I could not restrain my excitement, for we have been Kali worshippers for centuries and every bit of that place is holy to me. Even the very blood on the ground is holy. Every drop of it. I could lick it all up out of reverence.

But I have given strict orders about your lecture. There are to be no chairs. Everyone is to sit on the floor of the theatre at Yr. feet. And all shoes and hats are to be taken off. If Europeans and Bhahmos are present you may have to insist on this yourself. *You* will be on the steps with a few of the guests.

How I used to hate Kali and all Her ways. *That* was my 6 year's fight, because I would not accept Kali.

N. But now you have accepted Kali fully, have you not, Swami?

S. I had to. Ramakrishna Paramahamsa dedicated me to Her. And you know I believe that She guides me in every little thing I do, and just does what She likes with me.

But I fought so long.. I loved the man you see, and that held me. I thought him the purest man I had ever seen, & I knew that he loved me as my own father & mother had not power to do.

N. But when you doubted so long, with all your chances, what wonder if Brahmos still doubt!

S. Yes, but they never saw that marvellous purity in him that I saw! . . . Also not the love.

N. But I fancy it was His realisation that made the love hold you without failing — was it not?

S. His realisation had not dawned on me then. That was afterwards, when I had given in. At that time I thought him simply a brain-sick baby.

N. But now you have accepted Her specially, have you not, Swami?

S. I had to. Ramakrishna Paramahamsa dedicated me to Her. And you know I believe that she guides me in every little thing I do, and just does what She likes with me.

Yet I fought so long. I loved the man, you see, and that held me. I thought him the purest man I had ever seen, and I knew that he loved me as my own father and mother had not power to do.

N. But when you doubted so long, with all yr. chances, what wonder if Brahmos still doubt?

S. Yes, but they never saw that immense purity in Him that I saw! . . . . . nor got the love.

N. But I fancy it was His greatness that made the love hold you without palling. Wastn't it?

S. His greatness had not dawned on me then. That was afterwards, when I had given in. At that time I thought Him simply a brain-sick baby,

always seeing visions & things. I hated it. & then I had to accept her too

N. Won't you tell me what made you do that Sw.? What broke all your opposition down?

S. No that will die with me. I had great misgivings at that time you know. My father died & so on. And she saw the opportunity to make a slave of me. "They was the very words — "To make a slave of you". And R. P. made me over to her......
Curious, He only lived 2 years after doing that & most of that time He was suffering. He was only 6 months in His own health & brightness.

Guru Govind Singh (or Nanuk?) was like that, you know, looking for the one disciple to give his power to — And he passed over all his own family. His Children were as nothing to him. Till he came upon the boy & gave it to him, & then he cd. die.

N. I always look upon Sri R.K. as Incarnation of Kali. Is it that what the Future will call Him?

always seeing visions and things. I hated it. And then *I* had to accept Her too!

N. Won't you till me what made you do that Sw.? What broke all your opposition down?

S. No, that will die with me. I had great misfortunes at that time you know. My father died, and so on. And she saw Her opportunity to make a slave of me. They were Her very words: "To make a slave of you." And R. P. (Ramakrishna Paramahamsa) made me over to Her. . . . . Curious, He only lived 2 years after doing that, and most of that time He was suffering. He was only 6 months in His own health and brightness.

Guru Govind Sing (or names?) was like that, you know, looking for the one disciple to give his power to, and he passed over all his own family. His children were as nothing to him. Till he came upon the boy, and gave it to him, and then he could die.

N. I always look upon Sri R. K. as an Incarnation of Kali. Isn't that what the future will call Him?

S. Yes. I think there is no doubt that Kali walked up the bodies of Ramakr. & the Bra. Gods. You see [illegible] I cannot but believe that there is - somewhere - a Great Power that thinks of Itself as feminine and called Kali, & the Mother! . . . .
-- -- And I believe in Brahman too. - That there is nothing but Brahman Even[?]. - but you see it's always like that. It's the multitude of cells in the body that make up the person - the many brain-centres that produce the one consciousness.

N. Yes - always Unity in Complexity.

S. Just so! And why shd. it be different with Brahman? It is Brahman - the One - & yet it is the gods too.

And so you see I believe in Brah

S. Yes, I think there's no doubt that Kali worked up the body of Ramakr. for Her own ends. You see Margot I cannot *but believe* that there is, some where, a Great Power that thinks of itself as Feminine and called Kali, and the Mother!. . . . And I believe in Brahman, too,—that there is nothing but Brahman even,—but you see it's always like that. Its the multitude of cells in the body that make up the person—the *many* brain-centres that produce the one consciousness.

N. Yes, always Unity *in Complexity.*

S. Just so! And why should it be different with Brahman? It is Brahman— the One—and yet it is the gods too.

And so you see *I* believe in Brahman

& the "Gods and not in nothing else!"

But how she torments me sometimes. And then I go to her sometimes, & sing "If you don't give me so & so tomorrow, I'll throw you over, & preach Chaitanya", — and that thing always comes.

But these things must not be told to anyone — mind that.

M. You mean these are not arguments for the world to hear?

"Never!" said Swami —

Going away.

and the gods and not in nothin' else!

But how She torments me sometimes! And then I go to Her sometimes, and say, "If you don't give me so and so tomorrow, I will throw you over and preach Chaitanya" and that thing always comes.

But these things must never be told to anyone, mind that.

N. You mean they are not arguments for the world to hear?

"Never!" Said Swami, going away.

KALI-WORSHIP

A LECTURE DELIVERED BY

MISS MARGARET NOBLE

(Sister-Nivedita of the Rama Krishna Mission).

AT THE KALI'S TEMPLE AT KALIGHAT

On the 28th May, 1899.

PUBLISHED BY
HARIDAS HALDAR,
PRIEST TO HIS HIGHNESS THE MAHARAJAH OF JEYPORE (RAJPOTANAH) AT THE KALIGHAT TEMPLE.

Calcutta:
PRINTED AT THE "DIANA PRINTING WORKS"
2/1. KEDAR NATH BOSES LANE,
BHOWANIPORE.

1900

For free distribution.

২৮ মে, ১৮৯৯ তারিখে কালীঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণে নিবেদিতা তাঁর দ্বিতীয় কালী-বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তারই প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।—গ্রন্থের ৩৪৬-৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

THE WORLD: SUNDAY, APRIL 1, 1900.

YOUNG ENGLISH GIRL WORSHIPS IMAGES.

Miss Noble Renounces Wealth and Society to Become Nun in a Hindu Order.

> From the Unreal lead us to the Real; from Darkness lead us unto light; from Death lead us unto Immortality. Reach us through ourselves and evermore protect us. O Thou Terrible One, from ignorance, by Thy sweet, compassionate face'—Miss Margaret Noble's (Sister Nivedtina) substitute for the Lord's Prayer.

On the limited train that left New York for Chicago yesterday was a sweet-faced young woman clad in a strange garb. Around her was wrapped a long garment of gray woollen stuff, with loose Cassock sleeves, half dress and half robe, held in at the waist by a simple girdle. It was the dress of an Indian devotee. She was Miss Margaret Noble, a wealthy Englishwoman, who has been converted to the weird beliefs of the Far East.

She believes in Kali worship—the bowing down before the image of a black woman dancing on the body of a white man. Her faith in reincarnation is supreme; the prayer to the goddess Shivna she thinks is far superior to the Lord's prayer. She holds that the Supreme Being should be typified by motherhood, rather than by fatherhood, which is the essence of Kali worship. She holds very dear all the mysticisms of the Orient—yet she still clings, she says, to her Christianity.

In the Order of Rankrishna.

Miss Noble is now Sister Nivedtina. She has been initiated into the mysteries of the Hindu order of Rankrishna. There are only two other persons of foreign birth within its ranks, an English officer and his wife.

Sister Nivedtina was in New York a week, and stayed with her friends, Mr. and Mrs. Francis H. Leggett, at their beautiful home, No. 21 West Thirty-fourth street. On Thursday evening she gave a talk there on "The Message of India" to about twenty society people, who were vastly interested in this extraordinary young woman who has renounced the pleasures of money and of society to join a mystic order of Hindus.

"I have renounced the English world," said sister Nivedtina to a World reporter, who saw her just before she left. "I will spend the rest of my life in India. It is far more satisfying than the crude West. I am an Indian nun now, for I have taken the three vows—never to marry, never to possess anything, always to obey.

"Our monastery and nunnery are at Belur, just outside of Calcutta. The head of the order is Swami Vivekananda, an intellectual Hindu. We have no objections to Christianity. In fact, I am still a member of the Established Church, but our order goes farther. We believe in letting each soul choose its own religion and work out its own destiny. We have parted company with creeds.

Not Understood by Masses.

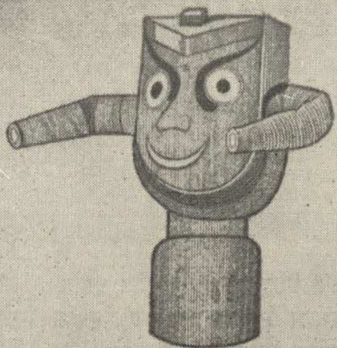
"Kali worship is opposed by the missionaries very strongly, but I believe in it. The image may be grotesque, but the symbolism of motherhood rather than fatherhood in the Supreme Being is one of great dignity. Unfortunately the masses can't understand this.

"We put no intellectual limitations on religion. We accept no authority. We believe in any thing we like. The Hindus say that if we were able to walk to the sun and take a photograph at every step, all would be different, but all would be true. So it is with religions. All may be true, but different."

Miss Noble left England for India eighteen months ago and spent her time between living in the squalid native quarters of Calcutta and in travelling in Northern India. She is in America to publish a book and to raise funds for an educational movement in India which purposes teaching girls manual training, in order that they may [illegible] support themselves.

[পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

'পুতুলপূজা করেন, এমন ইংরাজ তরুণী' সম্বন্ধে আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ বিবরণীকে যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তথ্যানুগ বলতে হবে!! এই বিবরণে যদি মিস নোবল 'ধনী ইংরাজ মহিলা' হন, এবং তাঁর নতুন নাম হয় 'নিভেদ্‌তিনা'—সেটা সংবাদপত্রের পক্ষে কিছু মারাত্মক ভুল নয়। সংবাদপত্রটি স্বভাবতঃই তাঁর 'বিচিত্র পোষাকে'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল, যিনি 'স্থূল-রুচি পাশ্চাত্ত্য দেশ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে বসবাস করতে গেছেন 'দূর প্রাচ্যের অলৌকিক রহস্যময় ধর্মে' বিশ্বাসী হয়ে। মিস নোবল অবশ্য তাঁর খ্রীস্টান মত ত্যাগ করেননি, কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা 'ইনটেলেকচুয়াল হিন্দু' স্বামী বিবেকানন্দ খ্রীস্টান ধর্মের বিরোধী নন। তাহলেও মিস নোবল বিশেষভাবে ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপাসক, অর্থাৎ তিনি কালীমূর্তির সামনে প্রণত হন, যে-কালী মূর্তি আর কিছু নয়, এক শাদা পুরুষের বুকের উপর এক ঘন কালো নারীর নৃত্য। 'নিভেদ্‌তিনা' অবশ্য স্বীকার করেন যে, সর্বসাধারণে এই মূর্তির রহস্য বুঝতে অসমর্থ ইত্যাদি।—গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



It is fully described as "exceedingly ugly, the most hideous caricature of the human face divine."*

The following is a native representation of Kali, the goddess from which Calcutta takes its name :



* In the *Antiquities of Orissa*, Vol. II., pp. 121-123, a full account is given of the image.

ক্রীশ্চান মিশনারীরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কি জাতীয় কুৎসা প্রচার করত, তার নমুনা। এ ধরনের বইয়ের লেখক হিসাবে বিখ্যাত ডঃ মার্ডকস্-এর বিবেকানন্দ-বিষয়ক একটি পুস্তিকা থেকে ঐ ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে। উপরের ছবিতে জগন্নাথের রূপার্চনা করা হয়েছে। তার নীচে কালীর মুদ্রিত ছবিটি ভাল করে লক্ষ্য করলে কিছু মিশনারী-কৌশল বোঝা যাবে। হিন্দুরা মূর্তি-নির্মাণের সময়ে যে, কিছু আলঙ্কারিক রীতিকে মান্য করে, তাকে একেবারে মুছে দিয়ে কালীর পদতলে শয়ান শিবকে দাড়ি-গোঁফওলা এক প্রৌঢ় হিন্দু দাঁড় করানো হয়েছে, যার ফলে এইসব গ্রন্থের সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য পাঠকেরা মনে করেছেন—"কালী বাস্তব এক নারী, যে নিজের স্বামীকে খুন করেছে।"—গ্রন্থের ৩০১-৩১২, ৩২৯, ৩৪১-৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মনে হয়, এইসব প্রশ্ন এখানে ত্যাগ করাই উচিত; ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রশ্নের আলোচনাতেই এগুলি আসতে পারে।

মনে রাখা ভাল, আমরা সত্যের সন্ধানী; কোনো দলের জয়লোভী নই। আরও মনে রাখা ভাল, কালীপূজার দোষদর্শনে তিনিই অধিকারী যিনি তা 'অর্জন' করেছেন কালীপূজার সবকিছু জানার ও তার থেকে সবকিছু পাবার পরে।

সে অধিকার যে মানুষটির ছিল, তিনি কিন্তু কোনো দোষ দেখেন নি। অপরপক্ষে জগন্মাতার নামে যে-বাণী উচ্চারণ করেছেন তা আজ ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে, নানা জাতির মানুষকে আকর্ষণ করে আনছে মায়েরই পদতলে।

যে অনন্ত অখণ্ড পরাচৈতন্যের কাছে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অলীক বলে প্রতীয়মান হয়, বেদান্তে তা-ই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত, এবং যে শক্তি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ রূপে ব্যক্ত হয়, তার নাম 'মায়া'। তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করার উপযুক্ত স্থান এ নয়, কিন্তু মায়া তত্ত্বটি কি তা বলার প্রয়োজন আছে। অনন্ত ও পরমকে সংজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না, আপেক্ষিক সম্বন্ধে আনা যায় না, বা অংশে ভাগ করা যায় না। যদি কোনো বস্তুকে অপর বস্তুর মত দেখায়, যা আসলে তা নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, তখন আমরা বলি দৃষ্টি-মায়া। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ক্ষেত্রে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের এই ধরনের অসংখ্য বর্ণময় লীলাচাতুরী ঘটে। ব্রহ্ম যদি চিরসত্য হন, তাহলে বস্তুজগৎ বিশ্বজগৎ মায়ার লীলা ছাড়া কিছু নয়।

প্রাচীন ঋষিরা এই মায়াকে প্রতীকরূপ দিতে চেয়েছেন, তাকে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ করেছেন কালীমূর্তিতে।

হিন্দুদের তথাকথিত পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, পৃথিবীর সকল সাধকই শব্দ-প্রতিমা ব্যবহার করেন, হিন্দু ঋষিরা তার অতিরিক্ত স্পষ্ট মাতৃমূর্তি রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বোঝার সুবিধার জন্য, তার ফলেই তাঁদের মধ্যে প্রতিমাপূজার চলন।

কালীমূর্তি কি, এখন দেখা যাক।

তিনি যে ভয়াল, ভয়ঙ্করী, প্রথমেই চোখে পড়ে। তিনি উলঙ্গিনী। স্বামী-বক্ষে নৃত্যপরা। কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা। সদ্য নিহতদের তপ্ত রক্তপানে ব্যাদিত রসনা। খড়্গধারিণী; নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমধ্যে এবং ভূতপ্রেত পিশাচদলের মধ্যে বিরাজমানা। সর্বনাশা মেঘপুঞ্জের মতই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। মুক্তকেশ ছড়িয়ে আছে পদতলে। হা-হা হাসিতে লজ্জা পায় বজ্রধ্বনি। তিনি স্বয়ং ত্রাস।

এই কি তরুণী হিন্দুনারীর ছবি? হিন্দু নারীর স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তিনি এতই মাধুর্যময়ী, লজ্জাশীলা, সংকুচিতা, সর্বদা সর্বাঙ্গে আবৃতা, কম্র কোমল প্রেমময়ী মাতা। কালী এই হিন্দু নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিচ্ছবি।

ঠিক সেইভাবেই ঋষিরা তাঁকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন; আর আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা সফল হয়েছেন। তাঁদের নির্মিত কালীমূর্তির চেয়ে অ-নারীজনোচিত, বিশেষতঃ অ-হিন্দুজনোচিত আর কিছু হতে পারে না।

ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যেমন সর্প ভিন্ন রজ্জুতে সর্পবোধ

সম্ভব নয়, কিংবা জল ভিন্ন বুদ্‌বুদ্। সুতরাং হিন্দুরমণী, সনাতনী নারীপ্রকৃতির নমুনা যিনি, স্বামী ভিন্ন তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মায়া দেখালেন কী?—সর্বদা পিছনে থেকে নিজের আদর্শ ভূমিকা পালন করে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি ব্রহ্মকে অধিকার করেছেন, আচ্ছন্ন করেছেন, নিজেকে প্রকাশ করেছেন অগণ্য ভয়ংকর নারীত্ব-বিরোধী, মাতৃত্ব-বিরোধী উপায়ে। অনন্ত, অম্লান, তরঙ্গোৎফুল্ল অমৃতসমুদ্রের পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি আপেক্ষিক জগতের বহুধাব্যক্ত রূপকে, পাচ্ছি দুঃখ ও মৃত্যুর অশান্ত ক্রন্দনকে, আত্মসংরক্ষণের উন্মত্ত সংগ্রামকে—যে সংগ্রাম নীহারিকা থেকে মানবজীবন পর্যন্ত সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়কে আকারিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। যদি আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা না করি, স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে না থাকি, আমরা কখনই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সকল পর্যায়ের মধ্যে বিস্তারিত, জীবনের অগ্রগতির নিয়ামক ঐ নীতিটিকে অস্বীকার করতে পারব না, যার নাম—আত্ম-সংরক্ষণের সংগ্রাম। এবং, কালীদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আতিশয্যপূর্ণ কিংবা অতিরঞ্জিত মনে হবে না, যদি তাঁকে আপেক্ষিক জীবনের এই মৌল নীতির স্পষ্ট প্রতিমারূপে দেখা হয়।

কালীমূর্তির এই ব্যাখ্যা শোনার পরে মনে প্রথম যে জিজ্ঞাসা জাগবে, তা হল—যদি কালী এমনই হন, তাঁকে পূজা করা কেন? তিনি অন্ততঃ কোনোমতে পূজার্হ হতে পারেন না।

কিছু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই প্রশ্নের পিছনে রয়েছে উপাসনার মূল অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতারই প্রতিক্রিয়া। উপাসনার অর্থ, হিন্দুর কাছে, নিত্য স্মরণ মনন।

তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে মোক্ষলাভের পক্ষে—এই যে প্রতীয়মান জগৎ, যা তার অগণ্য ভয়ংকর রূপে আমাদের আতঙ্কিত করছে, তা আসলে মিথ্যা আকার ভিন্ন কিছু নয়, পিছনে আছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম,—এই বোধের মধ্যে নিত্য সঞ্জীবিত থাকা ছাড়া এ জগতে গুরুত্বপূর্ণ আর কি থাকতে পারে?

মায়া মিথ্যা, কালী তারই প্রতীক। কালীকে যদি আদর্শ হিন্দু নারী করে চিত্রিত করা হত, তাহলে তিনি সত্য হয়ে উঠতেন। তাঁর অবাস্তবতা দৃশ্যমান করবার জন্য—কালী নিজেই তাই করেছেন—তাঁকে আদর্শ না-নারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

শিবকে পদতলে তিনি আবৃত করে আছেন, নাচছেন শিবের বুকে, অন্যের মনোযোগ টেনে এনেছেন নিজের উপরে—যেমন মরীচিকা ঝলমল করে উঠে বিভ্রান্ত করে দৃষ্টিকে।

তাই কালীকে ভেদ করে দৃষ্টি প্রেরণ করতে হবে; তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, তাঁর উপাসনা ছাড়া গত্যন্তর কি? কোনো বই যদি কেউ মুখস্থ করতে চায়, সে কি সাদা কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে?

তাই আসল সাধক, যিনি তাঁর ভিতর দেখে তাঁকে জেনেছেন, তিনি শান্তভাবে তাঁর অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন; যেভাবে তিনি দেখান নিজেকে, সেভাবে তাঁকে না দেখে, দেখতে পেরেছেন আসল যা-তিনি, তাঁকে। ব্রহ্মের মধ্যেই তাঁর সত্তা অস্তিত্ব, যেমন জাগ্রত 'আমি' থেকেই স্বপ্নের 'আমি' উদ্ভূত। কোনো নির্দিষ্ট-

কালে স্বপ্ন যতই জীবন্ত সত্য বলে মনে হোক, জাগ্রত অবস্থায় তার অস্তিত্ব নেই। দ্রষ্টা বলেন, কালীকে যা মনে হয়, তা তিনি নন, যথার্থত কালী ও ব্রহ্ম এক। তিনি মোক্ষদায়িনী তারা, তিনি ব্রহ্মময়ী।

দিব্যসাধক রামপ্রসাদের চেয়ে কালীকে পূর্ণতরভাবে প্রকাশ করতে আর কেউ পারেন নি। প্রাণশক্তিতে, সহজতায়, গভীরতায় তাঁর মাতৃভাবের গানগুলির কোনো তুলনা নেই। আমরা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গানেরই মাত্র অনুবাদ এখানে শোনাতে পারব :

কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে পায় না দরশন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের বচন।
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।

[কথামৃত, পঞ্চম খণ্ড (পৃষ্ঠা ৩) থেকে এই পাঠ নেওয়া হয়েছে।]

Who knows what Kali is?
The six *darshanas* (system of philosophy)
have not obtained Her *darshana* (sight).
Kali as a swan, plays with the swan
in the lotus forest.
The Yogi always meditates on Her in the
Muladhara (the plexus underneath the
spinal chord) and in the *Sahasrara*
(that in the brain).
Kali is *Atma* (self) of the *Atmarama*
(enjoyer of the self);
Innumerable are the wonderful evidences
and administrations of Her.
Tara resides in all forms just as she pleases.
The universe is the Mother's womb—you know
what size it is.

The *Mahakal* understands her properly,
who else knows Her like Him?
The world laughs at Prasad's words,—
"crossing the ocean by swimming?"
My mind has grasped it—but not the *prana*.
This dwarf wants to touch the moon.

মন করো না দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসী।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দে'তোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

My mind, don't be intolerant.
I have looked and searched through the
Veda Agama and Purana ;
Kali, Krishna, Shiva, Rama—
my Elokeshi (she with dishevelled
hair) is all these.
She holds the horn as Shiva, and
plays on the flute as Krishna,
O Mother, you have a bow as Rama,
and a sword as Kali.
Prasad says, the attempt to demonstrate
Brahman is like the smile of the person
who has got big rows of teeth
always projecting out.
My Brahmamayi is in all forms and
at her feet are the Ganges, Gaya
and Kashi.

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥

ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্বঘটে।
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা॥

Would, O Tara, such a day come, when
streams will flow down my eyes with
my repeating Tara Tara?
The lotus inside the breast will blossom and
raise up its head and the darkness of
the mind shall vanish.
And I shall fall down on the earth, and be
inside myself with the name of Tara.
Then shall I be able to give up the questions
of distinction and non-distinction (or
duality and non-duality),
All wants of the mind will vanish.
O the Veda is true a hundred times—
my Tara is formless.
With the greatest happiness Ramaprasad
proclaims to the world that the Mother
resides in all forms,
Look O blind eyes, at the Mother,
She is the dispeller of darkness.

আমি জানি, কালীপূজার সঙ্গে নানা অশুচি পাশবিক রীতিনীতি এসে জুটেছে। সে সব বিষয়ে আমাদের দুঃখ যেমন অসীম, তেমনি অপরপক্ষে কালী-পূজার সবকিছুর বিরুদ্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যে উগ্র বিদ্রূপ করে থাকেন অনেক সময়, তার মধ্যে উচ্চ প্রজ্ঞার লক্ষণ দেখি না। আগাছাকে দূর করুন, কিন্তু দোহাই, বাগানকে নষ্ট করবেন না!

দ্বিতীয় কালী বক্তৃতার পটভূমিকা

নিবেদিতা কয়েক মাসের মধ্যে আর একটি কালী-বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা কালীঘাট মন্দিরপ্রাঙ্গণে হয় ২৮ মে, ১৮৯৯। অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতার পরেই, নিবেদিতার চিঠিতে দেখেছি, কালীঘাটের মন্দির-কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে কালীঘাটে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান এবং স্বামীজী কালীঘাট মন্দির-কর্তৃপক্ষের উদারতায় বিশেষ খুশী হয়েছিলেন; হিন্দুসমাজের 'গন্ডীবদ্ধতা' দূর হওয়ার লক্ষণ এর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন।

স্বামীজীর আনন্দের পিছনে ছিল একটি বেদনার ছায়া। সে তিক্ত ইতিহাস, হিন্দুসমাজের একাংশের নীচতার কাহিনী আমরা একদা এক প্রবন্ধে উন্মোচন করেছিলাম।* তার থেকে অল্প কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"আমেরিকা ও ইংলন্ড থেকে ধর্মপ্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ভারতবর্ষের উপর দিয়ে ভাবাবেগের মহাবন্যা বয়ে গিয়েছিল, এবং ভারতবর্ষ তাঁকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তখন পর্যন্ত ভারতের সেকালের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। দ্বিধাহীনভাবে একথা বলা যায়, রাজনৈতিক নেতা ছাড়া সেই বিপুল জনকল্লোল আর কারও পক্ষে ভারতের ইতিহাসে পরবর্তীকালেও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতীকরূপে, বিজয়ী বীরের মত বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন, যখন রাজা ও প্রজা সকলে আক্ষরিকভাবে তাঁর রথের রশি টানছে—তখন একথা সত্যই বিশ্বাস করানো কঠিন হবে, হিন্দুধর্মের এই শ্রেষ্ঠ আচার্যের মুখের সামনে কলকাতার একটি হিন্দু-মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—এবং সে মন্দির—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির!!!

পৃথিবীতে বহু অবিশ্বাস্য বস্তুকে চোখ রগড়ে, চোখের পাতা উপড়ে ফেলে সত্য বলে মানতে হয়, এখানেও তাই মানতে হবে; ঔচিত্য, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়নীতি প্রভৃতি বহু জিনিস ভুলতে হবে—ভুলতে হবে প্রথমেই, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ রূপেই পৃথিবীর তীর্থ, এবং তা যে 'পৃথিবীর তীর্থ', এই সত্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন পৃথিবীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দই।

তথাপি, বিবেকানন্দ যত বড়ই হোন, আইনের শক্তি তাঁর থেকে অনেক বড়, যে-আইনে নিজ সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ছিল পারিবারিক সম্পত্তি—সেই 'পারিবারিক দেবালয়ে' যে-কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করার অধিকার উক্ত পরিবারের অবশ্যই আছে। স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সেই অধিকারই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এবং পাঠক বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বিরুদ্ধে সেই অধিকার 'প্রায়' প্রযুক্ত হচ্ছিল!

---

*স্বামী বিবেকানন্দ ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির বিতর্ক : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ; কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩৭১।

কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর কাছে যাই হোন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ছিলেন 'ছোট ভট্চাজ্।' দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি এবং পরবর্তী মালিক মথুরামোহন বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবতাজ্ঞান করে, তাঁর জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু তা হলেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাতায় তাঁর মাসিক বরাদ্দ ছিল ৫্ টাকা (বেড়েছিল বা বদলেছিল কি?)—এবং ঐ মন্দিরের অনেকে সেই কথাটার উপরে সবিশেষ আস্থা রেখেছিল।

মথুরামোহনের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবায় পিতা বা মাতামহীর অনুগামী ছিলেন না, তা নানা প্রসঙ্গেই পাই। (মূল প্রবন্ধে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে।.তারপর—)

শ্রীরামকৃষ্ণের সামান্যতম ইচ্ছাপূরণে উদ্গ্রীব মথুরামোহনের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ 'রাগের মাথায়' হলেও শ্রীরামকৃষ্ণকে মন্দির ছেড়ে যেতে বলতে পারেন!—সেই মন্দির —যার অন্নভোগ হতেই পারত না শাস্ত্রমতে, যদি না শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য পক্ষে বিধান দিতেন, এবং যে-মন্দিরের দেবতার অঙ্গহানি দূর করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যার দেবীকে জাগ্রত করেছেন তিনিই!......

এই ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসই স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করতে দেননি। কারণ?—বিলেত যাওয়ার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আর হিন্দু নন। এই ত্রৈলোক্যনাথই শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বিরূপতা দেখিয়েছেন—কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণও যথেষ্ট হিন্দু থাকছিলেন না—তিনি বিলেতফেরত ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শুধু মেলামেশা করছিলেন না, তাঁর বাড়িতে আহার্য পর্যন্ত গ্রহণ করছিলেন। হিন্দুধর্মের শুদ্ধিরক্ষার যে দায়িত্ব ত্রৈলোক্যনাথ গ্রহণ করেছিলেন, তদনুযায়ী তিনি, কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও দক্ষিণেশ্বরের শূদ্র-মন্দিরে পৌরোহিত্য স্বীকারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে তিরস্কার করেছিলেন কি না জানি না—যে অনুচিত পৌরোহিত্যের জন্য, আমরা এটুকু জানি—শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ব্রাহ্মণসমাজে পতিত ছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধই শুধু হয়নি, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এসবই হয়েছিল নিবেদিতার ভারতে আগমনের অব্যবহিত আগে। বিবেকানন্দের প্রতি নিক্ষিপ্ত অপমানে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলই খুশী হয়েছিল। রক্ষণশীলেরা কেন খুশী, তার কারণ বোধগম্য—এই লোকটি প্রথমতঃ শূদ্র, অন্যায় করে সন্ন্যাসী হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী হয়েও গুহায় বাস না করে সমুদ্র ডিঙিয়েছে; তৃতীয়তঃ সমুদ্র লঙ্ঘনের মত মহা অপরাধ করেও লজ্জিত নয়, বরং সেই দুষ্কর্মটাকেই মুক্তিপথ বলে প্রচার করতে চায়; চতুর্থতঃ শুধু ম্লেচ্ছ-দেশে গিয়েছে তাই নয়—ম্লেচ্ছাহার করেও সেটা গোপন করে না; পঞ্চমতঃ, ম্লেচ্ছাহার তো করেই, আরও মারাত্মক, ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বসে আহার করে; ষষ্ঠতঃ, সবচেয়ে ভয়াবহ, এই ব্যক্তিত্বশালী নেতা-জাতীয় লোকটি এমন প্রভাববিস্তার করেছে যে, সাধারণ লোকে এর কথাকেই ধ্রুববাক্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছে। এত কারণ!! রক্ষণশীল আক্রোশ তাঁর সামাজিক অমর্যাদা করতে অসমর্থ হয়ে অন্ততঃ পারিবারিক অধিকার-সীমায় তাঁকে অপমানিত করতে পেরে পরিতুষ্ট হল।

কিন্তু কিছু প্রগতিশীলের এক্ষেত্রে আমোদের কারণ কি? অন্য কিছু নয়, তাঁদের প্রগতিশীলতার একচেটিয়া অধিকারে যে বিবেকানন্দ হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি আত্মশোধন করতে বলেছিলেন দেশকে, কিন্তু আত্মশোধনের নামে আত্মাবমাননা করতে নিষেধ করেছিলেন। অপরদিকে কিছু আত্মাবমাননা না থাকলে আর সংস্কারস্পৃহা জাগে না!

এ ব্যাপারে সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন খ্রীশ্চান মিশনারীগণ। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, বিবেকানন্দ তাঁদের প্রচারের সর্বনাশ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালেই তাঁর বিরুদ্ধে ভারতে (বলাই বাহুল্য ভারতের বাইরেও) তাঁরা যথেষ্ট কুৎসা করেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট অভিপ্রেত ফল হয়নি। তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন। বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের পরে জয়ধ্বনির ঝাপটে যখন তাঁদের অভিপ্রায়গুলি গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় উড়ছে, তখন সহসা সেই শূন্যে তাঁরা সৌধ দেখলেন—দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিবেকানন্দকে নাকি ভ্রষ্ট হিন্দুরূপে বিতাড়িত করা হয়েছে! এতো শুধু সুযোগ নয়—একেবারে সুবর্ণ সুযোগ—ওহ্ ক্রাইস্ট!! হিন্দুধর্মের আচার্যরূপে কীর্তিত মানুষটি হিন্দু মন্দির থেকে বিতাড়িত, জাতিচ্যুত, অসম্মানিত একটি লোক—বাহবা কী আনন্দ! কী অপূর্ব প্রচারসামগ্রী!! অবিলম্বে বিবেকানন্দের মূল বৈদেশিক কর্মক্ষেত্র আমেরিকায় সে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং আমেরিকার পত্রপত্রিকা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল মুখরোচক খবরে।

নিন্দা গ্লানি বিবেকানন্দ গায়ে মাখতেন না, মনে করতেন 'persecutions ছাড়া জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না', অপমানের ধূলিধূসর মহাদেবের মূর্তি নিয়ে তিনি পৃথিবীর পথে হেঁটেছেন, উপেক্ষা করতে চেয়েছেন পথের কাঁটাকে, তবু—তিনি যে ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারছেন না—এ ব্যথা বোধহয় তাঁর মন থেকে যায়নি। হয়ত ব্যাপারটাকে দার্শনিক ঔদাস্য নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন, দুঃখের কৌতুক ফুটে উঠেছে তাঁর কথায়*—তবু—শ্রীরামকৃষ্ণের চল্লিশ বছরের পবিত্র অস্তিত্বে পূর্ণ যে মন্দির—সেখানে তাঁর জন্মোৎসব নিষিদ্ধ! নরেন্দ্রনাথের যৌবনের জ্বলন্ত তপোবনে বিবেকানন্দ প্রবেশ করতে পারবেন না!

---

* স্বামীজী ই. টি. স্টার্ডিকে এক চিঠিতে লেখেন : "মিসেস জনসনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মুলারও আমাকে ছেড়ে গেছেন—ঐ রোগের জন্য। হয়ত তাঁরাই ঠিক। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য, এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক অজও তো দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয় তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যাণ্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করত। তারপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হল— তা না হলে তারা আমায় স্পর্শই করবে না। তারা আমায় যা খেতে দিত, তা না খেলে অদ্ভুত মনে করত—এমনি সব।" (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯)

এই পটভূমিকা—কালীঘাট মন্দির-কর্তৃপক্ষের উদারতায় স্বামীজী কেন আনন্দিত। নিবেদিতার ১৫ই মে, ১৮৯৯ তারিখের এক চিঠিতে পাচ্ছি, স্বামীজী ১৪ মে তারিখে কালীঘাট দেখে এসেছেন—

"গতকাল স্বামীজী এক আত্মীয়ের সঙ্গে কালীঘাটে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেখানে তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনা করেছিলেন। খুবই উল্লাসের কারণ।"*

হিন্দুসমাজের পক্ষে এই উদারতার রন্ধ্র-আলোক একদিকে, অন্যদিকে ব্রাহ্ম ও মিশনারী সম্প্রদায়ের পক্ষে জ্বালা, এই পরিস্থিতিতে নিবেদিতা তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কালী-ব্যাপারে বিচিত্র সব বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। যেমন, পরম হাস্যকর একটি (ঘটনাটি অবশ্য দ্বিতীয় কালী-বক্তৃতার পরে ঘটে) :

"বুধবার সন্ধ্যায় রাটারদের কাছে বিদায়ী ডিনারে গিয়েছিলাম। অবাক হলাম, অনেকগুলি মানুষ আমার চায়ের আসরে এসে হাজির। হিন্দুধর্মের পক্ষে বলতে বলা হল আমাকে। অবশ্যই বললাম। ডিনারের সময়ে পরদিন নিমন্ত্রণ, এইসব বন্ধুদের কাছ থেকে। যেতে পারিনি, কিন্তু খুব চমৎকার নয় কি! **এঁরা সব সময়ে ভেবেছেন, কালী বাস্তব একজন নারী, যে নিজ স্বামীকে খুন করেছে!**"

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

নিবেদিতার যোদ্ধৃস্বভাবের পরিচায়ক একটি ঘটনা (৭ ফেব্রুয়ারীর চিঠি) :

"মিঃ পাদশা ও মিস্ পাদশা গত বৃহস্পতিবার চায়ের সময়ে এসেছিলেন। স্বামীজীর পায়ের কাছে বসে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে শুনছিলেন। আমার দুর্গার পটটি স্বামীজীর হাতে ধরে আছে—তিনি কালীর দিকে সোজা এগোচ্ছেন—এমন সময়ে দুই মিশনারীর আবির্ভাব, আমার ইতিহাস-বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিতে

* কালীঘাট-মন্দিরে যাওয়ার আর একটি ঘটনার বিবরণ পাই স্বামি-শিষ্য-সংবাদে। ছেলেবয়সে স্বামীজীর এক বড় অসুখের সময়ে তাঁর মা কালীঘাটে বিশেষ পূজা দেওয়ার ও ছেলেকে নিয়ে সেখানে গড়াগড়ি দেওয়ার মানত করেন। সে মানতের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন; স্বামীজীর শেষজীবনে অসুখবিসুখের সময়ে তাঁর জননীর হঠাৎ ঐ মানতের কথা স্মরণ হয়, এবং স্বামীজীও মায়ের ইচ্ছার মর্যাদা রাখেন। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : "কালীঘাটে যাইয়া স্বামীজী কালী-গঙ্গায় স্নান করিয়া জননীর আদেশে আর্দ্রবস্ত্রে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সেই যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভীড় হইয়াছিল। শিষ্যের বন্ধু, কালীঘাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি শিষ্যের সহিত বহুবার স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, ঐ ঐ যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃ পুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সেদিন স্বামীজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু ঐ ঘটনা আজও বর্ণনা করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, ঘটনাটি শিষ্যকে পূর্বোক্তভাবে শুনাইয়া স্বামীজী পরিশেষে বলিলেন, "কালীঘাটে এখনো কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাতপ্রত্যাগত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোনই বাধা দেননি, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করার সাহায্য করেছিলেন।"

ও আরো বক্তৃতার অনুরোধ জানাতে। আগে আমি স্থির করেছিলাম, এইসব মহিলাদের কালীর কথা বা মতভেদের বিষয়গুলির কথা জানার দরকার নেই—কিন্তু ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে তখন, এবং আমার লড়ায়ে স্বভাবের যা ধর্ম, স্বামীজীকে যেতেও দিলাম না, বিষয় বদলাতেও দিলাম না। তাঁকে প্রসঙ্গটি শেষ করতে হলই, যদিও দ্রুত তা করলেন, এবং তারপরে আমি কালীর প্রতি কিছু ভালবাসা ও স্তুতি-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম। তবু তারা আমার ইতিহাস-ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে পূর্বের মতই উৎসুক রইল!!!!"

এসব বহিরঙ্গ ব্যাপার—ইতিমধ্যে আর একটি রহস্যময় আত্ম-উন্মোচন ঘটল—স্বামীজীর বিরল আত্মপ্রকাশের একটি, যার রহস্যটুকু নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধায় হৃদয়মধ্যে রক্ষা করেছেন, প্রকাশ করেছিলেন আংশিকভাবে—আমাদের পরম সৌভাগ্য তার সবটুকু অংশ আজ আমাদের গোচর। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা কিছু অংশ আছে, যা যুক্তির শৃঙ্খলায় ধরা দেয় না, লীলার পাখায় ভাসে, ভাবের গভীরে ডোবে, এবং মিস্টিক-ব্যাপারের দৃষ্টান্তরূপে পরবর্তীকালের কাছে বর্তমান থাকে। বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজীবনের গহনে এই চকিত আলোকপাত আবার অধিকভাবে লক্ষণীয়, কারণ নিজ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তিতে তাঁর আত্মশাসনের সীমা ছিল না।

২৮ মে রবিবার কালীঘাটে বক্তৃতার দিন স্থির হয়েছিল। শূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল নিবেদিতার মন, নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন—বক্তৃতার ঠিক আগের দিন সকালে ৬টার সময়ে স্বামীজী সহসা হাজির। তারপর—নিবেদিতা ২৮ মে'র চিঠিতে লিখেছেন—

> "স্বয়ং জগন্মাতা স্বামীজীকে পাঠিয়েছিলেন কথা বলতে। আমি একেবারে অথৈ জলে ছিলাম।......তিনি সেই সব-হারানো মনোভাব থেকে আমাকে বিরাট শক্তিতে তুলে ধরলেন—সেই সঙ্গে এমনই অপার্থিব পবিত্রতা এবং আমার প্রতি ঘনীভূত বিশ্বাস যে, সেকথা লিখতে যাওয়াও যেন অন্যায় মনে হচ্ছে! **কিন্তু ভয় পাই, পাছে একটি কথাও হারিয়ে যায়।** তোমাকে রেজিস্ট্রি করে পাঠাচ্ছি। সারার কাছে পাঠাবার আগে তুমি কপি করে রাখবে।"

সে কোন্ কথাগুলি, যার প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণে নিবেদিতা এত উদ্‌গ্রীব—যার বিষয়ে লিখেছেন—

'You are going to have such a treasure in this letter—as you never received in your life'.

সে কথাগুলি উদ্ধৃত এখনি করব। তার আগে, সেদিনকার আলোচনার মূল কথা অন্যান্যদিনের আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে 'শক্তিপূজা ও স্বামীজী' অধ্যায়ে—সে বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে পারি। 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বিবেকানন্দ অতি বাল্যকাল থেকেই সমাধির সহজ অধিকারপ্রাপ্ত; যৌবনে তিনি ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদের প্রভাবাধীন; পরে ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর প্রচারজীবন, যেখানে তিনি এমন কিছু প্রচার করেন নি যা—মূর্তিবিশেষের

উপরে প্রতিষ্ঠিত। 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই তাঁহার একমাত্র আদেশ, অদ্বৈতদর্শন তাঁহার একমাত্র মতবাদ, এবং বেদ ও উপনিষদ তাঁহার একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ।'

তারপর নিবেদিতা লিখেছেন—

"তথাপি এর সঙ্গে একথাও সত্য, ভারতবর্ষে 'মা' শব্দটি সর্বদা তাঁর মুখে লেগে থাকত। জগন্মাতা সম্বন্ধে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন—যেভাবে আমরা বাড়ির একান্ত জনদের সম্বন্ধে বলে থাকি। সারাক্ষণ 'মা'-এর মধ্যেই ডুবে থাকতেন। অন্য ছেলেদের মত তিনি সব সময় শান্তশিষ্ট ছিলেন না। কখনো কখনো রীতিমত দুষ্ট, বেয়াড়া, বিদ্রোহী। কিন্তু দুষ্টুমি দৌরাত্ম্য মায়ের কাছেই। ভাল বা মন্দ—এসবের জন্য কখনো আর কাউকে দায়ী করেন নি। কোনো এক শুভকার্যকালে এক শিষ্যকে একটি প্রার্থনা শিখিয়ে দেন, যা তাঁর নিজ জীবনে মন্ত্রশক্তির কাজ করেছিল।—'আর মনে রেখো'—সহসা ফিরে অতি তীব্র প্রখরভাবে বলেছিলেন—'বেটিকে **বাধ্য করবে** তোমার কথা শুনতে! মায়ের কাছে **দীনা হীনা ভাব একদম নয়—একেবারে নয়** —মনে রাখবে—হাঁ!' প্রায়ই নূতন নূতন বর্ণনার অংশ ঝলসে উঠত তাঁর কণ্ঠে—উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ, বাম হস্তে ভীষণ কৃপাণ—'তাঁর শাপই তাঁর বর!'—সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠ, তারপরেই দীর্ঘ নীরব তন্ময়তা। কিংবা গভীর ভাবাবেগে প্রায় কাব্যের ভাষায়—'যাঁরা তাঁর একান্তই আপনার, তাদের হৃদয়ের গভীরে ঝলসে ওঠে কালীর রক্ত-রাঙা অসি!—মা নেমেছেন খড়্গ ধরে—এই মূর্তির তারা আজন্ম উপাসক।' এই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত 'মাতার কণ্ঠ' ('Voice of the Mother') নামে আমার একটি ক্ষুদ্র স্তোত্র জাতীয় রচনার প্রায় প্রতিটি বর্ণ বা ছত্র স্বামীজীর এই ধরনের 'উন্মোচন' থেকে সংগৃহীত।*—'আমি ভয়ঙ্করের উপাসক'—তিনি অবিরত বলতেন। তার মধ্যে একবার বললেন—'মনে করা ভুল যে, সুখই সকলের কাম্য। যত লোক সুখ চায়, ঠিক সেই সংখ্যক লোকই আজন্ম দুঃখ চায়। এসো, আমরা ভয়ের জন্যই ভয়ঙ্করের অর্চনা করি!'

বেশী খুঁতখুঁতেপনা বা প্যানপেনে ভাবকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। মন্দিরে পশুবলির ব্যাপারে মানসিক অস্বস্তি নিয়ে আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলাম—তিনি মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যাপারটি শেষ করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যেসব কথা সহজেই বলা যেত—যেমন, যারা বলির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠ, তাদের কিন্তু কোনই আপত্তি থাকে না যদি বলিটা হয় নিজের জিভের সুখের জন্য; কিংবা আধুনিক জীবনে কসাই ও কসাইখানার চেহারার বর্ণনা—সে সব তিনি কিছুই বললেন না,† আমার আপত্তিসমূহের বিষয়ে তাঁর সোজা উত্তর—'ছবিটা সম্পূর্ণ করতে দু'এক

---

* এই লেখাটি আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন বিষয়ক অধ্যায়ে উপস্থিত করব।

† আমেরিকায় কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে পাশ্চাত্ত্যের কসাইখানা নিয়ে প্রতি-বিদ্রূপ করেছেন।

ফোঁটা রক্তপাত হলই বা!' তারপরে তাঁর কাছ থেকে এবং নিকটে উপবিষ্ট অপর এক শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের (সম্ভবতঃ সারদানন্দ) কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের কালীপূজার প্রকৃত তথ্যগুলি আদায় করে নিতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল—কৃচ্ছ্রসাধ্য যে উন্নত উপাসনা জীবহিংসার স্তর অতিক্রম করে গেছে। অবশ্য তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি কখনই মা-কালীর অনুচর ভূতপ্রেতদের উদ্দেশ্যে জীবহত্যা সমর্থন করেন না। ওটা শয়তানের পূজা ছাড়া কিছু নয়—তিনি একেবারে ও জিনিসটির পক্ষে নন। নিজ মন থেকে ভয় ও দুর্বলতা দূরীকরণে সর্বদা সচেষ্ট, মাধুর্য ও আনন্দের মধ্যে যেমন, তেমনি পাপ, ভয়, দুঃখ ও বিনাশের মধ্যে স্বতঃই একই জগন্মাতার দর্শনে যত্নবান তিনি—এর থেকে বোঝা যায়, কোনোমতে তিনি বিশাল তত্ত্বটিকে তরল করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভীষণের পূজার বিষয়ে—তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনার বিষয়ে—শান্তভাবে বলতে বলতে হঠাৎ সরবে তিনি বলেছিলেন একদিন—'মূর্খ ওরা! মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয়—দয়াময়ী! মূর্খ! মূর্খ!' তাঁর কথা শুনতে শুনতে, দয়ালু, পালনকর্তা, সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বরের পূজা—যাতে ভূমিকম্পের, আগ্নেয়গিরির ঈশ্বরের ঠাঁই নেই—সে পূজার অন্তর্নিহিত অহংবোধ আমাদের কাছে একেবারে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। দেখেছিলাম যে, এ ধরনের পূজা, হিন্দুরা যাকে 'দোকানদারী' বলে তা ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর ভালোর মতই মন্দের মধ্যেও সমভাবে প্রকাশিত—এই শিক্ষাকে মনে হয়েছিল লক্ষগুণে নির্ভীক ও যথার্থ। যে-মন ব্যক্তি-আমির স্বার্থবোধে বিচলিত হতে না চায়, সে মনকে স্বামীজীর বজ্রবৎ উক্তির অনুসরণে দৃঢ় হতে হবে : 'মৃত্যু চাই—জীবন নয়! ঝাঁপ দিতে হবে তরবারির মুখে। এক হয়ে যেতে হবে চিরদিনের জন্য ভয়ঙ্করীর সঙ্গে।'

স্বামীজী যদি নিজের ধারণাগুলি শিষ্যের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, তাহলে স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলে এসেছেন, তার উল্টো কাজই করা হত। কিন্তু শিক্ষাব্রতীরূপে আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি ভারতীয় জীবনবোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলাম—ঐ ভারতীয় ভাবজীবনে বিশিষ্ট পূজাপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে অমরনাথ তীর্থযাত্রায় লব্ধ অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার মনকে বিহ্বল করে রেখেছিল। সেই জন্যই আমি কালীপূজার রহস্য বুঝতে সচেষ্ট হলাম, যেমন মানুষ নূতন ভাষা শিক্ষা করে, কিংবা নূতন জাতির মধ্যে নবজন্ম নিতে চায়। এইরূপ করেছিলাম বলেই আমি আচার্যদেবের জীবন ও চিন্তা কতকটা বুঝতে পেরেছিলাম। অল্পে অল্পে, ঝলকে ঝলকে একটু একটু বোধ। ধর্মব্যাপারে তিনি তাঁর অজ্ঞাতেই জন্ম-শিক্ষক। তিনি কখনোই অন্যের দ্বিধাসংকুল অথচ প্রকাশব্যাকুল চিন্তাকে বাধা দিতেন না। তাঁর সঙ্গে একদিন বসে আছি, এক কালীপ্রতিমা সেখানে আনা হলে চকিত চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল এবং আমি সহসা বলে উঠেছিলাম, 'স্বামীজী! কালী বোধহয় শিবের ধ্যানপ্রতিমা— তাই কি!' আমার দিকে

ক্ষণেক তাকিয়ে তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, 'বেশ বেশ! যেভাবে তোমার পছন্দ সেভাবেই প্রকাশ করো!"

এই সমস্ত আলোচনা ঠিক কখন হয়েছিল, বলা শক্ত, কিছু আগে হয়েছিল, আলোচ্য সময়েও কিছু হয়ে থাকতে পারে। তারপরেই স্বামীজীর মুখ থেকে কালীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক অবিস্মরণীয় কথাগুলি নিবেদিতা শুনলেন, যার মধ্যে, 'মাতৃ উপাসনার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অভ্রান্ত স্পষ্টতায় উন্মোচিত।' স্বামীজীর কথাগুলি অনেকাংশে বর্জন করে নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে দিয়েছিলেন, আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে তার অনুবাদ দিচ্ছি; মূলের প্রতিলিপিও গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হয়েছে :

স্বামীজী : সেই লোকটির কথা মনে আছে যিনি বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং দেবগণে (Angels) বিশ্বাসী, আর কিছুতে নয়?

নিবেদিতা : সেটা কি—

স্বামীজী : হাঁ, 'a damned sight better business'...

হাঁ, এই হল আমার ভূমি—আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী, এবং দেবদেবীতে, অন্য কিছুতে নয়।*

তোমার বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করতে আমাকে বলেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে আমি যাচ্ছি না। আর সোজা কথা বলি—সম্পূর্ণ সুস্থ হবার ভরসাও করি না। ওখানে দারুণ গরম হবে, এবং আমি উত্তেজনা সামলাতেও পারব না, কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমরা কালী-উপাসক—ঐ স্থানের প্রতিটি ধূলিকণাও আমার কাছে পবিত্র—মাটিতে গড়িয়ে

---

* এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে লিখেছেন, "...তারপরে কুণ্ঠিত-ভাবে কর্নেল হে'-র *Guardian Angels* কবিতার উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, ব্রহ্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে আমারও তাই মত—আমি ব্রহ্ম এবং দেবদেবীতে বিশ্বাসী, অন্য কিছুতে নয়।"

তারপরে লিখেছেন—

"স্পষ্টই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর নিজের বুদ্ধিবোধে যেখানে খটকা বেধেছিল, সেখানে আমারও খটকা বাধবে—বেদান্তের সর্বোচ্চ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বিশেষ ধরনের পূজা পদ্ধতিকে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা। তিনি এটুকু বোঝেননি যে, তিনি স্বয়ং আমাদের কাছে যেভাবে বর্তমান ছিলেন, তাতে তিনিই এইসকল বিপরীতের সমন্বয় এবং প্রতিটি সত্যের সাক্ষীস্বরূপ। তাঁর পূর্ব চিন্তার সূত্র ধরে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে ছাড়াছাড়া ভাবে বলে যেতে লাগলেন, প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন, স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজের বক্তব্যকে, কিন্তু সারাক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন ভিতরের কোনো একটা জিনিসে, যেন কোনো একটা ভাবের ঘোরে রয়েছেন, যার ঝোঁক কাটাতে পারছেন না—ডুবে রয়েছেন—কথাগুলি অর্ধ-স্বগতোক্তির মত।"

যাওয়া রক্ত পর্যন্ত—তার প্রতিটি বিন্দুও! পরম ভক্তিতে সে রক্ত চেটে তুলতে পারি।

তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দৃঢ় নির্দেশ দিয়েছি। কোনো চেয়ার থাকবে না প্রত্যেককে মেঝের উপরে বসতে হবে—মঞ্চের তলায় তোমার পায়ের নীচে। টুপি ও জুতো খুলে রাখতে হবে। যদি ইউরোপীয় বা ব্রাহ্ম কেউ উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে ও-জিনিস যাতে করা হয় স্বয়ং তোমাকে দেখতে হবে। **তুমি বসবে** সিঁড়িতে, কয়েকজন অতিথির সঙ্গে।।*

ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণাই না করতাম! ৬ বছর ধরে **সেই লড়াই**—কেননা কালীকে কিছুতে মানব না।

নিবেদিতা—কিন্তু এখন আপনি তাঁকে বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন, তাই না স্বামীজী?

স্বামীজী—মানতে **বাধ্য হয়েছি**। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি (মা) আমাকে চালিত করেন—আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি জানো। তিনি আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করান।

তবু কত দিনের লড়াই! লোকটিকে আমি ভালবাসতুম, বুঝতে পারছ—তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।

নিবেদিতা—এত সুযোগ সত্ত্বেও যখন আপনিই এত দীর্ঘদিন সন্দেহ করেছেন, তখন ব্রাহ্মরা যে করবে তাতে আশ্চর্য কি?

স্বামীজী—হাঁ—ঠিক, কিন্তু তারা তাঁর মধ্যে ঐ সীমাহীন পবিত্রতা কখনই দেখতে পায়নি, যা আমি দেখেছিলুম। আর—সে ভালবাসার স্বাদও পায়নি।

নিবেদিতা—আমার কি মনে হয় জানেন, তাঁর বিরাটত্বই তাঁর ভালবাসাকে এমন দুশ্ছেদ্য করে তুলেছিল আপনার কাছে।

*নিবেদিতা এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"কোনো দেবস্থানেই এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিজেদের দেবস্থানের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য রক্ষায় উদ্যত না হয়, সে নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্র।"

স্বামীজী—তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ কিন্তু তখন আমার মধ্যে জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের পরে। তার আগে তাঁকে খ্যাপা শিশুর মত ভাবতুম—সব সময়ে এই দেখছেন, সেই দেখছেন, দেবদেবী, কত কি! সেসব জিনিসকে ঘৃণা করতুম। কিন্তু তারপরে—এমনকি কালীকেও—মেনে নিতে হল আমাকে।

নিবেদিতা—কেন মেনে নিতে হল, তাকি বলবেন না স্বামীজী—কিসে আপনার অত বিরোধিতা চূর্ণ হল?

স্বামীজী, না; সে রহস্য আমার সঙ্গেই চলে যাবে। সে সময়ে আমার দুর্ভাগ্যের চরম; পিতার মৃত্যু ও নানা দুর্বিপাক; 'মা' দেখলেন, এই সুযোগ—আমাকে গোলাম করার। মা'র একেবারে মুখের কথা—'তোকে গোলাম করে রাখব।' আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দিলেন।—বিচিত্র, এরপর তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন, আর তার বেশী সময় ভুগেছিলেন। ৬ মাস যেতে না যেতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হল—সে উজ্জ্বলতা কোথায় চলে গেল!

গুরু গোবিন্দ সিংহেরও* একই দশা হয়েছিল। তিনি সেই শিষ্যটির সন্ধান করছিলেন, যাকে নিজের শক্তি দিয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে নিজ পরিবারের দাবিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। নিজ সন্তানাদির কোনো মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। সেই বালকটিকে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন— যাতে তাকে সব দিয়ে মরতে পারেন।

নিবেদিতা—শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সর্বদা কালীর অবতার মনে করি। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে কি তাই বলবে না?

স্বামীজী—হাঁ। এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী রামকৃষ্ণের উপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। মার্গট দেখ, আমি **বিশ্বাস না করে পারি না,** কোথাও একটা মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে অনুভব করে—কালী বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত করে।—আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই—বুঝতেই পারছ সর্বদা এমনই হয়। শরীরের অগণ্য কোষ-সমষ্টিতেই ব্যক্তির আকার—বহু মস্তিষ্ককেন্দ্র তৈরী করে অখণ্ড চৈতন্য—

---

*নিবেদিতার মূল ডায়েরীতে ছিল 'গুরু গোবিন্দ সিংহ'। পরে 'আচার্যদেব' গ্রন্থে 'গুরু নানক' ছাপা হয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী যাঁর কথা বলেছিলেন, তিনি গুরু নানকই। বলার সময়ে স্বামিজীর ভুল হতে পারে, কিংবা শোনায় বা টোকায় নিবেদিতার ভুল হতে পারে।

নিবেদিতা—হাঁ, বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য ঐক্য—

স্বামীজি—তাই কি! কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে ভিন্নতার কারণ কি! ব্রহ্মই—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—আবার দেবদেবীও—

সুতরাং দেখছ, আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী, আবার দেবদেবীতে, কিন্তু আর কিছুতে নয়—

কিন্তু কিভাবে না তিনি (মা) আমাকে যন্ত্রণা দেন কখনো কখনো! তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি, 'যদি তুই এই এই জিনিস আগামী কাল আমাকে না দিবি, তাহলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের পূজা করব।'—এবং সেই জিনিসগুলি আমি অতি অবশ্যই পেয়ে যাই!

এসব কথা কিন্তু কদাপি কাউকে জানাবার নয়, মনে রেখো!

নিবেদিতা—আপনি বলতে চান, এসব আলাপ পৃথিবীর শোনার জন্য নয়—

"কদাপি নয়!"—বলে স্বামীজী চলে গেলেন।

অধ্যাত্মরাজ্যের এক গোপন দলিলে চোখ বুলোবার সৌভাগ্য এখানে পেলাম। নিবেদিতা এই 'প্রমাণপত্রটি' পাঠাবার পরে ২৮ মের চিঠিতে শেষদিকে লিখেছেন—

> "স্বামীজীর ঐ কালীর উপরে রাগ করে কড়া হওয়ার ব্যাপারটি খুবই মিষ্টি আর মজাদার, নয়কি? বিশ্বরহস্যের উপরে যেন ইন্দ্রিয় চেতনার খুবই পাতলা আবরণ! ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছ—শিবের সম্বন্ধে—যা বলতে চাচ্ছি? 'তাঁর (কালীর) ক্রীতদাস'—কথাটা ঐ মুক্তির ভঙ্গি সম্বন্ধে নতুন অর্থ এনে দিয়েছে আমার কাছে।
>
> অসাধারণ হয় নাকি—সব ব্যাপারটা যখন প্রতীকের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে—অতীত কালের মানুষেরা এমন সব বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল?..... কিংবা সকলই মানবমনের সৃষ্টি? পূর্ণ মানবই কি ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন!
>
> এইসব কথা বা চিন্তার সঙ্গে কালীপূজার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে।"

নিবেদিতা নানাভাবে, আভাসে ইঙ্গিতে একটি কথা মিস ম্যাকলাউডের কাছে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন, যে-কথাটি তাঁরই মত ম্যাকলাউড বিশ্বাস করেন। তবু গভীর বোধের ক্ষেত্রে কিছু আত্মগোপনের ভাব থাকেই—আশঙ্কা থাকে যে চিন্তাগুলি শব্দে বা লেখায় আকারিত হলেই স্থূল হয়ে দাঁড়াবে। কথাটা আর কিছু

নয়—স্বামীজীর ঐশ্বরিক স্বরূপে বিশ্বাস—নিবেদিতা স্বামীজীকে শিবের অবতার মনে করেছিলেন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর অবতার। এর আগে সারদাদেবী-প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি পত্রের উল্লেখ করেছি, যাতে তিনি সারদাদেবীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এই কথার সমর্থনে—স্বামীজী National God অর্থাৎ শিবের direct incarnation (সাক্ষাৎ অবতার) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—কালীর। এই তত্ত্বটি নানাভাবে বেশ কিছুদিন ধরে নিবেদিতার মাথায় জেগেছিল—নানা ঘটনায় তার সমর্থন পেতেন এবং সমর্থন চাইতেন। স্বামীজীর মৃত্যুতত্ত্ব বা কালীতত্ত্ব নিবেদিতাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। এই প্রচণ্ড তত্ত্বটি কিভাবে স্বামীজীর কাছে এত সহজ সত্য হয়ে উঠল—এই প্রশ্ন তাঁর ছিলই, এবং উত্তরও সন্ধান করেছেন সর্বসময়। নানা উত্তর পেয়েছেন নানা সময়ে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যয়-বোধক উত্তরটি তিনি এক চকিত উপলব্ধির পরে লিখে পাঠান ৫ জুলাই ম্যাকলাউডকে :

> "কালী বিষয়ে আমার নতুন অনুভূতি জেগেছে। কলকাতায় শেষ দিনে তা পেয়েছি, যখন আমি রাজার সঙ্গে কালীমূর্তির পাশে বসেছিলাম—যেটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করি।
>
> শায়িত ঈশ্বরের (শিবের) আবেশগ্রস্ত দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখলাম, তা সত্যই দেবীর (কালীর) নয়নের সঙ্গে মিলিত—যেকথা সদানন্দ আমাকে বলেছিলেন। তারপর দেখলাম, কালী কিভাবে 'মা' সম্বন্ধে স্বামীজীর দর্শনের অনুরূপ। **শুধু শিবের পক্ষেই ঈশ্বরসত্যকে ঐ আকারে দেখার সাহস করা সম্ভব—শুধু শিবই পদদলিত হয়েও ঐ প্রেমাবিষ্ট নয়নে দেখতে সমর্থ। বুঝতে পারছ, সমস্ত ব্যাপারটা কত স্পষ্ট!**"*

ঐ চিঠিতেই নিবেদিতা লেখেন—

> "আর সব সময়ে তাঁর (স্বামীজীর) সেই দাবিটি গাঢ়তর গভীরতর হচ্ছে—'আমি বিশেষ অর্থে কালীর ছেলে।' আমার কাছে প্রতীয়মান সত্য যা—যা দিবালোকের মত স্বচ্ছভাবে দেখছি—যা কখনো তাঁকে বলতে চেষ্টা করিনি—তা হল 'ছেলে নয়, স্বয়ং শিব—ওঁরা দেবদম্পতি।"

স্বামীজী এবং নিবেদিতার কালী-উপাসনা অনেকেই বিচলিত করেছিল। পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজী বেদান্ত-প্রচারক রূপেই পরিচিত। শক্তিসাধনার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগের কথা সেখানে পরিচিত ছিল না। নিবেদিতা কালীবিষয়ে বক্তৃতা করার পরেই ব্যাপারটা সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ে। ১৮৯৯—১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা-ভ্রমণকালে নিবেদিতা তাঁর এই বিশেষ ধর্মানুরক্তির কথা গোপনও করেন নি। কালী-উপাসক

---

* "I worked at the intoxicated eyes of the prostrate God, and I saw how they did indeed meet Hers, as Sadananda had said—and then I saw how she was Swami's Vision of the Mother. Only Siva would have courage to see the Divine in such a guise, only Siva would look with that rapture, though Her feet are trampling on Himself."

ইংরেজ মহিলার কথা সেখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলও। (তেমন একটি সংবাদের প্রতিলিপি আমরা দিয়েছি।) স্বামীজীও মাতৃউপাসনার উপর বক্তৃতা করেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে স্বামীজীর বিদেশী সুহৃদ্‌মণ্ডলীতে। মেরী হেলকে স্বামীজী নিজের বোন বলে মনে করতেন, এবং মেরী হেলও সেই অধিকারে স্বামীজীর মতের বা কাজের মুক্ত সমালোচনা করতেন। নিবেদিতার গুরুভক্তি এবং স্বামীজী ও নিবেদিতার কালীভক্তির বিরুদ্ধে মেরী হেল নিশ্চয় সমালোচনা করে চিঠি লিখেছিলেন। এক্ষেত্রে স্বামীজী নিজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যেও কালীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রহস্যময় সম্পর্কের স্বীকৃতি আছে। এ ধরনের স্বীকারোক্তি স্বামীজী খুব কম ক্ষেত্রেই করেছেন বলে এটি খুবই মূল্যবান। স্বামীজী মেরী হেলকে ১৭ জুন, ১৯০০-তে লিখেছিলেন :

> "কালী-পূজা কোনো ধর্মের অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের সব কিছুই উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছে। কালী-পূজা আমার **বিশেষ খেয়াল**। আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোনোদিন শোননি, ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়োনি। বিশ্বমানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি শুধু তাই প্রচার করি। যদি কোনো অদ্ভুত প্রণালী থাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপনে রাখি, এবং সেখানেই তার ইতি। কালী-পূজা কি বস্তু, তা আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব না, কারণ কখনো তা অন্যকে আমি শেখাইনি।*......
>
> আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক প্রভৃতির স্থান নেই আমাদের ধর্মে—তা বিশুদ্ধ উপনিষদের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। অনেকে মনে করে, অনুষ্ঠানাদি তাদের ধর্মবোধের পক্ষে সহায়ক। তাতে আপত্তি নেই আমার।
>
> শাস্ত্র, আচার্য, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ত্রাণকর্তাদের উপর ধর্ম নির্ভর করে না। এই ধর্ম ইহজীবনে বা অন্য কোনো জীবনে অপরের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে তোলে না। এই অর্থে উপনিষদের অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম। তবে ত্রাণকর্তা, আদিষ্ট পুরুষ, শাস্ত্র বা অনুষ্ঠানাদির স্থান আছে ধর্মে। সেগুলি অনেককে সাহায্য করতে পারে, **যেমন কালী উপাসনা আমাকে আমার 'ঐহিক কাজে' (সেকুলার ওয়ার্ক) সাহায্য করে। এগুলি স্বাগত।**
>
> তবে গুরু একটি স্বতন্ত্র ভাব। শক্তি-সঞ্চারক ও শক্তিগ্রাহকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, এ হল তাই—আত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে। শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রতি জাতিই বিশিষ্ট ধাঁচের। প্রতি জাতিই অবিরত অন্য জাতির ভাব নিয়ে নিজের ধাঁচের মধ্যে অর্থাৎ নিজস্ব জাতীয় ধারায় গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। নির্দিষ্ট জাতীয় আদর্শ ধ্বংস করার সময় এখনো আসেনি। শিক্ষা-বস্তু যে-কোনো সূত্র থেকেই আসুক না কেন— যে-কোনো দেশের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তার ভাবৈক্য থাকেই, কেবল

* না, নিবেদিতাকেও নয়। অনেক পীড়াপীড়ি করে নিবেদিতা কালীতত্ত্ব কিছু শুনেতে পেরেছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে, কিন্তু স্বামীজীর বিশিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি চিরদিন তাঁর মধ্যেই থেকে গিয়েছিল- 'That . . . . is a secret that will die with me'.

তাকে গ্রহণ করবার সময়ে জাতীয় ভাবাপন্ন করে নিতে হবে, অর্থাৎ সে শিক্ষা যেন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়।"

কালীঘাটে বক্তৃতার আগের দিন স্বামীজীর মুখ থেকে আশ্চর্যজনক কথাগুলি নিবেদিতার মনে কী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে তিনি 'আচার্যদেব' গ্রন্থে পুনশ্চ লিখেছেন :

"আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ঐ কথোপকথন আমার জীবনে নব যুগের সূচনা করল। এই ব্যাপারটি ঘটার পর থেকে আমি যেন দেখতে লাগলাম—আচার্যদেবের ভাবে-গতিকে কার্যকলাপে রয়েছে অন্যের গচ্ছিত বিশ্বাস ও দায়বহনের ইঙ্গিত। কালী-প্রতিমার ব্যাখ্যা করতে বলা হলে তিনি যা বলতেন তাতে বোঝা যেত—কালী, অভিজ্ঞতার মহাগ্রন্থ, মানবাত্মা তার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গিয়ে সবশেষে দেখবে কিছুই নেই। এই হল কালীর চরম ব্যাখ্যা—আমার তাই মনে হয়। ভাবী ভারতবর্ষে কালীমাতাই একমাত্র উপাস্য হবেন। তাঁর নামে তাঁর সন্তানেরা নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছতে সমর্থ হবেন। এবং একেবারে শেষে তাদের হৃদয়ে সনাতন জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশ ঘটবে, পরম লগ্ন সমাগত হলে প্রতিটি মানুষ জানবে—তাদের সমগ্র জীবন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্নময়।

গীতার সেই বেদগম্ভীর বাণী কার না স্মৃতিতে উদিত হয়—'কর্মের আরম্ভমাত্র না করিয়া কোনো ব্যক্তিই নৈষ্কর্ম্য-লাভ করিতে পারে না; শুধু কর্মত্যাগ করিলাম বলিলেই সিদ্ধি করতলগত হয় না!'* সেইরূপ আমরাও কি নিশ্চিতভাবে জানি না যে, এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হলে আমরা অন্তে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাব? মাতার (শক্তির) মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম; নূতন জীবন, নূতন জ্ঞান, পরিবর্তন, সংগ্রাম, জয় ও পরাজয়ের সাময়িক সংঘটনের মধ্য দিয়া আত্মার নিশ্চিত স্বর্গে উত্তরণ, যেখানে অভেদ শুধু, শুধু মহাশান্তি। যাঁর পদাঙ্ক আমি অনুসরণ করেছিলাম, সেই শ্রেষ্ঠ আচার্যের জীবনের মধ্যে যতই গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছি, প্রতিদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর দেখেছি—তিনি স্বয়ং নিজ জীবন-মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি উল্টে গিয়েছিলেন একের পর এক, যখন একেবারে শেষ শব্দটিতে পৌঁছে-ছিলেন শ্রান্ত শিশুর মত এলিয়ে পড়েছিলেন মায়ের কোলে—পরম উন্মোচনে নিমজ্জিত সেই ক্ষণের পরম জ্ঞান : স্বপ্ন! এ সকলই স্বপ্ন!"

[Open the gates of light, O Mother
To me, Thy tired son,
I long, oh long to return home!
Mother, my play is done.]

(স্বামীজীর 'My play is done' কবিতার অংশ]

* ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

দ্বিতীয় কালী বক্তৃতা

২৮ মে, রবিবার কালীঘাটে মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে বক্তৃতা হয়। "বিকাল পাঁচটার সময়ে নিবেদিতা নগ্নপদে কালীঘাট গমন করিলেন।" আগেই দেখেছি, স্বামীজীকে সভাপতি হতে বলা হলেও তিনি নানা কারণে রাজি হননি। বক্তৃতার বিষয়ে নিবেদিতা ৩১. ৫. ১৮৯৯ তারিখে ওলি বুলকে লিখেছেন—

"একেবারে কালীঘাটে গত রবিবারে বক্তৃতা করেছিলাম।...যথার্থতঃ আমি ছোটখাট একটি বৈদান্তিক বক্তৃতা করেছিলাম—তাতে আমিই অবাক। আর একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম, দু'তিন হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুব খুঁটিনাটি বিষয় বলা যায় না, যা কয়েক শো লোকের মধ্যে করা যায়। আরও সহজ হতে হয়, মূল কথায় জোর দিতে হয়—কাজটা সোজা হয়ে দাঁড়ায়।"

একই বিষয়ে ম্যাকলাউডকে :

"কালীঘাট ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভয়ংকর কিছু দাঁড়ায়নি। সমবেত পুরুষদের আকার খুবই মার্জিত।"

বক্তৃতা সাফল্যমণ্ডিত হলেও তার দু'একটি অংশ স্বামীজী অপছন্দ করেছিলেন, নিবেদিতার এক চিঠি (৩১. ৫. ১৮৯৯) থেকে পাই :

"আজ সারদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব, আপত্তিকর বাক্যগুলি কি কি?"

কালীঘাট-বক্তৃতার মূল অংশ অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার অনুরূপ। 'বিশেষ অনুরোধেই' তা করতে হয়েছিল, নিবেদিতা চিঠিতে লিখেছেন। বক্তৃতার সূচনা ও সমাপ্তিতে কিছু নূতন কথা ছিল। সূচনায় তিনি কালীঘাটের স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বলেন, তার সাক্ষাৎ প্রেরণা স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথন, তা সহজেই বোঝা যায়।

নিবেদিতা আরম্ভে বলেন :

"যে-জায়গাটিতে আজ সন্ধ্যায় আমরা মিলেছি, এটি কালীর পবিত্রতম পীঠস্থান। যুগ যুগ ধরে কত ভক্ত প্রাণের প্রার্থনা, বেদনা ও কৃতজ্ঞতার পূজা নিবেদনের স্থান এটি, মৃত্যুক্ষণে শেষ চিন্তার লক্ষ্যস্থল। মা এখানে কত সাধককে দর্শন দিয়েছেন, তার নির্ণয় কে করবে? কেউ মায়ের সন্তান, কেউ তাঁর চিহ্নিত বীর। কেউ শুধু ভক্ত, তাঁর ভাব ও রূপসুধাপানে পাগল, আবার কেউ তাঁকে নিজ আত্মার স্বরূপজ্ঞান করেছেন। অনন্ত আত্মা, তাদের অনন্ত শক্তি, বাসনাও অনন্ত—যার তৃপ্তিসাধন মা করে থাকেন।

এই স্থান থেকেই তরঙ্গিত হয় তাঁর স্বর, ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে,

ঊষায় সন্ধ্যায় মৃদু মধুকণ্ঠে ডেকে বলে : 'শিশুরা, আমার শিশুরা, আমি—আমিও তোমাদের মা!'

দিবস যখন প্রখর উজ্জ্বল, পৃথিবী কর্মশব্দে মুখর, তখন মায়ের কণ্ঠ হয়তো ডুবে যায়, কিন্তু আবার যখন শান্তিলগ্ন ঘনায়, নিজ অন্তরের মুখোমুখি হয়ে বসে মানুষেরা, তখন তারা যত পরিবর্তিত-ভাবেই শুনুক না কেন, তবু বার্তা আসে, শান্ত ক্ষুদ্র সুরগুলি—এত ক্ষুদ্র, এত সুন্দর যে, আমাদের কানে প্রায় পশেই না, যদিও একদিন আমরা অনুভব করবই যে বিশ্বের সবকিছু—জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা—কালীর অখণ্ড নিত্য সংগীতের এক একটি সুর।

পবিত্র এই স্থানের আবহ, পবিত্র এই সন্ধ্যাকাল, মন্দিরের রক্ত-ধূলি—পবিত্র! পবিত্র! আমরা যেন অনুভব করতে পারি, এই স্থানে—যেখানে লক্ষ লক্ষ অতীত মানুষ প্রার্থনা করতে এসেছে—এখানে আমরা বক্তৃতা শুনতে আসিনি, এসেছি পূজা করতে।"

এর পরে কালী-তত্ত্ব সম্বন্ধে অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতায় নিবেদিতা যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলিই বলেন। সব শেষে অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলির উত্তর দেন। উত্তরগুলি গভীর মর্যাদাবোধ, জ্ঞান ও অনুভূতি-গভীরতার পরিচায়ক। মূর্তিপূজা, বলিপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে পুরাতন অভি-যোগসমূহ ছিলই, নিবেদিতা সেগুলির উত্তরও দিয়েছিলেন—কিন্তু সবচেয়ে প্রচণ্ড উত্তর হয় কালী মূর্তি কুৎসিত—ক্রীশ্চান মিশনারীদের এই পুরাতন অভিযোগের ব্রাহ্ম পুনরুক্তি সম্বন্ধে। ব্রাহ্ম অভিযোগকারী কিছু শিল্প প্রসঙ্গও তুলেছিলেন—তাঁর নিকটে—যিনি শিল্পজ্ঞানে অভিযোগকারীর চেয়ে বহু যোজন এগিয়ে আছেন। নিবেদিতার উত্তরটি ভারতীয় চিত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে কালের দিক থেকে গুরুত্ব-পূর্ণ—যথাসময়ে তার বিচার আমরা করব। সবশেষে ছিল নিবেদিতার বিশাল আহ্বান—বিবেকানন্দের কণ্ঠ যার মধ্যে ধ্বনিত—যে আহ্বান শুনলে মনে হয়, নিবেদিতাও কিয়দংশে 'অভিজ্ঞতার মহাগ্রন্থপাঠ' করেছিলেন।

আপত্তি ও নিবেদিতার উত্তর নিম্নোক্ত প্রকার :

"বক্তা অতঃপর কালীপূজা সম্বন্ধে অ্যালবার্ট হলের সভায় কতিপয় ভদ্র-মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটি অভিযোগের উত্তর দিতে অগ্রসর হন।

প্রথমতঃ, একজন বলেছিলেন, অনন্ত ঈশ্বরকে মূর্তিরূপে পূজা করা অসম্ভব।

তার উত্তরে ভগিনী নিবেদিতা বলেন, হিন্দুরা মূর্তিকে সম্বোধন করে পূজা করে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে মূর্তি মনঃসংযোগের অবলম্বন বিশেষ। আসল পূজা সমুখস্থ জলপূর্ণ পাত্রটিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। প্রকৃতি ও জীবনপাত্রে ঈশ্বররসধারা পূর্ণ হয়ে আছে, তারই প্রতীক ঐ পাত্রটি।

যাই হোক, এক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর পূর্বতন বক্তব্যে ফিরে যেতে চান—বস্তুকে যে আমরা দেখি, আসলে তার মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখি, এবং ভগিনী প্রশ্ন করতে চান, এখানে আমরা সমবেত হয়েছি কেন—যদি না ঐ কথা সত্য হয়? প্রতিমার মধ্যে আমরা ঈশ্বরকেই দেখি,—অন্যত্রও কি দেখি না? আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের

প্রতিমা, আমাদের জীবনের প্রতিটি গতিচ্ছন্দ ঈশ্বরেরই পূজা, যে-কোনো রূপে, আমাদের বা অন্যের; এবং যেহেতু আমরা বর্তমান জীবস্তরে রয়েছি, সেজন্য (প্রতিমার মধ্য দিয়ে পূজার) সত্য ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া কি ভাল নয়, যাতে আমরা স্বাভাবিক বিবর্তনে ঊর্ধ্বতর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারি?

পরবর্তী আপত্তি কালী-প্রতীকের আকার নিয়ে। অভিযোগকারীর মতে, কালীর এমনই আকার, যার কাছে মাতৃভাব শুকিয়ে যাবে। এই কথাটি এক দ্বিতীয় বক্তা সমর্থন করেন। তিনি যীশু-কোলে মেরীর সুন্দর মূর্তিকে বিপরীত তুলনায় উপস্থিত করেন।

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, তিন দিক থেকে এই আপত্তির সম্মুখীন হওয়া যায়। প্রথমতঃ, একথা সত্য, ইউরোপে কোনো এক যুগে ধর্মধারণা ও কলাশিল্পের উন্নতি পাশাপাশি চলেছিল, যার ফলে ধর্মবস্তুর বাহ্যিক চাকচিক্য এবং আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি এর দ্বারা কেউ এমন মনে না করেন যে, মেরী ও শিশুর মূর্তি সব সময়েই সুন্দর ছিল। বাইরের মানুষ যদি কেউ দেখে, যার মনের মধ্যে ক্রীশ্চান ভক্তের ভাবানুভূতির পরিমণ্ডল নেই, তাদের কাছে প্রাচীন বাইজান্টিয়ান চিত্রাবলী এবং খোদাই কাজ অতীব প্রাণহীন ও কুৎসিত ঠেকবে—ইউরোপীয় ভাবাপন্ন সমালোচকের কাছে কালীমূর্তি যেমন ঠেকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতি শিল্প বা ভাস্কর্য বিকাশের পরিপন্থী নয়। কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সময় পর্যন্ত সমস্ত গ্রীস তীর্থযাত্রা করে যেত ডেলফির মন্দিরে, যেখানে প্রায়-নিরাকার মূর্তিটি ছিল। যে-কালের মানুষেরা এহেন মূর্তির পাদমূলে প্রণত হত, তারাই জন্ম দিয়েছিল ফ্রিডিয়সের (Phridios)।

তৃতীয়তঃ, এসব ব্যাপার আমাদের আলোচ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না। ভক্তের কাছে মায়ের মূর্তি কুৎসিত নয়। যে-মূর্তিটিকে তুমি তোমার বাল্যকাল থেকে ভালবেসেছ, ভক্তি করেছ, সে মূর্তি কি তোমার থেকে আলাদা কিছু যে, তার সামনে গোমড়া মুখে দাঁড়াবে নিন্দা বুকে পুরে! 'নিষ্ঠুর', 'কুৎসিত', 'অবাস্তব'— এসব উক্তি তো বিদেশীর। জীবন, অভিজ্ঞতা ও ভাবনা যা দেখতে দেয়, মানুষ ধর্মীয় প্রতীকের মধ্যে তা-ই দেখে। কোনো খ্রীস্টান কি বর্ণনানুযায়ী ছবিটা চোখের সামনে জাগিয়ে রাখে যখন সে গায়—'রয়েছে উৎস, পূর্ণ রক্তে'? ('There is a fountain filled with blood')

এই ধরনের উক্তি কত না মানুষের কাছে পুণ্যতম, পবিত্রতম ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে; এবং একথা না বললেও চলবে, এগুলির খুঁটিয়ে বিচার করা হয় না। যাইহোক ইউরোপীয় শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতেও কিন্তু কালী মূর্তির অসাধারণ নাটকীয় গতিশক্তি ধরা পড়ে। কোনমতে চোখ এড়াবার বস্তু তা নয়। সকল আদিম শিল্পই ভাবনা ও অনুভূতির প্রকাশ চেষ্টায় আঁকুপাকু করেছে, যেহেতু প্রকাশের উপযুক্ত উপাদান তার আয়ত্তে ছিল না। কালীমূর্তি দেখে অভ্যস্ত এমন চোখেও ধরা পড়ে তার সুগভীর, সুতীব্র, চমকপ্রদ অর্থদ্যোতকতা। যে অভিযোগকারী ইউরোপীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছেন, তিনি যদি ইউরোপীয় হতেন, তাহলে কালী-মূর্তি-কল্পনার বিষয়ে ঐ কথাও বলতেন। এখানে এইটুকু বলা যায়, নিজেদের

পুরাণ-কথা, বা সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয়রা পশ্চিম থেকে চোখ সরিয়ে তুলনাদি ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকলেই ভাল করবেন। মাতৃরূপের চিত্রণে নিজস্ব উপায় বজায় রেখে তাতে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর্শবোধ সঞ্চারিত করাই তাঁদের পক্ষে উচিত কাজ হবে। তা করলেই তাঁরা যথার্থ জাতীয় এবং মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। তা না করলে তাঁরা বিদেশী সৃষ্টির বহিরঙ্গ সৌন্দর্যটুকু দেখে বিভ্রান্ত হবেন, কদাপি ঐ সৌন্দর্যের পশ্চাদ্বর্তী গভীর প্রেরণা ও আদর্শের চরিত্র বুঝবেন না, এবং নিজেদের শিল্পকে ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন করতে গিয়ে আরও স্থূল ও নিম্নমুখী করে তুলবেন।

পরবর্তী আপত্তি বলির বিরুদ্ধে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তাঁর কানে এই কথাটা খুবই কপট ঠেকে, যখন শোনেন, নিজের জন্য বলি চলবে, কিন্তু দেবীর কাছে নয়। কালীপূজায় লুকোচুরির ভাব নেই। যা জুটিয়েছি, দিতে হবে তা-ই। তথাপি কালীপূজার রীতি অনুসারে অপরকে নয়, নিজেকেই শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করার কথা আছে, এতে তিনি আনন্দিত। এইজন্যই শক্তি পূজায় এত শক্তি লাভ হয়। ত্যাগের দ্বারাই মাত্র শক্তি আসতে পারে, আর কালীকে কখনই ত্যাগ ভিন্ন পূজা করা সম্ভব নয়—ত্যাগ, আরও ত্যাগ চাই তাঁর পূজায়। আত্মোৎসর্গসহ জীবনবরণের যে অভিপ্রায় একদা খ্রীস্টধর্মে প্রবল হয়েছিল, কালীপূজার মধ্যে সেই ভাবের পুনর্জন্ম হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। কারণ এই ভাবের তুল্য আর কোনো ভাবই এত স্থায়ী ও শক্তিশালী নয়। কালীপূজার কুণ্ঠিত পক্ষ সমর্থনে তিনি আসেন নি, সর্বশক্তি দিয়ে তার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত।

আলোচনার সর্বশেষে অংশ নিয়েছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি, দুই চোখে জল নিয়ে শ্রোতাদের অনুনয় করেছিলেন পৌত্তলিকতা পরিহার করতে। ভারতীয় মন্দির সমূহকে তিনি কঠিন শব্দে ভূষিত করে বলেছিলেন, তার চতুর্দিকে নোংরামি ও লাম্পট্যের দৃশ্য। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এ দেশের দুর্বলতার মূল কারণ মূর্তিপূজা। কালীর সামনে কখনো কখনো নরবলি দেওয়া হয়, সেকথাও তিনি বললেন। ভগিনী নিবেদিতা বললেন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু যেসব কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন, সেগুলিকে তিনি সত্য বলে মেনে নিতে পারেন না। কোনো অভিযোগই, তাঁর মতে, প্রমাণিত হয়নি।

নরবলির ইতিকথা কালীর শত্রুরাই বিশেষভাবে লিখেছেন।* ব্যাপারটা যদি সত্যও হয়, এর দ্বারা, মানুষ মাঝে মাঝে খুন করে—তার অতিরিক্ত কি প্রমাণ হয়? এভাবে বা সেভাবে, যেভাবেই হোক খুন হল খুন।

তিনি তাঁর পুরাতন সূত্রে ফিরে যেতে চান (এক্ষেত্রে যা তাঁর বক্তব্যকে অধিক

---

* ভারতে এবং ভারতের বাইরে নরবলি প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। মার্ডকস সাহেব ভারতবহির্ভূত দেশের ব্যাপারে ব্যস্ত না হয়ে স্বভাবতই ভারতের কুপ্রথায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন—তাঁর গ্রন্থে।

বোধগম্য করে তুলবে)—যদি সমস্ত কিছুই ঐশী হয়, সমস্ত কাজই পূজা হয়, তাহলে হত্যাও পূজাকর্ম, যার মধ্য দিয়ে এক ধরনের চরিত্র ঈশ্বরমুখী হয়।

ধর্মভাবকে যেহেতু সত্যপূর্ণ, মহত্বপূর্ণ ধরে নেওয়া হয়, তাই তার কিছু অনুগামীকৃত বিকৃত কাজের জন্য বিশিষ্ট ধর্মপদ্ধতিকেই দায়ী হতে হবে—এ যুক্তি হাস্যকর। যদি তাই বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন করা যায়—কোন্ ধর্ম তার প্রবর্তকের নামে সর্বাধিক মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে? অবশ্যই খ্রীস্টধর্ম। কিন্তু কেউ কি যীশুখ্রীস্টকে স্বপ্নেও তার জন্য দায়ী করেন? যদি করেন, তাঁরা কি সংগত কাজ করবেন? কখনোই নয়। ব্যভিচারাদির দারুণ অভিযোগের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। ধর্মের ঘোষিত সত্য দৃঢ় ও মহৎ হলেই হল। তার বিপরীত কিছুর জন্য তাকে দায়ী করা উচিত নয়। প্যারিস, লন্ডন এবং আমেরিকায় একই ধরনের Satanites এবং diabalistes সম্প্রদায় রয়েছে, যারা একই ধরনের কাজ চালিয়ে যায় অন্য এক ধর্মের আচ্ছাদনের মধ্যে। এই পৃথিবীতে কোনো নীতি বা আদর্শই প্রকাশিত হয়নি, যার বিরুদ্ধে কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেনি। এসব কথাই সত্য। তাই বলে কি আমরা নীতি বা আদর্শ ঘোষণায় বিরত থাকব? এইভাবেই আমরা ভারতীয় পাপাদির কারণ ভারতীয় ধর্ম—এমন কথা বলতে পারি না।

সবশেষে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর শ্রোতাদের কাছে নিবেদন করেন—তাঁরা যেন কদাপি মনে না করেন যে, ধর্ম-সংশয়ের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতে চেয়েছেন। গভীরে দেখলে, ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়, চূড়ান্ত সত্যে বিশ্বাসেরই অপর দিক। আমাদের কর্তব্য, ঐ সংশয়ের সম্মুখীন হওয়া, তাকে প্রণিধান করা, তার পক্ষে তথ্য সন্ধান করা, এবং যদি মৃত্যুই তাদের নিয়তি হয়, সযত্ন সমাধিতে তাদের শায়িত করা। যে মন সন্দেহ করেছে—আন্তরিক সন্দেহে আলোড়িত হয়েছে—সেই মনই বেঁচে রয়েছে। কিন্তু সন্দেহ যেন যথেষ্ট সন্দেহ হয়। যেন অতি সহজ, নিতান্ত সাধারণ সমাধানকে যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া না হয়। ঈশ্বর প্রেমময়, বলা খুব সহজ, কারণ —আমাদের পারিবারিক সুখশান্তি তার প্রমাণ! কিন্তু ঈশ্বর যে প্রেমময়—ঠিক ঠিক সেকথা শিখি কখন, কিভাবে? আমাদের জীবনের যন্ত্রণার মুহূর্তেই কি মহাসত্য আমাদের কাছে আবির্ভূত হয় না—পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ আনন্দ রূপে? কালীমূর্তির মধ্যে এই বিপরীত সত্যটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে—প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানব-আত্মার এই বিরোধী সত্যটুকু: মানবের কাছে ভয়ঙ্কর যা-কিছু, সেই সকল কিছুর মাঝখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই, তা সত্ত্বেও 'মা' এবং আমরা সকলে তাঁর শিশুসন্তান।"

'কালী দি মাদার' গ্রন্থ

কালীঘাট-বক্তৃতার ২৩ দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করেন। জাহাজে স্বামীজীর সান্নিধ্যে যে অবিস্মরণীয় কাল নিবেদিতা কাটিয়েছিলেন, যা তাঁর কাছে 'শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রা', সেই সময়েও ভয়ঙ্করীর ভাবাবেশ স্বামীজীর কাটেনি। সুতরাং ২৮ মে, ১৮৯৯, নিবেদিতা যে লিখেছিলেন—

'I have practically ended school. I give up the house tomorrow. I began, do you remember, on the Kali Puja morning, and I end at the Kalighat',—

সেই কালী-কাল কিন্তু সমাপ্ত হয়নি নিবেদিতার জীবনে কখনো, এবং জ্বলন্তভাবে বর্তমান ছিল পরবর্তী মাসাধিক সময়ে।

ঐকালে স্বামীজী পুনশ্চ বৈষ্ণবধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে কালী-তত্ত্বের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন :

> "দাম্পত্যপ্রেম এবং সৃষ্টিকামনা অধিকাংশ ধর্মের ভিত্তিতে; ভারতে সে ধর্ম বৈষ্ণবধর্ম এবং পশ্চিমে খ্রীস্টধর্ম। কিন্তু কয়জনই বা মৃত্যুকে কিংবা কালীকে উপাসনা করার সাহস দেখাতে পারে! এসো, মৃত্যুর উপাসনা করি, ভয়ঙ্করকে আলিঙ্গন করি—তাকে ভয়ঙ্কর জেনে, নরম করে না নিয়ে! দুঃখ জেনেই দুঃখপূজা করি—এসো!"

এই ভ্রমণকালেই স্বামীজী 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি রচনা করেছিলেন, নিবেদিতার উদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে তা আগেই দেখেছি, তাঁর মহানাটকীয় আবৃত্তির কথাও শুনেছি। তাঁর সেই পৌরুষ-ভীষণ উক্তিগুলি, যা কোনো অনুবাদেই ধরা পড়বে না—

> "Yes! The older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. That is my new gospel. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!"
>
> "I love terror for its own sake, despair for its own sake, misery for its own sake. Fight always. Fight and fight on, though always in defeat. That's the ideal. That's the ideal."

তারপরে অবিস্মরণীয় ইতিহাস :

> "স্বামীজী বললেন—সগুণ ঈশ্বর হলেন সকল আত্মার সমষ্টি, কেবল মানবাত্মার সমষ্টি নন। সেই সমষ্টিভূত বিরাটের অভিপ্রায়কে কেউ রোধ

করতে সমর্থ নয়। তারই নাম নিয়তি। শিব, কালী প্রভৃতি বলতে তাকেই বুঝি আমরা।'

পৃথিবীর সর্বোত্তম নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় স্থান আমার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল, যখন তাদের মধ্যে অবস্থিত থেকে আমি ঐসব সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি শুনেছিলাম।

সিসিলি দ্বীপের কাছে যখন পৌঁছেছিলাম, তখন আঁধার ঘনিয়েছে, অস্ত-সূর্যের আকাশপটে এটনা-আগ্নেয়গিরি—শীর্ষে ধূম-বাষ্পের মৃদু উদ্‌গিরণ। মেসিনা প্রণালীতে যখন প্রবেশ করলাম, চন্দ্রোদয় হল আকাশে। স্বামীজী পায়চারি করছেন ডেকে, সঙ্গে আমি, তিনি এই সত্য বোঝাতে লাগলেন—সৌন্দর্য বহিরঙ্গ বস্তুগত নয়, তা মনোগত। আমাদের একদিকে ইতালী-উপকূলের ধূসর পাহাড়ের ভ্রূকুটি-রেখা, অন্যদিকে রূপোলী আলোয় ধোয়া দ্বীপখানি।—'আমি নয়, মেসিনাই ধন্যবাদ দিক আমাকে!'—তিনি বললেন—'আমি-ই দিয়েছি তাকে তার সকল সৌন্দর্য।'

তারপর বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জন্য তীব্র আকুলতা জন্মেছিল—তার কথা বলতে লাগলেন, কিভাবে একাসনে স্থিরভাবে বসে সারাদিন একটি মন্ত্রই জপ করতেন—সেই কথা। আমার প্রশ্নের উত্তরে তপস্যা কি, সেই কথাই ব্যাখ্যা করছিলেন, পুরাতন 'পঞ্চতপা' ব্রতের কথা বলছিলেন, যাতে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে মাথায় জ্বলন্ত সূর্য নিয়ে তন্ময় মনে বসে থাকে সাধক ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 'পূজা করো ভয়ঙ্করের! পূজা করো মৃত্যুর! আর সব বৃথা—বৃথা সকল সংগ্রাম! এই শেষ শিক্ষা। তাই বলে কাপুরুষের মৃত্যুকামনা নয়, দুর্বলের আত্মঘাত নয়। এ হল বীরের অভ্যর্থনা—মৃত্যুকে—সবকিছুকে যে শেষ পর্যন্ত যাচিয়ে বাজিয়ে দেখেছে, জেনেছে—এই শেষ উপায়! শেষ উপায়!' ”

এর পরে নিবেদিতার পক্ষে 'কালী দি মাদার' গ্রন্থরচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নিবেদিতা অনুভব করেন, যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তা এক মহান আচার্য কর্তৃক ন্যস্ত মহাদায়িত্ব—প্রকাশ তাকে করতেই হবে। নিবেদিতার প্রকাশ-অধীর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সেই ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি—'কালী দি মাদার' গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে Swan Sonnenschein & Co. Ltd., London, থেকে, পকেট সাইজে। ভারতীয় জীবনে এইটিই নিবেদিতার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

একথা সত্য যে, 'কালী দি মাদার'ই নিবেদিতার প্রথম পুস্তক, যত ছোট আকারেই হোক, কিন্তু নিবেদিতার একটি পুস্তিকা এর আগেই বেরিয়েছিল—কালী সম্বন্ধেই। সেটি আর কিছু নয়—নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ। অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার আগেই নিবেদিতা বক্তৃতাটি লিখে স্বামীজীকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন ('যা বলতে চাই, লিখে ফেলে নিয়ে যেতে চাই রাজার কাছে'—৩. ১. ১৮৯৯)। অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার পরেই পুস্তিকাটি বেরিয়েছিল কি না বলা শক্ত। সম্ভবতঃ বেরিয়েছিল। ২৮. ২. ১৮৯৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন—"তোমাকে এবং সারাকে কালী-বক্তৃতা পাঠাবার ভরসা করছি।

শুনছি বেরিয়েছে।" ২. ৫. ১৮৯৯ মিসেস হ্যামন্ডকে—"আমার কালী-বক্তৃতা তোমাকে পাঠাবার ইচ্ছা আছে, যদি কোনো কপি অবশিষ্ট থাকে।" ২. ৫. ১৮৯৯ তারিখে একই জনকে—"মনে হয় 'কালী' পাঠিয়েছি তোমাকে, যদি না পাঠিয়ে থাকি, মিঃ স্টার্ডি'র থেকে চেয়ে নিও।" এ সমস্তই নিশ্চয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তৃতা বিষয়ে নয়, পুস্তিকাকারে মুদ্রিত বক্তৃতার বিষয়েই।

পুস্তিকা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত উল্লেখগুলি সবই কালীঘাট-বক্তৃতার পূর্বে। কালীঘাট-বক্তৃতার পরে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, কালীঘাট মন্দির কর্তৃপক্ষের দ্বারা, সম্ভবতঃ সুষ্ঠুতরভাবে। ২৮ মে রবিবার বক্তৃতা হয়েছিল, আগের বুধবার নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন, "রবিবার কালীঘাটে বক্তৃতা; বক্তৃতাটি পরে হাজার কপি মুদ্রিত হবে; সুতরাং তুমি যা চাও পাবে—৫০টি পুস্তিকা।" বক্তৃতা হয়ে যাবার কয়েকদিন পরে ৩১. ৫. ১৮৯৯ তারিখে—"শুনছি, কালী-বক্তৃতা হাজারে হাজারে ছাপবে।"

এই কালীঘাট-বক্তৃতার একটি পুস্তিকা বেলুড় মঠ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। প্রকাশক : হরিদাস হালদার। সময়—১৯০০। বিনামূল্যে বিতরণের এই পুস্তিকা। অনুমান করছি, 'কালী দি মাদার' প্রকাশিত হবার আগেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

'কালী দি মাদার' বইয়ে যে-সকল রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়, তার মধ্যে সর্বাগ্রে কোন্‌টি রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। বইয়ের মধ্যেই দেওয়া ছিল : *The story of Kali* লেখা হয় লেগেট শিশুর জন্য, ১৮৯৮-এর বড়দিনের সময়ে বালীতে থাকাকালে। আত্মপ্রাণা জানিয়েছেন, ১৮৯৮-তেই *Voice of the Mother*ও লিখিত হয়। কোন্ সূত্রে তিনি এই সংবাদ পেয়েছেন জানি না, ডায়েরী বা পত্রজাতীয় কোনো সূত্র থেকে পেলে ভিন্ন কথা, কিন্তু নিবেদিতা স্বয়ং 'আচার্যদেব' গ্রন্থে যা বলেছেন, তাতে আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত তথ্য 'আংশিক' সত্য মনে হয়। 'স্বামীজী ও শক্তিপূজা' নামক অধ্যায়ে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে কালী সম্বন্ধে শ্রুত কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "From him was gathered, in such moments as these, almost every line and syllable of a certain short psalm called the *Voice of the Mother* which I wrote and published about this time."

আমরা আগেই দেখেছি—১৮৯৮-এর মাঝামাঝি থেকে ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে মাতৃভাবাবিষ্ট রূপে নিবেদিতা স্বামীজীকে দেখেছেন। সুতরাং আলোচ্য লেখাটি ১৮৯৮-৯৯ সালের যে-কোনো সময়ে রচিত হতে পারে।

আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত তথ্যে পাচ্ছি ২৪ মে *A Visit to Dakshineshwar* এবং ৪ জুন, ১৮৯৯, *An Intercession* লিখিত হয়।

'কালী দি মাদারে'র অধিকাংশ লেখা হয় আমেরিকায় মিঃ লেগেটের পল্লীভবন 'রিজলি ম্যানরে'। 'নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরে হাডসন নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে জায়গাটি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।' ২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা

রিজলি ম্যানরে পৌঁছান—সে সময়ে স্বামীজী ও-খানেই ছিলেন। ব্রতধারিণী নিবেদিতার কৃচ্ছ্রসাধনার ইচ্ছা, এবং স্বামীজী কর্তৃক তাঁর জন্য 'শান্তি' (Peace) কবিতাটি রচনা প্রভৃতি বিষয় আগেই জানানো হয়েছে। 'কালী দি মাদার' সম্বন্ধে মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন :

"এই সময়ে নিবেদিতা *Kali the Mother* পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন। নির্জন পরিবেশের মধ্যে ধ্যান-ধারণা এবং অবকাশমত লেখার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু দূরে একটি নির্জন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৭ই অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এই কুটীরে অবস্থান করিয়া পুস্তকখানি শেষ করেন। এই পুস্তকের অন্তর্গত *The Story of Kali* ও *The Vision of Siva* প্রবন্ধ দুটি পূর্বেই লেখা ছিল। জগন্মাতা কালী সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন নিজের মনোগ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা অপূর্ব ভাষায় *Voice of Mother* নাম দিয়া তাহাও পূর্বেই লিখিয়াছিলেন।"

নিবেদিতার চিঠিতে আরও কিছু সংবাদ পাই। ১৮ অক্টোবর, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"দেখছ, 'কালী' শেষ করতেই হবে। অন্য কাজও আছে। আবার যে-ভাবেই হোক আমি সর্বসময় নির্জনবাস চেয়েছি। সে পথে প্রধান বাধা আচার্যদেব। তাঁর সঙ্গে এবং সেন্ট সারার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যবস্থা হল—সকলকে জানানো হল, ১৫ দিনের জন্য নির্জনবাসে যাচ্ছি।......

আজ রাত্রে কালী-সাধকদের বিষয়ে রচনায় আটকে গেছি। রামপ্রসাদের শেষাশেষি অবধি লিখেছি। সেটি শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশের বাসনা ছিল—কিন্তু পারলাম না। কয়েকপাতা আজেবাজে লিখলাম, তারপর ছিঁড়লাম, তারপর হতাশ-বিরক্তিতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় টুকতে বসলাম। তুমি হয়ত হাসবে, কিন্তু আমার চিন্তাগুলি সুশৃংখল হচ্ছে না এখনো, তবে ভরসা করি, এইসব অসুবিধা সাময়িক।"

এই চিঠিতেই নিবেদিতা স্বামীজীর উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন—স্বামীজীর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা (তিনি 'পবিত্র' নন, 'স্বয়ং পবিত্রতা' ইত্যাদি), রামপ্রসাদের গান—যা আগেই উপস্থিত করেছি আমরা। নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে সদ্য শোনা এইসব বিষয় 'কালী দি মাদার'-এর মধ্যে তখনি সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

২৭ অক্টোবর নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন—

"গত রবিবার 'কালী দি মাদার'-এর শেষ ক্ষুদ্র রচনাটি শেষ করেছি। ছোট বইয়ের পাণ্ডুলিপি...শিশুর জন্য গল্প—তুমি ডায়েরী থেকে পাতা-গুলি কেটে পাঠিয়ে দিও।"

'শেষ ক্ষুদ্র লেখাটি' কোন্‌টি বোঝা শক্ত। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 'কালী দি মাদার'-এর রচনাসূচী নিম্নোক্ত প্রকার :

Concerning symbols	
The Vision of Siva—	(মুক্তিপ্রাণা অনুযায়ী ১৭ অক্টোবরের আগে লেখা)
Two Saints of Kali— (Ramaprasad and Ramakrishna)	(নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে লেখা)
The Voice of the Mother—	(এর তারিখ আত্মপ্রাণার মতে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কথা জানিয়েছি)
A Visit to Dakshineswar	আত্মাপ্রাণা অনুযায়ী ২৪শে মে, ১৮৯৯
An Intercession	আত্মপ্রাণা অনুযায়ী ৪ঠা জুন,১৮৯৯
The Story of Kali for a Western Baby	গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত নোট অনুযায়ী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে লিখিত।
Kali the Mother	স্বামীজীর কবিতা

আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত তথ্যগুলি ঠিক হলে 'কালী দি মাদার' গ্রন্থে প্রথম সন্নিবিষ্ট রচনা *Concerning symbols* -ই নিবেদিতা-কথিত 'শেষ ক্ষুদ্র রচনা'।

আরও বোঝা যাচ্ছে, লেগেট-শিশুর জন্য লেখা গল্পটি নিবেদিতার ডায়েরী-পৃষ্ঠায় ছিল (লেগেটদের কাছে পৃথকভাবে সেটি তিনি পাঠাতেও পারেন), যে-ডায়রী তিনি ম্যাকলাউডের কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং ম্যাকলাউড সেখান থেকে উদ্ধার করে তাঁকে পুনশ্চ পাঠিয়ে দেন।

বইটির প্রকাশ কিন্তু সহজসাধ্য হয়নি। তার জন্য নিবেদিতাকে যথেষ্ট চিন্তার থাকতে হয়েছে। যে প্রচন্ড আবেগে তিনি বইটি লিখেছিলেন—লিখে অনুভব করেছিলেন যে এর মধ্যে একটা মেসেজ আছে—সেই আবেগ গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে অযথা বিলম্বে প্রতিহত হয়েছিল। মিঃ লেগেটের প্রভাব ও প্রচেষ্টা ভিন্ন বইটি পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রকাশিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। ৪ নভেম্বর, ১৮৯৯-এর চিঠিতে দেখছি নিবেদিতা লিখেছেন, 'মিঃ লেগেট প্রকাশক ঠিক করার চেষ্টা করছেন।'

এ চেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরে চলে, শেষকালে এমন অবস্থা ঘটে যে, পাঁচ মাস পরে ৫ এপ্রিল তারিখে হতাশ নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন—

"তোমার কি মনে হয় না, পাশ্চাত্ত্য থেকে কালী বইটি ছাপাবার সমস্ত অভিপ্রায় ত্যাগ করে স্বরূপানন্দের কাছে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—কপিরাইট রেখে দিয়ে। ভারতেই বইটি বিশেষ বিক্রীর সম্ভাবনা। যদি তাই স্থির কর স্থানত্যাগের আগে তুমি ওটি (পাণ্ডুলিপি) পাঠিয়ে দেবে কি? এসব ব্যাপারে আমি একেবারে ব্যস্ত নই, শুধু জানতে চাই, ওর থেকে স্কুলের টাকা জুটবে কি?"

ইতিমধ্যে নিশ্চয় দ্রুত কিছু ব্যবস্থাদি হয়েছিল। ১২ মে তারিখে নিবেদিতা লিখলেন—"সত্যি-ই কি কালী-বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে?...আশা করি,...ভারতীয় কপিরাইট সংগ্রহ করবে এবং সোজা আকারে বার করবে। **ভারতকে 'কালী' কিনতেই হবে।"**

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

পুনশ্চ ১৩ মে তারিখে—"কালী-বইটির সংবাদ কী অপরূপ! জানিনা কিভাবে আমার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব! এ বিষয়ে মিঃ লেগেটকে লিখতে এখনো চেষ্টা করিনি।"

কালী বই কেবল প্রকাশের ব্যবস্থাই হয়েছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে ফরাসী অনুবাদের সম্ভাবনাও ঘটে। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু মঁসিয়ে নোবেল এ-ব্যাপারে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। ঐ ১৩ মের চিঠিতেই নিবেদিতা লেখেন—

"মঁসিয়ে নোবেল—কী না চমৎকার! নিশ্চয় 'কালী দি মাদার' তাঁর অনুবাদের (ফরাসীতে) উপযোগী ছোট আকারের—যদি তিনি সত্যই অনুবাদের যোগ্য মনে করেন!"

কয়েকদিন পরে ১৮ মে তারিখে নিবেদিতা লিখলেন—

"বইটির ব্যাপারে ব্যবস্থাদির জন্য কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই। প্রুফ পেলে দারুণ খুশী হব। দুটি আলাদা প্রচ্ছদপট সম্ভব হবে, তাতেও আনন্দবোধ করছি। ভারতীয় কপিরাইট সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া চাই, আমার **বিশ্বাস**, ভারতে বইটি চলবে।"

'কালী দি মাদার' ঠিক কোন্ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলা শক্ত। মনে হয় মে থেকে অগস্টের মধ্যে কোনো এক সময়ে। পয়লা অগস্টের (?) এক চিঠিতে বইটিকে নতুনভাবে সাজানোর কথা পাচ্ছি—তা কি বইটি বেরিয়ে যাবার আগে না পরে?—বলা শক্ত। নিবেদিতা ওলি বুলকে লেখেন :

"You will be delighted to know that they offered to reset the type and everything and make *Kali the Mother* exactly like the project of the R.K.... for £38-2—instead of £35-8-10. So Mr. Leggette paid at once, and I think it is now probably will on."

মনে হয়, এই সময়েও বইটি প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত বলতে অবশ্য বাজারে প্রকাশিত ধরতে হবে। নচেৎ বইয়ের উপরে লেখা আছে, নভেম্বর, ১৮৯৯।

নিবেদিতা বইটির ভারতীয় সংস্করণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন আগেই দেখেছি। তিনি ভারতীয় সংস্করণের কপিরাইট ছাড়তে রাজী হননি। ৯ জুন (?) ১৯০০, তারিখে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মায়াবতীর অবশ্যই কালী-মুদ্রণ করা উচিত। আর ভারতে বিক্রীও হবে, এবং ক্যালিফোর্ণিয়ায়। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডে ছাপার চেয়ে অনেক সস্তা পড়বে এবং ডাক খরচও কম হবে।"

ভারতীয় সংস্করণ অবিলম্বে করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে নিবেদিতা কিছু হতাশ হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য মুদ্রণ-সম্ভাবনা দেখা যেত। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল চিঠিতে লিখেছেন—"যদি স্বরূপ শেষ পর্যন্ত ছাপতে রাজী হয়, কভারের জন্য আমি ধূসর (Grey) রঙের কাগজ জোগাড় করে দেব, কারণ কালী—ধূসর। আমি পাটল রঙ (Pink) একেবারেই পছন্দ করি না।"

কাছাকাছি সময়ে বইটির ভারতীয় কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলতে পারব না। আত্মপ্রাণার মতে হয়নি—প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক।

বইটির আমেরিকান সংস্করণও কি প্রকাশিত হয়েছিল? বলতে পারব না। এক্ষেত্রে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী তারিখে মিঃ লেগেটকে লংম্যানস্ গ্রীন কোম্পানীর তরফ থেকে লেখা একটি চিঠিতে সেজাতীয় প্রয়াসের কিছু বিবরণ পাই :

Hand 93 Fifth Avenue
New York Jan 16, 1909

Francis H. Leggette, Esq.,
West Broadway,
New York City.

Dear Sir,

We are in receipt of your favor of January 15th, authorizing us to proceed with an American edition of "Kali the Mother", and in reply we would say that since writing you in December, we have had a communication from Miss Noble, informing us that she is in correspondence with the publisher of London edition, regarding her general rights in the matter, and we presume we shall hear from her, in due course, as to the outcome of that correspondence. As soon as we do hear from her, we will proceed with the matter.

With Compliments, we are
Yours very truly,
Longmans, Green & Co.

আগেই বলেছি, নিবেদিতা মনে করতেন, এই বইয়ের মধ্যে একটা 'মেসেজ' আছে ভারতের জন্য। এটিকে নিজের প্রেরণা-মুহূর্তের সৃষ্টি মনে করতেন। সে প্রেরণা অবশ্য সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ-প্রাপ্ত। তাই তাঁর বক্তব্য—"জানো কি, আমার মনে হচ্ছে, স্বামীজীই ছোট্ট 'কালী'-বইটির আসল লেখক।" একথা ভাবগতভাবে সত্য, বহুলাংশে তথ্যগত ভাবেও। কেবল স্বামীজীর প্রেরণাই নয়, স্বামীজীর উক্তিসমূহকেও নিবেদিতা বহু সময়ে অব্যাহতভাবে ধরে রেখেছেন এই বইয়ে, 'Voice of the Mother' কার্যতঃ স্বামীজীর উক্তির অপরিবর্তিত সংকলন, একথাও বলেছেন), শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে স্বামীজী বা সারদানন্দ প্রভৃতির কাছ থেকেই শুনেছেন, রামপ্রসাদের গানের অনুবাদও বহুলাংশে স্বামীজীর করা, নিবেদিতার পত্রাদি থেকে তা পাই, সংস্কৃত স্তোত্রাদির অনুবাদও তাঁর মারফৎ-ই পাওয়া, কালী-তত্ত্ব কিভাবে স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছেন, তাও দেখেছি, সুতরাং বস্তুগতভাবেও যে বইটি প্রধান অংশে স্বামীজীরই—একথা নিবেদিতা বলতে পারেন।*

এই কথাই নিবেদিতা আরও পাঁচ বছর পরে লিখছেন, স্মৃতিচারণার সুরে—

> "লেডী বেটী (মিসেস লেগেট) রিজলিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে আর একবার যেতে পারলে খুবই আনন্দিত হব। কিন্তু এবছর তা হওয়া সম্ভব নয়। সেখানে কত কি রয়েছে আমার! সেখানে 'কালী' লেখাও হয়েছিল। সমস্ত কাজের উৎসর্গ তার মধ্যে, কারণ আমার বিশ্বাস তিনি এ বই আমার হাতে লিখেছিলেন।" (২১ জুলাই, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে)

সুতরাং নিবেদিতা বইটি স্বামীজীকে উৎসর্গ করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না। উৎসর্গ তাই বলে 'বিবেকানন্দ' নামে নয়—বিবেকানন্দ যে স্বরূপে নিবেদিতার কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন সেই নামে।

TO
VIRESHWAR
LORD OF HEROES

এই তত্ত্বটি কিন্তু নিবেদিতার কাছে গোপন গভীর একটি সত্য—ম্যাকলাউড, ওলি বুল প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ এর কথা জানতেন। স্বামীজীর 'বীরেশ্বর' ডাক নাম নিবেদিতার উপলব্ধ সত্যের বিচিত্র পূর্ব-স্বীকৃতি।

উৎসর্গের মূল কথাটি বাইরের কেউ বুঝুক, নিবেদিতা কদাপি তা চাননি। তাই ব্রহ্মবাদিন কাগজে যখন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় 'কালী দি মাদারে'র সমালোচনায় ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা হল—তখন নিবেদিতা অত্যন্ত

---

* নিবেদিতা যে স্বামীজীর কথাই বলেছেন বা লিখেছেন, তা সহজেই বোঝা যায় 'আচার্যদেব' গ্রন্থের পরিশিষ্টে যুক্ত মাতৃউপাসনা সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত নোট দেখলে। নোট করেন মিস ওয়াল্ডো, বক্তৃতা হয় আমেরিকায়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের এক রবিবার অপরাহ্ণে।

অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করেছিলেন। মনে করেছিলেন, তাঁর গভীর কথাটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল প্রকাশ্য দিবালোকে, জনচক্ষে। ঐ বিরক্তি কিছুটা আতঙ্কযুক্তও ছিল। নিবেদিতা প্রমুখ কেউ কেউ স্বামীজীর অবতারত্ব নিজেদের মধ্যে চালু করতে চাইছেন, এই ধরনের কানাঘুষা এবং সমালোচনা কোথাও কোথাও ছিল। এসব ব্যাপারে স্বমীজীর আশঙ্কাও যথেষ্ট। এখন 'বীরেশ্বর শিব' যদি পরিষ্কার বিবেকানন্দ হয়ে দাঁড়ান, তাহলে সমালোচকদের কণ্ঠই আরও জোরালো হয়ে উঠবে —ব্রহ্মবাদিনের লেখা থেকে তারই সম্ভাবনা নিবেদিতা দেখেছিলেন।'

নিবেদিতা ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯০১-তে ম্যাকলাউডকে লেখেন—"ব্রহ্মবাদিনের কালী-বইয়ের সমালোচনা একেবারে যা-তা। কৌতূহলী পৃথিবীর কাছে ব্যাখ্যা করে—খুলে বলে দিলে—বীরেশ্বর স্বামীজীর বাড়ির নাম......।"

ব্রহ্মবাদিনের লেখায় অজান্তে নিবেদিতার বিরুদ্ধে যত 'অন্যায়ই' করা হোক না কেন—লেখাটি মনোযোগের বস্তু হতে পারে। কালীতত্ত্ব যে এতখানি দার্শনিক ও কাব্যিক গভীরতার সঙ্গে লিখিত হওয়া সম্ভব— ভারতবাসীর কাছে তাই ছিল পরম বিস্ময়ের বস্তু। নিবেদিতার আধা-মিস্টিক রচনার দুরূহতা অথচ অনস্বীকার্য আকর্ষণ সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এবং সেই চরম বাক্যটি লেখা হয়েছে—'নিবেদিতাই তাহলে এই পৃথিবীতে জগন্মাতার ভাষা রচনার জন্য আবির্ভূত!'

লেখাটি উদ্ধৃত করছি :

KALI THE MOTHER—By the Sister Nivedita of the order of Ramakrishna (Published by Swan Sonnenschen & Co., London, 1900).

A weired little book, 3 in by 6. Dark blue wrapper folding over on either side. We open the book with great curiosity, and wonder at the dedication: To

Vireswar—Lord of Heroes.

A friend explains, that was the home name of Swami Vivekananda, usually abbrerviated to *Beele*. The next page discloses the strange contents. . . . . . .

We are so fascinated, we do not care to read the chapters from begining to end in the given order. We turn to the simplest title—A visit to Dukineswar, and read it slowly through, and could not without much effort make anything of it, the friend proposing various guesses as to the meaning. The result is that the weird first impression is deepened. We then take up the first chapter, and are charmed with the many profound reflections on the contrast between the religious genius of the East and that of the West. And so we read on, a chapter here and a chapter there, stopping

now and then to enjoy the inspiration produced by the *Sat Sanga* of the book, occasional remarks of a 'very sincere woman' 'truly religious' &c. escaping us. We recognise a true artist's hand in the portraits given of Ramaprasad and Ramakrishna ; and we are reminded of painters who with a few black lines produce perfect pictures. Two of the chapters are prayers of a deeply sincere religious spirit, and we are tempted to compare them with the meditations of the devoted Thomas a Kempis.

A friend to whom we gave the book to read, became so enraptured with the interpretation of Kali the Mother, that he exclaimed "Was Nivedita born to interpret the Divine Mother to the world!"

Another, after going through it remarked that there was a mystic glow of loveliness about tht poetic prose of Nivedita's booklet which in several places mirrors forth the sentiments of Swami Vivekananda in all the glory of an English woman's language and imagery.

'কালী দি মাদার' নিবেদিতার হাত দিয়ে স্বামীজীর রচনা, সত্য, তবু স্বামীজী লেখাটির সবটুকু অংশ পছন্দ করেন নি। আমরা আগে নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী দেখে এসেছি, স্বামীজী কালী-বক্তৃতার অংশবিশেষকেও অপছন্দ করেছিলেন। 'কালী দি মাদার' বইটির অংশবিশেষ সম্বন্ধে স্বামীজীর আপত্তি আরও স্পষ্ট, হয়ত কঠোর হয়েছিল। নিবেদিতা বিশেষ আহত হয়েছিলেন তাতে। যে-বস্তুকে তিনি গুরু-প্রদত্ত মনে করেন, স্বয়ং গুরু যদি তার কোনো অংশকে অপছন্দ করেন, মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাহলে অবশ্যই ঘটে। এ ব্যাপারে নিবেদিতা তাঁর আহত মনোভাব এক পত্রে তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। ৮ অগস্ট, ১৯০০-তে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"স্বামীজী যে-কালী-অধ্যায়টিকে পছন্দ করেননি—সে বিষয়ে বিশেষ ভাবছি; কিন্তু সেখানে যা বলেছি অন্য কিভাবে তা বলতে পারতাম বুঝতে পারছি না। যদি তিনি আমার হয়ে কিছু লিখে দেন, আমি সানন্দে তা সেই জায়গায় বসিয়ে দেব। কিন্তু আমি মনে করি, জিনিসটি বলতেই হবে। জানি, তিনি যা বলেছেন সব সত্য। এ পর্যন্ত এমন কোনো নির্বোধ জিনিস ঘটেনি, যাকে কেউ না কেউ নিজের প্রেরণায় সৃষ্ট বলে দাবি করেনি —তাঁর একথা ঠিক। তাহলেও, আমরা কেউই অন্য-লব্ধ প্রেরণার উপর ভর করে কাজ করতে পারি না। ভ্রান্তি ঘটানো কখনো-কখনো কারো কারো ভাগ্যে থাকেই। কথাগুলো এত অবাধ্যের মত শোনাচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। যদি স্বামীজী আদেশ করেন অংশটি বাদ দিতে, দেব। আর তা যদি তিনি

না করেন, তাহলে—যদি অচিন্তিতপূর্ব বিকাশ কিছু আমার মাথায় না আসে—ও জিনিসটা থাকবে।

আমি যা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা হল—আমাদের কারো কারো দ্বারা অনুভূত কালীপূজার অনিবার্য নৈতিকতার রূপ, যাতে কালীপূজার বিরুদ্ধে প্রচলিত আপত্তিগুলি মূল্যহীন হয়ে যায়।

অবশ্য আমার সিদ্ধান্ত বিজ্ঞোচিত বা যথাযথ হয়েছে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত নই; নিশ্চয় করে শুধু এইটুকু বলতে পারি—সিদ্ধান্ত আমি করেছি।"*

স্বামীজীকে যদি আমরা জেনে থাকি, নিশ্চয় করে আমরাও বলতে পারি, নিবেদিতার জন্য সংশোধনী কিছু তিনি লিখে দেননি, এবং কোনো একটা অংশকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে, এমন আদেশ দেননি। সুতরাং কালীপূজার নৈতিকতা সম্বন্ধে নিবেদিতার ব্যাখ্যা অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। তথাপি এই ঘটনার আরও প্রায় পাঁচ বছর পরে (জুলাই ২১, ১৯০৫-এর উদ্ধৃত পত্র স্মরণ করুন) কি করে লিখতে পারলেন, 'আমার বিশ্বাস, তিনি এই বই আমার হাতে লিখেছিলেন'? এখানে একমাত্র ব্যাখ্যা নিবেদিতার কথা থেকেই উপস্থিত করতে পারি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মত প্রেরণা-পুরুষদের সম্বন্ধে নিবেদিতা বারবার বলেছেন—তাঁদের অনেকখানি প্রকাশই অসচেতন : যিনি দিচ্ছেন তিনি জানেন না, যিনি পাচ্ছেন তিনিই জানেন।

নিবেদিতা যখন বইটি লিখছেন তখন তিনি কিরকম কালীগতপ্রাণ তার সামান্য পরিচয় তাঁর পত্র থেকে তুলে ধরছি :

"মিসেস ওয়াটারম্যানের পুত্র এবং পুত্রের এক বান্ধবী এসেছিলেন বলতে যে, প্রথমজনের পিতা মৃত্যুশয্যায়, আর মিসেস ওয়াটারম্যানও সেই আঘাতে মৃত্যু-যাতনায়। কী ভয়ঙ্কর! আর-গত সোমবার সন্ধ্যায় মেরী হেল ও আমি তার ঘরের আগুনের পাশে বসে ছিলাম, 'The Voice of Kali' পড়ছিলাম এবং Law of Suffering সম্বন্ধে তর্ক করছিলাম।" (১০. ১২. ১৮৯৯)

---

* অংশবিশেষে অপছন্দ করলেও স্বামীজী বইটিকে নিশ্চয় সম্পূর্ণ অপছন্দ করেননি, এবং তার প্রচারগত সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০১, মিসেস ওলি বুলকে লিখেছেন—

"মার্গটের 'কালী দি মাদার' বইয়ের প্রশংসা সকলেই করছে। কিন্তু হায়, কেনার জন্য কেউ বই পাচ্ছে না—পুস্তক বিক্রেতারা বিক্রয় বাড়ানোর ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন।"

নিবেদিতার বই যে সমকালে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল, স্বামীজীর কথা থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় বেশী আলোচনা আমাদের চোখে পড়েনি। তবে অভিনব সৃষ্টি বলে সম্মানিত যে হয়েছিল তা বুঝি, কারণ, হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকার অগস্ট, ১৯১২, সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'History of Bengali language and literature' বইয়ের আলোচনার মধ্যে ডাঃ অনন্দ কুমারস্বামী লেখেন—

"Amongst the the later poets, like Rama Prasada Sen, were devout worshippers of Kali. No one as yet, except the late Sister Nivedita in her *Kali the Mother*, has attempted to make the idea of Kali intelligible to European minds."

সুতরাং—নিজ জীবনের ধ্রুব রূপ কোন্ মহাশক্তিতে নির্ধারিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে স্থির প্রত্যয় হয়ে নিবেদিতা লিখলেন :

> "এখন আমি দৃঢ় নিশ্চয়—আমার সম্বন্ধে স্বামীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে?—যদি কালী, শিব ও গুরুভক্তি প্রভৃতির বিষয়ে তাঁর মনের গভীর অংশটুকু না জানতাম, তাহলে এই শক্তি পেতাম না।" (২০.১২. ১৮৯৯)

পাঠককে এইখানে পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেব, এই সময়েই স্বামীজী ওলি বুল ও নিবেদিতার উপরে তাঁর কর্মভার চাপিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'নারীর কাছ থেকে যা এসেছিল, নারীকেই তা অর্পণ করলাম।' এবং নিবেদিতা বলেছিলেন, পৃথিবীতে এই প্রথম একজন প্রফেট তাঁর মিশন অর্পণ করে গেলেন নারীর উপরে।

প্রসঙ্গের একেবারে শেষে একটি সাক্ষ্য উপস্থিত করছি। 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে যা লিখিত হয়, তার অংশ :

> "একদিন নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসে তাঁর বিচিত্র স্বদেশী কাপে চা খাচ্ছি—সহসা আকাশ ঢেকে গেল গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার পরিচিত দারুণ কালবৈশাখীর কালো মেঘে। দেখি—তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীর মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন। প্রকৃতির করাল গতির ছায়া তাঁর মুখে। নূতন দীপ্তি সেখানে —ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর। একেবারে স্তব্ধ—আমার অস্তিত্ব যেন সেই মুহূর্তে বিস্মৃত—জানালার বাহিরে খরদৃষ্টি নিবদ্ধ—সেখানে আকাশ ও পৃথিবী-জোড়া ভীষণের ক্রম সমারোহ; ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে শুনছেন ধেয়ে-আসা, আছড়ে আছড়ে পড়া ঝঞ্জার হুঙ্কার। তারপরে—যখন মেঘে মেঘে প্রথম সংঘর্ষ—প্রথম ঝলসানো বিদ্যুৎ—তখন বলে উঠলেন রুদ্ধশ্বাসে—কালী!"

একটি আলোচনা

[নিবেদিতা প্রধানতঃ ইংরেজীতে লিখতেন বলে বাংলা পত্রপত্রিকায় তাঁর গ্রন্থের উপরে বেশী আলোচনা হয়নি, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়েনি। সুখের বিষয় 'কালী দি মাদার' বইটি অবলম্বন করে বিস্তৃত একটি লেখা বেরিয়েছিল 'সাহিত্য' পত্রিকায়, কার্ত্তিক, ১৩১৯, সংখ্যায়। লেখক শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি সেকালে সুপরিচিত গ্রন্থকার। তত্ত্বভূয়িষ্ঠ রচনায় এঁ'র খ্যাতি ছিল।

এই লেখাটি খুবই উচ্চাঙ্গের, এমন কথা আমরা মনে করিনা। গুরুভার বাচনভঙ্গিতে স্বচ্ছতার অভাব আছে। তবু, একজন তাত্ত্বিক পণ্ডিত অভারতীয় নিবেদিতার রচনার তাত্ত্বিক অংশকে প্রশংসার চোখে দেখে বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকায় তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—এইটাই লেখাটির পুনঃ-উপস্থাপনার পক্ষে যথেষ্ট কারণ।]

কালিকা

Kali the Mother—by Sister Nivedita

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হিন্দু বিশ্বের বীজস্বরূপিণী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী মহামায়া পরমাপ্রকৃতির প্রতীক পূজা করিয়া থাকেন। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু প্রভৃতিতে যে মূর্তি রচিত হইয়া থাকে, সেই মূর্তিরূপ যন্ত্রের সাহায্যে পূজাসাধনের নামই প্রতীক-পূজা। ইহা ভিন্ন ঘটে ও পটে প্রতীক-পূজা হইয়া থাকে। এখন সমাজের এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, হিন্দুর সন্তান প্রতীক-পূজার ও পুত্তলী পূজার তফাৎ করিতে অসমর্থ। মায়ার বৃতিতে আবন্ধ, সংস্কারের সঙ্কীর্ণতায় সসীম মানবের মানস-মুকুরে যে ভূমার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। সান্ত অনন্তের প্রতিবিম্ব ধারণে অসমর্থ। তাই মানব সকল বিষয়েই প্রতীকোপাসক। মানবের মনে, ভাবে, ভাষায়, কল্পনায়, ধ্যানে, ধারণায় সান্তের প্রতিমা বা প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত হইয়া থাকে;—ক্ষুদ্র মুকুরে বৃহতের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে না,—পড়িতে পারে না,—বৃহৎ বিপ্রকৃষ্ট থাকিলে ক্ষুদ্র হইয়াই ক্ষুদ্র মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে;—সন্নিকৃষ্ট হইলে উহার ক্ষুদ্র অংশই ক্ষুদ্র মুকুরে দেখা যায়। কিন্তু অনন্তের অংশও অনন্ত, সুতরাং সান্ত জীবাত্মার মানস-মুকুরে তাহা প্রতিবিম্বিত হয় না—হইতেই পারে না। সেই জন্য সাধকের হিতার্থ অনন্ত ব্রহ্মের সান্ত মূর্তি কল্পিত হইয়াছে।

মূর্তি বা প্রতিমায় অনন্তের বিভূতি কল্পিত ও ব্যক্ত করিতে হয়। মূর্তি-কল্পনার ইহাই প্রকৃত রহস্য। প্রকৃতির প্রতীকপূজা এই নিয়মেই সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। প্রতীক পূজার এই যে রহস্য, ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার Kali the Mother নামক পুস্তিকায় তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়, অনেক হিন্দুর সন্তান এখন যে-তথ্য বুঝিতে পারেন না,—সম্পূর্ণ ভিন্নদেশে জন্মিয়া, প্রতিকূল প্রতিবেশ অবস্থার মধ্যে লালিতা হইয়া মনস্বিনী নিবেদিতা জন্মান্তরের সুকৃতিবলে তাহা বুঝিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় পাশ্চাত্ত্য চিন্তার, পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রাচ্য প্রতীক-পূজার রহস্যে অনেকটা প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মূর্তিপূজা

ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার গ্রন্থের প্রথমেই প্রতীকের আলোচনা করিয়াছেন। মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার হইতেই ভগবানের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। দুইটি স্বতন্ত্র মূর্তি একই ধারনা বা একই ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। ভাষা, ভাবের প্রতিমা বা প্রতীকমাত্র। ধরাবাসী সমগ্র মানবের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য-আবশ্যক বস্তু একই। সেই জন্য বিদেশের ভাষা শিক্ষাকালে আমরা বৈদেশিক শব্দ সন্ধানে ব্যস্ত হই। "তৃষ্ণা" বলিলে আমার যে বেদনা বা অনুভূতি বুঝায়, "thirst" বলিলে ইংরাজের সেই বেদনা বা অনুভূতিই বুঝাইয়া থাকে। তৃষ্ণা শব্দ বাঙ্গালীর রচিত যে বেদনা বা অনুভূতির শাব্দিকা মূর্তি thirst শব্দ ইংরাজের রচিত সেই অনুভূতিরই শাব্দিকা মূর্তি। মূর্তিকে চিনিলেই আমরা ভাবকে চিনিতে ও চিনাইতে পারি। ভাবের অর্চিঃ ভাবেরই প্রতিমা শব্দে বর্তে, তাই শব্দ দেখিয়া ভাবের পরিচয় মিলে। সেইজন্য যেখানে ভাবসাম্য, সেখানে কেবল প্রতিমার পরিচয় পাইলেই ভাবের পরিচয়লাভ সম্ভব। কিন্তু অনুভূত বস্তু ও অনুভাবকের বিপর্যয় বশে অনুভূতিরও বিপর্যয় হইয়া থাকে। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য-ফলে অনুভূতির মূর্তি-শব্দেরও অর্থস্বাতন্ত্র্য ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভাষার শব্দ স্থূলতঃ একই ভাবের প্রতিমা বা মূর্তি হইলেও, উহাদের মধ্যে অর্চিঃ বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজীতে "twilight" বলিলে যাহা বুঝায় বাংলায় সন্ধ্যা বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। মেরুসন্নিহিত দেশসমূহে দিনের আলোক নিশার অন্ধকারে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবার পূর্বে আলোকে ও আঁধারে একটা বহুক্ষণব্যাপী মেশামিশি হইয়া থাকে। পলে পলে আলোকের পরিবর্তন যে গম্ভীরতা আনিয়া দেয়, না দেখিলে তাহার অনুভূতি অসম্ভব। আর সেই সময়ের সহিত দৈনন্দিন ব্যাপারের কত স্মৃতি, কত ভাব, কত অভিজ্ঞতা জড়াইয়া একটি ভাবের সৃষ্টি করে। সে ভাব twilight শব্দেই ব্যক্ত হয়। twilight শব্দ সেইভাবেরই পূর্ণ প্রতিমা। আমাদের সন্ধ্যা শব্দ সে ভাবের পূর্ণপ্রতিমা নহে। এদেশে সন্ধ্যা বলিলে twilight এর প্রতিমা পূর্ণমাত্রায় মনোমধ্যে জাগিয়া ওঠে না। এদেশে দিনের আলোক নিশার আঁধারে ত্বরিতে মিশিয়া যায়। সুতরাং ইংরেজী twilight শব্দ আর বাংলা "সন্ধ্যা" শব্দ ঠিক একই ভাবের দ্যোতনা করে না। উভয় দেশের শাব্দিক প্রতিমা স্বতন্ত্র। প্রদোষ শব্দও ঠিক ঐ ভাব প্রকাশ করে না। রজনী

প্রভাতা হইলেও উভয় অঞ্চলে twilight হয়। আলোক ও অন্ধকারে ঐরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে থাকে। এদেশের ঊষায় ঠিক সেরূপ হয় না। এদেশে দেখিতে দেখিতে ঊষার আলোক বালভানুকিরণে পরিণত হয়। এদেশে twilight নাই, সুতরাং বাঙালী সে ভাবের প্রতিমা গড়ে নাই। সেইজন্য বাংলায় twilight শব্দের প্রতিশব্দও নাই।

ইংরেজী gloaming শব্দ বাঙ্গালীর গোধূলি শব্দেরই অনুরূপ। প্রদোষের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, উৎসুকা নাগরী দিবাশ্রমশান্ত নাগরের গৃহাগমন প্রতীক্ষায় গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথপানে চাহিতেছে—"ঐ এলো, ঐ এলো" ভাব শব্দটির সহিত যেন জড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে;—প্রত্যাশিতের আগমনে পরিবারের মধ্যে যেন কেমন একটা কোমলভাবের প্রবাহ ছুটিতেছে, নিদ্রিত শিশুর অধরে কোমল হাস্য ফুটিতেছে। এই সমস্ত ভাব gloaming শব্দ-প্রতিমায় অনুস্যূত রহিয়াছে। বাংলা "গোধূলি" শব্দ ঠিক ঐ সময়কে বুঝায় সত্য, কিন্তু ঐ শব্দের সহিত বঙ্গীয় পল্লীজীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠে। তপন প্রতীচ্য দিক্‌চক্রবালপ্রান্ত* আশ্রয় করিয়াছেন। নিশাসমাগম-শঙ্কিত রাখাল গো-পাল লইয়া পল্লীর অভিমুখে ফিরিতেছে; প্রত্যাবর্তনশীল গো-পালের ক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে; দূরে গ্রামপ্রান্তস্থ শ্যামল শষ্পসমাচ্ছন্ন প্রান্তর-প্রান্তে রাখাল ও গো-পালের এই চিত্র গোধূলিশব্দের সহিত বিজড়িত। আর দেখিতে দেখিতে গাভীগণের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিকে আশ্রয় করিয়াই নৈশ অন্ধকার যেন সমস্ত দৃশ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙালীর পল্লীজীবন এই ধারণার সৃষ্টি করে,— 'গোধূলি' শব্দ এই ধারণারই শব্দময় চিত্র। 'গোধূলি' বলিলে এই সমস্ত দৃশ্যপট যেন মানস চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। ইংরাজী gloaming ও বাংলা গোধূলি একই কালের দ্যোতনা করে সত্য—কিন্তু উভয়ের প্রতিমা বা মূর্তি স্বতন্ত্র। এক কথায় দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, জাতির প্রকৃতি ও ব্যক্তির বিশেষত্ব অনুসারে শব্দের ব্যঞ্জনা ও ভাষার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

ধর্মসম্পর্কিত ভাব ও তাহার প্রতীক ঠিক এইরূপভাবেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। অনন্তঃজ্যোতিঃ আমাদের ধারণার মধ্যে আইসে না, উহা আমাদের চিন্তাশক্তির ভিতর দিয়াই মানস মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিভেদে ও জাতিভেদে চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র হয়; সুতরাং ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণা ও তাহার মূর্তি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। দুই জাতির বা দুই ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ও ধারণা সম্পূর্ণ একরূপ হয় না;—ফলে, তাহাদের মানস-প্রতিমা স্বতন্ত্রই হইয়া থাকে। আরব জাতির সমাজে পিতাই শ্রেষ্ঠ। আরবের মরুপ্রান্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ান্ পুরুষই সমাজের গোপ্তা ও পরিচালক। তাঁহারই ইঙ্গিতে শত শত যুবক সমরক্ষেত্রে প্রাণদানে প্রস্তুত। সকলে তাঁহারই আজ্ঞাধীন। সমাজে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ ও অপ্রতিহত প্রভাব। পিতৃশাসিত সেমেটিক জাতির মনে সেইজন্য শক্তিমানের কল্পনায় পিতৃপ্রতিমাই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহারা সর্বশক্তিমানকে পিতা বলিয়াই ডাকিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, আর্যজাতির সমাজে রমণীই প্রধানা। প্রতীচ্যখণ্ডে ভার্যাই সর্বেসর্বা, ভার্যাই স্বামীর সম্রাজ্ঞী। প্রাচ্যখণ্ডে জননীই সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবীমূর্তি,—সংসারের পবিত্রতা বিধায়িনী ও শান্তিপ্রদায়িণী। মা মা বলিয়া ডাকিলে এই অঞ্চলের

লোক যত তৃপ্তি, যত শান্তি পায়, বুঝি আর কিছুতেই তেমন তৃপ্তি পায় না। মা মা বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া যে ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। তাই বোধ হয় ক্যাথলিক খ্রীস্টান, শিশু খ্রীস্ট কোলে কুমারী মেরীর পূজা করিয়া থাকেন। মা শব্দের মত সর্বসন্তাপহারক শব্দ জগতে আর নাই। সাধকের আত্মা ইষ্টদেবের নিকট ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় হইয়া পড়ে। ভারতীয় বর্ণাশ্রমিগণ মাতৃত্বের পূর্ণভাবের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ভারতে মাতৃমূর্তির পূর্ণ প্রতিমা গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্যই কালীমূর্তি স্ত্রীমূর্তি—মাতৃমূর্তি। ভক্ত হিন্দু কালীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মাতৃপ্রতিমা অতি অদ্ভুত। প্রতীচ্যখণ্ডে রমণী-প্রতিমার সহিত কাব্যকলার সমস্ত কোমল ও কান্তভাব বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতেও যে ঐরূপ মাতৃমূর্তি নাই, তাহা নহে। নিবেদিতা সে মূর্তির উল্লেখ করেন নাই—সম্ভবতঃ তিনি উহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কালিকা মূর্তিই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। এই মূর্তি দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা শিহরিয়া উঠেন। এই মূর্তি বিবসনা লোলরসনা, বিকট দশনা,—এলোকেশী ও চতুর্ভুজা; মূর্তির এক হস্তে কৃপাণ, অন্য হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরশির। আবার অন্য দুই হস্তে বর ও অভয়। মূর্তির গলে দোদুল্যমান নরশিরের মালা, মূর্তি বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ, পদতলে লুণ্ঠিত শিবের উপর নৃত্যশীলা। মূর্তি বিভীষণা ও অসাধারণী। যাহারা মায়ের কেবল মূর্তির ঐটুকুমাত্র লক্ষ্য করে,—তাহারা মূর্তির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। মায়ের স্নেহমাখা স্বর তাহাদের কর্ণে পশে না। হিন্দু এই মূর্তিরই পূজা করিয়া প্রীতি অনুভব করে।

শিব

প্রকৃতি অনন্তসৌন্দর্যশালিনী। সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিত দ্রুম-দলশোভিনী, সুহাসিনী প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে শান্ত, শুভ্র নির্বিকার ও নির্মল সত্তা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেন প্রকৃতির অন্তরালে নির্বিকার, নিরঞ্জন, মূক ও অনন্ত শূন্যতার মধ্যে কে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া বোধহয়। পার্থিব সৌন্দর্যের মধ্যে যেন কেমন এক দ্বৈতভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। হিন্দু যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই এই দ্বৈতভাব দেখিতে পায়। আলোকের সহিত অন্ধকার, আকর্ষণের সহিত বিপ্রয়োগ, সৃষ্টির সহিত লয়, কারণের সহিত কার্য ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও স্ত্রী ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা—এই দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টিরহস্য-উদ্ভেদের ইঙ্গিত এইখানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়াই যেমন মানবতা, প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়াই তেমনি বিশ্ব। প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিরোধ বা বিবাদ নাই। স্ত্রী ও পুরুষের সমবায়ে যেমন মানবতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সেইরূপ বিশ্বও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত পরমাত্মার বিরোধ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু বলিয়া আসিতেছে,—পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তি অভিন্ন। মানবের কল্পিত মূর্তি মানবত্ব-জড়িতই হইবে। লোককোলাহলশূন্য নির্জন দেশে বিশাল পর্বতের বিপুল ছায়া মানবের

মনে ভূমার গুণবিশেষ উদ্রিক্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বেশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে না। বাহ্য আকৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা সম্ভব নহে। নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

Hinduism has avoided this danger of fixedness in a curious way. Of all the peoples of the earth it night be claimed that Hindus are apparently the most, and at heart, the least idolatrous"

ইহার মর্মার্থ এই, "হিন্দু অতি চমৎকার উপায়ে বন্ধভাব পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুরাই আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক পৌত্তলিক,—কিন্তু অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, অন্য কোনও জাতি তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সমর্থ হয় নাই।" মনস্বিনী ভগিনী নিবেদিতা বাস্তবিকই হিন্দুর মর্মকথা বুঝিতে সমর্থা হইয়াছেন,—হিন্দুধর্মের প্রকৃত রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারিয়াছেন। বাহ্য আকৃতি লইয়াই হিন্দু ব্যস্ত নহে,—ভাবের পথ ধরিয়া হিন্দু বিশ্বপ্রহেলিকার সমাধানে ব্যগ্র। বাহ্য আকৃতি বা প্রতিমা সেই ভাবেরই প্রকাশকমাত্র। বাহ্যবস্তু অবলম্বন করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, হিন্দু তাহা বুঝে; সেইজন্যই হিন্দু প্রতীকোপাসক। বিশাল হিমালয়ের বক্ষে নিত্য শুভ্র হিমানীর উপর কৌমুদীরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, —চন্দ্রিকাসমুদ্ভাসিত হিমানী দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্তকাল নিঃস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে,—আর তাহারই উপরে শশিকলাকে ভালে লইয়া নিবিড় নীলিমাময় অনন্ত আকাশ প্রকৃতির নগ্নামূর্তিরূপে নৃত্য করিতেছে,—এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হিন্দুর মনে যদি প্রকৃতিপুরুষের লীলা-কথা উদিত হয়,—যদি সে মনে করে, এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির মূলে নিত্য, শুদ্ধ, নিরঞ্জন ও নির্বিকার আত্মা অবস্থিতি করিতেছে; হিমাদ্রিশিখরশায়ী হিমরাশির ন্যায় উহা দুরধিগম্য, কিন্তু উহারই বক্ষের উপর নৃত্যশীলা নগ্না প্রকৃতির প্রত্যেক লীলারই প্রতিবিম্ব পতিত হইতেছে,—তাহা হইলে সে ভাব হৃদয়ে পুনর্বার জাগাইবার জন্য সেই ভাবমূলক প্রতীক রচনা করিবার প্রবৃত্তি হিন্দুর মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। সে প্রতীকপূজা পুত্তলিকার পূজা নহে, ভাবেরই পূজা। হিন্দু যেখানে সেইভাব প্রতিফলিত দেখে, সেইখানেই প্রকৃতি পুরুষের মূর্তি দেখিতে পায়। হ্রদের জল নিথর নিঃস্পন্দ লহরীশূন্য। কৌমুদীরাশি তাহারই উপর ছড়াইয়া তাহাকে শুভ্র করিয়া তুলিয়াছে। আর সেই শুভ্র সলিলরাশির উপর তীরস্থ তরুলতা, পত্রপুষ্প প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আর সেই সকল প্রতিবিম্বমধ্যে চন্দ্রকলার প্রতিবিম্ব পূর্ণ ভাস্বরতায় সকলকেই পরাজিত করিয়াছে।—এ দৃশ্য হিন্দুর মনে প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়,—তাই হিন্দু ইহারও প্রতীকপূজক। তাই বুঝি বিসর্জনের সময় দর্পণে বা পাত্রস্থজলে মায়ের পাদপদ্মের প্রতিবিম্ব দেখিতে হয়। হিন্দুর এই প্রতীক উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলা বিষম ভ্রম।

প্রকৃতি ও পুরুষের, শিবের ও শক্তির সম্বন্ধ কি? য়ুরোপীয়দিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য য়ুরোপীয়ভাবে মনস্বিনী নিবেদিতা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা সত্য, কিন্তু তাহাকে ক্রিয়া করাইবার জন্য পুরুষের প্রয়োজন। আত্মার সহিত অভিজ্ঞতার যে সম্বন্ধ, ডায়নামোর (dynamo) সহিত বিদ্যুতিক শক্তির

যে সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সেই সম্বন্ধ। একের সহিত অন্যের সংযোগের ফলে শক্তি ও কার্যকারিতা উদ্ভূত হয়, বিশ্বব্যাপারে ইহা নিত্য পরিদৃশ্যমান। শিষ্য শ্মশানে নিশীথে শবের উপর আসীন। অকস্মাৎ গুরুর মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ শিষ্যের কর্ণে পশিল। শিষ্য নির্ভয়ে শবসাধনায় ব্রতী হইল। সাধনবলে শবে জীবনীশক্তির সঞ্চার হইল। সেইরূপ পুরুষের অশরীরিণী শক্তির সঞ্চারে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। শিব ও শক্তি পৃথক নহে। নিবেদিতা এই তথ্যই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জীবমাত্রেই শিব। মানবাত্মা শিবরূপে প্রকৃতির লীলা দেখিতেছে।

ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিতে হইলে পার্থিব সকল সম্পদই পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন কি, সুখ, দুঃখ উভয় ভাবেরই পরিহার আবশ্যক হইয়া উঠে। সেইজন্য শঙ্কর ভিখারী,—আপনার যজ্ঞকুণ্ডের ভস্মে আপনি আবৃত। মহাযোগে নিমগ্ন। তাঁহার নয়নদ্বয় অর্ধনিমীলিত। পার্থিব কোন ব্যাপারই তিনি লক্ষ্য করেন না। জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে মায়াকল্পিত স্বপ্নরাজ্য। তাঁহার প্রজ্ঞাই কেবল ক্রিয়াশীল। সেইজন্য আদর্শ মানবরূপী শিবের ললাটে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত। তাই শিব বিরূপাক্ষ। তিনি সর্বজীবের আশ্রয়। বিষধর ভুজঙ্গও তাঁহার গলদেশে উপবীত-রূপে আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বপ্রেমে বিভোর। ভূত, প্রেত, পিশাচও তাঁহার প্রেমের পাত্র। সংসারের সকল দুঃখ-জ্বালা তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বিষপানে নীলকণ্ঠ। তাঁহার কিছুই নাই। বৃদ্ধ বৃষই তাঁহার বাহন, যোগের ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার আসন। তিনি আশুতোষ; বিল্বদল ও গঙ্গাজলেই তিনি তুষ্ট। তিনি সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, বীরেশ্বর ও বিরূপাক্ষ। ভগ্নী নিবেদিতা এই ভাবেই জীবরূপী শিবের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবাত্মা বা পুরুষ মায়া বা প্রকৃতির অর্ধাঙ্গ। মায়া নশ্বর ইন্দ্রিয়-বৈচিত্র্যজ্ঞান। জীবাত্মা শবরূপে পতিত। নিষ্ক্রিয় ও বাহ্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। কালী বা প্রকৃতি ভীষণামূর্তিতে সংহারকার্যে নিযুক্তা। চারিদিকেই সংহারের ভীষণ দৃশ্য। তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা, হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরশির ও উদ্যত কৃপাণ, অকস্মাৎ তাঁহার পদ তাঁহার ভর্তার বক্ষ স্পর্শ করিল। শিব ঊর্ধ্বে চাহিলেন; জীবাত্মার প্রজ্ঞা চক্ষু, মায়ার চক্ষুর সহিত সম্মিলিত হইল। মায়া লজ্জায় দশনে রসনা কাটিলেন। শিব সেই মহা মেঘপ্রভা সাক্ষাৎ সংহারিণী মূর্তিধারিণী মায়াকে পরমা·সুন্দরী দেখিলেন। তখন সেই নগ্না, ভীষণা, সংহারিণী প্রকৃতি সংহার-জন্য বেদনায় ব্যথিতা নহেন, বরং প্রফুল্লা। পিশাচগণ তাঁহারই প্রদত্ত পিশিতে পরিপুষ্ট। এ হেন প্রকৃতির উপর যোগী জীবাত্মার প্রজ্ঞাদৃষ্টি পতিত হইল। তখন প্রকৃতি তাহাকে বরাভয় কর উদ্যত করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষুশালী জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ মহাশক্তিকে চিনিলেন। তিনি শক্তিকেই মাতৃসম্বোধন করিলেন। প্রকৃতির রহস্য উদ্ভিন্ন হইল। মায়াবদ্ধ শিব 'জীবাত্মার' সহিত পরমাত্মা পরমা-প্রকৃতির মিলন হইল। যোগীর যোগ সাফল্য লাভ করিল।

কিরূপে সাধকের এই আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে? কিরূপে সাধক 'মা'-কে চিনিতে ও জানিতে পারে? প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্যশালিনী ও বৈচিত্র্যময়ী। কিন্তু তাঁহার সেই সৌন্দর্যময়ী যবনিকার অন্তরালে বিভীষিকাময় শ্মশানের দৃশ্য লুকাইয়া

রহিয়াছে। সে দৃশ্য সর্বজ্ঞের সর্বতোবিসারিণী দৃষ্টি অতিক্রান্ত করিতে পারে না। প্রকৃতির অঙ্কে জীব জীবের প্রাণসংহার করিতেছে। স্রোতস্বতী ভূধরকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছে, ধূমকেতু পৃথিবীকে চূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই যেন মধ্যগগনে খর করপালতুল্য পুচ্ছ উদ্যত করিয়া উদিত হইতেছে। জীবের হাহাকার, ব্যথিতের আর্তনাদ, পিপাসিতের মর্মোচ্ছ্বাস, ভয়চকিতের আতঙ্কধ্বনি প্রভৃতিতেই প্রকৃতির ক্রোড় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যথিতের বেদনার প্রতি তাঁহার একেবারেই দৃক্‌পাত নাই,—উপেক্ষার অট্টহাস্যে তিনি সেই বেদনাধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছেন। হিন্দু, প্রকৃতির এই দৃশ্যে অন্ধ নহে। হিন্দু হৃদয়ের মর্মতল ভেদ করিয়া বলিতে পারে—"মাগো, তুমি বিশ্ব-সংহারিণী সত্য কিন্তু তথাপি আমি তোমারই শরণাগত।" "মশানের মধ্যেই মায়ের করুণার কমল প্রফুল্ল রহিয়াছে।" নিবেদিতা দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে মায়ের মূর্তিকে চিনিয়াছেন। সাংখ্য মতে পুরুষ অনেক; প্রকৃতিই এক। নিবেদিতা বলেন পুরুষ সাধক, প্রকৃতি বিশ্বাত্মার মূর্ত প্রতিমা—মায়া। পরমাত্মা, মায়া কর্তৃক উপহত হইয়া, পদতলে মথিত হইয়া জীবাত্মারূপে শবের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। সাধনায় জীবাত্মার প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। তান্ত্রিকগণ সকলে কালী-মূর্তির এই ব্যাখ্যা করেন না। তাঁহারা বলেন, শিবই পরমাত্মা, কালী পরমাপ্রকৃতি। ঐশী শক্তি মায়ারূপে সৃষ্টিস্থিতি সংহার করিতেছেন, ঈশ, শুভ্র, শান্ত, নির্বিকল্প ও নিরঞ্জন অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। নিবেদিতা এ ব্যাখ্যাও গ্রহণ করিয়াছেন। মূলে সকল ব্যাখ্যাই এক। নিবেদিতা য়ুরোপীয়দিগকে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সাধক রামপ্রসাদ ও পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এই দুইজন মায়ের ভক্ত সাধকের সাধনপদ্ধতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষানবীশদিগের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

'কালী দি মাদার' গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ

['কালী দি মাদারে'র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হয়েছে। 'নির্বাচিত' কথাটি ব্যবহার করা বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ এই ক্ষুদ্র বইটির প্রায় সবটুকুই অনূদিত হয়েছে। এই বইয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের অনুবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে, পাঠক দেখেছেন। পরে অন্যপ্রসঙ্গে The Voice of the Mother এর অনুবাদ দেওয়া হবে। এখানে দেওয়া হল 'প্রতীকোপাসনা', 'শিবানুধ্যান', 'মায়ের গল্প' ও 'রামপ্রসাদ'।

'প্রতীকোপাসনা', 'শিবানুধ্যান' ও 'মায়ের গল্প' অনুবাদ করেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনা বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যে-সব আলোচনা হয়েছে, তাদের মধ্যে নিবেদিতার এই লেখার স্থান উচ্চে। নিবেদিতা জন্মে এবং প্রথম জীবনের শিক্ষায় ভারতীয় নন, সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বচ্ছন্দে রামপ্রসাদকে বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে স্থাপন করে বিচার করা সম্ভব হয়েছে, যে-ধরনের বিচার করতে আমাদের পক্ষে সাহসের অভাব বা হীনমন্যতার প্রভাব বাধা ঘটায়। নিবেদিতার আলোচনার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে সুনীলচন্দ্র সরকার নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি :

"আমাদের শ্যামা সঙ্গীতগুলির একটা উদার মানবিক ব্যাখ্যানের জন্য বাংলা সাহিত্যের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নিবেদিতার কাছে। সেই কাব্যরসবেদিত্ব তো তাঁর আগে কেউ প্রকাশ করেননি, কাজেই ঐ সুন্দর কবিতাগুলিকে আমাদের সাহিত্যের রসবিপণিগুলি থেকে পৃথক হয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উমার সৌন্দর্য নানা গানে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তাঁর বাপের বাড়ি আসার কাহিনীটিও গল্পে-প্রবন্ধে নানা জায়গায় কাব্যমণ্ডিত করেছেন। রামপ্রসাদের গানে তিনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার কাব্যিক বিশ্লেষণ তিনি করেননি, যেমনটা করেছিলেন আমাদের গ্রাম্য ছড়ার, মধ্যযুগের কবীর প্রভৃতির কবিতার, বাউলের গানের। সেই কাজ কী চমৎকার করেছেন নিবেদিতা!...... রামপ্রসাদের গানের যে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন নিবেদিতা, তার থেকেই তাঁর রসজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যখন বিদেশীদের জন্য আমাদের সাহিত্য-সম্ভার ইংরাজীতে মেলে ধরতে চেষ্টা করি, তখন এইগুলি নিশ্চয় কাজে লাগাতে পারি।"*

---

* রামপ্রসাদের গানের ইংরাজী অনুবাদ যতখানি নিবেদিতার, অন্ততঃ ততখানিই স্বামীজীর, একথা আমরা সহজেই বলতে পারি।

'কালী দি মাদার' বইটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের আরও কিছু সাধারণ মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায় :

"(কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি) ভজনার মধ্যে সমস্ত মানবাত্মার যে সার্বিক প্রেরণা, দ্যোতনা, আকৃতিগুলি কাজ করে, যা নানাভাবে সর্বদেশের সংস্কৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে, শুধু তাদের ধর্মচেতনায় নয়, তাদের কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পেও—তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। শিক্ষিত জীবনের সঙ্গে বরং তার একটা বিরোধ-আশঙ্কা স্থায়ী আসন পেতেছিল আমাদের মনে। নিবেদিতা এই সত্য দেখতে পেলেন অত সুন্দর করে তাঁর অনন্য কাব্যদৃষ্টির সহায়তায়। 'মূর্তি হল কুসংস্কারমাত্র, তা বর্জন করা উচিত'—এমন কথা তিনি বললে দোষের হত না। কিংবা তিনি বলতে পারতেন, ও ভারতীয়দের একটা বিশেষ সাধনার উপায়। কিন্তু তিনি তার মধ্যে দেখলেন সমস্ত মানবচিত্তের স্বাভাবিক প্রতীক-প্রবণতার উন্মেষ। ক্রীশ্চানদের পরম আনন্দ-দর্শন (Beatific Vision) ভগবানকে মায়ের কোলে শিশুরূপে দেখা, ম্যাডোনাকে নিয়ে তাদের নানা ভাবোচ্ছ্বাস—আর তার সঙ্গে তুলনায় আমাদের ঐ ভয়াল কালী-মূর্তি—এই সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলেন নিবেদিতা। তিনি ডি জি রসেটীর সনেট থেকে লাইন তুলে দেখিয়েছেন সেখানে ভার্জিন মেরীর শ্রদ্ধানম্রতা, বুদ্ধির প্রাঞ্জল গভীর সরলতা, অক্লান্ত ধৈর্য কী সুন্দর।......আবার পাশ্চাত্ত্য কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান কার কাছ থেকে কালী ধ্যানের ইঙ্গিত পেয়ে অনুভব করেছেন, 'সে যে আসে, ঐ আসে,'......তাও স্মরণ করেছেন নিবেদিতা। মিলিয়ে দেখেছেন সমস্ত বিশ্ব-সাহিত্যের সাক্ষ্য, তার মধ্যে যোগ্য স্থান দিতে চেয়েছেন ভারতীয় আত্মার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার আবিষ্কারকে।

এই হচ্ছে এমন এক সাধনার ফল, যাকে আমরা বলতে পারি দ্রষ্টা কবির সাধনা। 'কবির্মনীষী'র যে সিদ্ধান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথে পাই, তারই সূচনা দেখি নিবেদিতাতে।"]

প্রতীকোপাসনা

(Concerning Symbols)

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা হতেই ঈশ্বরের প্রতীক সৃষ্টি করে নিই আমরা। ও নিয়ে দুটি মানুষের ধারণা কখনও ঠিক একরকম হয়না।

আমরা ভাষা বলি যাকে, সেও এক ধরনের প্রতীক। তার সম্বন্ধেও ওই কথাটা খাটে।

প্রতিদিনের সাদাসিধা প্রয়োজনগুলি সারা পৃথিবীতে সব মানুষের বোধহয় একই। এজন্য যেসব কথায় প্রত্যেক দেশে পরস্পরে একটা মিল আছে, সেগুলি আমরা খুঁজে বার করতে চাই। সেইসঙ্গে এও জানি যে, প্রত্যেকের মুখের ভাষাতেই

কোনও একটা ভাব কিরকম যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর অন্য সব বাতিল হয়ে যায়। দুটি মানুষের ভাষায় ঠিক একই ধরনের জোর বা খুঁত কখনও চোখে পড়েনা আমাদের। আরও তলিয়ে দেখি যদি তো একটা দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অভ্যাসের মধ্যেই সবসময় সে-দেশের ভাবনা কিংবা ভাবাভিব্যক্তির স্ব-তন্ত্র বৈশিষ্ট্যের হেতুটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী খানিকটা সময়কে বোঝাতে উত্তরে আমরা বিশেষ একটি কালকে বলি আলো-আঁধারি (Twilight)। ভারতবর্ষে ঠিক ওই সময়-টারই নাম দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যাকাল। তার কারণ ওরকম 'আধ-আলো আধ-ছায়া'র কোন পর্ব নাই এখানে। দিবালোক ও নিশান্ধকার এদেশে যেন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে পরস্পরকে।

দৃষ্টান্ত আরও ফলিয়ে তোলা চলে। সায়ংকাল (gloaming) কথাটার সঙ্গে একরাশ ভাবানুষঙ্গ জড়ানো রয়েছে আমাদের মনে—আসন্ন সন্ধ্যার কম্প্র ছায়া, ঘরে ফিরে আসার মাধুরী, খোকা-খুকুদের ঘুমজড়ানো হাসির শেষ রেশটুকু। গোধূলি বেলা বললে ভারতীয় ভাষাতেও অমনি এক আবেগের সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠে।

কিন্তু দুয়ের মধ্যে কী সুস্পষ্ট পার্থক্য! ওই যে, মাঠের ধার দিয়ে গোয়ালিনী তার গরুগুলিকে রাতের মত গ্রামে নিয়ে চলেছে। ওদের খুরের ঘায়ে রোদে-পোড়া মেঠো পথ থেকে মেঘের মত ধুলা উড়ছে ওদের পিছনে। সব কিছু হঠাৎ কেমন আবছা হয়ে গেল, ধুলা উড়ে আকাশ ছেয়ে গেছে যেন। গোচরের মাঝখানে গয়লা মেয়েটিকে দেখতে অনেক বড় লাগছে।

গোধূলি কথাটিতে ভাবের যে-উৎস খুলে যায়, তা সত্যই এই পূবদেশের নিজস্ব। গরু-বাছুরের সব কিছু সাদরে খুঁটিয়ে দেখে ভাষায় তা ধরে রাখা হয়েছে। ওর খুরের গর্তে যেটুকু জল ধরে আর্যজাতির মধ্যে সে একটি অতি পরিচিত মান!

ভাষার ক্রমবিকাশে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী মুখ্য নিমিত্ত হলেও ব্যক্তিগত ও জাতি-গত বৈশিষ্ট্যবশতঃই যে প্রতিটি ভাষা এবং ভাষাগোষ্ঠী পরস্পর হতে পৃথক হয়—এরপর তা নিয়ে আর যুক্তিতর্ক নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মসংক্রান্ত প্রতীকের ব্যাপারটাও অনেকটা এই ধরনের। সম্যক উপলব্ধির ন্যূনতা থাকায় সেই ধ্রুবজ্যোতিকে আমরা যে যার নিজস্ব ধারণার পরকলার মধ্য দিয়েই দেখতে বাধ্য। কারও একজনের সঙ্গেই বোধহয় অন্য কারও পরকলাটার মিল নাই। আবার, ব্যক্তিগত আত্মোন্নতির ফলে কেউ কেউ সার্বলৌকিক ভাবনার কেন্দ্র হতে বহুদূরে এমন এক-একটি ভূমিতে গিয়ে পৌঁছান যে, খৃীস্টান, বৌদ্ধ বা এমনি সব বিভিন্ন অধ্যাত্ম চেতনার বিশাল ক্ষেত্রে অদ্যাবধি যে-প্রগতি ঘটেছে, মনে হয় তাঁরা যেন তার চরম সীমাই নির্দেশ করছেন।

এইটি করা, কিংবা সুপ্রাচীন ধ্যান-ধারণার মানদণ্ডটিকে কেন্দ্র করে একটা জাতিকে নতুন এক সংঘচেতনায় প্রচোদিত করাই ধর্মজগতের মহাশক্তিধর পুরুষদের বিশেষ দায়।

এমনি করে ঈশা আত্মশক্তিতে প্রাচীন ইহুদী ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠার খুঁটি যে

সত্যপরায়ণতা—তা-ও ছাড়িয়ে গিয়াছিলেন দুর্বার বেগে। ধর্মের কেতন তিনি নিজহাতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রেম ও করুণার রাজ্যে। সংগ্রামী সাধকরা তাঁর আগেই সে-রাজ্যে পা দিয়েছিলেন, তা ঠিক। কিন্তু ওই প্রেম ও করুণাকে জীবধর্মের মর্মস্থান এবং শক্তি কেন্দ্র করে তোলার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারও তো ছিলনা!

আর তাই আমরা প্রত্যেকে শুধু তাঁর নিজস্ব ভাব-ধারায় ভাবিত হয়ে, তাঁর জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অনুসরণ করেই বিশ্ববাসীর স্বপ্নেরও অগোচর উপায়ে ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতায় তাঁর দোসর হতে পারি। ম্যানিঙের জীবন দিয়েই কি ক্যাথলিকদের বিভব সমৃদ্ধতর হয়নি? ফ্রান্সিস রিড্‌লি হ্যাভারসালের জন্য প্রটেস্টান্টদের?

এ যদি সত্য হয় তাহলে প্রত্যেকের নিজস্ব কল্পনারই একটা তাৎপর্য আছে আমাদের জীবনে। প্রত্যক্ষতঃ আমাদের নিজ নিজ ভাবনা-চিন্তা দিয়েই আমাদের সংস্কারের খোলসটা তৈরি হলেও মনের উপর চিরাচরিত প্রথার যে-প্রতিক্রিয়া হয় তার পরোক্ষ প্রভাবও থাকে। ফলে, সব অবগুন্ঠনের মত এতে একদিকে যেমন দেখার সুবিধা হয়, অন্যদিকে তেমনি সে-দেখা আবার সীমিতও হয়। প্রতিটি প্রতীকের অর্থ যদি সম্যক উপলব্ধি করতে পারি কেবল তাহলে-ই ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের যা-ধারণা তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু দূর হয়ে যাক মনের এ খোলসগুলো।

প্রতীক-আবরণ, বাধা-বন্ধ সব কিছু বাদ দিয়েই যে সেই স্বয়ম্ভূ বৈশ্বানরকে বরণ করতে উৎসুক আমরা। ভগবানকে না দেখেও যদি জীবন কেটে যায়, তবে সেই ভাবেই মরি না কেন? ভয়ের কি আছে তাতে? অনাদি-নিধন প্রলয়াগ্নিতে ভস্মসাৎ করো—আমাদের ভাসিয়ে দাও মহা প্রাণসমুদ্রে। তবুও বলব, যে-অমৃত-ধারার পিপাসায় তৃষ্ণার্ত এ-প্রাণ, তার মাঝখানে আর কিছু যেন ঢুকিও না। না, ছায়ামাত্র নয় অন্য কিছুর।

সত্য একথা। তবু আমাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট একটা পথ আছে। আমরা নিজেরা হয়তো এখনও তা খুঁজে ফিরছি। কোথায় কখন যে তার হদিশ মিলবে তা-ও আমাদের অজানা। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে নিরূঢ় রয়েছে এ আশ্বাস যে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসবেই একদিন। বাঁশি বাজবে গোপন সঙ্কেতে, ইষ্টনাম সেদিন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশবে' আমাদের। যেমন করেই হোক কোথাও কোন এক দিন সেই শান্তিধামের দুয়ারে পা দেব আমরা। পরমা সংদৃক্ যে-পথের শেষ, সে-পথ একদিন আমরা ধরব-ই।

আর যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন, প্রাচীন হিন্দু কবি তাঁর দোঁহায় নিজেকে উদ্দেশ করে বেশ বলেছেন,—

তুলসী জগৎমে আইয়ে সব্‌সে মিলিয়া ধায়।
ন জানে কৌন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্‌ যায়॥

[Tulsi, coming into this world,
Seek thou to live with all—

for who knows where or in what guise,
The Lord Himself may come to thee?"]

আমাদের দৈনন্দিন জীবনই ঈশ্বরের প্রতীকটি আমাদের যুগিয়ে দেয়।

মরুভূমির আরবদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের পিতা যিনি, তিনি ধীরভাবে ন্যায়ান্যায় বিচার করেন, আত্মীয়-কুটুম্বদের রক্ষক তিনিই—শিশুর মত যারা তাঁর কোলের কাছে খেলে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে স্নেহবৎসল। যা কিছু হতে নিরাপত্তার আশ্বাস পায় মানুষ, তিনি স্বচ্ছন্দে তার জাতিরূপ (type) হতে পারেন।

তাই স্বভাবের নিয়মেই—নিত্যসত্ত্বের সঙ্গে আত্মার অনতিপরিস্ফুট সংযোগে সেমিটিক মনে 'পিতা'—এই মহান সংজ্ঞার প্রভাস্বরতাই পরমোল্লাসে ঝলসে ওঠে।

পরমেশ্বর আমাদের পিতা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্ত যে,—তার সঙ্গেও এমনই এক আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা তিনি যে, কোনো অকাজ-কুকাজেই তা ছিন্ন হওয়ার নয়। মানবিক সম্পর্ক যদি অচ্ছেদ্য হয়, দিব্য সম্পর্ক কি তার চেয়ে খাটো হতে পারে? 'পিতা'—এ-সম্বন্ধের বাঁধনে এতই আপন তিনি যে, আজও দশাসই এক আফগান মসজিদে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে ত্রিদশাধিপতিকে বলবে, 'তুমি' —'তোমার',—ছোট ছেলে তাদের কোলে বসে যেমন বলে তাঁকে!

আর্যদের ঘরে নারীর আসন সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্ত্যে সে যেমন তার স্বামীর ঘরে সর্বময়ী কর্ত্রী এবং তাঁর হৃদয়েশ্বরী, প্রাচ্যে সে তেমনি তার সন্তানের হৃদয়-সিংহাসনে আরাধ্যা দেবী—শুভদা ও শান্তিদায়িনী।

মায়ের কোলে কচি খোকা তিনি—ঈশ্বর সম্বন্ধে খ্রীস্টানের এই ঐকান্তিক প্রত্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হৃদয়ের গভীরে কি যেন এক আলোড়ন জাগে আমাদের। দোলনার পাশে স্নেহাতুরা মা, ক্রুশের নীচে ভক্তিমতী উপাসিকা আর পরম দীনতায় মহীয়সী—শোকে জর্জরিতা, ভালবাসার আগুনে অগ্নিদগ্ধা নারী-হৃদয়ের এ-আদর্শ মানবজাতিকে ক্যাথলিক চার্চের এক মহার্ঘ উপহার।

রসেটির সনেটে নারীত্বের আদর্শ তার নিজস্ব ধরনে অতুলন হয়ে ফুটে উঠেছে :

এই সে সুভগা মেরী
'যামেবৈষ বৃণুতে'—কন্যাকুমারী।
কতকাল গেল তার পরে,
গালিলির নাজারেথে কাটল কৈশোর তার,
দেবতার সংকল্পে সে বয়ে আনল নিষ্ঠার অর্ঘ্য,
আনল মেধার গভীর ঋজুতা,
আর ক্ষান্তি—পারমিতা।
কৈশোর এমনই ছিল তার
যেন দেবদূতের অমৃত-সিঞ্চিতা লিলি,
দেবতার একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে চলেছে—নিথরে।

ভাটিকানে কোন ম্যাডোনার সামনে কখনও নতজানু হয়নি যারা, তাদের জন্য ঈশা নিজেই চিরন্তন নারীত্বের এ-সুরে আলাপ করে গেছেন—

"বোঝার ভারে অবসন্ন শ্রমক্লান্ত যারা, তারা আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের সঞ্জীবিত করব। আমার দায় মাথায় তুলে নাও তোমরা। আমিও যে দীনহীন নম্রস্বভাব—আমায় চিনতে শেখো, তাহলেই প্রাণে তোমরা শান্তি পাবে।"

এ কি একটি মেয়েরই বুকফাটা ডাক নয়?

না, নিজের স্বভাবের এ-দিকটা সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। একবার অন্ততঃ তাঁর মুখে এই ভাবের কথা ফুটেছিল।

ভাবীকালের মুক্তিসেনাদের তরুণ অধিনায়ক হিসাবে সূর্যকরোজ্জ্বল পর্বত-শীর্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নীচে, স্বজাতির মহানগরীটির দিকে চেয়ে দেখছেন—ঘোর নিয়তির ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন তার অদৃষ্ট। সেই পরম মুহূর্তে সহজ মানুষের ব্যাকুল বেদনায় স্বদেশবৎসল ঈশা ভুলে গেলেন তিনি ঈশান, জীবের মুক্তিদাতা পরিত্রাতা তিনি। সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে গেলেন শুধু মাতৃমূর্তি।

"জেরুজালেম, হায় জেরুজালেম! প্রবক্তাদের হত্যা করেছ তুমি, যারা ঈশ্বরপ্রেরিত, পাথর ছুঁড়েছ তাদের লক্ষ্য করে। মুরগী যেমন তার ছানাগুলিকে ডানার তলায় জড়ো করে ঢেকে রাখে, কতবার তেমনি করে তোমার সন্তানদের বুক দিয়ে আড়াল করেছি আমি—কিন্তু তুমি তো তা করলে না!"

সাধকের প্রাণ সবসময়ই ছোট্ট একটি শিশুর মত হয়ে যায়। এই শিশুসত্তা যখন দেবতার দেখা পায়, তখন সাধারণতঃ তাঁকে মায়ের মতনই দেখে। পূত অমৃতান্নের (Blessed Sacrament) সামনে ধ্যান করতে গিয়ে কোন একজনের কলমে এসেছিল এই অপরূপ আশ্বাসবাণী—

"ওরে বাছা, আমায় খুসী করার জন্য বেশি কিছু জানতে হবে না তোকে। কেবল প্রাণ ভরে ভালবেসো আমায়। মা তোমায় কোলে তুলে নিলে যেমন করে কথা বলতে মায়ের সঙ্গে, তেমনি করে কথা কও আমার কাছে।"

কিন্তু এই মাতৃ-উপাসনার ভাবটি পূর্ণতা লাভ করেছে ভারতবর্ষে। দেবতার যেসব প্রতীক এদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়, কালীমূর্তি তার অন্যতম। ভগবানকে নারীরূপে উল্লেখ করাটা এখানে একেবারে প্রথাগত হয়ে গেছে। আর কাজে কাজেই সরাসরি সম্বোধনের বেলায় তাঁকে কেবল 'মা' বলে ডাকলেই চলে।

কিন্তু কি অদ্ভুতভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে তাঁকে! শিল্প ও কাব্যে যা কিছু মধুর, যা কিছু অনর্ঘ, পশ্চিমে তার সবটুকু উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে ওই মাতৃ-উপাসনার ভাবটিতে। মা তাঁর খোকার সঙ্গে খেলা করছেন, কি আদর করছেন তাকে, বা সেবা করছেন। কখনও-বা মায়ের বাহু-দুটিই হয়েছে তার রাজাসন। জগৎবাসীকে আশীর্বাদ করতে শিশু ঈশ্বর সেই আসনেই আসীন।

কিন্তু প্রাচ্যে মাতৃমূর্তির সর্বজনস্বীকৃত প্রতীক হল, এক আলুলায়িতকুন্তলা নগ্নিকা। এমনই ঘননীল তাঁর গায়ের রঙ্ যে, অসিতবরণী বলে মনে হয় তাঁকে। তিনি চতুর্ভুজা—দুই হাতে বরাভয়, আর অন্য দুটিতে খড়্গ ও রক্তক্ষরিত নরমুণ্ড। নৃমুণ্ডমালিনী হয়ে লোলরসনায়, শবাসনে শয়ান, ভস্ম-শুভ্র কলেবর এক পুরুষের বুকে নৃত্যপরা তিনি।

এ এক ভয়ঙ্করীর অলোকসামান্যা মূর্তি! এ-মূর্তিকে বীভৎস বলে যারা, তাদের স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করা চলে। তারা দেবায়তনের বহিরঙ্গনটি পার হয়েছে শুধু। মায়ের কণ্ঠ কানে আসে যেখানে গেলে, সেখানে তারা যায়নি। এ একরকম ভালই তাদের পক্ষে।

কিন্তু প্রতীচ্যের কাছে যা এত ভয়াবহ, মায়ের সেই প্রতিরূপটি বোধহয় ভারত-বাসীর কাছে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। শক্তি-উপাসকের কাছে মা অবশ্য শুধু ওই একরূপেই আবির্ভূতা হননি। শিখের কাছে তিনি অনিঃশেষে রূপ ধরেছেন তার কৃপাণে। সব মেয়েই, বিশেষ করে খুকুরা তাঁর মূর্ত বিগ্রহ। যশস্বিনী সীতা দেবীও ওই পরমা প্রকৃতিকে প্রকট করেছেন অনেকের কাছে।

কিন্তু সকলের চেয়ে কালী আমাদের বেশী আপন। অন্য সকলকে আমরা ভক্তি করি, ভালবাসি। মনে-প্রাণে কিন্তু আমরা তাঁরই। জানি বা না জানি, মায়ের সন্তান আমরা—তাঁর কোলের কাছটিতে খেলে বেড়াচ্ছি। এ-জীবন শুধু তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা একটা। সে-খেলায় একবার যদি কোনমতে তাঁর পা দুখানি ছুঁতে পারি—শক্তির কি বিপুল স্পন্দন সঞ্চারিত হবে আমাদের সত্তায়—কে তার পরিমাপ করে? কে বুঝবে কি উল্লাসে 'মা' 'মা' বলে ডাকি আমরা?

শিবানুধ্যান

(The Vision of Siva)

Dark Mother! Always gliding near with soft feet,
Have none chanted for Thee a chant of fullest Welcome?

Walt Whitman

হতে পারে আমাদের পিতৃপুরুষরা পাহাড়েই শিবের প্রতিরূপ দর্শন করেছিলেন। কিংবা হয়তো অন্যত্র। যেভাবেই হোক, হিন্দুর মনে এটা জেগেছিল যে. তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গ, জ্যোৎস্নাকিরণ আর নিস্তরঙ্গ সলিলের যে-সৌন্দর্য, বর্ণ-রীতি-প্রমোদ রূপে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যবহুল দৃশ্যরাজি হতে তার জাত আলাদা।

জগদীশ্বরী বা প্রকৃতি যেন পাখী আর ফুলফলের বুটি-তোলা সবুজ শাড়ি পরে নানা-রত্ন-খচিত নীল ওড়না তুলে দিয়েছেন মাথায়। কিন্তু তাঁর বৈভবের নিরবচ্ছিন্ন আড়ম্বর ও কলরবের মধ্য হতে যেন অন্য একটা কিছুর ইশারা চমক হানে থেকে-থেকে। শুচি-শুভ্র, তপঃশুদ্ধ এমন একটা কিছু, চিত্তকে যা উপপান্ত হতে প্রচোদিত করে—যাকে মনে হয় মৌন নির্বিকার এবং চির অসঙ্গ। এ-বিশ্বের সৌন্দর্যের পিছনেও তাহলে দুটি সত্তার ব্যঞ্জনা রয়েছে। যেদিকে চেয়েছে সেই দিকেই এই দ্বৈতভাবের পুনরাবৃত্তি চোখে পড়েছে হিন্দুর—আলো আর ছায়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, 'অণরোণীয়ান' আবার 'মহতো মহীয়ান,' কার্য এবং কারণ। শুধু তাই নয়, খোদ মানুষের জীবনের দিকে চেয়ে সে আবিষ্কার করেছে, মানুষ বলতেও তো নারী এবং পুরুষ, দেহ আর আত্মাই বোঝায়।

এইখানে একটা সূত্র পাওয়া যায়। প্রতীক-কল্পনার ক্ষেত্রে কেমন করে যেন বস্তুর প্রাণসত্তা এই পৌরুষ-রূপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, আর তার একটা শক্তিরূপ (যাকে প্রকৃতি বলি আমরা)—তা ওই নারী বা মাতৃত্বের সঙ্গে। নারী ও পুরুষ যেমন পরস্পরের পূরক, ঈশ্বর ও প্রকৃতিও যে তেমনি পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য—ওই ধারণার মধ্যে স্বতঃ প্রণোদিত এই স্বীকারোক্তিটাই লক্ষ্য করবার মত। প্রকৃতির প্রাণসত্ত্ব রূপে ঈশ্বরই প্রকৃতি স্বয়ং। ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি অন্যোন্য-বিরোধী তত্ত্ব? এ-কান্না কেবল এক মহাকবির নয়, প্রতীচ্যের বুক জুড়েই আজ এই আর্তনাদ। আর শত শতাব্দীর ধূসর অতীত হতে ভেসে আসছে হিন্দু ঋষিদের মৃদু গুঞ্জরণ—"ভাল করে চেয়ে দেখ ভাই, ওরা দুই নয় মোটেই, দুয়ে মিলে এক।" এই দৃষ্টিতে এক সন্মাত্রই পুরুষ ও প্রকৃতি, চৈতন্য ও শক্তিরূপে বিরাজিত।

দিব্যসত্ত্বের রূপকল্পনার চরমোৎকর্ষ যেখানে, সেখানেই মানবীয় ভাবের আরোপ। রৌদ্রক্লান্ত প্রতিবেশে বিরাট পাহাড়ের ছায়া ঈশ্বরের কাল্পনিক কয়েকটা গুণের চমৎকার আভাস এনে দেয় কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তা মনকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে না যে, আসল বস্তুটিও ওইখানে মিলে যাবে। জ্যোতিঃপ্রভা-উন্মুক্ত-দ্বার তুঙ্গ গিরি বা বর্ম সম্বন্ধেও ওই কথা। এগুলি এমন কোন প্রতিরূপ নয় যে হৃদয় ও বুদ্ধিকে যুগপৎ বিমোহিত করে ওদের জন্য প্রাণ দেওয়ার মত উদ্দীপনা জাগাবে কারও প্রাণে। কল্যাণকৃৎ মেষপালক কিংবা বিশ্বপিতা—এ-জাতীয় ছবির বেলায় ব্যাপার কিন্তু একেবারে আলাদা! এসব ক্ষেত্রে মনে অচিরাৎ অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সমস্ত রূপের পিছনে যে-রহস্য লুকিয়ে আছে, শেষ পর্যন্ত কোনও একটা সূত্রে (formula) বাঁধা পড়ে তা এত আস্থাভাজন, এমন চিত্তাকর্ষক আর এত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে যে, রূপ এবং প্রতিরূপের ভেদরেখা তখন মুছে যায়। আমরা ভুলে যাই যে, এই শেষ নয়—সেই 'ঋতং বৃহৎ' এই কল্প-মূর্তিকেও ছাপিয়ে স্ব-মহিমায় বিরাজিত। মন সংস্কারবন্ধ হয়ে যাবার এই বিপদটা হিন্দুধর্ম ভারি আশ্চর্য উপায়ে এড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে হিন্দুদের সবচেয়ে বেশী পৌত্তলিক মনে হলেও অন্তরে অন্তরে তারা যে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক, এ বোধহয় জোর করেই বলা যেতে পারে। তার কারণ তাদের প্রতীকগুলির প্রয়োগ নানামুখী—ঠিক 'ওপালে'র বর্ণ-বিচ্ছুরণের মত।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহাতত্ত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয়, এ-তত্ত্ব উপস্থাপনের একটা দিক। জীবাত্মা ও তার স্বানুভব—এর আরেকটা দিক তুলে ধরে আমাদের সামনে। আর ডায়নামো এবং যে-শক্তিতে তা বিদ্যুদ্‌গর্ভ হয়—সেটি ওই তত্ত্বের তৃতীয় একটা দিক হতে পারে।

এই শেষ দৃষ্টান্তটি একটুখানি মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। শক্তি ও ক্রিয়া-পরিণাম প্রকটনের জন্য একটা বস্তু অন্য একটা কিছুর অপেক্ষায় থাকে, এ-ব্যাপার আমরা সর্বত্রই দেখেছি। ভারতবর্ষে এই যুগলসত্তা শিব ও শক্তি নামে পরিচিত। 'নাইট' তার দয়িতার দেখা পাবার প্রতীক্ষায় থাকে, তার স্পর্শে উদ্দীপিত না হওয়া পর্যন্ত শক্তিহীন সে। শিষ্য থাকে গুরুর পথ চেয়ে, তাঁকে পেয়েই নিজের অতীত জীবনের অর্থ শেষপর্যন্ত সে খুঁজে পায়। তেমনি শুভ লগ্ন না আসা পর্যন্ত চৈত্যসত্তাও থাকে স্থাণু, নিষ্ক্রিয়, মাত্রাস্পর্শে অবিচল। তারপর যেন কোন দিব্য

সন্নিপাতে—বিদ্যুচ্চকিত হয়ে চোখ মেলে চেয়ে এক চমকে সে দেখে নেয়—তার অন্তঃরাজ্যের মত বাইরের এই যা কিছু—সমগ্র জীবন, কাল, প্রকৃতি আর বিষয়োপভোগ, এ-সবও দেবতা স্বয়ং।

এই হল 'পরমা সংদৃক' (Beatific vision) প্রতীচ্যের মতে। প্রাচ্যবাসী ঘোষণা করছে—একেই বলে জীবন্মুক্তি—এই দেহে এইখানেই আত্মোপলব্ধি।

তত্ত্ব-দর্শনের ওই শুভক্ষণটিরই প্রতীক কালী মূর্তি। চৈত্যসত্ত্ব চোখ মেলে জগৎকে দেখতে গিয়ে দেখছেন জগন্ময়ীকে।

দেবতায় নরত্বারোপ যে মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এ আমরা দেখতেই পাই। কিন্তু এই 'রূপকল্পনা'র রীতি-নীতি ও পদ্ধতি বুঝতে হলে একটা জাতির হৃদয়ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া চাই।

আমাদের কাছে পৌরুষের আদর্শ হলেন রাজা, আচার্য এবং পিতা। পুরুষের শক্তির চরম। অধিনায়ক ও রাজ্যাধিপ হিসাবে তাঁর সেনাপরিকরের পুরোধা তিনি। সন্তান সন্ততির মাথার প্রতিটি চুলও তাঁর আঙুলে গোণা। কেউ তাদের সম্পর্কে অন্যায় করলে তার শোধ নেবেন তিনি, রক্ষা করবেন মারী-ভয় হতে। এ-বিশ্বের দ্রাক্ষাকুঞ্জ তাঁরই অধিকারে। তাঁর বাছাই-করা আঙুরলতাগুলির রক্ষণাবেক্ষণও করেন তিনি নিজে। স্নেহ প্রেমে অতুলন, শাসক হিসাবে অনিন্দ্যকর্মা, প্রতাপে অদ্বিতীয়—আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক এবং আদর্শ নরপতি তিনি। পশ্চিমে এই হল নরত্বারোপের ধারা।

ভারতবর্ষের ধারাটা কি আশ্চর্যরকম আলাদা! সেখানে জীবনের কষ্টিপাথর একটাই—মানদণ্ড শুধু একটি। মানুষটা ভগবানকে জেনেছে কি না—এটাই আসল কথা। ফলাফলের প্রশ্নই নাই, কর্মকুশলতার কথা ওঠেই না, সুখ-সমৃদ্ধি নিয়েও কোন প্রশ্ন নয়। এক মাত্র প্রশ্ন—প্রাণ কি দেওয়ানা হয়েছে সত্যলাভের পিপাসায়?

মনের ঝোঁকটা যে এই একদিকেই, জনপ্রিয় যাত্রা-নাটকে তা আমরা স্পষ্টাক্ষরে ফুটে উঠতে দেখি। রোমাণ্টিক মনোবৃত্তির কোন স্থান নাই সেখানে। জ্যাক তার জোয়ানকে পাবে কি পাবে না, সেটা নিতান্তই গৌণ। বাগাড়ম্বর না করে গোড়াতেই ও-পালা শেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ওরা ভগবানকে পাবে কখন, কি নিদেন পক্ষে কখন ওরা বুঝবে যে, ভগবান ছাড়া চাইবার আর কিছু নাই—সেইটি জানবার জন্যই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিষ্টচিত্তে ওই নাটকে মজে থাকি আমরা।

বিষয়-বৈরাগ্যই চিত্তের ওই পরিণতির বাহ্য লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কারণ ঈশ্বরানুরাগের রক্ত কমলটি হৃদয়ে দল মেলে ফুটে ওঠে যখন তখন ঊর্ধ্বস্বরে সাধক বলে ওঠেন—"তৃষার্ত হরিণ যেমন ছোটে ঝরণার সন্ধানে, প্রাণ আমার তেমনি করে তোমায় চাইছে ঠাকুর!" এশিয়াবাসী ভাল করেই জানে তখন অন্য সব কিছুই খসে যায় তাঁর মন থেকে। হাজারো রকম ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়ে ওঠে একটা বোঝা। গৃহ-পরিবার এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেন বন্ধন একটা। আহার-নিদ্রা এবং প্রাণ-রক্ষার নানা প্রয়োজনে আর মন থাকে না তাঁর। দুঃসহ বোধ হয় ওসব। আর, তাই থেকে হিন্দুর কল্পনায় দেবাদিদেব মহাদেব হয়েছেন ভিখারী। যজ্ঞভস্ম বিলেপনে তুষার-শুভ্র তাঁর দেহ, অযত্নে জটা বেঁধেছে মাথার রাশি রাশি চুল, শীতোষ্ণে দৃক্‌পাত নাই তাঁর। তিনি যতবাক্‌ বিবিক্ত সেবী, নিত্য কালে ধ্যানমগ্ন।

প্রাকৃত নয়ন দুটি অর্ধ-নিমীলিত তাঁর। প্রতি নিশ্বাসে যদিও উৎপত্তি ও বিলয় ঘটছে জগতের, তবু তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। এই গতায়তি সবই তাঁর কাছে স্বপ্নবৎ। দৃশ্যজগতের অবাস্তবতার এই-ই অর্থ। কিন্তু তাঁর একটি শক্তিই সমস্ত কর্মশক্তির মূল। সর্বেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রত্যাহারে সংহত হয়েছে তাতেই। সে তাঁর ভ্রূমধ্যে উন্মীলিত উত্তাল তৃতীয় নেত্র, প্রত্যক্ দৃষ্টি। স্বভাবতঃ তাই 'মহতী দেবতা' শিবকেই আদর্শ পুরুষরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য নামের মধ্যে একটি নাম বিরূপাক্ষ।

তিনি পশুপতি। কেউ যাদের ছোঁবে না সেই সাপেরা জড়িয়ে রয়েছে তাঁর গলায়।

কাউকে তিনি ফেরান না কখনও। উন্মাদ, খামখেয়ালী অপ্রকৃতিস্থ সৃষ্টিছাড়া কি জড়বুদ্ধি—শিবের কাছে এদের সবারই স্থান আছে। রক্ষঃ পিশাচদেরও প্রেমালিঙ্গন দেন তিনি।

সকলের যা ত্যাজ্য তা-ই তিনি গ্রহণ করেন। বিশ্বের যত ব্যথা-বেদনা যত অমঙ্গল—তাঁর প্রাপ্য ভাগ বলে সেসবই তিনি স্বীকার করে নেন। জগৎকে রক্ষা করতে বিষয়-সমুদ্ধত হলাহল পানে নীলকণ্ঠ তিনি।

নিজের বলতে কি আছে তাঁর? বাহন হিসাবে বুড়া বলদ একটি, বাঘছালের আসন একখানা, দু এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা—আর কিছু নয়।

আর সর্বোপরি—তিনি আশুতোষ। এর চেয়ে অপরূপ বৈশিষ্ট্য আর কি হতে পারে? প্রতিদিন তাঁকে শুধু নির্মল জল, কয়েক দানা চাল আর একটি কি দুটি বিল্বপত্র দিলেই চলে। কারণ জাগতিক ব্যাপারে মহাদেব নিতান্তই অনাড়ম্বর। যেসব জিনিসের জন্য আমরা যুঝে মরি, মিথ্যাকথা বলি এবং আমাদেরই ভাইকে হত্যা করি—তেমন কোন কিছুই সঞ্চয় করতে চান না তিনি। বিশ্বাত্মা, করুণা-নিদান, অজ্ঞান-তিমিরান্তক শিব-মহাদেবের এই ছবিই ফুটেছে ভারতীয় মনে। আর শেষকালে এই ছবিতে লেগেছে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে ছড়িয়ে-পড়া অস্পষ্ট আলোর প্রথম আভাস এবং স্থির জলে প্রতিবিম্বিত প্রতিপদের একফালি চাঁদের ছোঁয়া। পূর্ণ বৈরাগ্য, সম্যক নিবৃত্তি, আর অনন্ত সমাপত্তি—এ কেবল তাঁতেই সম্ভব যিনি 'সৌম্যাদ্ সৌম্যতর ঘোরাদপি ঘোর বিলোচন বীরেশ্বর।'

কান পেতে শোনো আসমুদ্রহিমাচল ভারতে তাঁর উদ্দেশে অগণিত সাধকের কণ্ঠে অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে কি প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥*

---

* 'Wanderings' গ্রন্থে নিবেদিতা এই রুদ্রস্তুতি প্রথম কোন সময়ে ও কোন পরিবেশে শোনেন তা বর্ণনা করেছেন। ১৩ জুন, ১৮৯৮-এর ডায়েরী:

"(আলমোড়া থেকে কাঠগুদামে নামার পথে) রবিবার অপরাহ্ণে সমতলের কাছাকাছি,

এই আমাদের শিব—পৌরুষের আদর্শ, 'ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'।

পুরুষ বা পরমাত্মারূপে তিনি প্রকৃতি অথবা মায়ার—এই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিচিত্র জগতের ভর্তা এবং পতি। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তাঁকে কালীর পদতলে দেখি আমরা। তাঁর ওই শববৎ শয়ানের ভঙ্গি সূচিত করছে তাঁর নিষ্ক্রিয়তা—জগদ্ব্যাপারে চিৎপুরুষ নির্লিপ্ত, উদাসীন। সংহারের উন্মত্ত তাণ্ডবে মেতেছেন কালিকা। চারিদিকে ছড়ানো তাঁর ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য। মায়ের বুকে নৃমুণ্ডমালা, আবার হাতে খড়্গ আর সদ্য-ছিন্ন নরমুণ্ড। আচম্বিতে নিজের অজ্ঞাতে তাঁর স্বামীর অঙ্গে পদক্ষেপ করেছেন তিনি। শিবের বুকে তাঁর পা। সেই স্পর্শে যেন চোখ মেলে চেয়েছেন শিব। দুজনে চেয়ে আছেন দুজনের দিকে। দেবীর দক্ষিণ-পাণি যেন স্বতঃই উত্তোলিত হয়েছে বরাভয় মুদ্রায়, দংশিত রসনায় ফুটেছে অতিমাত্র লজ্জা ও বিস্ময়ের ভঙ্গি—গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যেটি সুপরিচিত।

আর শিব? তিনি কি দেখছেন? মহাশঙ্খ ও জপমালাধারিণী হয়ে, খর্পর-গলিত রুধিরস্রোতে যিনি প্রেত পিশাচবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করছেন, নিধনে যাঁর অনুশোচনা নাই, আছে উল্লাস আর কেবল পদদলিত মহেশ্বরের প্রতিই প্রসাদসুমুখী যিনি—সেই নগ্নিকা কালী করালিনী শিবের চোখে সাক্ষাৎ সৌন্দর্যলহরী।

মায়ের দীর্ঘ আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পিছনে—ধাবমান বায়ু, কাল বা ঘটনাস্রোতের মত। কিন্তু ত্রিনয়নের দৃষ্টিতে কাল-ই মহাকাল, সেই মহাকালই

একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগের এক জায়গায়—যেটিকে লোকালয়-বহির্ভূত পান্থশালা মনে হয়েছিল—বিশ্রাম করেছিলাম। সেখানেই তিনি (স্বামীজী) আমাদের রুদ্রস্তুতি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন।

From the Unreal lead us to the Real.
From Darkness lead us unto Light,
From Death lead us unto Immortality.
Reach us through and through ourself,
And evermore protect us—Oh Thou Terrible!
From ignorance, by Thy Sweet compassionate face.

চতুর্থ ছত্রটির ('আবিরাবির্ম এধি') অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন; 'Embrace us in the heart of our heart'—এইভাবে ছত্রটির অনুবাদ করবেন কিনা ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর সঙ্কোচের কারণ কুণ্ঠিতভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করে বললেন, আসল অর্থ হল, 'Reach us through and through ourself' তিনি স্পষ্টই ভয় পেয়েছিলেন, এই অতীব সঘন গূঢ়ার্থপূর্ণ ছত্রটি ইংরাজী অনুবাদে অর্থবহ হবে না। কিন্তু সেই অপরাহ্ণে নিঃসঙ্কোচে আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম, এবং পরে বুঝেছিলাম, আরও আক্ষরিক অনুবাদে দাঁড়াবে—"O Thou who art manifest only unto Thyself, manifest Thyself also unto us!" তাঁর অনুবাদকে এখন আমার মনে হয়—সমাধিপ্রাপ্ত উপলব্ধির দ্রুত প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। এর মধ্যে সংস্কৃতের জীবন্ত হৃদয়টিকে আকর্ষণ করে যেন ইংরাজী ভাষার আধারে স্থাপন করা হয়েছে।"

এই রুদ্রস্তুতি নিবেদিতার প্রিয়তম স্তোত্র হয়ে দাঁড়াবে। শেষক্ষণে যখন পৃথিবীর আলো চোখে নিভে আসছে, তখন তিনি এই স্তোত্রটি শুনতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে আছে—'from Darkness lead us unto light', এবং যার মধ্যে আছে স্বামিজীর সমাধি-প্রাপ্ত সত্য-ঘোষণা— Reach us through and through ourself'.

—লেখককৃত টীকা

ঈশ্বর। এক বিপুল ছায়ার মত কৃষ্ণায়িত তাঁর অঙ্গের নীলিমা। জীবন-মৃত্যুর নগ্ন সত্যের প্রতীক তিনি, তাই মা আমার নগ্না দিগ্‌বসনা। কিন্তু এ আঁধার তো আঁধার নয়, শিবের কাছে। এই ভীষণাদপি ভীষণার হৃদ্যসমূদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অপলকে চেয়ে আছেন তিনি। ধ্যানে তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁকে ডাকেন 'মা' বলে। এই তো শক্তি আর শূন্যের সাযুজ্য।

কোন্ ভাবনার পটভূমিতে এ-কল্পনার উদ্ভব হতে পারে, তা কি ধরতে পারলাম আমরা? কালী-মূর্তিকে দেবতার প্রতিরূপ বলার চেয়ে আমাদের জীবনরহস্যের সোচ্চার প্রকাশ বলাই হয়তো সঙ্গত হবে।

আত্মসাক্ষাৎকারকালে মাকে কেমন দেখে সাধকের সিদ্ধসত্তা? সবুজ ক্ষেত, প্রসন্ন আকাশ আর সূর্যের আলোয় মাখামাখি ফুলের ছবি তো সেই সর্বজ্ঞকে ভোলাতে পারে না। আপাতদৃষ্ট রমণীয়তার পিছনে তিনি দেখেন, প্রাণ পুষ্ট হচ্ছে প্রাণকে গ্রাস করে, নদী ভেঙে পড়ছে, পাহাড়ের উপর অন্তরীক্ষে রয়েছে সংহারোদ্যত ধূমকেতু। তাঁর দশদিকে নিখিল জীব-কুলের বিলাপরোল, যন্ত্রণার অস্ফুট রোদন, লোভের গুমরিয়ে কাঁদা আর ক্ষুদ্র প্রাণীদের ভয়ার্ত করুণ চিৎকার। মহাকাল অকরুণ দৃক্‌পাতহীন। মানুষের শোক-দুঃখে বধির তিনি, অথবা অট্টহাস্যই তাঁর একমাত্র প্রত্যুত্তর।

হিন্দুর মন জগতের এই চিত্র দেখতেই যেন তৈরি হয়ে আছে। তার ক্লান্ত হৃদয় বলে, 'জীবনের চেয়ে মরণের শক্তি সত্যই বেশি, আর হ্যাঁ, মরণই আমাদের ভাল।'

মহাপ্রাণের উপলব্ধি কিন্তু এ নয়। কাপুরুষের অবসন্ন দীর্ঘশ্বাস নাই তার মধ্যে, নাই করুণাকর্ষণের স্বার্থসন্ধ প্রার্থনা। অলসের মত হাল ছেড়ে দেওয়াও নয়। বিনম্র হোক চিত্ত, তখন শুনতে পাবে যুগযুগান্তে উৎপীড়ন আর আশাভঙ্গ সয়েও ভারতবর্ষ কি বলে চলেছে জগজ্জননীকে। মন দিয়ে শোন—ধ্বংসকাণ্ডের প্রচণ্ড ঘোরারাবে ক্ষীণ তার কণ্ঠস্বর,

নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে পরাণী।
কৃপা করে দিও রাঙা চরণ দুখানি॥

এই শৈব-দৃষ্টি ছাড়া, যাই বলনা কেন, আমাদের কেউ কি কখনও ঈশ্বরকে আর অন্য কোন রূপে দেখতে পায়? দুঃখের ভরা যখন পোরে, ঠিক সেই সব মুহূর্তেই না জীবনের পরম অনুভবগুলি পাই আমরা? সর্বহারা শূন্যতায় ফুঁপিয়ে উঠেই কি আমরা সবসময় উপলব্ধি করি না যে, প্রেমেই সর্বজয়ী সেই পরম পুরুষ?

মাগো আমরাও যে তোমার সন্তান! প্রাণে মারো যদি, তবু তুমিই আমাদের ভরসা মা!

মাহেন্দ্রক্ষণ অবসান, মিলিয়ে তোল অতীন্দ্রিয় দর্শনের আবেশ! মানুষ এ-পর্যন্ত নিজের জন্য যা-কিছু প্রতীক কল্পনা করেছে, তার মধ্যে ওই কল্পনাটি বোধহয়

সর্বশ্রেষ্ঠ। অতিক্রান্ত হল ধ্যানের লগ্ন, আমরা প্রাচীন যুগের পাহাড়-পর্বতে ফিরে এলাম আবার।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়েছে আর্যগোষ্ঠী। ওই যজ্ঞের সমিধ্‌ভার বহন করে রাজোচিত মহিমায় আমাদের দিকে মন্দগতিতে এগিয়ে আসছেন বৃষরাজ।

আগুন জ্বলে উঠল যজ্ঞবেদিতে। যজ্ঞানলের মাঝখান হতে উঠছে আনীল বহ্নিদ্যুতি। আর চারিদিকের সমিধসম্ভারকে লেহন করে দগ্ধ অঙ্গারের বুকে লুকলুকিয়ে ফিরছে হুতাশনের লোলুপ রক্তরসনা। ওর প্রত্যেকটি শিখার আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন ঋষি—

কালী করালী মনোজবা চ
সুলোহিতা বা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥ মুঃ ১।২।৪

ঋত্বিকরা বেদপাঠ করছেন, যজ্ঞ দর্শন করছে সমবেত জনতা। আমরা দেখছি ওই যজ্ঞাগ্নির শিখাতেই ফুটে উঠছেন ভাবীযুগের পঞ্চানন রুদ্র। দেখছি যজ্ঞ-ব্যাপারে বৈদিক কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে যেদিন, সেদিন ও-থেকেই তিনি গড়ে তুলবেন পুরুষ ও প্রকৃতি, চিৎসত্ত্ব ও মহাপ্রাণের বিরাট অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব।

পণ্ডিতেরা বলেন শিব ওই বৈদিক যজ্ঞবহ্নির প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছু নন। তিনিই বৃষবাহিত সমিধ্‌-ভার, শুভ্রদ্যুতি নীলকণ্ঠ হুতাশন।

আর তাঁর শক্তিস্বরূপিণী কালিকা ওই লেলিহান পাবকশিখা—অর্ধদগ্ধ সমিধ্‌ লেহন করে ফিরছে যারা। আজও দেবীর লোলরসনায় সেই সুলোহিতা অগ্নিজিহ্বারই সংকেত পাই আমরা।

মায়ের গল্প

[The Story of Kali]

আচ্ছা খুকুসোনা, ছোটবেলায় সবার আগে কি দেখেছিলে মনে পড়ে? তুমি মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হাসছ—এই না?

মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছ কখনও? মা চোখ বুজলেন,—ওমা! খুকী কোথায় গেল? চোখ মেলে দেখেন—এই যে খুকী! তারপর খুকী চোখ বুজল...মা নাই! নাই! আবার চোখ মেলতেই...এই যে!

আচ্ছা মা যখন চোখ বোজেন কোথায় যান তিনি? সেই সেখানেই তো ছিলেন সারাক্ষণ? তাঁর চোখ দুটি বোজা ছিল বটে। তবু তিনি সেখানেই ছিলেন কিন্তু।

জান খুকু, অনেকে বলেন ভগবানও একেবারে ঠিক এই রকম। তিনি আমাদের মা—কিন্তু অ—নে—ক বড়। এত বড় যে এই বিরাট বিশ্বসংসার তাঁর খোকাখুকু। তাঁর জগৎ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মা চোখ বুজে রয়েছেন। আর আমরা সারাজীবন

ধরে কেবল মা কখন চোখ চাইবেন সেইটি ধরতে চাইছি, বুঝলে খুকুসোনা? আমাদের কেউ যদি কখনও তা পারল, একবার একটি মুহূর্তের জন্যও যদি তাঁর চোখে চোখ মিলল কারও, তাহলে কি হয় জানো? সে-মানুষটি স—ব বুঝে ফেলে। বুকে বল হয় তার, সে হয় জ্ঞানী প্রেমিক, আর সেই মুহূর্তটি সে কোনদিন ভুলতে পারে না।

খেলায় যখন এইরকম জিতে যাও তুমি, মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, তখন আরেকটা ব্যাপার হয়। একটা মজার ব্যাপার। মায়ের অন্য সব খোকাখুকু তোমার সঙ্গে খেলা করতে আসে তখন। ছোট পাখীরা আসবে, এইটুক-টুক ভেড়ার ছানাগুলি তোমায় ভালবাসবে; বনের খরগোসরা ঘুর্‌ঘুর্‌ করবে পায়ের কাছে। আর ওই যে পথে-পথে-ঘুরে-বেড়ানো দীনদুঃখী ছেলেপুলেরা—শীতে যারা জমে যাচ্ছে, খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে—মা ওদের সবচেয়ে ভালবাসেন, জান! ওদের বাপ-মা, ঘরবাড়ি নাই কি না—তাই। ওই ওরাও বিশ্বাস করে তোমার কাছে আসবে, তোমায় ওদের একজন করে নেবে। আমরা সকলেই মায়ের কোলে আছি। কিন্তু ওরা বসেছে একেবারে মায়ের বুকের কাছটিতে।

মা যখন চোখ বুজে থাকেন তখন তাঁকে কি বলে ডাকি আমরা? ডাকি কালী বলে।

খানিকক্ষণ মনটা বড় ভার হয়ে আছে, এমন তো তোমার হয়েছে কখনও? তখন মা, কি ধাই-মা কিংবা পিসী বা আর কেউ এসে কোলে নিয়ে আদর করলেন, চুমো খেলেন। যতক্ষণ তোমার ঠোঁটে হাসি না ফুটল, ততক্ষণ কোলে কোলেই রাখলেন তোমায়।

ভগবান এরকমও করেন কখনও কখনও। তাঁর চোখ দুটি বোজা দেখি বলেই আমরা ভয় পাই। এই লুকোচুরির খেলা শেষ করতে চাই। এ আর আমাদের ভাল লাগে না। মনে হয়, বড় একা, কত দূরে পড়ে আছি, হারিয়ে গেছি যেন। তখনই কেঁদে উঠি আমরা। একেবারে আঁধার হয়ে এল, তবু যে চোখ দুটি বোজা মায়ের। আর খেলব না আমরা। এককে সময় এমনি মনে হয়।

তাঁর চোখ দুটি সত্যি সত্যি বোজা নয় কিন্তু। চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে কিনা, তাই অমন ভাবি আমরা। যেমনি তুমি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠ—অমনি তাঁর অপরূপ চোখ দুটি মেলে তাকান মা—চেয়ে থাকেন তাঁর সন্তানের মুখের দিকে। অগাধ স্নেহে যেন টলমল করে সে-দৃষ্টি। আর তুমি, একবার যদি দেখ সে-চাহনি, অমনি সব খেলা ফেলে 'মা' 'মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকাবে মায়ের বুকে—কান পেতে শুনবে মায়ের বুকের ধুকধুকানি।

তাহলে খুকুমণি—মা যেসব জায়গায় আছেন, এবার তোমার তা মনে থাকবে তো? যখন মনে হবে মা যেন অ-নে-ক দূরে আছেন, জানবে সে কেবল তাঁর সঙ্গে তোমার চোখাচোখি হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। এই মা যখন কোথাও চলে যান, তুমি তাঁকে দেখতে পাও না। কিন্তু মা কালী সবসময় আছেন তোমার কাছে, সবসময় তোমায় ভালবাসছেন। তাঁর খোকাখুকুর সঙ্গে খেলতে মা সবসময়ই তৈরি।

তোমার কি কখনও মনে হবে, একটুক্ষণের জন্য খেলাটা ছেড়ে ছোট্ট হাত দু'খানি জুড়ে বলি, 'মাগো একবার চোখ মেলে চাও না মা!'

মা আরেক ধরনের লুকোচুরি খেলেন। এ যেন অনেকটা রূপকথার মত। কখনও কখনও অন্য মানুষের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন মা, কি অন্য যে-কোনও কিছুতে। কখন যে তাঁর দেখা পেয়ে যাবে তার কিচ্ছু ঠিক নাই। হয়তো মায়ের চোখে চোখ পড়তে দেখলে তাঁর স্নেহদৃষ্টি...হয়তো বিড়ালছানাটির সঙ্গে খেলতে গিয়ে, কি ভুঁয়ে-পড়া পাখির ছানাটিকে তুলতে গিয়ে তাদের চোখে দেখলে তাঁকে। এদের সবার মধ্যে দিয়েই হয়তো মাকে লুকোচুরি খেলতে দেখবে।

যখনই কারও জন্য আমাদের কিছু করতে হয়—জানবে মা আমাদের খেলতে ডাকছেন। আমাদেরও তখন সে-খেলা খেলতে ভাল লাগে। মা একবার নিজে বলেছিলেন (অর্থাৎ কারও মধ্যে লুকিয়ে পড়ে তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন)—'দীন-হীন কারও জন্য যখন যেটুকু করবে, তোমরা জেন তা আমার জন্যই করেছ।'

ঠিক যেন রূপকথার মত লাগে না শুনতে? আর মা কি মজার মজার জায়গাতেই না লুকাতে পারেন! আরেকবার মা বলেছিলেন 'ওই পাথরটা তোল আমায় দেখতে পাবে। কাঠটা দু'টুকরো কর—ওখানেও আমি!' তুমি কখনও একটা পাথর তুলে, কি একটুকরা কাঠ কেটে দেখেছ—ওর ভিতরে কি আছে? কখনও ভেবেছ যে সব কিছুর ভিতরেই ঠাকুর আছেন? কি সুন্দর মায়ের খেলা! তাঁকে যেখানে চাও সেখানেই দেখবে,—তিনি সর্বত্র আছেন!

মা যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও কি তাঁর খুকিকে মা ভালবাসেন? নিশ্চয়, তা নইলে মা লুকোবেন কেন? মার চোখ দুটি বোজা থাকলেও কি তাঁর খুকুকে ভালবাসছেন মা? হ্যাঁগো—দেখ না, সারাক্ষণ মা কেমন হাসছেন!

কালীও তাই। অনেককাল তাঁর দেখা না পেলেও আমাদের ভয়ের কিছু নাই। মা যে হাসছেন সারাক্ষণ। যখন ভাল বুঝবেন তখনই খেলা ভেঙে দেবেন মা, তাঁর চোখে চোখে তাকাব আমরা, আর এক চমকে বিশ্বসংসার পিছনে ফেলে সোজা চলে যাব কোন সুদূরে—সেই 'মহাশূন্যের ওপারে।'

কাজেই ডাক পড়লেই এস খেলতে ছুটে। খুকু মনে রেখ, কাউকে দেওয়ার মত কিছু যদি থেকে থাকে তোমার, জানবে, মা তোমায় ডাকছেন তাঁকে খুঁজে বার করতে। কেউ যদি তোমায় দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে চায়—জেনো আসলে মা-ই তোমায় বলছেন 'খুকু চোখ চাও!' কিংবা নতুন কেউ ভালবাসার জন এলে বুঝবে, মা-ই বলছেন 'এই যে আমি খুকু!'

এছাড়া আরেকটা কথা আছে। তোমার বাবা, মা, মাসী পিসী ধাই-মা আর আর সকলকে তুমি তো ভালবাসো? নিশ্চয়ই বাসো। তাঁরাও ভালবাসেন তোমায়। তাঁরা সবাই কত ভাল, কত মায়া-মমতা তাঁদের।

কিন্তু অনেক দূরে মনে কর মায়ের এক ভাই আছেন, বড়ভাই—ওই অমুকের

মত। তুমি কি তাঁকেও ভালবাসো? কেন? কখনও তো দেখনি তাঁকে! তিনি কোনদিন খেলা করেননি তোমার সঙ্গে!

না, কিন্তু মা যে তাঁকে ভালবাসেন! আর মা যাদের ভালবাসেন তুমিও তাদের সকলকে ভালবাসো—তাই না খুকু সোনা? তেমনি কালী ভালবাসেন বলে আমরাও সব মানুষকে ভালবাসব। মায়ের যত খোকাখুকু—ওই ভেড়ার ছানাগুলি, কতরকম ফুল, বড় বড় গাছপালা, ছোট্ট ছোট্ট মাছ—সবার সঙ্গেই মায়ের খেলা। মা ওদের সবাইকে ভালবাসেন, ভালবাসেন আকাশের ওই তারার মেলাকেও। আমরাও তাই বাসব। আমরা যে তাঁর ছেলে-মেয়ে! তিনি যা-কিছু ভালবাসেন, আমরাও তা ভালবাসি। তিনি যে মা আমাদের—না-ভালবেসে কি পারি?

রামপ্রসাদ

'মহিমা' যেন কোনো কিছুর 'ভাষ্য'। কতকগুলি জীবনের সম্মুখীন হলে মনে হয়, সেগুলি যেন আমাদের অপরিচিত ভাষার কোনো কবিতার অনুবাদ। প্রত্যেক সুগভীর সত্য জীবনাধার প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করে থাকে—যে জীবন হবে ঐ সত্যের শঙ্খ। যখন সেই জীবনশঙ্খ মেলে তখন দুর্জ্ঞেয় সত্য লক্ষ লক্ষ মানুষের গোচর হয়, যা এতাবৎ সাধারণের অনায়ত্ত ছিল।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আলোকিত না হলে কিন্তু শব্দে সত্য দর্শন করি না। যে ব্যক্তব্যটি আমরা জীবনে পেয়েছি, কিন্তু উচ্চারণ করিনি, স্বগতোক্তিও নয়—তাকেই যদি অন্যের কণ্ঠে শুনি, আবাহন করে বলি, ধন্য প্রকাশ! অপরপক্ষে যা আমরা নিজেরাই বলে ফেলেছি, তা সাদা-মাঠা ঠেকে নিজেদের কাছে, আর যা আমাদের অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে তাকে দুর্বোধ্য বলে মনোযোগীই হই না।

তাই দেখা যায়, কবি বা ভাষ্যকার যাঁরা, তাঁরা পৃথিবীর কাছে সেই জিনিস-গুলিই বলে যাচ্ছেন, যার বিষয়ে তাঁর হৃদয় আলোকিত। বাণীদূতদের কাছে এই লক্ষণ-চিহ্নই আমরা সন্ধান করে থাকি—তাঁরা সমষ্টি-স্মৃতিকে উন্মোচন করেছেন কি না! যিনি করেছেন, সানন্দে তাঁর কথা আমরা শুনি, কেননা বিশ্বাস করি, তাঁর যে-কথাগুলি এখনো স্পষ্ট হয়নি আমাদের কাছে, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা তার তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করে দেবে অচিরে।

কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি—ঋষি। প্রেম, বেদনা অথবা বীরত্বের কতকগুলি দীপ্তোজ্জ্বল খণ্ডাংশকে নির্বাচন করে বহুজনের করবাদ্যের প্রলোভনে সেগুলিকে মণিখণ্ডবৎ রত্নমাল্যে গ্রথিত করা ঋষি-কবির কাজ নয়,—তিনি জীবনকে সর্বাংশে গ্রহণ করবেন, যে-জীবন মূলত ধূসর, পাংশু-মলিন উপাদানে গঠিত; সেই সঙ্গে কৃষ্ণতম এবং উজ্জ্বলতমকেও তিনি নেবেন, এবং সমস্তের উপরে নূতন আলোক-সম্পাত করবেন, যার ফলে দেখা যাবে জীবন যাদের যাতনা দিয়েছে, তারাও সুন্দর দেখছে তাকে। যিনি শুধুই নাট্যকার তিনি নাটকীয় ভাবটিকেই মাত্র বেছে নেন,

কিন্তু ঋষিকবির কাছে সব কিছুই নাটকীয়। একটি শিশুর সামান্য চাওয়া আর ওথেলোর দারুণ বাসনা, যা হনন করেছে ডেসডিমোনাকে—বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে যোগের ক্ষেত্রে একটি অপরের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ঋষিকবির কাছে।

জীবনের পুরাতন সঙ্গীদের ভিতর থেকে যে নূতন তান ইনি পেয়েছেন, তাকে ধরতে হয়েছে পলকে ঝলকে, নানা স্বরে, সুরে সাধারণের মধ্য থেকে। মা গুন্‌গুনিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন শিশুকে, কিংবা তার শেষ নিদ্রার শয্যাপার্শ্বে বুক-ফাটা কান্নায় লুটিয়ে পড়ছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে ফুঁসছে মানুষ কিংবা গুমরে উঠছে ভালবাসার পাত্রদের সামান্য একটু ভাল রাখতে না পারার দুঃখে, ধীর শান্তিতে লাঙল ঠেলছে কৃষক, দিনের আলোয় খেলছে শিশু,— সবকিছুই কানাকানি করে গেছে এঁর কাছে, দিয়ে গেছে জীবনরহস্যের সবটুকু।

তাহলে এই কথাই বলা যায়, প্রেরণা-পুরুষের কণ্ঠে নয়, গণমানুষের অমার্জিত বিশাল হৃদয়েই নবধর্মের অরুণোদয়। যে-সব অঙ্গভঙ্গি ও উগ্র বলের চেহারা আমাদের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে, তা আসলে এখনো আত্মসচেতন হয়নি, এমনি একটা আবেগ-তাড়নার অস্পষ্ট পরীক্ষামূলক উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়।

এইভাবে অগণিত জনের কল্পনায় ও চেতনায় ভাবটি যখন ব্যাপ্ত ও প্রকাশিত হয়েছে, তখনি আবির্ভূত হন একজন মানুষ যিনি ঐ ভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে দাঁড়ান। সকলে তাঁকে বন্দনা করে বলে—'আচার্য', 'শিক্ষক'—কারণ তিনি তাদের জীবনভাষ্য দিয়েছেন—ভাষা দিয়েছেন তাদের ব্যাকুল প্রকাশবাসনাকে। তিনি তরঙ্গচূড়া—তরঙ্গ ঐ 'অগণিত নগণ্য'।

এইভাবেই জাতি-জীবন থেকে আবির্ভূত হয়েছেন ঈশ্বরের মাতৃভাবের বাঙালী মহাকবি রামপ্রসাদ—তাঁর বাণী সাক্ষাৎ প্রবেশ করেছে জাতির অন্তর্লোকে। দলে দলে মানুষ গঙ্গাতীরে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল—তাঁর সব সেরা গানগুলি শুনছিল তাঁরই কণ্ঠে—শেষ কথাটি উচ্চারণ করেই সেই বৃদ্ধ মানুষটি বলে উঠলেন—'দক্ষিণা হয়েছে'—সেই মুহূর্তে মৃত্যু ঘটল।* কিন্তু তা মৃত্যু নয়—রূপান্তর। এই ঘটনার পরে এক শতাব্দীও পেরোয়নি। সকলে মনে করে, এ-তো গতকালকার ঘটনা!

---

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই রামপ্রসাদের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে প্রথম তথ্য পরিবেশন করেন। রামপ্রসাদের দেহত্যাগের বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"প্রাচীন লোকেরা কহেন, তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জন সময়ে পরিজন, স্বজন, বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবী-তটে গান করিতে করিতে আইলেন; ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে যতক্ষণ জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ অতি আশ্চর্য আশ্চর্য ভক্তিরসের বিদায়ী পদ অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গা-যাত্রার সময়ে পথিমধ্যে কয়েকটি গান করেন।"

ঈশ্বর গুপ্ত মোট চারটি গান উদ্ধৃত করেছেন। প্রথমটির শুরু—

কালী-গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।

দ্বিতীয়টির শুরু—

বলো দেখি ভাই কি হয় ম'লে—
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

(পর পৃষ্ঠায়)

সেরেস্তার মুহুরীরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। চাকরির কথা মনে রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। সপ্তাহ শেষে কিন্তু মালিক যখন খাতা চেয়ে পাঠালেন পরীক্ষা করতে, দেখলেন যে, প্রথম পাতাতেই লেখা একটি গান :

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
[Mother! make me Thy accountant.
I shall never prove defaulter]

হিসাবের খাতায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গান লেখা—ছত্রে ছত্রে একই হাহাকার—মা! মা! ধর্মের পাগলামির মর্ম বোঝে না, এমন হিন্দু যেহেতু বিরল, তাই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হল তৎক্ষণাৎ। কিছু বৃত্তি বরাদ্দ হল (মাসিক ত্রিশ টাকা), এবং তিনি অন্নের জন্য চাকরির দায় থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পেলেন।

এই গানটিরই শেষকালে আছে—

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদান কালে, যেমন, জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

তারপরে, ঈশ্বর গুপ্ত অনুযায়ী—'তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত' রামপ্রসাদ যে গানটি গেয়েছিলেন, সেটি অভিমানে, বিষণ্ণতায় অথচ গোপন আশা-বিশ্বাসে অপূর্ব।—

নিতান্ত যাবে দিন—এদিন যাবে—কেবল ঘোষণা রবে গো!
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে, পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে—ভবার্ণবে গো॥

ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, "প্রবাদ আছে নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল"—সে গানটির আরম্ভের দুই ছত্র—

তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
মাগো ওমা, এখন যেমন রাখছো সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে॥

শেষ দুই ছত্র—

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড় মাগো,
মাগো ওমা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।

" 'দক্ষিণা হয়েছে' এই উক্তি করিবামাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই কহেন, তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।"

উপস্থাপিত তথ্যগুলি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কেরী সাহেবের গ্রন্থে (১৮৫৮ খৃী.) লিখিত সংবাদ উদ্ধৃত করে অগ্রাহ্য করেছেন। কেরীর বইয়ে পাওয়া যায়—রামপ্রসাদ কালীমূর্তি বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'উদ্দাম ভক্তিতে' গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। শেষযাত্রার শুরুতে রামপ্রসাদ যে গানটি গেয়েছিলেন, তার কয়েকছত্র যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন, যার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা অবশ্য সুনিশ্চিত নই—

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো,
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।

ফল : এক গুচ্ছ লোকসঙ্গীত, কালী-উপাসনার ভাবে পূর্ণ—রয়ে গেল জনগণের স্মৃতিলোকে। তার অনেকগুলি এখনো সংগৃহীতই হয়নি হয়ত, ছড়িয়ে আছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। কিন্তু সেগুলি এমনভাবে গ্রাম-জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, ভরসা করা যায়, হয়ত হারিয়ে যাবে না কোনোদিন।

পরবর্তী কালে রামপ্রসাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্রীষ্ম-দিনে গঙ্গার উপরে নিজের ছোট ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার বজরার কাছে গিয়ে পড়লেন। বাংলার সেই প্রতিভাবান তরুণ শাসক* আদেশ জানালেন, বজরায় উঠে গান গাইতে হবে। কবি বীণা হাতে নিয়ে স্থান-কালের উপযোগী প্রাচীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মুসলমান মানুষটি সে সকলে খুশী নন—'তোমার নিজের গান গাও—মায়ের গান গাও!'—মধুরভাবে নির্দেশ দিলেন। তাঁর প্রজা আদেশ পালন করলেন পরম আনন্দে।

এত সহজ, এত সরল তিনি—কোনো স্তুতি দিয়েই তাঁকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে আমরা সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে এমন এক বিরাট কবির সাক্ষাৎ পাই—যাঁর প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছিল শিশুর অনুভূতির উপলব্ধিতে। আমাদের নিজেদের কাব্যে† উইলিয়ম ব্লেক যে সুর তুলেছেন, তা অনেকটা তাঁর কাছাকাছি—কিন্তু ব্লেক কোনোমতে তাঁর উপরে নন।

সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে অপূর্ব ঔদাসীন্যের ক্ষেত্রে রবার্ট বার্নস্, সাধারণ বস্তুর মহিমা ঘোষণার ক্ষেত্রে হুইটম্যান রামপ্রসাদের আত্মীয়, কিন্তু তাঁর সেই শুভ্র জ্যোতিপূর্ণ শিশু-সত্তা—তার কোনো তুলনা নেই—তুলনা পাওয়া অসম্ভব। বয়স তাঁর এই স্বভাব নষ্ট করতে পারেনি, বরং দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস—আত্মস্থতা। শিশুর মতই কখনো নিরাশ, কখনো সহাস, কখনো গম্ভীর, কখনো প্রগল্‌ভ। শিশুর কাছে এ সবই উদ্দেশ্যহীন, রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সুগভীর উদ্দেশ্য—তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি ছত্রে জগজ্জননীর মহিমাধ্বনি।

তাঁর এত সরলতা, তাই বলে একথা যেন মনে না করি বিনা আয়াসে তাঁকে বোঝা যাবে। এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। রোমের এবং ফ্লোরেন্সের সমগ্র ইতিহাসের দ্বারাই মাত্র (দান্তের) 'ডিভাইন কমেডি' বোধগম্য হয়েছে। যথার্থ বলতে গেলে, যে সংস্কৃতি থেকে কবির উদ্ভব, তার বিষয়ে কিছু না জানা থাকলে কোনো কবিকেই বুঝতে পারা যায় না। দান্তে সম্বন্ধে যদি একথা সত্য হয়, তাহলে যে-কবি বহু সমুদ্র এবং মহাদেশের ব্যবধানে অবস্থিত, জটিল বহু শতাব্দী-প্রাচীন সভ্যতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন—তাঁর বিষয়ে আরও কত সত্য হবে।*

বাস্তবিক, এই প্রশ্ন মনে ওঠে, প্রাচ্যের অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তিকর কি না! আমরা শুনি, চীনা-জাপানী শিল্পীরা চার লাইনের এক

---

* সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে নিবেদিতার এই উক্তি, বলা বাহুল্য, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

† নিবেদিতা কখনো ইউরোপীয়, কখনো ভারতীয়—লেখার সময়ে এই দ্বন্দ্ব তাঁর সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যায়।

* এখানে পুনশ্চ বোঝা গেল, নিবেদিতা ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য করেই এই বই লিখেছেন।

নিসর্গ-চিত্রে জাতীয় সভ্যতার সমগ্র তত্ত্ব প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন—অথচ কোনো ইউরোপীয় সন্দেহই করতে পারবেন না, ঐ নিসর্গ-চিত্রের মধ্যে ভিন্নতর কোনো উদ্দেশ্য নিহিত আছে। হিন্দুর বিষয়েও একই কথা বহুলাংশে সত্য। যেমন ধরা যাক, তুষার-পটে পার্বত্য অরণ্যের রূপ বর্ণিত হয়েছে অসাধারণ এই যে ছত্রটিতে—"মহাদেবের দেহে নিত্য সতীদাহ"—এর গুণাস্বাদের জন্য গভীর ঐতিহ্যজ্ঞান প্রয়োজন।

জাপানী শিল্পী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে নিতান্ত সত্য, উপাদানে শুধু পার্থক্য। রামপ্রসাদ ভাঙা খেলনা, চৈত্র সন্ধ্যার বৃষ্টিপাত, এবং শিশুর নানা ভাবের নানা কিরণের মধ্যে বিশ্বরহস্য আবৃত রাখেন।

জগন্মাতার প্রতি ভক্তির প্রবল আকৃতি ছাড়াও রামপ্রসাদের মনে জীবনের এমন এক পূর্ণাঙ্গিক বোধ রয়েছে, যা আমাদের অজানা। "হৃদয়ে যে পবিত্র, ঈশ্বরের দর্শন সে পাবেই"—এই ধরনের কথাকে একেবারে আক্ষরিকভাবে প্রাচ্যে গ্রহণ করা হয়। আদর্শ অবস্থা কেবল পরিত্রাণে (Salvation) নয়, কিংবা পাপ থেকে উদ্ধারের শর্তে নয়—তা আছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বোধের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই পবিত্রতার শক্তিতেই।

প্রাচ্য মতে চরম জ্ঞানের পথে শরীর বাধাস্বরূপ। অর্থ ভাষার দ্বারা বাহিত হয়, একথা সত্য নয়, ভাষা মনকে এনে দেয় অন্য মনের কাছে। অপরিণত ভাষায় শব্দ হয়ত চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু অতীব পরিণত ভাষাতেও তা চিন্তার আভাস-ইঙ্গিতের বেশী কিছু দিতে পারে না। স্নায়ু যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, একথা ঠিক নয়, যেহেতু কল্পনায় যে সুখ-দুঃখ অনুভব করি, তা নিজস্ব সুখ-দুঃখের চেয়ে অনেক প্রখর। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের দ্বারা সাধারণতঃ আমরা যে আমি-উত্তর বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হই, তা পরমকে আবৃত রাখে আমাদের কাছে—যে পর্যন্ত না আমরা সেই পরমকে সহ্য করার সামর্থ্য লাভ করি। এবং যে-পর্যন্ত না ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য ঘটেছে এমন অবস্থায় আমরা পৌঁছাই—সে অবধি শরীরেই আমাদের অবস্থান করতে হবে, কিংবা তাতে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু যখন সীমার বন্ধন ভেঙেছে, যখন আমাদের অস্তিত্বের গহন স্তর পর্যন্ত চেতনাস্পন্দিত হয়েছে, আমাদের সমগ্র চৈতন্য জ্ঞানলাভের একমুখী প্রচণ্ড প্রয়াসে সংহত হয়েছে—সে জ্ঞান এই পরিচিত নির্ধারিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ পরমানুভূতি—তখন কী দর্শন করি আমরা?—তখন দর্শন-স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা যা 'বহু' বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তা হয়ে দাঁড়াবে 'এক'—অদ্বৈত—ঈশ্বর।

এই কারণেই প্রাচ্য ধর্মের পরম লক্ষ্য মুক্তি বা নির্বাণ। অর্থাৎ স্বাধীনতা। যাঁর মধ্যে এই চেতনা পূর্ণতা পেয়েছে, তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত ; যথেচ্ছতার মধ্যে বিহার করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ নন। অজ্ঞানের ঘুম ঘোর ছেড়ে এসেছেন তিনি, তিনি চিরজাগ্রত। রামপ্রসাদ বলেন :

"যে দেশে রজনী নাই......"

[নিবেদিতার অনুবাদ— "from the land where there is no night"—পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে]

রামপ্রসাদের গানের মুখ্য বিষয় কিন্তু জগন্মাতা। মাকে ডেকে তাঁর আদর্শ শিশু হয়ে ওঠেন তিনি। ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়, দেড়শো বছর আগে—ইউরোপীয় শিল্পে 'শিশু-ভাব' আবির্ভূত হওয়ার প্রায় এক শতাব্দী আগে—একজন মহান ভারতীয় ঋষি-কবি ক্ষুদ্র শিশু-প্রাণের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন—লক্ষ্য করেছিলেন তাদের ভাবের পর্যায়, নিজেকে সঞ্চারিত করেছিলেন তাদের অনুভূতির প্রতিটি অংশে—তা করেছিলেন যেন সে বিষয়ে সচেতন না হয়েই।

একবার তিনি বাস্তবিকই সাফাই গেয়েছেন :

"আমি তেমন মায়ের ছেলে নই যে..." [পূর্বে উদ্ধৃত]

কিন্তু আহত গর্বের স্থানে এসে যায় গোপন নৈরাশ্য, তাতে মিশ্রিত সরোষ অধীরতা। ঈশ্বর কি আছেন—তিনি নেই—মরেছেন—নইলে কোনো মা কি ছেলের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে? মায়ের মূর্তি বিসর্জন দিয়ে বেরিয়ে পড়বেন সংসার ত্যাগ করে :

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে আসি দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই।
বিমাতার* তীরে গিয়ে কুশপুত্তল দাহাইয়ে,
অশৌচান্ত পিন্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই।

[Mind, stop calling 'Mother, Mother!'
Don't you know she is dead?—
Else why should she not come?
I am going to the banks of Ganges,
To burn the grass image of my Mother,
And then I will go and live in Beneras]

কিন্তু যখন তীর্থযাত্রার কথা সত্যই উঠল, তখন তিনি এক অপূর্ব সুন্দর, সুগভীর উত্তর দিলেন। বড় দুরন্ত ছেলে তিনি, তাই যেতে চান না, কিন্তু না-যাওয়ার কারণ নির্দেশেও তৎপর। সন্দেহ নিয়ে যায় সন্দেহের মধ্যে, ভ্রূকুটি পরিণত হয় পরম অবাধ্যতায় :

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।...
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন, তাঁর দাসী।
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

---

* গঙ্গার।

[Why should I go to Beneras?
My Mother's lotus-feet
Are millions and millions
Of holy places.
The books say, man dying in Benares
Attains Nirvana.
I believe it. Siva has said it.
But the root of all is devotion
And freedom is her slave.
What good is there even in Nirvana?
Mixing water with water—!
See I do not care to *become* sugar,
I want to *eat* sugar!]

শেষ দুই ছত্রে কী আলোকোদ্ভাস! কৃষকের গ্রাম্য সহজ-চতুর বুদ্ধি মিলেছে মহাকবির অন্তদৃষ্টির সঙ্গে। নিম্নাবস্থানে থাকার উল্লাসের মত অতি সুন্দর—সুন্দরতম—অনুভূতির প্রকাশেই তা নিয়োজিত নয়, একই সঙ্গে সৃষ্টিরহস্যকেও ব্যঞ্জিত করেছে।*

অপরূপের চেয়ে অপরূপ ঘুড়ির গানটি। মা তার খেলনা নিয়ে খেলবেন, এটা শিশুর কাছে খুবই স্বাভাবিক চিন্তা। সব মা-ই তো তাই করে থাকেন। কালী কিভাবে খেলার সাথী হন? মায়ের খেলার জিনিস ঘুড়ি। সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া আছে, যাতে অন্যের ঘুড়ি কেটে বেরুতে পারেন। কিন্তু মা এমন মোহিত করে রাখেন যে, ছেলে তার খেলা ভুলে যায়। সে ছুটে পালিয়ে যায়, আনন্দ-গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখে—আর তার মুখে অজান্তে গান বাঁধা হয়ে যায়। জীবনের সঙ্গীত তা—যে জীবনের খেলা সে দেখছে সামনে। যে-ঘুড়ি কাটল—তা হচ্ছে আত্মা—মুক্তি পেয়েছে। তবু মা হাসছেন, খেলছেন, যেন জানেন না যে, এ সবই ছায়ার খেলা!

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভবসংসার বাজার মাঝে।...
ঘুড়ি লক্ষে দু'একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।

[In the market place of this world,
The Mother sits flying Her kite.
In a hundred thousand,
She cuts the string of one or two.
And when the kite soars up into the Infinite
Oh how She laughs and claps her hands!]

* অদ্বৈতবাদীর কাছে 'চিনি হতে না চাওয়া' নিম্নাবস্থানের অবস্থা, কিন্তু লীলার আনন্দে থাকা। লীলাবাদীর 'চিনি খেতে ভালবাসি'র মধ্যেই সৃষ্টিরহস্য রয়েছে, কারণ অভেদে প্রলয় এবং রূপভেদের লীলাকামনায় সৃষ্টি।

আবার কবি কিছু নেই তবু তারি মধ্য থেকে রহস্য সৃষ্টি করে শিশুর বড় আনন্দের লুকোচুরি খেলছেন।

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।...
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।...
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা, চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বোঝ না রে মন ঠারে ঠারে।

[The name of Her whom I call my Mother
Shall I tell that secret to the world?
(Lit. 'Shall I break the pot before the market?')
Even then who knows Her?
Lo, the six philosophies were not able to
find out Kali!]

মাত্র একটি অলংকারে দেখা যায়, কবি আর শিশু নেই, যেখানে ব্যাকুল হয়ে তিনি নিজেকে শুধিয়েছেন—'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অতল জলে',—সেই সৌন্দর্যসাগরে ডুবতে বলেছেন মনকে যেখানে 'রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।'

সুকোমল শিশুহৃদয়ের ব্যাকুল অর্চনার শিল্পরীতির বিষয়ে এই পর্যন্ত। মায়ের সঙ্গে কবির এই ঘনিষ্ঠতার জন্য এই কবি হিন্দুর কাছে কেবল প্রিয় ও মহান হয়ে ওঠেন নি, পরম ভক্তরূপেও গৃহীত হয়েছেন। সেণ্ট টেরেসার তিরস্কারের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে এক্ষেত্রে : 'প্রতিদিন যেসব মানুষ বা বস্তু আশেপাশে দেখি তার থেকে ঈশ্বর অনেক সত্য আমার কাছে।' ঈশ্বরের এত নিকট এই যে আত্মা, এ কি সেই শিশু নয়, যাকে খ্রীস্টের জানুর উপরে স্থাপন করা হলে তিনি বলেছিলেন—'স্বর্গরাজ্য এদেরই নিয়ে!'

মৃতের জন্য প্রার্থনা*

আত্মগতভাবে :

কি নির্জন হয়ে গেছে শহর, কি ভীষণ জনশূন্য ঘর-বাড়ি,
যেখানে এক সময় লোক গমগম করত!...
কি ক'রে উৎস শুকিয়ে গেল, বাতি গেল নিভে!
কি ক'রে আগুন নিভে গেল, চুল্লির উপর ছাই পড়ল ছড়িয়ে!
কারণ এখন কুমোরের পরম হাত নিজের তৈরি পাত্র ভেঙে ফেলেছে।
এবং জগন্মাতা আমাদের পরম প্রিয়ের মুখ রেখেছেন ঘোমটার আড়ালে।
রাত্রি অন্ধকার, শ্মশানে ঝড় ভয়ংকর।
খরস্রোতা গভীর নদী ভস্মরাশি বহনের পক্ষে।
কাল অনন্ত, যে-কালে বিদেহী আত্মারা ধাবমান।
এবং প্রেম মৃত্যুর হাতকে আটকাবার ব্যর্থতায় কাঁদছে।
হে প্রিয়, আমাদের পুষ্পবনে শুকিয়ে গেছে ফুল, শূন্যপদ্ম পদ্মদীঘি।
আমাদের কাছে গানের পাখির গান থেমে গেছে, আমাদের চোখের তারার উপর দিয়ে কালো মেঘ চলে গেছে।
কারণ তোমার পায়ের চিহ্ন আমাদের দরোজায় আর পড়ে না, তোমার চোখে আর আলো দেখি না।

মৃতার প্রতি প্রণতি :

তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ, যাবার আগে আবার শোনো আমাদের প্রণতি এবং বিদায়!
সমস্ত আঘাত এবং নিঃসঙ্গতার জন্য,
সমস্ত ক্ষুব্ধ এবং অধীর ভাবনা-চিন্তার জন্য,
সমস্ত ভালোবাসায় আমাদের ব্যর্থতার জন্য,
অথবা ভালোবাসা, তোমাকে যে-কথা বলতে পারিনি
আমরা ভালোবাসতাম, ক্ষমো হে ক্ষমো।
জীবনে তোমার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য,
মৃত্যুর পরে সমস্ত প্রয়োজনের জন্য,
যে-পরিশ্রম তোমাকে ক্লান্ত করেছিল,
এবং যে-ভালোবাসা তোমাকে শান্তি দিতে পারেনি,
ক্ষমো হে ক্ষমো।
তোমার মৃত চরণে এইখানে নম্রভাবে আমরা তোমার অতীতের স্মৃতিপত্র অর্পণ করছি।

---

* নিবেদিতাকৃত *An Indian study of Love and Death* কাব্যগ্রন্থের *An office of the Dead*-এর অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত।

তোমার শিশু-দিনের অনুস্মরণে অসীম ভালোবাসায় আবার আমরা বেঁচে উঠি।

একে একে তোমার সমস্ত সাহায্যের মাধুর্যের নম্র আত্মনিয়মের কথা আমাদের মনে আসছে।

আমাদের একত্র চলার স্মৃতি অপরূপ! আশ্চর্য! মৃত্যুর সামনে তুমি এখন পবিত্রতা!

কিন্তু জেনে রাখো, তুমি আমাদের গভীর ভালোবাসায় ফুল, জেনো, যতদিন না আমরাও মৃত্যুর দ্বারা আবৃত হয়ে তোমার পাশে যাচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে নিয়ত প্রেমের ও সাহায্যের প্রার্থনা পাঠাতে ভুলব না।

জেনে রাখো ভালোবাসা মৃত্যুর মতোই শক্তিমতী, অনেক জলেও ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটে না, অনেক প্লাবনেও ভালোবাসা ভেসে যায় না।

তোমার হাত আমাদের হাত থেকে বিচ্যুত হয়নি। আমাদের হৃদয়ের জীবন থেকে তোমার নাম চলে যায়নি।

এবং আমরা এটা ভালোই জানি যে আমাদের তীব্র ইচ্ছা এবং ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা তোমার কাছে না পৌঁছে পারে না, তোমাকে শক্তি না দিয়ে পারে না। ইহলোকে অথবা পরলোকে—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা।

কিন্তু তুমি—প্রিয় আমাদের—এখন বিশ্রাম নাও, শান্তিতে থাকো। তারপর জেগে উঠে আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা কোরো ; এখন এবং মৃত্যুর লগ্নে চিরদিন প্রার্থনা কোরো।

পূজা :

তুমি রাত্রি ভয়ঙ্করী!
তুমি রাত্রি ছলনাময়ী!
তুমি রাত্রি অয়ি মৃত্যুময়ী!
তোমাকে প্রণাম করি আমরা।
তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে প্রণাম করি।
তোমাকে প্রণাম।
জীর্ণ বাস ছেড়ে মানুষ নতুন বস্ত্র পরিধান করে,
জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে আত্মা নতুন দেহে আশ্রয় নেয়...
যা জন্মেছে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত,
যা মৃত তার জন্ম সুনিশ্চিত...
দেহী আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না...

এই সমস্ত দেহ যা আত্মাকে ধারণ ক'রে আছে বিনাশ আছে তাদের, শুধু আত্মা অনন্ত, অবিনশ্বর, অজ্ঞেয়...

সেই আত্মাকে অবিনাশী ব'লে জানো, যে-আত্মা জগৎ চরাচর পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে। কোন কিছুই সেই অনিঃশেষ আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না...

দেহ আসে আর যায়। মৃত্যু থেকে আমাদের অমৃতত্বে নিয়ে যাও!...

শান্তি! শান্তিতে থাকো শ্মশানতীর্থে হারিয়ে-যাওয়া হে মানুষ, তোমরা চলে গেছ আগে, আমরা তোমাদেরই পিছনে আসছি।

হে মহান শক্তিমান মৃত্যু! হে সুখী মৃত্যু! অনন্তকাল ধ'রে পৃথিবী মৃতদের জন্য রোরুদ্যমানা। মৃতের জন্য কেঁদো না! জীবিতদের জন্য বরং কাঁদো, কারণ তাদের মৃত্যু এখনো বাকি।

মৃতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য :

ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাকে রক্ষা করুন।
ঈশ্বর তাঁর মুখের আলো তোমার উপর প্রক্ষেপ করুন,
এবং তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন,
তোমাকে শান্তি দান করুন।
স্বর্গ থেকে করুন তোমাকে সাহায্য।
স্বর্গীয় আসন থেকে তোমাকে শক্তিমতী ক'রে তুলুন।
পূরণ করুন তোমার অন্তরের ইচ্ছা;
ভরে তুলুন তোমার সমস্ত প্রাণ-মন।

প্রার্থনা :

হে কৃষ্ণ, জনগণের প্রিয় গোপাল প্রিয় রাখাল,
হে বুদ্ধ, অনন্ত করুণার অবতার,
যীশু, আত্মার প্রেমিক, আত্মার ত্রাণকর্তা,
রামকৃষ্ণ, মহামাতার মুখচ্ছবি, আর বিবেকানন্দ বীরপ্রাণ,
তোমরা এবং আত্মার আর-সব নামহীন প্রভু
দিব্য করুণার মূর্তি
তোমরা এই আত্মাকে গ্রহণ এবং রক্ষা করো।
হে ঈশ্বর এই মেয়েটিকে তোমার সামনে তোমার সমীপে রাখো,
এবং আলো অন্তহীন তার মুখের উপর বিভাসিত হোক।

'শান্তিতে বিশ্রাম' (স্বামী বিবেকানন্দ রচিত) :

দ্রুত যাও দ্রুত আত্মা তোমার
তারকাকীর্ণ পথে!
ধন্য আত্মা যাও দ্রুত সেইখানে
যেখানে চিন্তা-ভাবনা পেয়েছে মুক্তি!
যেখানে করে না ইন্দ্রিয় কাল দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন
অসীম শান্তি আশীর্বচন বর্ষিত হোক তোমার উপরে, হোক
তোমার সত্য কর্ম তোমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন!
মধুময় স্মৃতি যা অতিক্রম করে সমস্ত দেশ আর কাল,
বেদীর গোলাপের মতো পূর্ণ করুক তোমার পিছনের আসন।

তোমার বন্ধন ছিন্ন, আশীর্বাদে তোমার অন্বেষা সমাপ্ত,
এবং তা-ই যা জীবন-মৃত্যুর মতো আসে,—
তুমি সহায়! পৃথিবীতে সর্বসময়েই ঈর্ষাহীন,
এই দ্বন্দ্ব-কলহের জগতকে তুমি এখনো প্রেম দিয়ে সাহায্য করতে অগ্রসরমান।

রুদ্রের প্রতি প্রার্থনা :

হে রুদ্র, অসৎ থেকে মেয়েটিকে সতে নিয়ে যাও!
অন্ধকার থেকে মেয়েটিকে আলোতে নিয়ে যাও!
মৃত্যু থেকে মেয়েটিকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও!
প্রবেশ করো মেয়েটিতে মেয়েটির আত্মার ভিতর দিয়েই হে রুদ্র।
এবং রক্ষা করো তাকে রক্ষা করো অজ্ঞান থেকে, হে রুদ্র!
অবারিত করো তোমার দক্ষিণ মুখ তার কাছে!

জগন্মাতার প্রতি প্রার্থনা:

হে মাতঃ, তুমি সর্ব আশীর্বাদ-দাত্রী,
সর্ব প্রার্থনা-পূরয়িত্রী,
সর্ব সৎ কর্মের কারয়িত্রী,
তোমাকে আমাদের প্রণাম।
তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে প্রণাম করি।
তোমাকে প্রণাম।
তুমি রাত্রি ভয়ঙ্করী!
তুমি রাত্রি ছলনাময়ী!
তুমি রাত্রি অয়ি মৃত্যুময়ী!
তোমাকে প্রণাম করি আমরা।
তোমাকে প্রণাম করি! তোমাকে প্রণাম করি!
তোমাকে প্রণাম!

পূর্ব জীবন

পূর্ব জীবন

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নিবেদিতার 'দ্বিতীয় জীবন' আরম্ভ হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু 'প্রথম জীবন' শুরু হয় অনেক আগেই—কেবল বয়সের হিসাবে নয়, মনের হিসাবেও। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকালে নিবেদিতার বয়স ছিল প্রায় আটাশ বৎসর। বিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে কর্মজীবন আরম্ভ করেন ১৮ বৎসর বয়সে। মধ্যে দশ বৎসরের ব্যবধান। এই দশ বৎসরে নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ও মনোজীবনের ইতিহাস কার্যতঃ আমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, থাকতও, যদি না লিজেল রেমঁ নিবেদিতাজীবনের এই অধ্যায়ের উপরে আলোক-পাতের দীর্ঘ দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হতেন। বহু সন্ধানে, পরিশ্রমে, শ্রীমতী রেমঁ এই জীবনেতিহাস যথাসম্ভব উদ্ধার করেছেন ; এবং নিবেদিতার পরবর্তী যে-কোনো জীবনীকার এক্ষেত্রে তাঁর পরিশ্রমের ফলভোগ করেছেন, যদিও তা মুক্তভাবে স্বীকৃত হয়েছে, এমন দেখিনা। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রধানতঃ শ্রীমতী রেমঁ-সংগৃহীত তথ্যাদির উপরই নির্ভর করব।

নিবেদিতার 'পূর্বজীবন' বলতে আমরা প্রধানতঃ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ববর্তী জীবনই বুঝব। তবে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে এবং নিবেদিতার ভারতে আগমনের মধ্যেও কিছু সময় ছিল—সেই 'পরিবর্তন যুগের' সম্বন্ধেও কিছু তথ্য দেবার চেষ্টা করব। এসব বিষয়ে উপাদানের প্রধান উৎস নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন ও ভাই মিঃ রিচমন্ড নোবলের স্মৃতিকথা। নিবেদিতার চিঠি থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে ; ম্যাকলাউডের উক্তি থেকেও। মিঃ এরিক হ্যামন্ডের এবং মিঃ এস কে র‍্যাটক্লিফের রচনায় সংবাদ আছে, কিছু সাময়িকপত্রের রচনাতেও।

স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার আগেই নিবেদিতা লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে কি ধরনের ভূমিকা নিতে শুরু করেছিলেন, তা দেখাতে ইংলন্ডে প্রকাশিত দু'একটি সংবাদপত্রের বিবরণী উদ্ধৃত করতে চাই। রেমঁ সংগ্রহে একটি সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ আছে, যার উপরে জিজ্ঞাসা চিহ্নসহ '১৮৯২' লেখা রয়েছে। সেটি এই :

The November number of *Research* will raise considerable discussion in scientific circles from several different standpoints. One article deals with the latest views of scientific investigators in regard to the effect of fresh water on the starfish, which eat the oysters on the American coast. The ravages of the starfish on the oyster beds are almost ruinous to the oyster farmers, but reading the report in *Research* will tend to convince most people that a remedy for the trouble is yet afar off. Then there is an article by Miss Margaret E. Noble, of Kingsley-gate school, Wimbledon—formerly of Liverpool—on "The Higher Education of Girls," which will set some women's tongues going ; and there is an article on "The Life Zones of the British Lias". . . .

কোন্ সংবাদপত্রের অংশ এটি, তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু 'রিসার্চ' পত্রিকায় মার্গারেট ই. নোবলের প্রবন্ধ প্রকাশ এবং অন্যত্র তার সচকিত উল্লেখ লেখিকার বিশিষ্টতাই দেখিয়ে দেয়। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তার বিষয়ে স্বীকৃতিও।

মার্গারেট নোবল কি ধরনের প্রভাব বিস্তার এবং কি জাতীয় স্থানগ্রহণ করেছিলেন সেইকালে, সে বিষয়ে যৎসামান্য তথ্যই আমরা পাচ্ছি, এবং এখানে মনে রাখা উচিত, যেহেতু তিনি ইংলণ্ডের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে যান, তাই পরবর্তী কীর্তি-গৌরবের আলোকাভাস পূর্ববর্তী জীবন পায়নি, সচরাচর বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, তথাপি তাঁর দেহত্যাগের পরে ইংলণ্ডে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিবরণীতে পূর্বজীবনপ্রসঙ্গ একেবারে অনুল্লিখিত থাকতে পারেনি।

টাইমস পত্রিকায় ২৬ অক্টোবর, ১৯১১, মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় :

NOBLE.—On the 21st (13th) Oct., at Darjeeling, MARGARET NOBLE (SISTER NIVEDITA), eldest daughter of the late Rev. S. Richmond Noble.

একই তারিখে টাইমস লেখে :

MISS MARGARET NOBLE

A private telegram from Darjeeling announces the death on October 20, at the age of 44, of Miss Margaret E. Noble, widely known in India as Sister Nivedita, of the Order of Ramakrishna-Vivekananda. A correspondent writes:—

"Miss Noble occupied a remarkable position among the English women who have thrown in their lot with the Indian people. She was of Irish parentage and birth, the daughter of a Congregational minister, the late Rev. S. R. Noble. *A trained teacher of exceptional gifts, she was one of a group of educationists who in the early nineties founded the Sesame Club.* In 1895 she came under the influence of the Swami Vivekananda, who was then lecturing on Indian religion and philosophy in London, and in 1898 went out to India for the purpose of opening a school for Hindu girls in connexion with the Ramakrishna Mission, of which Vivekananda was the head. Taking a small house in the northern quarter of Calcutta, and living in the simplest Indian style, Sister Nivedita grew to exercise, partly through her classes for Hindu girls and women and more through her writings and adresses, a wide influence in India. Her house was visited by leading Indians from every province, and there were few English or Americans of distinction passing through Calcutta who did not make a point of seeing her.

"In 1904 she published 'The Web of Indian Life,' and three years later a volume of 'Cradle Tales of Hinduism'. Last year her record of the life and teachings of Swami Vivekananda appeared under the title of 'The Master as I Saw Him', and latterly she

was engaged in preparing the Swami's lectures and letters for publication."

(বক্রলিপি লেখককৃত)

টাইমস কাগজের এই সুষ্ঠু বিবরণটি নিবেদিতার পরিচিত কারো দ্বারা লিখিত সন্দেহ নেই; অন্ততঃ লেখক যে নিবেদিতার বিষয়ে ঠিক সংবাদ রাখেন তা বোঝা যায়। এর মধ্যে নিবেদিতার পূর্বজীবনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য পাচ্ছি—তিনি "অসাধারণ গুণসমন্বিত 'শিক্ষিত' শিক্ষক," যিনি সিসেম ক্লাবের শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।

ইংলণ্ডের 'নেশন' কাগজে ২৮শে অক্টোবর, ১৯১১, যে লেখা বেরোয়, তাতে অবশ্য নিবেদিতার ভারতীয় জীবনের কথাই বিশেষভাবে বলা আছে :

The early death of Miss Margaret Noble ("Sister Nivedita," or The Consecrated), at Darjeeling, will be felt as a heavy personal loss by thousands of Hindus, especially in Bengal. She was Irish by birth, but there are few Europeans who have entered so closely into the most intimate phases of Indian life. About sixteen years ago she met the Hindu teacher and reformer, Vivekananda, in London, and under his influence she joined the Order of Ramakrishna (the name of his own *Guru*, or teacher) on the Ganges, and herself established a school for Hindu Girls in one of the poorest "native" quarters of Calcutta. Her personal influence, however, extended far beyond the school and the Vedantist Order. In the movement for national regeneration of recent years in India, she served as a recognised guide and inspirer and young India holds no foreign name in greater honour.

২৬ অক্টোবরের ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটে পূর্বজীবন সম্বন্ধে মূল্যবান উল্লেখ :

THE LATE MISS MARGARET NOBLE

By the death at Darjeeling a few days ago of Miss Margaret E. Noble (Sister Nivedita) there has passed away one who succeeded in a very remarkable way in identifying herself with the life and sentiment of India. In 1898, when she went to the East, *Margaret Noble was a brilliant young woman of thirty, and eager educationist,* with a new and absorbing enthusiasm for India, called forth by that powerful personality the Swami Vivekananda. She took a house in the Hindu quarter of Calcutta, and began modestly with a small school for Indian girls.

AS SPEAKER AND WRITER

But Miss Noble's energies soon sought other channels of expression. She addressed large audiences in various cities on Indian ideals, ancient and modern, and there are many who think that her voice was the first to give definite and challenging form to the religion of Nationalism. She wrote as she spoke—with a

strong and vivid power of expression, and an almost fierce sincerity. Her books—especially "The Web of Indian Life" (1904) and "Cradle Tales of Hinduism" (1907)—have been widely read in England and America; but none who knew Margaret Noble will in life have ever thought of them as an adequate reflection of her fine powers of mind. In India, it is no exaggeration to say, her name was held in almost universal reverence.

(বক্রলিপি লেখককৃত)

চমৎকার লেখা, নিবেদিতার প্রতিভা ও কর্মজীবনের উৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ। মার্গারেট নোবল যে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়কালেই 'ত্রিশ বৎসরের দীপ্ত-প্রতিভা তরুণী', এবং 'আগ্রহী শিক্ষাব্রতী' তা পুনশ্চ জানলাম, আরও জানলাম বক্তা ও লেখকরূপে তাঁর ইংলণ্ডে বিদিত যশের কথা, তাঁর উচ্চাঙ্গের মনঃশক্তির কথা, সর্বোপরি, ভারতের "জাতীয়তা-ধর্মের স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, স্পর্ধাযুক্ত প্রবক্তারূপে" তাঁর ভূমিকার কথা। শেষোক্ত মন্তব্যটির বিস্তারিত আলোচনা "শিখাময়ী" অধ্যায়ে করা হবে।

নিবেদিতার ভারত-পূর্ব জীবনের সম্ভাবনাময় প্রকৃতি সম্বন্ধে লণ্ডন টাইমস বা ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্বীকৃতিকে মূল্য দিতেই হয়। এবং ইংলণ্ডের ডেইলী নিউজ কাগজে বিখ্যাত সাংবাদিক এস কে র‍্যাটক্লিফের রচনাকেও। র‍্যাটক্লিফ কলকাতার স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন, পরে ইংলণ্ডেও সম্পাদকতা করেন। ইনি নিবেদিতার বন্ধু ও গুণমুগ্ধ, নিবেদিতার সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলি লেখা পাওয়া যায়, অন্যত্র তার যথাসম্ভব সংকলন দিতে চেষ্টা করব, এখানে ২৬ অক্টোবর, ১৯১১-তে ডেইলী নিউজে প্রকাশিত লেখাটি উপস্থিত করছি :

MARGARET NOBLE

A TRIBUTE TO A REMARKABLE CAREER

(By S. K. Ratcliffe)

News comes by a private cablegram from Darjeeling, in the Himalayas, that Miss Margaret Noble (known throughout India as Sister Nivedita) died there a few days ago, after a short illness. The announcement will bring profound grief to a large number of English and American people, to whom Miss Noble was known alike by her books and her vivid personality. It would be true to say that no English woman has ever made for herself a similar place in the affections of the Indian people, or has tried to do the work to which she put her hand.

Irish by birth and family, the daughter of a Non-conformist minister, *Margaret Noble was known in London twenty years ago as perhaps the most eager and brilliant member of a group of new educationist who, among other things, founded the Sesame Club.* In the middle of the nineties she met the Swami Vivekananda, the first real missionary of Indian religion in the West.

He had made a dramatic appearance at the Chicago Parliament of Religions two years before, had been astonishingly successful in his tour of the United States, and in 1895 was lecturing in London.

Margaret Noble became the most devoted of his followers, and in 1898 she went out to India to assist in the educational work of the Ramakrishna Brotherhood, of which Vivekananda was the head. She became, under the name of Sister Nivedita, an unattached member of the Order, and began in her small house in Northern Calcutta a school for Hindu girls and classes for Hindu women—her aim being to provide modernised instruction on the firm basis of Eastern feeling and ideals. She lived with extreme simplicity entirely among Indians. Her name became known far and wide; there were few Indians of distinction unknown to her; she identified herself with their culture and thoughts, and as a consequence her influence was incalculable. To young Bengal she was an inspiration, for there can be no doubt it was through her words, spoken and written, that the ideal of Indian nationality grew to be a living and absorbing force.

Not on its metaphysical side, but on its vital social relations, Margaret Noble was a constant and intense student of Indian thought. Some years ago she spoke frequently to audiences large and small in many cities of India, and her power of speech was a wonderful thing. In later years, when fever had destroyed her fine physique, she was content to use her pen—for the most part in the Indian monthly reviews. To readers in the West she is known chiefly through her most ambitious, "The Web of Indian Life" (which by no means reveals her full powers), or through the "Cradle Tales of Hinduism", published three years ago. She contributed a paper on "The Present Position of Woman" to the proceedings of the Universal Races Congress held in London last July. She was forty-four years of age, and to many of us her death means the passing of a rare intilligence and of a dauntless and most beautiful soul.

(বক্রলিপি লেখককৃত)

এস কে র‍্যাটক্লিফের মত বিখ্যাত সাংবাদিক-লেখকের পক্ষেই উপরের আকারের মধ্যে নিবেদিতার জীবনের মূল কথাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব। এই লেখায় র‍্যাটক্লিফ খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন, নিবেদিতার লেখা এবং মুখের কথা থেকেই ভারতের জাতীয়তা-ধর্ম জীবন্ত শক্তি হয়ে ওঠে। এই লেখার মধ্যেও পূর্বজীবনের নিবেদিতা সম্বন্ধে 'ব্রিলিয়ান্ট' কথাটি পাচ্ছি, যা পরবর্তী জীবনে 'বিরল মননশক্তি' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই সকল সাক্ষ্য নিবেদিতার মাতৃভূমির সংবাদপত্রসমূহ এবং লেখকবৃন্দের। নিবেদিতার বুদ্ধি ও প্রতিভা বিষয়ে পৃথিবীবিখ্যাত বহু মনীষী ও লেখকের উক্তি আমরা ক্রমে দেখব, এখন আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরতে চাই।

নিবেদিতার বংশলতিকা

হ্যামিলটন——ম্যাকফাডেন

জন নোবল——মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস
১৭৮৮-১৮৪৪ ১৮০৯-১৮৭৩
(এগারোটি সন্তানের ৬ জন জীবিত)

রিচার্ড হ্যামিলটন——এলিজাবেথ মার্ডক

স্যামুয়েল নোবল——মেরী হ্যামিলটন
১৮৪৩-১৮৭৭ | ১৮৪৫-১৯০৯

মার্গারেট
১৮৬৭-১৯১১

মেরী (মে)
(বিয়ের পরে মিসেস উইলসন)
তিন কন্যা, মার্গট, সিসিলি ও গ্রাণী)

রিচমন্ড নোবল
(বিবাহিত)

বোন মে উইলসনের স্মৃতিকথা

পটভূমিকা

নিবেদিতার প্রথম জীবনের তথ্য প্রধানাংশে পাওয়া গিয়েছে তাঁর বোন মেরী (মে) উইলসনের কাছ থেকে। পরবর্তী জীবন সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ তিনি দিয়েছেন। প্রথম জীবন সম্বন্ধে ভাই রিচমন্ড নোবলের স্মৃতিকথা থেকেও তথ্য মেলে।

নিবেদিতা সেই সকল ক্ষণজন্মাদের অন্যতম যাঁরা আদ্যন্ত আদর্শবাদী। 'নিবেদিতা' নাম পাওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি নিবেদিতা, পরে তো নিশ্চয়ই। এই হেতু, নিজের পরিবারের মানুষের কাছেও তিনি আদর্শ প্রতিমা, সাধারণতঃ যা হয় না। তাঁকে নিকট থেকে যারা দেখেছে তারা আরও শ্রদ্ধা করেছে—এই বিরল ব্যাপারটি নিবেদিতার জীবনে দেখতে পাই। বোন এবং ভাইয়ের স্মৃতিকথা থেকে ঐ মনোভাবের পরিচয় মেলে।

যাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক এবং যিনি অত্যুচ্চ চরিত্র, তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর বিষয়ে উপযুক্ত কর্তব্য পালনের ইচ্ছা স্বাভাবিক। ভাই ও বোন, দুজনেরই সে ইচ্ছা ছিল। ভাই চেয়েছিলেন নিবেদিতার জীবনী রচনা করবেন। বলাই বাহুল্য বোনের তাতে সায় ছিল। অন্যদিকে নিবেদিতার পত্রসংকলনের বাসনাও বোনের ছিল। ভাই এবং বোন কারুরই সে ইচ্ছা সফল হয়নি। তার জন্য গভীর অনুতাপ তাঁরা বোধ করেছেন।

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে তাঁর রচিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হন জগদীশচন্দ্র। এস কে র‍্যাটক্লিফ বিশেষ সাহায্য করেন। উদ্বোধনের গণেন্দ্রনাথও বড় ভূমিকা নেন। এই সমস্ত চেষ্টার বিষয়ে মিসেস উইলসনের আগ্রহের শেষ ছিল না। কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র, র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতি তাঁকে পত্রযোগে অবহিত রেখেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তেমন দু'একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। চিঠিগুলি থেকে নিবেদিতার কয়েকটি বইয়ের পটভূমিকাও পাই।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ৮ মার্চ তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা মিঃ র‍্যাটক্লিফের চিঠিতে নিবেদিতার 'ইন্ডো এরিয়ান মিথস্'*, 'সিভিক এন্ড ন্যাশন্যাল আইডিয়ালস্', 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইসটার্ন হোম' প্রভৃতি বইয়ের সংবাদ আছে। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত নিবেদিতার রচনা সংকলন যে বেআইনীভাবে বেরিয়েছিল, তাও জানতে পারি। নিবেদিতার গ্রন্থ সম্বন্ধে যাঁরা কিছু লিখতে চাইবেন, তাঁদের কাছে এই চিঠিটি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

Dear Mrs. Wilson,

I now know to a certain extent what is happening with regard to Margaret's MSS. The book of Indo-Aryan Myths, which she had undertaken to write for George Harrap & Co. was not quite half finished, but the part that is completed would be publishable as it stands if it were not for the conditions governing the series in which it was to appear. I saw the publisher a week ago, and found that he was inclined to insist upon the contract, which would involve the writing of the second part of the book by another hand. My impression is that Dr. Bose will not consent to this, and I think he would be quite right if he did not. Harrap is quite a reasonable man, but he points out that his farm commissioned Margaret to write the book and that large number of illustrations were also ordered which would make it practically necessary that the contract should be carried out.

You will know that Dr. Bose has brought out a small volume of "Civic and National Ideals" and that a Madras publisher has issued an unauthorised collection of miscellaneous papers, including some of the most interesting things published in the "Indian Review".

A few days ago I received from Dr. Bose the MS. of a proposed volume, "Studies from an Eastern Home", which he asked me to submit to Longmans. It is not quite long enough for a volume, as Mr. Longman pointed out to me yesterday. My suggestion to Dr. Bose is that it should be added to by a selection from the articles in the "Indian Review" some of which have been included in Ganesh's volume, and that it should have a biographical introduction. He approved of both suggestions, and

* বইটি পরে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল এবং আনন্দ কুমারস্বামীর যৌথ রচনারূপে কুমারস্বামীর ভূমিকাসহ 'মিথস্ অব দি হিন্দুজ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস্' নামে প্রকাশিত হয়।

I gather from Dr. Bose that he is prepared to leave the question of the introduction to the publisher and myself. I do not know how you and Rich will feel about this, or what your view would be as to the length and character of the introduction. Perhaps you will let me know. Whoever was entrusted with it would have to get from you and from some of Margaret's London and American friends a certain amount of material and possibly some of her letters, although I assume it will be felt that these should be reserved for future use. Mr. Longman is in correspondence with Dr. Bose with regard to the details of publication, but I think there need be no delay about the volume after his reply has been received.

Yours Sincerely,
S. K. RATCLIFFE.

এর কয়েক মাস পরে ২৯ জুলাই তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা এক চিঠিতে মিঃ র‍্যাটক্লিফ জানালেন, **তাঁর ভূমিকা সহ** 'স্টাডিজ ফ্রম এ্যান ইসটার্ন হোম' বইটি শীঘ্রই বেরুচ্ছে। তিনি "দি ওয়েব"-এর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের পক্ষে ইচ্ছা-প্রকাশ করলেন। এই সঙ্গে বাংলায় নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী প্রকাশের প্রসঙ্গও উঠল। গণেন্দ্রনাথ নিশ্চয় উদ্বোধন থেকে তেমন একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে র‍্যাটক্লিফ বললেন, সে বই কিন্তু তাঁর ভূমিকাটি প্রকাশের পরেই বের হওয়া উচিত, কেননা সেক্ষেত্রে বাংলা জীবনীকার নিবেদিতার লন্ডন-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। র‍্যাটক্লিফ বললেন, নিবেদিতার বাংলা জীবনী প্রকাশের ব্যাপারে গণেন্দ্র-নাথের অধিকার অবশ্যই আছে, কারণ "গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত", কিন্তু "ডাঃ বসুর সঙ্গে কেন তিনি যোগাযোগ করেননি, তা বিস্ময়কর।" মঠের পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ এই কাজ করছিলেন কি না, তাও জানতে ইনি উৎসুক ছিলেন।

নিবেদিতার প্রথম জীবন সম্বন্ধে যে-কেউ লিখতে চান, তাঁর পক্ষে মিসেস উইলসনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। র‍্যাটক্লিফ সে সাহায্য নিয়েছিলেন। অপরপক্ষে দেখতে পাই গণেন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত নিবেদিতার বাংলা জীবনী কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থ পরিকল্পনা গণেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত, না মঠের তরফে করা, তা বলার উপায় নেই। তবে উদ্বোধন থেকে এইকালে সরলাবালা সরকারের লেখা 'নিবেদিতা' নামে একটি স্মৃতিমূলক উৎকৃষ্ট জীবনচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সে বইটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়।

পঁচিশ বছর পরে আবার উদ্বোধন থেকে নিবেদিতার জীবনী প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। ১৯৩৭ সালে স্বামী প্রেমঘনানন্দ এই উদ্দেশ্যে নানা তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং মিসেস উইলসনের কন্যা মিস সিসিলি উইলসনকে উপাদানের জন্য পত্র লিখবেন। মিস ম্যাকলাউডের ইচ্ছায় লিখিত ২৭ মে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ঐ চিঠিতে তিনি নিবেদিতার "বংশ পরিচয়, জন্ম তারিখ, প্রথম জীবন, গৃহসংসার ও শিক্ষা প্রভৃতির বিস্তর বিবরণ" চেয়েছিলেন, তৎসহ নিবেদিতার অল্প বয়সের

ফটো, তাঁর পিতা মাতা ও বাড়ির ফটোও। প্রেমঘনানন্দ লিখেছিলেন, "আমরা তাঁর প্রথম জীবনের কথা বিশেষ জানি না, যার জন্য পরিকল্পনাকে কার্যকর করা বিশেষ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ঠিক এই সময়ে, কি এর কিছু পূর্বে শ্রীমতী লিজেল রেম° নিবেদিতার জীবনী রচনার মনস্থ করেন, এবং শ্রীযুক্ত জিন হারবার্টের সহযোগিতায় তথ্যাদি সংগ্রহে সচেষ্ট হন। তাঁদের ব্যাপক প্রয়াসের পরিচয় দেবার স্থান এখানে নেই, শুধু এইটুকু বললেই চলবে, প্রায় দশ বৎসর ধরে তাঁরা উপাদানের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ করেছেন, এবং এই কাজে বহু সহস্র মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ ব্যাপারে দুজনের সাহায্য এঁরা সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলেন—নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন এবং নিবেদিতার মাতৃস্বরূপা বান্ধবী মিস ম্যাকলাউড। মিস ম্যাকলাউডই নিবেদিতার ভাবী জীবনীকাররূপে শ্রীমতী রেম'কে আবিষ্কার করেছিলেন। রেম'র ফরাসী জীবনীর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় জিন হারবার্ট এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুদের একজন, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ 'য়ুম য়ুম' বলতেন, তিনি কয়েক বৎসর আগে একদিন যেন সহসা দিব্যদৃষ্টির ঝলক লাভ করলেন, যেদিন আমরা তাঁর স্ট্রাটফোর্ড অব অ্যাভনের যোড়শ শতাব্দীর প্রাসাদে বসেছিলুম।—নিবেদিতার জীবনীলেখক সত্যই প্রস্তুত হয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন—লিজেল রেম°! ব্যাপারটা সকলের কাছে অবিলম্বে এতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তন্দণ্ডে সেখানেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হল, এবং সর্বদিক থেকে উপাদান অনর্গল এসে হাজির হতে লাগল।"

উপাদানের মুখ্য উৎস ১৮৯৫ পর্যন্ত মিসেস উইলসনের স্মৃতিকথা, এবং পরবর্তীকালে ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রাবলী।

মিসেস উইলসন ও তাঁর কন্যাকে উপাদানের জন্য রেম°-হারবার্ট এবং প্রেমঘনানন্দ প্রায় একই সময়ে লেখেন। উইলসনদের কাছে রেম°-হারবার্ট কিছু আগে তথ্য চেয়েছিলেন, সেইজন্য, কিংবা তাঁরা ভারতীয় প্রয়াসের সাফল্য-সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা রাখতে পারেননি সেই জন্য—যে-জন্যই হোক, প্রেমঘনানন্দকে তাঁর প্রার্থিত উপাদান না দিয়ে রেম°-হারবার্টকে দেন। সেইসঙ্গে প্রস্তাব করা হয়—নিবেদিতার জীবনী রচনার জন্য যৌথ চেষ্টা করা হোক। ভারত এবং বহির্ভারত থেকে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা প্রথমে শ্রীমতী রেম° ফরাসী জীবনী লিখবেন, পরে সিসিলি উইলসন তার ইংরাজী অনুবাদ করবেন, এবং বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবে উদ্বোধন। এই প্রস্তাব সম্ভবতঃ প্রেমঘনানন্দ বা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয়নি, এবং বাংলা জীবনী রচনার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, যা আরও কুড়ি বৎসর পরে কার্যকর হবে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার চেষ্টায়। তার আগেই অবশ্য লিজেল রেম'র জীবনী প্রকাশিত হয়ে যাবে।

১৯৩৭ সালের মে মাসের পূর্বেই রেম°-হারবার্ট নিবেদিতার জীবনী রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে মিসেস উইলসনের সঙ্গে সংযোগ করেন। নিবেদিতার প্রতি

দায়িত্ব পালন না করার জন্য মিসেস উইলসন দীর্ঘদিন ধরে যে আত্মগ্লানি বোধ করেছেন, তা দূরীভূত হয়েছিল রেমঁ-হারবার্টের উদ্দীপ্ত প্রস্তাবে, 'যাঁরা মনে করেন কাজ বিস্তৃত ও সুচারু ভাবেই করা উচিত।' সেকথা জেনে মিসেস উইলসনের 'মানসিক ও আত্মিক বলাধান' হয়েছিল, এবং এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনার জন্য রেমঁ-হারবার্ট যখন তাঁকে মার্সেলিজ বা জেনিভায় আমন্ত্রণ জানালেন, তখন তাঁদের প্রতি এঁর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, এবং ট্যান্টিনের (ম্যাকলাউড) প্রতিও।— "সুতরাং, ট্যান্টিন ডার্লিং, তুমি আমার জন্য আবার একটি সুযোগ করে দিলে! আমি উদ্দীপ্ত, শিহরিত!" ১৯৩৭ সালের ৩০ মে তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে এইসব কথা পাচ্ছি। ঐ চিঠিতে মিসেস উইলসন লেখেন, তিনি রেমঁ-হারবার্টকে কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতার ডায়েরীর কথা বলেছেন, যা ওঁরা দেখেন নি, যেগুলি হয়ত ম্যাকলাউড-প্রেরিত চিঠির দ্বিতীয় তাড়ার মধ্যে রয়েছে!'

মিস ম্যাকলাউড জানিয়েছিলেন, রেমঁ-হারবার্ট জীবনী রচনার কাজে গোটা দু'বৎসর ব্যয় করবেন। সেই সংবাদে মিসেস উইলসন আনন্দে আত্মহারা। জিন হারবার্টকে লেখা ১২ জুলাই তারিখের চিঠিতে সে উল্লাস প্রকাশ করার পরে মিসেস উইলসন নিজেও খুশীর সংবাদ দিলেন—'আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমাদের কাছে ডায়েরীগুলি আছে, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে সেগুলি তাঁর (নিবেদিতার) তীর্থভ্রমণ সংক্রান্ত, এবং তাদের পাঠোদ্ধার করা নিতান্ত কঠিন।'

রেমঁ-হারবার্ট প্রচেষ্টার বিষয়ে মিসেস উইলসনের উৎসাহের আর একটি কারণ, এঁরা কেবল তথ্যভার জমিয়ে তোলাতেই উৎসাহী নন, 'জীবনী রচনায় পরিবেশ ও আবহের উপরও নির্ভর করেন।'

'That is where I feel an Oriental mind could not catch the Elusiveness of an Occidental idealist!'

এইসব কথা মিসেস উইলসন ১০ অগস্ট, ১৯৩৭ তারিখে লিখেছিলেন, এবং ঐ পত্রেই স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর চমৎকার উত্তরের কথাও জানিয়েছিলেন।—

"I had such nice answers from the Boses—I love them for Nivedita's sake as well as their own. Sir Jagadis Bose says "we shall, of course be pleased to meet Monsieur Jean Herbert and Mlle Raymond, when they come to Calcutta. The only thing I could tell them is however in regard to Nivedita's help throughout my uphill scientific work against tremendous odds, till it received full recognition. No one who knows the real state of things will realise how much the cause of Indian Nationality owes to Nivedita's selfless devotion and long suffering."

মিসেস উইলসন তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (নিবেদিতার চেয়ে দশ বছরের ছোট) জামাইকাবাসী রিচমণ্ড নোবলের সঙ্গে সংযোগ করতে বলেন, 'কারণ সেও যথেষ্ট সংবাদ দিতে পারবে।'

মিসেস উইলসনের ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এর চিঠি থেকে পাচ্ছি, তিনি বহু উপাদান ইতিমধ্যেই রেমঁ-হারবার্টকে দিয়ে দিয়েছেন, বাকি উপাদানের বিষয়ে কন্যা

সিসিলিকে লিখতে বলেছেন। সেই সঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে মিঃ র‍্যাটক্লিফের সাহায্য চাইতে বলেছেন, যিনি 'অতীব সমর্থ', যাঁকে নিবেদিতা সবিশেষ সমাদর করতেন।'

এই সময়ে মিসেস উইলসন লন্ডন ছেড়ে সাউথ আফ্রিকায় যাচ্ছেন। (বয়স তখন প্রায় সত্তর), যেতে প্রাণ চাইছে না, তবু নিজের সন্তানেরা রয়েছে সেখানে, যার টান কাটানো যায় না, কিন্তু লন্ডনের সঙ্গে বিচ্ছেদ আতুর করে তুলছে প্রাণ,—"যে লন্ডন সব সময়ে অন্তর্জীবনে প্রাণতরঙ্গ এনে দেয়; মনে পড়ে যায় নিবেদিতা আর আমি কতবার ঘুরে বেড়িয়েছি এর আনাচে কানাচে!"

মিসেস উইলসনের কথামত রেম্‌-হারবার্ট রিচমন্ড নোবল ও সিসিলি উইলসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সিসিলি উইলসনকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এ লেখা এঁদের চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডের দেওয়া বিপুল সংখ্যক পত্রের কথা পাচ্ছি, যাদের পাঠোদ্ধার করা বহু সময় দুরূহ। পত্র পত্রিকায় লেখার সময়ে নিবেদিতা কি কি ছদ্মনাম নিতেন, সে বিষয়ে, এবং মিসেস উইলসন-কথিত তীর্থযাত্রাকালীন ডায়েরী, যাতে অজস্র সংবাদ আছে—সে বিষয়ে প্রশ্নও ছিল। সে ডায়েরী কি সিসিলির কাছে আছে? থাকলে কি পাঠিয়ে দেবেন?*

ঐ চিঠির উত্তরে ৫ নভেম্বর তারিখে সিসিলি উইলসন জানালেন, তাঁর কাছে নিবেদিতার প্রথম জীবনের অনেক লেখা রয়েছে। কয়েকটি ছদ্মনামেরও উল্লেখ করলেন; ডায়েরী প্রভৃতি তিনি তাঁর মাকে দেখিয়ে পাঠাবেন বললেন।—

"I have, amongst other papers, a great many articles written by Aunt Margaret at different stages of her career. Her earlier noms de plume were Margaret Nealas Underwood, Nealas Underwood, and I think, Margaret Nealas. I cannot find any others. As Mother will be back here towards the end of the month, I think it would be better to let her look everything over before sending them, including the diaries."

ইতিমধ্যে ডাঃ বসুর মৃত্যু হয় (২৩.১১.১৯৩৭)। এই মৃত্যুতে মিসেস উইলসন ব্যক্তিগত শোকবোধ করেছিলেন। জোহানেসবার্গ থেকে লিজেল রেম্‌কে তিনি লেখেন (তারিখ নেই চিঠিতে)

"ডাঃ বসুর মৃত্যুতে বিরাট ক্ষতি হল। খুবই মুহ্যমান বোধ করছি, কারণ আমরা সকলে তাঁর অনুরক্ত ছিলুম। বেচারা লেডী বসু অতীব বেদনার্ত হয়ে চিঠি লিখেছেন। তাতে আছে—'আমার স্বামীর কাগজপত্রের মধ্যে নিবেদিতাকে লেখা মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির কিছু চিঠি রয়েছে। সে গুলি নিয়ে কি করব?'

---

* "Mrs. Wilson also feels that we might get a lot of information from Nivedita's diaries, especially those written during the pilgrimage to Kashmere, and she thinks you may be able to find them. Could you send them also?"

"বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয় বিবেচনা করে সরাসরি তাঁকে লিখলাম, তিনি যেন নিবেদিতা-সংক্রান্ত কাগজের টুকরো পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। ৩০ মার্চ লেখা তাঁর উত্তরের অংশ—'আমার কাছে নিবেদিতাকে লেখা ট্যান্টিন প্রভৃতি কয়েকজনের চিঠি ছিল, যেগুলি জনৈক সন্ন্যাসী নিয়ে যান, যিনি জীবনী প্রস্তুত করছেন।' "

এই চিঠিতেই মিসেস উইলসন জানান, নিবেদিতার ডায়েরীগুলি তাঁর হাতে নিরাপদে, বহাল তবিয়তে রয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক কাগজপত্রও।

লেডী বসুর কাছ থেকে নিবেদিতা-সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র হস্তান্তরিত হওয়ায় মিসেস উইলসন বিশেষ বিরক্ত বোধ করেছিলেন। ম্যাকলাউডকে ১৩ মে, ১৯৩৮-এর চিঠিতে তা জানিয়েছেন। শীঘ্রই যে ডায়েরী থেকে অংশ টুকে লিজেল হারবার্টকে পাঠাচ্ছেন, তাও লিখেছিলেন।*

এই সমস্ত চিঠিপত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি, নিবেদিতার ডায়েরী রীতিমত জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস উইলসনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নিবেদিতার কিছু ডায়েরী গোড়া থেকেই তাঁর কাছে ছিল, যেগুলি তাঁর ধারণায় তীর্থযাত্রা-সংক্রান্ত, যাদের পাঠোদ্ধার করা দুরূহ বলে সে চেষ্টা বোধহয় পূর্বে তিনি করেননি। নিবেদিতার চিঠিপত্রে এই সকল ডায়েরীর প্রভূত উল্লেখ রয়েছে। স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবনের অপরূপ বর্ণনা এইসব ডায়েরীর মধ্যে ছিল, যা নকল করে নিবেদিতা নিজেদের মন্ডলীর মধ্যে বিতরণ করতেন। ডায়েরীগুলিতে নিবেদিতা ছবি পর্যন্ত এঁকেছেন, এমন কথা তাঁর চিঠি থেকে পাই। স্বয়ং স্বামীজী এই ডায়েরী পড়েছেন। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' বইটি এই ডায়েরী অবলম্বন করেই রচিত। পরে এই ডায়েরীগুলির কিন্তু কোনো সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়নি। শ্রীমতী রেম' আমাকে বলেছেন, তিনি কখনো কোনো ডায়েরী পাননি। জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে কিছু ডায়েরী ছিল, যেগুলি তিনি রক্ষা করেছিলেন, কারণ তার মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের নোট ছিল, তেমন কিছু ডায়েরী লেডী বসু বোধ হয় মিসেস উইলসনের কাছে ডাঃ বসুর মৃত্যুর পরে পাঠিয়ে দেন। রেম'-হারবার্টকে লেখা মিসেস উইলসনের চিঠিপত্র থেকে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না, রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে কোনো ডায়েরী গিয়ে পড়েছিল (যদিও জনৈক সন্ন্যাসীর হাতে কিছু চিঠিপত্র পড়েছিল, একথা পাই)। পরে আমরা শুনেছি, মিসেস উইলসন নিজেই আফ্রিকায় সফররত জনৈক সন্ন্যাসীকে নিবেদিতার কিছু ডায়েরী দেন, আত্মপ্রাণা প্রভৃতি তাঁদের

---

* "I had a letter from Lady Bose in which she told me that amongst her Husband's papers, she found a good many letters from you, Mrs. Ole Bull and others, to Nivedita and some other odds and ends. She asked me what she should do. By return I asked her to let me have every spred of letters and papers belonging to or in connection with Nivedita. Then to my astonishment she wrote that she handed them over to a Swami, who came asking for them saying that he was writing a biography and you had given him many letters. I did not take any further step for the whole affair is rather unusual. I do not know anything about 'rights' in the matter, and the fact that he had letters of yours might authorise him to get others. I find myself wondering why Dr. Bose detained any letters—but I assure myself that there will be no matter in them that we should regret being made public."

জীবনীতে যেগুলির উল্লেখ করেছেন। আত্মপ্রাণা আমাকে জানিয়েছেন, সব কয় বছরের ডায়েরী পাওয়া যায়নি, এবং ডায়েরীগুলি মোটেই বর্ণনাত্মক কিছু নয়, অতি সংক্ষিপ্ত, নিবেদিতার নিজস্ব ভঙ্গিতে করা কিছু নোট তার মধ্যে রয়েছে।

ডায়েরী প্রসঙ্গ শেষ করছি জোহানেসবার্গ থেকে লেখা (তারিখহীন) মিসেস উইলসনের চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে—

"I enclose Nivedita's letter in which she refers to diaries and papers—and it was because of this that I was so surprised at Lady Bose's action. I think Dr. Bose reserved some of the diaries because they referred to his work. I cannot find a diary for 1903! I am disappointed to find that the diaries are not at all narrative—they are memoranda rather than diaries"*

যে বৃদ্ধা নারী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্মৃতির পবিত্র অগ্নি বুকে ধরে রেখেছিলেন দীর্ঘকাল কিন্তু স্থাপন করতে পারেননি বাইরের কোনো আধারে, তিনি যখন সেই অগ্নিকথা লিখবার উপযুক্ত মানুষ পেলেন, তখন তাঁর সুগভীর আনন্দের পরিচয় দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করছি। রেমঁ-হারবার্ট যেসব বস্তু চেয়েছিলেন, অসুস্থতার জন্য সেগুলি সময়মত দিতে পারেন নি বলে তিনি মরমে মরে ছিলেন। 'দেখতে পাচ্ছি অসুস্থতার মন্দতম দিক শারীরিক যন্ত্রণা নয়, তা হল, মানুষকে তা দুর্বল ও অসমর্থ করে তোলে।'—মিসেস উইলসন লিখেছিলেন।—'নিবেদিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করছি না, এই চিন্তা আমার অসুস্থতার মধ্যে আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করেছে। এবং সেই আকুতিই যেন আমাকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছে আবার!' রেমঁ-হারবার্ট তথ্য সন্ধানের জন্য ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, 'নিঃস্বার্থ সেই পরিশ্রম প্রশংসার অতীত', 'মনে হচ্ছে নিবেদিতার সমাধির একটি পাথর যেন সরে গেল'; মিসেস উইলসন জানতে চেয়েছিলেন, ওঁরা কি "কলকাতায় নিবেদিতাকে জানতেন এমন কোনো মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে নিবেদিতা বিপুল অন্তর্নিহিত শক্তি লাভ করেছিল, এবং 'দি ওয়েব' বইয়ের অপূর্ব কিছু পরিচ্ছেদ লিখতে পেরেছিল?" ২৯ অগস্টের (১৯৩৯) ঐ পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন, 'বর্ণনার অতীত আমার আনন্দ—একাজ করবার মত শক্তি আপনারা পেয়েছেন। ধন্য আপনারা; ধন্য ট্যান্টিন! কী বিশ্বস্ত বন্ধু না সে!'

আরও লিখেছিলেন—'আমার শক্তি অব্যাহত থাকে যেন, যাতে করে আপনাদের প্রয়োজনে আমি লাগতে পারি; হাঁ সে চেষ্টা আমি করব।'

১৯৩৭ সালের নানা সময়ে, কখনো মিস ম্যাকলাউডের স্ট্রাটফোর্ড অ্যাভনের আবাসে (২৫-২৬ মার্চ), কখনো ট্রেনে, কখনো প্যারিসে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের বাসস্থানে (অক্টোবর) কখনো জেনিভায় (অক্টোবর) নিজেদের বাড়িতে এঁরা মিসেস

* ডায়েরী সম্বন্ধে একই জাতীয় কথা ইনি লিজেল রেমঁকে লেখেন ২৯ অগস্ট, ১৯৩৯-এ—
"But you know Lizelle, the diaries were simply notes on Dr. Bose's activities, they were no revelation of Nivedita and I understood that that was the reason he kept the diaries in his own care so long."

উইলসনকে প্রশ্ন করে তথ্য জেনেছেন। সেই সব সাক্ষাৎকারের নোট এঁরা রেখেছেন। জিন হারবার্টের নোটগুলি ইংরাজীতে, এবং লিজেল রেমঁর নোট প্রধানতঃ ফরাসীতে। যে সব নোট আমি পেয়েছি, তাতে প্রচুর পৃষ্ঠা নেই। নোটগুলি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে করা, অনেক সময়ে এত হ্রস্ব যে, অর্থবোধ হওয়া কঠিন। বিশেষত শ্রীমতী রেমঁর ফরাসী নোটগুলি তাঁর বিচিত্র সংক্ষিপ্ত মিশ্র লিখনপদ্ধতির জন্য প্রায়ই দুর্বোধ্য। ফরাসী সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ কর্মকারের সাহায্য ভিন্ন তার থেকে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হত না। এই নোটগুলি উপস্থিত করব, এই কারণে যে, সবটুকু অংশ শ্রীমতী রেমঁ ব্যবহার করেননি, এবং নিবেদিতার বাল্যসঙ্গিনী বোনের মুখের উক্তিগুলির মধ্যে প্রাণোত্তাপ প্রচুর। তবু পাঠকদের সতর্ক করে বলব, বিনা বিচারে এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না, কারণ, যিনি বলেছেন, দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের জন্য কিছু তথ্যগত ভুল তিনি করতে পারেন; যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা ভুল লিখতে পারেন, এবং তাঁরা যা লিখেছেন, তার থেকে পাঠোদ্ধার করবার কালে আমরাও ভুল করতে পারি।

মিসেস উইলসনের মুখের কথাগুলি উপস্থিত করার আগে প্রথমে যে লেখাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন, তার অনুবাদ উপস্থিত করছি। তার পরে কথিত স্মৃতি দেব।

মিসেস উইলসনের লিখিত স্মৃতিকথা

নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল) সামুয়েল ও ইসাবেল নোবল, এই তরুণ আইরিশ দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান। সে তার শৈশব কাটিয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডে। যখন সে মাত্র কয়েক মাসের, সেই সময়ে আমাদের বাবা মা ঠিক করেন যে, ইংলণ্ডে বাস করবেন। সেই ওলটপালটের কালে তাকে আমাদের ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন তাকে ফেরত নেওয়ার কথা হল, তখন ঠাকুরমা এমন করুণভাবে নিজের নিঃসঙ্গত্বের কথা বলেছিলেন যে, শিশুটিকে "স্কুলের বয়স" পর্যন্ত তাঁর কাছে রেখে দেওয়া স্থির হয়। সে তাই কয়েক বছর সেখানেই ছিল, এবং এই সময়টি নিবেদিতার জীবনে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে।

অসাধারণ মহিলা ছিলেন আমার ঠাকুরমা। তাঁর প্রশান্তি এবং মাধুর্য সহজাত গুণ নয়, অখণ্ড আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পুণ্যার্চনার ফল। তিনি ধীর, সমর্থ মহিলা ছিলেন, অনাথ বালকদের নিয়ে তাঁর যে বৃহৎ পরিবার ছিল, তাকে কিভাবে শাসনে রাখতে হয় জানতেন, অথচ তাঁর সম্বন্ধে তাদের গর্ব ও ভালবাসা অব্যাহত থাকতই। নিবেদিতা শেষকালে যখন সত্যই বাড়ি ফিরেছিল, তারপরে দীর্ঘ সময় সে নিজেকে বহিরাগত বলে অনুভব করত, আমরা যে অন্যান্য ভাইবোন ছিলাম, আমাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে ব্যস্ত থাকত, সেইসঙ্গে কর্তৃত্বও করত, এবং নিজের সুখ সম্বন্ধে স্বার্থপরতার চিহ্নমাত্র ছিল না তার মধ্যে। সেই অল্প বয়সেই ক্ষমা গুণে পূর্ণ ছিল তার অন্তর। আর রূপকথার গল্প ও বিচিত্র সব বিষয়ের কথা বলে আমাদের অধীর আগ্রহে ব্যাকুল করে তুলত। বাবার উপাসনা সভায় যেসব পীড়িত আর বৃদ্ধ লোক

আসতেন, তাঁরা তাকে তার সমুজ্জ্বল করুণার জন্য বড়ই ভালবাসতেন ; সে তাঁদের দুঃখকষ্টের সংবাদ নিতে সদাই উৎসুক ছিল। বয়সের তুলনায় প্রবীণ ছিল সে, উৎফুল্ল নয়, প্রশান্ত। খেলাধুলা না করে পড়াশোনায় ডুবে থাকার জন্য নানা অসুবিধা ঘটত, কারণ আমার বাবা-মা বুঝতে পারেননি সে তার শৈশব হারিয়েছিল—নিঃসঙ্গ শৈশবজীবন কাটিয়ে।

বাবা ও নিবেদিতার মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল গভীর। বাবা বিবেচনাবুদ্ধির সঙ্গে তাকে বুঝতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। নিবেদিতার বয়স যখন দশ, তখন বাবা মারা যান। সে মৃত্যু তাকে প্রচন্ড বেজেছিল।

তারপর বিদ্যালয়ের সাতটি মর্মান্তিক বছর। স্পর্শকাতর একটি শিশুর কাছে তা ছিল যূপকাষ্ঠে বলিদানের সময়। এই যে কটাহে সে নিক্ষিপ্ত হল, তার অতীত জীবন এর পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না। শিশুরা অনেকটা পশুর মত, তাদের থেকে যা-কিছু আলাদা তাকেই তারা যন্ত্রণা দেয়—এক্ষেত্রে সে ছিল পৃথক, বিশিষ্ট ও আদর্শবাদী। অন্যের মত হয়ে ওঠার জন্য তার সকরুণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে নিজের নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন থাকত। তার যন্ত্রণার শেষ ছিল না। তা সত্ত্বেও, তার মনের অসাধারণ শক্তি, আদর্শবাদ ও কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত স্কুলে তাকে নেত্রীত্বের আসন দিয়েছিল ; তার নির্ভয় সাধুতা, আত্মার পবিত্রতা, ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ উদারতার জন্য সে যে জন্ম-নেত্রী—এই অবিতর্ক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, পরবর্তী-কালে যা থেকে গিয়েছিল মূল্যবান ঐতিহ্যরূপে। বহুজনের মধ্যে যাপন-করা এই নিঃসঙ্গ জীবনের বছরগুলি অল্পবয়সী মেয়েটির অন্তর্জীবনে সবিশেষ বলাধান করেছিল, তাকে নিয়ে গিয়েছিল গ্রন্থ, শিল্প ও ধর্মের জগতের মধ্যে, তার আত্ম-মুক্তির ঐগুলিই ছিল পথ।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এমন একজন প্রধানা শিক্ষিকাকে পেলাম, যিনি ধর্ম-সংস্কারের অগ্নিপ্রবাহ বইয়ে দিলেন। নিবেদিতা উৎসাহী দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল, যারা বাইবেল-চর্চা করেছিল গভীরভাবে এবং সারা জীবনের জন্য সংযম ও আত্মশাসনের শপথ নিয়েছিল। তাদের অনেকেই অবশ্য বন্ধুবান্ধব ও ছুটির অবকাশ যেসব প্রলোভনাদি হাজির করত, তা এড়াতে পারেনি, কিন্তু নিবেদিতা আনুগত্যে অটল ছিল—"উদ্ভট", "গুরুমণি" এইসব আখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। সৌভাগ্যবশতঃ এহেন জীবনের কাঠিন্য এবং আত্মনিগ্রহের ভার লাঘব হয়েছিল তার সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধে। এই শিল্পপ্রীতির জন্য সে কিছু সময়ের জন্য রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে কিন্তু সে এমন কিছু পরমোৎসাহী সুপণ্ডিত অ্যাংলো-ক্যাথলিকের ব্যক্তিগত সংশ্রবে আসে, যাঁদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা দেখতে পায়। ঐ দুই সূত্র থেকে সে প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলনের অমূল্য প্রেরণালাভ করে।

স্কুল ত্যাগের পরে নিবেদিতা শিক্ষকতা ও আংশিক সাংবাদিকতাকে উপজীবিকা-রূপে গ্রহণ করে। কোনো বিষয়েই উদাসীন থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ সংস্কারের পক্ষে সে মহা উৎসাহী প্রচারক ; তার অক্লান্ত প্রচারের বিষয় : শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, দায়িত্বশীল নাগরিক

হয়, কতকগুলি তথ্যের কোষাগারমাত্র হয়ে না দাঁড়ায়। এই আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে, যার মধ্য দিয়ে আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হবে। নিজের শৈশবের অভাবের কথা স্মরণ করে সে সেখানে কিন্ডারগার্টেন পর্যায় যুক্ত করেছিল।

শিক্ষকতাতেই নিবদ্ধ থাকেনি সে। সংবাদপত্রের রচনা এবং জনসভায় ভাষণাদির দ্বারা নিজেকে ও নিজের আদর্শকে সে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তুলেছিল। শিক্ষা ব্যবস্থায় নব চেতনা সঞ্চারে এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার উন্নয়নে সে ছিল অক্লান্ত কর্মী।

সুতরাং সে যখন স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেল, ন্যায্য প্রতিরোধের পরে যখন স্বামীজীর মূল্য ও আন্তরিকতার সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় হোল, তখন চমৎকৃত হয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই ভারতের নারীদের জন্য কাজের প্রবল আগ্রহে হৃদয় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। সে অনুভব করল যে, তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এই উদ্দেশ্যের পথেই তাকে চালিত করেছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বশক্তি নিয়ে। যত প্রকারে সম্ভব, ভারতীয় নারীদের কাছে এই সত্যটি প্রতিভাত করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল, তাদের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে ; এবং তারা যাতে নিজেদের সাহায্য নিজেরাই করতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত উপাদান তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও তার ব্রত হয়ে দাঁড়াল।

এই উদ্দেশ্যেই বাগবাজারের ১৭নং বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির সৃষ্টি, যে বিদ্যালয়টি এখন সুরম্য একটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার আশা ও বিশ্বাস, বিদ্যালয়টি ভারতে নারী-শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শনির্ভর সৃষ্টিশীল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

নিজ আদর্শের সাধনায় নিবেদিতা কোনো ফুল-বিছানো পথে হাঁটে নি, বাধা-হীন কোনো পথ বাছে নি ; আদর্শের সিদ্ধিরূপ সে দেখেছে, কারণ দুর্জয় ছিল তার সাহস, অখন্ড ছিল উৎসাহ, প্রলোভনের সামনে ম্লান হয়নি জীবনোদ্দেশ্য, এবং ভারতের নারীদের জন্য সর্বোচ্চ-সম্ভব উৎসর্গের কমে সন্তুষ্ট হয়নি সে।

"ঈশ্বর তার সব অভিপ্রায় সার্থক করুন।"

মিসেস উইলসন-কথিত স্মৃতি

নিবেদিতার ঠাকুরমার নাম এলিজাবেথ নীলাস। এ'দের পরিবারের আয়ারল্যান্ডে বাস ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের রস্টোভরে বন্ধুর (বা আত্মীয়ের) বাড়িতে গেলে সেখানে জন নোবলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জন নোবলের বয়স তখন ৪০, এ'র বয়স ১৮। পুরুষটি এ'কে আত্মহারা করে দেন, বিয়ে হয়, ফলে পরিবার থেকে বিতাড়িত ও একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েন।

জন নোবল পাদরী ছিলেন। ৫৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এগারোটি সন্তান হয়, যার ৬টি বাঁচে।

তিনি ওয়েসলিয়ান চার্চে ছিলেন। তিন বছর অন্তর এক প্যারিশ থেকে অন্য প্যারিশে বদলি হতেন, তবে উত্তর আয়ারল্যান্ডের মধ্যেই। তাঁর মৃত্যুকালে পত্নীর

বয়স ৩৫। পত্নী পরে হয়ে দাঁড়ান মস্ত রাজনীতিক, রক্ষণশীল দলের। দলের লোকেরা এ'র বাড়িতে জুটতেন সলা পরামর্শের জন্য। এ'র বাড়ি সর্বজনপরিচিত।

ইনি মার্গটকে (নিবেদিতা) ৪ বছর পর্যন্ত পালন করেন। বাইবেল পড়তে শেখান। ইনি ফুল পছন্দ করতেন, বাগান তৈরী করেছিলেন, অপূর্ব তা, প্রাচীরের গায়ে গায়ে ফুলের রাশি। ৬৪ বছর বয়সে এ'র মৃত্যু হয়। মার্গট এ'কে খুব শ্রদ্ধা করত। আয়ারল্যাণ্ডের জন্য প্রবন্ধ লেখার সময়ে সে এ'র 'নীলাস' পদবী ছদ্মনাম-রূপে ব্যবহার করত।

জন নোবলের ভাইয়ের নাম ডাঃ জর্জ নোবল। বিধিবদ্ধ পড়াশোনা না করলেও তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানে পন্ডিত বলে খ্যাত। প্রভাবশালী। ভ্রাতৃবধূর যথার্থ সুহৃদ। এ'র ছেলেরা ছিলেন ভারী কল্পনাপ্রবণ।

এ'র বড় ছেলে সব শেষে মারা যান। সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় তাঁর পত্নীসহ মৃত্যু। নিবেদিতার সঙ্গে এ'র সাক্ষাৎ হয়েছিল (নিবেদিতার) মায়ের মৃত্যুকালে।

আমাদের মা যখন ৪ বছরের শিশু তখন দিদিমা মারা যান। তখন মাকে পালনের ভার পড়ে মায়ের ঠাকুরমার উপর। তিনি তিরিক্ষি বুড়ি, আধিপত্য করা স্বভাব। আদর দিয়ে ও প্রশংসা করে নাতনির মাথা খেয়েছিলেন। মা ধনী পরিবারের মেয়ে। মায়ের পিতৃপরিবারও আয়ারল্যাণ্ডে বহু পূর্বে বসতি করেছিলেন। তাঁদের মূল মন্ত্র ছিল—ফুঁড়ে এগিয়ে যাও।

দাদামশায় রিচার্ড হ্যামিলটন—কর্ক-ছিপির ব্যবসা করতেন। রাজনীতিতে বিশেষ উৎসাহী।

আমাদের পিতার জন্ম ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এগারো জন সন্তানের মধ্যে তিনি শেষের দিকে তৃতীয়। এগারো জনের মধ্যে ৬ জন বে'চেছিলেন। পিতার নাম, স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল (একজন বিখ্যাত 'প্যাস্টরের' নাম ছিল রিচমন্ড ; ঠাকুমা সেই কথা মনে রেখেই ঐ নাম দেন যাতে সন্তান ভাবী জীবনে প্রভাবিত হয়)। বড় ভাই জনই তাঁকে মানুষ করেন কারণ তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। শেষে কাপড়ের ব্যবসায়ে লাগেন। এক ধনী কাকা কাজকর্ম শিখিয়েছিলেন। বয়সের পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ছলচাতুরীতে অভ্যস্ত হতে পারেন নি কখনও। ব্যবসায়ী সমাজের এক সমাবেশে মেরী ইসাবেল হ্যামিলটনকে (জন্ম ১৮৪৫) দেখেন। তখন তাঁদের বয়স অল্প। তিন সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হয়। মেয়েটি অনেক দিন ধরেই এ'র মাকে (যিনি পরে শাশুড়ী হন) শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সেই কারণেই এই বাড়ির বধূ হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। বিয়ের পরে সুন্দর গ্রাম-শহর ডানগাননে থাকেন পরম সুখে।

স্বামীর মতই তরুণী বধূ অনুভব করেন যে, ব্যবসা ত্যাগ করে তাঁর স্বামীর পাদরীজীবন বরণ করা উচিত। স্বামী স্থির করতে পারছিলেন না ঠিক কি করবেন। তিনি কবি, চমৎকার বক্তা, ব্যক্তিত্বে ছিল চৌম্বক আকর্ষণ। ওয়েসলিয়ান চার্চের ব্যাপারে সুখী ছিলেন না। অন্য একটি চার্চ খুঁজে নেওয়া দরকার। অল্প বয়সী বধূ গৃহসুখের সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত—সব কিছু বিক্রী করে দিতেও। শিশু মার্গটকে ৪ বছর তার ঠাকুরমার কাছে এ'রা রেখে দিয়েছিলেন। পিতা ইংলণ্ডে

গেলেন পড়াশোনা করতে। স্বাধীনতাহীন আয়ারল্যান্ডকে তাঁর অসহ্য বোধ হয়েছিল। ব্যবসা-বেচা টাকা দিয়ে খুবই অল্প খরচে ম্যাঞ্চেস্টারে লেখাপড়া শুরু করেন। পত্নীর খুবই কষ্টে কেটেছিল, কারণ এ রকম কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনে তিনি অভ্যস্ত নন, সামাজিক আমোদপ্রমোদ ভালবাসতেন। পিতার বাগ্মিতা ছিল অদ্ভুত। তাঁকে ওয়েসলিয়ান চার্চ বা চার্চ অব আয়ারল্যান্ডে যোগ দিতে বলা হয়। তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে কন্‌গ্রিগেশনালিস্টে যোগদান স্থির করেন। বাড়তি রোজগার করতে চেষ্টা করতেন অন্যের ছুটির সময়ে তার হয়ে বেদীতে বক্তৃতা করে। এর ফলে শরীর ক্লান্ত এবং ফুসফুস যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়।

পিতা অতীব উৎসাহী রাজনীতিক। আইরিশসুলভ উগ্র। এ ব্যাপারে তাঁর বিপুল উদ্দীপনার কথা মনে পড়ে। ১৮৭৬ সালে রুশ-তুর্কী প্রশ্ন খুবই সজীব। যারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে আসত, তাদের সঙ্গে প্রচুর আলোচনা করতেন—দরজা ভালভাবে বন্ধ করে। শিশুরূপেই মার্গট অনেক তীব্র রাজনৈতিক আলোচনা শুনেছে। পিতা 'ভিকার' হলেন। দরিদ্র অঞ্চল ওল্ডহ্যামে তাঁকে পাঠানো হল। এর ভুল চার বছরের মধ্যে বুঝলেন—অশিক্ষিত লোকজনের সংশ্রবে এবং পরিশ্রমে যখন যক্ষ্মা ধরল। তখন আর ফেরার উপায় নেই। চার্চ অব ইংলন্ডে যোগদান করে বেশী স্বাধীনতা পেতে পারতেন। অত্যন্ত ডায়ন্যামিক। গোষ্ঠী পরিবর্তন পছন্দ করতেন। মার্গট তাঁর খুবই প্রশংসা করত।

খুবই পীড়িত, ওল্ডহ্যাম ত্যাগ করতেই হল, পাঠানো হল ডেভনশায়ারের একটি গ্রামে, নাম গ্রেট টরিংটন। ১২ মাস পরে এখানে তাঁর মৃত্যু হয়—ফুসফুস ঝাঁঝরা। সমস্ত 'প্যারিশ' ভেঙে পড়েছিল সৎকার-অনুষ্ঠানে। জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রভাব ছিল।

তখন গ্রেট টরিংটন ছোট জায়গা, গাছে ভরা, পুরনো এক দুর্গপ্রাসাদ ছিল, তার গায়ে চরে বেড়াত বনময়ূরীর দল। ছেলেদের খুশীর সীমা ছিল না। পরিবারের আর্থিক কষ্ট অত্যধিক। পিতার জীবনের জন্য প্রয়োজন ছিল মনোযোগের, ভালো খাওয়া-দাওয়ার—যার দাম অনেক! তিনি চেয়ে দেখতেন—তিনি চলে যাচ্ছেন—শিশু সন্তানদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তাঁর পত্নী। মার্গট চেঁচিয়ে বাইবেল পড়ত—বাবার বইগুলি খোঁজ করে ঠিকঠাক রাখত। বাবার সঙ্গে তার হৃদয়ের নৈকট্য ছিল খুবই। দীর্ঘ কথাবার্তা হত। ভারতবর্ষের কথা হত। বালিকা বয়সে নিবেদিতা ভাবত, বড় হলে সে ভারতবর্ষে যাবে। সেবাকে বিরাট আদর্শরূপে নিয়েছিল।

মার্গারেট জন্মাবার কয়েকদিন পরেই বাড়ির পাচিকা তাকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্যাথলিক মতে 'ব্যাপটাইজ' করে আসে।

চার বছর ঠাকুরমার কাছে থাকার পরে যখন মার্গট পিতার কাছে ফিরেছিল, তখন আমি তাকে পছন্দ করিনি ; হিংসে করতুম। আমাদের এক ছোট্ট বোন অ্যানী, সে ডেভনশায়ারে মারা গিয়েছিল, ওল্ডহ্যামের বাগানের বিষাক্ত ফল খেয়ে। পিতার কাছে যারা আসত, সব কলেজের ছাত্র। বাবা রাজনীতির মাথা, তাঁর উদারনৈতিক রাজনীতি। বাড়ির ঝি আইরিশ, নাম ম্যাগী, খুবই অনুগত। নানা ভয়ঙ্কর গল্প বলত আমাদের।

ওল্ডহ্যাম ছিল গরীব শহর। ছেলেমেয়েরা থাকত পিছনের ঘরে। সেখান থেকে

মাঠ, ক্ষেত দেখা যেত। বেশী গাছপালা ছিল না। শহরটা শ্রমিকদের, মর্যাদাহীন। বাবা মনে করতেন আবহাওয়া শ্বাসরোধী। কলকারখানা থেকে দূরে আমাদের বাড়ি। আমরা অবাক হয়ে শুনতুম, খুব সকালে, ৬টার আগে কারখানার পথে শ্রমিকদের কাঠের জুতোর শব্দ।

এখান থেকে গ্রেট টরিংটন গ্রামে চলে আসা আনন্দের কারণ হয়েছিল। নোংরা উঠোনের বদলে সেখানে সত্যকার বাগান মিলল। জায়গাটা চমৎকার, দৃশ্য মনোরম।

ওল্ডহ্যামে থাকাকালে মার্গট ও আমাকে স্কুলে পাঠানো হয়। তিন মহিলা সেটির তত্ত্বাবধান করতেন। সেটি দেড় মাইল দূরে। সেখানে বাগান ছিল। দুপুরের খাওয়াও সেখানেই হত। আমাদের ঠান্ডা রাখার জন্য সেন্ট জনের ১৪টি অধ্যায় মুখস্থ করতে দেওয়া হত। দু'জনের ডাক নাম দেওয়া হয়েছিল "সান্" ও "রেন্"।

আমাদের বাড়িতে বিরাট রান্নাঘর, তাতে মস্ত চিমনি। সেখানে খেলা করতাম। ফায়ারপ্লেসটুকু বাদ দিলে জায়গাটা খুব অন্ধকার। লুকোচুরি খেলতাম। মা ও দাসী আগুনের দু'ধারে বসে সেলাই করতেন, কারণ চোখ-বাঁধা অবস্থায় সেখানে আমরা চলে যেতাম, আটকাবার দরকার হত। আসবাবপত্রের কথা মনে নেই। অগ্নি-কুণ্ডের কাছ ঘেঁষে বাবা মার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়তাম। তারপরে ঘণ্টা-খানেকের আজগুবি গল্প।

আমরা চার্চের মধ্যে খেলাধুলা করতাম। খুবই প্রিয় জায়গা সেটা। মার্গট প্যাস্টরের ভূমিকা নিত, বেদী থেকে বক্তৃতা করত, আমি ও অ্যানী শ্রোতা। গান ও প্রার্থনা এবং অভিনয়। বাইবেলের কিছু কিছু অংশ জানা ছিল, বিশেষতঃ মজার জায়গাগুলি। ঐসব অংশের অভিনয় হত।

মজার অংশ যেমন, ইজরায়েলের রাজা ৪১ বছর সেবা করেছিল প্রভুকে, তবু তাঁর পায়ে ঘা। ইসাকিয়েল ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু গোমড়া মুখে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। ডেভিড প্যালেস্টাইনের গেট আঁচড়াচ্ছিলেন পাগলের ভান করে।

বাবা মা এইসব খেলার কথা জানতেন। প্রতিদিন সান্ধ্য আহারের পরে পূজা, পড়া, স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা। চেয়ারের পাশে আমরা নতজানু। ভৃত্যরা উপস্থিত।

আমরা ছোটরা প্রতি রবিবার চার্চে যেতাম। সেখানে গল্প শোনার জন্য শান্ত-শিষ্ট থাকতাম। বিকালে উপাসনার পরিবর্তে মায়ের কাছে গল্প শুনতাম, তাঁর কোলে মুখ ডুবিয়ে। গল্পগুলো বিশেষভাবে লোকান্তরিত আত্মাদের নিয়ে। ধর্ম-কাহিনী নিয়েও। গল্প শোনার কালে মিশর সম্বন্ধে মার্গটের ভালবাসা দেখা যেত। ভবিষ্যতে সে যে মিশর ও তার শিল্পের প্রতি প্রীতি দেখাবে, তার সূচনা এখান থেকেই। হিব্রুদের প্রতি তার সহানুভূতি বেড়েই যাবে। প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সূচনা এই সময়েই।

বাল্যকাল থেকেই মার্গটের মন করুণাপূর্ণ। গাঁয়ের অসুস্থ লোকদের কাছে সে ৬ বছর বয়সেই চেঁচিয়ে বাইবেল পড়ত। বড় সুন্দর করে সে পড়ত, এবং নিজের অপরূপ কণ্ঠের প্রভাব লক্ষ্য করে খুসী হত।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল তার। তাতে ধাক্কা খেতেন মা। রাগ করে বলতেন—কী মেয়েই হয়েছে!

বাবার মৃত্যুর পরে মাকে আমাদের দাদামশায় সাহায্য করতেন। ১০ ও ৮ বছরের দুই মেয়েকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হল। মা চলে গেলেন সমুদ্রতীরে, তারপরে লন্ডনে, সেখানে দু'বছর কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি শিক্ষা করলেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের পালন করার মত টাকা রোজগার করতে সমর্থ হলেন না। তখন ঠিক হল, তিনি একটি অতিথিভবন তৈরী করবেন পিতার সাহায্যে ; মেয়েরা ইংলন্ডে স্কুলে পড়বে। বেলফাস্টের কাছে এই বোর্ডিংহাউস চালিয়ে মা অন্নসংস্থান করতেন।

মায়ের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ওল্ডহ্যামে থাকাকালেই হয়েছিল, যখন স্বামীর কাজে সাহায্য করতেন। রবিবার সন্ধ্যায় চার্চে যেতেন না বলে খুবই সমালোচিত হতেন। অবিরত সন্তানধারণের জন্য তাঁর দেহ বিপর্যস্ত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মেজাজ চড়া। রাত্রে সন্তানদের জুটিয়ে নিয়ে অন্ধকারে (বাড়তি আলো জ্বালাবার পয়সা ছিল না) বাইবেলের গল্প শোনাতেন। বাইবেলের কাহিনীকে এমনভাবে অভিনয় করে দেখাতেন যে, সন্তানেরা ভয় পেয়ে যেত। রাজনীতি ও ধর্মকে মিশিয়ে দিতেন, তাতে প্রচুর কল্পনা যোগ করতেন। ইজিপ্টের জ্বালা যন্ত্রণা, বা আয়ারল্যান্ডের নবজাগরণ প্রভৃতির কথা শুনে শিশুদের চুল খাড়া হয়ে উঠত। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে লাফিয়ে যেতেন, ইচ্ছামত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চলতেন—যাতে সন্তানের মনে রঙ ধরে যেত। দারিদ্র্যের মধ্যেও বর্ণসৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যায়নি ; সুতো তুলে নানা অলঙ্করণ করতেন। পিতৃগৃহে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পালিত হয়েছিলেন, সংসারের কোনো কাজকর্ম করতে হয়নি। তাঁর গুণের জন্য তাঁর স্বামী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল পারস্পরিক।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের যখন মৃত্যু হয়, তখনো বিচিত্র কথা, মার্গটের মধ্যে সেক্স সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। কারণ মা নরনারীর শাশ্বত মিলনের কথাই বলতেন। মায়ের কল্পনা অনুযায়ী, কিংবা মায়ের যে কল্পনা ছিল বলে নিবেদিতা বিশ্বাস করত তদনুযায়ী, সে আত্মার সঙ্গে আত্মার চিরন্তন মিলনের কথা বলত—যেন স্বর্গে পিতা ও মাতাকে একত্র দেখছে! মা আমাকে বলেছিলেন—"আমি ও সবের পারে এখন। মার্গোও (নিবেদিতা) বিয়ে কি জিনিস বোঝে না। তোমার পিতাকে মহাপুণ্যে স্বামীরূপে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাহলেও ভবিষ্যতে আর কিছুর সঙ্গে জড়িত হতে কখনো চাইব না।" মায়ের মৃত্যু নিবেদিতার কাছে অসাধারণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার মনে হয়েছিল—যেন আত্মা পাখা মেলে দিয়েছিল যাতনা-সমুদ্রের উপরে।

মা ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন।

হ্যালিফ্যাক্সে আমাদের স্কুলে পড়ার সময়ে বুধবার বিকালে প্রান্তরভূমিতে ভ্রমণ : ঝোপঝাড়, লতাগুচ্ছ, কণ্টকগুল্ম, কালোজামের গাছ, বন্য গোলাপ, ব্লু-বেল প্রভৃতি।

মার্গটকে হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পাঠানো মস্ত ভুল হয়েছিল। কোনো লাইব্রেরী পায়নি। ইতিহাস ধরনের বই সে ভালবাসত, যেমন Fifty year in Uganda, কবিতাও, শেক্সপীয়ার, মিল্টন পরম প্রিয়। শেক্সপীয়ারের একেবারে ছিন্ন এক গ্রন্থাবলী তার ছিল। দাদামশায় তাকে বই উপহার দিতেন যখন নাতনিরা ছুটির শেষে বাড়ি ফিরত।

বছরে দুবার ছুটিতে আমরা মায়ের কাছে ফিরতাম। দেখা যেত মায়ের মনে ক্ষোভ—তিনি ধর্মের জন্য যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন না। ছেলেমেয়েরা তাঁর মত নয় বলেও তিনি আক্ষেপ করতেন।

মার্গটের বয়স যখন ১১, একবার তখন এক বছরের ছোট ভাইকে সঙ্গে দিয়ে তাকে ফ্লিটউড থেকে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল।* অল্পবয়সী মেয়েটি একেবারে কাঁচ ভাইকে নিয়ে একলাই গিয়েছিল। বেলফাস্ট বন্দরে পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা ঝাঁকুনি-খাওয়া গাড়িতে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে।

স্কুলে প্রতিবারেই আমরা একদিন দেরীতে হাজির হতাম।

ঐ সময়ে সেক্স সম্বন্ধে আমাদের কোনই সচেতনতা ছিল না। অপরিচিতদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলতে কখনো বারণও করা হয়নি।

ফেরবার পথে ফ্লিটউডে আমরা রেস্তোরায় প্রাতরাশ করতাম। স্টিমার সেখানে পেঁছিত সকাল ৬ টায়; তারপর ট্রেন ছাড়ত ১২ টায়। ট্রেনে ৪টে পর্যন্ত থাকতে হত।

বিদ্যালয় পত্রিকায় মার্গেট প্রচুর লিখেছে। কিন্তু কবিতা নয়।

মার্গট মিস কলিন্সের (শিক্ষিকা) সঙ্গে সংযোগ রেখেছিল। তিনি আমাদের কাকার বাগ্‌দত্তা হন। আমিও ঐ স্কুলে পড়িয়েছি। নিবেদিতা মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়েছে, প্রধানতঃ বনের ফুলের উপরে।

স্কুলে থাকাকালে নিবেদিতার উপর 'ব্রিদরেন অব প্লিমাউথে'র প্রভাব পড়ে। এগারো বছর বয়সে প্রতিক্রিয়া ঘটে। ১২ থেকে ১৩-র মধ্যে ক্যাথলিক ভাবকে আবিষ্কার করল বইপত্র লেখে। সে হৃদয়বত্তার সন্ধানী, বর্ণরাগের, তাই ক্যাথলিক ভাবে আকৃষ্ট। স্কুল, এই ভাবের বিরোধী। সুতরাং একে সে লুকিয়ে রাখত। মা পরে তাকে তার ক্যাথলিক ব্যাপটিজমের কথা বলেছিলেন। সেজন্য সে ঐ মতে আরও উৎসাহী হয়। এর শিল্প-সৌন্দর্যে সে বিশেষ আসক্ত।

সঙ্গীত প্রভৃতি খুবই ভালবাসত। কিন্তু ২১ বছর থেকে সবকিছু ছেড়ে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে মগ্ন।

সব সময়েই শিক্ষাবিৎ।

বিদ্যালয় জীবনে জনপ্রিয় নয়, কারণ সর্বদাই পরিস্ফুট ব্যক্তিত্ব। তার স্কুল-জীবন আগাগোড়া তীব্র ভাবপূর্ণ। উদ্ভিদবিদ্যা ভালবাসত।

সকলকে জুটিয়ে বক্তৃতা করতে পারত।

ভূতের ও বাইবেলের গল্প বলে সকলকে মাতিয়ে রাখতে পারত। নতুন গল্প বানাত।

ইতিহাসকে জীবন্ত রাখত আমাদের কাছে।

আমরা দুজনে মারামারি করতাম। একবার তার মাথা থেকে এক খামচা চুল টেনে ছিঁড়ে নিই। সে সর্বদাই প্রবল স্বভাবের।

---

* রিচমণ্ড নোবল লিখেছেন, নিবেদিতার বয়স তখন ১৩ এবং তাঁর বয়স তখন তিন। এই কথাই সত্য মনে হয়।

স্কুল ছাড়ার পর

১৮৮৪-১৮৮৬—কেসউইক
১৮৮৬ —রাগবি
১৮৮৭-১৮৮৯—রেক্সহ্যাম
১৮৮৯-১৮৯১—চেস্টার
১৮৯১-১৮৯৪—মাদাম ডি লীউ (উইম্বলডন)
১৮৯৪-১৮৯৭—নিজের স্কুল (ঐ)

১৮৯১তে আমি ও নিবেদিতা ছুটির সময়ে লিভারপুলে থাকতুম। রোটাণ্ডোয় যাবার ট্রেনের ভাড়া দেবার মত পয়সা ছিল না বলে আমরা দুজনে হাঁটতুম, নিবেদিতা সারাটা পথ আবৃত্তি করে যেত।

স্কুল ছাড়ার পরে সে 'লেক ডিস্ট্রিক্ট'-এ যায়, কোলরিজ ও সাদের বাড়িতে বাস করে; সেখানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রাসকিনের ঐতিহ্য জীবন্ত। রাসকিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকারী এক পাদরী ছিলেন, যিনি তাকে স্বাধীনভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন।

কেসউইকে এক বেসরকারী বিদ্যালয়ে সে গভর্নেস ছিল।

সেখানে দু'বছরের মত ছিল; প্রধান শিক্ষিকা মিস চিভলির দ্বারা 'হাই চার্চ'-এর প্রভাবে পড়ে। তিনি বোঝান, চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। ওঁরই প্রভাবে রোমান ক্যাথলিক প্রভাব থেকে মুক্তি।

তারপরে সে রাগবিতে একটি ছোট দাতব্য বিদ্যালয়ে পড়াতে গেল, সেটি কুড়িটি শিশুর অনাথ আশ্রম। পরিচালিকা ছিলেন এক মিস নিকলসন, যাকে নিবেদিতা পাগল বলত; তাঁর নানা পাগলামি ছিল, কিন্তু করুণা ও সহানুভূতিতেও পূর্ণ ছিল মন।

তারপরে নর্থ ওয়েলসের রেক্সহ্যাম নামক কয়লাখনি অঞ্চলে একটি বেসরকারী স্কুলে গেল। এইখানেই জনৈক ওয়েলশ্‌ম্যানের সঙ্গে তার ভালবাসা হয়। ভদ্রলোক কয়লাখনির অফিসে চাকুরিয়া ছিলেন। সাহিত্য এবং রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি উভয়তঃ আকর্ষণ তাদের একত্র করেছিল।

তারপরে চেস্টারে এক স্কুলে মার্গট যায়। সেখানে যাবার অল্প পরেই ফুসফুসের ব্যাধিতে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। এঁর মা নিবেদিতাকে ভালবাসতেন। মার্গটের এইটেই মধুরতম প্রেম-ব্যাপার কিন্তু গভীরতম নয়। ভদ্রলোক তার থেকে দু'বছরের বড় ছিলেন; ইনিও হাই চার্চের।

নিজের স্কুল যখন সে আরম্ভ করে তখন বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী মাদাম ডি লীউ তার সঙ্গে ছিলেন। ইনি ডাচ, ফ্রবেল ও পেস্তালাৎস্কির অনুগামী।

উইম্বলডনে তাদের স্কুলের ব্যাপারে বিরাট সংগ্রাম করতে হয়েছে।

মাদাম ডি লীউ আমেরিকায় বড় চাকরি পেয়ে চলে যান। সেখানে পরে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা তাঁকে ভারতে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিল।

স্বামীজীর কাজ নিয়ে নিবেদিতা যখন ভারতে চলে গেল, তখন আমাকে তার স্কুলের ভার নিতে হয়েছিল।

উইম্বলডনের দুটি স্কুলই কিন্ডারগার্টেন।

তার আগে সে প্রধানতঃ ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদেরই পড়াত।

উইম্বলডনের দু' জায়গাতেই সে নিজের প্রভাব বিস্তৃত করেছিল এবং বহু বন্ধু ছিল তার।

তার নিজের স্কুলে ৪০টি শিশু ছিল। হল্যান্ডের কিছু বোর্ডারও তার ছিল, যারা ইংরেজী শিখতে এসেছিল।

১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই তার ভারত যাত্রা পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট হয়।

তার দ্বিতীয় প্রেমের ব্যাপার শুরু হয় ১৮৯৪তে। ভদ্রলোকের নাম ম্যাকডোনাল্ড, একটি ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। ১৮ মাস ধরে তা অব্যাহত থাকে।

শিক্ষার ব্যাপারে তার একটি বক্তব্য—শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, সে যাতে শিক্ষা খুঁজে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

সে শিক্ষামন্ত্রী স্যার মাইকেল স্যাডলারকে জানত।

ইয়র্কশায়ারের স্কুলে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী। সংখ্যা সেখানে নিয়ন্ত্রিত।

রেক্সহ্যাম এবং চেস্টার থেকে মার্গট সপ্তাহ শেষের ছুটিতে লিভারপুলে আসত।

১৮৯১-৯ সালে মার্গট নিজের স্কুলে বক্তৃতা করতে গিয়েছে।

রেক্সহ্যামে যখন সে ছিল, তখন কয়লাখনিগুলির সমৃদ্ধির কাল। শ্রমিকদের অধঃপতিত অবস্থা তার মনে গভীর যন্ত্রণা দিত, কিন্তু কোনো সক্রিয় সমিতিতে যোগ দিতে পারেনি কারণ প্রাইভেট স্কুলে কাজ করত।

১৭ বছর বয়সে রাজনীতিতে মার্গটের বিশেষ আকর্ষণ। আয়ারল্যান্ড প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত। ঐ সময় হোমরুল প্রশ্নে যারা ব্যস্ত তারা পাপী তার কাছে। কিন্তু ২২-২৩ বছরে সে হোমরুলের পক্ষপাতী।

তারপরে বুয়র যুদ্ধের সময়ে বুয়রদের পক্ষপাতী। এই কালে আয়ারল্যান্ড তার আবেগ-কেন্দ্র।

১১ বছর বয়সে সে প্লিমাউথে এক যাজকের সঙ্গে পরিচিত হয়, যিনি তাকে মুগ্ধ করেন। সে প্রতিজ্ঞা করে, মদ্যপান করবে না, নাচে অংশ নেবে না। বোধহয় ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞাও নিয়েছিল।

নিবেদিতা সম্ভবতঃ ডেইলী নিউজে প্রবন্ধ পাঠাত। 'রিভিউ অব রিভিউজে'ও।

নিবেদিতার পাঠানো লেখাকে বদলে রিভিউয়ের সম্পাদক উইলিয়ম স্টেড 'সিস্টার রোজ' করে তাকে দাঁড় করান। কিন্তু সিস্টার রোজ প্রেমেও পড়েছিল। তাতে নিবেদিতা স্তম্ভিত ; তার রাগ ও ঘৃণার সীমা ছিল না।

ভারতে যাবার অনেক আগে থেকেই সে স্টেডকে জানত।

মিস ডি এস্টেরে সিসেম ক্লাবের লেখিকা সদস্য। এক সন্ধ্যায় বিতর্ক হল, বিষয় "শিশু না বয়স্ক, কারা দেবস্বভাবের নিকটবর্তী ?" নিবেদিতা শিশুদের পক্ষ নিল, মিস ডি এস্টেরে বয়স্কদের পক্ষ। মিস ডি এস্টেরে বলেন, তিনি শিশুদের দত্তকরূপে পালন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি সে কাজে ; শিশুরা একেবারে লোভী

ছুঁচো, নিজেদের ছাড়া কিছু জানে না। শুনে নিবেদিতা রাগে অস্থির, অগ্নিপ্রবাহ বয়ে গেল কণ্ঠ দিয়ে, শিশুদের একেবারে স্বর্গলোকে তুলে দিল।

নিবেদিতা নিজের স্কুলে সর্বদা বীরপূজা শেখাত।

সে এমার্সন পছন্দ করত, 'মাই লেডিজ টাম্বলার'।

তার এমার্সনের বই বহু ব্যবহারে ছিন্ন। রেক্সহ্যামে থাকালে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে এমার্সন ও থরো প্রচুর পড়েছিল।

মিস মুলারের বোন এক সুপরিচিত ইংরেজ রাজনীতিককে বিয়ে করেছিলেন। ডেভিড মার্গসন, এম.পি.,—লেডী ইসাবেলের পুত্র।

১৯০৬—১৯০৯—'নীলাস' ছদ্মনামে বাংলাদেশের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লিখেছিল।

ইংলণ্ডে 'দি সিস্টার নিবেদিতা লীগ অব হেল্প ফর ইণ্ডিয়া' হয়েছিল।

নিবেদিতা একবার (১৯০২?) রাশিয়ান দূতাবাসের এক ভোজসভায় বক্তৃতা করেছিল। তাকে সামলে কথা বলতে বলা হয়।

(১৯০৭—৮) লিভারপুলে পজিটিভিস্টদের একটি গোষ্ঠী ছিল, খুবই ধনী, মানবতাবাদী এবং বিচিত্র ধরনের। তাঁদের এক মহিলা নিবেদিতা ও আমাকে তাঁদের সঙ্গে থাকতে আমন্ত্রণ করেন। নিবেদিতা বক্তৃতা করে। বাড়ির লোকজন ও ভৃত্যেরা একই ঘরে আহার করে।

এই ধরনের অনেক ড্রইংরুম-বক্তৃতা সে করে। উইম্বলডনে চমৎকার ভাষণ দেয়। এ সবের দ্বারা নিজের স্কুলের জন্য টাকা সংগ্রহে সচেষ্ট ছিল।

নিবেদিতা কান্নায় ভেঙেছে জীবনে বহুবার। তার সংকটের সীমা ছিল না, কিন্তু সত্বর সেগুলিকে সে অতিক্রমও করত।

নিবেদিতা জিরাল্ড নোবলকে বিশেষ পছন্দ করত। বহু লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল।

১৯০৮ (১৯০৯?) নিবেদিতা গ্রেট টরিংটনে আবার যায় এবং মিসেস ওলি বুল ও ডাঃ বসুর সঙ্গে সেখানে থাকে।

'Minor poet' হলেন বীটী, অক্টেভিয়াস নন।

অক্টেভিয়াস বীটী ছিলেন বড় ভাই, তাঁর জন্য মার্গট 'উইম্বলডন নিউজে' প্রবন্ধ লিখত।

নিবেদিতা যখন শুনল—কৃষ্ণমূর্তিকে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া শিখতে পাঠানো হয়েছে—দারুন চটে গিয়েছিল।

সে মোটামুটি ভালই ফরাসী জানত।

মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার একবার চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বইয়ের যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলে এক লাইন পড়লেই বাকি অংশ আমি বলে দিতে পারব।" গোটাগুটি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা নিয়ে তিনি ভারতে ফিরেছিলেন। তারপর ঐ বইটি ২৭ বার পড়েন।

আমার মেয়েরা রাত্রে শোয়ার আগে যাতে সারদাদেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা করে, সে বিষয়ে নিবেদিতা বিশেষ তাগিদ দিত, ভারতে যেখানেই যেত, সেখান থেকে সর্বদা কবচ-তাবিজ প্রভৃতি তাদের কাছে পাঠাত।

একদিন ত্রিচিনোপল্লীতে অধ্যাপক সুন্দরম আয়ারের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে তার প্রচণ্ড বিতর্ক চলছিল। স্বামী সদানন্দ নিবেদিতার খুবই অনুরাগী, কিন্তু ইংরেজী অল্পই জানতেন—মহা রাগে বললেন—'তুমি কে হে, নিবেদিতার সঙ্গে তর্ক করছ?'

নিবেদিতা কিংবা আমি কখনই নিজেদের বংশগৌরব নিয়ে ব্যস্ত হইনি।

একদিন নিবেদিতা এক পরম ভক্ত যুবককে, যিনি মঠে যোগদান করতে যাচ্ছেন (পরে মঠের সন্ন্যাসীই হন), জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মনে করতেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছেন। রাজনীতির পথে তাঁর সায় ছিল না। একদিন নিবেদিতা তাঁর ঘরে সোজা ঢুকে বললেন, 'স্বামীজী, আমি আপনার সঙ্গে ধ্যান করতে চাই।' ব্রহ্মানন্দ নিজেই বলেছেন, আধ ঘণ্টা পরে যখন আমি চোখ মেলে তাকালাম, নিবেদিতা তখনো ধ্যানমগ্ন।

মাতা ঠাকুরাণী সারদা দেবী তাঁকে পা টিপতে দিতেন।

নিবেদিতা যথার্থ মিশনারী। না হয়ে পারেনি।

মা মারা যাবার সময়ে নিবেদিতা বলেছিল 'ওঁ', এবং এমন এক সান্নিধ্য অনুভব করেছিল, যার কাছে মৃত্যু কিছুই নয়।

মড স্টামের আঁকা নিবেদিতার ছবি আদর্শায়িত। সে সুন্দরী ছিল না, কিন্তু তার চেহারায় ছিল অপার্থিবতার আলো। তার নাক অত সুন্দর নয়।

নিউ স্টেটসম্যানের সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার মহৎ বন্ধু।

কালীকে গ্রহণ করার পরেও ক্রুশকে ত্যাগ করার প্রয়োজন সে বোধ করেনি।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের মধ্যে কঠোর মানসিক সংঘাত হয়। বশী সেন স্পষ্টই ক্রিস্টিন-ঘেঁষা, এবং বসু নিবেদিতা-পক্ষীয়।

নিবেদিতা মনে করেছিল, সিস্টার ক্রিস্টিন আরো ভালভাবে স্কুল চালিয়ে যেতে পারবে, যেকালে সে অর্থসংগ্রহ করে যাবে।

নিবেদিতা প্রেরণাদাত্রী ধরনের।

মৃত্যুকালে ক্রিস্টিনকে ডেকে পাঠায় সে। বলে, সব কিছু তার হাতেই থাকবে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে নিবেদিতা প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে কাজ করেছিল।

কার্জন নিবেদিতাকে ঘৃণা করতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে তার সমস্ত চিঠি সেন্সারের ব্যবস্থা করেন। ১৯১০-১১,—এই কালে যে চিঠিপত্রে পারতপক্ষে বসুর নামোল্লেখ করত না। ১৯১০ সালে নিবেদিতার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা ছিল। তার বন্ধুরা চাইতেন, সে যেন আরও চতুরতা দেখায়।

ভ্রমণকালে ও ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে সে ছদ্মনাম নেয়, কারণ বন্দরসমূহে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল সরকার থেকে। জাহাজে নিবেদিতা কী নাম নিয়েছিল, তা রিচ জানতে পারে, কারণ ঐকালে রিচ তাকে চিঠি লিখেছে। 'White' নাম কি?

নিউইয়র্ক থেকে ফিরে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্ন দেখা দেয়। সে বসুর সঙ্গে কাজ করত কিছু মাইনে নিয়ে। মিঃ থর্প তাঁর বোনের (ওলি বুলের) টাকা উদ্ধার করে এঁদের প্রাপ্য দিয়ে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালের ধাক্কাই (ওলি বুলের উইলের মামলা) তাকে কার্যতঃ

মেরে ফেলেছিল। ট্যাণ্টিন (মামলার বিবরণযুক্ত) সমস্ত পত্রপত্রিকার কর্তিত অংশ পাঠাতেন। পরে এর জন্য তিনি আক্ষেপ করেন। নিবেদিতা মরমে মরে গিয়েছিল; নিজের রোগ গোপন করে রাখে। সকল বন্ধুকে শীতকালে তার সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করে, কিন্তু কেউ আসতে পারেনি। বন্ধুদের কাছে মনপ্রাণ খুলে ধরা প্রয়োজন হয়েছিল। স্বামীজীর কথা আবার তার মনে গভীরভাবে এসেছিল। বসু তাঁকে প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া দেখাননি।

বোস্টনের প্রতিকৃতিতে যাকে (নিবেদিতাকে) দেখা যাচ্ছে, তা জীবনের শেষ পর্যায়ে এক ভাঙা নারীর চেহারা। তার পূর্ব পর্যন্ত আলোকরূপিণী এক নারী ছিল, যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই বলে তার শক্তি নিঃশেষিত নয়—ওটা সংকটকালের ছবি—সহসা বুড়িয়ে-যাওয়া এক নারীর।

মিঃ ওলি বুল নরওয়ের লোক, মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন বিখ্যাত ভায়োলিনবাদক। বৃদ্ধ। স্ত্রী তাঁর থেকে ৪০ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ। স্ত্রী পিউরিটান স্বভাবের, ধনী, পিয়ানো-বাদিকা। সর্বদা স্বামীর সঙ্গী। ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় কনসার্ট বাজিয়েছেন একত্রে। স্বামীর বিরাট প্রতিভা, অত্যন্ত মেজাজী। স্বামী বিবাহবিচ্ছেদ চাননি, স্ত্রীর ফেরার প্রতীক্ষায় ছিলেন, ফিরলে বলেছিলেন, ওগো জানতাম, তুমি ফিরবে। এঁদের কন্যা ওলিয়া, খুবই শিল্পস্বভাবসম্পন্ন, উগ্র স্বভাবের এবং দুষ্ট প্রকৃতির। সেই যেন নিবেদিতাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।

বিয়ের আগে মিসেস ওলি বুল ছিলেন মিস থর্প। তাঁর ভাই মিঃ থর্প মিস লংফেলোকে বিয়ে করেন। মিসেস বুলের উইলের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা ইনি করেন, এবং নিবেদিতাকে তাঁর ভারতের কাজের জন্য টাকা দিতে মনস্থ করেন।

রিচ, আমাদের ভাই। সে কথা রাখেনি। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল রিচ ভারতের জন্য জীবনোৎসর্গ করবে। নিবেদিতা তাকে কৃষিবিদ্যা পড়ায়। খুব অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়। তার বউ ধনী, বিদুষী, সামাজিক জীব।

রিচ স্থির করেছিল নিবেদিতার জীবনী লিখবে।

১৯০৯ সালে মায়ের মৃত্যু, উত্তর ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারে, আমাদের বাড়িতে। টেলিগ্রাম পেয়ে নিবেদিতা হাজির হয় তিন দিন আগে। কয়েক মাস আমার কাছে থাকে, বসু পরিবার আসা পর্যন্ত। আমেরিকায় সভা প্রভৃতি স্থগিত রেখে ছুটে আসে। সে যখন নিউইয়র্কে গেছে তখনই মা মৃত্যুমুখে।

মিসেস ওলি বুল ও ট্যাণ্টিন পরস্পর সামাজিকভাবে বন্ধু; তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উভয়েই অপর দিকে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ। নিবেদিতাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে ঈর্ষা ছিল।

মিসেস ওলি বুল নিবেদিতার অন্তর্জীবনের রূপ জানতেন।

মিসেস লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা অ্যালবার্টা, স্বামী জর্জ মণ্টেগু, যিনি পরে আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ হন। তিনি ভারতে এসেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ব্যবহারে ইনি সর্বসময়ে মার্জিত ও অমায়িক। সংবাদপত্র জগতে এঁর বিরাট প্রভাব। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে লণ্ডনের নানা সংবাদপত্রে রচনাদি পাঠিয়েছিলেন।*

* নিবেদিতার বিশেষ গুণমুগ্ধ আর্ল স্যাণ্ডউইচ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দকে লেখা এক পত্রে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে একটি চমৎকার ছবি দিয়েছেন।—

অ্যালবার্টার এক ভাই ছিল, হলিস্টার নাম, নিবেদিতা তাকে খুব ভালবাসত। সে ভার্জিনিয়ার একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল।

মিঃ ও মিসেস লেগেটের কন্যা ফ্রান্সেস—শীতল স্বভাবের। মার্গ্সনের সঙ্গে বিবাহিত। মিসেস লেগেটের বয়স যখন চল্লিশের বেশী তখন তার জন্ম হয়।

মিসেস লেগেট ও তাঁর বোন ট্যাণ্টিন প্রভাব বিস্তার করতে, চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদে মহিমা বজায় রাখতে চাইতেন। পোষাকাদির ব্যাপারে তাঁরা নিবেদিতার উপর জোর খাটাতেন। নিবেদিতার চেহারা ভারী, দৃঢ়, পরিচ্ছদের ব্যাপারে তার খুবই অবহেলা। রাজ্ঞীর মত মিসেস লেগেটের মহিমা, দুই পৃথিবীতে (আমেরিকা ও ইউরোপ) তাঁর বিচরণ।

ওলি বুলের সঙ্গে মিলে নিবেদিতা নিজের পোষাকের ধরন নির্বাচন করেছিল। আমেরিকায় বন্ধুদের খুশী করবার জন্য তাকে সিল্কের পোষাক পরতে হয়েছিল। তাঁরা চাইতেন সে ভাল পরিচ্ছদে ভূষিত হোক। তাঁরাই তাকে সব কিছু দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা যখন প্রথম ভারত থেকে ইংলণ্ডে ফেরে (১৮৯৯), তখন আমার বিয়েতে 'লেডী অব অনার'রূপে সাহায্য করেছিল এবং ট্যাণ্টিনের দেওয়া সাদা সিল্কের গাউন পরেছিল। আমার স্বামী বিরাট কোনো ব্যক্তি নন, কিন্তু ভালবাসার মানুষ।

হ্যামণ্ডরা স্বামীজীর শিষ্য। অতি বিচিত্র দম্পতি। খুবই কুদর্শন। মানবসংসারের প্রতি প্রেম পূর্ণ। মিসেস হ্যামণ্ড তাঁর পিতার (অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন; তাঁর স্বামী প্রবন্ধ লিখে বড় কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। অতি সহজ সরল, সহানুভূতিসম্পন্ন পরিবার। নিবেদিতার পক্ষেও সাধারণ তাঁদের জীবনযাত্রা; সে আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য পছন্দ করত।

"প্রিয় স্বামীজী, বহু বৎসর পূর্বে নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়সূত্রে আপনি কিছু লিখতে বলেছেন। ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ কাজের বিষয়ে যে-সব শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে, তাতে নূতন কিছু যোগ করতে পারব মনে হয় না।

আমার অবশ্য অপরপক্ষে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অতি স্পষ্ট স্মৃতি মনে আছে, যা তাঁর চরিত্রের এমন একটি দিককে উন্মোচিত করবে, অনেকের কাছে যা বোধহয় জানা নেই। ঘটনাকালে আমার শাশুড়ী মিসেস লেগেট, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড (যাঁরা ইউরোপীয়দের মধ্যে বোধহয় নিবেদিতার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ), আমার স্ত্রী এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। নিবেদিতা লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক ক্যাম্বের সঙ্গে সাক্ষাতে ইচ্ছুক হন। ইনি মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাসে বিশিষ্ট পণ্ডিত, সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন, এবং বেদান্তদর্শনের সঙ্গেও পরিচিত।

আমরা সকলে মিসেস লেগেটের ১২ ব্রাউন স্ট্রীটের বাড়িতে নৈশ ভোজে মিলিত হয়েছিলাম। সময়, মনে হয় ১৯১০ বা তার এক-দু' বছর আগে।

অতঃপর ঘটনা যা ঘটল তা নিবেদিতা-অনুরূপ। তিনি আলোচনা আরম্ভ করে দাবি করলেন—ভারত এখন গণতন্ত্রের উপযুক্ত। সজোরে ঐ দাবি তিনি আঁকড়ে রইলেন, যদিও অধ্যাপক ক্যাম্ব একেবারে মানতে গররাজি যে, গ্রীস ও ইংরেজী-ভাষী দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও 'গণতন্ত্র' শব্দটির অর্থ পর্যন্ত উপলব্ধ হয়েছে। বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, দু'পক্ষের কেউই হারতে রাজী নন, যার সমাপ্তিতে, বেদনার সঙ্গে আমরা দেখলাম, নিবেদিতা কেঁদে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে উঠে চলে গেলেন, কিছু পরে বাড়ি থেকেও।"

(প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯৫৩)

হ্যামণ্ডরা গরীব। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাজ করত—তাদের সাহায্য করত।

নিবেদিতার মৃত্যুর তিন চার বছর পরে আমি নিবেদিতার পত্রসংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। কেউই কোনো সাড়া দেয়নি। তারপর মহাযুদ্ধের জন্য ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। ট্যাণ্টিন একেবারে চেপে যান, খুব কমই চিঠি দেন। মিসেস ওলি বুলের কাছে লেখা চিঠিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এতে নিবেদিতার মনস্বিতার দিকটি উন্মোচিত। ট্যাণ্টিনের কাছে লেখা চিঠিতে তথ্য থাকত। স্বামীজী যে ট্যাণ্টিনকে খুব পড়াশোনা করা মহিলা মনে করতেন না, তা নিবেদিতা জানতেন। স্বামীজীই ট্যাণ্টিনকে পড়াশোনার অভ্যাস ধরান।

আরও যেসব বন্ধুর কাছে চিঠি ছিল, তাঁরা হলেন :

মিঃ অ্যাপলটন : শোনা যায় ইনি সব চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছেন। উইম্বলডন কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মিঃ হ্যাভেল : ডেনমার্কের লোক। আমেরিকার নিউইয়র্কে বাস করতেন। কলকাতা মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। এঁর সঙ্গে নিবেদিতার মননপ্রধান পত্রালাপ। বিষয়—শিল্প ও তার বিকাশ।

মিঃ ও মিসেস ক্রপটকিন : লণ্ডনে থাকাকালে নিবেদিতা এঁদের বিশেষ জানতেন। এঁরা লণ্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চিঠির ব্যাপারে মাডাম ক্রপটকিন বলতে চেয়েছিলেন—সবই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

মিঃ কুক : লেডী ইসাবেলের বন্ধু, শিল্পী, ব্রাশ্-এর কাজ করতেন। নিবেদিতার স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। রাসকিনের বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে তন্ন তন্ন ভাবে নিবেদিতাকে জানান।

মিঃ গেডেস ও টমসন : এঁরা দুজনে একত্রে এডিনবরার টাওয়ার তৈরী করার কাজ করেছিলেন। নতুন ধরনের স্কুল এটি, যেখানে শিশুরা পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষালাভ করত। গেডেস তাঁর পত্নীর সব অর্থসম্পদ এতে খরচ করেন। এই পরীক্ষামূলক কাজে টাকা নষ্ট হওয়াটা পত্নী খুশী মনে মেনে নিয়েছিলেন।

নিবেদিতার গোষ্ঠীর সকলে বড় লোক হয়ে ওঠেন। তাঁরা নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা আদর্শ প্রবেশ করিয়ে দিত। তার ছিল অখণ্ড মন। মোটেই নম্র শান্ত ছিল না। সম্ভ্রম আদায় করে নিত। তাকে হেলাফেলা করা যেত না।

সে মোটেই saint ধরনের নয়, বরং prophet ধরনের।

সে পূর্ণ পবিত্র। কখনো পুরুষ-সম্পর্ক হয়নি। যৌন-আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। সব আকাঙ্ক্ষাই মননের জগতে।

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। বসু ব্রাহ্ম হলেও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

নিবেদিতা জগদীশ বসুর বক্তৃতা লিখে দিত, এবং তাঁর বিপদে সাহায্য করেছে।

নিবেদিতার একটি মনোরম ছবি জগদীশ বসুর বাড়িতে আছে।

লণ্ডনে থাকাকালে বসু নিবেদিতার সঙ্গে প্রায়ই সিনেমা ও থিয়েটারে যেতেন ;

সেগুলি হাসির বই হওয়া চাই। সহজ উপন্যাসাদি তাঁরা পছন্দ করতেন, হালকা ধরনের, যাতে মনের কিছুটা বিশ্রাম হয়।

ভারতের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসাই বসুর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। সেই সর্বাঙ্গীণ ভালবাসাকে কি করে প্রকাশ করব জানি না, তা আবেগময় অথচ গভীর পবিত্র।

নিবেদিতাকে জেলের বাইরে রাখতে বসু সচেষ্ট ছিলেন। নিবেদিতা ভারতের জন্য শহীদ হতে উদ্গ্রীব কিন্তু বসু সরকারী ব্যাপারে জড়িত ; তিনি নিবেদিতাকে সাবধান হতে বাধ্য করেছিলেন। বসু ভয় করেছিলেন, তাঁর কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। নিবেদিতা তা অনেকটা মেনে নেয়, কারণ বসু তার কাছে মূর্তিমান ভারতবর্ষ।

বসু কখনই নিবেদিতার আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতে পারেননি। নিবেদিতা তাঁকে সন্তানবৎ মনে করত। বসু বুঝেছিলেন, নিবেদিতা অন্য ধরনের মহিলা। বসু হলেন সেই শিশু, নিবেদিতা যাকে কামনা করেছিল, এবং বিবেকানন্দ-মারফৎ তাঁকে পেয়েছিল।

আমি একবার চেয়েছিলাম তাকে আমার একটি সন্তান দেব। সে তা জানত।

তার ত্যাগধর্ম নিয়ে বসু প্রায়ই তামাসা করতেন। উত্তরে একবার নিবেদিতা বলেছিল, 'কিন্তু শিশুদের উপর ভালবাসা তো ত্যাগ করতে পারলুম না।'

একবার জাহাজে ফেরার সময়ে নিবেদিতা এক মিশনারী পরিবারকে দেখে যাদের চারটি শিশুকে যাত্রীদের দয়ার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নিবেদিতা তাদের তুলে নেয়। সে বলে, ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে দাম্পত্যজীবনের জন্য আমার অভাববোধ কখনো হয়নি—অভাববোধ শুধু সন্তানের জন্য।

মার্গট সব সময়েই এমন একজনের সন্ধান করত, যিনি তার চেয়ে বড় চরিত্রের হবেন। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই চরিত্র পেয়েছিল।

আমি স্বামীজীকে প্রথম দেখি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি নিবেদিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে আসেন।

স্বামীজীর কাজে তার যোগদানের ঔচিত্যের বিষয়ে আমরা কখনো প্রশ্ন তুলিনি। নিবেদিতা তার "আহ্বান" পেয়েছিল। উপলব্ধির পথে অগ্রসর তার জীবন।

আমি অনুভব করেছিলুম, যদি একবার বিবেকানন্দের ক্ষমতাকে পথ ছেড়ে দিই, তাহলে আমার আর বিয়ে হবে না, অথচ আমি তখন বিয়ে করতে যাচ্ছি।

বিবেকানন্দ যে-কোনো বিষয়ে কথা বলবার সময়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। প্রতি বক্তৃতার অন্তে নিবেদিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলত, 'স্বামীজী, ক্ষমা করবেন, কিন্তু—'

নিবেদিতা বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়নি। সে সত্যের সন্ধানী। বিবেকানন্দ ছিলেন সত্য—যার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছিলাম।

নিবেদিতা যখন স্বামীজীর কাজে যোগদানের বিষয়ে স্থিরপ্রত্যয় হয় ট্যান্টিন সে বিষয়ে কিছু জানতেন না। পরে ১৮৯৮ সালে নিবেদিতাকে ভারতে পেয়ে বিস্মিত হন। কলকাতায় তাঁদের সাক্ষাতের কালে ট্যান্টিন দেখেন, নিবেদিতার মুখ মশার কামড়ে ফুলে আছে কিন্তু তবু তা আনন্দে হাসিতে দীপ্ত।

বিবেকানন্দ যে-কোনো জিনিসকে অবিলম্বে স্পষ্ট আকারে ধরে দিতে পারতেন, যেখানে অন্যেরা হাতড়ে বেড়াত।

বিবেকানন্দ জ্যোতির্ময় আত্মা। কোনো কিছুই অস্বচ্ছ নয় তাঁর কাছে। বক্তব্যকে পরিষ্কার করে তোলার ক্ষমতা নিবেদিতারও বহুলাংশে ছিল।

নিবেদিতা যখন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেল, তারপর থেকে তার পক্ষে রোমান ক্যাথলিক বা অন্য কোনো অনুশাসনে আস্থা রাখা সম্ভব হয়নি।

বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দসহ আমাদের পরিবারে প্রায় মাসখানেক ছিলেন।

বিবেকানন্দ আমাদের ভাই রিচমন্ডকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে গিয়ে 'বীফ স্টীক' খেতে দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ জানতেন, নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডের রাজনীতিতে নিমগ্ন। তিনি তাকে বিবেচনা করে চলতে বলেছিলেন, গোঁড়ামি না রাখতে এবং খোলাখুলি জড়িয়ে না পড়তে।

আগে আয়ারল্যান্ড ছিল তার আবেগের কেন্দ্র। বিবেকানন্দই তাতে বিপর্যয় ঘটিয়ে সেখানে ভারতের প্রতি আবেগ সঞ্চারিত করেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস-প্রদর্শনীর পর স্বামীজী, নিবেদিতা, লেগেটরা, মিসেস ওলি বুল প্রভৃতি দল বেঁধে মাসখানেক কি মাস দেড়েকের জন্য (ফ্রান্সের) ব্রিটানীতে বেড়াতে যান। এখানেই স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁর চরম নির্দেশ দেন, যা নিবেদিতার জীবনে পরম জ্যোতি।

বিবেকানন্দ সেই ঊর্ধ্বমুখী আলোকশিখা যা নিবেদিতার প্রাণমূলকে শিহরিত করেছিল।

রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতিকথা

[নিবেদিতার ছোট ভাই রিচমন্ড নোবল দিদির অতীব ভক্ত। পরবর্তী জীবনে জামাইকায় খ্রীস্টীয় যাজকরূপে ইনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইনি নিবেদিতার ভাই এবং বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এ'র পক্ষে ভারতের নিপীড়িত মানুষের কথা ভোলা কখনো সম্ভব হয়নি। স্বামীজীর প্রভাবে ইনি ভারতকে কর্মক্ষেত্ররূপে নেবেন, প্রায় স্থির করেছিলেন, পরে অবশ্য তা কার্যকর হয়নি। তা হলেও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল এবং তা প্রকাশও করতেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে, ইনি যখন ২৩-২৪ বছরের যুবক তখন ইংলণ্ডের চার্চ গেজেট পত্রিকায় 'ভারতে মিশনারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা কিয়দংশে উদ্ধৃত হয় 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়, ২৫ অগস্ট, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। ঐ প্রবন্ধে রিচমন্ড নোবল কঠোরভাবে জানান, ভারতে যে সব মিশনারী যান তাঁরা অধিকাংশই মূঢ় ও নির্বোধ, নিতান্ত অশিক্ষিত, কোনো রকম দার্শনিক চিন্তার ধারে-কাছে নেই তাঁরা, দার্শনিক চিন্তায় পারদর্শী হিন্দুদের তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, খ্রীস্টান হলেই সোজা স্বর্গবাস, যেখানে "একেবারে ভগবানের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া যাবে।" মিশনারীরা কি পরিমাণে জাতিগর্বে অধীর, বিজিত জাতির প্রতি ঘৃণায় শিহরিত, তা তীব্রভাবে ইনি জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জীব, তাও কঠোরভাবে জানাতে ভোলেন নি। এ'র ভাষার নিষ্ঠুরতা এমনই ছিল যে, বেঙ্গলীর সম্পাদক পর্যন্ত মৃদু প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছেন।*

আইরিশ জাতীয়তার রক্তে পালিত রিচমন্ড নোবল ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিবাদী। যেহেতু তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ জানতেন, সেজন্য যখন স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ লেখা প্রকাশ করল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, রিচমন্ড নোবল প্রতিবাদ না করে পারেন নি। তেমন একটি চিঠি আমরা রেঁম-সংগ্রহে পেয়েছি।

রিচমন্ড নোবলের নিবেদিতা সম্বন্ধে দুটি লেখা আমরা পেয়েছি। প্রথমটি নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১২-র জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি প্রেরিত হয় রেম-হারবার্টের কাছে, তাঁদের ১৫

---

* রিচমন্ড নোবলের উক্ত রচনার অংশ—

"It would be imagined that these missionaries would go amongst their hearers in a spirit of humility, and not of arrogance. Oh dear no! They come as Englishman, as a conquering race, and treat the Hindus as the vanquished foe. Is it any wonder that between this and the fact that they are the mission flourishing financially when it receives nothing from the converts, they conclude that the missions are promoted by the Government? The result of all this is, that only the scum of the Hindus become Christians, and then only for purposes of their own, so much so that the phrase "There are no Native Christians, about," has come to mean that you are quite safe from burglary."

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এর চিঠির উত্তরে। রেম-হারবার্ট যখন "মার্গারেট নোবল নাম্নী অতি অসাধারণ মহিলাটির জীবনের সত্য ও পূর্ণ চিত্র দেবার জন্য" ভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন দিদির অতি ভক্ত ভাইয়ের পক্ষে সাড়া না দেওয়া সম্ভব ছিল না। এঁর লেখায় আমরা নিবেদিতার সাহিত্যপ্রীতি ও আবৃত্তিক্ষমতার যেমন উজ্জ্বল ছবি পাই, তেমনি যেহেতু ইনি খ্রীষ্টীয় যাজক ছিলেন, তাই সহজেই নিবেদিতার প্রথম জীবনের খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ক্রম-রূপান্তরের ছবি দিতে পেরেছেন। কয়েক লাইনে বিবেকানন্দের রেখাচিত্র অনবদ্য।]

অনুজের শ্রদ্ধা

(মডার্ন রিভিউ, জানুয়ারী, ১৯১২)

মডার্ন রিভিউ পড়বার জন্য আমি সাধারণতঃ খুবই উৎসুক হয়ে থাকি। আপনাদের এই মাসের সংখ্যাটি স্বভাবতঃই আমার কাছে বিষাদময় আকর্ষণের বস্তু, যদিও সে বিষাদের সঙ্গে তৃপ্তি ও আনন্দও মিশ্রিত রয়েছে, কারণ এই সংখ্যাটি আমার ভগিনীর প্রতি বহু ভারতীয় জনসেবকের সহৃদয় মনোভাবের স্মারকপত্র। অনুজ ভ্রাতা নিজ ভগিনী সম্বন্ধে কিছু বলতে অগ্রসর হয়েছে, এই ব্যাপারটিকে হয়ত আপনারা অস্বাভাবিক ও অশালীন ভাবছেন, কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, আত্মম্ভরিতার দ্বারা চালিত হয়ে একাজ আমি করছি না,—এর মূলে আছে আপনাদের সকলের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

আমার ভগিনীর জীবনে দুটি দিক ছিল, যা সব সময়ে সকলের জানা ছিল না; এক, তার বিপুল ধর্মানুভূতি, দুই, তার প্রবল প্রগাঢ় জাতীয়তা। এই দুই প্রবণতা তার জীবনে এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে ছিল যে, যথার্থভাবে বলতে গেলে দুটি নয়, একটি উদ্দেশ্যেই সে সতত উজ্জীবিত ছিল—নিজ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আত্মবিকাশে মানুষের নিঃসংশয় অধিকার ঘোষণায়। যে-দেশের অধিবাসী আমি, সে দেশের মানুষের পক্ষে এই ব্যাপারটি বুঝতে পারা সম্ভব, কারণ, এখানে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা—তথাকথিত 'ন্যাশনালিস্ট', বা তথাকথিত 'ইউনিয়নিস্ট' তাঁরা যাই হোন—জনসাধারণকে নিজেদের 'গেলিক' পূর্বপুরুষদের প্রাণধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য দেশের মন্দ নকলনবিশ হতে প্ররোচনা দেন। বিজাতীয় ইংরেজী ভাবধারায় নিমজ্জিত হওয়াই আয়ারল্যাণ্ডের পতনের অন্যতম কারণ। এর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের গেলিক ভাষা, গেলিক নৃত্যাদি, গেলিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, এবং সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে আইরিশ কৃষকদের, যাতে তারা কুসীদজীবী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শিকারে আর পরিণত না হয়। এক কথায় এখানে আমাদের প্রধান সমস্যা—আইরিশ জাতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ। মনে হয়, আমাদের দেশের মতই আপনাদের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা বলবেন, এই নীতি প্রগতিবিরোধী, যেহেতু আমরা মানুষকে জাতীয় করে তুলতে চাইছি, যখন কালধর্ম আন্তর্জাতিকতার দিকে; আমরা যেন জনগণের পার্থিব উন্নতির পথ

বন্ধ করতে চাইছি। এর উত্তর, কেউই প্রথমে জাতীয় না হয়ে যথার্থ আন্তর্জাতিক হতে পারে না ; এবং তাকে জাতীয় হতে শিক্ষা দিয়ে, তাকে তার পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে আমরা তাকে মেরুদণ্ড ফিরিয়ে দিচ্ছি, ফিরিয়ে দিচ্ছি হারানো ব্যক্তিত্ব, তাকে সবলতর শ্রেষ্ঠতর মানুষ করে তুলছি, যা সে ছিল না। এক কথায় আমরা তাকে পৃথিবীতে পথ কেটে চলবার মত করে গড়ে তুলছি। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে-আইরিশের কাছে স্বদেশের কোনো মূল্য নেই, তার নৈতিক শক্তিও নেই, সে মনোবলহীন ক্ষয়িষ্ণু অধঃপতিত জীব। বৈষয়িক সাফল্যে বিশ্বাসী আমাদের বস্তুবাদী বন্ধুরা মানব-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকটি উপেক্ষা করেন।

বুঝতে পারছি প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটছে। উদ্দেশ্য ছিল, আমার ভগিনীর ভারত গমনের পিছনে কোন্ কারণ-সমবায় বর্তমান ছিল, সে বিষয়ে অল্প কিছু বলি। শ্রীমতী অবলা বসু তাঁর প্রবন্ধে অনুগ্রহ করে আমার পিতার এক বিচিত্র পূর্ব-ধারণার বিষয়ে জানিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে মার্গট (এই নামেই আমার বোনকে আমি সর্বদা স্মরণ করি) যে-ডাকে সাড়া দেবে, তার প্রারম্ভিক অনুশীলন কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। পনের বছরের মত যখন তার বয়স, তখন চার্চ অব ইংলণ্ডের ট্রাক-টারিয়ান আন্দোলন তার মনে নাড়া দেয়। এই আন্দোলনে পূজা-প্রার্থনায় যে বর্ণ-মহিমা এবং স্যাক্রামেণ্ট প্রভৃতি প্রতীকের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল, অনুগামীদের কাছ থেকে যে নিষ্ঠাভক্তি ও শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনা দাবি করা হয়েছিল,— তা আমার ভগিনীর কল্পনাকে আকর্ষণ করে এবং তার জীবনে প্রথম বড় ধরনের ধর্মীয় প্রভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই 'হাই অ্যাংলিসিজমে'র প্রভাব তার জীবনে শেষ সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। এই কালের আত্মনিগ্রহের অভ্যাস পরবর্তীকালে তার কর্মজীবনের পক্ষে তাকে অধিকতর যোগ্য করে তুলেছিল।

হাই অ্যাংলিসিজম্ ছিল অতীব কঠোর, অনমনীয়, নিতান্ত অনুদার,—তা মার্গটের মত চরিত্রের মানুষের আধ্যাত্মিক আকূতি শান্ত করতে পারেই না, কারণ নিশ্ছিদ্র গোঁড়ামি, অন্য মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে এর অনুগামীদের প্রকাশ্য অসহিষ্ণুতা মার্গটকে অবশেষে নূতনতর পথের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করল—এই ধর্ম-রীতি ভিন্ন অধিকতর 'খ্রীস্টীয়', অধিকতর মানবিক কোনো ধর্ম আছে কি? ট্রাকটারিয়ানরা অবশ্য তাকে ঐতিহ্যের মূল্য শিখিয়েছিল। ক্রমে সে চার্চ অব ইংলণ্ডের 'দি ব্রড চার্চ স্কুল' নামে পরিচিত সংস্থায় যোগ দিল, কিন্তু তার প্রথম জীবনের ট্রাকটারিয়ান-অভিজ্ঞতার অনেকখানি তার মধ্যে থেকে গেল।

উৎকৃষ্টতর শব্দের অভাবে Broad churchism যাকে বলছি, সে বস্তু মার্গটের মত চরিত্রের মানুষের আধ্যাত্মিক আকূতি শান্ত করতে পারেই না, কারণ মামুলী কতকগুলি কথা বলা ছাড়া এর মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি অথবা সুগভীর কোনো শিক্ষা ছিল না। এর মধ্যে ছিল এক ধরনের সিনিক মনোভাব যা অন্যের বিশ্বাসকে কুসংস্কারপূর্ণ বা বিদ্যাহীন মনে করত, যার জন্য ধর্মজীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় রসানুভূতির প্রশ্রয় এতে ছিল না। মার্গটের জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। সে এতাবৎ যা শিখে বা অনুভব করে এসেছে, সব কিছুকেই স্বামীজীর শিক্ষার মধ্যে সমন্বিত দেখতে পেল, সব

কিছুই এক সমগ্রের অংশ, কোনো কিছুই অপরকে খণ্ডন করে না; সবই এখন নূতন জীবনে, নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে গেল, এবং মার্গটের সদা-প্রস্তুত সহানুভূতি অধীনস্থ এক জাতির যাতনার অনুভবে সহজেই জাগরিত হয়ে উঠল।

স্বামীজী দেহত্যাগ করেন তরুণ বয়সেই। আমার ভগিনীও দেহত্যাগ করল অল্প কিছু বেশী বয়সে। আমার ভগিনী যে স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, তা অদ্ভুত কিছু নয়, কারণ আমি নিজে স্বামীজীকে দেখেছি, আমি জানি তাঁর শক্তি। তাঁকে একবার শুধু দেখা ও তাঁর কথা শোনা মাত্র অবিলম্বে বলতে হবে আত্মগতভাবে—Behold the Man!—দেখ, দেখ, কে ইনি! সত্য ধ্বনিত তাঁর কণ্ঠে—মানুষ অনুভব করত—কারণ তিনি অধিকারের সঙ্গে কথা বলতেন, শুধু পণ্ডিত বা, পুরোহিতের মত করে নয়। স্বামীজী নিশ্চয়তাকে, প্রত্যয়কে নিজের মধ্যে বহন করতেন, জিজ্ঞাসুকে দিতেন আশ্বাস ও বিশ্বাস। সেই জিনিসই আমার ভগিনীকে তিনি দিয়েছিলেন; এই ধ্রুব-প্রত্যয়ই তাকে স্বামীজীর আহ্বানে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে শক্তি দিয়েছিল; এবং বিনা দ্বিধায় সে আহ্বান স্বীকার করার পরে কখনো তাকে অনুতাপ করতে হয়নি।

প্রিয়জনের বিয়োগবেদনা আরও বেড়ে যায় যদি স্বভূমি থেকে বহু দূরে তার মৃত্যু ঘটে। আমার ভগিনীর ক্ষেত্রে কিন্তু মনে হয়েছে, সে যেন শেষ ক্ষণে আমাদের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডেই ছিল। ডাঃ বসু এবং শ্রীমতী বসুর আবাসে তার জীবনাবসান, তা যেন তার স্বজনের মধ্যে, পরিবারের মধ্যেই। মার্গারেটের প্রতি আমি এই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি, সে তার জাতির ঐতিহ্যগত কর্তব্য পালন করে গেছে শেষ অবধি—সে সাহায্য করছে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মানুষকে, এবং শান্তির পথে চালিত করেছে তাদের অভিযাত্রাকে।

রেম-হারবার্টকে পাঠানো রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতি

আমার বোন মার্গারেট ৬ জন ভাই বোনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। আমি সর্বকনিষ্ঠ। পিতার মৃত্যুকালে আমার দুই বড় বোন এবং আমি, এই তিনজনই জীবিত ছিলাম। আমি তখন মাত্র তিন মাসের।

মার্গারেটের সঙ্গেই আমার আদিতম স্মৃতি জড়িত। যখন আমার বয়স তিন বছরের কিছু বেশী, তখন মায়ের আর্থিক দুর্দশার ভার লাঘব করতে আমাকে দাদামশায়ের কাছে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে মায়ের আবাস থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছিল মার্গারেটের উপর, তখন সে স্কুলের মেয়ে, ১৩ বছরও বয়স হয়নি। খুব অস্পষ্টভাবে একটি জাহাজের কথা মনে পড়ে, আর জাহাজী নীল রঙের পোষাক পরা একটি বালিকাকে, যে আমাকে ভোলাচ্ছিল। এই ঘটনাটির আকর্ষণ এইখানে—এর মধ্যে আমার বোনের সাহস ও আত্মনির্ভরতার ইঙ্গিত আছে, যে দুটি গুণ পরবর্তীকালে তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে। স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে একটি অবুঝ শিশুকে নিয়ে যাওয়া প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষেও সহজ কাজ নয়—সে তো নিতান্ত বালিকা!

আমার মনোবিকাশের ক্ষেত্রে মার্গারেটের প্রভাব বিরাট। শেক্সপীয়ারের নাটকীয় বক্তৃতার আবৃত্তি করতে সে ভালবাসত। ম্যাকবেথ থেকে তার আবৃত্তি কী দারুণ হৃদয়গ্রাহী হত, এখনো তা স্পষ্ট মনে আছে :

"Is this a dagger which I see before me
The handle toward my hand?"

কিংবা জুলিয়াস সীজার থেকে অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ :

"friends, Romans, Countrymen, lend me your ears!"

তার ধ্বনিময় কণ্ঠের "for Brutus is an honourable man" এখনো আমার কানে সুস্পষ্ট বাজছে, যেন আজ সকালেই তা শুনেছি। আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকতুম। প্রথম জীবনে আমার দাদামশায় আমাকে বাইবেল পড়তে উৎসাহ দিতেন, মার্গারেট উৎসাহ দিত শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে; তার ফলে, এই দুই প্রেরণায় আমি অপূর্ব শিক্ষা পেয়েছিলুম। মার্গারেটই তার অতীব স্বল্প পুঁজি থেকে আমাকে পয়সা দিয়েছিল থিয়েটারে প্রথম শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতে—লীসিয়ামে 'কিং হেনরি দি এইটথ্',—আর্ভিং অভিনয় করেছিলেন উলসির ভূমিকায়, এবং ড্যালীতে 'টুয়েলফথ্ নাইট' দেখতে,—এডা রেহান যাতে ভায়লা সেজেছিলেন। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউই মার্গারেটের তুল্য তীব্র শক্তিতে শেক্সপীয়ারের লাইনগুলি বলতে পারেননি।

আমার বোন প্রথম জীবনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করত। একবার, যখন আমার বয়স দশও হয়নি, তার সঙ্গে 'লিভারপুল সায়েন্স ক্লাবে'র সভায় গিয়েছিলুম।......আমরা পিছনে বসেছিলুম। কতকগুলি গম্ভীরমুখ ব্যক্তির সঙ্গে মার্গারেটের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, যার ফলে পরে তার লণ্ডনে আসা সম্ভব হয়। ঐ সভার বক্তা মিঃ লজ্‌ম্যান তাঁর বোনের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এই দুই মহিলা পরে একসঙ্গে উইম্বলডনে স্কুল খোলেন।

মার্গারেট যেখানেই যেত, সেখানেই নির্ঘাত একটি সাহিত্যসংস্থা গজিয়ে উঠত। উইম্বলডনে এমন একটি সংস্থা সে আরম্ভ করে। এ সেই যুগ—যাকে এখন দুরন্ত নব্বুয়ের দশক বলা হয়—যখন টমাস হার্ডি তাঁর কর্মজীবনের চূড়ায়, যখন তাঁর Jude the Obscure নিয়ে উত্তপ্ত সংঘর্ষ চলেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সভাগুলিতে জড়ো হয়ে যুবকের দল সমকালীন ঔপন্যাসিকদের নিয়ে (হায়, যাদের খুব কম সংখ্যককেই এখন স্মরণ করা হয়!) ডেইলী টেলিগ্রাফ বা অন্যান্য রবিবাসরীয় সংবাদপত্রের সমালোচনার সূত্রে মহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুগম্ভীর আলোচনা চালাত। এখন শুনতে মজাদার মনে হলেও এইসব সাহিত্য-খ্যাপা তরুণদের আন্তরিকতা ছিল নিদারুণ ও সন্দেহাতীত। তাদের কেউ কেউ কবিযশঃপ্রার্থীও ছিল।

সিসেম (Sesame) ক্লাবের সংগঠনে মার্গারেট যে অন্যতম প্রেরণাশক্তি হয়ে দাঁড়াবে—এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এক্ষেত্রে সহযোগিতা ছিল লেডী

রিপন এবং মিঃ রোনাল্ড ম্যাকনীলের। রোনাল্ড ম্যাকনীল তখন সেণ্ট জেমস গেজেটের সম্পাদক ছিলেন, পরে হন লর্ড কুশেনডান। নর ও নারী, সকলের জন্যই এই ক্লাব উন্মুক্ত ছিল, সেকালের পক্ষে অভিনব ব্যাপার, এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল সংস্থাটি। ডোভার স্ট্রীটে উঠে যাবার আগে গোড়ায় ক্লাবটি অবস্থিত ছিল ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের কাছে। ১৯৩৪ সালে লর্ড কুশেনডানের মৃত্যুর এক মাস আগে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি গূঢ় হাসির সঙ্গে মার্গারেটেরে বিরুদ্ধে তাঁর একটি অভিযোগকাহিনী বলেছিলেন। ক্লাবের আস্তানা নিয়ে একবার একটি মামলা হয়; মালিক তাঁর সাক্ষ্যে মিঃ ম্যাকনীল এবং আমার বোনকে ঘর ভাড়া নিয়েছে এমন 'মধুচন্দ্রের দম্পতি', বলে উল্লেখ করেন। মার্গারেট শুনে রেগে অস্থির।

লর্ড কুশেনডান এবং মার্গারেট, উভয়েই উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে আগত। লর্ড কুশেনডান জন্মেছিলেন অ্যানট্রিম কাউন্টির ব্যালিকাসল্-এ, এবং আমার বোনের জন্ম টাইরন কাউন্টির ডানগাননে। লর্ড কুশেনডান আলস্টারের প্রচণ্ড সমর্থক, অপরপক্ষে আমার বোন দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষাবলম্বী, অর্থাৎ সে তৎকালীন আইরিশ জাতীয়তাবাদের সমর্থক। আলস্টার-পক্ষীয়রা, যাদের 'আইরিশ ইউনিয়নিস্ট' বলা হত, সাধারণতঃ তারা নিজ আইরিশ আবাসের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত, অপরপক্ষে আইরিশ ন্যাশন্যালিস্টরা বাসস্থান বিষয়ে মোটামুটি উদাসীন। সাধারণতঃ আয়ারল্যান্ড থেকে দূরে ছড়িয়ে তারা বাস করত। লর্ড কুশেনডান এবং আমার বোনের মধ্যে আইরিশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত, এবং এইসব আলোচনা উত্তপ্ত ও বেদনাদায়ক হয়ে উঠত। এঁরা পরস্পরের প্রতি রীতিমত রূঢ় আচরণ করতেন, ফলে যে-কেউ ভাবতে পারত, জীবনে এঁরা আর কথা বলবেন না। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রান্ত, কারণ এঁরা চমৎকার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন, বন্ধুত্ব আরও গাঢ় এইজন্য যে, এঁরা সাঁড়াশি-হাতুড়ি নিয়ে পরস্পরের কাছে যেতে পারতেন শত্রুভাব না রেখেও। এমনি একটি সংঘর্ষের দুদিন পরে—আমার জানা উগ্রতম সংঘর্ষ যেটি—দেখা গেল লর্ড কুশেনডান আমার বোনের একটি বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করছেন, এবং যৎপরোনাস্তি তার পক্ষ সমর্থন করছেন!

সাহিত্য ও শিক্ষা মার্গারেটের কাছে জোরালো আকর্ষণের বস্তু হলেও তাই তার স্থায়ী আকর্ষণের বিষয় নয়। ধর্মই নিঃসন্দেহে তার মূল জীবনোদ্দেশ্য। ধর্ম সে পেয়েছিল উত্তরাধিকাররূপে। পিতা ছিলেন বাগ্মী প্রচারক, পিতামহও তাই। পিতামহ তাঁর প্রণয়িনী মার্গারেট নীলাসকে নিয়ে ওয়ারেনপয়েন্ট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন আয়ারল্যাণ্ডে। মার্গারেট নীলাস ছিলেন লিভারপুলের এক ওয়েলশ্-সম্ভূত ইউনিটারিয়ান পরিবারের মেয়ে।

মার্গারেটের সাহিত্যচেষ্টার শুরু হয় সারমন্-জাতীয় লেখা দিয়ে। এই ধরনের লেখাকেই নিখুঁত করার চেষ্টায় সে ব্রতী ছিল। বাইবেলের একটি অংশ বেছে নিয়ে তার উপর সারমন্ লিখত। সারমন্‌টি হয়ত দশ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেল। সে তখন সেটিকে আবার লিখে মাত্র তিন কি চার পৃষ্ঠায় দাঁড় করাল। সবশেষে

আবার লিখল—সমস্ত বক্তব্যকে ধরালো এক পৃষ্ঠায়। যাঁরা তার বইয়ের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই এই সংহত করার চেষ্টা লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের হয়ত কৌতূহল থাকতে পারে—কিভাবে সে এই গুণটি আয়ত্ত করেছিল।

পরিবারের অন্যান্যদের মতই মার্গারেটের আদি ধর্মীয় শিক্ষা ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্ট মতে। এ বিষয়ে কোনো ভুল ধারণা যেন না থাকে। অধিকাংশ লোকের ধারণা, সকল ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্টই ক্যালভিনিস্ট। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমরা free well-এ বিশ্বাস করি, এবং আমাদের কোনো Predestination তত্ত্বে বিশ্বাস করতে নির্দেশ দেওয়া হয়না কিংবা বিশেষভাবে কাউকে ত্রাণ করতে, নরকে পাঠাতে বা চির শাস্তির বিধান দিতেও বলা হয় না। জন ওয়েসলি এবং সিমিয়ন-এর আদর্শে আমরা ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্ট। অন্য পক্ষে ক্যাল-ভিনিস্টদের চেয়ে আমাদের কর্মভার কিছু কম নয়। আমরা কঠোরভাবে 'স্যাবাথ' পালন করি, প্রতি রবিবারে দুই থেকে চারবার পর্যন্ত পূজানুষ্ঠানে যোগ দিই, বাইবেলকে মানবের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রেরণাবাণীরূপে গণ্য করবার মত শিক্ষা আমরা পাই; বাইবেলের মধ্যে আমাদের জীবনাচরণের সম্পূর্ণ নীতিনির্দেশ করা আছে, যে আচরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণভাবে আমরা দায়বন্ধ। একথা সত্য, ক্যালভিনিস্টদের মত কোনো ক্লান্তিকর বাঁধা বুলির কাছে নতিস্বীকার করতে আমাদের বলা হয় না, কিন্তু আমরা অপরপক্ষে বিশ্বাস করি, একদিন আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠে ঈশ্বরের কাছে অপরাধীরূপে আমাদের উপস্থিত করবে। এ ধরনের শিক্ষা সমুচ্চ অখণ্ড বিশ্বস্ততা দাবি করে, যা মোটেই মনোরম ব্যাপার নয়। এড়িয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, বা ছলচাতুরীর কোনো সুযোগ এখানে নেই, আমাদের সমস্যার মুখোমুখি আমাদেরই হতে হয়,—সবকিছু দায়িত্বও আমাদেরই, অন্য কারো নয়। এই শিক্ষার সুগভীর প্রভাব আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যেই ছিল, এবং মার্গারেটের জীবনের সকল পর্যায় এই নীতির উপর গঠিত হয়েছিল।

উৎসাহী ইভেনজেলিক্যাল মতাবলম্বীর ধর্মোৎসাহপূর্ণ হৃদয় সহজেই নূতন প্রভাবে ধরা দেয়। বিদ্যালয় ত্যাগ করবার আগেই মার্গারেট চার্চ অব ইংলণ্ডের 'হাই চার্চ' বা 'ট্রাকটারিয়ান' আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে। এই আন্দোলনকে চার্চ অব ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিকতার অনুকরণপ্রয়াস বলা হয়ত অনুচিত হবে, যদিও এই আন্দোলনের অনেক অনুগামীই রোমান ক্যাথলিক মতের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকারী ছাড়া কিছু নয়।

ইভেনজেলিক্যালরা পূজাপদ্ধতির বিষয়ে অল্পই মনোযোগ দেয়; 'স্যাক্রামেণ্ট' প্রভৃতিতে গুরুত্ব আরোপ করে সামান্যই; ঐ সবের মূল্য বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রভুর স্মরণ-মনন ঘটানোতেই মাত্র। গির্জার পাদরীরা ঐতিহাসিকভাবে অ্যাপসল্‌দের কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন কি না এ বিষয়ে ইভেনজেলিক্যালরা ভ্রূক্ষেপই করে না। অপরপক্ষে ট্রাকটারিয়ানরা প্রকাশ্য পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে মনোযোগী, স্যাক্রামেণ্টের শুভফলের উপর জোর দেয়, এবং ঐতিহ্যধারাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে। অর্চনার আনুষ্ঠানিকতাকে তারা বর্ধিত করেছে, রোমান চার্চের সঙ্গে সচরাচর যুক্ত এমন বহু আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রবর্তন করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে

শিল্পসুষমা পেয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে এমনকি রোমীয় নমুনাকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। সর্বজনীন পূজাপাঠে, তাদের অনবদ্য গদ্য রচনা এবং উপাসনার অপূর্ব শিল্পরূপ এখানে তাদের সহায়তা করেছে।

এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এই দেখাতে যে, আমার বোনের রোমান্টিক স্বভাবের সঙ্গে কোন্ বস্তুর সংযোগ ঘটেছিল, এবং কী তাকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। এর ফলে ধর্মাচর্নায় কেবল বর্ণগরিমা ও নাটকীয়তাই সে লাভ করেনি, (তার মন সর্বদা শিল্পের ভাবাকৃতিতে পূর্ণ থাকত)—তার মন যুক্ত হতে পেরেছিল অতীত সন্তগণের যুগের সঙ্গে। মার্গারেট ভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক সময়ে রোমান চার্চে যোগদানের কথাও ভেবেছিল। যদি এমন ঘটনা ঘটত, তাহলে হয়ত কোনো সিস্টার নিবেদিতাকে পাওয়া যেত না। মার্গারেট যদিও ভক্তিমতী কিন্তু তাকে কোনোভাবে অনড় অন্ধভক্ত বলা যাবে না। এক গুডফ্রাইডেতে —যে-দিনটিতে নিষ্ঠাবান হাই চার্চ ব্যক্তিদের উপাসনা ও ধ্যানাদিতে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করার কথা—সে পরমানন্দে মজা করে তার ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিল। এহেন স্বাধীনতা গ্রহণের ব্যাপারটা তার ভাই ভুললেও সে কখনো ভোলেনি। তার জীবনের শেষের দিকে ভাই যখন ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিল, সে ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য নিজের এই রীতি পরিহারের ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েছিল।

অন্য প্রভাবের সম্মুখীন হওয়াও তার নির্ধারিত নিয়তি। অ্যাংলো-ক্যাথলিক-দের (এ নামই তারা সাধারণতঃ পছন্দ করে) সংকীর্ণতার প্রতিরোধ না করে সে পারেনি; অ্যাংলো-ক্যাথলিক মত তাকে তার মনোবিকাশের সুযোগ দেয়নি। তা আবেগকে পুষ্ট করলেও বুদ্ধিকে শুকিয়ে মারত। সে কিভাবে চার্চ অব ইংলণ্ডের উদারতর চিন্তাশীলদের সংস্পর্শে এসেছিল তা বলতে পারব না, কারণ আমরা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখতে পারিনি। মনে হয় সে যাজক স্কট হল্যাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং তাঁর মারফৎ ফ্রেডারিক ডেনসন মরিস ও তাঁর মত অন্যান্যদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। সে যাই হোক, সে "উদারনৈতিক ধর্মীয় চিন্তার" মূল্য স্বীকার করতে শুরু করেছিল।

এই উদার চিন্তার জগতে যখন সে প্রবেশ করেছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ; তার ফলেই প্রাচীন ধর্মগুলির উদারনৈতিকতার রূপ সে প্রথম উপলব্ধি করল; 'আমার ধর্মেই একমাত্র ত্রাণ সম্ভবপর',—এই যে ধারণা ইহুদী, খ্রীস্টান কিংবা ইসলাম প্রভৃতি সেমিটিক ধর্মগুলি পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে পোষণ করেছে, ঐ প্রাচীন ধর্মগুলি সেই ধারণা থেকে একেবারে মুক্ত। একথা হয়ত বলা চলে, ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে এই সংযোগ তাকে খ্রীস্টীয় ধর্মমতকে নূতন দৃষ্টিতে দর্শনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, একথা ঠিক, একেবারে প্রথম থেকেই সে অনুভব করেছিল ভারতের ডাক আছে তার জন্য।

মার্গারেট প্রথমবার ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করার আগে স্বামীজীকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। স্বামীজীকে মানবদেহে যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব তিনি কী ছিলেন। শিষ্যরা সচরাচর গুরুর মধ্য থেকে নিজেদের অভিপ্রেত শিক্ষা-বস্তুকেই নির্বাচন করে নেয়, এবং তারা গুরুকে নিজেদের মতাদর্শের

প্রয়োজনেই ব্যবহার করে। কিন্তু স্বামীজীকে জানার অর্থ স্বয়ং খ্রীস্ট কী ছিলেন তাই কিছুটা জানা। অফুরন্ত রসিকতার ভাণ্ডার ছিলেন ; সেই হাসির আলোকেই নানা যুগের বিচার করতেন, এবং সেইভাবেই অনুভব করিয়ে দিতেন, ঈশ্বর আমাদের স্নেহশীল পিতা-মাতা, কদাপি নির্দয়-কঠোর প্রভু নন। নির্লিপ্ত বোধের এক জগতে তিনি উন্নীত করে দিতেন।

একবার তাঁর সন্দেহ হল, মার্গারেটের চাপে বোধহয় আমাদের বাড়িতে গোরু খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমার কাছে মার্গারেট সে কথা অস্বীকার করলেও স্বামীজী তা মানলেন না, এবং তার গোঁড়ামি নিয়ে তামাশা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, গোরু ইংরেজের সাধারণ খাদ্য; গোঁড়া মার্গারেটের জন্যই যে, আমাদের গো-খাদ্যে বঞ্চিত হতে হচ্ছে সে ধারণা ছাড়লেন না; আমাকে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে 'বীফ স্টিক' খেতে দিলেন। তিনি বললেন, পুরুষরা সর্বদা মেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে চলে কারণ মেয়েরাই তাদের সমর্থন করে।

স্বামীজীর সাক্ষাৎ যে পেয়েছে, কোনো না কোনোভাবে উন্নীত না হয়ে সে পারবে না। মানুষটা হয়ত মন্দ লোকই রয়ে গেল, কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সে এইটুকু সান্ত্বনা অন্ততঃ পাবে, সে আরও কত মন্দ হতে পারত কিন্তু হয়নি! স্বামীজীর সংস্পর্শ কোনো না কোনো ভাবে মন্দত্বের সংশোধন না করে পারে না।

মার্গারেটের প্রথম ভারতযাত্রার দিনটিকে এখনো আমার মনে পড়ে—ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া লাইনারে সে যাবে—আমরা বিদায় দিতে গিয়েছি টিলবেরী ডকে। আমার অন্য বোন এবং মাও ছিলেন। আরও দুজন বন্ধু ছিলেন—এবেনিজার কুক, যিনি মরিসের বন্ধু ও ড্রয়িং-শিক্ষক এবং অক্টেভিয়াস বীটি, যিনি ১৮৯৫ সালে চেলসিয়া থেকে উদারনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন। মা এবং বোন কাঁদতে লাগল। জাহাজের যাত্রীদের এবং নেপলস্ প্রভৃতি যেসব বন্দরে জাহাজ ছুঁয়েছিল তাদের জীবন্ত বর্ণনায় পূর্ণ মার্গারেটের চিঠিগুলির কথা আমার এখনো মনে আছে।

পরবর্তী সাক্ষাৎ সাউথ আফ্রিকার যুদ্ধের ঠিক আগে। ঐবারই স্বামীজীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আবার সে যখন বাড়ি ফিরল, তার সঙ্গে ডাঃ জগদীশ বসু ও শ্রীমতী বসু ছিলেন। সে সময়ে ডাঃ বসু অত্যন্ত সংকটের মধ্যে কাজ করছিলেন। তাঁর কাজের মূল্য কেউ কেউ অস্বীকার করেছিল, কেউ কেউ বা চুরি করে নিতে চেয়েছিল। তিনি তখন 'Response on the Living and Non Living' বইখানি লেখায় ব্যাপৃত ছিলেন। মার্গারেট লেখায় সাহায্য করছিল। ডাঃ বসু হুইস্ট তাস খেলা ভালবাসতেন। মার্গারেট খেলতে চেষ্টা করত, কিন্তু এ ধরনের আমোদে সে নির্লিপ্তভাবে যোগ দিত, সেটাই তার স্বভাব ছিল। আসল মজা ছিল তার খেলার ধরনে—যা নিয়ে আমরা আমোদ করতুম।

আমোদ-প্রমোদের কথায় আমার মনে পড়ছে তার বাইসাইকেল চড়ার চেষ্টার ব্যাপারটি। এক সময়ে রাস্তার অন্য দিকে একজন ঝালাইওয়ালা কাজ করছিল।

সাইকেল-অধিষ্ঠিত মার্গারেট তাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণবস্তু মনে করল—এবং ধাক্কা মারার কাজটি নিবারণ করতে পারল না কিছুতে! দৃশ্যটা আমি কখনোই ভুলব না—আমার ভগিনীদেবী গতিশীল সাইকেলে আসীনা, তাকে প্রাণপণে সংযত করতে চেষ্টা করছেন, যেমন অশ্বরজ্জু আকর্ষণ করে থাকে লোকে, প্রশস্ত পথকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে ছুটছেন, কণ্ঠে উচ্চ নিনাদ : "মিঃ ঝালাইওয়ালা, সাবধান! সাবধান!" আজ পর্যন্ত স্যার জগদীশ বসু হাসিতে বেসামাল হয়ে পড়েন সেই ঘটনাটি স্মরণ করলেই।

আমার বোন যাকে বলে ওস্তাদ সাইকেল-চালিয়ে, তা কখনই হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সে না-পড়ে এক মাইল-দেড় মাইল চালাবার মত শিখে নিয়েছিল। এইটুকু শিক্ষার জন্য তার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। সে উদারভাবে ঘোষণা করেছিল, আমি তার পকেটে ঐশ্বর্য পুরে দিয়েছি। এই মহাকীর্তির স্মরণোৎসবরূপে স্থির হোল আমরা "ট্যুরে" বেরিয়ে পড়ব। অতীব হ্রস্ব ট্যুর। বেশ চেষ্টা করে আমরা উইম্বলডন থেকে মাইল চারেক যেতে পারলাম, মিচামের কাছাকাছি জায়গাটা, পুরনো ধরনের পাবলিক হাউসের সামনে হাজির হলাম। জায়গাটা অবিলম্বে মার্গারেটের কল্পনায় প্রাচীন কালের পথিপার্শ্বের সরাইখানায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেখানে থেমে, তার ভিতরে ঢুকে আমাদের জলযোগ করতেই হল। মনে হয় চা পান করা হয়েছিল। মার্গারেট দারুণ খুশী, অতি সাধারণ যে খাদ্য-পানীয় জুটেছিল তাতেও, কেননা—তা রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের আনুষঙ্গিক! আমরা যে পথিক—বহু কষ্টে সেখানে পৌঁছেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি!! হয়ত শেষ পর্যন্ত সে-ই ঠিক, কেবল আমার গদ্যাত্মক মন সেই সময়ে তা দেখতে পায়নি।

পরবর্তীকালে সে আয়ারল্যান্ডের ডোনিগ্যাল কাউন্টিতে আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু আয়ারল্যান্ড তার মন টানেনি। তার সমস্ত মন অধিকার করে ছিল ভারতবর্ষ। আমাদের সব কিছুই নীরস, তা ঠিক, যদিও আমার কাছে তা নীরস ছিল না মোটেই, তা এমনই রোমাঞ্চিত করে তুলত আমায় যা অন্য কোথাও পাইনি। কালগতে আমি এই ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন কিন্তু বুকে ঈর্ষার মোচড় লাগত—হায়রে, আমার বোনের হৃদয়ে আয়ারল্যান্ডের স্থান নেই, তা নিয়ে নিয়েছে ভারতবর্ষ!

১৯১১ সালের শেষের দিকে মার্গারেটের কাছ থেকে একটি চিঠি এসে পৌঁছল, হস্তাক্ষর এলোমেলো ; আমার প্রশংসা উদ্রিক্ত করত যে দৃঢ় মুদ্রিত ব্যক্তিত্বময় রচনা, তা নয়; নৈরাশ্যে, দুঃখে ভাবতে চেষ্টা করলুম—এর অর্থ কি? মার্গারেট মৃত্যুশয্যায়। চিঠিতে কিন্তু লিখেছিল, তার মারাত্মক অসুখের বিষয়ে যদি কোনো সংবাদ পৌঁছায়, তাতে যেন গুরুত্ব না দিই, এ ব্যাপারে মিথ্যে হৈ চৈ করা হচ্ছে, অসুখ সামান্যই। সে চিঠি পৌঁছবার আগেই তার এল—সে নেই।

নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর মা, বোন ও ভাই

মা

নিবেদিতার চিঠি থেকে তাঁর মা, বোন ও ভাই সম্বন্ধে তাঁর নানা মানসিক প্রতিক্রিয়ার কিছু অংশ উপস্থিত করছি। নিবেদিতার ঘরোয়া ছবিটি এই সব অংশে পাওয়া যাবে। তিনি যে একদিন এবং চিরদিন ঘরের মেয়ে ছিলেন, নিছক কর্মের ও ধর্মের পতাকাবাহীই নন, এই সব পত্র থেকে পেয়ে যাই। সেই সঙ্গে দেখি, ঘরের মধ্যেও তাঁর ধর্মের প্রদীপটিই জ্বলছে।

নিবেদিতা প্রচুর লিখেছেন জীবনে, কত বিষয়ের কথা, কত মানুষের কথা, কিন্তু বিস্ময়কর হল, নিজের মায়ের কথা (পিতার কথাও) লিখে যাননি। শ্রীমা সারদাদেবী—নিবেদিতা যাঁকে নিখিল মাতৃত্বের প্রতীক মনে করতেন, তাঁর কথা লিখেছেন, মিসেস ওলি বুল, স্বামীজীর মতই নিবেদিতাও যাঁকে মা বলতেন, তাঁর কথাও লিখেছেন, লেখেননি শুধু নিজের মায়ের কথা, বোধহয় এই জন্য যে, যে-পূর্বজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছেন, তাকে প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় করতে তাঁর নীতিতে বেধেছিল, এবং আত্মমর্যাদায় বেধেছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রকাশ্যে গৌরবান্বিত করতে।

কিন্তু কী গভীর ভালবাসতেন নিবেদিতা তাঁর মাকে। শ্রদ্ধায় এবং করুণায় মিশ্রিত সেই ভালবাসা। মায়ের সুদীর্ঘ দুঃখজীবনকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, দেখেছেন সাধারণ এক জীবনে অসাধারণ সহনকে, দায়িত্বের বোঝার চাপে নিষ্পিষ্ট যাতনাকে, তারই মধ্যে শান্ত তপস্যাকে। দেখেছেন—সামান্য অর্জনের জন্য যাঁকে বুকের রক্ত তুলে খাটতে হয়েছে, তিনিই কী উদার মহিমায় ত্যাগ করেছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকে।

নিবেদিতার মায়ের জীবনের দিকে তাকালে দেখব, তাঁর ক্ষেত্রে সুখ কত ক্ষণস্থায়ী! বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল মেরী হ্যামিলটন; জন্ম হয়েছিল ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে; বিয়ে হয় স্যামুয়েল নোবলের সঙ্গে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে(?)। বিয়ের সময়ে স্যামুয়েল মোটামুটি সচ্ছল ব্যবসায়ী। বিয়ের এক বছর পরে প্রথম সন্তান মার্গারেট অর্থাৎ নিবেদিতার জন্ম হয়। আরও এক বছর পরে স্যামুয়েল আদর্শের টানে, জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার আকাঙ্ক্ষায়, ব্যবসা বেচে দেন এবং শিশু-কন্যাটিকে নিজের মায়ের কাছে সঁপে দিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে হাজির হন। সঞ্চিত পুঁজিতে দু'এক বছর কাটে, তারপরে অর্থকষ্ট, তখন ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় স্যামুয়েলকে, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও কঠোর শ্রম তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়, ক্ষয় রোগ ধরে, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন। মেরীর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ।

এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে মেরী একদিকে যেমন আদর্শবাদী স্বামীর সান্নিধ্যে উদ্দীপ্ত হয়েছেন, ধর্মসঙ্গিনী ও কর্মসঙ্গিনীরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্য দিকে পেয়েছেন দারিদ্র্য ও মৃত্যুশোক। স্বামীর মৃত্যুর আগেই কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল। অবশিষ্ট তিনজনকে (দুই কন্যা, মার্গারেট ও মে এবং পুত্র রিচমন্ড) নিয়ে মেরীর কঠোর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয়—সেই সংগ্রামের অনেকখানি অংশই নিবেদিতার স্বচক্ষে দেখা। নিবেদিতা দেখেছেন, দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম কিভাবে কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর মায়ের প্রাণসার। তারপরে —দুঃখদিনের শেষ হবার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়েছে, মেয়ে দুটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত, ছেলে শিক্ষিত ও প্রাপ্তবয়স্ক—ঠিক তখনি বড় মেয়ে চেয়েছে অজানা এক দেশে পাড়ি দিতে—অজানা ধর্মের মধ্যে—অজানা আশঙ্কার মধ্যে।

মেয়ের যাত্রায় মা বাধা দেননি।* মেয়ে মনের দিক থেকে স্বতন্ত্র, তা জানতেন, সেজন্য কষ্টও তাঁর কম ছিল না। বৈধব্য-জীবনে মেরী সাচ্ছল্যের সুখ পাননি, আনুগত্যের তৃপ্তিও পাননি, কেননা তাঁর বড় মেয়ে পারিবারিক ধর্মবিধির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব থেকেই, বিদ্রোহ করে আসছিল।

মনের দিক থেকে নিবেদিতা মায়ের অন্তরঙ্গ নন, কিন্তু ভুলবেন কী করে তাঁর দীর্ঘ দুঃখের তপস্যাকে! যখন ইংলন্ড থেকে ভারতে যাত্রা করলেন, তারপরে ভারতে বাস করতে লাগলেন, সমস্ত সময়েই 'ছোট্ট মা-টির' কথা তাঁর মনের কোণে বেঁধা একটি কাঁটা হয়ে রইল, সামান্য স্পর্শেই তাতে চাপ লাগত, আর রক্তক্ষরণ হত।

সেই ব্যথাতুর কাতর কন্যাহৃদয়ের ছবি নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে আমরা পাই। যে-কথা কোনোদিন প্রকাশ্যে লেখেননি, পত্রে পত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই মনের কথা, নিজের 'ছোট্ট মা-টি'র চারপাশে বিছানো সেই সতৃষ্ণ ভালোবাসার অপরূপ কথাগুলি!

নিজের মায়ের কথা চিঠিতে লেখার সময়ে নিবেদিতা 'ছোট্ট মা-টি' ভিন্ন লেখেননি প্রায়। ভালবাসার অপূর্ব এই রূপ—কন্যা যেন পরম স্নেহে নিজের মাকে কন্যারূপে দেখছে!

---

* বাধা না দেবার একটা গূঢ় কারণ ছিল। প্রথম সন্তানসম্ভবা হলে মেরী আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, শুভ প্রসব হলে সন্তানটিকে তিনি দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। নিবেদিতা সেই প্রথম সন্তান। ঘটনাটি নিবেদিতার মা একমাত্র মিস ম্যাকলাউডকে বলেন, তিনিই পরে সকলের গোচর করেন। রোমা রোলাঁকেও ম্যাকলাউড এই ব্যাপারটির কথা বলেছিলেন, রোলাঁর ডায়েরীতে তা পাওয়া যায়।

নিবেদিতার বোনের কাছ থেকে আরও জানা গিয়েছে, নিবেদিতার পিতা মৃত্যুকালে পত্নীকে বলে যান, কন্যা যদি ধর্মের জন্য আত্মদান করতে চায়, তাকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। রেমঁ-সংগ্রহে ম্যাকলাউডের এই কথাগুলি পাই :

"Nivedita: 'I cannot understand my little mother, the widow of an orthodox clergyman, opening every door to me when I wanted to go to India.' But the mother had made a vow when she was with child that she would consecrate the child to the Lord when He should call her. She told the story once to Miss Macleod who told it later herself to Nivedita. Vivekananda himself never knew it."

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ জুনের এক চিঠিতে নিবেদিতা নিজের বাল্যের অভিমানী স্বভাবের কথা লিখেছেন—"জানো কি, ছোটবেলায় প্রাণপণে চেষ্টা করে তবে আমার গর্বিত মাথাখানি নামিয়ে মায়ের কাছে খাবার চাইতে পারতাম!" মায়ের এই অভিমানী জেদী মেয়েটি দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে এসে বিশ্বমায়ের আঁচলের তলায় যখন পরম আশ্রয় পেলেন, তখনকার সুগভীর আনন্দও কিন্তু গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদের যাতনাকে মুছতে পারেনি। মিস ম্যাকলাউডকে ১২ মার্চ ১৮৯৯, তারিখে লিখছেন: "তুমিই এঁকে (সারদাদেবীকে) মা বলে ডাকতে শিখিয়েছ—আমার ছেড়ে-আসা ছোট্ট মায়ের দাবির সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই।"

বিষণ্ণ মধুরতায় ভরা লাইনটি। একদিকে নবজীবনে নবপ্রাপ্তির আনন্দ, অন্যদিকে গত জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা, একসঙ্গে। মার্গারেট নোবল ভারতবর্ষে এসে 'নিবেদিতা' নামের শ্বেতবস্ত্রে রাগরক্ত অতীত জীবনকে আবৃত করেছেন, নবজীবনের আলয়ে মাতৃরূপে পেয়েছেন চির মাতৃত্বের বিগ্রহরূপিণী এক নারীকে, যাঁর চরণপদ্মের আলপনা চলে গিয়েছে দ্বারপথ থেকে মন্দিরকক্ষে, কিন্তু এই ভবনে প্রবেশের আগে ছেড়ে এলেন কোন্ গৃহদেবীর স্নেহাঞ্চলের শান্তিকে!

সুগভীর, শিহরিত, আলোড়িত দীর্ঘশ্বাস নিবেদিতার—'আমার ছোট্ট মা-টি!'

নিজ পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে তাঁদের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় কিভাবে নিবেদিতার মন মথিত থাকত, তার কিছু কিছু পরিচয় তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়। আশঙ্কার কালো ছায়াভরা মনের রূপ, ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে, (২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯)—

"আমাদের পরিবারের বিষয়ে কিছু মিষ্টি খবর লিখতে চেষ্টা করবে কি! আমি কি খুবই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছি, কি জানি, কিন্তু বাড়ির লোকজনের হস্তাক্ষরে কোনো চিঠি এলে আমি থরথরিয়ে কেঁপে উঠি এবং না-পড়ে পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়। বাস্তবিক তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে এমন বোকার মত ভীতু হয়ে উঠেছি যে, একজন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বাড়ির জন্য মন-কেমন করছে কি না, তখন বলেছি, আমি বোধহয় কিছুতে সুখী হব না যতক্ষণ না কোনো দুর্বিপাকের ঢেউ হঠাৎ এসে অন্য পৃথিবীতে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়! জানি উদ্ভট কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে যুক্তিবিচার অর্থহীন। নাগালের মধ্যে প্রেতচ্ছায়া—তবু তার অস্তিত্ব ভুলতে চাইছি যেন! এহেন মনোভাবের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হল, তথাপি এখানকার (ভারতের) জীবনকে ভালবাসছি। প্রিয় জয়া, যদি তুমি কোনো অসুস্থ মনের চিকিৎসা করতে সমর্থ হও—সে মন অন্ততঃ একবারের জন্য—এবারের জন্য—আমারই হোক—আমাকে একটু সাহায্য করো, যাতে এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে উচিত মনোভাব অবলম্বন করতে পারি।"

নেল হ্যামন্ডকে লেখা একটি চিঠিতে (৯.৩.১৮৯৯)—

"নেল, তুমি জানো যে, নিজের পরিবার সম্বন্ধে আমার হৃদয়হীনতার ভাবটি আমি কত অনুভব করি। কিন্তু আমরা এত পৃথক হয়ে পড়েছি যে, এইসব কথা (শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি ভক্তির কথা ইত্যাদি) কী করে তাদের বলব? আমার সমস্ত

হৃদয় এই নূতন ধর্মীয় আকর্ষণে যেভাবে গ্রথিত হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কিছু বলতে সাহস করি না।"

নিজের পরিবর্তিত ধর্মবিশ্বাস (নিবেদিতা একেবারে কালীতত্ত্বে পর্যন্ত বিশ্বাসী হয়েছিলেন) কিভাবে নিজের পরিবারের গোচর করবেন, এবং তাঁরা কিভাবে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল মনে। কালী সম্বন্ধে তাঁর মত যদি ইংলণ্ডে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে বোনের বিয়ের ব্যাপারে অসুবিধা পর্যন্ত ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন। এদিকে নিবেদিতার মা তাঁর কন্যাকে "ব্যাকুলভাবে কাছে পেতে চাইছিলেন," এবং নিবেদিতা ব্যাকুলভাবে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, তাঁর পরিবর্তিত ধর্মবিশ্বাসের চেহারা "মায়ের বুক ভেঙে দেবেনা" (২৮.৫.৯৯), যদিও বিপরীতই ছিল অনুভব।

নিবেদিতার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল একটি পরম ঘটনায়—১৮৯৯ খৃীস্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করে স্বামীজী হাজির হলেন ইংলণ্ডে, এবং নিবেদিতার পরিবারে কয়েকদিন কাটালেন। বিবেকানন্দের উপস্থিতিই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা—সাহস—সত্য। নিবেদিতা লিখেছেন (১২.৮.১৮৯৯)—

"নিম-এর (বোনের) প্রণয়ী আচার্যদেবের চরণে নতজানু হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মা, নিম ও রিচ। অপরূপ।"

নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন—

"আমাদের বাড়ির সবকিছু যেন ভারতের জন্যই উৎসর্গীকৃত।...বিশ্বাস করি, আমার ভাইও একদিন স্বামীজীর সন্তান হয়ে দাঁড়াবে, তবে মা বেঁচে থাকতে তা হবে না বলেই মনে হয়।" (২২.৩.১৯০১)

মা বেঁচে থাকতেই রিচ স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিতে পারতেন, যদিনা স্বামীজী স্বয়ং বিপরীত ইচ্ছা করতেন—

"তুমি জানো, স্বামীজী তাকে ডাক দেবেন বলেছিলেন; কেবল ভেবেছিলেন, মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ; অথচ আমার প্রিয় ছোট্ট মা-টি কখনই অভিযোগ করতেন না আমি জানি।"

রিচ প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তিনি স্বামীজীকে দেখেছিলেন। বহু দিন পরে তিনি লিখেছিলেন—"স্বামীজীকে সশরীরে দেখার আগে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তিনি কি ছিলেন।...তাঁকে জানার অর্থ খৃীস্টকে কিছুটা জানা।"

১৮৯৯ খৃীস্টাব্দে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নিবেদিতার মায়ের জীবনের চতুর্থ পর্ব শুরু হল বলা যায়। প্রথম পর্বে তাঁর কুমারী জীবন, দ্বিতীয় পর্বে বিবাহিত জীবন, তৃতীয় পর্বে বৈধব্য জীবন ও সংগ্রামী জীবন—(নিবেদিতার ইংল্যাণ্ড ত্যাগ ও প্রথম ভারতবাস পর্যন্ত সময়); এই তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ সম্প্রদায়-সীমায় আবদ্ধ ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবতী নারী। চতুর্থ পর্বই শেষ পর্ব। এইকালে নিজ ধর্ম ধারণার প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও উদার আধ্যাত্মিক বোধে জাগরিত। বিবেকানন্দের প্রভাবই তার মূলে।

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই তিনি ভারত সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন

সন্দেহ নেই। তাঁর স্বামীর ভারত বিষয়ে আগ্রহ ছিল। ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে নিজ কন্যার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, ও পরিশেষে ভারতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর মনে অবশ্যই নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে যথেষ্ট, যা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে দূর হয়নি।

অতঃপর ভারতবাসীর জন্য তাঁর দ্বার খুলে গিয়েছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন (২৮.৯.১৯০০)—

"আমার ছোট্ট মা-টি এখানে এসেছিলেন ডাঃ বসু ও মিসেস বসুর থাকার কথা বলতে। তাঁর পক্ষে এটা খুবই মিষ্টি ব্যবহার নয় কি?"

স্বামীজীর প্রভাব সংক্রামিত হওয়ায় উদারতর হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু পূর্বতন সংস্কার ও ধারণা দূর হয়নি—মায়ের এমনই একটি মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা মিসেস ওলি বুলের কাছে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-র চিঠিতে—

"অনেকেই দেখছি আমার ছোট্ট মা-টিকে ভালবাসে এবং তিনি বিশেষ ধরনের যে-সব স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেন, তার জন্য প্রত্যাশী হয়। মাকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে চেষ্টা করছি, কারণ তিনি খ্রীস্টীয় ধরনের কর্ম-উপাসনার নিষ্ঠুর দিকের অভিজ্ঞতা পেতে আরম্ভ করেছেন। এখন যেহেতু তাঁর কাজের কাল শেষ হয়েছে, তাঁর সাহায্যের দরকার আমাদের কারোরই নেই—তিনি মনে করছেন তিনি এখন বোঝার মত, এবার যেতে পারলেই হয়। এখনই প্রথম আমি হিন্দু ভাব ও রীতির সৌন্দর্য ও মর্যাদার রূপ বুঝতে পারছি ; মানুষের সত্যকার বাঁচার জীবন তো এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়! মানুষের বিষয়ে যার যা ধারণা, ঈশ্বরের বিষয়েও তাই—ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে **সেবা** ও **বন্দনা** চান (কী নির্বোধ ও যুক্তিহীন শোনাচ্ছে কথাগুলো তা জানি, কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাও না ভেবে পারছি না) ; মা তাই অনুভব করতে পারেন না—ঈশ্বরকে শুধু ভালবেসে যাওয়াই একমাত্র কাজ হতে পারে। এই অপর দিকটি শুধু **বলে বোঝানো** যায় না ; তবু বিশ্বাস করি, যেভাবেই হোক, তা মায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। বসুদের পেলে একদিন এ বিষয়ে মাকে বলতে তাঁদের বলব। বসুদের আসতে বলতে ইতস্ততঃ করছি, কারণ, চাকর-বাকর না থাকলে ঘণ্টাখানেকের জন্যও যদি কোনো অতিথি আসে তাহলে মাকে এত ব্যস্ত হতে হয় ও খাটাখাটুনি করতে হয় যে, তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন—তাঁকে ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করেও কোনো ফল হয় না।"

এর পরে নিবেদিতা কিছু কথা লিখেছেন, যার মধ্যে তাঁর স্পর্শকাতর মনটি অপূর্ব ফুটেছে—"স্বামীজীকে কোনো খবরাখবর দিই নি, এই ব্যাপারটিকে তুমি যদি অদ্ভুত মনে করো, তার উত্তর—আমি স্বামীজীকে জানাতে চাই—'আমি **মা**-এর সঙ্গে বাস করতে গিয়েছি, এবং কিছু সময়ের জন্য এমন কি তাঁর (স্বামীজীর) বিষয়েও ভাবতে চাই না।"

["If you think it funny that I send no messages to Swami, I would like him to know that I have gone away to stay with Mother and I do not want even to *think* of him for a while."]

বিচিত্র বিমিশ্র মন এখানে। একদিকে স্বামীজীর বিরুদ্ধে অভিমানের ব্যঞ্জনা, তিনিই যেন মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, অন্যদিকে সূক্ষ্ম অভিযোগ, নিজের মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েও স্বামীজী তাঁকে জগন্মাতার নিত্য সান্নিধ্য দান করেন নি, যে-সান্নিধ্যে অপরপক্ষে তিনি নিত্য বাস করেন। নিবেদিতা যখন সেই অচেনা মাকে লাভ করলেন না, তখন তাঁর চেনা ছোট্ট মা-টি ছাড়া গতি কি? স্বামীজীর বাক্-ভঙ্গির নকল করে অভিমানের খোঁচাটুকু দিলেন—নিজের মায়ের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে mother শব্দটিকে বড় অক্ষরে Mother লিখে জানালেন,—কি করব, আমার ক্ষেত্রে অগত্যা নিজের মা-ই ঈশ্বর-মা!

নিবেদিতার মায়ের জীবনে নূতন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিসর দেখা দিয়েছিল অতঃপর। তিনি সহানুভূতি-স্নিগ্ধ হৃদয়সান্নিধ্য পেয়েছিলেন নিবেদিতার সুহৃদদের কাছ থেকে। মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস ওলি বুল এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর অনেক সমস্যার সমাধানে। সেজন্য নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। ৭ মে, ১৯০৩, তারিখে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"লেডী বেটীর (মিসেস লেগেট) সহৃদয়তা সবচেয়ে মর্মস্পর্শী।...আমার ছোট্ট মা-টি সহসা দেখছেন—প্রাণোত্তপ্ত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অবস্থিত, যখন ভেবেছিলেন—এ পৃথিবীতে তিনি বড় নিঃসঙ্গ!"

১৮ অগস্টে একই জনকে লেখা চিঠিতে :

"সেণ্ট সারা (মিসেস বুল) এবং আমার কাছে লেখা মায়ের এ সপ্তাহের চিঠি তোমার ও লেডী বেটীর কথায় পূর্ণ। পাঁচ বছরের শিশুও যার থেকে গভীরতর, মধুরতর সুখ পাবে না, এমন সুখ আমার ছোট্ট মা-টি পেয়েছে। আর, তোমার জ্যাকেট, মসলিনের গাউন, পালকের টুপি প্রভৃতির চেয়ে সুমধুর সুখের বহিরঙ্গ উপাদান আর কি হতে পারে।"

মায়ের দুঃখময় জীবনের কথা সদাই মনে জাগরূক ছিল বলে নিবেদিতা তাঁর যন্ত্রণাবৃদ্ধি করতে চাইতেন না, এমন কি যখন ১৯০৫ সালে ব্রেন ফিভার হয়ে প্রায় মৃত্যুমুখে, তখনো মাকে খবর দিতে দেননি; আরোগ্যের পরেও অসুখের সংবাদ জানাতে নিষেধ করেছেন (ম্যাকলাউডকে লেখা ৫ এপ্রিলের চিঠি)। মায়ের জন্য সদাই কাতর তাঁর মনের ছবি ফুটেছে ১৯০৭ সালের এক চিঠিতে—

"অগস্ট বা সেপ্টেম্বরে পাশ্চাত্ত্য যাচ্ছি।...যে-সব বন্ধুদের বন্ধুত্বের মূল্য দিতাম, তাদের কতজন শেষবার ইংলণ্ড ছাড়ার পরে মারা গেছে! মাকে দেখতে আবার গিয়েছি, ভাবতে ইচ্ছা করছে। বেচারা ছোট্ট মা-টি—কত রোগা, পাতলা হয়ে গেছেন যেন!"

ঐ বছরই ১০ সেপ্টেম্বরে ওলি বুলকে—

"তুমি যে ইংলণ্ডে আসছ, এ সংবাদ পূর্ণ তৃপ্তিকর। মা মিষ্টতম ছোট্ট নীড়টি তৈরী করে রেখেছেন— আমাদের সকলের আসার জন্য মনে মনে প্রস্তুত। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম।"

নিবেদিতার এই মাতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা করেছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা :

"য়ুরোপ হইয়া সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিবেদিতা ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মাতা ও ভাই-ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।...ভারতের যে আধ্যাত্মিক জীবন নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহার আস্বাদ প্রিয়জনকে দিবার জন্য তাঁহার কী আগ্রহ! কত জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য— মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, নানা রকমের মালা, কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র পট।...বোতলে করিয়া আনিয়াছেন গঙ্গাজল। একদিন গোপালের মার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়া নিবেদিতা যখন তাঁহার নিকট রক্ষিত মালাটি মাতাকে স্পর্শ করিতে দিলেন, তিনি অভিভূত হইলেন।"

১০ নভেম্বর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"বাড়ি ফিরতে কী সুখ! কী আনন্দ!—যেখানে স্নিগ্ধতম আত্মাটি বিরাজ করছে। মা তাঁর নিজের রাজ্যে মাধুর্যে, সাহায্যে, সেবায় পূর্ণ। প্রতিটি জিনিস এখানে অপরূপ সুন্দর!"

এই সুন্দর নীড়-স্বপ্নটি ছিন্ন হয়ে গেল বছরখানেকের মধ্যে। ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় কাজের জন্য গিয়েছিলেন নিবেদিতা, সেখানে দারুণ আহ্বান গেল প্রত্যাবর্তনের জন্য—শেষ শয্যায় মেরী, অবিলম্বে না এলে দেখা হবে না।

নিবেদিতার ব্যাকুল ঊর্ধ্বশ্বাস প্রত্যাবর্তন-চেষ্টার রূপ ছড়িয়ে আছে কয়েকটি চিঠিতে। কালবিলম্ব না করে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন, ব্যবস্থা করে দেবার জন্য একান্ত মিনতি করে লিখেছিলেন প্রতিপত্তিশালী মিঃ লেগেটকে। ১১ জানুয়ারী, ১৯০৯-এর সেই চিঠি—

প্রিয় মিঃ লেগেট,

এই দারুণ সংকটকালে আপনার নিকটে প্রার্থনার সুযোগ গ্রহণ করছি, যদিও জানি, এর দ্বারা কী অসুবিধা ঘটাচ্ছি, এবং জানি আপনার সময়ের মূল্য কতখানি!

মিসেস বুলের নামে টেলিগ্রাফ করছি :

অনুগ্রহ করে ক্যাম্পানিয়া থার্টিনথ্-এ মার্গটের জন্য আসন সংগ্রহ করুন। যদি সম্ভব হয়—ইন্ডিয়ান মিশনারী রেটে। তারে উত্তর জানান।—সারা বুল

আমরা এখানে হিসাব করে দেখেছি ক্যাম্পানিয়া (কুনার্ড লাইন) নিউইয়র্ক থেকে পরশু, ১৩ই সকাল দশটায় ছাড়বে। আমাদের ধারণা, সস্তাতম স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে অন্য যে-কারো চেয়ে আপনার ক্ষমতা বেশী।

আর একটি নিবেদন করতে পারি কি?—আপনার পক্ষ থেকে টেলিফোনে যদি কেউ জেনে নেয় যে, আগামীকাল, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠে বসতে পারি কি না, এবং সেই খবরটি যদি টেলিগ্রাফ করে কেউ আমাদের জানিয়ে দেয়! মিসেস বুল স্থির করেছেন, ট্রেনে বিকাল তিনটে কি চারটেয় আমার সঙ্গে নিউইয়র্ক যাবেন ; তারপরে স্টেশন থেকে গাড়ি করে মারী হিল হোটেলে ; সেখানে

আমার মালপত্রের জন্য ওয়াগন নেবেন, জাহাজে উঠবেন আমার সঙ্গে, এবং যদি সম্ভব হয়, রাত্রিটা জাহাজেই কাটাবেন।

এ সমস্ত হতে পারে, এমন জানিয়ে যদি একটি টেলিগ্রাম এসে পোঁছায়, কী না কৃতজ্ঞ হব আমরা!

গভীর ভালবাসার সঙ্গে, এবং যে অসুবিধা ঘটাচ্ছি তার জন্য শত সহস্র দুঃখের সঙ্গে।"

পরদিন মিস ম্যাকলাউডকে—

"আগামীকাল সকালে...ক্যাম্পানিয়াযোগে বিদায়। মিঃ লেগেটকে তার করেছিলাম, তিনি আমার টিকেট কেটেছেন। তার এসেছিল শনিবার দুপুরে।...

জানি, তুমি আমার জন্য এই প্রার্থনা করবে যে, শেষ ক্ষণে আমি যেন মায়ের সেবায় লাগতে পারি। আহা আমার প্রিয় জননী!

তাঁর কাছে যেতে পারছি—তাতে গভীর শান্তি আর আনন্দ।"

১৬ জানুয়ারী জাহাজ থেকে একই জনকে—

"এই যাত্রায় সব কিছুই বিষাদের নয়। আমাকে আহ্বানের কারণটি দারুণ, নিশ্চয়ই, কিন্তু এই অপরূপ ব্যাপারটি তো রয়েছে—আমি যেতে পেরেছি—হয়ত সময়েই পোঁছব!"

যাত্রাশেষে কী ঘটল, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তা মিঃ লেগেটকে লিখে জানিয়েছেন মিসেস ওলি বুল ২৭ জানুয়ারীতে—

"গতকাল মার্গটের কাছ থেকে একটি তার এসেছে, শুধু লেখা : 'শান্তি!' তাহলে ছোট্ট মা-টি মার্গটকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রাণটি ধরে রেখেছিলেন, এবং মার্গট প্রার্থনা করতে পেরেছে কয়েকদিন!"

অন্তিম পর্বের বর্ণনা পাই নিবেদিতার দুটি চিঠি থেকে। একটি ম্যাকলাউডকে, অন্যটি ওলি বুলকে লেখা। মৃত্যুর বর্ণনায় নিবেদিতার লেখনী চিরদিনই গভীর রসময়। আর এখানে তো ঘনিষ্ঠতম মর্ত্যবন্ধনের ছেদ! তথাপি বৈরাগ্যশান্ত সুর। নিবেদিতার সঙ্গে একদা তাঁর মায়ের সংঘর্ষ হোত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। খৃীস্টীয় যাজকের পত্নী, পুত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন দিনে দিনে। তিনিই শেষ ক্ষণে আকাঙ্ক্ষা করলেন 'ভারতীয় মৃত্যুকে!' অমোঘ প্রভাব বিবেকানন্দের!

৩০ জানুয়ারীতে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি :

"গত মঙ্গলবার সকালে মা মারা গেছেন—তখন নিম আর আমি শুধু ছিলাম তাঁর কাছে। আমি চাপাস্বরে বললাম, 'হরি ওঁ!'—যাতে তাঁর কানে সেই হয় শেষ শব্দ! ঈশ্বরের করুণার শেষ নেই—ঠিক সময়ে পোঁছতে পেরেছিলাম। বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, এখন তিনি যাচ্ছেন 'পূর্ণ তৃপ্তি' নিয়ে। ২৪ ঘণ্টা একত্র ছিলাম আমরা, আমি দেখলাম—তাঁর সমস্ত আত্মা ফিরল পরজীবনের দিকে। শুক্রবার সকাল থেকে মোটামুটি সারাক্ষণ ওষুধে নিঃঝুম ছিলেন।

শেষ যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা তিনি বলেছিলেন, তা হল 'ভারতীয় মৃত্যু' হচ্ছে

আমার। আমরা ভাবলাম, তিনি অগ্নিসংকার চাইছেন, যা পূর্বেও চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে তাঁর সে ইচ্ছা পালিত হল। আমাদের পারিবারিক যাজক সংকারমন্ত্র পড়লেন—আহা, কী সুন্দর ভাবে! একমাত্র এই পরিবর্তন করেছিলেন—

'Commit her body to the *fire,* in the sure and certain hope of the resurrection of the body.'

এ'র শরীর অর্পিত হোক **অগ্নিতে,** এই স্থির-নিশ্চিত প্রত্যাশায়—পুনরুত্থিত হবে দেহখানি।

কী আনন্দ হল শুনে, কারণ ঐ অর্থে তিনি ইতিমধ্যেই পুনরুত্থিত হয়েছেন ; যে-'দেহবস্ত্রখানি' আমরা সরিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে (পুনরুত্থানের) ঐ দেহের কোনোই সম্পর্ক নেই।

তাঁকে হারিয়ে কত না হারিয়েছি! তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আর কিছু চাইবার হেতু নেই। এখন একমাত্র কাজ, যত দ্রুত ও নীরবে সম্ভব ভারতে ফিরে যাওয়া। **বুঝতেও পারিনি** কতখানি গুরুত্ব নিয়ে তিনি জীবনের ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন! এখন দেখছি, তাঁর উপস্থিতি কত জিনিসের মূলে। কিন্তু তিনি, প্রিয় ছোট্ট মা-টি আমার, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহদিন পেয়েছিলেন। কী সুখী, একেবারে শিশুর মত—নিশ্চয় এখন তাই হয়ে উঠেছেন! কত উদার ছিলেন, প্রেমে পূর্ণ, নিঃস্বার্থপর। এখন তিনি এমন সত্তালোকে পেঁছেছেন, যেখানে বিরাট প্রেমের তরঙ্গ তাঁর উপর ভেঙে পড়বে, উন্নীত করবে তাঁকে, স্থাপন করবে সমুচ্চ তরঙ্গচূড়ে।

পুণ্য! পুণ্য! পুণ্যপ্রাণ! শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

মিসেস ওলি বুলকে লেখা ৪ ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে মৃত্যুক্ষণের আরও বিস্তারিত বর্ণনা :

"'সূর্যের একটি কিরণরেখা ছড়িয়েছিল, আমাদের প্রত্যেককে—সকলকে—সেবা ও আশীর্বাদ করতে',—তোমার এই কথাগুলি কী সুন্দরভাবে মায়ের বিষয়ে ভাব-প্রকাশ করেছে! আহা, আমার পেঁছানো তাঁর কাছে কতখানি না হয়ে উঠেছিল! মিঃ অ্যাডামস যা বলেছিলেন, তা যেন আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল। নিম বলেছে, আমি যে ঠিক সময়ে পেঁছতে পেরেছিলাম, এর পরে সে আর কখনো ঈশ্বর-করুণায় অবিশ্বাস করতে পারবে না। তোমার উপস্থিতি বড়ই চেয়েছিলেন—সেকথা প্রায়ই বলতেন।...প্রার্থনাঘরে শান্ত প্রহরটির জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ আমি জানি, তুমি তাঁকে সাহায্য করেছিলে। কত না মনে হয়, অপর জীবনের মধ্যে জন্মলাভ এই পৃথিবীতে জন্মলাভের মতই ব্যাপার—প্রেম ও প্রার্থনা তাতে বহুল সহায়তা করে।

নিম খুব শোক পেয়েছে। পুত্রশোকের মত বেদনা। আর্নেস্ট ও রিচ—এই দুজনই ছিল শুধু কফিনবাহক—এখানে ও অগ্নিসংকার স্থানে। তাঁর বিষয়ে 'ভাইকারের' কত ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সুকোমল আন্তরিকতা।*

* মায়ের অগ্নিসংকার অনুষ্ঠান যে খ্রীস্টান যাজক পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর উদারতার জন্য নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। ম্যাকলাউড ও ওলি বুল, দুজনকে লেখা চিঠিতেই তাঁর বিষয়ে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। প্রায় দেড় বছর পরে অক্সফোর্ডের বিখ্যাত

শেষ সন্ধ্যায়, শেষের শিহর যখন দেখলাম, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করলাম—এ'কে তুলে নাও করুণা করে, যত শীঘ্র সম্ভব, মধ্যরাত্রির আগেই। তারপরে ভাবলাম, প্রার্থনা তো করেছি, এখন আর কিছু চাওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে বা অন্য কারো কাছে ; অপরপক্ষে 'পরম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যাশা' করতে হবে—যা শ্রেয় তাই তাঁরা করবেন এ'র জন্য। আরও দেখলাম, আমার প্রার্থনার পরে তাঁরা যা-কিছু শ্রেয় বলে স্থির করবেন, তাকেই বরণ করতে হবে।

সকালে যখন তাঁর কাছে গেলাম, দেখি শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে। নিম বলল, পাঁচটা নাগাদ এমন হতে শুরু হয়েছে।

প্রাতরাশে গেলাম, যদিও মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যাওয়া কঠিন ছিল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম, তৎক্ষণাৎ নিমকে ডাকলাম।

কিন্তু আর্নেস্ট যতক্ষণ না গিয়েছে এবং নিম আর আমি শুধু তাঁর কাছে আছি, ততক্ষণ মৃত্যুলক্ষণ দেখা দেয়নি। তারপর শেষের শুরু। আহা—তিনি যা চেয়েছিলেন, ঠিক সেই জিনিসটি সর্বাংশে, একেবারে আক্ষরিকভাবে যেন ঘটে গেল! বলে সেকথা বোঝানো যাবে না।

আমি সাক্ষাৎ অনুভব করলাম—স্বামীজী এসেছেন—এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দ্বার তিনি নিজে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। আমি চাপা স্বরে বললাম—'হরি ওঁ!'—যেন তাঁর কানে পৃথিবীর শেষ শব্দ হয় ঐগুলিই! এত স্তব্ধ-গভীর আমরা, এত সুগম্ভীর, মৃত্যুর অপূর্ব নিরোধের তীব্রতা আমাদের এতই অভিভূত করে ফেলল যে, চোখের জল বা তেমন সব-কিছু আবেগ স্তম্ভিত হয়ে রইল, ছেয়ে গেল অনুপম শান্তি আর আনন্দ, ঊর্ধ্বলোকের বস্তু যা—সারাদিনের জন্য।"

৪২ বছর বয়সে নিবেদিতা তাঁর ৬৪ বছরের মাকে হারালেন। ৩২ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন মা, আরও ৩২ বছর পরে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য তাঁর আত্মা ঊর্ধ্বপ্রয়াণ করল। ঐ ৩২ বছরের বৈধব্য কী নিয়ে কাটিয়েছিলেন, নিবেদিতার চিঠিতে তারই কথা (৪.২.১৯০৯)—

"মা আমাকে বাবার সব-কটি উপদেশ-ভাষণ রিচ ও তার সন্তানদের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে- বলেছিলেন।...বাবার ভাষণগুলি অপূর্ব—একজন কবি যেন তাঁর হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের জনগণের স্থূল মস্তিষ্ক কিন্তু প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উপরে। এগুলো যে পড়তে হল তার জন্য খুবই আনন্দিত। সেইসঙ্গে এই কথা ভেবে বুকে আঁচড় লাগল—বেঁচে থাকতে মা কতখানি সুখ পেতেন এগুলি থেকে!

ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ চেইনীকে লেখা চিঠিতে (১৭. ৪. ১৯১০) পুনশ্চ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন—

"আপনাকে কখনো বলা হয়নি, গত বছর যখন মা মারা গেলেন দূর ইয়র্কশায়ারের ছোট 'প্যারিশে', সেই সময়ে আমাদের যাজকের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা আমাদের। তাঁর নাম, বার্কলি ই আর। তিনি আপনার অধীনে ছিলেন, সেইসঙ্গে অক্সফোর্ডের প্রভাবও পেয়েছেন; তাঁর মন এতই প্রশস্ত—সহায়ক—সুন্দর। আপনি গভীর আনন্দ পেতেন যদি দেখতেন তাঁর মানসিক প্রসারতা কিভাবে কাজে ফলবতী হয়েছে এবং শুভকর হয়েছে আমাদের সকলের পক্ষে।"

১৮৭৫ বা ১৮৭৬ সালের ভারতীয় দুর্ভিক্ষের উপরে লিখিত একটি ভাষণ পেয়েছি, সেটি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে।

এই ভাষণগুলি মায়ের কাছে হৃদয়ের সামগ্রী, যাদের ধারণ করে তিনি তাঁর অপূর্ব বৈধব্য যাপন করেছেন।"

মায়ের মৃত্যুদিন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহদিন বলে মনে হয়েছিল নিবেদিতার কাছে। ডেভনশায়ারে পিতা সমাহিত, সেখানে মার ভস্ম স্থাপন করতে নিবেদিতা গেলেন—

"পিতার সমাধিতে মায়ের ভস্ম স্থাপন করবার জন্য ডেভনশায়ারে গিয়েছিলাম মে ও আর্নেস্টের সঙ্গে। **ইস্টার ইভের দিন** সে কাজ করা হয়েছে, সুন্দর নয় কি? স্থানীয় লোকজনই সে কাজ করেছে, মাকে সম্মান জানাতে। সুতরাং তাঁরা দুজনই এখন একই বিশ্রামস্থানে, পাইনঘেরা জায়গাটিতে। আমরা যেন অনুভব করেছিলাম—তাঁরা আবার তাঁদের তরুণ জীবনে ফিরে গেছেন। আহা—হায়! কত অধৈর্য আর অবহেলার স্মৃতিকে বেদনাশ্রুর সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে। তোমার কাছে যেন কখনো দুষ্টু না হয়—হতে দিও না কখনো!" (ম্যাকলাউডকে লেখা; ৫.৪.১৯০৯)

এর পরে অবশিষ্ট রইল শুধু স্মৃতির উদাস রোমন্থন। অধ্যাত্মরহস্যময় ভাষায় অনির্বচনীয়ের প্রকাশ চেষ্টা। পর পর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করে যাচ্ছি :

বোন মে-কে লেখা, ১৫.৫.১৯০৯

"মার স্মৃতি 'শান্ত স্তব্ধ'—এই ভাবটি আমাকে অনেকখানি শান্তি দিয়েছে, কারণ আমার মনে হত তা যেন সঞ্চরমান। তোমাকে বলেছি কি—সংবাদটি যখন সেই সকালে ওলিয়ার কাছে পৌঁছেছিল—সে তারই প্রতীক্ষায় ছিল! খুব ভোরে তার ঘুম ভেঙে যায়, তার মাথার দিকে কে যেন দাঁড়িয়ে, জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সরে যায়—'বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।' ওলিয়া আধো তন্দ্রায় স্বপ্নে শিশুকে বলল, 'সিলভিয়া, ও একটা অশরীরী আত্মা।' কিন্তু শিশু বলল, 'না, না, মানুষ।' ওলিয়া বলল, 'না অশরীরী! সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে পুরোপুরি জেগে উঠল, ব্যাপারটা মনে এতই প্রভাব রাখল যে, সে উঠে ঘড়ি দেখল, তখন তিনটে বাজতে পনেরো। ব্যাপারটা স্বপ্ন হতে পারে, একথা কিন্তু পরেও তার মনে হয়নি।

সুতরাং প্রিয় বোনটি, আমি অনুভব করছি, মা তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করার পরে আমরা যেন আমাদের পরম প্রিয়ের নিশ্চিত বার্তা পেয়েছি। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রা—না, তা তো নয়—এ তো শুধু বর্তমান থেকে চিরন্তন প্রেমে নিমজ্জন।

সুইডেনবরী আমাকে খুবই সান্ত্বনা দিয়েছে। আর্নেস্টও যে পছন্দ করেছে, তার জন্য খুবই আনন্দিত। কারণ সুইডেনবরী অনুভব করিয়ে দেয়—যবনিকার এদিকেই যত যাতনা; আর কেউ যখন তা অনুভব করে তখন প্রিয়তম মানুষের মৃত্যুতে পর্যন্ত বেদনাদংশনটুকু থাকে না। হায়, পূর্ণ দিব্য সুখে অবস্থিত কাউকে ভালবাসতে যে আমরা প্রায়ই অভ্যস্ত নই! মিঃ স্টেডের লিপিটুকু তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, আশা করি রক্ষা করবে।...আমাদের প্রিয়তম মৃতের বিশ্রাম কী সুপবিত্র!

সে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য গভীর উদ্বিগ্ন আমি। সে শান্তি থেকে মাত্র কয়েক মুহূর্তের যাতনাপূর্ণ চৈতন্যে তিনি অবতরণ করুন আমাদের আহ্বানে—তাও আমি সহ্য করতে পারব না। এক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবনা কী সত্য!—একটি অস্তিত্ব-প্রকৃতি আছে, যাকে এইসব ক্ষণে নিজেদের মধ্যে অনুভব করতে পারি—যেখানে সবই আনন্দ, যেখানে বিচ্ছেদের কল্পনাও অচিন্তনীয়, মৃত্যুতেও যেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। **এখানেই** আসল সান্ত্বনা—সেই পরমে, অভেদে, নিত্যে—শান্তি থেকে কাউকে টেনে জাগানোয় নয়। 'এই অসত্য হইতে আমাদের সেই সত্যে লইয়া যাও।'"

১ জুলাই, ১৯০৯, একই জনকে

"অগস্টের শেষে কয়েক মুহূর্ত তুমি এবং আমি আমাদের বড় ভালবাসার মায়ের পাশে উপস্থিত ছিলাম—মুহূর্তগুলি আমার নিত্য মনের সাথী। এ পৃথিবীতে আর বেশী যন্ত্রণা মাকে সইতে হয়নি, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞ। প্রিয় বোনটি, আমি হাজির হলে তিনি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলেন, একথা সত্য নয় মোটেই। ঐ দিন-গুলিতে আমরা দুজনই একসঙ্গে তাঁর মনে ছিলাম।...মৃত্যু এল—কী অপরূপ! জীবন থেকে তাঁর প্রস্থানের সেই মুহূর্তকয়টিতে তিনি যতখানি জীবন্ত, এমন আর কখনো ছিলেন না।"

মায়ের মৃত্যুর এক বছর পরে লেখা চিঠি (৬.১.১৯১০) একই জনকে

"তোমার হৃদয়ভাব খুবই অনুভব করছি, কিন্তু তার কাছে হারলে চলবে না। যখন আমরা ভাবি যে, আমাদের প্রিয়জনটির প্রভাব সর্বদিকে বুঝি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে, তখন ঐ ধরনের অনুভূতি তীব্রতর আকারে হাজির হয়। এক্ষেত্রে কী বলতে পারি বলো? শুধু বলি, পরিবর্তন ঘটছে ভালোর জন্যই, তাঁর অনন্ত ভালোর জন্য, আর এর মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে যা আমরা একদিন খুঁজে পাবই যদি ধৈর্য ধরি। জীবন সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু অনন্ত অর্থে পূর্ণ, সুখ ও দুঃখকে যা নিজস্ব যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে।

যখন এই চিঠি তুমি পাবে, সেই শেষ দিনগুলি পুনশ্চ যাপিত হবে পৃথিবীর দুই প্রান্তে, এবং গত বৎসর যা শান্ত ও উন্নীত মনে হয়েছিল, এখন মনে হবে তা নিদারুণ।...প্রিয় বোনটি, শোনো, আমার কাছে সব কিছুর সার অর্থ হচ্ছে : প্রতিটি সম্পর্কবন্ধনই মূল্যবান, যেহেতু মৃত্যুচ্ছায়াবিস্তার যে-কারো উপরই হতে পারে। আহা, মাকে আবার যদি ফিরে পাই, তাঁর মূল্য কত না বড় হয়ে ধরা দেবে! তাই এসো—আমাদের চারপাশের সবাইকে ভালবাসি, পূজা করি। আমাদের আত্মার উদ্যান থেকে মানবিক সম্পর্কের শ্যামল ভূমিখণ্ডগুলি এখনো শুকিয়ে যায়নি একেবারে। আমাদের সকলেরই উপর সূর্যকিরণ ছড়াবে, হাঁ, ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ তা ঘটবে, যে-পর্যন্ত না আমরা ব্যাকুল ভালবাসার এবং সেবার অনন্ত আকৃতির শিক্ষা নেব, যাতে শোক করবার আর কোনো কারণ থাকবে না, এবং এই সব কিছু থেকে উড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করে দেবে—ঈশ্বরের দিকে পাখা মেলে দেওয়ার জন্য।

আবার আমরা মাকে দেখব, **দেখবই,** তুমি এবং আমি দুজনই। তাঁকে তখন ভালবাসব, সেবা করব, অতীতের সেই নিদারুণ ক্ষোভ ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে নয় কিন্তু। আ—হা! কী সে পবিত্র ভালবাসা ও আত্মিক উদারতা তিনি দিয়ে গেছেন! তাঁর দোষগুলি সবই বহিরঙ্গ, অন্তরে তাঁর তুল্য কেউ নয়। ঈশ্বর রক্ষা করুন তাঁকে, সুখী করুন—যেখানে তিনি আছেন; তিনি আমাদের চিরদিনের—চিরদিনের—প্রেমপাত্রী।"

৫ মে, ১৯১০, একই জনকে

"আমি নিতান্ত নিশ্চিতভাবে জানি—মা, তুমি এবং আমি আবার একত্র হব। খুবই ভরসা করি যে, অন্য জীবনে আমি তোমার উপর বোঝা চাপাবো না, যা নিতান্ত স্বার্থপরের মত এ জীবনে করেছি। সত্য সত্যই আশা করি তা। সত্যই আশা করি যে, আমাদের ছোট্ট মা-টির উপর ভালবাসা উজাড় করে দেব। যাই হোক না কেন, আমি স্থির নিশ্চিত—**সাহায্য তিনি পাবেন,** কেননা আমাদের দ্বারাই আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে; তিনি তৃপ্ত হবেন যা হয়েছেন তা হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন বলে; তুমি আর আমি তৃপ্ত হব তাঁর জন্য যা করতে চাই তা করার সামর্থ্য পেয়েছি বলে। জীবনের নবলব্ধ স্বাধীনতা ও মহিমার আলোকে তখন দৃষ্টিপাত করতে পারব। এ জীবনে সকল বৃহৎ ব্যাপারে তিনি কী যথার্থ মহিমা ও মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন, এবং ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিতে কী অসহনীয় স্বভাবের!"

১২ জুন, ১৯১০, একই জনকে

(বদরীনারায়ণ যাত্রাপথে লিখিত)। "প্রতি রাত্রে মায়ের স্বপ্ন দেখি। কত সকরুণ স্বপ্নগুলি! মৃতের জন্য প্রার্থনার যোগ্যভূমি নাকি বদরীনারায়ণ! তোমাদের সকলের কথা কত মনে পড়ে!"

মৃত্যুর পরে মায়ের সঙ্গে মিলিত হতে এত উৎকণ্ঠিত ছিলেন নিবেদিতা—তার জন্য বেশী দেরী করতে হয়নি তাঁকে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর দেহান্ত হল তাঁর। 'ভারতীয় মৃত্যু'ই হল। ভস্মীভূত করা হল মরদেহ। ভস্মাবশেষের কিছু অংশ পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংলন্ডে, পরিবারবর্গের কাছে। এবং সেই চিতাভস্ম সমাহিত করা হয়েছিল ডেভনশায়ারে পাইনঘেরা সেই জায়গাটিতে, যেখানে মাত্র আড়াই বছর আগে নিবেদিতা নিজে গিয়ে মায়ের চিতাভস্ম স্থাপন করে এসেছিলেন পিতার সমাধিপার্শ্বে।*

---

* নিবেদিতার ভস্ম ইংলন্ডে পাঠানো সম্বন্ধে মূল্যবান সংবাদ আছে লিজেল রেম'কে লেখা মিসেস উইলসনের ২৯ অগস্ট, ১৯৩৯-এর চিঠিতে—

"নিবেদিতার চিতাভস্ম সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন। না, তা ইংলন্ডে পাঠাবার জন্য আমি অনুরোধ করিনি। মনে হয়, ডাঃ বসুর উদ্যোগেই তা হয়েছিল! একটি কথা মনে রাখবেন, নিবেদিতা আমাদের পিতার স্মৃতিকে পূজা করত। ১৯০৭ সালে মিসেস বুল ও বসুদের সঙ্গে নিয়ে সে ডেভনশায়ারে গিয়েছিল—পাইনগাছের আশ্রয়ে যে-প্রিয়

তারিখটি ছিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর। নিবেদিতার প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীর পূর্বদিন। সমাধিকৃত্য করিয়েছিলেন গ্রেট টরিংটনের কংগ্রেগেসন্যাল চার্চের 'মিনিস্টার' রেভাঃ এডওয়ার্ড বার্নস্টীন। নিবেদিতার পিতা ওখানেই 'প্যাস্টর' ছিলেন। চার্চের পক্ষে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। "মর্ত্যজীবনে সিস্টার নিবেদিতা নামে কথিত যে-আত্মা অল্পদিন পূর্বেও এই স্বল্পাবশিষ্ট ভস্ম-রাশিকে জীবন্ত করে রেখেছিল, সেই আত্মার প্রভায় পূর্ণ ছিল স্থানটি।"

নিবেদিতার সমাধিকৃত্য একবার হয়েছে ভারতে, আবার হল ইংলণ্ডে। প্রথমবার বরণ-করা দেশে, দ্বিতীয়বার জন্মভূমিতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জীবন্ত যোগসূত্র যিনি ছিলেন, তাঁকে সম্মান জানাতে মিলিত হল দুই মহাদেশ। পঞ্চভূতে বিলীন হলেন নিবেদিতা। ভারতে চিতা যখন জ্বলেছিল, 'তেজ' তাকে গ্রহণ করেছিল, সূক্ষ্মতর অংশ ছড়িয়ে গিয়েছিল 'মরুৎ'-এর মধ্যে, এবং তা মিশিয়ে গিয়েছিল 'অপ্'-এ, অবশিষ্ট অংশ টেনে নিল 'ক্ষিতি'—ভারতে ও ইংলণ্ডে, আর সব কিছু রইল 'ব্যোম'-এর উদার আশ্রয়ে।

নিবেদিতা তাঁর পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে চিরতরে সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে, সমাহিত হয়ে রইলেন।

কথাগুলি আমার নয়। এমন একজনের*, যিনি ম্যাগী নোবলকে তার বাবার কাছে গ্রেট টরিংটনে দেখেছিলেন, তখন থেকে জানতেন, সেই ছোট্ট মেয়েটিকে—হাসিতে খুশীতে প্রাণোচ্ছলা মেয়েটিকে। পরেও মেয়েটিকে দেখেছেন, ভারতের কাজে যখন সে জীবন উৎসর্গ করেছে। তারও পরে, যখন সে ফিরে এসেছে পিতার সমাধিক্ষেত্রে মাতার ভস্ম সমাহিত করতে। তারও পরে, যখন সে এসেছে—সে আসেনি, এক মুষ্টি পবিত্র ভস্ম এসেছে পিতা ও মাতার সমাধিমূলে স্নেহাশ্রয় লাভের জন্য।

O Krishna, Thou loving shepherd of the people,
Buddha, Lord of infinite compassion,
Jesus, Thou Lover and Saviour of the soul,
May Ye and all the nameless Masters of the spirit,
Receive and save this soul!
Keep her in Thine own presence, O Lord God,
And let light perpetual shine upon her.

ভূমিতে পিতা সমাহিত আছেন, সেই স্থানটি দেখাবার জন্য। ১৯০৯ সালে আমার সঙ্গেও সেখানে সে যায় মায়ের চিতাভস্ম সমাহিত করতে। ঐ স্থানটি তার কাছে কী, কি সুখ-স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে—সেসব কথা সে নিশ্চয় ডাঃ বসুকে বলেছিল। কিন্তু মনে হয় না, ওখানে নিজের ভস্ম-সমাধির ব্যাপারে সে কোনো গুরুত্ব দিয়েছিল। অবশ্য আমি তার পরম প্রিয় পবিত্র স্থানটিতে তার ভস্ম সমাহিত করিয়েছিলুম। আমার কিন্তু সর্বদা মনে হয়েছে, গঙ্গার মুক্তি-প্রবাহকেই সে ভালবাসত।"

* লেখকের নাম জর্জ এম ডো। ডেভনশায়ারের গ্রেট টরিংটন থেকে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর এটি পাঠানো হয় এবং প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১২, ডিসেম্বরে।

বোন

মে, মার্গটের একেবারে কোলে-পিঠের বোন। শৈশবের খেলাধুলা একই সঙ্গে; পিতার মৃত্যুর পরে অবস্থাবিপর্যয়ে একই বোর্ডিং স্কুলে প্রেরিত; তারপরে কর্ম-জীবনে দুজনই শিক্ষয়িত্রী। নিবেদিতা ভারতে চলে যাবার পরে নিবেদিতার স্কুলের ভার তাঁকেই নিতে হয়। নিবেদিতার পরবর্তী জীবনেও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বজায় ছিল। স্বামীজীর প্রেরণার অধীন মে-ও হয়েছিলেন এবং নিবেদিতা-গোষ্ঠীর প্রায় সকলের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। বসু-পরিবারের সঙ্গে এঁর এমনই ঘনিষ্ঠতা ঘটে যে, জগদীশচন্দ্র শেষ জীবন পর্যন্ত গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে তা মনে রেখেছেন। এঁকে লেখা জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি আমরা পরে জগদীশ-প্রসঙ্গে হাজির করব।

বোনকে এবং বোনঝিদের নিবেদিতা নিয়মিত চিঠি লিখেছেন। বড় বোনঝি মার্গটকে নিবেদিতা ধর্মকন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের কাছে নিবেদিতার চিঠিগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক, সাধারণের ভালোলাগার বস্তু তাতে নেই—একথা সিসিলি উইলসন (মেজ বোনঝি) লিজেল রেমঁকে লিখেছিলেন। সেসব চিঠি তাঁরা দেননিও। মে উইলসনকে লেখা অল্প কয়েকটি চিঠি আমরা পেয়েছি। এবং মে বা তাঁর কন্যাদের প্রসঙ্গ ম্যাকলাউড বা ওলি বুল প্রভৃতির কাছে লেখা চিঠিতে পাচ্ছি। এইসব চিঠিপত্র থেকে অংশ নির্বাচন করে উপস্থিত করব। এখানে নিবেদিতাকে নিতান্তই ঘরের মেয়ে রূপে পাব, জীবনীকারের কাছে এই একান্ত মূর্তিখানি বড় হৃদ্য, সেইসঙ্গে নিবেদিতার আদ্যন্ত আদর্শবাদিতাও এখানে দেখা যাবে, কারণ লোকলোচনের অন্তরালের জীবনেও যদি অম্লান থাকে মহত্ত্ব, সে মহত্ত্ব সহজাত, আরোপিত কিছু নয়।

নিবেদিতা যখন স্বামীজীর কাজের দায় গ্রহণ করে ভারতে চলে এলেন, তখন তাঁর বোন কেবল বিচ্ছেদের দুঃখ-সাগরে ভাসলেন না, উদ্বেগের চাপা আগুনেও পুড়তে হল তাঁকে, কারণ সংসারের দায়িত্ব পড়ল তাঁর উপরে, বিশেষতঃ নিবেদিতার স্কুলের দায়। এই দায় আরও দুর্বহ বোধ হওয়ার কারণ, ইতিমধ্যেই মে নিজ জীবনের পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছিলেন—তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন!

বোনের উপরে দায় চাপিয়ে ভারতে চলে এসেছেন বলে নিবেদিতারও মর্মপীড়নের সীমা ছিল না। তার রূপ কয়েকটি চিঠিতে দেখতে পাই।

নেল হ্যামন্ডকে জুন ৫, ১৮৯৮-তে লিখেছেন—

"যে-সব খবর দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ। আমার নিম, বেচারা, সে যে নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা জানি, আর তা আমারই দোষে। কিন্তু আমি অতি—অতীব নিশ্চিতভাবে অনুভব করি যে, তার ভারকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না যাতে তা বওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য পালন করার সুযোগ আমি পাব, তাও বিশ্বাস করি। ইতিমধ্যে, যাঁরা তার প্রতি ভালবাসা-ভরা বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা ছোট কথা। তোমাদের করুণাপূর্ণ প্রিয় হৃদয়টিকে ধন্যবাদ জানিয়েছি—সারাক্ষণই।"

অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে, ভারতের কাজ ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার

কথা পর্যন্ত নিবেদিতা ভাবতে থাকেন। ম্যাকলাউডকে ৩০ জানুয়ারী, ১৮৯৯, লিখেছেন—

"একটা বিচিত্র কথা বলবার আছে। এবছর হয়ত সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হতে পারে। সত্যই, ব্যাপারটা অনিবার্য মনে হচ্ছে। নিমের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে কার্যতঃ আমাকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে—পরিশ্রম আর চিন্তায় সে ভেঙে পড়েছে, এ অবস্থায় বিয়ে করবে কি করে? মনে হচ্ছে, এ বছরই সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু স্কুলের দায় ঘাড়ের উপরে—স্কুলের যা অবস্থা তাতে মনে হয় যেন তাকে অনির্দিষ্টকাল এইভাবেই চলতে হবে। এক্ষেত্রে একটি উত্তরই আমার জানা আছে। তার জীবন সব সময়ই আমার জীবনকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এখন আমার পালা তাকে পথ ছেড়ে দেবার—অবশ্যই দিতে হবে! যদি সে বিয়ে করতে চায়, ভিন্ন কোনো অভিপ্রায় তার না থাকে, তাহলে অবশ্যই বাড়ি ফিরে গিয়ে পুরনো স্থান নিতে হবে আমাকে। আর এখানকার সকলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝবেন, এই সম্ভাবনায় কিছুটা শান্তি পেয়েছি। সর্বদিক দেখে আমি বলতে পারি, এখানে এসে ভালই করেছি, কোনো সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু সেইসঙ্গে আমার বোনকেও বলি দিয়েছি আমি—সেটা নিদারুণ। তবে তার (বোনের) অভাব-পূরণের ব্যবস্থাও আছে, তাও ভুলিনি। সুতরাং বৃথা অনুতাপে সময়ক্ষেপ করব না। ঈশ্বরকে **শুধু এইকথা বলি** আমার বোনের সুখকে নষ্ট করবার পথে একটা সীমার বাইরে **তাঁর জন্যও** যেতে পারি না। তাছাড়া আমি ঈশ্বরের কাছে কোনো-ভাবে প্রয়োজনীয় একথা ভাবা আমার পক্ষে খুবই অহঙ্কারের জিনিস নয়কি! কিন্তু স্বামীজীকে আমি এ বিষয়ে কিছু বলিনি, যাতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে, যা হৃদয়কে উপড়ে ফেলা ছাড়া কিছু নয়, আমি অনিশ্চিত-মন হয়ে পড়ি।......হায়, নিমের বরাতে না জানি কি আছে! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পারিবারিক গর্ব এমনই যে, বাইরে থেকে (ভিতরের ব্যাপারের) চিহ্নমাত্র দেখতে পাবে না। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে আমাকে কাজ করতে হবে; শুধু তাকে লিখে দেব, আমি ফিরে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছ, বোঝা জমিয়েছি আমিই, সে ভার তাকে বওয়াতে পারি না অবশ্যই।"

ম্যাকলাউডকে, ২৪ ফেব্রুয়ারী, লেখা—

"নিমকে অবশ্যই লিখো। তাকে উৎসাহিত করো। কেন জানি না মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে তার সংগ্রাম অতি কঠোর। কিছু একটা করা দরকার। তবে এও জানি, যে-মুহূর্তে সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় গা ভাসান দেবে, তখন ভয় থাকবে না, সংগ্রামও শেষ। নিম প্রভুরই হাতে আছে, জানি, জানি তা, শুভ হবে সব কিছুরই।"

নিবেদিতার মানসিক কষ্টের কথা জেনে মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন স্কুলের ব্যাপারে, যা নিমকে ভারমুক্ত করেছিল। কৃতজ্ঞ নিবেদিতা ১৫ মার্চ ১৮৯৯, মিসেস বুলকে লিখলেন—

"এই অপূর্ব মুক্তির বার্তা আমার কাছে এল, যা পাওয়ার অধিকার আমার নেই, এর জন্য তোমাদের দুজনের (ওলি বুল ও ম্যাকলাউড) কার কতখানি ভূমিকা জানি না, কিন্তু তোমার হাত আছে নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে আমার অনুভূতি কত গভীর তা তোমাকে এখনি জানাতে চাই, ধন্যবাদ এখানে নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার।

যেন কবরের বুক-চাপা পাথর একটা সরে গেল—উপমাটি এ সপ্তাহে বারবার মনে উঠেছে।"

১৬ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—

"প্রিয়তমা য়ুম, আমাদের বাড়ির সংবাদের মধ্যে জোরালো সুখের সংবাদটি বেছে পাঠাবার জন্য কি ভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি, বলো। তুমি নিমকে ভালবাসো, সে আমার থেকে আলাদা বলেই ভালবাসো—স্বর্গীয় কথা।"

পুনশ্চ ম্যাকলাউডকে, ৫ এপ্রিল তারিখে—

"নিম সম্বন্ধে তোমার খোলাখুলি মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদও যথেষ্ট নয়। তোমার কাছে সে যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। বাস্তবিক তোমার শক্তির এ এক প্রমাণ। আমার কাছে এত খোলা মন সে কখনো হয়নি। বেচারা নিম! —এই ভারকে সে এত দুর্বহ ভাবছে, তা ভাবতে ভয়ংকর লাগে। সে বিয়ে করুক বা না করুক, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যেখানেই থাকুক, স্বামীজীর কাজ করে যাবে। না করে পারবে না। যে অপূর্ব ক্ষণে আমার **কর্মফল-ভার** তুমি তার ঘাড় থেকে তুলে নিলে, সেই ক্ষণ থেকে তাকে তার নিজের ভার বইবার এবং নিজের সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি, আমার বিভ্রান্ত ভাবনা ও চিন্তার পাক থেকে তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমার দিব্য ক্ষমতায় তুমি বলতে পারো, বলেছও—এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা তার আছে। দুটো কি তিনটে চিঠিতে আমার ভাবনা-যাতনার চেহারা তুমি দেখেছ, সেগুলির বিস্তারিত উত্তর দেবার কষ্ট স্বীকার তুমি করবে না ভরসা করি।"

১৯ এপ্রিল, একই জনকে—

"মিষ্টি কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ, গত মেলে যা লিখে পাঠিয়েছ। সেই সঙ্গে নিমের চিঠি পুরে দিয়েছ।

শেষোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে আমার গভীর হৃদয়ানুভূতির কথা তুমি জানো, এ বিষয়ে কিছু বলা অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে, উপযুক্ত কিছু বলার আশা রাখি না। শুধু এই ভরসা করি, এবার কাজ করে যেতে পারব, যা তোমার বিরাট বিশ্বাসের মর্যাদা হয়ত সম্পূর্ণ নষ্ট করবে না।

মে'র কী ভাগ্য যে, সেই রাত্রিটি এবং রবিবার তোমার সঙ্গে কাটাতে পেরেছে! সে নিশ্চয় দারুণ খুশী হয়েছে! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি তোমাকে যেভাবে জানি, সে সেইভাবে তোমাকে জানার কিছু সুযোগ পেয়েছে।"

স্কুলের বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পরে মে-র বিয়েরও ঠিকঠাক হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ২ মে তারিখে নেল হ্যামণ্ডকে বোনের প্রতি 'মধুর ও সহৃদয় মনোভাব' দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নিবেদিতা মে-র মহত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন—"অনেক দিক থেকে সে আমার থেকে অনেক অনেক এগিয়ে আছে। তার সম্বন্ধে ভাবার সময়ে নিজেকে খাটো মনে হয়।" এসব কথা লেখার প্রয়োজন হয়ত এইজন্য হয়েছিল যে, মে'র সাদা-মাঠা আচরণের পিছনে যে উদার সহনশীলতা ছিল, তা প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যেত।

এর পরে স্বামীজীসহ নিবেদিতার ইংলণ্ড যাওয়া এবং নিম-এর বিয়েতে

যোগদানের সম্ভাবনা দেখা গেল। নিবেদিতা নিতান্ত আনন্দিত হলেন এই সম্ভাবনায়। এইবারই ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা শেষ বারের মত গৃহস্থকন্যার ভূমিকা গ্রহণ করবেন—বোনের বিয়েতে 'মেড অব অনার' হবেন। বিবাহ সমাপন পর্যন্ত এই সংক্রান্ত পত্রাংশ পরপর উদ্ধৃত করছি—

ম্যাকলাউডকে, মে ৮, ১৮৯৯—

"রাজা মধুর স্বভাবে, প্রদীপ্ত। আগামীকাল যাত্রার টিকেটের ব্যবস্থা করতে হবে।......তিনি (স্বামীজী) নিমের বিয়েতে হাজির থাকবেন ও আশীর্বাদ জানাবেন!!! যদি তোমার কোনো কথায় এ জিনিস ঘটে থাকে, আমি জানি তুমি সে-রকম কথা স্বতঃই বলবে, যাতে আমার বোনটি জীবনের ও হেন ঐশ্বর্য লাভ করে।"

একই জনকে, মে ২১, ১৮৯৯—

"নিম ও মাকে (যাত্রার কথা) বলো না। আমি চাইনা আমাদের যাত্রার কথা তারা জানুক, কেননা তাহলে বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ মনোযোগ না দিয়ে আমাদের জন্য ব্যস্ত হবে।"

একই জনকে, জুলাই ১৯—

"তোমার কাছ থেকে নিমের বিয়ের তারিখের কথা জানতে পেরে খুবই আনন্দিত। স্বামীজীর সঙ্গে যদি তার প্রণয়ীর কথাবার্তা বলার সুযোগ ঘটে ওঠে, কৃতজ্ঞ হব। স্বামীজী বলেছেন, সম্ভব হলে তিনি তা করবেন। অনেকদিন বাড়ি থেকে কোনো খবর পাইনি।"

একই জনকে, জুলাই ২১—

"নিমের বিয়ের দিন থেকে আমি সব কিছু পরিহারের ব্রত নেব। ভরসা করি, এজীবনে আর কখনো আমার জন্য নতুন গাউন তৈরী করার দরকার হবে না। অবশ্য যদি রিজলিতে যাই এবং তুমি চাও তাহলে তোমার ফ্রক পরে আমি লৌকিক সাজ করব। অন্যথায় আমি এক সাজে—একটি সাজেই! য়ুম, আমি এমন বড় নই যে, আমার অবশিষ্ট জীবনের পাঁচ মিনিট সময়ও ঐ একটি উদ্দেশ্য ভিন্ন ব্যয় করতে পারি।......

মিঃ স্টার্ডি লিখেছেন, তিনি ওয়েলশ্ চলে গেছেন। স্বামীজীকে বাসস্থানের জন্য উইম্বলডনে যেতে হবে, যে-পর্যন্ত না তিনি কর্মসূচী স্থির করেন। স্বামীজীর দলে তিন জন আছেন। তিনি লণ্ডনে থাকাই পছন্দ করেন। সুতরাং জানি না কি ঘটবে। অবশ্য আমি চাই, তিনি উইম্বলডন চলুন, কয়েকদিনের জন্য হলেও। কিন্তু নিমের বিয়ে পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ড থাকবেন, এমন আশা করার অধিকার আমার নেই।"

একই জনকে, অগস্ট ৩—

"সোমবার সকালে পৌঁছেছি। নিতান্ত অসময়ে হলেও মা, নিম, মিস প্যাসটন এবং দুই আমেরিকান মহিলা মিসেস ফাঙ্ক ও মিস গ্রিনস্টাইডেল-এর সাক্ষাৎ তখন পেয়েছি।

রাজা সোমবার এইসব বন্ধুদের সঙ্গে শহরে কাটিয়েছেন, এঁদের সান্নিধ্য দেবার জন্য। কিন্তু মঙ্গলবার খুব সকালে ফিরে এসেছেন, শেষ পর্যন্ত

উইম্বলডনকেই ভাল মনে করে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে দুবার দীর্ঘ কথালাপ ঘটে গেছে। নিম তাঁকে খুশী করেছে; রিচকে পছন্দ করেছেন তিনি।

নিম তাঁকে মনোরম ঘর খুঁজে দিয়েছে, স্টেশনের কাছে, তার চারদিকে সবুজ, এবং শান্ত পরিবেশ।......

ভবিষ্যতের কথায় নিম একেবারে চুপচাপ। তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে—সত্যই সুন্দর সে। তার সঙ্গে এবার আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়টি—একেবারে যা-তা—দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত চিন্তা বা অনুভূতি কিছু নেই—সহসা সব কিছু ঝাঁপিয়ে এল—আর সেও—সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতে কেঁদে উঠল। সে বলল—তার মনে হল যেন সমাধির ঢাকা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি।......

মিসেস গিবসন চলে গেছেন। কিন্তু নিম সিসেমে স্বামীজীকে আপ্যায়িত করার কোনো চেষ্টাই ত্যাগ করবে না।"

একই জনকে, অগস্ট ১২—

"গতকাল তিনি (স্বামীজী) জিজ্ঞাসা করলেন—আমেরিকা যাবার জন্য কবে তৈরী হচ্ছ?

—যখনি আপনি চাইবেন, স্বামীজী!

—কী? বোনের বিয়ে পর্যন্ত থাকতে চাও না?

—হাঁ, আমার তাই করা উচিত, আপনি কি বলেন?

—হাঁ, আরও এক মাস, তাই নয় কি?

নিম, সেণ্ট সারাকে প্রায় পূজা করে। তোমাকে বলে—'পরীর মত ধর্ম-মা।' সে বলে, সে আগে কখনো স্বপ্নেও সুসজ্জিতা সেণ্টদের কথা ভাবেনি। তোমার সবুজ ও পিঙ্গল ফ্রক এমন গায়ে হয়েছে—মহিমান্বিত ব্যাপার! আর শাদা ফ্রক—মহা মহিমান্বিত!—যদিও এখনো পরে দেখিনি।......

স্বামীজী গ্লাসগো থেকে অ্যালান লাইনে নিউইয়র্ক যাত্রা করছেন আগামী ১৭ই, বৃহস্পতিবার। তিনি চান ৬ই সেপ্টেম্বরে নিমের বিয়ের পরে যত শীঘ্র সম্ভব আমি যাত্রা করি।"

একই জনকে, অগস্ট ১৭—

"গতকাল সকালে করা আমার টেলিগ্রাম বলছে— স্বামীজী তোমাদের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁর শেষ কথা আমাকে—'যত শীঘ্র পার এসো।'......মে'র বিয়ে ৬ সেপ্টেম্বর। যদি আদেশ হয়, তার অব্যবহিত পরেই যাত্রা করতে পারি। নচেৎ আরও এক সপ্তাহ পরে, গ্লাসগো থেকে অ্যালান লাইনে যাত্রা।......

নিমের প্রণয়ী আমাকে খুশী করেছে। সে আচার্যদেবের চরণে নতজানু হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মা, নিম ও রিচ। অপরূপ!......

চমৎকার তোমার ফ্রকগুলি, বিশেষতঃ শাদা ফ্রকটি, যেটি বিয়েতে পরব।"

একই জনকে, সেপ্টেম্বর ৭—

"গতরাত্রে যাত্রা করার ঠিক দশ মিনিট আগে বহু-প্রত্যাশিত তোমার চিঠি এল, যাতে জানলাম রাজা পেঁৗছেছেন—কখন, কিভাবে—তাও। আমার হৃদয় শান্ত হল। ন'টা বেজে কুড়িতে আমি বাড়ি ছাড়লাম।

গতকাল অপরাহ্ণে নিমের বিয়ে হল। মিষ্টি নিম! অনুষ্ঠানপর্ব সমাধা করলেন

কাকা—খুবই সুখের হল যা—নিজেই ব্যাপারটা সাজিয়েছিলেন—অতি মনোরম ভাবস্পর্শ ছড়ানো ছিল যাতে। কাকা বললেন, এ কাজ করতে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে, কারণ নিমকে এত সুখী দেখাচ্ছিল, এবং সে একেবারেই কাঁদা-কাটা করেনি। সুন্দর নয় কি? যখন সে গির্জা-পার্শ্ব থেকে নেমে এল, সবাই চমৎকার গোলাপ আর পদ্ম ছুঁড়ছিল সামনে। তারপরে সকলে বাড়ি এলাম চায়ের জন্য, একত্রে কেক কাটার জন্য—মহা মজা হল তখন। সবাই বলল, নিতান্ত মধুর ও ঘরোয়া হয়েছে ব্যাপারটা। তবে তার জন্য কোনো কৃতিত্ব আমরা দাবি করতে পারি না, কারণ আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিয়ে, সুতরাং আমরা জানতামই না এক্ষেত্রে নিখুঁত ফর্ম্যালিটি কি!! যাইহোক, আমি বিশেষভাবে সুখে ও বিস্ময়ে ছিলাম, কারণ আমার কখনই মনে হয়নি—বিয়ে ব্যাপারটা কম-বেশী আমোদের জিনিস হয়ে উঠতে পারে।

যদি অ্যালবার্টার জন্মদিনে হাজির হতে পারি, আমি ঐ একই পোষাক পরতে চেষ্টা করব, তোমরা তাহলে দেখবে—কী দারুণ দেখতে হয়েছিল আমাকে! আর নিমের বিষয়ে—সব কথাই তোমাকে বলব। মা তোমাকে ডাকে কেক পাঠাবেন।......

আর্নেস্ট ও নিম নর্ম্যান্ডি গেছে, তাদের বাইসাইকেল নিয়ে।"

নিমের দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। তার সুখে সুখী বড় দিদি মিসেস বুলকে লিখেছেন ২৬ ডিসেম্বরে—

"নিমের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। বেটকে লেখা তার চিঠি বেট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাতে নিম লিখেছে—'আমি কত সুখী সেকথা লিখে জানাতে চাই। সারা পৃথিবীতে আমার স্বামীই সেরা বলে আমার মনে হয়। যত তাকে জানছি, ততই ভালবাসছি।' সুতরাং প্রিয় মিসেস বুল, তুমি দেখছ, আমার সব সন্দেহের শুভ সমাপ্তি। এত ভাল কথাগুলি, আহা যেন সত্য হয়। আমার কাছে লেখা চিঠিতে নিম সুখী হওয়ার বিষয়ে কদাপি উল্লেখ করেনি, সেটাই মনে হয় সেরা ইঙ্গিত। কিন্তু সারাক্ষণ 'আমরা', 'আমরা', 'আমরা' বকে গেছে। তুমি আগে যা বলেছিলে তাই সত্য। নানা বিষয়ে তাকে সর্বোচ্চ উপলব্ধি করতে হবে। তার কমে সে শান্তি পাবে না—তাই ভবিতব্য।"

ম্যাকলাউডকে, ডিসেম্বর ২৬, ১৮৯৯—

"গতকাল...নিমের চিঠি এল। পরিপূর্ণ সুখের কথায় ভরা চিঠি...প্রতি দ্বিতীয় শব্দে 'আমরা', এবং আর্নেস্ট ও সে যে সত্যই আধাআধি টাকা দিয়ে আমার জন্মদিনের কলমটি কিনেছে আমাকে এই আশ্বাসদান, ইত্যাদি। তার সুখ সম্বন্ধে আরও বেশী নিশ্চয় বোধ করতাম যদি সে তার উল্লেখ না করত। সে আরও লিখেছে, মিস ম্যাকলাউড ইংলণ্ড ফিরলে আমাদের সঙ্গে **অবশ্যই** যেন বাস করেন।"

নিমের আনন্দময় নীড়ের কথা, তার সন্তানাদির কথা পরবর্তী দু'একটি চিঠি থেকে অল্প কিছু তুলে দিচ্ছি।

ম্যাকলাউডকে, অগস্ট ২৯, ১৯০০—

"নিমের চিঠি তোমাকে পাঠাতে ইচ্ছা করি। অপরূপ—নয় কি! তার জীবন তুলনায় এখন কত বেশী ঐশ্বর্যময় হয়েছে।......

নিমের শেষ চিঠিটি পাঠিয়ে দিচ্ছি, সুগভীর সুখে পূর্ণ ; এই সুখ যে সে পেয়েছে তার জন্য আমার কোনো কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়।"

ম্যাকলাউডকে, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০০—

"আর্নেস্ট হয়ত তোমাকে লিখেছে যে, বুধবার সকালে নিমের সন্তান হয়েছে —মেয়ে।"

একই জনকে, ২২ মার্চ ১৯০১—

"নিম দীর্ঘ পীড়ায় ভুগছে, অন্ত্রে ক্ষত, ভয় পেয়েছিল হয়ত ক্যানসার। এখন সত্যই আগের চেয়ে ভাল—তাই লিখেছে। এধারে আমাদের খুকিটির বয়স ৬ মাস হয়ে গেল; সে নিজের চেয়ারে বসতে পর্যন্ত পারে!"

একই জনকে, মে ৩, ১৯০১—

"ইয়র্কশায়ারে গিয়েছিলুম, নিম ও তার শিশুকে কুটীরে, ভায়োলেট ও প্রিমরোজের মধ্যে—রাডিয়ার্ড কিপলিঙয়ের নিজের জায়গায় দেখলুম। শিশুটি সোনালি আলো, মাধুর্যের পুঞ্জ ; নিম জানে, কেমন করে ভালবাসতে হয়, ভালবাসা পেতে হয়।"

একই জনকে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৪—

"প্রিয় য়ুম, তুমি যে নিমের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাতে কতই না খুশী হয়েছি! তার গৃহজীবনের মাধুর্য, বিশ্বাস করি, তাকে অনুভব করিয়েছে যে, তার গৃহে তোমার জন্য যথেষ্ট স্থান রয়েছে, আর অভ্যর্থনা!"

একই জনকে, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৪—

"বিশ্বাস হয় যে, তুমি সোজা নিমের ওখানে গিয়েছ। ঐ দিন (ক্রীসমাস) তার কাছ থেকে মধুরতম এক চিঠি পেয়েছি। আমার নিশ্চিত ধারণা, তার ছোট্ট আশ্রয়টি শান্তিতে জড়ানো।"

এবারে বোনকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠি পর পর তুলে দিচ্ছি। ২৯ জানুয়ারী,১৯০৩-এর চিঠি—

"মিস্টি নিম, মনে মনে ঠিক করেছিলুম, এবার ছেলে হবে। কিন্তু মায়ের শরীর যেহেতু ভাল রয়েছে, অন্যথা হওয়াতে কিছু মনে করছি না।

তার (নবজাতকের) নামটি যে পাঁচটি মিঠে সিম্‌ফনির মধ্যে আছে, তাতে আনন্দ পেয়েছি।

৭ই জানুয়ারী তারিখে স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছে কয়েকবার। (সম্ভবতঃ ঐ দিন কন্যাটির জন্ম)।

ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে তোমার নববর্ষের চিঠি আর্নেস্টের চিঠি পাবার পরে পেয়েছি। সেটা চমৎকার।

আহা বাছা মার্গট-গোলাপমণি (নিমের প্রথম মেয়ে)—তার কথা ডাঃ বসু এখনো বলেন।

আশাকরি সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে, তার পিতাও।

প্রিয় বোনটি, আমার ফটোগ্রাফ যে তোমাকে চিন্তিত করেছে, তার জন্য দুঃখিত। এ ছবি পাঠিয়েছি, কারণ বেট-এর (পারিবারিক পরিচারিকা) ধারণা, ছবিটি অদ্ভুতভাবে মায়ের মত। সে যাই হোক, এখন আমি আবার বেশ মোটা-সোটা হয়ে উঠেছি।

তোমাকে মজা দেবার জন্য অন্য একটি জিনিস পাঠাচ্ছি—মিঃ স্টেডের দুটি চিঠি। তাঁর প্রথম চিঠি পড়ে আমি কি রকম আঁতকে উঠেছিলুম, বুঝতেই পারো। আমার সমস্ত কাজের দফা রফা হয়ে যেত। অবশ্য ব্যাপারটা গোপনীয়।

আমাদের বেচারা ছোট্ট মা-টি! কী ভয়ঙ্কর সময় গেছে তাঁর! সেজন্য কী দুঃখই পেয়েছি! ধরে নিচ্ছি, এর মধ্যে তার শেষ হয়েছে—কিন্তু তাঁকে কত না সহ্য করতে হয়েছে। আর্নেস্ট খুবই বিবেচক—সে মনে করে এসব কথা আমাকে জানিয়েছে।......

আবার চিঠি খুলে লিখছি : টাকা আমি সত্যই পেয়েছি। কিন্তু যখন টাকা আসে তখন আমি বাইরে ছিলাম, এবং কোনোভাবে প্রেরকের নাম হারিয়ে গিয়েছিল। তাই মাকে জানিয়েছিলাম।......মা বোধহয় তোমাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

পরের মঙ্গলবার সরস্বতী পূজা—আমাদের ভারতীয় মিনার্ভা দেবী, এবং ৫০টি দরিদ্র বিধবা ভরণপোষণের কিছু টাকা পাবে—তোমার টাকা তাতেই যাবে।

বিধবাদের পক্ষে ভিখারী হওয়া সম্ভব নয়, তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু ভদ্রনারী, ঠিক সেই শ্রেণীর মানুষ, যাদের সাহায্য করা তোমার পছন্দ হবে।"

১১ অগস্ট, ১৯০৪-এর চিঠি—

"প্রাণের নিম, তোমার চিঠিটি মনোরম। এই ধরনের ব্যাপারগুলিই **বইটিকে** (দি ওয়েব) উপলব্ধ করায়, আমি যে শেষ পর্যন্ত এটিকে লিখতে পেরেছি, তার আনন্দ অনুভব করায়। স্টাইলের বিষয়ে—তুমি অন্য যে-কারো তুলনায় এই ব্যাপারটিতে আমার সাফল্যে বেশী আগ্রহী। তুমিই প্রথম বলেছিলে—আমার একটা স্টাইল আছে। সুতরাং তুমি যখন বলছ, স্টাইল অনেক উন্নতিলাভ করেছে, এবং সন্তোষজনক তা—এতে গভীর স্বস্তিবোধ করেছি, সেই সঙ্গে আনন্দও।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, বইটি এখানে সবাই বুঝেছে এবং সমর্থন করছে কি না? কী বলো! বোম্বায়ের এক মুসলমান ভদ্রলোক গত রবিবার এসেছিলেন আমাকে 'ধন্যবাদ' জানাতে—'আমাদের মায়েদের বিষয়ে আমরা যা অনুভব করি' তা এত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করার জন্য, এবং (ইতস্ততঃ করে, কিছু সলজ্জভাবে)—ভারতীয় পত্নী স্বামীর সম্বন্ধে কী অনুভব করে, তা বলার জন্য।

আমার বইয়ের **আসল** বিষয়, হিন্দু ও মুসলমানের মূলগত ঐক্য এবং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ মহান ভবিষ্যৎ। সুতরাং (মুসলমান ভদ্রলোকের) উক্ত সমর্থন সম্বন্ধে তুমি কী বলবে বলো? **তুমি** অবশ্য বুঝবে যে, বইটি সম্বন্ধে আমার সর্বোচ্চ আশা—স্বামীজীর ভাবগুলিকে ভাষা দেওয়া, যে-সব কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন, সেগুলি বলা।

ইতিমধ্যে তুমি জেনে গেছ, আমি অসুখে পড়িনি।

হাঁ, হিমালয়ের ঝঞ্ঝা অপরূপ। কিন্তু গঙ্গার উপরে ঝড়ও আমার কাছে অন্ততঃ অনুরূপ মহান। মুহূর্তমধ্যে পৃথিবী আঁধার হয়ে যায় আর গর্জাতে থাকে ঝড়। এবং—গ্রীষ্ম দেশের বজ্রধ্বনি থেকে বৃষ্টি অপূর্বতর।......

ডাঃ বসু সর্বাধিক আগ্রহের সঙ্গে তোমার চিঠি শুনেছেন। বইটি সম্বন্ধে প্রতিটি শব্দ শুনতে চেয়েছেন, এবং মার্গট ও সিসিলী সম্বন্ধে প্রতিটি শব্দ। তিনি প্রায়ই বলেন, তাঁর সমস্ত স্নেহ ক্ষুদ্র মার্গটের উপর ঢেলে না দিয়ে তিনি খুবই ভুল করেছেন—সুযোগ যখন ছিল।

প্রিয় নিম, গৃহ-তরণী পথ করে শান্ত বারিতে প্রবেশ করছে শুনে কত না আনন্দবোধ করেছি! আর আমার আনন্দ—তোমার অঙ্গন উজ্জ্বল হয়ে আছে ফুলে ফুলে।

আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে তুমি কখনো ব্যস্ত হয়ো না যেন—তা কখনই দুঃখজনক নয়। মানুষ সামনের দিকে অল্পই দেখতে পায়, কিন্তু আলো সব সময়ই আসে—যখন আমরা কাজ করে এগিয়ে যাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই আমোদজনক। সহৃদয়তার সঙ্গে যে-সব আমন্ত্রণের চাপ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যদি সেগুলিকে গ্রহণ করতাম, তাহলে তুমি শুনতে যে, আমি এখন মিশরে আছি, তারপরে ইতালীতে, পুনশ্চ আমেরিকায়। বাল্যে কত না চেয়েছি ইতালী ও মিশর দেখতে, আর তারপরে বেঁচে থেকে সেই দুই জায়গা দেখার আমন্ত্রণ চিন্তামাত্র না করে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছি!! সুতরাং মনে রেখো, সব সময়েই আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, ভারতেই আমি স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করতে পারি—আহা, কত সুখে! আমার তো মনে হয়, যদি এক পেনিও না থাকে—সেই হল খাঁটি আদর্শ। আমরা টাকা চাই—কাজের জন্যই। এবং সে সম্বন্ধে ভাবতে চাই—দায়িত্ব আমাদের নয়, ঈশ্বরের।"

১ নভেম্বর, ১৯০৫-এর চিঠি—

"মিষ্টি নিম, তোমার কেকটি চমৎকার। যে-ই খেয়েছে সেই বলেছে, এমনটি কখনো খাইনি। আমাদের দার্জিলিঙয়ে থাকাকালে ওটি পৌঁছায়। সুতরাং আমাদের দুটি জন্মদিন ঘটে গেল। আমাদের দার্জিলিঙ ছাড়ার আগের রবিবার সেটি কাটা হল যখন বসুরা ও আমি সবাই একত্র আছি। যে-টিনে ওটি মোড়া ছিল, মিসেস বসু সেটি পর্যন্ত এনেছেন। আর্নেস্ট সহৃদয়, সে আমার জন্মদিনে লিখে পাঠিয়েছে। তোমরা সকলে মিঃ লালের (মিঃ পরমেশ্বরলাল) প্রতি কতই ভাল ব্যবহার করেছ!

মিঃ গোখলে ব্রাডফোর্ডে বক্তৃতা করছেন জেনে নিতান্ত আনন্দিত। তোমাকে কি জানিয়েছি, আমার অসুখের সময়ে তিনি এসে কিভাবে সারারাত্রি থাকার প্রার্থনা করেছিলেন এবং বারান্দায় বসে বরফ ভেঙেছিলেন। ও-কাজ করেছিলেন যখন তিনি দারুণ ব্যস্ত—মহান এক কাউন্সিল-বক্তৃতা প্রস্তুত করছিলেন—যা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কার্জনের মুখোমুখি। ক্রিস্টিনের তিনি সবিশেষ গুণগ্রাহী। তাঁর হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণাই নেই।

গ্রীষ্মকালে কিছু মালা পাঠিয়েছিলুম, পেয়েছ কি? এ-বিষয়ে কিছু শুনিনি।

জিনিসগুলি কিছু নয়, তবু সেগুলি যে খোয়া যায়নি তা জানতে পারলে খুশী হই।......সংবাদ পাচ্ছি, আমার ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি মাঝেমাঝে গন্ডগোলে পড়ছে; ডাঃ বসু এই জন্যই তাকে আরও ভালবাসেন। তিনি বলেন, এর দ্বারা বোঝায় তার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য আছে। আমার প্রাণের ছোট্ট খুকি মার্গট—আজ তার একটি ফটোগ্রাফ নিয়ে দেখছি—কী চমৎকার! সিসিলীর কোনো ফটোগ্রাফ কি তোলা হয়নি? ভুলো না, তাকেও আমি ভালবাসি। দু'জোড়া ক্রুশই......ডাঃ বসু ও আমার জন্য যা পাঠিয়েছে—খুবই স্বাগত।

মিঃ ডিগবির বই পড়ে আর্নেস্ট খুবই ভাল করেছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় ধারণা ঐ বই থেকে পেয়ে যাবে। কিন্তু আরও খুশী হব যদি সে এমন বই পড়ে যাতে ভারতের মহিমা প্রকাশিত, যাতে লেখা আছে ভারত কি দিতে পারে! যেমন, স্বামীজীর বইগুলি, 'লাইট অব এশিয়া' (যা কার্যতঃ প্রাচীন ভারতীয় পুস্তক 'ললিত বিস্তরের' আক্ষরিক অনুবাদ), তিলকের 'ওরিয়ন', এবং 'দি আর্টিক হোম ইন দি বেদজ্', আমার অমর রচনাগুলি যা লেখা হয়েছে বা হবে ইত্যাদি। এই জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইংরেজের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে দৃঢ়তর ভূমি লাভ করতে পারব যখন আমরা 'ভারত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি করতে পারব।

আহা, কি বিরাট ছিলেন স্বামীজী, প্রিয় নিম! আমি কি আনন্দিত—**তিনি** তোমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তোমার স্বামীকে, তোমাদের যুগ্মরূপকে।

মিষ্টি ছোট্ট জননী, ঈশ্বর তোমাকে এবং তোমাদের সকলকে এখন ও চিরদিন নিরাপদে রাখুন। শুভরাত্রি।—তোমার ভালবাসার পেগী।"

১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৫-এর চিঠি—

"মিষ্টি নিম, আনন্দের ক্রীসমাস, সুখের নববর্ষ, তুমি ও তোমাদের জন্য। দীর্ঘদিন ধরে তোমাকে একেবারে ভারতীয় কিছু উপহার পাঠাতে চেয়েছি, অবশেষে তা পাঠাচ্ছি, একটি ব্রেসলেট, যা তুমি পরবে এমন ভাবার মত নির্বোধ অবশ্য নই। এটা তোমাকে নিছক শিল্পবস্তুরূপে উৎফুল্ল করবে, যা করেছে আমাকে। বাচ্ছাদের জন্য কয়েকটি রত্ন-পাথর পাঠাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু যখন এটিকে দেখলাম সেগুলিকে যৎসামান্য মনে হল—এবং এটিকেই সংগ্রহ করলাম।

দামের কথা ভেবে অসুখী হয়োনা যেন। এত সুন্দর তবু মোটেই দামী নয়। একটা সংগ্রহশালা থেকে কিনেছি।

ভরসা করি তোমার কুটীরটিকে শীতকালীন আবাসরূপেও তুমি ভালবাসছ। তা নিশ্চয় খুব নির্জন বা আর্দ্র নয়। শিশুদের জন্য ছোট নকল রত্ন-পাথর যা কিনেছি, সেগুলি ভারতীয় বালিকারা কি পরে দেখাবার জন্য; আর আংটি কিনেছি ছোট বয়সে আমার গভীর আংটি-প্রীতি স্মরণ করে। যদি আমি এসব পেতাম শৈশবে —এই সামুদ্রিক শামুক আর মুক্তাজননীর (অর্থাৎ ঝিনুক) উপর বসানো জিনিস-গুলিকে—তাহলে নিজেকে তো মহারাণী বলে মনে করতাম!

তোমার চিঠি সব সময়েই মনোহারী। এক বছর আগে তুমি একটা অপূর্ব চিঠি লিখেছিলে। কয়েকদিন আগে রাত্রিতে সেটা পড়ছিলাম।

মিষ্টি বোনটি আমার, ঈশ্বর তোমাকে এবং তোমার প্রিয়দের রক্ষা করুন, তোমার আবাসটিকে পাখির নীড়ের মত করে তুলুন, যে-সব পাখিরা একদিন মহান মানব-ঐশ্বর্যে পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলবে।—তোমার নিজের বড় ভালবাসার পেগী।"

১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সালে নিবেদিতার মায়ের মৃত্যু ও ভস্মাবশেষের সমাধি পর্যন্ত নিবেদিতা ও মে-র মধ্যে অনেকবার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা বেশ কিছুদিন একসঙ্গে কাটান। মায়ের মৃত্যুর মহাবেদনার লগ্নে দুই কাতর প্রাণ কোন অনুভূতির বন্ধনে ধরা পড়েছিল সে বিষয়ে 'নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর মা' অংশে জানিয়ে এসেছি। নিবেদিতার অধ্যাত্ম সত্তার গভীর রূপের পরিচয়ও ঐ সব অংশে পেয়েছি।

প্রসঙ্গ শেষ করছি ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের পয়লা জুলাই তারিখে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি দিয়ে। চিঠিটি আসলে ভ্রমণস্মৃতি; ইউরোপের বিখ্যাত মন্ট ব্ল্যাংক ঘুরে এসেই লিখেছিলেন। সাক্ষাৎ দর্শনের তপ্ত স্পর্শ আছে দীর্ঘ চিঠিটিতে, সবটা উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। ঐ চিঠিতে নিবেদিতা মন্ট ব্ল্যাংকের পার্শ্বস্থ বিশাল হিমবাহের দারুণ মহিমার কথা লিখেছিলেন, তার অবর্ণনীয় নির্জনতা, বিরাটত্ব, বৈদ্যুতিক বায়ুমণ্ডলের কথা। "যে আধঘণ্টা ধরে ঐ অংশ অতিক্রম করেছিলাম, আমরা তখন ছিলাম যেন মেরুপ্রদেশে। আমাদের চতুর্দিকে অত্যুচ্চ হিমতরঙ্গ, মহাসাগর যেন তুষারায়িত, এবং ব্যাদিত-মুখ গহ্বরসমূহ—একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ মানেই মৃত্যু।" এইসব কথা বলার পরে নিবেদিতা কাহিনীগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—"তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে মৃতদেহ চাপা আছে ওখানে, তবু তাজা, তরুণ— সমাধিস্থ করেছিল সমসাময়িক পলিতকেশ বৃদ্ধ মানুষেরা!"

এই চিঠির শেষকালে নিবেদিতা বোনকে প্রাণ ঢেলে কয়েকটি কথা লেখেন, বিদায়ের পূর্বেই তাঁর বিদায়বার্তা যেন, যদিও বলেছেন, এ আমার বিদায়বার্তা নয়—

"ভালবাসার বোনটি, তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি একেবারেই মনে হচ্ছে না। কোনো বিদায়বার্তা নয়—শুধু তোমার নিজস্ব মনঃশক্তির জন্য প্রার্থনা। আর—ধন্য হও, ধন্য হও, ধন্য হও নারীকুলমধ্যে—বিশ্বাসের সংরক্ষণের জন্য, কর্তব্য পালনের জন্য। যাদের কখনো এড়াতে পারবো না, এমন তিনটি স্নেহের পুত্তলীর জন্য আমার ভালবাসা রইল—ঐ আমার ধর্মকন্যা মার্গট, মিষ্টিমণি সিসিলী আর খুশী-হাসির গ্রানসি। তাদের পিতাকে ভালবাসা দিও। তাকে আদরে যত্নে রেখো, যতখানি পারো বিশ্রাম দিও। আর তুমি—তোমাকে ভালবাসা ভালবাসা ভালবাসা।"

ভাই

ভাই রিচমন্ড নোবলের বেশ কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা দিয়ে এসেছি। ভাইটির সম্বন্ধে নিবেদিতার ভালবাসা ও আশার শেষ ছিল না। রিচমন্ড একে বাড়ির ছোট ছেলে, তদুপরি বড়দির অনুগত, তদুপরি 'পুরুষালি পুরুষ'— নানা

অবিবেচনার কাজে দিদিকে ব্যস্ত করলেও তাকে নিয়ে সস্নেহ-গর্ব ছিল দিদির। নিবেদিতার চিঠি থেকে তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরছি।

২৯.৯.১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মিসেস বুলকে লেখা এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—

"স্বেচ্ছাসেবকবৃত্তি রিচকে অনেক কিছু দিয়েছে। আর্দ্র আবহাওয়ার মধ্যে সে তাঁবু ফেলেছিল, নিজের কাজ নিজে করেছে, চমৎকারভাবে খাড়া ছিল এবং পক্ষকালের নোটিশে যে-কোনো জায়গায় যেতে তৈরী।"

৪.৪.১৯০১ তারিখে ম্যাকলাউডকে—

"রিচ এখন এখানে। আমার প্রতি ব্যবহার সুন্দর। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে তিন মাস পেলাম। তাতে বড় আনন্দ পেয়েছি। দশাসই চেহারা, চড়া গলা, মাঝে মাঝে জ্বালায়—কিন্তু অনেক দিক থেকে গ্র্যান্ড। কলকাতার ব্রাদারহুডে যোগ দেবে বলেছে। তার মানে মনে হয় মাকে যখন দেখতে হবে না তখন অক্সফোর্ড মিশনে যোগ দেবে।

ছুটির দিনের ব্যায়ামরূপে সকাল-সন্ধ্যায় বাইসাইকেল চড়ছি। দারুণ উপভোগ করছি। এমনকি সেন্ট সারাও শিখতে শুরু করছেন—রিচকে শিক্ষক করে।"

একই জনকে—৯.১১.১৯০১—

"এমনকি রিচ ও মা পর্যন্ত আর কখনো পাশ্চাত্ত্যে না ফিরতে বলছেন।... আর একটি কথা বলার আছে, তা আর কিছু নয়—রিচের জন্য তুমি যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।"

একই জনকে—২৩.৪.১৯০৩—

"রিচের বিষয়ে তোমাকে ব্যস্ত করা উচিত হবে না, কারণ মায়ের কিছু বন্ধু তাকে জামাইকার পথে অতিথি হিসেবে নিয়ে যেতে চাপাচাপি করছেন, যদিও মা বলছেন—রিচকে সাহায্য করার বদলে কাজ দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে মনে হয় তুমি ব্যাপারটা জেনে গেছ যে, অসুবিধা ভালভাবেই দূর হয়েছে।...আমার বিশ্বাস, এখনো সে কিছু করবে—ভারতের জন্য যদি না হয়, অন্ততঃ মানবতার জন্য। আমি একান্তই চাই—স্বামীজী যেভাবে তাঁকে নেবেন বলেছিলেন, সেভাবে সত্যই তাকে নিয়েছেন।"

একই জনকে—৭.৫.১৯০৩—

"রিচের প্রতি তোমাদের—তুমি, লেডী বেটী (মিসেস লেগেট), মঃ নোবেল—ব্যগ্র সহানুভূতি ও সহৃদয়তার জন্য কী বলব জানি না! গভীর গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ...মা জানিয়েছেন, রিচের নাকি একদিকে পক্ষাঘাত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মস্তিষ্কের কাজের জন্য এ জিনিস হতে পারে—কদাপি আমার জানা ছিল না। কিন্তু ডাঃ বসু বলেন, ফুটবলের জন্যই ঐ কাণ্ড—সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রোপচারের ফলে যার সম্ভাবনা প্রকটিত। ডাঃ বসু বলেছেন, ব্যাপারটা গোপনীয়। তোমাকে বলছি এই জন্য যে, যদি রিচের সঙ্গে দেখা হয়, শারীরিক কসরতের ব্যাপারে তার উৎসাহ কমাবে। কিন্তু সে পুরুষ। পুরুষোচিত ব্যাপারে তার শক্তি সে দেখিয়েছে—হাঁ।"

একই জনকে—২০.৫.১৯০৩—

"রিচের জন্য তোমার সর্বপ্রকার স্নেহের জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের পরিবারের নারীস্বভাবের পরম ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। স্বয়ং তুমি,

লেডী বেটী এবং অ্যালবার্টা—প্রেরণা ও কর্মনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সত্যকার সুযোগ প্রথম সে পেল। তার মধ্যে যে বিরাট আত্মবিশ্বাস তুমি জাগিয়েছ, তা এতই সুপবিত্র যে তার পক্ষে তার উল্লেখ করাও সম্ভব নয়—একথা আমি জানি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

একই জনকে—১৮.৮.১৯০৩—

"রিচ যে উত্তরাঞ্চলে ট্রেন ভ্রমণের সময়ে তোমার সঙ্গে গিয়েছিল, তাতে আমি বড় খুশী। বেড়ানোর ক্লান্তি অনেক কমে যায় যদি তরুণ একটি বীরযোদ্ধা সঙ্গে থাকে—আর আমাদের রিচ তো এসব ব্যাপারে সদাই প্রস্তুত পরমানন্দে।...

আমরা সবাই যেন তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি, তাই নয় কি? তুমি একে একে আমাদের সকলকে 'দত্তক' নিয়েছ। তোমার সঙ্গে রিচমণ্ডের এই যাত্রাকে স্বামীজীর তাকে ডাক দেওয়ার ইঙ্গিত বলেই মনে করি। তুমি জানো, স্বামীজী তাকে ডাক দেবেন বলেছিলেন। কেবল ভেবেছিলেন, মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ। অথচ আমার প্রিয় ছোট্ট মা-টি কখনই অভিযোগ করতেন না, আমি জানি।

রিচ সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ—তাকে **বিরাট** হতে হবে স্বপ্নে ও কর্মে—বিশ্বাস করি তা সত্য হবে। তার সম্বন্ধে আমার বদ্ধমূল ধারণার কথা তুমি জানোই। সব সময়েই আমি বিশ্বাস করেছি, একদিন সে স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণীকে বহন করবে। ডাঃ বসু এখন মনে করেন, যদি সে কঠোর পরিশ্রম করে এবং যদি তার স্বাস্থ্য ভেঙে না পড়ে—সে অত্যুচ্চ স্থানে উঠতে পারবে। ডাঃ বসু বলেন, চমৎকার-ভাবে সে শুরু করেছে ; সেইভাবে যদি এগিয়ে যেতে পারে, রাজনৈতিক সম্মান নিশ্চিত তার জীবনে আসবে, কিন্তু এখনি তার কিছু গ্রহণ করা উচিত হবে না, গোড়ার দিকে শুধু সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

নিজের মধ্যে আমি দর্শন, ভক্তি ও অনুভূতির বিরাট শক্তি অনুভব করছি, দেখছি যে, এমন শক্তি বিরল। পুরুষের বুদ্ধিতে যেন নৈতিক পক্ষাঘাত এসে গেছে। তাদের মধ্যে যারা ভাল, তারা নিস্তেজ, লক্ষ্যহারা—যখন ফেটে পড়া তাদের দরকার—নব ধর্মযুদ্ধের আহ্বান এলে যা করে পুরুষ। আর, যারা মন্দ, তারা তাতেই ডুবে আছে।

যদি রিচ এই সমস্ত জিনিস বুঝতে শুরু করে, সেইসঙ্গে পায় ভালবাসার শক্তি ও পুরনো স্বাস্থ্য, অফুরন্ত প্রাণশক্তি—তাহলে তাকে তোমার নিশ্চয় মনে হবে—বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে অধীর-অস্থির তেজী তরুণ রণতুরঙ্গ। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তার নেই, তাই চিঠিপত্রে বেশী কিছু লেখে না।"

নিজেকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রিচমণ্ডের সত্যই বেশী ছিল না। সে চেষ্টা যখন করতেন, অনেক সময়ে অবাঞ্ছিত ফল হত। ১৩.১০.১৯০৪ তারিখে রিচমন্ড, নিবেদিতাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ—দিদির বিপদে বীরপুরুষ ভাইয়ের তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসা—কিন্তু দিদি ভাইয়ের এতখানি উৎসাহকে ভাল চোখে দেখেন নি।

ভাইয়ের চিঠিটি আগে উদ্ধৃত করি—লিংকন কলেজ থেকে লেখা—

"অতিবড় ভালবাসার মার্গট, বারে বারে ফিরে আসুক এই সুখের দিনটি! এই বছর তোমাকে অভিনন্দন জানানোর মস্ত কারণ ঘটেছে। প্রথমতঃ তুমি এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করেছ (দি ওয়েব বই), যা ভারতে তোমার কাজের স্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ। দ্বিতীয়তঃ তোমার বই ভালই চলেছে। যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের কাছে এই দুটি জিনিস অতীব তৃপ্তিকর। চিরদিন তুমি কাজ চালিয়ে যেতে পার, এই আমার হৃদয়ের একান্ত অভিপ্রায়। কিন্তু এরও বেশী কিছু তোমাকে বলতে চাই—তোমার চাই পিছনে দাঁড়াতে পারে এমন একটি মানুষ। আমি চাই, তুমি বোঝো যে—আমি সেই মানুষ। তোমার পাশে আমি আছি। ভারতে যদি তোমার উপর উৎপীড়ন হয়, তাহলে অগ্রণী আইরিশ নেতাদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে আমার এতই প্রভাব আছে যাতে তোমাকে যারা অভিযুক্ত করতে চায়, তাদের কাছে ব্যাপারটা নিতান্ত অসুবিধা-জনক করে তুলতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, যে-ব্যক্তি তোমাকে পীড়িত করতে চায়, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক—ব্যক্তিগত শত্রুতার। আইরিশ রীতি তুমি জানো—আমার কথার অর্থ তুমি বুঝবে। ব্যাপারটা চরম শোনাচ্ছে, তবু তোমাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, যথাসম্ভব রক্ষণাবেক্ষণ তোমার দরকার। তোমার সাহস যেন হারায় না—এগিয়ে যাও!

তোমার বন্ধু লালের (পরমেশ্বরলাল) সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে খুব ভাল লেগেছে। কিছু কিছু ভারতীয়, যাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মধ্যে সে সর্বাত্মক ভদ্রলোক ; ভালো বংশের গুণাবলী তার আছে। মানুষের নেতা হবার যোগ্যতা তার আছে ; তাই দুঃখ লাগে যখন দেখি জাতীয়তার ভিত্তিতে কাঠামো গড়ে তোলার পরিবর্তে রাজনীতিতে তার বিশ্বাস। আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পদ্ধতির ব্যর্থতা আমি দেখেছি। যদি গভীরতর কোনো জিনিসের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, রাজনৈতিক আন্দোলন শূন্য বস্তু, একথা জানি আমি। এদেশে যখন ফিরবে, আইরিশ প্রশ্নের ক্ষেত্রে কতখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে দেখে অবাক হয়ে যাবে। অতি প্রিয় দিদি আমার, যে-কাজ তুমি নিয়েছ, যা আমাদের সকলের হৃদয়মধ্যে স্থান নিয়ে আছে, সে বিষয়ে তোমার সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করে পত্র শেষ করছি।—সর্বোত্তম ভালবাসাসহ, তোমার চিরদিনের প্রিয় ভাই, রিচ।"

দিদির শুভাশুভের জন্য এতখানি উদ্বেগ এবং সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে মহাবীরত্বের ভূমিকার প্রতিশ্রুতি দিদির মোটেই ভাল লাগেনি। ভাইয়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দিদি ইতিমধ্যেই কোন্ ভূমিকা নিয়ে নিয়েছেন। চড়া মেজাজের ভাই সম্বন্ধে দিদির মনে চিন্তাও ছিল যথেষ্ট। ৬ নভেম্বর ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা এ বিষয়ে লিখলেন—

"রিচের কাছ থেকে জন্মদিনের যে চিঠি পেয়েছি, তা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাবছি, এটা তোমার কানে বেসুরো ঠেকবে কি না, আমার কানে যেমন ঠেকেছে—শারীরিক শক্তি প্রয়োগের ঐ ইঙ্গিত। রিচ যেন স্থূল আর অশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই শীতে যদি লণ্ডনে যাও, তাহলে তাকে হেসে থামিয়ে দিও। তার ওসব কথা মিষ্টি ঠেকার মত খোকা আর সে নেই।"

ম্যাকলাউড রিচের পক্ষ সমর্থন করে নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। রিচমণ্ড সম্বন্ধে নিবেদিতার দুশ্চিন্তার কিছু কারণ কিছুদিন থেকে ঘটছিল। রিচের রাজনীতিই নয় তা—তা তাঁর ব্যক্তিজীবন—প্রণয়সংক্রান্ত ব্যাপার। যে-ভাইকে নিবেদিতা অত ভালবাসেন, তার প্রণয় বা বিবাহ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন না। এক্ষেত্রে উদ্বেগের বিশেষ কারণ—রিচ জীবনে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই সংসারে জড়িয়ে পড়তে চাইছে—এবং এমন একজনের সঙ্গে যে অতীব ধনী। দরিদ্র অথচ আত্মাভিমানী আইরিশ পরিবারের যে-রক্ত ছিল নিবেদিতার মধ্যে, মর্যাদানাশের কল্পনায় তা তপ্ত হয়ে উঠেছিল অবিলম্বে। অথচ প্রেম—সীমাকে লঙ্ঘন করে—জানতেন। সেই মথিত মনের ছবি—শঙ্কা, স্নেহ ও গর্ব চমৎকার ফুটেছে একটি চিঠিতে ম্যাকলাউডকে লেখা, ১৯.৬.১৯০৩—

"মহিলাটি সম্বন্ধে তুমি কি জানো তা কি আমাকে লিখবে? আমি খুবই উদ্বিগ্ন। তার বয়স কত? তার পরিবারের লোকজনের কাছে এনগেজমেণ্ট ব্যাপারটা কি গোপন রাখা হয়েছে? এবং আমাদের পরিবারের কাছেও?...রিচ নিজের সামাজিক অবস্থা, তারও বেশী, নিজের আর্থিক অবস্থার বহু উঁচুতে অবস্থিত কারো কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে—এটা আমার কাছে ক্ষমার অযোগ্য কাজ। আশা ও বিশ্বাস করি—করতে চাই—মেয়েটির নিজের অন্ততঃ কোনো টাকা নেই। যদি থাকে, সমস্ত ব্যাপারটা জঘন্য।

রিচের উপর তোমার যে বিরাট প্রভাব আছে, বিশ্বাস করি, তা প্রয়োগ করে তুমি অন্ততঃ তাকে বোঝাবে—তার পক্ষে অদ্ভুত ভাল একটি ডিগ্রী নেওয়া মেয়েটির জীবনের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয়। যদি রিচ তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে নির্বাচন করা মেয়েটির পক্ষে বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে ; আমাদের কাছেও তাই।

অন্য দিকে বলতে পারি, আমি এই দেখে পরম আনন্দিত যে, রিচ বন্দনাযোগ্য একটি নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছে।"

রিচমণ্ডের এই প্রণয়-ব্যাপারটি তাঁর দিদির পক্ষে দীর্ঘ দিনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি মেয়েটির বিষয়ে বার বার প্রশ্ন করেছেন—"সে কে? বাস করে কোথায়? কোথায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ? তার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? সে আমাকে প্রায়ই চমৎকার সব চিঠি লেখে, অথচ আমি এত অন্ধকারে আছি—"। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪-এর চিঠিতে রিচমণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা, যাকে কেন্দ্র করে দিদির বহু স্বপ্ন ছিল—"আমি বিশেষ চাই, ইংলণ্ডে গেলে তুমি (ম্যাকলাউড) রিচের কথা মনে রাখবে। ধনী বন্ধু, সহপাঠী ও অন্যান্যদের মধ্যে দরিদ্র ছাত্রের অবস্থা কী না শোচনীয় দাঁড়ায়, এবং সেই অবস্থার মধ্য থেকে পৌরুষের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে তার পক্ষে কি বিপুল পরিমাণ সতেজ সরলতা ও নৈতিক সাহসের দরকার হয়! এক এক সময় আমার এত ভয় হয়, পাছে রিচ তার সুন্দর সত্যপ্রিয়তা হারিয়ে কপটতা ও চালিয়াতির মধ্যে ডুবে যায়! বিশেষতঃ মায়ের ব্যাপারে তাকে ঠিক রেখো!"

এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উপস্থাপনের কারণ, এর দ্বারা নিবেদিতার ব্যক্তি-জীবনের একটি অনালোকিত অংশের উপর আলোকপাত হয়েছে। নিজ পরিবারের সঙ্গে মনের যোগ তাঁর বজায় ছিল সর্বসময়, কিন্তু অপরপক্ষে সব কিছুর মধ্যেই

একটা নির্লিপ্ততা বজায় ছিল, এবং তিনি যে-কোনো জিনিসকেই আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে দেখতেন। মায়ের সঙ্গে রিচের সংঘর্ষের সম্পর্ক নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে ছিলেন, এবং রিচের কোনো আচরণে মা যাতে আঘাত না পান সে বিষয়ে বিশেষ সন্ত্রস্ত ছিলেন। নিবেদিতা জানতেন, দীর্ঘ জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মার মন স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে, রিচের নবলব্ধ সম্পদশালী বন্ধুদের সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হবেনই। সেজন্য যখন তিনি শুনলেন, রিচের সঙ্গে মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে, তখন রিচেরই দোষ দেখেছিলেন। পরে যখন মিস ম্যাকলাউড জানালেন, এক্ষেত্রে রিচের দোষ নেই, তখন মায়ের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা-করুণা সত্ত্বেও 'রিচকে অবিভক্ত সমর্থন জানানোর' আনন্দ বোধ করলেন। রিচের উপর তাঁর বড় ভরসা বলে তার আচরণের সামান্যতম ত্রুটিতে তিনি অতিরিক্ত বিচলিত হতেন, যে-'রিচের ভবিষ্যতের মত সুপবিত্র কোনো ব্যাপারে সুন্দরতম কিছু ভিন্ন আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।'

রিচ তাঁর দিদির মন কতখানি অধিকার করেছিলেন, নিম্নের চিঠিতে তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১২.৯.১৯০৪-এ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি—

"যদি তুমি ইউরোপে যাও এবং লণ্ডনে এক সপ্তাহের জন্য কাটাও, তোমাকে তাহলে একটি কাজ করতে বলব, যার জন্য অসীম বিচক্ষণতা ও হৃদয়মাধুর্য প্রয়োজন। আমি চাই, মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে রিচ বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াক, এবং বিয়েট্রিসকে মায়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিক।

তুমি মাঝে মাঝে আমার সম্বন্ধে অত্যুক্তি করে থাকো। এই ক্ষেত্রটিতে তুমি প্রমাণ করো যে, আমার অন্তর্দৃষ্টিতে তোমার কিছু বিশ্বাস আছে। কিছুদিন ধরে আমার মনে ব্যাপারটা ঘুরছে, সেইসঙ্গে তোমার ইউরোপ যাওয়ার সম্ভাবনা এবং ছোটখাট জিনিস, যাদের বলে বোঝানো যাবে না অথচ চিঠিপত্রে যাদের আভাস পাই—এইসব জমে উঠে আমাকে খুলে বলতে প্ররোচিত করছে।

প্রিয় য়ুম, বিশ্বাস করো, জীবনের এই সংকটক্ষণে সামান্য ভ্রান্ত লজ্জা বা ক্ষুদ্রতা রিচমণ্ডের গোটা চরিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে, সত্য ও মহিমার উৎসকেই একেবারে বিষাক্ত করে তুলবে।

রিচের বিচিত্র অবস্থা-সংকটের কথা ভেবে দেখো,—তার মত দরিদ্র এক ছোকরা সহসা তার থেকে পঞ্চাশ গুণ অবস্থাপন্ন লোকদের সমাজে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বন্ধুদের সহৃদয়তায় এবং নিজের বুদ্ধিযোগে! জীবনের এই পরীক্ষা থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে সে মাত্র একটি উপায়েই পারে—যদি সে পারিপার্শ্বিকের বিষয়ে খেয়াল না করে, যদি সে অন্যত্র যে সতেজ সরলতা ও সহজতা দেখিয়েছে, এখানেও তাই দেখায়। আমার ধারণা, তুমি ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলতে পারো যদি মায়ের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাও এবং সেই সময়ে বিয়েট্রিসকে আনিয়ে নাও। কিছু বিবেচনা-শক্তি অনেকখানি ভুল নষ্ট করতে পারে, যে ভুল পথ হয়ত অসচেতনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো এক সময়ে বিয়েট্রিস যেন ছোটখাট ব্যাপারকে মানিয়ে নেবার সুযোগ পায়, সেটাই উচিত, যে-জিনিসগুলি রিচ হয়ত চাইবে সে না দেখে।

এনগেজমেন্টের ব্যাপারটা মা এখন জেনে গেছেন, সুতরাং সহজভাবেই তিনি মেয়েটিকে বুঝে নিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তুমি মায়ের ছোট্ট নীড়টিকে পছন্দ

করো, তা মিষ্টি, অনাড়ম্বর হওয়া সত্ত্বেও নারীমর্যাদাপূর্ণ। আমার স্থির ধারণা, কোনোভাবেই তা হীন বা অমার্জিত নয়। মনে হয়, বিয়েট্রিসের যোগ্য ভূমিকা হবে, এই গৃহ-পরিবেশ থেকে সর্বোত্তম আদায় করে নেওয়া, যা তুমি বা আমি করি, এবং রিচকে এ সম্বন্ধে সঠিক মনোভাবে স্থাপিত করা। অন্ততঃ বিয়েট্রিসের এই সুযোগ পাওয়া উচিত। আর, তোমার সামাজিক মর্যাদা ও ঐশ্বর্য এক্ষেত্রে স্বাধিকারে কথা বলতে তোমাকে সামর্থ্য দেবে।...যে পরিবেশে তুমি তুষ্ট ও গর্বিত হতে পারো, তার বিষয়ে এ পৃথিবীতে কে আছে যে অভিযোগ করতে পারে?

ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর অস্বস্তির কথা মনে পড়ে।* কেবল তিনি জানতেন না, পুরুষকে যা প্রতিহত করে, মেয়েরা কত সহজে তা মানিয়ে নিতে পারে।

সুন্দরতম বিয়ে হল তাই যেখানে নারী পুরুষের সমস্ত জীবনটি হৃদয়ে গ্রহণ করে। আমি কখনো সহ্য করতে পারবো না—মা, নিম বা আর্নেস্ট রিচের বাড়িতে স্বাগত নয়। অতি জঘন্য হবে তা, এত স্থূল, হঠাৎ-নবাবী ভাব, যা রিচের যোগ্য হবে না, মেয়েটির পক্ষেও নয়, তাকে যেভাবে আমি কল্পনা করে এসেছি, তদনুযায়ী। কিন্তু যদি উল্টো কথাটাই সত্য হয়, সে যেন তোমাকে মধ্যবর্তী ও ব্যাখ্যাকাররূপে পেয়ে এখনি নিজস্ব ভাবে সম্পর্ক গড়ে নেবার সুযোগ পায়। বিয়ে হয়ে যাবার পরে শুধু মুখচেনা পরিচয়ের বাইরে আর কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

চোখের সামনে ছবিটা আঁকছি : এক বিকালে তুমি আর মা রয়েছ, মা যাতে একটু ভাল দেখায় তা করিয়ে নিয়েছ, এবং চায়ের সঙ্গে কিছু ভাল আয়োজন—রিচ এমন সময়ে বিয়েট্রিসের সঙ্গে এসে হাজির মাকে চমক দেবার জন্য! ব্যাপারটা এই ধরনের হলেই ভাল দাঁড়াবে, যে-সময়ে আমার ছোট্ট মা-টি নিজের স্বাভাবিক সুমিষ্ট ভালবাসার মেজাজে থাকবেন ; তাঁর গভীরতর দোষগুলি রিচমণ্ডের স্ত্রীর কাছে কখনই আত্মপ্রকাশ করবে না, কারণ তিনি বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়ে এত দিনে কিভাবে অপরকে স্বাধীনতা দিতে হয় শিখেছেন।

প্রিয় যুম, আমি যেভাবে ব্যাপারটিকে দেখে থাকি, তুমিও সেইভাবে দেখবে বলে বিশ্বাস এবং এক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে। রিচের এই ব্যাপারটি খুব পাতলা বরফের আবরণের উপরে স্কেট করার মত ; তা যে তুমি করছো তা যেন দেখবে না বা দেখাবেও না, যাতে হীনতাবোধের পরিবর্তে রিচের আত্মগৌরববোধ ক্রমেই বেড়ে যায়। একাজ তুমি যদি **না পারো,** অন্য কেউ **পারবে না,** এবং না পারলে ছেড়ে দিও। সেক্ষেত্রে আমাকেও অনেক কিছু ছাড়তে হবে, যা তোমাকে বলে উঠতে পারব না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, বিয়েট্রিস নিজে অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করুক ; এক্ষেত্রে তুমি বা আমি যা করতাম, সে তাই করুক। সম্ভবতঃ সে খুবই অল্পবয়সী, তবু আমি যদি সে হতুম তাহলে মায়ের কাছে নিয়ে

* স্বামীজীর দেশাভিমান বিদেশীর অবজ্ঞা সহ্য করতে পারত না। তিনি সব সময় নিজের বিদেশী অনুরাগীদের সাবধান করে দিতেন—ভারতের আর একটিও নিন্দা সইতে তিনি প্রস্তুত নন। নিবেদিতা বা ম্যাকলাউডকে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, যদি তারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অধঃপতন সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে, তবেই যেন ভারতে আসে। ঐ বিষয়েই নিবেদিতা ইঙ্গিত করেছেন।

যাবার জন্য জোর করতুম, তারপরে মা ও তাঁর পারিপার্শ্বিক, তাঁর আকার ও তাঁর দারিদ্র্য সব কিছুকে গৌরবে ভরিয়ে তুলতুম, যাতে রিচ অনুভব করত, ভালবাসা সোনালী স্বপ্নের মত, অথচ দৃঢ় ও স্থায়ী—যেমন জীবন হয়ে থাকে তেমনই।

কিন্তু আমরা গর্বিত জাতি। আর বেচারা ছেলেটি পুরুষসুলভ বোহিসেবীর দোষে ভুগছে ; সেইসঙ্গে আছে তার নিজস্ব গর্ব।

দারিদ্র্য মস্ত জিনিস, তার গর্ব যেন সে অনুভব করে।"

প্রসঙ্গশেষে মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির (৫.১২.১৯০৬) উল্লেখ করতে পারি, যাতে রিচের চাকরির সুরাহা হওয়ায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করে নিবেদিতা লিখেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—তাঁরা রিচকে সব সময়ে নিজেদের আশ্রয়ে রেখেছেন—আমি জানি, জানি তা।"



নিবেদিতার একটি অপ্রকাশিত ছবি। ছবির পিছনে ১৮৯৯ সাল লেখা ছিল।



স্ট্রাটফোর্ড অব অ্যাভনে ম্যাকলাউডের বাসভবনে ১৯৩৭ সালে তোলা ছবি। মিস ম্যাকলাউড দাঁড়িয়ে আছেন, বসে—নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন, লিজেল রেম'কে 'যিনি নিবেদিতার বাল্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন।'—গ্রন্থের ৪০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2nd

22 Norfolk Sq.
Hyde Park. London W. 2.
Aug 10th 37

Dear Monsieur Herbert.

Enclosed please find a transcript of the Swami's letter to my daughter Cicely Wilson. I believe she wrote to you giving you his name. I also sent a copy to Tantine so that there should be no cross purposes. Excuse the manner of the copy, but letters are so soon too bulky.

I sent your letter on to my daughter, because in it you spoke of the eventual translation into English; to ask her if she would be willing to undertake that should you be willing. You see she has lived in France for short periods, & so would have enough command of French to understand that an idiom needs careful rendering & her own literary knowledge & polish are considerable. And I think we should all be very gratified if you were able to approve of such a scheme. She wrote that she would love to do it if & when you wished it, but that she felt she was hardly the one to propose it

Thank you so much for helping me about Publishers &. I found a second-hand copy of "The Web" – original edition – in excellent condition & a new Indian edition of "The Master" – very well printed & very clear for reading. – in Luzac's. They informed me that the latter was in good demand. I am so glad I shall have the pleasure of seeing you. I am asking Mlle Raymond if I can come a little sooner.

নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনের চিঠি—জিন হারবার্টকে ১০. ৮. ৩৭ তারিখে লেখা। রেম'-হারবার্ট নিবেদিতার জীবনী রচনার পূর্বে মিসেস উইলসনের সঙ্গে কি ধরনের যোগাযোগ রেখেছিলেন, তার কিছু নমুনা এই চিঠি থেকে পাঠক পাবেন। সেই সঙ্গে নিবেদিতার বোনের হস্তাক্ষরের নমুনাও; ভাই রিচমণ্ডের একটি চিঠির প্রতিলিপিও আমরা দিয়েছি। পত্রমধ্যে নিবেদিতা সম্বন্ধে ডঃ বসুর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদন লক্ষণীয়।—গ্রন্থের ৪০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

For I find so many final Engagements pushed into October.

I am very thrilled in seeing how well you understand this business of building a biography not only on facts but also on atmosphere. That is where I feel an Oriental mind could not catch the Elusiveness of an Occidental idealist! However you know so much more than I. but and mine may only be an inhibition

I had such nice answers from the Boses - I love them for Nivedita's sake as well as their own

Sir Jagadis Bose says "he shall of course be pleased to meet Monsieur Jean Herbert and Mlle Reymond when they come to Calcutta. The only thing I could tell them is however in regard to Nivedita's help throughout my uphill scientific work against tremendous odds till it received full recognition. No one who knows the real state of things will realise how much the cause of Indian Nationality owes to Nivedita's selfless devotion & long suffering" (But here again is atmosphere!)

Have you been in communication with her brother Richmond Noble who is living in Jamaica? If not we must do something about it because he can also add to the store of Knowledge. He was 10 yrs younger

With kind regards. Sincerely yours
Mary L. Wilson

নিবেদিতার ভাই রিচমণ্ড নোবলের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় ক্রীশ্চান মিশনারী প্রভৃতিরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে কি ধরনের প্রচারকার্য চালাত।—৪২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

21A High St.,
Wimbledon
S.W.
Aug. 1st/02

Sir,

In reference to an article which appeared yesterday in the 'Leader' and which is exaggerated in 'Star' on Vivekananda, I would beg to suggest that your have been mightily abused. I know how careful you usually are in regard to articles published under your editorship, I am therefore the more surprised that an *unsigned* article written by an enemy—for Swami had many bitter enemies, some missionaries, some Anglo-Indians on account of Swami's denunciations of them, and others—should have been allowed in. Men like Lord Reay, Archdeacon Wilberforce, and Mr. Macniel (St. James Gazette) knew and reverenced Swami. The late Mr. Haweis was one of his most intimate friends. Though I am soon to be ordained in the Orders of the Church of England, yet having come into contact with Swami I have learnt, while still retaining my Christian Faith, to appreciate so good a man.

You know that even here men of great intellect (e.g. the late Mr. Galdstone) have many bitter enemies who leave no stone unturned to blacken their characters, a fortune (?) when a man is dead and that in a distant land how much easier it is to attack him and how hard to defend him. Your paper is different to the others, and had it appeared in the 'Globe' or 'Mail' I would have passed it, but yours has been so scrupulously just and interested in the welfare of India that I cannot rest till it is set right.

Yours faithfully,
R. S. W. Noble

[বিষয়বস্তুর প্রতিলিপি পরের পৃষ্ঠায়]

~~Private~~ To the Editor of the Morning Leader

21A High St., London
Wimbledon
S.W.
Aug 1st/02

Sir,

In reference to an article which appeared yesterday in the 'Leader' & which is exaggerated in 'Star' on Vivekananda, I would beg to suggest that you have been mightily abused. I know how careful you usually are in regard to articles published under your editorship. I am

therefore the more surprised that an <u>unsigned</u> article written by an enemy. for Swami had many bitter enemies some missionaries, some Anglo-Indians on account of Swami's denunciations of them, and others — should have been allowed in. Men like Lord Reay, Archdeacon Wilberforce, & Mr. MacNiel (St. James' Gazette) knew and reverenced Swami. The late Mr. Haweis was one of his most intimate friends. ~~My sister~~ Though I am ~~als~~ soon to be ordained

in the Orders of the Church of England, yet having come into contact with Swami I have learnt, while still retaining my Christian Faith, to appreciate so good a man.

You know that even have men of great intellect (e.g. the late Mr. Gladstone) have many bitter enemies who leave no stone unturned to blacken their characters, a fortiori when a man is dead & that in a distant land how much easier it is to attack him and how hard to defend him. Your paper is different to the others, & had it appeared in the 'Globe' or 'Mail' I would have passed it, but yours has been so scrupulously just & interested in the welfare of India that I cannot rest till it is set right.

Yours faithfully,

R. S. W. Noble

6

THE CHRIST CHILD.

It is Christmas time, and at this season, when the very air seems laden with carols, when homes for the most part are at their happiest, and when the children are glad with the universal gladness of the time, there seems a special call upon us to go back in thought to that first Christmas-tide, so long ago, whence proceed this joy and blessedness.

Christmas—the Christ time—is a widespread festival. Throughout Europe, from north to south and east to west, it rings a merry peal to loving thought and kindly household cares; and children, as it comes, lie awake at night to think about Santa Claus, and to cast up their private accounts with conscience, or fall asleep may be, to dream of Christmas fairies, and the wonderful star of old; while even the grown people find themselves wondering why the words, "In Bethlehem of Judæa, in the days of Herod the King," have power to raise such a world of vague emotions in their minds. It has long been so. Christmas has grown with our growth, and strengthened with our strength. Long ago, in these northern lands, we had the Yule-tide, with its religious mysteries, and its greater or less excess. But there crept a new joy into the lives of men, and in its honor they did re-name the great feast of the year's home-season—for what reason better than that a little child had come into the world?

A little child! Say rather a mighty soul, that has stood at the helm, and handled the rudder of human nature through all the ages since—a little child "Bethlehem of Judæa in the days of Herod the King." The words linger on our lips, and slowly we go backwards to the picture. It is very still and silent, midnight, and the eternal stars shine down on Bethlehem as they do on Athens and on Rome. Which of them, glittering points in the revolving chariot-wheel of God, knows or recks that Bethlehem to-night has received a jewel from the hand of Truth brighter than any gleaming on the brow of Athens, that the glory of Israel, though, perchance, pale and dim, burns to-night with a steadier, intenser flame than even the fierce glowing lights of Rome? The stars are cold and distant, and Bethlehem is still. The hour is fraught with the destinies of ages, yet the silence is unbroken. Save by one sound—in the deep hush we hear the cry of an infant, and the scene is quiet no longer; for that cry echoes through all Christendom, and the joy of 1800 years come rolling back to us in a glad tide of music—the music of Church bells and children's carols, of the anthems of the old who depart in peace, with the hymns of the young who get them ready to the battle, aye, and no little of it, the cry of strong hearts on whom the Christ-child has descended in their struggling, with all the benediction of Truth.

The picture itself is a homely one—a rough cave, a gracious woman on whose lap lies a tiny babe, an old man attending on them, and in the shadows (for so the conception of art has grown into the heart of the world), a little black lamb, gazing on the mother's love-treasure with great lustrous eyes full of a wistful yearning consciousness. A strange group truly, yet with nought of grandeur to the careless eye, and we, who kneel in thought beside the forms of mighty dead, may well wonder at the magnetism that has drawn man hither, through so many ages, as to the soul's true house of bread. It is not in the scene that we find the answer, but in its issues: not Bethlehem, but the Wilderness draws us in reality; not the child, but the Christ Child. This is the birth-night of a genius, to whom, as to all genius, more or less, the right and good of common men will be utter depravity and baseness; to whom mighty anguish will be the breath of nature; whose crown shall be won in death; who by the majesty of His own self-sacrifice shall first make the path for each man beyond the the little circle of self to the centre of the greater circle of the love of Humanity, yet, who in the midst of pain and woe and sorrow, shall be happy, gloriously happy withal, in the sense of having caught the whispers of the God-voice; of having come closest of all to the burning, throbbing heart of Truth. The happiness of Christ—we laugh at the words. Yet, let us bethink ourselves. Is this not the very secret we learn from Him—how to know the crown of thorns, the crown of glory, the unutterable fullness of beatitude in the hungering and thirsting after righteousness? It is impossible, as we watch the sweet story grow, to help thinking of the old Indian Buddha, who was tempted and tried, yet became "the blessed" so many centuries before. We cannot repress the thought of Socrates, as we look at this life's stern loyalty to truth, with its winning lowliness and grace. Undoubtedly they are there, Buddha and Socrates, but whether their memories fell athwart the cradle of the Christ, or whether they agree as brethren sprung right from the common soul of human genius, who can tell?

Bethelehem stands out on the face of history like a grand white cameo—a pure woman and a pure child; and we should never forget that the call it sent forth to all the world proved the first spell potent to raise in the mind of man the idea of the universe. The Christianity that held Western Europe so long under its sway did not wrongly give itself the name of Catholic, for it was the outcome of man's earliest assumption to conceive of things in their totality. We follow the steps of the Christ Child reverently; we see Him turn with bitter consecration from the loves and hopes and happiness of common souls; we hear Him cry, "Come unto Me all ye that labor and are heavy laden," with the yearning pity of only a royal soul; we bend in awe before Calvary's sublime enthronement of human sorrow; and we feel the truth of the quaint old German tales of the child who comes to us in the snow of the winter-tide, in cold and hunger and want, but departs with words of blessing, and leaves us to say we have seen a prince, for the Christ Child has been here.

NEALAS.

Christmas 1887.

এই প্রবন্ধটি ১৮৮৭ সালে অর্থাৎ নিবেদিতার ২০ বছর বয়সে লেখা। প্রবন্ধের তলায় নিবেদিতার প্রিয় ছদ্ম-নাম—'নীলাস'। তার তলায় তিনি নিজের হাতেই 'Christmas 1887' লিখে রেখেছেন।—গ্রন্থের ৪৬৬-৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Viola. Bromley Kent.
July 15. 1907

Dear Madam

We were very pleased to get a word from you. We well remember the few pleasant hours we spent together when you came with our dear friend, Mrs. Ole Bull, and we were so pleased to hear that Miss Noble is perhaps coming soon to England.

We are just now leaving for Brittany, for 5-6

বিশ্ববিখ্যাত রুশ মনীষী ও বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের পত্র। চিঠিটি সম্ভবতঃ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা। পত্রমধ্যে নিবেদিতার উল্লেখ আছে। Viola. Branly (?) Kent.

weeks, but we hope to
have the pleasure of
seeing you some day in
the fall. —

When you write to Mrs
Ole Bull, or to Miss
Noble give them please
our warmest greetings.

With kindest regards
from my wife and myself
I am, dear Madam

Yours sincerely
P. Kropotkin

July 15, 1907

Dear Madam,

We were very pleased to get a word from you. We well remember the few pleasant hours we spent together when you came with our dear friend, Mrs. Ole Bull, and we were so pleased to hear that Miss Noble is perhaps coming soon to England.

We are just now leaving for Brittany, for 5-6 weeks, but we hope to have the pleasure of seeing you some day in the fall.

When you write to Mrs. Ole Bull or to Miss Noble give them please our warmest geetings.

With kindest regards from my wife and myself. I am, dear Madam,

Yours sincerely
P. Kropotkin

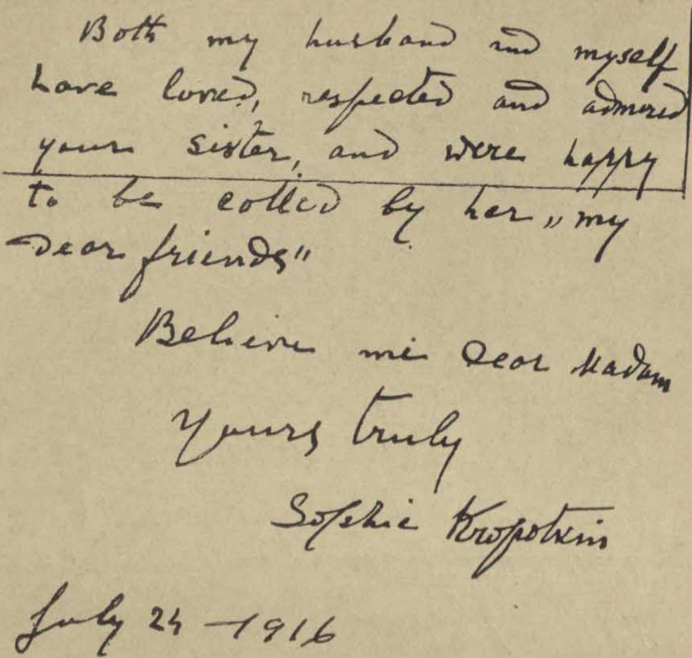
Henfield
Sussex

Dear Madam

your letter after many readdressings found us here in a small village in Sussex. We return to Brighton at the end of this week and I shall look among old letters and if there any from your sister will send them to you with great pleasure.

We are glad to hear that Miss Noble's biography is going to be written. A life like her's consecrated to the oppressed ones will be most welcome now. Humanity of today, perhaps

more than at any other time is in need of biographical sketches of such lofty noble souls as Margaret Noble was.



প্রিন্স ক্রপটকিনের পত্নী সোফি ক্রপটকিনের লেখা এই পত্রে নিবেদিতার প্রতি অকুণ্ঠে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। যে-রকম সম্ভ্রম ও অনুরাগের সঙ্গে ইনি নিবেদিতার বিষয়ে বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় নিবেদিতার সঙ্গে ক্রপটকিন-পরিবারের কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল। ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য আমরা পরবর্তী খণ্ডে দেব।—৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Henfield
Sussex

Dear Madam,

Your letter after many wanderings found us here in a small village in Sussex.

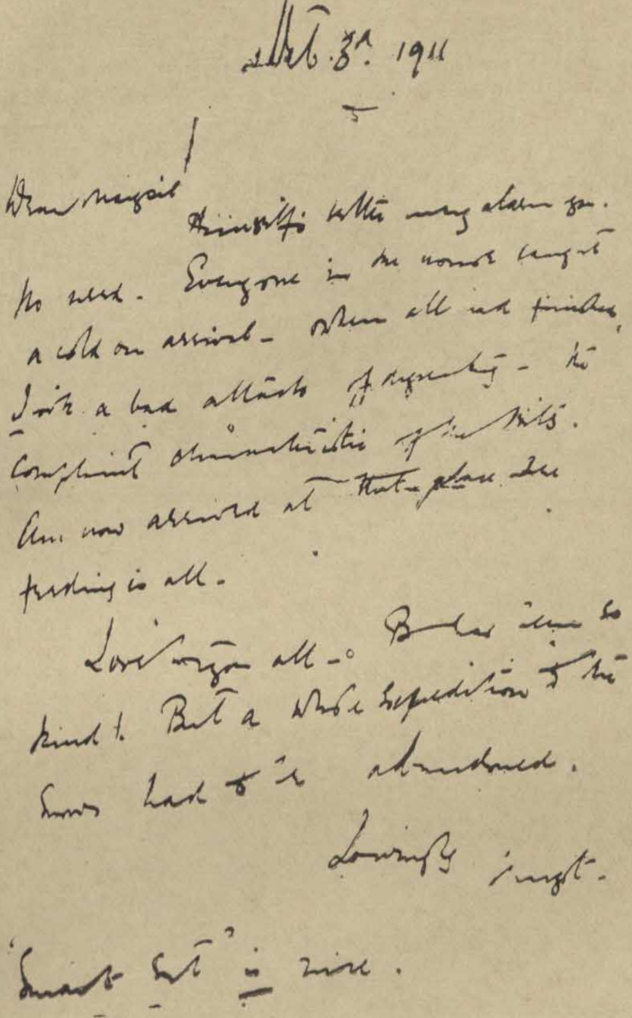
We return to Brighton at the end of this week and I shall look among old letters and if there any from your sister, will send them to you with great pleasure.

We are glad to hear that Miss Noble's biography is going to be written. A life like her's consecrated to the oppressed ones will be most welcome now. Humanity of today, perhaps more than at any other time is in need of biographical sketches of such lofty noble souls as Margaret Noble was.

Both my husband and myself have loved, respected and admired your Sister, and were happy to be called by her "my dear friends".

July 24, 1916

Believe me dear madam
Yours truly,
Sophie Kropotkin



Oct. 3rd. 1911

Dear [illegible]

[illegible] letter may alarm you. No need. Everyone in the house caught a cold on arrival — when all [illegible] finished, I got a bad attack of [illegible] — the complaint characteristic of the hills. Am now [illegible] at that place. [illegible] is all.

Love to you all. [illegible] But a whole expedition [illegible] has had to be abandoned.

Lovingly [illegible]

[illegible]

৩ অক্টোবর, ১৯১১-এর এই চিঠিটি সম্ভবতঃ বাড়িতে পাঠানো নিবেদিতার শেষ চিঠি। লিজেল রেমঁকে রিচমণ্ড নোবল যে স্মৃতিকথা পাঠান, তাতে নিবেদিতার সর্বশেষ চিঠির কথা বলা হয়েছিল, যাতে 'হস্তাক্ষর এলোমেলো', যাতে নিবেদিতার স্বাভাবিক 'দৃঢ়-মুদ্রিত, ব্যক্তিত্বময়' রচনা নেই। নিবেদিতা ঐ পত্রে জানিয়েছিলেন, যদি তাঁর অসুখের কোনো সংবাদ পেঁছে থাকে তাতে যেন গুরুত্ব দেওয়া না হয়, ইত্যাদি। — ৪৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Oct. 3rd. 1911

Dear Magsil (?),

Himself's letter may alarm you. No need. Everyone in the house cought a cold on arrival—and when all had finished, *I* took a bad attack of dysentery—the complaint characteristic of the hills. Am now arrived at that place when feeding is all.

Love to you all. B has been so kind! But a whole expedition to the snows had to be abandoned.

Lovingly,
Margot

· [' '] *is* nice.

পূর্বজীবনে লেখিকা

রিচমণ্ড নোবল বলেছেন, 'মার্গট যেখানেই যেত সেখানেই একটা সাহিত্য সংস্থা গজিয়ে উঠত'—আগেই তা জেনেছি আমরা। মিসেস উইলসন জানিয়েছেন, 'শিক্ষকতার সঙ্গে সাংবাদিকতাও সে করত।' মিস সিসিলি উইলসন নিবেদিতার কয়েকটি ছদ্মনামের উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয় তাঁর আটাশ বৎসর বয়সে। তার আগেই তিনি লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে। এই কালে যেসব লেখা লিখেছেন, সেগুলির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। প্রায়ই ছদ্মনামে লিখতেন বলে আরও অসুবিধা। সিসিলি উইলসনের চিঠিতে আমরা আগেই দেখেছি, তাঁদের কাছে মার্গারেট-মাসীর 'প্রভূত সংখ্যক' প্রবন্ধ ছিল। রেম-সংগ্রহে আমরা কয়েকটি লেখা পেয়েছি, 'প্রভূত সংখ্যক' নয়। এই লেখাগুলির অধিকাংশই আমরা এখানে উপস্থিত করছি, মূল ইংরাজীতে, অনুবাদ করে নয় (মাত্র একটি ব্যতিক্রম), কারণ এগুলি অন্যত্র কোথাও নেই বলেই মনে হয়, সুতরাং নিবেদিতা-গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

যে-সব রচনা আমাদের কাছে আছে, তার মধ্যে নিবেদিতার পরবর্তী সব কয়টি ভূমিকার পূর্বপ্রস্তুতি পর্ব দেখা যাবে। সেবা, শিক্ষা ও ধর্মান্দোলনে অংশ, করোটি-তত্ত্ব ও রহস্যময় স্পিরিটের বিষয়ে কৌতূহল, সেই সঙ্গে জাতীয়তা-নির্ভর রাজনীতির প্রতি আসক্তি, সব কিছুই। প্রাপ্ত রচনাগুলির মধ্যে দু' একটি মুদ্রিত করছি না। যেমন চার্চের তর্ক বিতর্কের কিছু লেখা, যা *Churchman V. Interloper* —এই শিরোনামায় চিঠিপত্র কলমে বেশ কিছুদিন ধরে বেরিয়েছিল। এই বিতর্ক নিতান্ত স্থানীয় এবং এর সমস্ত আকর্ষণ সেই কালেই সীমাবদ্ধ; তাছাড়া নিবেদিতা বিতর্কে কোনো এক পক্ষে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি কে—'চার্চম্যান' না 'ইনটারলোপার'—সুনিশ্চিতভাবে ধরা শক্ত। এ বিষয়ে শ্রীমতী রেমও কোনো আলোকপাত করেননি। একমাত্র উপায় রচনাভঙ্গি থেকে অনুমান করা, এক্ষেত্রে আমরা সে কাজ করতে চাইছি না।

এ ছাড়া বাদ দিচ্ছি একটি লেখা যেটি নিবেদিতার কি না বলতে পারব না। লেখাটি সুদীর্ঘ, নাম— *Notes on the Life of Frederic III Emperor of Germany and King of Prussia.* লেখাটির শিরোনামার তলায় লেখা আছে—"Specially translated from the German for the *North Wales Guardian*" শেষে লেখা—K. W. Kingston House, Wrexham রেম-সংগ্রহে এই লেখার একটি প্রুফ কপি রয়েছে। এটি যে নিবেদিতার লেখা তা স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। নিবেদিতার কাগজপত্রের মধ্যে প্রুফ কপি থেকে-যাওয়া যেমন লেখাটি তাঁর হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়ে দেয়, অপরপক্ষে যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, নিবেদিতা যথেষ্ট পরিমাণে জার্মান জানতেন, ততক্ষণ বলা যাবে না এটি তাঁরই করা অনুবাদ। এ ছাড়া নর্থ ওয়েলস্ গার্ডিয়ান পত্রিকার ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৮-র একটি

সম্পাদকীয় রেম-সংগ্রহে রয়েছে, যার বিষয়বস্তু সমস্ত বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর হিসাব নিকাশ। এই পত্রিকার সঙ্গে নিবেদিতার যোগ ছিল বলে এটি তাঁর লেখা হতেও পারে। কিন্তু না হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে, কারণ এই সম্পাদকীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই রক্ষণশীল। এতে গ্লাডস্টোনকে তাঁর উদারনীতির জন্য আক্রমণ করে রক্ষণশীল শাসনকে সমর্থন করা হয়েছে, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের গুণগান রয়েছে।

এর পরে লেখাগুলি উপস্থিত করছি :

THE CHRIST CHILD

শিশু খ্রীস্ট

[লেখাটির তলায় হাতে লেখা তারিখ দেওয়া আছে 'ক্রীসমাস, ১৮৮৭।' দেখে মনে হয়, ঐ তারিখ নিবেদিতার নিজেরই হাতে লেখা।

পরবর্তীকালে ধর্ম ও দার্শনিকবোধে পরিবর্তন ঘটার জন্য নিবেদিতার খ্রীস্টপ্রীতির কথাটা অনেক সময়ে আবৃত থাকে। নিবেদিতা এক পত্রে লিখেছেন, 'আমি গোঁড়া খ্রীস্টান ছিলাম', তা আগেই দেখে এসেছি। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই, নিজস্বভাবেই, সেই গোঁড়ামিতে ভাঙন ধরে, স্বামীজী সেই ভাঙনকে সম্পূর্ণ করে এক নতুন ভাবজগতে তাঁকে স্থাপন করেন, যাতে খ্রীস্টানীর কোনো ঠাঁই নেই, কিন্তু খ্রীস্ট ও খ্রীস্টীয়তার পূজ্য আসন। শৈশব সংস্কারের মধ্যে যে-খ্রীস্টকে নিবেদিতা পেয়েছিলেন, শেষ অবধি তিনি নিবেদিতার মনে রয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান রচনাটি তাঁর যৌবনের খ্রীস্ট-প্রীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত।

খ্রীস্টকে কেন্দ্র করে এই ধরনের রচনা খ্রীস্টান জগতে প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ পাদরী যাজকদের পরিবারের মধ্যে। ভাষণ দেবার কালে খ্রীস্টজীবন ও বাণীর কোনো অংশকে বেছে নিয়ে ভাব বা বক্তব্য বিস্তার পাদরীদের করতেই হয়। নিবেদিতার পিতা সে-কাজ করেছেন, এবং ঐসব উপদেশ-ভাষণের মধ্যে তিনি তাঁর কবিহৃদয়কে উজাড় করে দিতেন, নিবেদিতার নিজের কথায় তাও দেখেছি। পিতার উপদেশ-ভাষণগুলি নিবেদিতার খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর ভাইয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী নিবেদিতা স্বয়ং উপদেশ-ভাষণ লিখতেন।

আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তু যীশুর জন্ম, যার জন্য 'সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক।' খ্রীস্টের অন্য মূর্তির তুলনায় নিবেদিতা শিশুমূর্তিকেই বেশী ভালবাসতেন, তা তাঁর পরবর্তী লেখা থেকেও বোঝা যায়। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের যে-বর্ণনা করেছেন, তাতে দেখি, র‍্যাফেলের আঁকা Sistine Child -এর ললাটের কোমলতা ও মহিমা স্বামীজীর মুখে তিনি দেখেছিলেন। গোপালের মায়ের কথা লিখবার সময়ে শিরোনামা দিয়েছিলেন—'Gopaler-Ma: The Mother of the Christ-Child'

এই লেখাটি লেখার সময়ে নিবেদিতার বয়স একুশের মত। এর মধ্যে হৃদয়

উজাড়-করা খ্রীস্ট-প্রীতি রয়েছে। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গোঁড়া খ্রীস্টানী একেবারে নেই। খ্রীস্ট ত্রাণকর্তা সত্য, কিন্তু তিনিই একমাত্র নন। তাঁরও পূর্বসূরী আছেন। খ্রীস্টের কথা লিখতে গিয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে—"এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বুদ্ধের কথা না ভেবে পারি না, যাঁকে প্রলোভিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধত্ব পেয়েছিলেন, বহু শতাব্দী পূর্বে। মনে থেকে মোছা যায় না সক্রেটীসের কথা—তাঁর জীবন—সত্যের প্রতি কঠিন আনুগত্যে পূর্ণ অথচ বিনম্র বিজয়ী লাবণ্যে সিক্ত সেই জীবন। নিঃসন্দেহে তাঁরা আছেন, বুদ্ধ এবং সক্রেটীসেরা, কিন্তু খ্রীস্টের দোলনার উপরে তাঁদের স্মৃতিবারিবর্ষণ হয়েছিল কিনা কে বলবে—কিংবা তাঁদের ভাবৈক্যের মূলে কি রয়েছে মানব-প্রতিভার অখন্ড উৎস থেকে জন্মগ্রহণ—তাই বা বলবে কে?"

করুণার বিগ্রহ বুদ্ধ এবং সত্যের শুদ্ধ আকার সক্রেটীসকে যিনি খ্রীস্টের পূর্ববর্তী বলে স্মরণ করেন, তিনি খ্রীস্ট বিষয়ে নূতন ভাবনায় সমর্থ। দেখি যে, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্টের যন্ত্রণা শিহরিত স্বীকৃত মূর্তির পরিবর্তে খ্রীস্টের আনন্দ-মুরতিকে দর্শন করতে চেয়েছেন।—

"এ হোল এক প্রতিভার জন্মরাত্রি......যাঁর কাছে নিজ মৃত্যুই নিজ মুকুট।...... যিনি যাতনা, শোক ও দুঃখের মধ্যেও সুখী, সগৌরবে সুখী, কেননা ঈশ্বরের স্বরমর্মর তাঁর কানে পশেছিল; তিনি সত্যের জ্বলন্ত, স্পন্দিত হৃদয়ের সবচেয়ে নিকটে এসেছিলেন। 'সুখী' 'খ্রীস্ট!'—শুনলেই হাসি পাবে। তবু যদি ভেবে দেখি!"

আলোচ্য রচনাটির মধ্যে তীব্র অনুভূতিস্রোত বহমান। খ্রীস্টজন্মের গভীর তাৎপর্য, তাকে কেন্দ্র করে সমগ্র খ্রীস্টান জগতের আনন্দোৎসব লেখিকা যেন সত্তা মেলে অনুভব করেছেন। তারায় তারায় বেজেছে যে পদধ্বনি, তারই পদাবলী রচনা করতে চেয়েছেন তিনি। অলঙ্কার দিয়েছেন সুন্দর ক'রে—ইতিহাসের বক্ষে বেথলিহেমকে তাঁর মনে হয়েছে মহান মর্মর-পট, যাতে খোদিত পবিত্র নারী ও পবিত্র শিশু। 'ছোট্ট শিশু! আ-হা! বলো, বিরাট শক্তিধর আত্মা—জন্মপরবর্তী শতাব্দীগুলিতে মানবপ্রকৃতির কর্ণধার।' পবিত্র পুরাণী-সুরে লিখে গেছেন—"'জুডার বেথলিহেম—হেরড রাজার কালে'—কথাগুলি জড়িত-মর্মরিত হয় আমাদের কণ্ঠে, ধীরে মন পেঁছিয়ে যায় 'চিত্রটির' কাছে : একেবারে নিথর, নীরব, নিশীথরাত্রি —চিরতারকার আলোক ঝরছে বেথলিহেমের উপরে, এথেন্স ও রোমের উপরেও।"

তারপরে, সেই চির পুরাতন কাহিনী নতুন হৃদয়ের ভাষায় :

সেই চিরদিনের প্রশ্ন আকাশভরা তারা-সাগরের দিকে তাকিয়ে—বলো, তারকাদের মধ্যে কে জানো, আজ রাত্রে বেথলিহেম একটি রত্ন পেয়েছে, যা এথেন্সের ললাটরত্নের চেয়েও উজ্জ্বল, রোমের ধাঁধানো আলোকের চেয়েও, যা স্থিরতর নিবিড়তর জ্যোতিতে দীপ্যমান ম্লান ইজরায়েলের শিখরে! রাত্রি, শীতল সুন্দর সারি সারি নক্ষত্র, স্তব্ধ বেথলিহেম। নিয়তি-সমুদ্যত প্রহর, কিন্তু এখনো অভগ্ন নীরবতা। সহসা একটি শব্দ—মৌনের বুকের ধ্বনি-শিহরণ—একটি শিশুর কান্না —তখনি সঙ্গীতে অশান্ত দৃশ্যপট—সেই কান্না ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র খ্রীস্ট-পৃথিবীতে, আর, ১৮০০ বছরের আনন্দতরঙ্গ সমুদ্রসঙ্গীতে ভেঙে পড়ল আমাদের

উপরে : গির্জার ঘণ্টারব ও শিশুদের প্রার্থনার সুর, শান্তিতে বিদায়ী বৃদ্ধদের উদ্দেশে প্রশস্তিগীতি, সমরে প্রস্তুত যৌবনের বন্দনাগান, শিশু খৃীস্ট যাদের সংগ্রামী হৃদয়ে আবির্ভূত সেই সব বীরপ্রাণের নির্ঘোষ......।]

It is Christmas time, and at this season, when the very air seems laden with carols, when homes for the most part are at their happiest, and when the children are glad with the universal gladness of the time, there seems a special call upon us to go back in thought of that first Christmas-tide, so long ago, whence proceed this joy and blessedness.

Christmas—the Christ time—is a widespread festival. Throughout Europe, from north to south and east to west, it rings a marry peal to loving thought and kindly household cares; and children, as it comes, lie awake at night to think about Santa Claus, and to cast up their private accounts with conscience, or fall asleep may be, to dream of christmas fairies, and the wonderful star of old; while even the grown people find themselves wondering why the words, "In Bethlehem of Judaea, in the days of Herod the King," have power to raise such a world of vague emotions in their minds. It has long been so. Christmas has grown with our growth, and strengthened with our strength. Long ago, in these northern lands, we had the Yule-tide, with its religious mysteries, and its greater or less execss. But there crept a new joy into the lives of men, and in its honor they did re-name the great feast of the year's home-season—for what reason better than that a little child had come into the world?

A little child! Say rather a mighty soul, that has stood at the helm, and handled the rudder of human nature through all the ages since—a little child "Bethlehem of Judaea in the days of Herod the King." The words linger on our lips, and slowly we go backwards to the picture. It is very still and silent, midnight, and then eternal stars shine down on Bethlehem as they do on Athens and on Rome. Which of them, glittering points in the revolving chariot-wheel of God, knows or recks that Bethlehem to-night has received a jewel from the hand of Truth brighter than any gleaming on the brow of Athens, that the glory of Israel, though, perchance, pale and dim, burns to-night with a steadier, intenser flame than even the fierce glowing lights of Rome? The stars are cold and distant, and Bethlehem is still. The hour is fraught with the destinies of ages, yet the silence is unbroken. Save by one sound—in the deep hush we hear the cry of an infant, and the scene is quiet no longer; for that cry echoes through all Christendom, and the joy of 1800 years come rolling back to us in a glad tide of music—the music of Church bells and children's carols, of the anthems of the old who depart in peace, with the hymns of the young who get them ready to the battle aye, and no little

of it, the cry of strong hearts on whom the Christ-child has descended in their struggling, with all the benediction of Truth.

The picture itself is a homely one—a rough cave, a gracious woman on whose lap lies a tiny babe, an old man attending on them, and in the shadows (for so the conception of art has grown into the heart of the world), a little black lamb, gazing on the mother's love-treasure with great lustrous eyes full of wistful yearning consciousness. A strange group truly, yet with nought of grandeur to the careless eye, and we, who kneel in thought beside the forms of mighty dead, may well wonder at the magnetism that has drawn men hither, through so many ages, as to the soul's true house of bread. It is not in the scene that we find the answer, but in its issues: not Bethlehem, but the Wilderness draws us in reality ; not the child, but the Christ-Child. This is the birth-night of a genius, to whom, as to all genius, more or less, the right and good of common men will be utter depravity and baseness ; to whom mighty anguish will be the breath of nature ; whose crown shall be own in death ; who by the majesty of His own self-sacrifice shall first make the path for each man beyond the little circle of self to the centre of the greater circle of the love of Humanity, yet, who in the midst of pain and woe and sorrow, shall be happy, gloriously happy withal, in the sense of having caught the whispers of the God-voice ; of having come closest of all to the burning, throbbing heart of Truth. The happiness of Christ—we laugh at the words. Yet, let us bethink ourselves. Is this not the very secret we learn from Him—how to know the crown of thorns, the crown of glory, the unutterable fullness of beatitude in the hungering and thirsting after righteousness ? It is impossible, as we watch the sweet story grow, to help thinking of the old Indian Buddha, who was tempted and tried, yet become "the blessed" so many centuries before. We cannot repress the thought of Socrates, as we look at this life's stern loyalty to truth, with its winning lowliness and grace. Undoubtedly they are there, Buddha and Socrates, but whether their memories fell athwart the cradle of the Christ, or whether they agree as brethren sprung right from the common soul of human genius, who can tell ?

Bethlehem stands out on the face of history like a grand white cameo—a pure woman and a pure child ; and we should never forget that the call it sent forth to all the world proved the first spell potent to raise in the mind of man the idea of the Universe. The Christianity that held Western Europe so long under its sway did not wrongly give itself the name of Catholic, for it was the outcome of man's earliest assumption to concieve of things in their totality. We follow the steps of the Christ Child reverently ; we see Him turn with bitter consecration from the loves and hopes and happiness of common souls ; we hear Him cry, "Come unto Me all ye that Labor and

are heavy laden," with the yearning pity of only a royal soul; we bend in awe before Calvary's sublime enthronement of human sorrow; and we feel the truth of the quaint old German tales of the child who comes to us in the snow of the winter-tide, in cold and hunger and want, but departs with words of blessing, and leaves us to say we have seen a prince, for the Christ Child has been here.

NEALAS.
Christmas 1887

HAG-RIDDEN

ডাইনী পাওয়া

[ভগিনী নিবেদিতাও গল্প লিখতেন!

নিবেদিতাকে আমরা অবশ্যই ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর নব রূপায়ণের কর্মে পরবর্তীকালে নিযুক্ত দেখেছি, কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি যে গল্প লিখতেন, তার একটিমাত্র নমুনা আমরা সৌভাগ্যবশতঃ পেয়েছি। ১৮৮৭ সালে লেখা এই ডাইনীর গল্পটিতে (লেখিকার বয়স তখন কুড়ি) শক্তির পরিচয় আছে। এবং এর মধ্য থেকে পরবর্তী নিবেদিতাকেও চিনে নেওয়া যায়। গল্পের বিষয় বিশ্লেষণ করে পাঠকদের রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না, শুধু বলি, যে-দুটি রূপে পরবর্তী নিবেদিতা প্রকাশিত—তাঁর সেই অপূর্ব বেদনাময় মাতৃমূর্তি এবং সত্যের চিরসন্ধান—একটি ডাইনী গল্পের মধ্যেও সেই উভয় রূপের পরিচয় মেলে। ডাইনী—তবু মা—তারই মর্মান্তিক কাহিনী এটি, এবং ডাইনীও 'নিজস্ব-ভাবে নিজস্ব ভূমিতে সত্যসন্ধানী' —মার্গারেট নোবল জানাতে ভোলেন নি। গল্পটিতে আগাগোড়া একটি ভৌতিক রহস্যময় পরিবেশ বজায় রাখা হয়েছে, সেইসঙ্গে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, এবং শেষ কালে ঘটনাধারার আকস্মিক পরিবর্তনে ছোট গল্পের রীতি রক্ষা। সাহিত্যরসিক পাঠকেরা এই গল্পটি থেকে গল্পকার নিবেদিতাকে আবিষ্কার করে, এই পথে হায় কেন তাঁর প্রতিভা প্রবাহিত হল না, বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারবেন।

প্রথমে গল্পটির সম্পূর্ণ অনুবাদ দিই—]

একটি কুটিরের সামনের দরজার উপরে এই সাইনবোর্ডটি টাঙানো—

> 'জেনেট নাটাল
> গাছ-গাছড়া বিক্রেত্রী।'

থর্নবার্গ প্রান্তরভূমির ধার ঘেঁষে, রাস্তার ঢালের নীচে কুটীরটি। তার গা ঘেঁষে কোন বাড়ি নেই, সবচেয়ে কাছের বাড়িও অন্ততঃ পাঁচশো গজ ব্যবধানে। একসার সিঁড়ি নেমে গেছে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত, গহ্বরের মত জায়গাটার চারধার ঘিরে নড়বড়ে বেড়া। অন্য দিকে ঝুলছে ধুলো-রঙের শুকনো পুদিনার ঝাড়, নানা ওষুধের গাছ-গাছড়া ও তেমনি সব বিদ্ঘুটে গন্ধ ভরা জিনিসপত্র—ব্যবসার পুঁজিপাটা সব।

জানলায় যদিও প্যারিসকা লাড্ডু বা মিঠে গুলির মত ছেলেদের প্রাণের জিনিস রয়েছে, তবু কাছাকাছি গাঁ থেকে কোন ছাওয়াল এসে কোনদিন জানলার কাঁচে নাক থেবড়ে উঁকি দেয়নি, কারণ কুঁড়েটির খুব বদনাম, লোকজন তাই এড়িয়ে চলে, যদি না স্বার্থের খাতিরে হাজির হতে হয়।

নাটাল-বুড়ির মোরগ-মুরগী, ভেড়া-ভেড়ী, এরা সব বাড়ির পিছনকার পাহাড়ে চরে বেড়ায়, সেখানে চরবার মত অনেকখানি জমি পায়, কিন্তু পল্লীর পাদ্রিকে বাদ দিলে থর্নবার্গের আর কেউ বুড়ির বাড়ির ডিম বা মুরগী খেতে ভরসা করে না—খেলেই—বাপ্‌রে—বাঁচোয়া আছে! পল্লীর যত লোকজন, জলা-প্রান্তরের আশপাশের লোকজনসুদ্ধ সবাই, এমন কি সাত মাইল দূরে বারমারসাইড বাজার-শহরের চাকরানি ও ছেলেরাও—সবার কাছেই জেনেট নাটাল 'জ্ঞানী বুড়ি'। তবু —যারা তার সঙ্গে পরামর্শ না করে এক পা-ও চলে না, এবং প্রাপ্তিযোগ ঘটলে সেগুলি কদাপি ভোগ করে না তাকে নমস্কার না-জানিয়ে—তারাও তাকে ভালবাসে না। তারা ভয় করে তাকে, বুড়ির ঘৃণার জ্বালার সামনে কুঁকড়ে সরে যায়। কারণ স্পষ্টই বোঝা যেত, বুড়ির জাদুশক্তিকে যারা নিজেদের প্রয়োজনে লাগাত, বুড়ি তাদের ঘৃণা করত।

কারো কারো কাছে অবশ্য মনে হত, বুড়ি আসলে অন্য জগতের মানুষ, শাপভ্রষ্ট হয়ে নেমে এসেছে। হোঁৎকা চাষা উইলসন এক সকালে তার কাছে সাহায্যের জন্য হাজির হয়েছিল অনিচ্ছাভরে—পরে অবাক হয়ে দেখে, নিজের অজান্তে চাষাড়ে সম্বোধনের বদলে কখন 'মহাশয়া' বলে ডাকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। হোঁৎকা উইলসন এক আঁধার রাতে চার মাইল পথ হাঁটার সময়ে রুপোর ঘড়িটা হারিয়ে ফেলেছিল। ঘড়িটা সে পেয়ে গেল একটা গেটের পাশে খড়ের গাদার মধ্যে, ঠিক যে-জায়গাটির কথা বুড়ি বলে দিয়েছিল। এই ঘটনার পরে বুড়ির পাওনা নিয়ে বিবাদ করার পরিবর্তে—তা করবে বলেই আগে-ভাগে মতলব করে এসেছিল—সে এত শ্রদ্ধাবোধ করল যে, টাকার কথা তুলতেও তার লজ্জা হল, যদিও কৃতজ্ঞতার ঋণ সে শেষ কড়ি পর্যন্ত শুধেছিল। শীতকালে সে কয়েকবার নিঃশব্দে থলে-ভর্তি আলুর বস্তা বুড়ির দরজায় রেখে এসেছিল।

জেনেট নাটালের ঘৃণার পিছনে কিন্তু সে অন্যজগতের মানুষ, এই জাতীয় কোন অহংকার ছিল না। কিংবা নিজের অলৌকিক শক্তির বৃথা বড়াই থেকেও তা আসেনি। তা কি প্রতারিত ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রতারকের অবজ্ঞার উল্লাস?—কদাপি নয়। এই বৃদ্ধা নারীর শক্তির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সে অন্ততঃ নিজ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল, এবং তার প্রয়োগেও দ্বিধাহীন। একবার, মাত্র একবারই সে তার শক্তি ব্যবহার করেছিল সন্তর্পণে, যখন হতভাগিনী অ্যানী উইলডার

তার নাবিক প্রণয়ীর ভাগ্য জানতে এসেছিল—এসেই বুড়ির কোলে মুখ গুঁজে বসে পড়েছিল নারীসুলভ আর্ত সঙ্কোচে আর বড় যাতনায়। তার মাথা-ভরা সোনালী চুলগুলোর উপরে শুকনো শীর্ণ হাতখানি যখন স্নেহভরে রেখেছে, তখন বুড়ির ভাঙা শরীর কিন্তু একেবারে খাড়া, রাজ্ঞীমহিমা যেন ভর করেছে ক্ষণেকের জন্য —আর কোটরগত ধূসর চোখ প্রসারিত কোন এক দূর-দৃশ্যের দিকে। তারপরে উন্মুক্ত ওষ্ঠ থেকে যে-কথাগুলি বেরিয়ে এল, সেগুলি সংখ্যায় অল্প কিন্তু বড় নির্মম—

'বাছা, ওরে বাছা, তোর জোয়ানটার জন্য কাঁদিসনে আর। সে কখনো ঘরে ফিরবে না।'

মেয়েটির সঙ্গে সমপ্রাণতার একটা গভীর আবেগ বোধ করলেও 'জ্ঞানী বুড়ি'র বক্তব্য এতটুকু নরম হল না। বুড়ির চোখে যে ভাসছে তরুণ নাবিকের চেহারাখানি—গভীর জলের নীচে, জটিল আগাছার মধ্যে সে শুয়ে আছে, সমুদ্র-তলের নরম কাদায় ইতিমধ্যেই তার দেহ আধখানা ঢেকে গেছে—ছবিটা এত স্পষ্ট যে, বুড়ি যেন সেখানে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। তারপরে যখন মেয়েটি আঁতকে উঠে কোল থেকে মুখ তুলে চিৎকার করে তীরের মত ছুটে পালাল, তখন তার জন্য করুণার বদলে বুড়ির নৈরাশ্যই হল। এর পরে কয়েকদিন সে প্রবল জ্বরে বিছানায় পড়ে রইল।

কারণ, জেনেট নাটালের নিজের জীবন নিষ্ফলা সন্ধানে কেটেছে। সে তার আশাভঙ্গের জগৎ থেকে আপাত-সুখীদের যখন দেখে, তা যেন পর্বতের চূড়ো থেকে তলায় তাকানো, সহানুভূতির কোন যোগ থাকে না তার মধ্যে।

অনেকে আবার মনে করে আলেয়ার পিছনে ছুটছে সে, তার মগজে পাগলের অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নেই—যদি সত্য হত এ-কথা! জেনেট নাটাল তাহলে হয়তো সান্ত্বনা পেত। কিন্তু সান্ত্বনা সে পায় না, ভিতরের ব্যর্থতার জ্বালা একটুও কমে না। কদাকার এক গাঁইয়াকে যে বলে দিতে পারে, তার প্রেয়সী আসলে বিশ্বস্ত কিনা, সে কিন্তু হায়, কোন বিশেষ একটি দণ্ডিত আসামী এখনো তার ছেলেটিকে বশীভূত করে রেখেছে কিনা, তা দেখতে পায় না। ছেলেটি—আর কেউ নয়—তার নিজের পেটের ছেলে—চল্লিশ বছর আগেও যে তার কোলে বসে থাকত। বুড়ির বিশ্বাস, তাকে অন্যায় ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তবু, নিজের অপ্রাকৃত ক্ষমতা সত্ত্বেও সে আবিষ্কার করতে পারেনি আসল দোষী কে?

যাদের আত্মা তার সঙ্গে একই অন্ধ গহ্বরে নিমজ্জিত নয়, তাদের সম্বন্ধে ব্যর্থতার এই গভীর বেদনা তাকে উগ্র করে তুলেছিল। নিজ জীবনের এই ভয়ানক অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার জন্যই সে যা দেখত বলে দিত কঠোর নিষ্ঠুর ভাবে।

তবু, থর্নবার্গ প্রান্তরের এই জ্ঞানী বৃদ্ধা নিজস্ব রীতিতে এবং নিজস্ব ক্ষেত্রে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যারা যে-কোন মূল্যে সত্যের সন্ধানী।

নভেম্বরের শেষে এক অপরাহ্নে—যে সময়টিতে জেনেট নাটালের মানসিক স্থৈর্য বিশেষ কারণে সর্বদা বিঘ্নিত থাকে—এমনি সময়ে বারমারসাইড বাজার থেকে প্রান্তরের উপর দিয়ে সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ধূসর শুষ্ক শীতল আবহাওয়া, রাস্তার ধারে জলাভূমিতে তুষার-ঢাকা নলখাগড়ার মধ্য দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসের

সন্‌সনানি, তাতে শিউরে কেঁপে ওঠে পিছনের প্রান্তরের শুকনো ফার্ন,—এদের উপর ছড়িয়ে পড়ল সন্ধ্যার মরা আলো,—ঠিক তখনি গাধাটি গাড়ি টেনে পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘুরে উপত্যকায় নেমে গেল থর্নবার্গ চার্চের দিকে। সময়টি বুড়ির প্রিয়, সন্ধ্যার অস্বচ্ছ আলো সে ভালবাসে। গির্জা-চত্বরের নীচু পাঁচিলের এক পাশে রাশি রাশি ঝরাপাতা জড়ো করা আছে, বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাছের মাথার মস্ত শাখাগুলিকে নাড়িয়ে, ডালে ডালে গোঙানির ঘুম-পাড়ানো গান মৃতদের জন্য।

গির্জা-প্রাঙ্গণের মুখে পুরনো ধরনের একটি 'লীচ গেট', যদিও সেটি বেশীদিন তৈরী নয়। সেখানে একটি খুঁটিতে গাধাটিকে বেঁধে বেষ্টনীর মধ্যে বুড়ি ঢুকল।

স্থানটিতে বুক-চাপা স্তব্ধতা, কিন্তু তা বড় জীবন্ত বুড়ির কাছে, অদৃশ্য বন্ধুজনদের সান্নিধ্যে। বুড়ি ভিতরে ঢুকছে, তার বলিকুঞ্চিত দেহে উল্লাসের রক্তিমাভা। তার চোখগুলি সুন্দর, গভীর অন্তর্ভেদী চাউনি, তাতে এখন চাপা উত্তেজনার উজ্জ্বলতা, পুরনো বিমূঢ়তা আর নেই, সন্ধান-ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় তীব্র দীপ্ত।

ভাঙা, কুঁজো দেহটি ঝুঁকে ঝুঁকে এগোতে লাগল এক কবর থেকে অন্য কবরে, প্রতি কবরে থামল, যেন অদৃশ্য কার সঙ্গে কথা বলল। দেখা গেল, সদ্য মাটি-চাপানো কবরগুলির প্রতি তার বিশেষ আসক্তি। আঁধার ঘনিয়েছে, ব্যগ্র চোখ যেন তার মধ্যে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দেখছে। কিন্তু ক্রমে মুখের প্রত্যাশার চেহারা একটু একটু বদলে গেল, নৈরাশ্য, তারপরে একেবারে ভগ্ন আশার বিধ্বস্ত আকার।

'বাছা, ওরে আমার বাছা, আমার দুলাল'—তার গলা চিরে অবশেষে শব্দ বেরিয়ে এল—'তুই কি বাড়িতে ফিরবি না? তোর জন্মরাত্রিতেও নয়? নিজের বুড়ি মায়ের কাছেও ফিরবি না? বাছা, বাছা রে! আমার বাছা রে! দু-বছর আগে দেখেছি, আমিই তোর কফিন বইছি, দেখেছিলাম, এই দিনটিতেই তুই বাঁধন ছিঁড়ে বেরুবি, অথচ তিন বছর হয়ে গেল, তুই এখনো এলি না। ওরে বাছা, তুই নিজের মায়ের কথাও ভাবিস না! বাছা, বাছা, ওরে আমার বুকের দুলাল!'

ককিয়ে কান্না, তবু তারি মধ্যে জেনেট নাটালের রাজ্ঞীমহিমা যায়নি। এই 'ঈশ্বরের ভূমিতে'ও, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও, সে ব্যক্তিগত বেদনায় মগ্ন হবার মত যথেষ্ট নির্জনতা বোধ করল না।

ফেনিয়ে ওঠা কান্না চেপে, শূন্য স্থানটির দিকে পরম সৌজন্যের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বন্ধুগণ, বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে এই গির্জা-প্রাঙ্গণ প্রতীক্ষার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। আমার সঙ্গে তোমরা এস আমার অগ্নিকুণ্ডের পাশে, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত সুখের আশ্রয়, বন্ধুর আহ্বান—খুবই আমোদ বোধ করবে তোমরা—চল সেখানে।'

বুড়ি যখন গাড়িতে উঠছে, পাদরী মহাশয় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'শুভরাত্রি জেনেট।' আর নিজের মনে বললেন, 'নিশ্চয় আবার কবরে কবরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেচারা—আহা বেচারা! প্রতিদিন মাথার গণ্ডগোল বাড়ছে। উইলসনের ঘড়ির ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত।' জেনেট কিন্তু পাদরীকে দেখেনি বা তার সম্ভাষণ শুনতে পায়নি। তার মনোযোগ নিবদ্ধ অশরীরী নীরব

জনতার প্রতি, যারা তার সঙ্গী হয়ে গাড়িতে উঠল। নিঃসঙ্গ গৃহের দিকে গাড়িটি এখনি ছুটবে।

বহু ঘণ্টা কাটল। রহস্যময় অতিথিরা চলে গেছে অনুভব করার অনেকক্ষণ পরে জেনেট নাটাল আগুনের সামনে গিয়ে বসল—মর্মভেদী দৃষ্টি নামিয়ে আনল জ্বলন্ত কয়লার উপরে। ভবিষ্যৎবাণী করার মেজাজ এবার তার উপর ভর করল। এই রকম সময়েই নিজশক্তির উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

নীচু ভাঙা ধরা গলায় সে বলল, তীব্র আগ্রহের থরথরে স্বরে,—'হ্যাঁ, এই তো, তুমি এসে গেছ জেন হেওয়ার্ড—আমার সাহায্য চাইতে এসেছে। ভাল, ভাল কথা, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে, ওগো মেয়ে, ইচ্ছা পূরণ না হলে কত ভাল হয় তা যদি জানতে! ...ওঃ তুমি, হেনরী মরিস, কী চাও—চাবি? তাই তো বটে। আমাকে তাড়া দিও না ছোকরা, ওটা পাওয়া যাবে ঠিক সময়েই। এই যে এটাকে টানো দিকি—এটা একটা ড্রয়ার, ড্রয়ার গো, এর সামনে পিতলের আংটা ঝুলছে, আর এখানে চাবিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে, আর একটা—'

একেবারে তন্ময়, মুখে বিড় বিড় শব্দ, কিন্তু হঠাৎ রুদ্ধশ্বাস আর্তধ্বনি—একটা চেনা ছবি যেন চোখের সামনে—তাই তো বটে!—

'আ—হাঃ! এই তো আবার এসেছ কফিন ধরে—তুমি, জেনেট নাটাল—দেখি—দেখি—দেখি—' লম্বা গলা বাড়িয়ে টলমল করতে করতে বুড়ি উঠে দাঁড়াল, যেন আগুনের মধ্যে চোখ আরও ঢুকিয়ে সে ভবিষ্যৎকে সামনে এগিয়ে আনতে চায়।—'হ্যাঁ, এই তো সেই কফিন—একেবারে একই কফিন—অ্যাঁ, আজ একই দিনে! বাছা, আমার বাছা! ঐ তো নাম লেখা আছে, নিশ্চয় তাই—নাঃ, না তো! কোনো নাম নেই তো! লেখার চাকতিটি যে আয়না হয়ে গেল!—ওর মধ্যে আছে কি? দেখি দেখি! ওহ্ঃ!—ঈশ্বর দেখতে দাও—অ্যাঁ একি—আমি? ও হোঃ হোঃ—এ যে আমি—আমি—!!!' চেয়ারের উপরে সে লুটিয়ে পড়ে গেল, ককিয়ে উঠল আঁ আঁ আতঙ্কে—আর ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রামের মধ্যে গির্জার চূড়োয় ঘণ্টা বাজল একে একে—এগারোটা।

লণ্ডন শহর। ওয়াটারলু ব্রিজের দক্ষিণ দিকের এক দরজার ছায়ায় একটি লোক হাতের উপর ভর করে হুমড়ি খেয়ে আছে—সামনের ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঘোর-লাগা চোখে। তার পোশাক, এবং ছোট করে ছাঁটা চুল দেখলে বোঝা যায় সে খালাস-পাওয়া আসামী। একটা লণ্ঠন ঝুলছে—তার তলায় পরিষ্কার খানিক জায়গা, চলমান পথচারীরা স্বতঃই সেদিকে সমীহের ভাব নিয়ে তাকিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা কালো দস্তানা।

ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশী সময় ধরে লোকটি সেখানে বসে আছে। তার জ্বলজ্বলে চোখ পায়ের সামনে ফেলে রাখা ঐ জঘন্য চ্যালেঞ্জের উপর নিবদ্ধ। হঠাৎ—নিকটের এক ঘড়িতে বাজল এগারোটা। এবং তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই কোণে ধাক্কা দিল।

উৎকর্ণ বাতাসের মধ্যে শেষ শব্দটি যখন কেঁপে নিঃশেষিত হয়ে গেল, তখন

লোকটির মুখে সহসা পরিবর্তন। দাঁড়িয়ে উঠল সে, খাড়া হয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে নিল—'আমি মুক্ত'—সে ধীরে বলল, যেন নূতন পৃথিবীতে সে জেগেছে। দাঁড়িয়ে সে একের পর এক শ্বাস বুক ভরে টানতে লাগল।

দূরে নদী তমসাময়ী—কালীতরঙ্গে ধাবমানা—তার আঁধার ও মৃত্যুর জাদু যেন মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল। লজ্জা-সঙ্কুচিত মুখে লোকটি কালো দস্তানাটা তুলে নিল—ওটাকে সে নিজেই ছুঁড়ে দিয়েছিল।

'আমি মুক্ত'—আবার বলল—'আমি মুক্ত। হ্যাঁ, এই সমস্ত সময়টা আমাকে তাহলে ডাইনীতে পেয়েছিল।'

আত্মার মুক্তির ক্ষণটি। জীবনে সেই প্রথম, তার পঞ্চাশ বছর বয়সে জন নাটাল লাফিয়ে ছিটকে ছুটে চলল। মুক্ত। নিজের জীবন, নিজের স্বভাব গড়ে নেবার পক্ষে মুক্ত সে।

শেষ প্রহরের সংগ্রাম কঠোর, ভয়ঙ্কর, থর্নবার্গ প্রান্তরের বৃদ্ধা নারী এবং লণ্ডন বস্তী অঞ্চলবাসী তার পুত্রের মধ্যে। এখন সব শেষ। বিজয়ী চলে গেল নিজের পথে—প্রত্যাবর্তন করল নিজস্ব প্রকৃতিতে—তা ভাল বা মন্দ যাই হোক; অপর দিকে যে পরাভূত, সে ঘুমিয়ে পড়ল নিজের চেয়ারে, নিঃসঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের পাশে—যে ঘুম চিরদিনের।

JANET NUTTALL
HERBALIST

The cottage, over whose front door hung this sign, nestled by the roadside, skirting Thornburg Moor, at a distance of some five hundred yards from its nearest neighbour. A flight of steps led down to its entrance, and a shaky-looking fence railed in the pit so created, while in the window lay dusty looking bunches of dried mint, sage, cammomile, and other disagreeable and odorous items of the stock-in-trade.

Even had the window contained Parisian bon-bons, and those hard gluey balls beloved of children, no urchin from the nearby hamlet would have flattened his nose against the pane, for the cottage had an evil name, and people shunned it, save when interest of another nature, pressed.

Old mother Nuttall's cocks and hens, and her donkey clogged on the hill behind the house, got a wide berth for feeding-ground, and in no Thornburg household, save and except the vicarage, would eggs and chickens from her poultry-yard have been eaten, without fear of dire results. By all the perish, and the inhabitants of the moor-side, as well as by servant-girls and children as far as Bermerside Market-town seven miles off Janet Nuttall was known as a "wise woman." Yet even those

who took no step in life without consulting her, and enjoyed no boon without her tribute, did not love her. They feared her, and shrank from her contempt. For it was very evident, that the old woman despised those who made use of her occult powers.

To some, it seemed that she had 'come down' in life and burly Farmer Wilson, who came to her for help one morning, involuntarily, and his own amagement, changed the "mother" of his rough address to "Madam". He had lost a silver watch in the course of a four-mile walk on a dark night, and when she subsequently discovered the missing chronometer in a heap of straw, beside the very gate she had indicated to him, instead of disputing her fee, as he had shrewdly foreseen himself doing, he was too delicate even to mention money. But he paid the uttermost farthing of his obligation, several times over during the course of the winter, in sacks of potatoes, left quietly within her door.

Nevertheless, it was from no pride of origin, that the scorn of Janet Nuttall sprang. Neither was it a plumming of herself, on her talents, and least of all, the triumph of the charlatan over his dupe. Whatever the nature of the old woman's gifts might be, she at any rate, believed in them fully. Once, and once only, she had been almost tender in their exercise. It was when poor Anne Willder had come to her to learn the fate of her sailor-lover, and had hidden her face on the old woman's knee, in an agony of terror and maidenly shame. Gently the withered hand had been laid on the golden head, and the frail figure in its high-backed chair, had grown erect and queenly for a moment, while the deep-set grey eyes, dilated to a distant vision. But the words that fell from the parted lips, were few and bitter.

"My lass, my lass, weep no more for your laddie. He'll never come home again!"

In the wise woman, there had sprung up a sudden throbbing sense of kinship, yet she had not softened her message. To her eyes, the figure of young Davey, in his deep sea-grave, lying among tangled weeds, and already half buried in the ooze of the ocean-floor, were as real as if she herself were on the spot, and she told the worst bluntly. Indeed, disappointment rather than pity had been her strongest feeling, when the girl fled from her with a piercing shrick, and for several days afterwards kept her bed, in a high fever.

For Janet Nuttall's own life was spent in a fruitless search, and from her position of despair, she looked down on the merely happy, as from a mountain-height.

The fact that other people would have regarded the object of her efforts as a chimera, and their field of pursuit as an insane delusion, could no way lessen the bitterness of inward failure for her. She could tell a country yokel if his sweetheart

were true to him; but whether a certain convict-person still held the son, who forty years ago, had lain as a babe in her arms, she could not see. And though she believed he had been condemned unjustly she could not, in spite of her gifts, discover the true perpetrator of the crime.

It was this deep knowledge of pain that made her haughty to those whose souls did not lie with hers in the abyss; it was the awful tragedy of suspense in her own life that made her utter remorselessly the thing she saw.

In her own way, and on her own plane, the wise woman of Thornburg Moor was of the member of those who thirst after Truth at any cost.

One afternoon, late in November—a month during which Janet's calm was always somewhat broken,—she was driving her empty cart home across the moor from Bermerside Market. It was a time of cold grey weather, when the breeze whistled among frozen rushes in the pools by the road-side, and stirred the withered bracken on the expanse beyond. Twilight fell as the donkey rounded the shoulder of the hill, and disappeared into the dell where Thornburg Church was situated. It was the hour, and the light that the old woman loved. Under the low-Churchyard wall, Brown leaves had drifted, and in the tree-tops the wind tossed about the huge branches, moaning its weird sleep song over the dead.

A lych gate, of ancient pattern, but recent date, formed the entrance, to the Churchyard, and to one of the posts, Janet fastened her donkey, and then passed into the enclosure.

To her the silent place was alive with friends, delicate flush warmed her wrinkled features, as she entered. Her eyes—beautiful and deep seeing—shone with suppressed excitement, while the customary look of baffled stirring on her face, was heightened into passionate yearning for the nonce.

From grave to grave, the bent old figure went, stopping at each, as if to talk with the invisible, and choosing with marked preference those with new-turned soil. Her eyes strained eagerly into the gathering dusk, and gradually her air of expectation changed to an expression of disappointment, mounting finally to despair.

"Eh my Bavin, my Bavin!" she cried at last. "Will ye no come home? Not on your own birth night? Not to your own old mother? My lad, my lad! Two years I saw myself carrying your coffin, and well I marked that on this day ye would slip your fetters. And now its the third year and ye havena' come. So ye no mind yer old mother! My lad, my lad, my own lad!"

A something of untamed queenliness pertained however to Janet Nuttall, and not even in the darkening God's acre, could she feel sufficiently alone to indulge her private grief.

"Friends," she said mastering a sob, and turning courteously to address empty space, "its ill biding in a Churchyard, in

wind and rain. Come back with me to a warm hearth, for a bit of shelter and a friendly word's always heartsome, and may help ye on to the good land."

The Vicar, passing, as she climbed into her cart, called out "good-night, Janet," and muttered to himself, must have been wandering about among the graves again, poor old body! She grows more daft every day. Strange about Wilson's watch!" But Janet neither saw her pastor, nor heard his salutation. Her attention was engrossed by that silent crowd, who accompanied her in her market cart to her lonely home.

Hours passed away, and long after she conceived her strange visitants to have departed, Janet Nuttall sat before the fire and bent her piercing gaze on the glowing coals. Her prophetic mood was on her and at times like this, she believed firmly in her powers.

"Yes," she said, in a low broken voice, and with evident anxiety, "there ye come, Jane Hayward, asking my help. Well, well, ye'll get yer wish woman but ye were better without it if ye only knew! And ye, Henry Morris, what do ye seek? A Key? I see it! Hurry me not, man. It'll be found, all in good time. Here, pull away something—its a drawer, a drawer, with a brass ring in front of it, and here's the Key! ....Yes, yes, and here's another—"

She had forgotten herself utterly by this time, in her eager muttering, but now she gave a smothered scream as some visions seemed to come upon her with a sense of recognition.

"Oh! here you are again, with the coffin in your arms, you—Janet Nuttall—Let me see, let me see!" and craning her neck, the old woman tottered to her feet, as if by peering further into the fire, she could indeed bring the future nearer to her eyes. "Yes its the same coffin," she went on "the very same, and the same day! My boy! My boy! There's the name upon it surely—why no! There's no name! The plate's a looking-glass—what is in it? Let me see! oh!"

Dear God let me see—why its myself! She fell back into her chair, with a moan of horror, and at that moment, from the Church steeple in the village, rang out eleven strokes.

It was London, and in the shadow of a door-way, on the south side of Waterloo Bridge, a man, whose clothes and closely cropped hair proclaimed him a discharged convict, crouched with folded arms, moodily gazing at the pavement in front of him. There was a clear space there, under a lamp, and passing pedestrians automatically respected it. In the middle of it had been thrown—a black cotton glove.

Already, for an hour or more, the man had sat there with glowering eyes fixed on the sordid challenge at his feet. Suddenly, a nearby clock boomed out eleven, and the sound reverberating, struck down into the corner.

As the last stroke died away on the listening air, a curious

change suddenly came over his face, and he rose and stretched himself. "I am a free man," he said slowly, as if in the light of a new world, and he stood there, taking in one deep breath after another.

The river running black in the distance, had lost the fascination of death and darkness all at once. He bent with a shame faced movement to lift the theatrical emblem he had himself cast down.

"I am free", he repeated, "I am free. Surely all this while, I have been hag-ridden."

It was the moment of the soul's liberation, and for the first time, and at forty years of age, John Nuttall turned with a spring in his step. Free! To carve out a life and a character for himself.

It was a grim battle that had been a fighting that last hour, between an old woman on Thornburg Moor, and her son in a London slum. Now, however, it was over, and the victor went forth to be his own man for good or evil, while the vanquished slept in her chair by her lonely fireside—that sleep from which there is no awaking.

MARGARET NEALAS UNDERWOOD.
About 1887 (M. L. W.)

About 1800 words.

A VISIT TO A COAL MINE

By a Lady

(June 23, 1888)

['কয়লাখনি দেখে-আসা'—রচনাটি উচ্চাঙ্গের। লেখাটির মধ্যে একদিকে পাই বাস্তবরসায়িত একটি বর্ণনা, যাতে কয়লাখনির পারিপার্শ্বিক, যাবতীয় কাজকর্ম, আকার প্রকার প্রভৃতির নিখুঁত বিবরণ রয়েছে, এমনই তা যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংলণ্ডের কোনো কয়লাখনির চেহারা জানতে চাইলে এই লেখাটিকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে দেওয়া যাবে, অন্যদিকে আরো কিছু আছে, যার জোরে জানিয়ে দেওয়া যায়, সাহিত্যে বাস্তবরস সৃষ্টির জন্যই মার্গারেট নোবল দেহধারণ করেননি। ভাবের, আদর্শের ও কল্পনার জগতের চির অধিবাসী ইনি—সামান্যতম স্পর্শে এ'র হৃদয়াগ্নি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মনোযোগী এই ছাত্রী, কোনো কিছুকেই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের (কখনো কখনো প্রাগৈতিহাসিকেরও বটে) প্রেক্ষাপটে স্থাপন না করে, তার পরিচিত অস্তিত্বের ধারাবাহিক, সেই সঙ্গে সুবৃহৎ তাৎপর্যে দর্শন না ক'রে পারেন না। সুতরাং, কয়লাখনিতে উপস্থিত হয়ে,

সেখানকার বহু মানুষের কর্মব্যস্ত রূপ দেখে বিরাট শক্তিতরঙ্গের রূপ অবশ্যই দর্শন করেন,—ভূমিগর্ভের মধ্যে যে মানবপ্রতিভূরা জমাট অন্ধকারতুল্য কয়লার বুকে আঘাত করছে, তারা প্রতীয়মান হয় 'দেবদূত' বলে, সমাহিত উদ্ভিদ জগতের যারা 'পুনরুত্থান' ঘটাচ্ছে, যারা আর এক রূপে 'অগ্নি ও আলোকের স্বর্ণাগার' উদ্ধারে ব্রতী বিরাট শক্তিধর পুরুষের দল। বৈজ্ঞানিক সত্য কল্পনারসে সিক্ত হয়েছে এখানে, ইতিহাস আরোপিত হয়েছে তার উপরে; মার্গারেট নোবল জানিয়েছেন—ঐ খনি-শ্রমিকদের ঘর থেকেই এসেছেন ইতিহাসের অদম্য আত্মার প্রতীক মার্টিন লুথার।

নিবেদিতা বস্তু সত্যকে কখনোই অস্বীকার করেন নি, কখনোই স্বীকার করেন নি একমাত্র সত্য বলে। অতীত জীবন্ত হত তাঁর কল্পনায়, বর্তমান প্রদীপ্ত হত তাঁর চেতনায়। ইতিহাসের কথা যখন তিনি বলেন, তথ্যের ব্যত্যয় না করেও তখন তিনি ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক এবং বিজ্ঞানের কথা যখন বলেন, তখন উপাদান অবিকৃত রেখেও বৈজ্ঞানিক-ঔপন্যাসিক। কয়লাখনির মধ্যে যখন তিনি অবতরণ করছেন—অগ্রবর্তী লণ্ঠনের অতি ক্ষীণ আলোক-সংকেত দপ্‌দপ্‌ করছে আশঙ্কায় —অন্ধ কৃষ্ণগুহায় ঝরঝর জলপতনের শব্দ, প্রবেশব্যাকুল বাতাসের মূঢ় যন্ত্রণাস্বর— সেই সময়ে অকস্মাৎ—দপ্‌ করে নিভে গেল লণ্ঠন, আর—'কয়লার মহালোকে শুধু আমরা—আমরা বহু বহু অতীতের বিশাল ইতিহাসের বুকে।'

মার্গারেট নোবল অবতরণ করলেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে।

...বিশাল নীচু জলাভূমি, তার একেবারে তট পর্যন্ত ঝুঁকে নেমে এসেছে ঘন নিবিড় অরণ্যের আস্তরণ। বিরাট—অতি বিরাট আচ্ছন্ন অরণ্য! যুগ যুগ ধরে তার মধ্যে ঘুরলেও জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মিলবে না—সেই নিশ্ছিদ্র নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে ধ্বনিত হয় সমুদ্রস্তনিত বিশ্বসঙ্গীত, আছড়ে পড়ে হুহুঙ্কারে প্রমত্ত ঝঞ্ঝা, কিন্তু চেতনার কোনো শব্দ নেই—নেই—শুধু হয়ত পতঙ্গের পাখার ঝিম্‌ ঝিম্‌, কিংবা বিরাটাকার সরীসৃপের গোপন গমনের স্পন্দন। আচ্ছন্ন অতিকায় অরণ্য, অজস্র শাখায় পত্রে অসংযত, জটিল, গহন...

সমুদ্র ও অরণ্য! নিঃসঙ্গ, নিথর অন্ধকার চারিদিকে, না, দীপ্তজ্যোতি তারকা-রাজি লণ্ঠনের মতো ঝুলে আছে উত্তপ্ত শিহরিত কুয়াশাচ্ছন্ন বায়ু-যবনিকার উপরে। শুধু তাও নয়, যখন সময় আসে, আকাশ ও সমুদ্রের বর্ণরঙিন সভাতলে আবির্ভূত হয় চন্দ্রমহিমা—বর্ষিত হয় আলোকধারা জলরাশিতে, রুপালি তরঙ্গ ওঠে, পড়ে, ভেঙে যায় লক্ষ চূর্ণে...তাপ-ভীষণ গরীয়ান্‌ দিবসের অবসানে রাত্রি—মোহময়ী যাদুকরী রাত্রি—রহস্যমহিমা গ্রাস করে নেয় সব কিছু...

—সে মহিমা দেখেনি কোনো আঁখি। দেখেছে কল্পনার আঁখি, যেমন মার্গারেট নোবলের।

এই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর অরণ্য কিভাবে যুগে যুগে বিস্তারশীল জল-রাশির দ্বারা নিমজ্জিত হয়েছে, ধীরে অতি ধীরে কিভাবে ভূমিগর্ভে প্রোথিত হয়েছে তা, এমনই ধীরে যে, মহাকালের নয়ন ছাড়া কোথাও ধরা পড়বে না, প্রোথিত অরণ্যের উপরে নূতন অরণ্য উঠেছে, তার উপরে নূতন অরণ্য, নিম্নের অরণ্য যত নেমেছে, তত

কঠিন হয়েছে, শিলীভূত সুকঠিন সেই অরণ্যসমাধি স্তব্ধ হৃদয়ে রক্ষা করেছে অতীত প্রাণাগ্নি—প্রতীক্ষা করেছে কখন মুক্তি দেয় প্রমিথিউসেরা—

মার্গারেট নোবলের চোখে অগণিত খনি-শ্রমিক অগণিত প্রমিথিউস।]

It was some little time ago that, lured by the accounts of a geological and somewhat poetic friend, we were driven to beg an invitation to the scene of his labours, from our kind friend, Mr. William Pattison, the Manager of the Bersham Coal Mine. It is a golden rule to impart the good that we receive, and so bright is the memory of this our visit to the Ebon Fairy-land, and so many good impulses did it raise and develop in us that we feel that others, if they but knew what was to be gained by it, would gladly go and do likewise.

There is something awesome in the busy scene at the mouth of the shaft. Here one stands, muffled up against dust, damp, and draught, in man's cap and coat; in one's hand is the small, heavy lamp which marks out those who are about to descend into the black abyss; around is a perfect network of truck lines, all converging towards the mouth of the pit; at one side is the ribbed, leaden slope, down which each load is emptied, that the lumps and large pieces may bound off into one receptacle, while the small coal slips down the furrows into another; in all directions men are passing and repassing, pushing one business, settling another, beginning something else. Everywhere are Life and Works astir, busy, eager, courageous, as all life work must be, if it will lead to Life Victory. And meanwhile the victory sleeps and smiles beneath our feet! Not one of these men, cheerful, careless, prosaic it may be, but may pass (by a swifter and surer road than most mortals) to the Great Unknown before the evening dews; not one but is fighting a good fight in grim earth/grapple for the very root of human civilization, "ravaging the graveyards of Heaven for the buried gold of fire and light;" and no few are here whose stunted forms and dusky features are shrines, seen by memory's light, of some "deed of grace" that, coming in the way of duty, has been accepted and fulfilled quietly, with the heroism that is most heroic in its humility. The very man who stands at our side, chatting so pleasantly, and so courteously displaying the multitude of scientific contrivanes for our security, is he who, some seven years ago, rushed into the flaming mine, without hope or thought for his own, that he might glorify his responsibility in so saving the life and property of others.

One thrills with admiration. This is a large atmosphere, and one breathes freer in it; but alas! for us, there will be no danger, a woman's path will be as free from that as a garden walk on a fine day.

How comes it, we think, that we never before realised the firm antagonism, the dauntless spirit born in the soul of him

who wrestled as scholar, as saint and as reformer, till the curtain rose and the stage of history was trodden by the son of the miner of Eisleben—the giant souled Martin Luther? Never again shall we look on the black gruesome face of a miner returning from his daily toil without some flutter of reverence, without some of the benediction that ever comes with the recognition of a secret beauty. Yet man here tremendous in the spiritual aspect is insignificant before the magnitude of material fact which fronts us.

Down, down we go, a quarter of a mile into the very thews and sinews of Mother Earth, till we stand on the upper floor of the mine (there is another level beneath this), at the focus of many paths, many truck lines, many double rows along the roof of the same small lamp we carry (the specific virtue of which is that it goes out when tilted, or when in contact "with coal", which is poisonous also to human life), and many double rows too of timber supports, without which the smooth shale above must inevitably fall in, weighed down by overlying strata, and even with which, it has but a limited period of duration. (N.B. There is an outlay of 2,000 a year on this item alone, and Canada is the chief source of supply.) In the distance above us, we hear the dropping of water, like heavy rain, percolating through the sandstone, down which we have just passed ; beside us, the inrush of fresh air makes the organ-music of a great stone ; for a moment the commonplace going and coming have ceased ; our lamp has gone out, and our companion has turned away to replenish it ; we are alone,—alone in the coal country,—alone with a mighty vision of the Long, Long Ago.

Wrexham and all the pleasant country had vanished like a dream, and in its stead lay only a vast tract of low marshy land, clothed with dense forests to its very shores. Immense, dim forests ! within which one might wander in unbroken solitude many lifetimes, hearing the distant world-music of the sea, deafened by the crashing fury of tropical tempests, but unconscious of any sounds indicative of life, save perhaps the buzz of insects, or the stealthy motion of a great reptile here and there. Dim mighty forests, of vegetation too rich, luxuriant, unconditioned, to let them nurse in moss-lap the wee violets and primroses, baby-darlings of the spring wood of to-day. Yet forests wondrous beautiful withal, in their long dark array of ferns and cycads, and their fathom-deep carpet of enormous club-mosses. Beautiful, exceedingly, had there but been mortal eye to note their beauty! Though no ship sailed the sea that lay around those shores, the sun set then as now, in loving, lingering fashion to the west ; then as now, he kissed the treetops through the openings in the many-hued cloudcurtains, ere he took the last step down the golden water-stair, to leave the

Ocean, though bereft of her royal lover, serene in the tender rippling faith that he would come again.

Ocean and forest! alone, still, and but for the great luminous stars that hang like lamps above the misty veil of the hot, trembling air. Yet no-hot even alone beneath the stars, for there in her season, in the grand purple hall of sea and sky, stands our beautiful liege lady, the Moon, and her light falls upon the waters in a long clear path is broken into silver fragments, shining down between the trees on the running stream, or into the marsh-pool of the forest. The solemn heat and glory of the day are gone, and night has put on a more witching majesty, but a *majesty that no eye beholds.*

It is an awful thought. We men, who think that the world was made for us, are here brought face to face with the thought that it was as beautiful, as thought-stirring, as meaning-full as now, ere ever a human soul existed on it, or a single mind heard the whispers of Law and Force and Truth.

The ages passed on, and the forests sank tower and lower beneath the encroaching waters. Slowly, slowly it went down ; so slowly that the forest pools seemed to stand ever where they had ever stood before, and none but the brooding Eternity could know that the rusting moan of waves and trees was the millenniumlong "Nunc Dimittis" of their departure. Yet year by year a higher tide would join some few more lakelets with the waters of the sea, and the fringing waterreeds, through which the woody matter of the trees was filtered as it sank, would grow in wider and wider circles, till at last all lay submerged, and the ocean gently and evenly deposited a firm sand-covering, putting its dead plant-world to rest with loving care, to await the far-off resurrection by fire. And then the story is repeated. Over the buried trees grow others, different in kind, condition, and development, the old forgotten—as the young shall be—but neither for ever.

It is a wonderful picture. A picture in which each line, each tint, is the work of many years, and the whole the delineation of ages beyond the thought of man to compass. Many times has Wales been but "a dark strait of barren land," while "on one side lay the ocean, and on one lay a great water" ; often has she robed herself in gloomy forests, which have again disappeared beneath encircling water ; once at least has she worn the white ice-mantle, and exchanged it for the fiery hues of volcanic lavas, until to-day she lies before us in garments of green, and brown, and grey, passive under the hands of nature's latest mystery-Man. And man is at once the loftiest and most frivolous of beings. The miner gains his livelihood as an angel of the resurrection to the plant-life of the far-off ages, and the chemist coats his pills with seeds such as carpeted the forests of the olden time ; but does either ever think of the truths, of

the histories, of the poems, that lie latent beneath his fingers? We trow but rarely. "Earth's crammed with heaven, and every common bush afire with God, but only those who see take off their shoes, the rest sit round it, and pluck blackberries."

But here is our lamp and we must go. It does not seem so dark as it was, for our eyes have become accustomed to the twinkling light, and it is not till we get into the more remote parts that we realise the great subterranean heat. We take one of the main roadways, and stooping as we best can, follow our guide along the line of route. Lest all the air from the shaft should distribute itself through the upper level of the mine, and leave none for the lower, brattice cloths are at first suspended across the passages at regular intervals to turn it partially back. Behind one of these we find the manager's "office." It is a curious little den, prevented from wearing an entirely rustic look by an incongruous heap of loose coal ; it is something between an arbour and a coal hole. Along the floor of the roads run lines laid on sleepers, over which we stumble, ankle deep in dark, grey dust. With this dust everything is covered, save the rough, glossy coal on each side, and the smooth shale above. As we go on, we now and then hear a shout in the distance, and looking up see a truckful of coal, pushed by men or drawn by a pony, coming at full speed towards us.

It is on its way to the shaft, where, the pony taken out, the truck is ran into the "cage", raised to the pit's mouth, run off on the lines above to the "sorter," and as rapidly returned to the "cage" and to the men below, to go through the same process again and again. From this we have to take refuge in the recesses between the wooden pillars which support the roof, and the mild excitement of these scrambles is the only form of danger which we come near. We may burn to distinguish ourselves, but alas! burn we ever so ardently, we have no more chance than—than—the newspaper reporters at Telel-Kebir!

In the dim reaches of the mine we find men at work. They are seated on the ground, one foot against the wall, and both hands wielding the pickaxe, with which they deal their heavy blows and bring the great lumps of black rock tottering down. Here, perhaps, in this heavy, reeking atmosphere, one thinks one has found a *cul de sac*, and pursued the road to its utmost limits, to find no outlet save by the way we came. But we are mistaken ; there, in that corner, where it seemed closed up, is a tiny opening, and when we see the paths beyond we realise that not unto us has it been given to find the boundaries of the territory we explore. Here they show us the mark of an ancient stream in its windings—the bed making that curve in the strata that is here named a "horseback", but in Staffordshire would be dubbed a "pig's". In another place, not far off, gas is to be found in some small quantity and they hold up

the lamps that we may see the blue flame creep up, as its dread enemy proceeds to put out the light.

So we go on. At one place Mr. Pattison puts up his hand, because here the smooth surface of the shale is broken, and we would see that it is it really shale and not slate (a difference simply of pressure on strata) that is above us. And lo, on his hand lies a thick grey scale of rock, bearing a perfect impression of a leaf! It is of delicate ovate form-less acuminate than the lily of the valley, which it greatly resembles with entire margin, and a venation which might be called *divergent,* since it is intermediate between the midribbed and the parallel modes. This was, indeed, a treasure, and in all our visit we had no happier moment than that when our eyes were the first to behold the tiny nature-secret that the sea tucked up her mud-blankets so many long ages ago.

It was Saturday afternoon, and our experience had all the charm of novelty when, after sitting on a throne of black diamond for some twenty minutes, we were put into the front fank of the men going up, and entered the top compartment of the age to make the ascent. Oh, the speed of that journey! At first it was easy enough to look round and make observations on the strata we were passing through—at that time we were rising at the rate of 400 yards per minute—but suddenly came the sensation of a swift fall, a fall too swift and sudden to allow even of terror, or of anything but complete physical bewilderment; one barely grasped the fact that something had snapped, and that we were sinking, and the sun was shining, we were at the top, and it was time to get out. The motion up had been so rapid as to seem like a descent, and we had "our own erratable temperature" to blame for taking it at its quickes. But it ought to be said that even in case of accident in overwinding it is not possible for the cage to drop, for the pulleys are so contrived that the instant a rope is detached from the cage, a kind of iron plate runs up and prevents any further uncoiling, thus effecting a stoppage. A clocklike instrument in the engine-room records the time and the exact place where the cage is arrested. It is thus with everything. Accidents are guarded against, but every provision is made for them should they occur, and she who would feel nervous on a visit think this would be like that absolutely cautious man, whose only rational security lies in instant suicide.

The ventilation is a matter of great interest. The method of mechanical suction is employed at Bersham, by which, while pure air is received in the mine through the principal shaft, the impure passes out by a vent specially constructed for the purpose. At the top of the second shaft a great wheel, thirty feet in diameter, is kept revolving at a rate of 4800 times per minute. This sucks up the hot impure air, and hence the name of the process. In some mines a great fire is kept burning

between the two shafts, and this is termed furnace ventilation.

The water supplying steam to the powerful machinery at Bersham is obtained from the permeable rocks through which, of course, the upper part of the bore has been made. The difficulty of pumping this water from its great depths, is overcome by the hundredfold multiplication of leverage in the engine-room.

There they lie bright steel ropes, some flat, some round, two inches in diameter more or less, coiled round the great metal drum ; they are renewed, we are told, on the slightest appearance of fraying, and are examined carefully day by day.

Great had been for us the pleasure of the past hours, but when we stood beside the great iron monster, and knew that to a Watt and to a Stephenson, aye, to the very men around us, these things would be simple explicable facts, human influences, but of motion more regular and certain than vital functions ever could be, a daily living miracle of cause and effect ; oh, then, in all the enjoyment of sight-seeing lay the humiliation of ignorance, and the sharp point of resolve for future doing.

In that resolve was the day's fruit, whereof all other thoughts and words had been but blossom, and it is in the hope that some other may be inspired to plant a like seedling tree of knowledge in her mental garden, that we venture to offer this humble bouquet from our reminiscenes of a coal mine.

It would be so easy in this country were but instruction organised, to learn much of mechanics, much of geology, much of physica ; it would be so easy every way, for here are heads that know, hearts that will aid, and illustrations on a gigantic scale. We do not ask for power to spend £17,000 or £22,000 wisely, as Mr. Pattison has twice proved his ability to do. For that, we must establish a Mining College ; but we do ask for increased perception, stronger faculty, larger knowledge of all that comes to us through eye and ear, in a word, for mental hygiene—for Science.

Our opportunities are great for learning and for collecting. Not long ago the trunk of a tree seven feet high was discovered in the very mine of which we are speaking, and it was sent—where? *To the South-port Museum!* It is a case of "Ask, and ye shall receive," but how is it with us when we ask not?

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS

[মার্গারেট নোবলের বয়স যখন মাত্র একুশ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কের সীমাকে স্পর্শ করেছেন, সেই সময়ে 'এক বন্ধ্যা, অতি বন্ধ্যা নারীর' ভূমিকা নিয়ে যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে, এক পত্রে প্রকাশের পরে

পত্রান্তরে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল। নারীর অধিকার সম্বন্ধে এই ৬টি প্রবন্ধ মার্গারেট নোবলের চরিত্রের অনেকগুলি দিককে উদ্ঘাটিত করেছে। লেখাগুলি বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত, তা লেখিকার প্রতিভার লক্ষণ, কিন্তু তিনি যে বৃদ্ধার ছদ্মনামে এগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে আছে তাঁর স্বভাবের লক্ষণ। মার্গারেট জন্মবৃদ্ধা, জন্মবিজ্ঞা ; বিদ্যালয়ে সমবয়স্কদের তিনি সমান মনের মনে করতেন না, পরবর্তীকালে বয়োজ্যেষ্ঠদেরও অনেক সময়ে সন্তানবৎ দেখেছেন। লেখাগুলিতে অধিকন্তু শিক্ষয়িত্রীর মনোভঙ্গি রয়েছে ; মার্গারেটের বৃত্তির প্রতিফলন সেখানে দেখা যায়। ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ, ইতিহাস-সত্যকে অধিগত করার ক্ষমতাও প্রবন্ধগুলিতে দেখতে পাই। ইতিহাসের তথ্যজ্ঞান শুধু নয়, গভীর মননের সামর্থ্যও, তথ্যের উপরে দার্শনিক ভাবনার গভীরতা অর্পণের চেষ্টা ও তাতে সাফল্য লক্ষণীয়। পাঠকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন, লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি তথাকথিত বৈপ্লবিক, অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনশীল। বিদ্রোহের পতাকার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনবোধকেই বহন করতে চেয়েছেন তিনি। সেইজন্য মনের স্বাস্থ্যের মত দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাই বলে লেখিকা নারী-অধিকারের প্রচলিত দাবির বিরোধী নন। ওসব সাধারণ বুলি তিনি মেনেই নিয়েছেন ; তাদের যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। আসল প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশের, স্বক্ষেত্রে নির্বাচনের এবং সামগ্রিক সমাজ গঠনের। পুরুষের কাজ আত্মসাৎ করে কি নারী সেই সামগ্রিক সমাজ গঠন করতে পারবে? উত্তর—নিশ্চয়ই না। সমাজে যদি গৃহ থাকে, যদি সন্তান থাকে, তাহলে সে সকলের সুষ্ঠু সংরক্ষণের প্রয়োজনও থাকবে, এবং নারীকে প্রধানতঃ সে ভার নিতে হবে।

নারী-অধিকারের বাতাসে ভর করে যেসব আবর্জনা উড়ে এসেছে, তাদের বিষয়ে কঠোর সমালোচনা লেখাগুলিতে আছে। আধুনিকতার অর্থ দাঁড়িয়েছে পুরুষের মন ভোলানোর জন্য নিজেকে অধিক লোভনীয় করার প্রতিযোগিতা। মার্গারেট নোবল এই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে নারীর অধিকার ঘোষণা করতে চেয়েছেন। এর ঠিক উল্টো দিকে আছে, শারীরিকভাবে যা প্রধানতঃ পুরুষের কাজ, সেগুলিকে প্রাণপণে অধিকার করার চেষ্টা। এই প্রগতিও লেখিকার মনঃপূত নয়। তাঁর মতে, নারী-অধিকার মানে নারীর নিজস্ব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকার।

প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আজকে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় কারণ হঠাৎ-শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা এখানে পুরুষের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে হোটেল—মোক্ষ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর অনেক চিন্তার সাদৃশ্য আছে। স্বামীজীর বক্তব্য অবশ্য আরও মূলগত। যাই হোক, একথা বলা চলে, স্বামীজী নিশ্চয় মার্গারেটের তখনকার চিন্তাপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েই তাঁকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের ইচ্ছা করেছিলেন।

নিবেদিতার চিন্তাধারার স্তর নিয়ে যাঁরা চিন্তা করবেন, তাঁদের কাছে প্রবন্ধগুলি অবশ্যপাঠ্য।

প্রথম প্রবন্ধ : নারীর সৌন্দর্যের অধিকার : এই অধিকারের দাবি সহ 'একজন বৃদ্ধা নারী পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়েছেন, মাথায় চোখ বসিয়ে এবং হাতে নোটবই

নিয়ে।' সৌন্দর্যের অধিকার-দাবি বলতে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, গোড়াতেই তাকে দূর করেছেন—সৌন্দর্যের অধিকারের লড়াই কিন্তু যথেচ্ছ প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহারের পক্ষে লড়াই নয়। তারপরে একটিমাত্র কথায় সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—তা হল 'হার্মনি', যা নারী ও পৃথিবী, ফুল ও কবিতার সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। এইসঙ্গে সাহিত্য থেকেও দৃষ্টান্ত দিয়ে হার্মনি কি, বোঝাতে চেয়েছেন।

সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের যোগ অঙ্গাঙ্গি। দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে সচেতন হতে শুরু করেছে সকলে। সুতরাং এইবার 'নারীর জন্য সেই বিশেষ শিক্ষা দাবি করা দরকার, যাতে তাদের অনস্বীকার্য অধিকার—স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষার অধিকার।' সে শিক্ষার উদ্দেশ্য—'ফ্যাসানের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তার পরিবর্তে অধিক বৃহৎ, অধিক মুক্ত, অধিক গৌরবান্বিত এবং কম ক্ষতিকর সৌন্দর্য ও শিল্পের সেবা।'

ফ্যাসানের তামাসা নিয়ে 'বৃদ্ধা নারী' অনেক তামাসা করেছেন। ফ্যাসানের চেহারা কী?—শক্ত জুতো পরে পা ছোট রাখা, সেই ধরনের গ্লাভস পরা, যাকে নাকি অপরে সুন্দর বলে প্রশংসা করে, কয়েক সের ওজনের পোষাক দেহের এক জায়গায় ধরিয়ে দিয়ে অন্য জায়গাটিকে প্রায় স্বচ্ছাবৃত রাখা! চশমার অত্যন্ত পুরু কাচের মধ্য দিয়েও বৃদ্ধা নারী যা দেখেছেন তাতেই চমৎকৃত, শিহরিত। পীনবক্ষা রমনীর ক্ষীণবক্ষা হবার কী প্রাণান্ত প্রয়াস! 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', বৃদ্ধা লিখেছেন, 'যে-সব নারীর অন্তঃশরীর সুস্থ, তারা কোমরকে কাঁধের পরিধির এক-তৃতীয়াংশে দাঁড় করাতে পারে না।'

আতঙ্কিত বৃদ্ধা প্রশ্ন করেছেন—ক'জন জানে যে, তলপেটে ফিতে বাঁধলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে চামড়ার রঙ জ্বলে যায়? উঁচু-হিল জুতো দৃষ্টি দুর্বল করে, শিরদাঁড়ায় চাপ দিয়ে মাথা ও শরীরের ছাঁদ নষ্ট করে? পোষাকের অসম সংস্থাপনে রক্ত সঞ্চালন যথাযথ হতে পারে না, তার বিপদ সম্বন্ধে কতজন অবহিত? পারিবারিক ও নাগরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই ক'জন নারী সজ্ঞান?

ফ্যাশানের পুতুলের দল আর্টের সঙ্গে ফ্যাশানের তফাত বোঝে না। আর্ট দিয়েছে—গ্রীক দেবদেবীদের স্থায়ী লাবণ্য, র‍্যাফেলের সেন্টদের নারী-মডেল, দিয়েছে রুবেন্সের সৃষ্টি-সন্ততিদের। আর ফ্যাশানে পাওয়া গিয়েছে ভিক্টোরিয়ান যুগের কোমরে দাঁড়-বাঁধা পোষাকের খ্যাপামিকে।

'স্বাভাবিক, মুক্ত সুসমঞ্জস'—নারীর মধ্যে এইসবই সুন্দরের নিশানা, যেমন দেখা যায় ভাস্কর্যে। এ জিনিস ফ্যাশন-পাণ্ডারা মেনে নিলে তবেই আবার ইংলণ্ডের নারীরা প্রাচীন গ্রীসের নারীর মত লাবণ্য-সচ্ছন্দ হয়ে উঠবে। এবং ফ্যাশনের দায় না ঘুচলে কখনই ইংরেজ নারী তার শারীর শক্তির সকল সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারবে না।

নারীর স্বাস্থ্য, অর্থাৎ শক্তি, অর্থাৎ সৌন্দর্যের পক্ষে ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছেন এই 'বৃদ্ধা নারী' অনবদ্য ভাষায়। মানবতার মহাযজ্ঞে নারীই পুরোহিত। মানুষের কাছে অমৃতপাত্র তারাই বয়ে আনে। তাদের স্বাস্থ্য-সাধনায় যদি ত্রুটি থাকে তাহলে সে অমৃত বিষ হয়ে যাবে, মৃত্যু ঘনাবে সৃষ্টির উপরে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ : কর্মের (ও সেবার) অধিকার : গোড়ার দিকে খ্রীস্টবাণী উদ্ধৃত—বড় যদি হতে চাও, আগে হও ভৃত্য।

নারীর কর্মাধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে নানা সামাজিক সমস্যা জড়িত, যেমন বাইরে চাকুরিতে নারীর অংশগ্রহণের ফলে পুরুষের জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হবে কি না!

এইসব সমস্যার দিক ছেড়ে দিয়ে 'কাজ' করার সহজ দিকগুলিই আলোচিত হয়েছে।

গৃহ নামক কর্মক্ষেত্রে নারী আত্মবিস্মৃত সেবা-কর্মের সুযোগ পায়। বাড়ির প্রতিটি কাজেই তার দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে, যতই সে শিক্ষিতা বিদগ্ধা হোক। "যে মহিলা সুন্দরভাবে টেবিল সাজাতে পারেন, ডিনারের রান্নার সুব্যবস্থা করতে পারেন, ঘরের সবকিছু প্রয়োজনমাফিক সাজিয়ে রাখতে পারেন, তারপরে অতিথিকে হৈ চৈ না বাধিয়ে বা ভঙ্গি না করে সহজ সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করতে পারেন, তিনি নারীকুলচূড়ামণি মহাপণ্ডিতার চেয়ে বহুগুণে উচ্চদরের নারী।"

পুনশ্চ—যে মহিলা অবিলম্বে 'সাপার'এর পরিকল্পনা করতে পারেন, যা একই সঙ্গে সহজ সুন্দর অথচ পুষ্টিকর, গৃহশৃঙ্খলা যিনি রক্ষা করতে পারেন, বুদ্ধির সঙ্গে ভৃত্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সে মহিলা 'নারীর অধিকার' অনেক বেশী বজায় রেখেছেন—ঐ সমস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সমর্থ কোনো মহিলার তুলনায়।

সুতরাং নারীর পক্ষে বলাই বাহুল্য বাড়িতে বিপদ আপদ ঘটলে, কাটা পোড়ার ক্ষেত্রে, এমন কি মাথা-ধরার ক্ষেত্রেও, কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা জানা দরকার ; কোন্ খাদ্যের সঙ্গে কোন্ খাদ্য মেশালে ভালো হয় তাও ; খাদ্যনীতি নিয়ে অনেকখানি আলোচনাসহ 'বৃদ্ধা' তা জানিয়েছেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শারীর সংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের জন্য। ঘর-পরিষ্কার রাখা থেকে শুদ্ধ জল পানের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছু বাদ যায়নি, কারণ—"ছোট ছোট জিনিস নিয়েই জীবন।"

তৃতীয় প্রবন্ধ : গৃহ নির্বাচনের অধিকার : সেবা ও কাজের পরে স্বতঃই আসে শাসনাধিকারের প্রসঙ্গ। তার বদলে এগিয়ে আনা হয়েছে গৃহ সন্ধানের ও গৃহ নির্বাচনের প্রশ্নটি।

যাঁরা প্রাসাদ কিনবেন তাঁদেরও জানা দরকার কী কিনছেন। কিন্তু সেই মহাভাগ্যবতীদের সাহায্য করার অভিপ্রায় নেই 'বৃদ্ধা'র,—তাদেরই সাহায্য প্রয়োজন যাদের স্বামীরা সংসারের বোঝা বইছে ধুঁকে ধুঁকে, কিন্তু সংসারের দিকে দৃষ্টি দিতে পারছে না কোনমতে। ফলে দায়িত্বটা প্রধানতঃ পত্নীর।

বাড়ি বাছবার সময়ে বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে ভাল কি নয়, সেদিকেই বড় নজর দিলে চলবে না, যদিও তার মূল্য যথেষ্ট। একথা সত্য, যদি শুধু সুন্দর একটি বাড়ি আর আলোবাতাসপূর্ণ বাড়ির মধ্যে বাছতে দেওয়া হয়, খুব কম জনই শুধু সুন্দরকে বাছবে। এটুকু স্বাস্থ্যবিধি সকলেরই জানা হয়ে গেছে, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু নয়। সীমাবদ্ধ আয় যেখানে, সেখানে বাড়ি বাছবার সময়ে বাড়ির আকার বা অবস্থান নিয়ে (তা উঁচু কি নীচু জায়গায়, কোন্ মুখো বাড়ি তা) খুঁতখুঁতুনির বিলাস সম্ভব নয়, কিন্তু খুব কম জনই জানে জমির প্রকৃতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ;

জল হলে কি জমিতে কাদা হয়, নাকি অবিলম্বে শুকিয়ে যায়?—এইসব কথা। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, বড় শহরে বাড়ির জমি তৈরী হয় নোংরা জিনিস দিয়ে ভরাট করে, যাতে রোগ-জীবাণুর সীমাসংখ্যা থাকে না। গৃহিণীরা এসব জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হলে যা-তা বাড়ির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

দরজা জানলা আছে কি না, গৃহিণীরা দেখেন, কিন্তু ভেণ্টিলেশন সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টি নেই। মেঝে কি রকম কেউ লক্ষ্য করে না ; যদি স্যাঁতসেঁতে হয়, কার্পেটে ঢেকে রাখে ; ফলে রোগের সহজ শিকার হয়। নর্দমা-ব্যবস্থা উপযুক্ত না হলে মহামারী ঘটতে পারে, এ সম্বন্ধে কতজন সচেতন? চিমনীতে থলে বা কম্বল শুকোচ্ছে দেখা যায়। তার মানে শুদ্ধ বাতাস সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণারও অভাব। একথা সত্য যে, সব রকমের দোষ ধরতে হলে অনুবীক্ষণের দরকার হবে, এবং, ঐ যন্ত্রটি হাতে নিয়ে কোনো গৃহিণী বাড়ি খুঁজতে বেরুবেন কেউ আশা করে না, কিন্তু তাঁরা জীবনীশোধক জিনিস দিয়ে বাড়ি ও পারিপার্শ্বিক বৎসরে একবার শোধন তো করিয়ে নিতে পারেন!

পুরুষেরা ধরে নেয় মেয়েরা ললিত লবঙ্গলতা। সে ধারণা ত্যাগ করে যদি তারা মনে করে যে মেয়েদের মন নামক পদার্থ আছে এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তাহলে দেখা যাবে মেয়েরা নিজেদের কাজ নিজেরাই চালিয়ে নিচ্ছে।

আর 'বৃদ্ধা', মেয়েদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুরনো কথাটা—অধিকার মানে দায়িত্ব।

চতুর্থ প্রবন্ধ : অগ্রগতির অধিকার : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, এই বক্তব্য দিয়ে প্রবন্ধের সূচনা।

'বিবর্তন' হল ইতিহাস-নগরীর সমুচ্চ মিনার, যেখান থেকে সব কিছু লক্ষ্য করা হয়। ঐ বিবর্তন-মিনার যেহেতু ইতিহাস-ভিত্তিতে উত্থিত, সেই কারণে 'নারীর অগ্রগতির অধিকারে'র আলোচনায় অবশ্যই ইতিহাসের পর্যালোচনা আসবে। 'বৃদ্ধা' অগ্রগতির ইতিহাস নিয়ে কিছু বিস্তৃত যে-আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান।

নারীর স্বভাব লক্ষণের আলোচনায় জানিয়েছেন—দুটি লক্ষণ অধিকাংশ নারীতে প্রধান, কিন্তু সাধারণতঃ দুটি গুণ পূর্ণ ব্যক্ত হয় না এক দেহে। গুণ দুটি হল—আত্মমর্যাদা ও আত্মবিলয়। প্রথমটিকে নষ্ট করে আবির্ভূত হয়, ফ্যাশান, পোষাকের নানা ঢঙ ইত্যাদি ; দ্বিতীয়টির বৃদ্ধিতে পাওয়া যায় ক্যাথারিন ডগলাস, জোয়ান অব আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, এবং গৃহজীবনের শান্ত বীরাঙ্গনাদের, যাঁদের গুণাবলী সংসারসীমার বেষ্টনী অতিক্রম করে না।

নারীর এই দুই শ্রেষ্ঠ গুণের ব্যতিক্রম চেষ্টা 'বৃদ্ধা'র কৃপার হাসি উদ্রিক্ত করেছে। আত্মমর্যাদাহীনতার বহু হাস্যকর দৃষ্টান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় রয়েছে। যথা, ইংলণ্ডের এক রানীর শিরোভূষণ এমনই উচ্চ ও প্রশস্ত ছিল যে, তাঁর জন্য দরজা উঁচু ও চওড়া করতে হয়েছিল!

অতঃপর 'বৃদ্ধা' ইংরেজের গৃহজীবন-ব্যবস্থার স্তর পর্যায়ের উৎকৃষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। তাতে নানা কালের ঘর-দোর, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, দৈনন্দিন কর্ম ও অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জীবন্ত ছবি পাই। অ্যাংলো-স্যাক্সন কালে

শোচনীয় অবস্থা—তখনকার কাঠের বাতা বা মাটিতে তৈরী খুপরি-ঘর, আলো-বাতাস আসার জন্য তাতে গর্ত, সেই গর্তে বাইরের জল-বায়ু আটকাবার ব্যবস্থা নেই, ঘরের মাঝখানে আগুন, চিমনি নেই, ফলে দেখা যায় ঘরের ধোঁয়া ঐ গর্তটি দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে এবং বাইরের বৃষ্টি ও বরফ ঢুকবার চেষ্টা করছে,—সেই মৃত্যু-নরক! গৃহসজ্জাও অনুরূপ—ভেড়ার চামড়ার বা খড়ের বিছানা, কাঠের বালিস। তারপরে নর্ম্যান যুগ, টিউডর যুগ ; মধ্যবর্তীকালে লণ্ডন শহরের বিবর্তন, বিখ্যাত ইংরাজ মধ্যবিত্ত সমাজের উদয়। লেখিকা, গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও তথ্যজ্ঞান-সহ বিস্তারিত বর্ণনার শেষে জানিয়েছেন, অতীতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারীকে 'প্রাথমিক' (ইনি 'বন্য' 'বর্বর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে অনিচ্ছুক) জীবন যাপন করতে হয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে সেই জীবনকে নারী অতিক্রম করে এখন 'যথার্থ প্রগতি ও জ্ঞান লাভের' অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

পঞ্চম প্রবন্ধ : জ্ঞানের অধিকার : নারীর জ্ঞানের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে জ্ঞানী 'বৃদ্ধা'র স্থবিরত্ব নাড়া খেয়েছে, কাব্যিক না হয়ে পারেন নি, কারণ পৃথিবীর মিষ্টতম, দারুণতম শব্দ—'To know'। জ্ঞানের বিষয়ে ভাবগম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন : আত্মার মানমন্দির—যেখানে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের নক্ষত্র-ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়। নির্বাক অনন্ত আকাশের পারে, হিসাবহারা অতীতের ক্ষীণালোক থেকে বিশ্বগণ শক্তি ও আলোকের বিরাট তরঙ্গ পাঠাচ্ছেন, তাকেই মানবমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যে সংহত করে আমরা বলি—'আমি জানি!' আর তা বলার কী অসীম যাতনা ও আনন্দ!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ঐ অনুভূতি ক্ষণিকের। যদিও বলি, পরিক্রমণশীল গ্রহ থেকে আমাদের বুদ্ধি নামক লক্ষ্যবস্তুতে চিন্তা-শর-নিক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্ধ হয়েছে, —তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, জ্ঞান নয়, অজ্ঞানেই আমাদের অধিকার।

এর পরে জ্ঞানের অসীমতা এবং মানববুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে পুনশ্চ গভীর কাব্য।

তারপরে 'বৃদ্ধা' বলছেন—অতএব সেই বিরাট চৈতন্যের সামনে মানবজাতির মহানতম আত্মাও প্রণত হয়ে নম্রকণ্ঠে বলে, 'আমি জানি না',—যখন বলে তখনই নিঃসন্দেহে বোঝা যায় সে জানে—আগের থেকে অনেক বেশী জানে।

জ্ঞানের যেখানে এই অপূর্ব উন্মাদনা, সেখানে শতাব্দীর মুক্তিতে আনন্দে পাগল-হওয়া নারীরা যদি ছুটে যায় মানবপ্রজ্ঞার পুণ্য, মহাপুণ্য লাভের জন্য, তথাকথিত গৃহকর্ম বা সজ্জাব্যবহারের চর্চা-দাসত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে—তাহলে অবাক হবার কী আছে!

জ্ঞানচর্চায় নারীর উপর 'প্রতিভার' অবতরণ ঘটতে পারে, আর প্রতিভার কোনো আইন নেই, নিজের রাজকীয় নিয়ম সে নিজেই তৈরী করে নেয়। এই 'প্রতিভা'-কন্যাদের বাদ দিয়ে 'বৃদ্ধা' মাঝারি ধরনের নারীদের কথাই বলতে চান, যাদের জ্ঞানের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠেছে।

ফল কিন্তু সর্বক্ষেত্রে উত্তম নয়। জঘন্য পরীক্ষাযন্ত্রের পেষণ। তার বদল চাই। "আমাদের নারীদের জন্য দুর্বোধ্য-জটিল বিষয়ে নির্বিচারে শিক্ষাদানকে কখনো সোচ্চারে সমর্থন করতে পারি না।" বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতেই নারীশিক্ষা

চাই। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধবিগ্রহের কতকগুলো তারিখ মুখস্থ হলেই অশিক্ষার অপরাধ দূর হয় না।

সুতরাং আসল প্রয়োজন যুক্তিচালিত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনবোধ। সে যুক্তিবোধ সঞ্চারিত হলে নারী তার আলোকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ বিচার করে নিতে পারবে। তা যে সে করতে পারে, এই নৈতিক ধারণা নারীর আচরণ এবং পারিপার্শ্বিকের উপর অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্বনিয়ম, যা অভ্রান্ত অভঙ্গ, জীবন তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে নিয়ম ভাঙা যায় না। যে ভাঙতে চায়, সে কোনো না কোনোভাবে তাকে পালন করে। নারীকে এই সত্যটি তার কর্মজীবনের সর্বত্র প্রয়োগের কথা শেখাতে হবে।

অজ্ঞান পরিব্যাপ্ত বলে দায়িত্ববোধের অভাব চতুর্দিকে। যেমন স্বাস্থ্যনীতি ও বংশগতি সম্বন্ধে নারীর ধারণা বদলের দরকার আছে। পারিপার্শ্বিক কী প্রচণ্ডভাবে মানসিক ও নৈতিক কর্মকে প্রভাবিত করে!

ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ মানে নৈতিক নিষ্ক্রিয়তা নয়, সম্ভাব্য সকল পাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ : শাসনের অধিকার : এই শেষ প্রবন্ধে মূল কথাগুলি লেখিকা একসঙ্গে বলতে চেয়েছেন। বহির্জীবনে নারীর অধিকার অস্বীকার করা নয়, গৃহ-জীবনে অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য। রাজা লেমুয়েলের মায়ের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—শক্তিতে প্রচণ্ড, মনীষায় বিরাট মহিমান্বিতা রাজ্ঞী হওয়ার চেয়ে শান্ত সমর্থ ব্যস্ত গৃহিণী হওয়া বাঞ্ছিত।

এর বাইরে যদি নারী কিছু চায়, তার বিয়ে করা চলে না।

সেন্ট লিউক অঙ্কিত 'ক্রাইস্ট অ্যাজ্ দি গ্রেট ফিজিশিয়ান' ছবিটির মর্মকথা লেখিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। খ্রীস্ট ব্যাথাদুর্বল দেহের নিরাময় করছেন, তেমনি নিরাময় করছেন পৃথিবীর ভারাতুর আত্মাদের।

'বৃদ্ধা' নারীর আবেদন—এই আলোকপ্রাপ্ত যুগে, যেখানে মানবজীবন গতিশীল পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় আক্রান্ত, সেখানে নারীর দায়িত্ব গভীর, সে দায়িত্ব যেন তারা পালন করে। যদি তারা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেদের কর্তব্য পালন করে, তাহলে গৃহ-পরিবার-নগর-জাতি হয়ে উঠবে শক্তিপূর্ণ সমর্থ পুরুষে পূর্ণ, বুদ্ধিমতী, সৎ স্বভাবা, সুন্দরী নারীতে পূর্ণ, স্বাস্থ্যবান শিশুরা অখাদ্যের সঙ্গে সেখানে অপরিচিত এবং সমাজ বদমাস ও উন্মাদদের কবল থেকে মুক্ত।

'বৃদ্ধা' সবশেষে তাঁর মূল বক্তব্যকে সংহত আকারে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। সেগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে, মূলতঃ নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধীয়। 'সিভিক এন্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস্'-এর লেখিকা ভগিনী নিবেদিতাকে পূর্ব জীবনেও সমভাবে জীবন্ত দেখি। সমাজ গঠন করতে হলে শুধু উচ্চ কথার ফানুস ওড়ালেই চলে না, বাস্তব সংসারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, এবং অন্যের উপর দায় না চাপিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে হয়। ভলটেয়ারের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন—মানব-সম্পর্কিত সব কিছুই মানবের মনোযোগের যোগ্য।

সুতরাং 'বৃদ্ধা'র মোট নিবেদন—

(ক) মানব সমাজের সমস্ত কিছুই—ব্যক্তিগত বা সামাজিক, শারীরিক বা মানসিক—যে-সব প্রাকৃতিক নিয়ম এদের নিয়ন্ত্রিত করে তাদের অনুযায়ী অবিরত পরিবর্তন, প্রগতি বা অধোগতির অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বাস্থ্যনীতি বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলা যায়।

(খ) প্রতি শহরে বৃহত্তর মানবশ্রেণী অতি নিম্নস্তরের জীবন যাপন করে। তারা উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে, কারণ অবিরত তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যনীতি ও অন্যান্য নীতি লঙ্ঘন করছে। এই শ্রেণীর মানুষেরা শারীরিক ও নৈতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত।

(গ) বিষয়টি সম্বন্ধে আইন-প্রণেতারা এতই স্থিরনিশ্চয় যে, সর্বত্রই আমরা স্বাস্থ্য-সংস্থা, পরিদর্শক ও নিয়মাবলী পাই—প্রয়োজনীয় নিয়ম পালনের জন্য বাধ্যতামূলক বহুল নির্দেশও।

(ঘ) এইসব বাধ্যবাধকতা যে যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়নি, নিম্নতম শ্রেণীসমূহের যে-কোনো সতর্ক পর্যবেক্ষকই অবিলম্বে স্বীকার করবেন। রেক্সহ্যাম শহরের অঞ্চল-বিশেষে এমন দৃশ্য দেখা যায়, যা লজ্জা ও ঘৃণায় মন ভরিয়ে দেয়।

(ঙ) ধরে নেওয়া যাক, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাদি যথেষ্ট কার্যকর নয়। সুতরাং আশা করতে হয়, শিক্ষিত ও বিবেচক নারীর পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব এমন হয়ে দাঁড়াবে যাতে নিম্নশ্রেণীকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করবে।

(চ) এর জন্য, না বললেও চলে, স্বাস্থ্যনীতির সতর্ক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষাদান সবিশেষ প্রয়োজন।

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 1

THEIR RIGHT TO BE BEAUTIFUL

By an old, old woman

(Reprinted from the *"North Wales Guardian"*, August 18th 1888)

Once upon a time, a very long while ago, perhaps as far away as Persia—somewhere near the Caucasus at least, and in the midst of primeval forests—a small hairy urchin—an advanced Radical had he only known it!—climbed on a woman's knee to play. They must have been alone; indeed she, perhaps, as women are apt to be, was somewhat lonely, for she did not repulse the child, though he was many months too old to be her nurshling. She let him gambol on, and, too ignorant for much language, may have given him a rude caress, with an indistinct but meaning fraught vocable now and then; some instinctive bond was touched, and the child laid his shaggy little head down on her shoulder, curled himself up within the encircling arms, and—not in the tender "Mutter!" of the north, not in the rich, broad "Madre!" of the south, but —in some fond sound, never heard till then, looking up into

her eyes, said "Mother!" The woman's heart beat faster, and that night each star as it came out, and peeped down between the trees, saw her still watching with love that knew no weariness, beside the sleep of the child who had called into her life a new intensity of passion.

At least it was in some such sweet fashion, doubtless, that in those far-off days arose the mighty question which, passing through all the stages of Radical, Liberal, moderate and extreme Conservatism has finally become part of history (of Mr. Herbert Spencer's history at any rate) under the name of the *Mutterrecht*, the woman's right. And holy the word has continued to be. True, "Right" is often confounded with "monopoly." Are woman's monopolies always holy? But it is not for an aged spinster (herself not free from the faults of her sex) to scold the scolds, and harangue the gossips! Spinsterhood brings with it the great blessing of peace, and who knows how far the *man* has desecrated his rights ere the *woman* degenerates into the virago? Sacred be the secrets of matrimony! Over *some* of the rights of women we will draw a veil. Nevertheless an old maid who has gone about the world with eyes in her head, and a note book in her pocket, may be pardoned if, at the end of half a centuary or so, she claims to be able to advise the young around her, if she gird her to the battle, and even attempts to deal the blows that are sharper than sword strokes in defence of the rights of her sex. Fear not, gentle reader, your task shall not be interminable. We only at present enter upon one ground of combat.

Inspired, then by all the passion of the wronged, all the bitterness of the created; by the vision of sculptured Venuses and pictured Madonnas; by jealousy of Persian Vashti and Alexandrian Hypatia, of Greek Helen and Roman Lucretia, of Austrian Theresa, and all the fair host of dead Stuarts and dead Bourbons, whose loveliness made all hearts its kingdom; so inspired and so envenomed, we would first claim, for each and every sister-woman, *the right to beauty*.

What! are we, women, to raise a tempest for the use of pearl-powder and rouge-pots, of hair-dyes and corsage-machinery merely? "Lo, all these have I used from my youth up," many a one of us may truly answer, "and behold what more or less of beauty they may have given."

This is *not* the beauty for which we contend. A very different, yet, a very brief definition have we of that perfectness of form and colour which men call beauty. Our definition lies in one word, but the word is ever expressive of the idea. Beauty, we believe, will be found a synonym for *Harmony*, and harmony is to us a term which expresses the fascination alike of women and worlds, of flowers and poems.

Had Shakespeare assigned to Lady Macbeth the sparkle of Rosalind, or the sweetness of Desdemona; had Dante written

the Divina Commedia in a style combining his own with Spenser's, or with Bunyan's we might, indeed, have recognised the genius of the writers; but the glory of their works would be gone, since there would no longer be the profound union of all the parts to one another, nor that sublime Unity of Idea which stamps these creations as those of masters. Yet, Englishwomen and girls expect, by cramping their feet into boots tight enough to be very wearying "for the first few days," and their hands into gloves which cause them to be, or appear to be, the size which they happen to admire; by wearing many pounds of clothing on one part of the body, and leaving it most thinly clad in another, and by continuing this treatment for years or for generations, to produce a self or a descendant, who shall meet the national and artistic ideal of beauty. As well teach a kitten to be supple by putting it into corsets, or a child to be graceful by making it wear crinoline.

It may be urged that such abuses in clothing are not so common as they were a few years ago. This is true enough, but the reason is one which ought to put them out of existence altogether. Surely it is not incorrect to say that the present advance in opinion is due to more thorough and more scientific education in general. Let us go further and give all women the special education which is their undeniable right—an education in the principles of health. This teaching might and ought to be given by a woman. Let it be so, and while the first consequence would, doubtless, be to release them from the slavery of fashion, and the second would be their exchange into the larger, freer, more glorious, yet less dangerous, service of beauty and art.

For it is not to the Catholicity of Art that Fashion bows; she is a schismatic, the goddess of those who worship the artificial; she is local, frivolous, timeserving, and while to *Art* we owe the enduring loveliness of the Hellenic deities, and ladies of Raphael's saints, and Ruben's children, to Fashion we owe little more than an aesthetic art, parody, and the crinolines and dress absurdities of the Victorian era.

The Natural, the Free, the Proportionate, these are the Beautiful in women as in statues, and it is only when these are recognised by the devotees, as well as the leaders, of fashion, that the race will stand a change of due progression in form. When that time comes, however, the women of England may well hope to be as fair and graceful as those of ancient Greece.

After all, thank God, it is not every woman—especially if the internal organs are in good condition—who can produce a waist of one-third the girth of her shoulders, or can ruin her vital capacity by tight lacing. But these, and other like evils, do prevail to such an extent, and are already entailing such disastrous consequences, that an old woman with very good spectacles may be pardoned for the suggestion that only

knowledge brings safety, and that neither present nor future generations of the English race will attain to their full physical possibilities, until English girls are taught what really are hygienic errors, why they are errors, and how they are to be avoided. How many girls—and it is to girls that all these things are chiefly applicable—how many girls are aware that tight lacing injures the liver? All, we trust, know that bilious attacks ruin the complexion. How many could show that high heels were a probable source of weak sight? Many more, doubtless, have heard that they engender curvature of the spine. How many of these will recollect they must thus interfere with the pose of the head and figure? How many realise the evils consequent upon bad circulation, and know at the same time that this is often an outcome of inequalities in the weight of clothing? And many who could answer some or all of these questions would be appalled were it clearly and truthfully demonstrated in how far physical development is retarded by bad ventilation ; how greatly disease and death result from imperfect sanitary arrangements ; or to what extent the remedies for these things lie unused in the hands of women.

For it is they who are the priests in the communion of humanity. It is they who bear the Chalice of Life to the race, and if they have not first sacrificed at the altar of health the wine is but a polluted offering, and by no means may they wash from their hands the guilt of blood, or put from their souls the bitter regret of having robbed the encharist of its glory, and mutilated a finer sculpture that was ever the Venus of Milo.

Transcendently does the great boon stand in the gift of the wife, of the mother, and of the housekeeper, yet even an old maid may make herself useful in these early hours of the battle, by pleading for what we all need so sorely—*an organised system of instruction where women shall be taught by a woman the principles of health.*

Hygiene classes of this nature ought to be established in every town ; and if as a result of such teaching, women acquired higher ideals of beauty and grace, of form and proportion, along with the knowledge of how to attain to those ideals, the praise of future generations would be only part of the great reward of those who had thus promoted the health, happiness, and power of posterity.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 2

THEIR RIGHT TO SERVE

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian", August 25th, 1888.

Eighteen hundred years ago, in a small province on the shores of the Levant, there dwelt a gracious personage, whose

wondrous intuitions of sweetness and sympathy reached forward through more than twice nineteen centuries, and told truths, the perfect development of which as laws remains even to-day in the far distant future. We fear that too much of what passes for Christianity amongst us the lips of the Chirst would utter the words, "I never knew you" ; yet one saying of His was God-like in such human fashion that we humbly believe that amongst women, at least, the Galilean Teacher would see verified the exceeding insight of His words, would find the due fruits of His precept—"He that will be great among you, let him be your servant."

"Servant of the servants of God," says Lord Macanley, "was the proudest title ever claimed by the Roman Pontiffs," and "Servant of the servants of God" is the queenly dignity of every woman who faithfully takes her place in the home-throne that comes to almost all of us at some period or other of our lives.

It may, perhaps, be said, that on this ground of service the question of "women's rights" passes into the current slang of the day. In the usual acceptation of the phrase forms a deep sociological problem which our own inferior cerebrum must confess its inability to solve. Ever we study this great subject; never do we see a girl enter upon a clerkship or on some other branch of service once exclusively masculine, without thinking of the father whose bread-winning is being made a sharper struggle, of the young men who are thus being retarded from progress ; and as we muse, there recurs to us the thought of that tremendous growth of pauperism, and the terrible keeness of taxation for the support of the idle nobody's-poor, that make it impossible for a man to support adequately his own poor, and drives out daughters along with sons to take part in the baneful "struggle for existence," but—

"The life so short, the craft so long to learn," sings Chaucer of old. The poet is right. For us, with the snows of many winters upon us, the subject is too large, and under her grey hair an old, old woman is fain to give up its pursuits, and to turn her feeble and very feminine brains to a simpler aspect of "Woman's right to serve."

Woman's home. Rule and home service (for the two ideas are to some extent inseparable) have their root in her power of self-forgetting, in her devotion, and her greater craving for something to lavish tenderness upon, than for love itself. This spirit can only be satisfied by the performance of little loving offices, and the home life is the more fair and perfect in its broader outline, the more accurately and anxiously these details are carried out.

We have all seen homes of the greatest elegance and refinement, presided over by woman of cultured mind and polished manner; and the least observant must have noticed that the more prominent have been these traits, the

surer has been the discovery on better acquaintance that the mistress held the household reins in her own hands, and did not think it beneath her to make dinners that were miracles of ingenuity, to mend and darn in private, and to superintend housework in person. It is so, throughout the various degrees of middle-class life. The instinct of a gentle-woman will never allow these things to be prominent, but they are there all the same, and to us it seems that the lady who can arrange a Table prettily, set the cooking of a dinner on foot, see that every room is ready for use, and can then receive and entertain a guest with frankness and courtesy, without "fuss" or ostentation of one sort or another, is of infinitely higher type than any mere *grande dame* or *femme savante* whom we have ever met.

Indeed, it seems to us that she who can plan a supper at once elegant, simple, and wholesome, that she who can keep a house in order, and control a servant with wisdom, better upholds the rights of her sex than some more learned member of it, who may discuss the matter with more depth than she. The tact of a woman in adapting herself to her circumstances, will often prove enough; after more or less experience, to make her a tolerable cook and house-wife. In days gone by, girls were more under the training of their mothers in domestic matters than is now the case, and in those days we learnt to darn stockings and make bread at increadibly early ages. But our plea is not for enforced home-life for women; it is rather that the home-life which does devolve upon a large proportion of them sooner or later, should be rendered freer and higher by the infusion of the important element of knowledge.

At the occurrence of some domestic fatality, for instance, how great would the mother's relief sometimes be, had she any but vague ideas of the treatment to apply to a serious cut or burn, or of the value of such accessible remedies as strong coffee, green tea, vinegar, lime-water, or soap-suds, in various cases of accidental poisoning! How sad is it that she should so seldom understand even so simply a matter as tendency to headache, restlessness, and viritability in her own children!

And this knowledge, so useful in emergencies, is almost equally valuable in the ordinary routine of life. One may never need to practise artificial respiration, but how useful to every one would be a proper explanation of the science of mixed diet!

Different causes call for occasional variation in quantity, kind and combination of foods. We practise the necessary change, but could two women in fifty explain their own conduct in so doing? For instance, we would all provide ham or bacon to be eaten with veal and chicken, and not with beef or mutton; how many of us know why we would make the provision "Liver and bacon" forms one dish; we regard the oil as part of the

salad.; it is a Lancashire habit to include a small piece of cheese amongst the ingredients of an apple pie. These things all have their reasons, but we no more seek for their motive than we make question of such customs as the throwing of a shoe for luck, the raising of the hat as a form of salutation, or the freedom of the mistletoe-bough at Christmas, all matters which likewise have their reasons. It would almost seem as if some of us found it impossible to think at all; nine out of ten people not previously instructed on the point, will be found ready enough to state that mastication is the only operation performed on food in the mouth.

Possibly we are all acquainted with the position of the tongue and teeth; not too many can point out likewise, the locality of liver, heart, and lungs, not to mention such more abstruse (!) matters as sweetbread, duodenum, and spleen.

We would that the wonderful story of alimentation were only half as widely conned as that of every murder and every execution that takes place on English ground!

The benefit to be derived from teaching girls the science of food is not altogether visionary, neither does this subject cover the whole of the ground which they must traverse, in preparation for high and holy household service.

Take the use of soap and water for instance. Few of us fully appreciate the importance of these two commodities. If servant girls were taught that careless washing of floors, paint, and furniture, laid themselves and their employers open to disease; if mothers knew how many childish illnesses might be prevented by the use of hot baths; and if all house-keepers understood the true nature of *dust*, there might indeed be no apparent change in the cleanliness of houses unimpeachable before, but there would be an influence at work beneath the surface doing undreamt-of service in stamping out zymotic disease.

Again, it is part of the matron's duty to provide her household with pure water. That this is important may be seen from the fact that typhoid and scarlet fevers; cholera, diphtheria, erysipelas, and skin diseases generally have all been clearly traced to impurities in drinking water. The difficulties in the way of obtaining the required liquid are not however, so easily perceived. The filter does not obviate the danger of disease germs, and on occasion of doubt of epidemic perfect security is only attained after boiling. It will, then, be readily acknowledged that the mistress of a house should understand the nature of pure water, and should be able to compare that which is supplied to her house with the true type. The educated eye can detect in water the taint of organic matter, mineral impurity, or sewage, just as the educated eye can at a glance realise the healthiness in position and sanitation of a given house. Why should not all women possess this power?

In wall-papers and curtains, clothing materials . and unguents, parasites, mineral waters, kitchen utensils, and a hundred and fifty other commonplace objects, may be found similar food for thought and interest.

Life is made up of little things. Dinners and suppers, soaps and wall-papers, modes of cooking and composition of beverages, are not in themselves great matters. We all look down upon the natures that consciously and voluntarily yield to their sway. Yet, there is no doubt that in the subtle inter-actions of body and mind we are dependent on them. It is for the loving and conscientious service of mothers, wives, and sisters to make the dependence basis of gain and not of loss. It is for the study of Hygiene.

* * *

But here the old woman will put on her considering-cap, lest in her zeal to read a lesson she should be launching forth into a sermon, illustrative of the loguacity of old age.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 3

THEIR RIGHT TO CHOOSE (HOUSES)

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," September 8th, 1888.

After their right of service, it would have seemed fitting perhaps to have treated of women's right to rule, which forms the outcome of her service, but it seems to us that we have hardly given due share of gossip to the very ground of all their labours, the essential preliminary of all the home duty and family love of society. Let us then talk of *house hunting* and women's right to choose their homes.

It is hardly to the woman of fortune, whose assent is required in the selection of some mansion or villa, that our remarks apply, though even to her a more scientific mode of house valuation, a clearer and more definite idea of the merits of buildings, would doubtless be valuable. At the close of a long life, however, it is not such favourites of heaven that one longs to aid ; rather do we aim at bringing the knowledge of health laws to those homes where the wife may be indeed the housewife, where the husband, worried by commercial or pro-fessional pressure, cannot look to servants for domestic com-forts, where there is room and need for womanly tact, economy, and regulation, to those families who are most likely to be sufferers by the modern practice of jerry building.

In choosing a house, more has to be thought of than

prettiness or the lack of it. This plays an important part in the moral functions of the house, still, were we asked to take as alternatives, beauty on the one hand, and lofty, well-lighted rooms on the other, few of us would hesitate about taking the second. So much of hygiene we all formulate for ourselves in the ordinary routine of life. But beyond this few of us have adequate knowledge. Of limited purse, we may not think it reasonable to be fastidious as to position and aspect of the house we take, whether it stands high or low, faces north or south, and so on ; but too few of us know how important is the nature of the *ground* on which our home is built. Let us take an illustration. In our own little town every reader has noticed that on a rainy day the Rhosddu roads get muddy, and that Pools of water remain standing long after the shower that caused them has passed off ; the Erddig road and the elevated Part of Hightown, on the contrary, become dry immediately the rain is over ; even a considerable downpour will leave no trace in half an hour's time. The difference arises from the diverse characters of the soil, and in one, being built on clay, will be found frequent instances of consumption, neuralgia, and rheumatism, while in the others, which are situated on gravel or sandstone, these maladies will not be nearly so rife. This is not all. There is a terrible custom of "making" soils for building purposes, common in large towns. Ground is often "made" in this way of dust, containing organic matter in a state of decay, disease germs, vermine, &c. The house built on rubbish and filth of this kind is in worse case than that built on sand, and the catastrophe attendant on its existence is likely to be correspondingly more terrible. The selection of houses by careful, well-informed women would be sufficient to drive such fraud out of the trade, and produce the survival only of the fit. This is one danger of ignorance.

Again, few matrons would take a house where doors and windows did not fit well in there frames, yet these crevices often form the only ingress for fresh air, and if they are not to be allowed (their discomfort and inconvenience are very real), some substitute must be found for the due performance of this function. Hence the househunter requires scientific knowledge of the *Principles of ventilation.*

At the same time we doubt that the draught from the floor of an unfurnished house would receive as much attention from most woman, as that from the door. She would cover the floor with a carpet, and never know, as might probably be the case, that through the carpet drain-air was filtering, and that the seeds of illness were possibly lodging in carpet and furniture, till some systemic weakness in those who lived in the room should make them an easy prey.

Most would be eagar to pitch their tent in some district of complete and air-tight sewers. Few would realise all that

fact was worth. It would simply mean that since sewer-gas could not escape into street or park, *it was all the more to be dreaded within the dwelling.* Cesspools are not good in themselves, but a case of epidemic has been known, where disease attacked houses in connection with a drainage-system that was the pride of its town, and altogether passed over certain cottages which each possessed a cesspool of its own (Spencer). It is comparatively easy to detect the commoner faults of this nature, but surely every householder would have a right to require diagrams of its sewage arrangements before taking any house, and that this knowledge might be effectively used, it is scarcely necessary to point out that women, as a rule, ought to know something of the *principles of drainage.*

Another class of difficulties falls under the head of *accommodation.* A small house for one family is doubtless a better rule for a population than a larger house for two families. This implies many things, and its discussion involves no little research, of a kind which no woman ought to omit. Legislation on the subject influence which might be brought to bear on the point, its physical and hygienic aspects, are matters which ought to be familier to every lady. They are not, perhaps, so important as others which we have mentioned, in the choosing of a house—not so theoretically important—because they are more likely to be carried into practice. Other knowledge there is, which all woman should possess, knowledge bearing on woman's right of choice, knowledge calculated to make wondrous increase of weight on the sorrowful side of the scales of the "might have been," but since it might also fall under another heading, and will be perhaps more palatable in a later paper, we will defer its discussion for the present.

Women are often blamed for being superfinal. We believe that no more unfounded opinion was ever current. When men will condescend to regard us as having minds, and when they will allow us free and sensible scope for our powers, in the form of solid education for our particular functions, we shall have pleasure in proving that we can discharge those functions unusually well. To an old maid we wish to give our opinion for what it is worth. The preservation of human health would seem one of the most important of those functions, and we believed that women only equipped with due knowledge to start from, would bring to bear on it the highest motives, besides keen faculties of reasoning and observation. In the particular matter which we have been discussing, their judgment would seem all important. There can be no doubt of the tremendous infiuence on life and function, exerted by ventilation and good or faulty drainage. It should be remembered that a population changes three times in a century ; hence any process of degradation or development will be comparatively quick in taking effect. At the same time the recent rapid growth of towns tends to

cause such influence as we have noted above, to make uniformly for degradation. We see but one remedy. If women cease to take ill-built houses, builders will cease to build them. The thin walled, damp, egg-shell dwellings so lamentably common at present, no longer finding tenants, would no longer find existence. The spread of hygienic science would indeed bring about that most desirable end—the survival of the fit.

At the same time, we have endeavoured to indicate—this did not seem the place to do more—the almost incredible ignorance which prevails on these matters. It is no uncommon thing to find a bag of shavings or rags stuffed up the chimney of a lodging-house bed-room, which could only be done in most utter ignorance of the value and management of pure air.

To detect many perils which lurk in walls, wall-plasters, wall-papers, and mortar, microscopical examination is often necessary. We do not claim that she who wishes to take a small house should go round, armed with visual and chemical apparatus, but we do claim that all should be taught the value of a yearly wash and disinfectants, and of the disinfectants which would be advisable to use.

But, enough ; there is but one thing to be remembered, and we have done. It is that "Right" means "Responsibility!"—that she who claims must be prepared to act ; and that she who wishes to know must be ready to learn.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 4

THEIR RIGHT TO ADVANCE

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," September 29th, 1888.

"What has been, what is, and what shall be."—All are summed up in one brief space of time. So intimately are connected the future and the past.

"Evolution" is but the watchtower of the city of history: without foundation in that city, the tower could never have been built, and only can we reach the conception of what progress in any direction may mean, by a careful survey of what progress has hitherto meant in the same direction. It is thus that we come to look at the question of "Women's Right to Advance". Her "right" must depend on the meaning of "Advance," and that, again, will be most clearly realised when we look at her past history, and see in what way her circumstances have already furthered her development.

First and foremost, it will perhaps, be well for us to examine into her *character*, that beginning with something like a true estimate of what she *is*, it may be the easier for us to find out what she has been.

We find, then, two traits strongly brought out in most women but not capable of their fullest display together—self-respect and self-forgetfulness. To the abuse of the first may be ascribed the frivolities of fashion in dress or other matters; to intensity in the second, such stories as that of Catherine Douglas,[1] of Joan of Arc, of Florance Nightingale, and of many a quiet domestic heroine, whose virtues have never transpired beyond the circle of her home-life.

History has many comical things to tell of that weakness which we have called the abuse of self-respect. For instance, we may all remember the story of our childhood, where a certain Queen of England is said to have adopted a head dress so broad and high, that the royal doorways had to be raised and widened for her accommodation.[2] In another age[3] bonnets were warn so tall, that a fashionable divine threatened his fair hearers with the vials of Divine wrath, for striving to add a cubit to their stature! To the frivolities of fashion, also we charge the abortive attempts which women make at intellectual cramming, the Lady Jane Greys and bluestockings of history.

But these freaks, proceeding from undue prominence of one feature, have had little to do with the historical progression of woman. That is based on the gradual blending and balancing of the two activities; the rest is mere excresence, eliminating itself age by age, from the economy, in the natural course of things. Again, we must remember that nothing can be viewed without due regard to the conditions which surround, and modify it—its environment. Thus, it is necessary that we should give a glance, however cursory, at the home customs of women, throughout the past centuries of English History.

In Anglo-Saxan times we find the houses of the "people" to be mere huts of lathes and earth, with holes in the wall to admit light. There was no protection against stress of weather, in these premitive windows, and as the fire was in the middle of the room, and there was no chimney, it is easy to picture the conflict of smoke escaping, and rain or snow entering by one aperture!

The houses of the higher ranks were sometimes built of stone, and were only one storey high. In the centre of the building was the hall, of which the dais was sometimes tessellated, while the lower floor was of clay. Benches sometimes ran round the walls, but sitting on the floor was quite admissible. Chairs were a mark of the highest rank; candles were made of grease plastered round a stick; the fire was in the middle of the room; the windows at best were only spaces filled with trellis work; masters and servants dined together (above

or below the salt), and the cooking was often done at the lower end of the dining-hall!

The sleeping apartments or "bowers" opened off this central room, and were very simply furnished, beds then and for long after consisting usually of straw, sheepskins, and a log of wood for a pillow. Such roughness was, of course, mere indicative of the state of its owners ; but the main point for us is that even so we find in the women of those days many attractive and redeeming features. True, it was not thought unwomanly for the pretty coquette of the dining hall to act the virago and the slave-driver in her own bower, but this was a savagery to be expected of the age. It is somewhat wonderful to find that Anglo-Saxon ladies rejoiced in clean table-linen, in decorating their walls with tapestries and so on, and in cunning needle work and embroidery. It is something to be proud of, that, though our ancestresses used no forks, they atleast washed their hands after every meal ; that they used the bath with Roman frequency, and made an essential of personal cleanliness. Curiously enough, too, we find that they studied physic, and cultivated herbs and flowers.

In Norman days, great ladies gained much in position and refinement, as mistresses of fudal castles. Their girlhood was almost invariably passed in convents, which we may suppose to have been open to the influence of whatever culture existed on the Continent. Later in life, the baron's wife was left in charge of his fortress during her lord's absences, as commander of troops and representative of his honour. At the same time, the warlike practices of the age required of every woman a knowledge of surgery, salve making, and sick nursing, and amongst the placeful arts, of course, embroidery was the most prized. [Even during the reign of Edward the Confessor, we hear of an estate being left to a certain person, on condition that he taught this accomplishment to the testator's daughter.] This continued to be the case for centuries, so much so that the lace worn by Elizabeth in the authorised portraits, was worked by the fingers of Mary, Queen of Scots. With all that would seem to us gloomy, revolting, and brusque in the woman life of these far-off days, it is amusing to remember that the great S. Dunstan, *in the tenth century* had made himself fashionable by his talent for designing ladies' robes! It must be borne in mind (lest their should seem no sufficient occasion for the display of finery) that at least after the coming of the Normans, every English castle was in truth a college for pages, a school of embroidery for gentlewomen, a garrison for troops, and a hostel for king's messengers, guests, and chance travellers.

In the fifteenth century, the nobility began to use manor houses or halls, built of oak, and several storeys high. Strange to say, little advance seems to have been made in the decoration of the great hall, beyond the fact that it was strewed with

rushes or boughs in summer, and hay or straw in winter. It is curious to remember that not yet was the use of glass common, that chimneys were only beginning to be made, that thatched roofs were the rule even in London, and that forks were not used till more than two hundred years later. At the same time, owing to the fashionable habit of receiving calls in the bed-room, the furniture of that room began to be much improved. It is a comfort to hear that beds were made more healthy by being placed on bedsteads, and that the mattresses and curtains grew more modern in style.

Side by side with this civilisation of the highest ranks there was growing up, amongst London and other town populations, the great English middle class. This led to the building of substantial houses for their accommodation, and the form of building usually adopted was that of two or three storeyed houses, with each storey jutting out beyond the one underneath. The streets being originally narrow and lane-like, it may be imagined that this practice deprived people of air and light, even when out of doors, and when we add to this that the floors of these houses were usually clay, enamelled with dirt and rubbish of all kinds, and that the streets of London itself, up to the end of the seventeenth century, are described as "open sewers," it will be seen that there was a happy hunting-ground prepared for those disease-germs, which, under the names of "the plague," "the black death," and "the sweating sickness," seem to have ravaged the country so often during the mediaeval period.[4]

Civilisation having now advanced for enough to render societies infinitely more mobile than had been the case in Saxon or Norman days, women, as a whole, underwent many changes in ambitions, customs, status, and powers, between the end of the Plantagent and the present days. During the thirteenth century, either they or the spiritual character must have been highly respected, for four abbesses were then summoned to Parliament![5] At the same time, old chancer tells, with less flattery two tales which throw greater light on the subject—"The Nun's Tale" and "The Tale of the Wife of Bath;" one worldly and frivolous, the other earthly and robust.

From this it is a startling transition to the "Higher education" of the Tudor period, when girls of rank were crammed with Greek and Latin, but were treated usually with a severity that forgot the weightier matters of parental love and mercy, and of a high ideal of family life.

Like all mere "fashions," this attack of the blues died out in time, and the next well-defined type that we meet with in English history is perhaps that of the Puritan struggle. Great times produce fine characters, and there can be no doubt that those years of turbulence, fanaticism, and gloom produced women of much purity and dignity; the more the pity that the reaction

was so strong. One thing is to be noted amongst all the littleness and modishness of Charles II's days, and that is, that while spelling was but dimly understood by ladies, they got up a great passion for the study of science, chemistry having become the rage of Court!

The life of the upper ranks during this reign, however, is best regarded as a frolic, and bearing this in mind, it is somewhat saddening to find, when the glare of French playhouses has passed off, and when the nation has blossomed into the literary elegance of Anne's reign, that the women of the period may scarcely be called participators in its pen and ink refinement, to find that they are not merely homely matrons pursuing a daily round of pastry making and cider brewing, but that they were illiterate, dull, and coarse in language and manners.

From the beginning of the Georges till now is a space that needs no elucidation from us. The spread of newspapers, the discovery of steam power, the use of gas, all the varied and extended activities of nineteenth century life, have been so many hands bringing to our doors that higher development which may well form the keystone of the arch of pure, natural existence.

That our lives are, to some extent, "natural" (we do not mean "wild" or "savage," which seems the popular notion of the word) results from the working out, however imperfectly, of nature's law. We are ready to believe, after our slight review of domestic habits in this country during the past, that life then was in all cases a "struggle for existence," we are ready to acknowledge that we are now well on the uphill path. In the name of what has been done, then let us go still further, and let us take the first steps of all true progress in knowledge and understanding!

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 5

THEIR RIGHT TO KNOW

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," October 6th, 1888

"Women's Rights" is a battle-cry echoing so clearly the "higher education" turmoil that we feel that the task we have

[1] Catherine Douglas was the lady who replaced the bolt with her own arm, when the conspirators were forcing their way into James I.'s presence.

[2] Isabella, Queen of Richard II.

[3] Under the later Stuarts.

[4] This state of things was only done away with completely in 1665, the year of the fire of London. After this the city was rebuilt on more sanitary principles.

[5] Of Shaftesbury, Barking, S. Mary Winchester, and Wilton.

undertaken would be incomplete without an acknowledgment of the existence of that question, more especially as the particular "right" for which we have been pleading is neither more nor less than a branch of education which we do not consider widely enough disseminated in the feminine world. And so we come to talk about "Women's Right to Know."

Most sweet and awful word, "to know!" How we thrill with the mingled pain and rapture of the moment when, in the soul's observatory, in midnight solitude, we stand and gaze upon the star-wealth of our knowledge ; when across the silent Infinitudes of space, out of the dim reaches of the long-past ages, the world send their mighty waves of Force and Light, all the concentre in the tiny consciousness of our one human mind, and first we utter the words "I know."

It is but an instant, and it is gone ; exulting, we tell ourselves that our Intellect is the target to which an arrow-thought from a bow formed, mayhap, of the curve of some circling planet, has winged its way ; and even as we tell it, the rejoicing has died out, and the hubler, truer fashion, we see that not Knowledge, but Ignorance, is ours. For there, in the solemn blackness of night, in the overarching majesty of the Eternal, our wisdom shrinks to nothing, and is seen hardly to exist, save in the fevered pride of our own brains. We find that all our problems and measurements, worked out with aching and weariness, all our guessings and calculatings, all our gleanings and hoardings, all our waverings and bewilderings, serve but to show us the true Gold-Dust of the Universe, that there, in the down-stretching space-depths, there, amidst the moving water-atoms of the oceans, nay, here, in our own minds and bodies, in the hoary rocks and in the sparkling icicles, in the rising mist and in the blushing leaves, there lives and works a Something, a subtle, impalpable Reality, not to be so much as conceived by us.

And thus, in silence and darkness, the grandest soul in our race must bow, and humbly, reverently, like a little child, in the presence of the Great All-Spirit, must say "I know not!" Nay, when he reaches the "know not',, it is incontestable that he does know, better than he ever did before!

It is a wondrous ecstasy, this blessedness of knowledge! And it is little marvel if women, in the larger freedom which this century has certainly brought them, should attempt to rush through the gates, at once to exchange the outer courts of duty and frivolity for the absorbing beatitude of the Holy of Holies of human wisdom!

Less excusable is the action of those who would force the mind of a girl into such a channel, when obviously uncongenial. "Even on Women" the mantle of Genius will fall sometimes, and genius is ever its own law maker, by its own Royal right. But while for genius we would have liberty to do all things,

we believe that for mediocrity also there ought to be liberty of another kind.

In these days of reaction, from the blindness and thraldom of the past—while it is plain that the present violence of examinational steam and cram will give way betimes to something wiser and gentler—it behoves us to do nothing to intensify the exaggeration of the hour, but to do all that in us lies to produce a sounded practice of education for those who come after us. Thus we would never, for our own part, lift our voice in favour of the indiscriminate instruction of our sex on abstruse subjects.

With a far different view have we been advocating women's right to the knowledge of a certain branch of science.

It seems an acknowledged conclusion amongst some of our greatest thinkers that to be acquainted with the date of the battle of Hastings can have no moral effect on a child, i.e., that the spread of elementary education cannot check crime. That this is true of the isolated facts of instruction we emphatically believe.

But it is on all hands allowed that the conduct of a well-ordered life is to be regulated by Reason. Now, there is one idea with which we wish to saturate womanly reason ; indeed, we wish so to imbue it with this notion that every question bearing on vital well-being shall be seen in its light, and we believe that thus moral conceptions will be formed which will have an undeniable influence on women's conduct and surroundings.

"He hath given them a law which shall not be broken."* It was in far away Israel, three thousand years, that the words were spoken, yet echoed as they have been ever since alike in Temple Ritual and Christian Memorial, almost without ceasing, it has taken so long for men, as a whole, to wake up to their meaning!

Law, rigid, immutable, unavoidable, is the Master-tone of the Universe, and the sooner we learn to sing our Life-catches in harmony with it, the better.

We talk of *breaking laws*, forsooth, as if laws could be broken! A deeper understanding would show us that he who suffers from the breach of law is only *keeping* it after the manner of his own choice. Laws keep themselves for the matter of that, and while the World-Father may *forgive*, as the Chirst's sweet voice long ago declared, His very omnipotence forbids that he shall abrogate the dignity of His own Empire.

This is the truth we would teach to women, this the idea—in all its practical bearing on the wide field of womanly cares and duties—that we would give them ; and for our own part would be content to leave it to them to demonstrate that it is possible for knowledge to produce moral conceptions, which,

---

* Prayer Book Version.

in turn, it would become matter of conscience to carry into practice.

At present ignorance gives no room for responsibility. When women have heard proclaimed the Evangel of Health; when, for instance, they know what taints are hereditary, and must be attacked from that standpoint; when the tremendous effect of physical condition on mental and spiritual activity has been made evident to them; when, above all, they have learnt that resignation to the Divine will mean, more often than at present they dream, the vigorous prevention of possible evil, then and not till then will they have a fair opportunity for showing what value they attach to principles, and whether or not it is true that they are wholly inaccessible to the appeals of the abstract virtues. The only argument which we have ever heard advanced against a course of such study is best answered by silence; it is as shallow as it is contemptible, since "fearfully and wonderfully made" can have no meaning at all for one who has no knowledge of how she is made. This knowledge at least we believe that women have a "right" to receive. For the rest it is not our function to agitate. To the experience of time, and to individual capacity must be left to the determination of individual culture.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 6

THEIR RIGHT TO RULE

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," October 13th, 1888

The words of the prophecy of the mother of king Lemuel are startling, both in their contempt for women as she sees them, and in their reverence for what she sees that women may become. The ideal of this old-time queen is not that of some Semiramis or Christina, mighty in power and great in intellect; she is, rather, a quiet, capable, busy burgher wife, looking well to the ways of her household, providing them thick clothing for the winter, and working willingly with her hands; she is mayhap, a king's daughter, for her garments are of silk and purple; but she is, at all events, the embodiment of our old Saxon notion of a lady—her children's loaf-server.*

The king's mother insinuates that only in this home-path can woman attain social distinction for herself or her family, and surely never were the political claims of the sex urged with

* The word Lady is derived from A. S. Heaef—loaf, and Duggan—to serve.

more of strength or wisdom than when it is assigned to its type as her reward that men are to "give her of the fruits of her hands and let her own works praise her in the gates."

The prophecy is true all round, and after many a year of observation and experience we can but endorse the utterance of this royal woman of old and give it as our belief that the most wholesome, most practical, most realisable ambition for a woman is that which is pursued amongst the crowding duties of the home and the family. [If any woman have another, let her take a vow of spinsterhood 'ere she pursue it!]

How little those duties are generally understood, we have tried to show in our past papers on this topic. We will now consider what effect might be produced by a better comprehension of them. We do not wish to fall into the error of assuming that knowledge directly modifies conduct, but we think our case may be strongly made out in a few sentences: —

(a) Human organisation, individual as well as social, physical as well as mental, is subject to constant change, constant progress or constant degradation, in conformity with those laws of nature which directly control it, and which we call the laws of health, or the science of hygiene.

(b) Large classes in every town belong to a low type of life, and are undergoing the process of degradation, owing to the perpetual infringement of primarily health, and secondarily other laws. These classes are prolific of physical and moral diseases alike.

(c) So convinced is the legislative mind of these facts, that we have everywhere sanitary committees, inspectors, and rules, with a whole apparatus of compulsion for the observance of the necessary principles.

(d) That this compulsion is not fully effectual, will be readily admitted by any keen observer of the lowest classes, even in so small a town a Wrexham. For instance, he who will stand near the Wymstay Arms on Mayor's Sunday, will see sights which will fill him with shame and loathing (force at once convertible into sympathy and reform.)

(e) Granted that compulsion is not sufficient, we believe that in course of time the domestic and social *influence* of educated and conscientious *women* would prove all that is necessary to eliminate the low, and raise the existing higher types.

(f) For this, it seems superfluous to say that women, as a whole, must have careful and systematic training in Hygienic principles.

Yes, we aim at no woman-rule which shall transcend that of *inflence*. Her emotional strength gives her this—the most delicate, as it is the most enduring form of power—pre-eminently, and we believe that she needs no other sceptre. Obviously within her own family and indirectly outside it,

the influence may be made all powerful for good in the direction which we have been contemplating. How far her tact and goodwill can go in political and religious affairs, we have all proved. Something of Hygienic work she has already performed in the Temperance field. Her moral force might be tripled in the way which we have indicated. Women! Women! Oh, will they never come forward to claim and to do?

If any feel doubtful that women, seeing a path of high usefulness, would decline to tread it, we need only point to the amount of charitable work done by them, week by week, in the name of religion. The deepest wretchedness, the most abject squalor, have never proved too black for the ministrations of gentle ladies, who often, indeed, have loved humanity not wisely, but too well!

On the sacredness of this one question, of the highest humanity, religion and science are well agreed. "All that concerns man should interest men," said the doubt-embittered Voltaire, and to this day, whatever unhappy divisions may exist amongst the truth-seekers, to this creed, at least, they all hold true.

There is something inexpressibly beautiful in S. Luke's picture of the Christ as the Great Physician—at once healer and absolver—a royally-tender presence of strength and help to the pain-weakened body as to the world-weary soul. It is, then, in this name, as well as on the grounds of mercy and truth, that we would urge the supreme claim of womanhood to a knowledge of health-science.

There is a tremendous responsibility for us who live during these enlightened days in the fact that human life is a plastic and modifiable reality. If women would only act up to the rights within their grasp we might have homes, families, cities, and nations, composed of men at once able and vigorous, of women good, beautiful, and intellectual, of children strangers to posset and potion, and of societies free from criminals and lunatics.

And, visionary as all this sounds, it is none the less true that it lies with us to determine in great part whether and when these things shall be woman-rule, apart from the foregoing, needs no remark here. A blind man lately told us that a woman could get her own way so artfully as to make her husband think it his. Women may have talent of this sort, but it is not of it that we would speak. The true woman-rule is a will formulated only in the "law of kindness," but which, being so formulated, may be by a mother, goes with all who receive it, into the wide world, clinging to them like some subtle aroma, protecting, guiding, and moulding themselves, their associates, and their posterity with force that always

accumulates in direct ratio to the number and goodness of the women who reiterate it.

This is no fancy. An Old, Old Woman is long past the days of youthful romance and enthusiastic distortion. At the same time, she maintains that what she has said on this point is not merely the outcome of senile talkativeness.

In the course of a long life she has seen much evidence of the emotional power of womanhood, and if, as the greatest writer of our day asserts, emotion is the only pressure competent to produce moral effects, then it seems to her that here is the grandest engine imaginable, to be utilised for the benefit of mankind at large. Let us walk with our eyes open, let us seize all opportunities of learning, above all, let us be doers of the word, and not hearers only, and then hurrah for the days when doctors shall be almost unknown in the land, and when faultless medical pedigrees shall have stamped out toothache and bad temper, deformity and vice together!

THE WREXHAM FREE LIBRARY

[রেক্সহ্যামে থাকাকালে মার্গারেট নোবল সমাজকল্যাণে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, জীবনীকার লিজেল রেমঁ সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে যেসব রচনা উপস্থিত করেছি, তাদের মধ্যে, মার্গারেট নোবলের এই ক্ষেত্রে প্রয়াস, পরিশ্রম এবং পরিণত মননের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। 'রেক্সহ্যাম ফ্রি লাইব্রেরী' লেখাটির এবং 'অ্যাম্বুলেন্স ওয়ার্ক' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মধ্যে অন্য কিছু না থাক, লেখিকার সমাজসেবিকার ভূমিকাকে তা স্পষ্ট করে তুলেছে।]

Notwithstanding the present vigorous agitation on behalf of increased culture for Wrexham, we do not believe that there is as general an understanding as there might be amongst us of the advantages which we already possess in our Free Library. This institution was commenced under the Free Libraries' Act on the suggestion, originally, of the late Mr. J. C. Owen and the Rev. Canon Howell, B.D., and first saw working existence on December 10th, 1879. From that day it bore the name of the Wrexham Free Library and Museum—it is needless to say that it was at first merely a reading room and is not yet a museum—but for a long time no addition could be made to its functions owing to want of funds. By dint of private gifts and judicious expenditure of rates and subscriptions, however, the nucleus of a library was formed, and while the museum has only existed in name as yet, every day a vast extension of its scope comes nearer to those who are interested in the premises above the Guildhall. The Free Library at present consists of two parts, which it is earnestly desired to make into three. The two parts are—the reading room and the reference library. In the

first is a constant ebb and flow of visitors of all classes, but chiefly those who can snatch only short intervals, at the expense of hurried meals; and here one sees that finest and most distinctive of English sights—the eagerness of the working man for political news. Men bend over the *Times* and *Standard,* or sit and read *Punch,* the *Edinburgh Review,* the *Nineteenth Century,* or the Welsh and provincial news, with the zest which makes them, for the time, blind and deaf to all that goes on around them. So earnestly they read, so responsible and keenly interested they look, that one could almost imagine that the extended franchise was written on the face of each one there! The average daily number of these visitors comes close on three hundred and fifty persons, each of whom can, if he likes, receive the full benefit of the expenditure of £60 per annum on papers and magazines.

At the upper end of this fine room is a door, within which we find the library proper. Here sits the librarian, Mr. Gough, like the famous spider, demanding record of book received, name and address, from every visitor who comes within his toils. Mr. Gough is the "right man in the right place;" such is his personal devotion to abstract method, that we verily believe, had he walked in the life-path of the higher mathematics, he would have achieved a name and fame therein, comparable, perhaps, to that of the immortal Euclid or imperishable Newton. Mr. Gough's catalogue, arranged with painful accuracy, and written in the hand that rivals copperplate, he that runs may read; and Mr. Gough's rigid observance of his committee's rules, is a phenomenon worthy of imitation, which is, as we all know, the superlative of admiration. Now, to this inner sanctuary we fear that comparatively few do penetrate. It is true that the ambition of the committee soars far beyond its present means with regard to the assortment of volumes provided for the student's delectation, but even at this moment there is an intellectual banquet available by a visit to the dingy little book-room, which is enough to make the lover of old literature mad with hunger. In the department of fiction, for instance, are already collected the complete works of Dickens, the master of pathos and comedy alike; of Scott, the clear, penetrating expositor of historic drama; of Thakeray, the John Baptist of nineteenth century high life; of Kingsley, that most fascinating of scientists, and most sympathetic of novelists; and of the ruling mind of the modern novelist, our peerless, incomparable George Eliot. This is not all. Amongst works of more purely philosophical character, we have De Quinsey's essays; Emerson's complete works; a less complete set of Carlyle; twenty-two-volumes of Professor Morley's "English men of Letters," together with the same writer's "Burke" and "Diderot," and Fraude's "Short Studies on Great Subjects." In the domain of history Wrexham possesses, in its collective character, those of Macauley, Green, Prescott; translations of

Guizot and various biographies, such as Boswell's "Life of Johnson" for example. There is also a supply for reference in this same division, comprising "Ancient Laws and Institutions of Wales," supposed to have been enacted by Howell the Good; Pennant's "Tours in Wales;" and Blackstone's commentaries. Several rows of bound periodicals, like Cornhill, Temple Bar, Blackwood, Household Words, and Chamber's Journal, 20 volumes of the poets, some theological works, and a large and excellent reference department, make up the rough outlines of what must be acknowledged a thoroughly good start for any Municipal library. Of the reference department we have yet to speak; it is, perhaps, the most salient feature in the whole collection. Every work in it is *crime de la crime*, and it includes a number of excellent writings on local subjects, all of which have been printed in Wrexham, and which, put together, the librarian dubs "Our Local Library." The most costly work in the room belongs to this division, and consists of the twenty-four volumes of the "Encylopœdia Brittannica," obtained at the nett cost of not less than £ 32 8 s.; but besides this are also four volumes of the "Imperial Dictionary," "Haydon's Dictionary of Dates," "Smith's Classical Dictionary," "Smith's Latin-English," and "Pugh's Welsh-English Dictionaries," with other works of a similar character.

It will be seen that a place like this cannot be kept up—above all, cannot maintain adequate *growth*, without a considerable allowance for current expenses. As a matter of fact these reach the modest sum of about £ 230 yearly, of which some £ 190 or thereabouts is paid out of the rates, while about £ 12 a year is raised by private subscription. £ 12 yearly is not a great sum, considering the class of people who may be expected to give support to such an object as a Free Library, and the fact that the whole establishment is as yet but a means to an end, makes this paucity of the wherewithal the more felt.

The words "suitable for circulation," occurring in the Secretary's report of May last, mark the desire of the committee of establish in our midst a Free *Circulating* Library. This would indeed be an inestimable boon, and towards its achievement a large room has already been built, opening off the lower end of the reading-room. Now, it is a fact that the work here is for the present at a standstill, *because the committee have not the funds in hand necessary to furnish it with shelves.* Fifty pounds would be a sum sufficient for this work, after which the books, save and excepting the works of reference, would be moved from their present place into the new room. Fifty pounds! Why half-a-crown each from four hundred people would procure a constant supply of the best literature, to be read by their own hearthstone, not only by themselves, but by their children, their neighbours, and by the hundreds others who might perhaps have no other direct *claim* on them, save

that of belonging to the same town, and looking to the said half-crown people for their guidance and enlightenment, as we would look to the capacity of the tubes and burners to indicate in some degree the amount of gaslight which a room was to enjoy!

Fifty pounds, to be raised in half-crown subscriptions. Bah! We feel like suggesting a charity, when we are in truth pointing out a responsibility! More than four hundred of us would think ten, or twenty, or thirty shillings little enough if subscribed to some private library for our own and the proprietor's sole and individual profit and behalf, and too often for the feeding of our own and other minds on stuff as poisonous, pestilental, and vulgar as the lowest drugs of the most adulterated wine of literature can even be! Can it be, that any such would grudge some slight donation or subscription in books or money, to an enterprise which brings picuniary profit to no private party; the highest kind of benefit to all; and which is in fact the common property of all of us, who live and work in the town, however much we ignore our proprietorship, however little we do for our own property.

It is to be hoped that the circulating librabry will be quickly followed up by a local museum; but that is perhaps to be looked for, rather in connection with the coming(?) science and art class than in the older institution, which is doing brave enough battle at present to keep its own head above water, to maintain its own way against the inertia of public (want of) opinion!

[নিম্নের লেখাটি খণ্ডিত আকারে পেয়েছি। প্রাপ্ত অংশ থেকে বোঝা যায়, স্থানীয় শিক্ষা আন্দোলনের পক্ষে এটি জোরালো রচনা। এতে বিজ্ঞান ও কলা-শিক্ষাকে সমন্বিত করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিবেদিতা ভারতের ক্ষেত্রে এই উভয় শিক্ষার যুগপৎ বিকাশ চেয়েছিলেন।]

Now popular Ignorance at the present time will be freely allowed to be decidedly on the wane. Are we in Wrexham taking any steps to decrease its influence in our own midst? After all that has been said in these columns during the last few months on this very subject, it could only be the happiest of tasks to us to record the action of the meeting assembled in the Council chamber of the Guild hall, under the presidency of the Mayor, last week. His Worship's speech on that occasion was a model of clearness and simplicity, explaining that there was a branch of Government (the Science and Art Department of the Council on Education, South Kensington) specially devoted to the provision of art and science culture for the nation at large, that this body gave instruction in more than a dozen branches of art and twenty-five of science, that it conducted

examination and encouraged effort in these direction by grants and loans, and he proceeded to ask by what medium we could bring ourselves into receipt of all these good things. Having already set up a Free Library, our Corporation is entitled to add to itself further a local committee for the establishment of science and art classes and, if desirable, a museum in the town. The South Kensington session for this year began on the 5th of the present month of October. Hence it is to be feared that we are too late to have the work on foot, and examinations held in the town next spring. Whether this be so or not, however, is hardly the point at present. What we have to remember is that even when the classes are fairly commenced, popular support of a serious and steady nature will be necessary to make them a success. This will not be difficult to give, since the fees are arranged in regular proportion to the means of students. Will it be our choice to give it? In former years, as the Mayor properly remarked, similar attempts have twice been made, and both times have proved abortive, owing probably to the want of due publicity. It rests with us to see that the like failure does not again occur. The number of mutual improvement societies, and so on, which have existed in this town during the last few years, and died of inanition, or maintained but a feeble hold on life, will of itself be token enough of the need for some organised scheme of this kind. This system proposed is such as to bring Wrexham, the metropolis of North Wales, into scientific touch with the rest of the kingdom, and—truly a most important point?—such as to enable her youth to take full advantage of the natural wealth with which this district is so richly endowed. Of the life-enrichment which knowledge of this kind efforts we have already spoken. It is, surely, a strange anomaly that the Welsh—whose own country is a perfect earth-jewel of beauty, and who are themselves noted for their literature, their oratory, and their music—should utterly neglect the arts of form and colour, and the tremendous mental game of scientific education! Let us hope, then, that out of regard for our town and our neighbours, there will be a pull, a strong pull, and a pull altogether, to bring this matter to a favourable issue and that, once available, we shall, each for himself, hasten to secure the fullest participation in its golden benefits.

W. Neilus.

AMBULANCE WORK

Sir,—In sending me Dr. Lawton Roberts' little book with the Red Cross shield on its covers the other day, you added one benefit more to six columns of consideration which you

have already accorded to my unworthy self. May I hope that you may allow me publicly to thank you for the same, and also to make a few remarks on the work in question. In a series of papers with which I encroached on your space a short time ago, I dealt under the title of "Rights ; with woman's claim to a knowledge of the Laws of Health." One very important branch of that subject—Ambulance—is treated in an exhaustive and interesting style in the book you sent me. It is a strange thing that ambulance always seems a subject more attractive to the feminine mind than hygiene. Perhaps the need of gathering up split milk is more obvious to womanly intellect than the need for preserving it in a good, deep basin ; and perhaps—yes. I am sure—that much of the reason lies in that large womanly compassion which is so quickly stirred at the sight of pain. At any rate, there they are—the need, and the will to supply it. Now, do we in this little town do our best even in this matter of learning ambulance? Alas, we have no lectures! The only lady of whom I have heard as studying the subject here at present has to go to Chester for instruction, and I know a few (myself for one) have been anxious for help nearer home. In the face of this need incomes Dr. Roberts' illustrated lectures on ambulance, and for my own part I have greatfully to record that, with the help of its clear illustrations, a few handkerchiefs and strips of linen, with the legs of tables and chairs to practise upon, I have been enabled to master many of the mysteries of the roller and triangular bandages.

One remark seemed to me eminently practical. Dr. Roberts considers that universal reference to some one ambulance system—as the St John's—would be an advantage, as it would secure a kind of free masonry of method in giving first aid to the injured. Again, he frequently and strongly insists upon the need for ambulance training in *mining* and manufacturing districts like our own. Surely this need is obvious. But some few ideas ought to be even more widely circulated than a class or a book ensures. How many, for instance, know that a man lying "dead drunk" is really in a state of extreme danger from acute alcohol poisoning, and that to pass on without rendering aid or giving warning is a breach of Christian duty? Such knowledge as this ought to be universal. May I suggest to the readers of your valuable paper that, if they will only buy and read the book for themselves, they will find much information equally new, startling, and worth acquiring.—

Your obedient servant,
an old old woman.

A PAGE FROM WREXHAM LIFE

(From the Wrexham Advertiser, December 7th, 1889)

ভগিনী নিবেদিতাকে অনেকেই এদেশে কল্পনাবিলাসী বলেছেন। যাঁরা বলেছেন তাঁরা অধিকাংশই 'সাহেব'—বিলেতী বা দিশী। এঁদের মধ্যে সমাজ সংস্কারে উৎসাহী কিছু মানুষও আছেন। এঁরা জানতেন বা জানতেন না—মার্গারেট নোবল বা ভগিনী নিবেদিতা বাস্তবকে যে-আকারে দেখেছেন, স্পর্শ করেছেন, সমালোচকেরা তার থেকে বহু যোজন তফাতে ছিলেন। বাস্তবকে তার সমস্ত ক্লেদ-গ্লানির মধ্যে দর্শন ও অনুভব করেও সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে পারেন যিনি, তিনিই যথার্থ মানবতাবাদী, মানুষের কোনো পরাজয়কেই তিনি শেষ কথা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নন,—'আমি থামব না',—এই যাঁর জীবনবাণী। 'রেক্সহ্যামের জীবনের এক পৃষ্ঠা' বস্তী অঞ্চলের জীবন্ত সমীক্ষা—মার্গারেট নোবল যে 'লোকমাতা' হবার পূর্বেই লোকমাতা—তার প্রমাণ।

রচনাটির সূচনাতেই একটি মর্মভেদী প্রশ্ন—"অসজ্ঞান অন্যায়ের চেয়ে তিক্ত অন্যায় কিছু আছে, অজ্ঞানের মেঘের চেয়ে কালো মেঘ কিছু হতে পারে?" উত্তর—"আমাদের এই ছোট শহরে যারা তলিয়ে ডুবে আছে, তারা বলবে—'না'।" কারণ—"রেক্সহ্যামের চওড়া খোলা সোজা রাস্তার পিছনে আছে বস্তী ও সংকীর্ণ গলির গোলক-ধাঁধা, যেখানে বাস করে এমন এক শ্রেণীর মনুষ্য যাদের আচার-আচরণ ও পরিবেশ আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক, দুষ্ট ক্ষতের মত, আমাদের নাগরিক জীবনের প্রাণশক্তি তা কুরে খাচ্ছে। রেক্সহ্যামের অধিবাসীবৃন্দ, কান পেতে শুনুন, আমাদের শহরের ১২ হাজার অধিবাসীর ১২ ভাগের ৫ ভাগ লোকও মুক্ত বায়ু বা আকাশের আলোর তলায় বিচরণ করে না।"

আলোকিত ও অনালোকিত দুই জগতের পার্থক্যের রূপ ফোটাবার সময়ে দীর্ঘশ্বাসে দুলে উঠেছে মার্গারেটের লেখনী। অনালোকিত অংশের বর্ণনা—

"খোলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছি, না তো ওগুলি রান্নাঘর নয়, সবে-ধন শোয়ার ঘর! ভাগ্যবান যারা, তাদের আলাদা নিজস্ব শোয়ার ঘর আছে।" ঘরগুলি অন্ধ গুহার মত, পিছনের দিকে আলোবাতাস চলাচলের দরজা-জানলার লক্ষণমাত্র নেই। "প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক গৃহপরিকল্পনার কালে অবাধ বায়ু চলাচলের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকৃত, কিন্তু এখানে একমাত্র যে বায়ু চলে, তা ডাস্টবিনের জঞ্জাল-গন্ধে পরিপূরিত, ত্রুটিপূর্ণ জঘন্য ব্যবস্থাসৃষ্ট বিষ-জীবাণুতে ভর্তি,—ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে, বেরুচ্ছে চিমনি-নামক বিচিত্র জিনিসটির ভিতর দিয়ে, এবং ঢেলে দিচ্ছে সর্বদিকে কৃমি-কীটের জীবাণু, রোগ ও বিষের সম্ভার, যার ফলে গহ্বরটি—স্থানীয় লোকদের ভাষায় গৃহটি—পাপ ও মৃত্যুর মৃগয়াভূমি।"

মার্গারেট নোবল বস্তী সমীক্ষায় বেরিয়েছিলেন, হাতে ছিল নোটবুক, মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন—স্বামী কখন ফেরেন, কি করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ধারণা কি ইত্যাদি। প্রশ্ন করছেন আর চোখের পটে ছবি উঠছে—"ভাঙা সিঁড়ি, ভিজে দেওয়াল, খসে-পড়া চুনবালি, মেঝের ভাঙা পাথর, চারদিকে ছড়ানো

সকালের এ'টো বাসনপত্র, এক কোণে আগুনের ধারে ময়লা নোংরা একটি শিশু কর্তৃক আর একটি শিশুর পরিচর্যা, চিমনি থেকে হঠাৎ ভক্‌ভক্‌ করে ধোঁয়া উঠে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়া—।" না, এই শেষ কথা নয়—"সেই স্থান ত্যাগ করেছি 'স্বামী আমার বেকার'—এই শব্দে ঝাঁ ঝাঁ-করা কান নিয়ে।" একটি পীড়াদায়ক চেতনায় মন ভরে ছিল—"যে-পর্যন্ত গৃহ বন্যের গৃহ, পারিপার্শ্বিক বর্বরের পারিপার্শ্বিক হয়ে থাকবে, সে অবধি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংস্কার বা প্রগতির চেষ্টা ময়লা নোংরা গোরস্থানের উপরে চুণ বুলানো ছাড়া কিছু নয়।"

কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িও অবশ্য দেখেছিলেন, যার গৃহকর্ত্রী কর্মপটু, দেখে মনে হয় সুযোগ পেলে তাঁরা দরজা জানলা খোলা রাখবেন, কিন্তু খুলে লাভ কি—সামনে বিদ্রূপের হাসির মত খোলা ডাস্টবিন, যার কয়েক গজ দূরে জঞ্জাল-ছড়ানো জায়গায় "ছোটরা স্ফূর্তিতে খেলছে, জানে না, হায়, শীঘ্রই হয়ত মমতাতুর একটি প্রাণ চেয়ে দেখবে, সন্নিকটের গির্জা-চত্বরে সংকীর্ণ কফিনের বিছানায় তারা শুয়েছে নিরাপদ বিশ্রামে—চির বিশ্রামে।"

সমীক্ষা আরও অগ্রসর হয়, উত্তম চেহারার একটি বস্তীর সন্ধান মেলে, যার মালিক কিছু বিবেচক, কিন্তু ঐ একটিই, বাকি সর্বত্র পুরনো চেহারা। সপ্তাহে ১ শিলিং ৬ পেনি ভাড়া এমন একটি ঘরের—সমগ্র পরিবার একটি ঘরেই থাকে—তার মধ্যে রয়েছে ব্রঙ্কাইটিসের রোগীও! পাশেই একটি বুড়ির ঘর, দশ বছর সেখানে আছেন, দশ বছর ঘরে মেরামতের হাত পড়েনি, মেঝের সর্বত্র গর্ত, ইঁদুরের স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র। একটি মুচি-পরিবার : স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে আট জন একটি ঘরে, সেই ঘরেই জুতোর 'কারখানা' ; রোজগার সপ্তাহে ১৬-১৭ শিলিং। এমনি নমুনার পর নমুনা। বিচিত্র অলসতার দৃষ্টান্ত : প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র অসুস্থতার ভান করে মায়ের কষ্টার্জিত উপার্জনের উপর জীবন কাটাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে নতুন জ্ঞানোদয় হল লেখিকার। এতাবৎ তাঁর ধারণা ছিল—"নারী অহঙ্কৃত সাজসজ্জার প্রতীক, যারা সাজতে—সাজতে—সাজতে—নির্ঘাত ব্রেন ফেল করে ;" কিন্তু বস্তীর অভিজ্ঞতায় জানলেন, ঐ "অমার্জিত প্রাথমিক পৃথিবীতে পোষাকের অধোগতি পুরুষের চেয়ে নারীরই বেশী।"

দীর্ঘ বর্ণনার শেষে মার্গারেট নোবল লিখলেন—

"দৈনিক পত্র মারফত জানছি যে, আগামী বছর ইউরোপে এশিয়াটিক কলেরার অভিযান ঘটতে পারে, তখন—!!!"]

Is there any wrong so bitter as unconscious wrong, any cloud so dark as the cloud of ignorance? He who dipped far below the surface of life in our little town, would almost, we think, be inclined to answer "no." For behind the open streets and thoroughfares of Wrexham lie networks of slums and alleys, wherein dwells a race whose habits and surroundings are a blot on our civilisation, a foul canker eating into the very heart of our Municipal life. For be it known unto you, O, men of Wrexham, that a population of twelve thousand are

we, of whom not more than some five twelfths dwell in the fresh air under the light of heaven!

A walk through these dismal regions behind our main roads carries with it much instruction. We come in from the country on some bright, fresh, morning, and plunge downhill, literally and metaphorically, into a fine wide roadway. In vain we look for traces of squalor and wretchedness here. The buildings are bright and large, the houses clean and fresh, or at most quaint and olden looking. A few steps further bring us, however, into a very different region, and a turn to the left, lands us into one of those courts where life is a perfect epitome of degradation and uncleanness. "Byron's Alley" is, we will suppose, its name, and in all that is miserable and ramshackle, it and its neighbour den, "Hill Square" are truly birds of a feather. Have we entered an assemblage of the back aspects of tumble-down dwellings we ask in amazement—for here are all the arrangements which could characterise a back yard, grouped together, face to face, with open kitchen doors, and bedroom windows. But no, we are in the *front* of these houses. The supposed "Kitchens" are their sole living rooms, and lucky are those dwellings with a single bedroom in addition for family use, while—worse and worse—there is no "back" at all save a blind wall, unbroken by window or door or other aperture for light and air on the other side. Thorough ventilation in these days of elementary schools and scientific buildings is to be taken for granted, but all the ventilation that exists here consists of air well saturated with the refuge of a dustbin, and the poison-germs of defective sanitation, going and coming, going and coming, through the open door up the crazy chimney, depositing here and there its load of parasites and vermin, its diseases and its poisons, till the hole these people call a home is little more than a hunting ground of vice and death.

We go into one of these houses, and say "Good morning" to the woman standing yonder at her wash-tub. "Does she happen to be the laundress patronised by our own better half?" We think with a shudder, and we take a mental resolution to make closer inquiries than we have ever yet done into the peregrination of certain linen shirts and collars and cuffs from Saturday to Saturday. We want to know when her husband will be at home, and various little question as to his ideas and predilections are asked and answered within a few minutes. Into our notebook go the particulars we have sought for ; into a deeper memorandum within our brain go descriptions of the broken-down staircase, the plaster peeling off the damp walls in all directions, the broken stones of the floor, the unwashed breakfast things scattered about, the grimy child nursing the dirtier baby at the fire in one corner, the smoke that an occasional gust blows down the chimney into our faces, the—but

it is enough. We leave the house with "Husband out of work, sir," ringing in our ears, and a sickening consciousness that reform and progress for our working classes are but superficial white-washings of a recking sepulchre, so long as their homes are the homes of savages, their surroundings those of barbarians.

Another house in the same vicinity shows a picture different, and yet the same. The thriftlessness and improvidence of the last are gone. A clean, neat woman, with tidy children, and well-arranged kitchen, stands at a table ironing; there are a couple of plants in the window; there is a bright fire in the grate, and, though the house is as dilapidated, the sanitation as bad, and the damp as obtrusive as before, one warms with the knowledge that while the windows will not open, here are people who would open them if they could. That though their privileges are a sinecure, the two shillings a week that pay for them are well-earned—that in short, there are families to be met with, even here, who have the energy and courage to better their condition if only they knew how, and that, at last, we have lighted on one case of the deserving poor. But the open dustbin, &c., of which there is one for the whole yard's use—still laughs in our face. A couple of yards away, and in the filth-breeding sunlight outside, little children still play merrily, all unknowing that a kind heart might sooner see them safe in their narrow coffin at rest in the churchyard yonder.

And, reader, did you ever notice that a gutter to drain the water off your roof was a luxury? Life is possible without it any way, for here, at least, is not one, and two shillings a week to pay. Is it any wonder that these people would fain sell a vote for a soup ticket, or a load of coal, that they would worship at any shrine for a charity blanket, or that the word "relief" has for them only the most material and degrading of meanings.

Out of Byron's Alley and Hill Square we go, up a hill to the right, and down a street—James or Charles or William, as the case may be—from which opens a slum or two, that in every respect presents a complete contrast to those we have just passed through. And subsequent inquiry shows us in the landlord's agent of these parts, a kindly, sensible man, who takes an interest in the cleanliness of his tenants, and who earns the respect and hearty goodwill of all who know him. Two or three hundred yards further on, however, lies a district which to some extent repeats the horror of our first dip. Here is a house in which the man lies ill of bronchitis. There is but one room—rent 1 s 6 d a week—and this is damp and close. There are a few pictures, though the bed at one side is by no means too clean, and there the usual complaints to be made as to floor, walls, and roof. In the same neighbourhood we find an old woman who has been a tenant of the one domicile for the last ten years. The floor of course needs

repairing. Rats—those amiable heralds of imperfect drains—have been working their own sweet will beneath the surface. We enquire, and learn that the hearth was mended ten years ago, and that since then improvements have been simply nil.

Never mind! We are learning something as we go along this bright morning, pursuing investigations which are nauseous to the last degree. Hitherto, women have been to us symbols of all that is vain and beautiful in dress. We have associated with them the thought of two bonnets where one would have done, of trains lost through over-long toilettes, &c. The scales fall from our eyes here. Down in these habitations of the lower orders, where habits are more primitive, and instincts less modified, we find that the women sink into degradation in the matter of clothing infinitely sooner than the men. We find, too, that cats will live where dogs will not, and we respect cats less for ever after.

The next case has its comical side. A sharp, thin little woman, with spectacles, opens the door of a kitchen which is as clean and neat as a new pin. As we enter, a tall, pale, and melancholy-looking man stands up to salute us, while his mother proceeds to victimise us with an account of his illness and weakness. We hasten to depart, with her shrill words, "Nobody knows, sir, what that young man has suffered," following us. But we do not find that the neighbours have the same high opinion of him. When we hear more of him, the dreadful truth begins to dawn on us that he is dying of starvation because he is too idle to work, and prefers living on his mother! And she, poor soul, for and because every hen's chicken is the glory of the farmyard, supports him and does battle for him, when he would be far better pitting his miserable, puny little egotism against the world for her sake!

But our task is by no means done. In one place we come to an area, within which all the water has to be carried from a certain well. To do this, in some cases, must be the work of quite a quarter of an hour. To our common sense is left the imagination of how charily that water must be used, and how small a proportion of it is likely to be consumed in cleansing operations. But oh, we shudder to think of the merit which will accrue to that house-wife who can "do" with the smallest water supply! And our blood runs cold as we picture to ourselves the clothes, the dishes, the floors, that will remain unwashed, or semi-washed, to avoid the trouble of carrying water from the well?

Again, we find a home for seven, which consists of one room under a *provision warehouse*. The room is large, and bare, has an earthen floor, and no furniture save one small table, and seats formed of wood placed on a couple of bricks. There is something in the furthest corner which we do not at once recognise to be handful of rags—once, perhaps, clean.—

doing duty as a bed; and there needs no tongue to tell us of damp and vermin in every wall, while "no ventilation" is written in the building. In another abode near this eleven people live in a kitchen and two bedrooms, and pay two and six pence a week for the privilege. The house is damp, and is close to almost stagnant water, but half-a-crown a week is its rental nevertheless; and the eleven people—of whom from two to four are men-lodgers, and all at home on Saturday nights—continue to be its inmates also.

But all these are only types. Here for instance, live a cobbler and his wife with eight children. The income of the family is sixteen or seventeen shillings a week, which the father earns by working in the one bedroom. The mother has a scullery in a little shed across the yard. The children are clean, but the house is not, and the water supply consists of one tap for the common use of the yard. In another house, near, we find an old Irish woman, of—from her own showing,—a most violent temper, and evidently strong mendicant tendencies. This old dame pours into our ear a long tale about the way in which she has been pressed to enter "The House." We have not the pleasure of knowing much about "The House" ourselves, but it strikes us with a sense of something wrong that she appears to consider herself public property, whose life and fortunes are at the disposal of the corporation.

Our description is a long one, but meagre when compared with the facts. More than one problem has cropped up during the walk, but the great one, that of the direction in which to look for the progress of the masses, will need many another, ere it becomes elucidated. And meanwhile the daily papers tell us that next year Europe may look for the incursions of Asiatic cholera, when, woe be to the classes as well as the masses, when sanitation is not a little more highly developed than sanctification is apt to be!

PHRENOLOGY AND PHYSIOGNOMY

[মার্গারেট নোবলের ব্যাপক জ্ঞানসাধনার মধ্যে 'ফ্রেনলজি' অর্থাৎ মাথার খুলির আকার থেকে মানবপ্রকৃতি নির্ধারণ-বিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বিদ্যার মূল ব্যাপারটি যে-রকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি আলোচনা করেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, এই বিদ্যাকে তিনি যথেষ্টই অধিগত করেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট বিশ্বাস করেছিলেন কি না সন্দেহ। অন্ততঃ এর বিষয়ে তিনি যে কৌতূহল ও কৌতুক দুইই বজায় রেখেছিলেন, তা বুঝতে পারি। এই বিশেষ বিদ্যায় আকৃষ্ট ব্যক্তিরা রচনাটি থেকে আনন্দের খোরাক পাবেন।]

O, the amateur Phrenologist! How many of us know what it is to spend a week in the same house with him? At

first he pleases by his constant reference to and elucidation of the fascinating subject—self; but gradually this palls on us, and ere long we would do anything to escape him and his reflections, his scepticism as to our motives, his reiterated assertions of the strength of our vanity, indolence, or love of approbation. There is no doubt, however, as to have a smattering of the art oneself is a great stimulus to the power of observation. To be able, or to think yourself able, to trace the irregularities of your friend's character according as his cranial contour varies from the curve of beauty is, beyond dispute, a powerful incentive to the habit of analysing features and character alike. The neophyte finds it easy to gather a general impression, as to greed, but hard to localise the trait; the believer, however wanting of penetration, is at once able to point out that this lies in the closeness of the inner corner of the eyes. Of course, the truth of this conclusion is a further question on which our most ingenious consideration is adduced. If the craniologist, in his voyages amongst our billowy locks, chances to make some glaringly false statement, he can always find some "neutralising bump" to pacify our outraged experience. We once saw a clever amateur astonish a lady whom he had known for half-an-hour by telling her that she was fond of dress, but was not gratified by brilliant colours. Notwithstanding his explanation that she had "love of dress" (or whatever means that) largely developed but "colour" very slightly, we could not help a suspicion that a glance at her attire had really been the ground of his statement. Still, such an incident is apt to suggest a good deal. Evidently, after the map of the head and face has been well-memorised, the thorough-going physiognomo-phrenologist finds a heavy balance of training still to be traversed. He has to master all this counteraction-neutralisation branch of the subject; any slips in his practice will be laid to the charge of imperfection here, and is it possible to delineate a character correctly after this fashion, if it is not, to some extent, covered by one's own? Is it possible for the lower to analyse the higher nature?

Thus far, we have taken no note of the idea that the system is but elaborate quackery. The facts of the case appear to be these. In form, the human brain (i.e., the part with which craniology is chiefly concerned) is uncommonly like a walnut covered with a grey, instead of a brown layer. In the walnut, the more the twisting and contortion of the surface, the larger the area of brown skin which the nut will possess. Just so in the brain. The more the dippings and convolutions of the organ (sulci and gyri, as they are called), the greater and extent of grey surface appear to depend the intelligence and perceptive power of the brain; in the man of genius there is great surface, in the idiot comparatively little. It may be supposed, then, that each of these walnut-like protuberances of

grey matter produces a corresponding protuberance of the skull. The phrenologist further maintains that each protuberance is a seat of a peculiar power, and we thus get the "bunips", and their associated faculties of craniology. The idea is plausible, but by no means proven; and in the present state of the science of brain-function, a positive judgment is perhaps impossible. How many good folks, halting between two opinions, will tell you that "they do not exactly believe in it, but they think it comes true sometimes!"

Meantime we must speak of people as we find them, and for our own part we have found the amateur, for an evening's amusement, capital; but for a week's society—well, quite too knowing! At the beginning of this century the system was the fashionable craze. A clever schoolboy, named Gall, had been in the habit of comparing and conclating the heads and characters of his schoolfellows. On leaving school he pursued his investigations amid prisons and lunatic asylums, blossomed forth into essay writing and became the fashion. He was soon joined for a time by a man named Spurzheim, and in a few years the partnership was dissolved. Spurzheim, however, continued to believe and expand the system, and thus it is commonly spoken of as founded by both. In the course of our researches into the matter, we have found some curious items. For example, Gall had a pious brother, the top of the front of whose head (just above the coronal enture) was uncommonly well developed. Gall watched the people who prayed with most fervour in church. Noting that they were all more or less strong here, he assigned the region to the organ of veneration. Order was determined by examining the head of a methodical idiot. Conscientiousness, we are told, was recognised by its absence, and constructiveness by comparing the head of an unusually skilful milliner with a skull said to be Raphael's; while love of approbation was first localised from the head of a lunatic who imagined herself queen of France. A strange idea held by the founders was that the particular functions of a bit of brain surface belonged also to the outside of the skull in some way. Thus, friends who were much attached were supposed to lay their heads together in the line of the organ of adhesiveness; poets, when composing, to lay the hand on ideality, and musicians to press the "bumps" of time and tune!

The art of physiognomy seems to us infinitely more fascinating than its kindred science. Here at least, we cannot go far wrong, since the salient points in all faces are explained and made prominent by the whole expression. How many phases of character, for instance, may be denoted by the shape of the forehead. That narrowing of breadth at the middle, which indicates cruelty; that expansiveness betokens culture; that prominence that shows reasoning faculty, are all traits

familiar to each of us. Another feature that at once stamps its impression on the beholder is the mouth. Coarseness acidity, amiability, weakness, that peculiar long, straight lippedness, so often to be noticed in members of Parliament and others who may be supposed to have a "power o' talk," and the full, sensitive lips of talent, are qualities which impress themselves at a first glance on many ordinary beholders. For these things, doubtless, some of us have long ago compiled unwritten codes of our own; few would need Wells and Fowler, we think, to tell them that one whose eyebrows form a single arch possesses a sullen temper. One *feels* that is so, without any theory. Can anything be more interesting than the lower jaw? This according to physiognomists, is a great index to character. Does anyone possess a friend whose lower maxillam is square in the front? Let him take note that his friend is of iron will. But is the line of greatest breadth set far back, nearer the neck! Then it indicates generosity of temperament. Phrenology, comes in, however, if the line of greatest breadth of the head be just above the ears, and says that so foxlike a formation can only indicate craftiness. Almost involuntarily association with those who are deep in this kind of knowledge will leave in the mind a resdiuum of something that is not science, and yet is scarcely superstition. Physiognomy, is allied to astronomy, is a very ancient art, and really a week with the amateur skull-diviner is apt to produce in one the tendency for ever after to "tell people's fortunes" 'by their faces. One has heard that small ears are a sign of ambition and powers; one goes away just a trifle inclined to label all the small ears one sees with the word "success!" We have been told that a dimpled chin points out a nature that desires love, rather an object of love, while dimpled cheeks indicate a power of lavishing, rather than receiving, affection. What romances do we henceforth weave around that distinction! One or two points of physique—as the small, arched foot, the shapely hand, and the little shell-like ear—have so long been theory, that we accept them as tokens of "blue blood" as a matter of course. Others, the facial angle, heaviness of eyebrow and fulness of the eye, are by this time so thoroughly part of ethnological science, that Darwin himself devoted time and labour to their observation. But a large remainder are of purely hypothetic virtue. This is chiefly the case, indeed, with phrenology or "skull-doctrine," as Carlisle translated its German name. And in this branch of character divination, uncertainty is increased vastly by its dependence on the individual interpreter. Has he much sympathy, much comparison, much power of deduction? Without all these, and we may add, a very large endowment of intuition, even the professional will not be able to do justice to the system of Gall and Spurzheim.

But as for the amateur under those circumstances—Flee him! Beware of him! Come not near him, as you value your peace of mind! Oh, the agony which that misguided individual is capable of causing to anyone who possesses any self-esteem at all! Oh, the number of times a day that he will attribute your vituperation to jealousy, or your amiability to weakness, your courage to conceit, or your kindness to love of approbation, your partiality for chocolate caramels to an epicureanism, or your fondness for tobacco to a want of intellect. And the delight with which the malicious creature views your faint applauding smile!

Gentle reader, should you ever know what it is to be tormented thus, remember that phrenology is only an ingenious form of idle speculation, that some amateurs are very amateurish, and that it is a case of "More shame for 'em, has honly shows their hignorance."

W. NEILUS.

পরিবর্তন যুগ

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের অপরাহ্ণে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শনের পরে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে আগমন পর্যন্ত সময়কে আমরা 'পরিবর্তন যুগ' বলতে চাই। এই কালে মার্গারেট নোবল কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছেন, নানা সূত্র থেকে তার সংবাদ আমরা পেয়েছি, যদিও এই সময়ে তাঁর অন্তর্জীবনের রূপ একান্তভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে, এমন কোনো চিঠিপত্র পাইনি। মার্গারেটের মত প্রতিভাদীপ্ত সামাজিক নারী, যাঁর প্রচুর বন্ধু-বান্ধবী ছিল—সেই বন্ধুরা এই অভিপ্রায়ে কতখানি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট ছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে তাঁকে কতখানি যাতনা পেতে হয়েছিল—তাঁর পূর্ণ ইতিহাস বোধ হয় আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

নিবেদিতা পরবর্তীকালে 'আচার্যদেব' গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন, আগেই জেনেছি তা। এই কালে নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর পত্রগুলিও উদ্ধৃত হয়েছে পূর্বে। নিবেদিতা দু'একবার বক্তৃতায় এবং চিঠির মধ্যেও স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কিভাবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, বলেছেন।

নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতা, ক্লাস এবং ঐসব ভাষণাদিতে নিবেদিতার উপস্থিতির ও অংশগ্রহণের বিষয় যথাসম্ভব বিস্তারিত জানিয়েছেন। নিবেদিতার বোনের স্মৃতি-কথা থেকে পেয়েছি—নিবেদিতা যদিও প্রথম থেকে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলেন—জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিরোধ জাগিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘ দিন। প্রতি বক্তৃতার শেষে তিনি কিভাবে—'স্বামীজী, কিন্তু—' বলে উঠে দাঁড়াতেন, তার কথা জেনেছি।

স্বামীজী ইংলন্ড থেকে চলে আসার পরে নিবেদিতা কিছুদিন লন্ডনের বেদান্ত সোসাইটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ই, টি, স্টার্ডি, এরিক হ্যামন্ড, বিশেষতঃ মিসেস অ্যাশটন জনসন এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। এই সমস্ত কার্যাবলীর কিছু বিবরণ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় মিস মার্গারেট নোবল প্রেরিত লেখা থেকে পাই। ব্রহ্মবাদিনে নিবেদিতার এইরকম চারটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, ১ অক্টোবর, ১ নভেম্বর, এবং ১৬ ডিসেম্বরে।

১৫ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত লেখায় মিস নোবল জানিয়েছেন, গত ডিসেম্বরে (১৮৯৬) স্বামীজী চলে যাবার পরে উইম্বলডনে অল্পই বড় ধরনের বক্তৃতাদি হয়েছে। তবে স্বামী অভেদানন্দ কিছু ক্লাস নিয়েছেন, যাতে মিঃ স্টার্ডি সভাপতিত্ব করেছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য ক্লাস বন্ধ; লেখিকা আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে 'বেদান্ত ঘুমিয়ে পড়েনি।' শিক্ষার বিরতি, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয়; বিশেষতঃ বর্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে তত্ত্বটি অভিনব এবং বিশাল। পাশচাত্ত্য মনের কাছে পুনর্জন্মবাদ এবং 'পাপ, অজ্ঞান ছাড়া কিছু নয়' এই তত্ত্ব এতই চমকপ্রদ ও সংস্কার-

বিরোধী যে অবিলম্বে তা আত্মসাৎ করা কঠিন। তথাপি অনুকূল মনের উপর এই শিক্ষার কি রকম চমৎকার প্রতিক্রিয়া ঘটে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত যোগে লেখিকা তা দেখিয়েছেন। বেদান্ত শিক্ষার সাময়িক বিরতিকেও লেখিকা অনুকূল ব্যাখ্যায় ভূষিত করেছেন—"এসব ক্ষেত্রে বিরতি ও নির্জনতা একান্ত প্রয়োজন। এমনই নিয়তি, তার সন্ধানে ধাবিত হতে হল না, শিক্ষকেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যাতে আমরাই আমাদের অজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই করতে পারি।"

১ অক্টোবর প্রকাশিত লেখায় পাই—স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা যাত্রা করায় লন্ডন কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য সদস্যদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। নতুন জায়গায় আরম্ভ করার জন্য অনেক আমন্ত্রণ পাওয়া গিয়েছে। আলমবাজার মঠ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ সেবাকাজের যে বিবরণ পাঠানো হয়েছিল, তা পেয়ে লেখিকা অতীব উল্লাস প্রকাশ করেছেন, কারণ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন আলস্যের আকর—পাশ্চাত্যের এই সমালোচনার উত্তর ঐ সেবাকাজের মধ্যে পাওয়া যাবে।

১ নভেম্বর সংখ্যার লেখায় মিঃ প্যাসটন ব্রাউনির বাড়িতে মিঃ এরিক হ্যামন্ডের সভাপতিত্বে বেদান্ত-অধিবেশনের কথা পাই, যাতে জনৈক সদস্য প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধের উপর কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা মিস নোবল করেছেন, সেইসঙ্গে পুনরায় জানিয়েছেন, বিদেশীর পক্ষে বেদান্ত কী কঠিন অথচ গভীর আগ্রহের বস্তু। স্বামীজীর প্রতিভার প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলা হয়েছে—

"It is very difficult to some who have never dreamt of the genuine character of Christianity, to conceive of the Vedanta as a friendly and not rival system. It says worlds for the power of the Swami Vivekananda's teaching that, it drew many such to listen to him, and left thoughts with them which they have since unconsciously assimilated and used instead of rejecting."

এই লেখায় আবার রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ কাজ সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করে স্পষ্টই ইঙ্গিত করা হল—তিনি ভারতে কাজে যোগদান করতে যাচ্ছেন—

"Great interest was expressed in the work of famine relief and in the Ramakrishna Mission. These are developments which appeal to the West in a peculiar way, *and it may be hoped that eventually the English centres will do their share towards sending out those secular and spiritual educators who shall carry on Hindu work on Hindu lines as some slight acknowledgement of the great benefits conferred on themselves by the awakening missionary zeal of India.*"

(বক্রলিপি লেখক কৃত)

১৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় পাই, মিস নোবল জানিয়েছেন, মিসেস অ্যাশটন জনসনের তত্ত্বাবধানে আবার 'বিবেক লাইব্রেরী' খোলা হয়েছে। ইংলন্ডে বেদান্ত আন্দোলনে মিসেস জনসনের ভূমিকার প্রচুর প্রশংসা করে লেখিকা জানিয়েছেন, এই শীতে যে মিঃ স্টার্ডি ভ্রমণের জন্য বাইরে থাকবেন, আন্দোলনের পক্ষে তা খুবই

ক্ষতিকর। রামকৃষ্ণ সংঘের কার্যাবলী যে ইংলণ্ডে বিশেষ সহানুভূতির উদ্রেক করেছে, এই লেখায় তা পুনর্বার জানানো হল।

ব্রহ্মবাদিনের লেখাগুলি থেকে এই সময়ে মার্গারেট নোবলের কর্মী-ভূমিকাকে পেয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজে সক্রিয় সাহায্যের জন্য বেদান্তকর্মীরা ইংলণ্ডে সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করেছিলেন—রেমণ্ড-সংগ্রহে তেমন একটি সংবাদপত্রের অংশ রয়েছে। আবেদনটি মিসেস জনসনের নামে প্রচারিত—বলা বাহুল্য এর পিছনে নিবেদিতারই মুখ্য তাগিদ ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের আদিপর্ব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই সংবাদটি উদ্ধৃত করছি। আবেদনটি প্রকাশিত হয় ডেইলী ক্রনিকলে।

AN IDEAL RELIEF FUND

THE EDITOR OF THE DAILY CHRONICLE

Sir,—It is probably superfluous to remind your readers that the need for famine relief in India has not been ended by the recent rains. Hunger and disease will continue unwelcome guests in peasant homes until the next harvest is reaped, and one shudders to think of the terrible burdens of debt and enfeebled constitution that will leave their mark for years to come on human lives.

These things point to the desirability of continuing the aid so generously begun to our subject-Empire, and—to meet the objections of those who dislike giving money to a scheme, such as the Government's, in which a large proportion must necessarily be spent on mere machinery—it is my privilege to point out a means of contributing, where every penny will be applied directly to the purpose for which it is given. This agency has, further, the advantage of being entirely native, so that money given through it is really an encouragement to self-help.

It is, in fact, the Sannyasins—a religious order, much revered by the people, who are on the one hand without material needs or ambitions of their own, and on the other absolutely devoid of antagonism to any race or creed whatever, Christian, Mussalman, or Hindu—who have taken up the idea of organised assistance for the suffering populations and are now hard at work in the villages round Pabna, a town in the Moorshedabad district, giving food, medicine, and nursing to the disease and famine-stricken peasantry.

These particular Sannyasins form a brotherhood called the Alum Bazar Math, having its head-quarters at Baranagore, Calcutta, and their Superior is the Swami Vivekananda, who visited the Chicago Parliament of Religions in 1893, and who resided in London temporarily in 1895 and 1896; a man for whose ability and integrity many well-known people in this country and America would be willing to vouch. Their work

in the relief of distress began on May 21, and by June 22 they had dealt with some 9,429 cases.

Full accounts and many touching details are published in the *Brahmavadin* (an English paper printed in Madras and on sale in London) of June 19, and July 3 and 17 last. The Government depots quickly recognised the importance of fostering this effort, and undertook to supply grain to the Order at Rs. 3 per maund, as against Rs. 4½ current rate. It is by no means in food alone, but almost as much in medicine and personal attendance that assistance can be given, and the movement derives special significance from the fact that many young men of the highest castes have allied themselves to it and are now enthusiastically engaged in nursing cholera patients of the pariah and out-caste classes. This is a phenomenon probably not paralleled in India since the days of Buddha. But the Sannyasins depend on the donations of others. May I therefore appeal to the generosity of your readers—especially of those who are acquainted with Indian life, or who in any way have special cause to believe in the trustworthiness of this channel to assist them? Money, marked "Famine Relief Fund", may be transmitted direct to the Swami Vivekananda, Alum Bazar Math, Baranagore, Calcutta, or sent through Miss Margaret Noble, 84, Worple Road, Wimbledon. Cheques in the latter case should be crossed, London and South-Western Bank, Ltd., Wimbledon-hill Branch. All sums received in India will be acknowledged in the *Brahmavadin*.

Earnestly hoping for a sympathetic response to this appeal.
I am, Sir,

Yours faithfully,
Ethel Jonson.

28, St. Ermin's Mansions, Westminister,
September 8.

ই. টি. স্টার্ডির চিঠি

ইংলণ্ডে বেদান্ত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ই, টি, স্টার্ডির বড় ভূমিকা ছিল। স্বামীজীকে ইনি আতিথ্য দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে ইনি বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। নিবেদিতা স্টার্ডির বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এবং স্টার্ডির পরবর্তী আচরণ তাঁর কাছে বিশ্বাসভঙ্গের মত গর্হিত কাজ মনে হয়েছিল। যাই হোক, রেম‍‌ঁ-হারবার্ট নিবেদিতা-জীবনী লেখার পূর্বে মিঃ স্টার্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। রেমঁ-সংগ্রহে স্টার্ডির তিনখানি চিঠি আছে—১৬,৪,৩৮, ২৭,৬,৩৮ ও ১৯,১০,৩৮

তারিখের। শেষের চিঠিতে জিন হারবার্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্টার্ডি, এক রাত্রি তাঁর আবাসে কাটাবার জন্য; এবং পথের নিশানা লিখে দিয়েছেন। আগের দুটি চিঠিতেও খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাই না। ইনি লিখেছিলেন—"এত দিন পরে আমার স্মৃতি অনিশ্চিত ; আর আমার ধরনের মন কদাপি অতীতের ব্যক্তি বা ঘটনার মধ্যে ডুবে থাকে চায় না বা তার রোমন্থন করতে পারে না" (২৭,৬,৩৮)। আগের চিঠিতেও (১৬,৪,৩৮) এই ধরনের কথা তিনি লিখেছিলেন—"দুঃখের বিষয়, আমার মনের যে ধাত, তা খুঁটিনাটিতে নিবিষ্ট নয়, বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণ-মননে আগ্রহী নয়।" তবু মিঃ স্টার্ডি কিছু পূর্বস্মৃতি জানিয়েছিলেন, কারণ—"একটি বিরাট কাজে আপনারা হাত দিয়েছেন।" এবং মিঃ স্টার্ডি যতই বিস্মৃতিপ্রবণ হোন—

"স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিত্ব ছাপ না রেখে যান না। যদিও আমুদে মজাদার স্বভাবের লোক তিনি ছিলেন, তবু সকল আনন্দের অবসরের মধ্যেও তিনি সর্বদা মর্যাদাময়। তিনি কেবল হাসিকেই জানেন নি, বেদনাকেও গভীর ভাবে অনুভব করতেন, এবং বেদনামথিত জীবনকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বিরাট সহানুভূতি স্পর্শ করত।" (স্টার্ডির চিঠি—১৬,৪,৩৮)

এই চিঠিতে মিঃ স্টার্ডি স্বামীজীর একান্ত ভক্ত শিষ্য গুডউইনের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। আবেগের সঙ্গে লিখেছিলেন—

"আপনারা কোনো এক জায়গায় যদি গুডউইনের নামোল্লেখ করেন!—তাঁর গোটা নামটা আমার মনে পড়ছে না—কিন্তু তিনি না থাকলে আমরা স্বামীজীর আমেরিকার বক্তৃতাগুলি পেতাম না।

আমেরিকায়, ইংলণ্ডে বা ভারতবর্ষে স্টেনোগ্রাফাররূপে তাঁর কাজের পিছনে কদাপি কোনো প্রতিদান প্রাপ্তির চিন্তা ছিল না, তা সম্পূর্ণতঃ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার কর্ম। তিনি নিজের ব্যয় নিজেই বহন করতেন এবং নিজের জীবন বলি দিয়েছিলেন।"

মিঃ স্টার্ডি নিজের দুর্বল স্মৃতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা বিনয়ের উক্তি নয়। রেম-হারবার্টকে প্রদত্ত তথ্যে স্পষ্টই ভ্রান্তি আছে। কারণ তিনি এমন পর্যন্ত লিখেছেন যে, নিবেদিতা ভারত থেকে কখনো ইংলণ্ডে ফিরেছেন মনে করতে পারেন না। এবং নিবেদিতা যে কখনো আমেরিকা গেছেন বা তার পিছনে পুলিশ লেগেছিল, এসব কথাও তিনি জানেন না। নিবেদিতার ছদ্মনামের বিষয়েও একই বক্তব্য। ভারতীয় কল্পনাবিলাস সম্বন্ধে কটূক্তিও আছে—"যদি আপনারা ভারতীয় সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি এইটুকু বলতে পারি, সে দেশ রূপকথার, বীরপূজার এবং উদ্ভট সৃষ্টির।"

নিবেদিতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংবাদ মিঃ স্টার্ডির পত্র থেকে পাই—

"ইংলণ্ডে শেষ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস নিবেদিতা যেন অবিচ্ছিন্নভাবে আধা সমাধির মত মানসিক অবস্থায় ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে যাওয়ার বিষয়ে আমার সঙ্গে যৎপরোনাস্তি আগ্রহ ও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আমি তাঁকে ভারতে যেতে উৎসাহিত করেছিলুম। তাঁর অনেক বন্ধু প্রস্তাবটি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন।"

শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে অন্য পত্রে লেখেন—

"অন্য কারো পরামর্শ তিনি নিয়েছিলেন বলে আমি জানি না।* তাঁর যাত্রা নিয়ে কেউ কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা মনে আছে। তাদের নাম করতে চাই না।"

লেডী ইসাবেল মার্গসনের চিঠি

নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু এস কে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার সঙ্গে লেডী ইসাবেল মার্গসনের† বিশেষ পরিচয়ের কথা বলেছেন। লেডী ইসাবেলের ড্রইংরুমে স্বামীজীর বক্তৃতাকালেই নিবেদিতা তাঁকে প্রথম দেখেন। নিবেদিতার বিশেষ বন্ধু লর্ড কুশেনডানের দ্বিতীয় পত্নী লেডী ইসাবেলেরই প্রথম কন্যা।

রেমঁ-হারবার্টের পত্রের উত্তরে লেডী ইসাবেল ৩০ অক্টোবর, ১৯৩৮, যা লেখেন, তাতে বিশেষ সংবাদ নেই, এবং সংবাদ দেবার উৎসাহও নেই। লেডী ইসাবেল জানিয়েছিলেন, মিস মার্গারেট নোবল তাঁদের বাড়িতে কখনই গভর্নেসের কাজ করেন নি, এবং দৈনন্দিনের গতানুগতিক জীবনে 'মিস নোবল আকর্ষণীয় আনন্দ-দায়ক চরিত্র।' এঁর চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

"Miss Margaret Noble was never our governess. At the time I first met her she had a little school at Wimbledon and a certain Miss Wiedeman, a young Dutch girl was on her teaching staff and applied to me for the post of governess. I saw her at Miss Noble's house and I engaged her then and there. This was the link between Miss Noble and myself and it happened in 1895. I wish I could tell you more but I only knew Miss Noble as a delightful and interesting personality in the come and go ordinary life."

এরিক হ্যামণ্ডের স্মৃতি

এরিক হ্যামণ্ড এবং তাঁর পত্নী নেল হ্যামণ্ড নিবেদিতার ইংলণ্ড-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তা পাঠকগণ ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন আশা করি। নেল হ্যামণ্ডকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি সেরা চিঠি আমরা পেয়েছি, যার মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত

---

* অন্যের সঙ্গেও নিবেদিতা পরামর্শ করেছিলেন। কিছু পরে এরিক হ্যামণ্ডের স্মৃতি-কথা থেকে তা দেখতে পাব।

† "লেডী ইসাবেল মার্গসন স্যার মার্টিমার মার্গসনের পত্নী। ইনি লর্ড হোবার্টের তৃতীয়া কন্যা। লর্ড হোবার্ট ছিলেন বাকিংহ্যামশায়ারের ষষ্ঠ আর্লের দ্বিতীয় পুত্র। লেডী ইসাবেল ১৮৮৬ সালে বিবাহিত হন। এঁর দুই পুত্র, বড়—ভাইকাউণ্ট মার্গসন। তিন কন্যা,—বড় মেয়ে লর্ড কুশেনডানের দ্বিতীয়া পত্নী।" (লেডী ইসাবেলের দেহত্যাগের পরে সংবাদপত্রের শোকলিপি থেকে)

মন খ্লে ধরেছিলেন। নিবেদিতার চিঠি থেকে জেনেছি, তাঁর ইংলণ্ড ত্যাগের পরে হ্যামণ্ডদম্পতি নিবেদিতার পারিবারিক ব্যাপারে নানা সাহায্য করেছেন।

হ্যামণ্ডদম্পতি বেদান্ত আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ'রা স্বামীজীর শিষ্য, এবং তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের মহিমায় অভিভূত। নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই, ভারতে শিক্ষা-কাজের জন্য এই দম্পতির আসার সম্ভাবনা ছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে এরিক হ্যামণ্ড এই আন্দোলন ও আন্দোলনের কেন্দ্র-প্রুষদের কথা বহ্বার বহ্ স্থানে উপস্থিত করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বিদেশী পত্রিকাতেও। স্বামীজী সম্বন্ধে এ'র একটি চমৎকার কবিতা সমসাময়িক পত্রিকায় দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র এ'কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, এবং তাঁর বিষয়ে স্গভীর ভাবময় ভাষায় ইনি প্রবন্ধাদি লিখেছেন। স্বামীজীর ইংলণ্ড-জীবন সম্বন্ধে এ'র চমৎকার স্মৃতিকথা পাই।

বেদান্ত-আন্দোলনের এই ভক্ত লেখকের বিষয়ে দ্ঃখের কথা, উপয্ক্ত তথ্য সংগৃহীত হয়নি। ইনি কবি ও প্রাবন্ধিক ছিলেন, ভাবকমনীয় ব্যঞ্জনাময় ভাষায় লিখতেন—লেখা থেকে সেট্কু ব্ঝতে পারি। মিসেস উইলসন, রেমং-হারবার্টকে দম্পতির সম্বন্ধে অল্প কিছ্ জানিয়েছেন, যার মধ্য থেকে এই দরিদ্র আদর্শবাদী লেখক দম্পতির চেহারা কিছ্ স্পষ্ট হয়েছে—কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় মোটেই।

এরিক হ্যামণ্ডের লেখায়, আমি যতদ্র দেখেছি—নিবেদিতার প্রসঙ্গ দ্বার মোটাম্টি বিস্তারিত পেয়েছি, একবার স্বামীজীর স্মৃতি প্রসঙ্গে, অন্যবার নিবেদিতা নামাঙ্কিত একটি রচনায়।

বেদান্তকেশরী পত্রিকায় ১৯২২-এর মে মাসে স্বামীজী-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিবেদিতার কথা ইনি বলেছিলেন। লেখাটি কিয়দংশে উদ্ধৃত করছি। নিবেদিতা কিভাবে স্বামীজীর বক্তৃতা শ্নতে ধাবিত হতেন, এই লেখা থেকে বোঝা যাবে।—

"স্বামীজীর আগমনে লণ্ডনে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হল। চিকাগোর ধর্মসভায় তাঁর সম্বন্ধে যে মহাবিস্ময় ও প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, তাঁর পদার্পণের প্র্বেই তা লণ্ডনে পেঁছে গিয়েছিল। তাঁর চেহারার চৌম্বকশক্তি, তাঁর বক্তৃতার ততোধিক মোহিনী আকর্ষণ বহ্ মান্ষকে তাঁর দিকে টেনে আনল।...

অজস্র অভিজ্ঞতার শহর লণ্ডন। এর সহস্র প্রকৃতি।...লণ্ডন বাস্তবিকই নানা উদ্গিরণের আগ্নেয়গিরি স্বর্প।...এইখানেই, এই লণ্ডনেই স্বামীজী এলেন নিজের স্থান গ্রহণের জন্য, বিরোধী ও সংঘাতশীল শক্তিসম্হের মধ্যে হিন্দ্ধর্মের বাণী-বাহকর্পে নিজেকে স্থাপন করবার জন্য।...লণ্ডন শীঘ্রই জানল, এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের উদয় হয়েছে। স্বামীজী ধারাবাহিক বক্তৃতা করে চললেন, অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন—এক কথায়, নিজেকে দেখালেন ও জানালেন। তাঁর বিশেষ ভক্তদের মধ্যে ছিলেন মিস মার্গারেট নোবল, যিনি ভাগ্যবশে পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যা হবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনীর্পে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বরণ করবেন এবং বেদান্তধর্মের এক অপ্র্ব শক্তিশালী বক্তা ও লেখক হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরই সাগ্রহ নির্বন্ধে পড়ে বর্তমান লেখক একদিন পার্শ্ববর্তী এক জেলা-শহর থেকে স্বামীজীর বাসভবনের দিকে যাত্রা করলেন। স্বামীজী ঐখানে নির্দিষ্ট সময়ে

দর্শন দেন। অত্যন্ত বিশ্রী ও বিমর্ষ এক সন্ধ্যায় তাঁর দ্বারে হাজির হলাম। কিন্তু সেখানে আরও হতাশা—স্বামীজী বাড়িতে নেই। তবে আমাদের জন্য একটি বিশেষ সহৃদয় বার্তা রেখে গেছেন, তাতে আছে, আমরা তাঁর জন্য সিসেম ক্লাবে যেতে পারি, যেখানে নির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে হঠাৎ-আহ্বানে তিনি চলে গিয়েছেন। সাগ্রহে আমরা নির্দেশমত ক্লাবের অভিমুখে যাত্রা করলাম। হাজির হয়ে দেখি, মস্ত একটি ড্রইংরুম, বা হলঘর, সান্ধ্য পোষাকে সজ্জিত কেতাদুরস্ত মানুষে প্রায় ঠাসাঠাসি-ভর্তি। দু'একজন ভদ্র ও সহৃদয় ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মের একেবারে কাছে আমাদের ঠেলে এগিয়ে দিলেন, সেখানে দু'একটি চেয়ার খালি রাখা ছিল। আসন দুটি আকর্ষক, হায়, আমরাও তাই! আমাদের ওভারকোট থেকে জল ঝরছে, এবং এহেন সমাবেশে আসতে হবে জানা না থাকায় পোষাকাদিও আহা-মরি কিছু নয়। দেখলাম, উপস্থিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা জাতীয়। বক্তৃতার বিষয় —'শিক্ষা'। অল্প পরেই স্বামীজী আবির্ভূত হলেন। প্রায় কোনো সময় না দিয়েই, কিংবা একেবারেই কোনো সময় না দিয়ে, তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে, বক্তৃতা একেবারেই তৈরী নেই। তবুও তিনি, যেমন সর্বক্ষেত্রে, পরিবেশের উপরে নিজেকে স্থাপন করলেন। শান্ত, সংযত, আত্মস্থ—তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। একজন হিন্দু—আর্য বিশ্বাসে ও বাণীতে পূর্ণ-হৃদয়, পূর্ণ-কণ্ঠ একজন উদ্দীপ্ত হিন্দু, —যাঁর পিছনে আছে সুপ্রাচীন সভ্যতার মহিমা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য। সে এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর শ্যাম বর্ণ, সুগভীর জ্বলন্ত নয়ন, এমনকি তাঁর পোষাক—সবই চতুর্দিকে মোহবিস্তার করল। সর্বোপরি তাঁর বাণী, তাঁর বাগ্মিতা—প্রেরণার সেই উচ্চারিত ধ্বনি। ইংরাজি ভাষার উপর তাঁর বিস্ময়কর অধিকার শ্রোতৃবৃন্দকে চমকিত ও আনন্দিত করে তুলল,—মনে রাখতে হবে, এই শ্রোতাদের অধিকাংশের বৃত্তি হল, আমি আগেই বলেছি, ইংরেজদের ইংরাজি ভাষা শেখানো, এবং সেই ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিদ্যা দান করা। এ ছাড়াও স্বামীজী শীঘ্রই দেখিয়ে দিলেন—তিনি ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমভাবে ব্যুৎপন্ন। ঐ মানুষগুলির মধ্যে, তাদের দুর্গভিত্তির উপরে তিনি সদর্পে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরম নির্ভয়ে, অনুগ্রহের কোনো প্রত্যাশা না রেখে, আঘাতের পর আঘাত করে তিনি হিন্দুনীতির মহিমা তুলে ধরলেন—যে-শিক্ষক টাকা তৈরীর কথা শেখান ছাত্রদের, তিনি উচ্চতম ও গভীরতম সত্যের নিকট বিশ্বাসঘাতক। 'শিক্ষা ধর্মের অঙ্গাঙ্গি বস্তু; শিক্ষা কিংবা ধর্ম, এই দুইয়ের কাউকেই বেচাও যায় না, কেনাও যায় না।'...তাঁর কথাগুলি প্রচলিত শিক্ষারীতির মর্মকে তীব্রভাবে ভেদ করে প্রবেশ করল।..."

লণ্ডনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এরিক হ্যামণ্ডের কয়েকটি স্মৃতিচিত্র প্রকাশিত হয় ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ১৯০৭ সালে। তারই একটিতে (সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) লণ্ডন থেকে স্বামীজীর বিদায় সংবর্ধনার ব্যক্তিগত বর্ণনা রয়েছে। নিবেদিতার নাম নেই এই লেখায়, কিন্তু ধরে নিতে বাধা নেই, এই অনুষ্ঠানের মুখ্য সংগঠকদের তিনি অন্যতম। স্বামীজীর বিদায় কী দারুণ শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, অথচ একই সঙ্গে কি অপরূপ আধ্যাত্মিক গভীরতায় অন্তরকে পূর্ণ করেছিল, এরিক হ্যামণ্ড তার

সুন্দর বর্ণনা করেছেন। এরিক হ্যামণ্ডের মনের পাশেই অনুরূপ আর একটি মন ছিল—মার্গারেট নোবলের—একথা ধরে নিয়ে লেখাটি কিয়দংশে উপস্থিত করছি—

"ধূসর বিষণ্ণতার একটি দিন...রবিবার।...ধূসর, খানিক স্তিমিত, প্রায়-নীরব লোকগুলি চার্চ ও চ্যাপেলের দিকে মন্থর চরণে চলেছে। স্যাবাথ-দিনের মনোভাব ও আবহাওয়া সম্বন্ধে তারা পূর্ণ সচেতন। এই ধূসরতা ও নীরবতার সঙ্গে আমাদের মত কিছু লোকের মন এক তারে বাঁধা। ঐ অপরাহ্ণে আমরা চলেছিলাম 'বিদায়' জানাতে—সেই মানুষটিকে বিদায় দিতে যাঁর অভ্যুদয় আমাদের জীবনে বহু-কিছু তাৎপর্য এনেছিল। তাঁর প্রস্থান-দিন স্থির হয়ে গেছে। শূন্য হয়ে যাবে আমাদের জীবনের অনেকখানি, কিছুতে পূরণ হবে না তা।...

মাইল সাতেক দূরে আমাদের আবাস, সেখান থেকে শেষ নমস্কার জানাবার জায়গাটির দিকে চলেছি। হাঁ, আমাদের মুঠিতে শেষ বারের মত উষ্ণ চাপ পড়বে, সেই স্থির, প্রেমপূর্ণ, উন্নত নয়নের শেষ চাহনি—। আমাদের সম্মেলন গৃহটি শিল্পীদের ব্যবহারের গ্যালারি, দেওয়ালে লম্বিত চিত্ররাজি, ফুলে লতায় পাতায় সজ্জিত মঞ্চ। এখান থেকেই, ইংলণ্ডের সুমহান রাজধানী-নগরীতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজ জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর বিদায় ভাষণ জানাবেন।

সর্ব ধরনের, সর্ব অবস্থার মানুষ সমবেত হয়েছে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী, জাগতিক দৃষ্টিতে কেউ উচ্চ, কেউ নীচ, নানা শ্রেণীর মানুষ—সবাই কিন্তু একটি আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ—তাঁকে দেখবে, তাঁর কথা শুনবে, আর যদি সম্ভব হয়, তাঁর বসনপ্রান্ত স্পর্শ করবে, কেননা শীঘ্রই স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা বঞ্চিত করবে সে সৌভাগ্যে।

বক্তৃতা হল। নারী ও পুরুষেরা বললেন। সে সব বক্তৃতায় প্রকাশ পেল স্বামীজী কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন। প্রকাশ পেল—প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শনের অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি কী গভীর ও বাস্তব ঋণে আবদ্ধ করেছেন।... আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বক্তৃতা করতে সমর্থ, দেখা গেল অনেকেই সমর্থ, বক্তৃতা তাঁরা করলেন, প্রবল করতালিতে ও 'হিয়ার হিয়ার' শব্দে তাঁদের কথায় সানন্দে সমর্থন জানানো হল। আবার নীরব ছিলেন কেউ কেউ, ঠোঁট চেপে বসে, হৃদয়ে বিষাদ নিয়ে। কোনো কথাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।...সত্য কথা বলতে কি, চোখের পাতার তলায় টলটল করছিল অশ্রু।

যে-মঞ্চে তিনি অনুগত বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার নিকটেও আমরা যেতে পারিনি। তাঁদের মধ্যে গায়ক-বাদকেরা ছিলেন, যাঁরা অনুষ্ঠানের ফাঁকে সুস্বর ভরিয়ে দিচ্ছিলেন।...

আমরা জেনেছিলাম, শিখেছিলাম, স্থান ও কাল সামান্য বস্তু। আমরাই তাদের সৃষ্টি করি, কিংবা সৃষ্টি করে বলে অনুমান করি আমাদেরই প্রয়োজনে। সত্য কথা। তবু, এই বোধ আমরা দূর করতে পারিনি—যিনি আমাদের জীবনে মূল্যবান হয়ে উঠেছেন, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের যাতনার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু নেই—আমাদের জীবন যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ!

তাই খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছি, ইতস্ততঃ নমস্কার ও সম্ভাষণ বিনিময় হচ্ছে, শুনছি কান খাড়া করে যতখানি শোনা সম্ভব......। কৃত্রিম আলোয় হলটি কিছু আলোকিত, কিন্তু ধূসর-বিষণ্ণ বাতাস, অনুরূপ অনুভূতিতে পারিপার্শ্বিক আচ্ছন্ন—সকলের মর্মে প্রবিষ্ট তা।

বাইরের ধূসর-বিষণ্ণতা অন্তরের ধূসর-বিষণ্ণতার দ্বারা ঘনীভূত।

এর মধ্যে একটি মূর্তি কেবল বেদনা-সংগ্রামে বিজয়ী। জ্বলন্ত পোষাকে মোড়া দেহটি। স্বামীজী সমবেত মানুষদের মধ্য দিয়ে চলন্ত সূর্যকরের মত সঞ্চরণ করতে লাগলেন। তাঁকে ঘিরে থাকার জন্য যখন তাঁর আকার দৃষ্টিগোচর হয়নি, তখনো মনে হল, যেন তাঁর উপরে, তাঁর ভিতরে, আলোকের তরঙ্গ—উত্তাপে, আনন্দে, উজ্জ্বলতায় এবং নবজীবনে তা উদ্ভিন্ন।

তারপর, অন্যান্য বারের মতই, তাঁর পদধ্বনি নিকটতর হল যখন, আমি অনুভব করলাম, আমার কিছুই বলার নেই, কোনো প্রশ্ন নেই, এমন কোনো চিন্তা নেই যা তিনি না জানেন! তিনি এগিয়ে আসতে আমি নত হলাম, কিন্তু এমন নত নয় যে চোখে না পড়ে। তাঁর চাহনি শোকের আবরণ ভেদ করে গেল, ছিন্ন ভিন্ন করে দিল তাকে, আর নিরাময় করে দিল তারই মধ্যে। সেই দুটি চোখের সৌন্দর্য ও শক্তি এ জীবনে ভুলবার নয়। তারা নিরাময় করেছিল, কেননা তারা সুনিশ্চিত দেখিয়েছিল,—আমাদেরই মত তাঁর বেদনা, এবং, সমবেত বেদনার মধ্য দিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত পরমা শান্তিকে লাভ করব। তিনি আমার হাত ধরলেন— দৃঢ়ভাবে ধরে রইলেন। সেই স্পর্শের মধ্য দিয়ে যেন তাঁর আত্মা—'যেন' নয়, সত্যই তাঁর আত্মা—আমাকে আলিঙ্গন করল। বললেন, "হাঁ, নিশ্চয়, আমরা আবার মিলব, হাঁ নিশ্চয়, আবার—।"

'পরিবর্তন যুগে' নিবেদিতার মনচ্ছবি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান লেখা এরিক হ্যামন্ড লিখেছিলেন প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ১৯২৭, ডিসেম্বর সংখ্যায়। লেখাটির নাম—Sister Nivedita: An impression of earlier years. নিবেদিতার মানস-প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মূল্যবান কথা এই লেখায় আছে, যা অন্যত্র পাই না। নিবেদিতার এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন,—

"Margaret Noble was essentially a woman's woman. Her temperament, her sympathies, her personality, all tended to attract persons of her own sex."

এই 'সবিশেষ উল্লেখযোগ্য' কথাটি জানিয়ে লেখক বলেছেন-"Thus it was, happily, plainly palpable, that her allegiance to the Swami was not in any wise coerced by his masculinity. It was rather the spirit within him......"

নিবেদিতার প্রথম জীবন সম্বন্ধে এরিক হ্যামন্ডের লেখাটি এই—

"তিরিশ বছরের উপর কেটে গেছে। মিস মার্গারেট নোবল, পরবর্তীকালে যিনি সিস্টার নিবেদিতা হন, লন্ডনের শহরতলী উইম্বলডনে একটি মেয়েদের

স্কুল চালাতেন। জ্ঞান-সঞ্চারের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা তাঁর ছিল ; অনুরূপ উল্লেখ-যোগ্য, উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ও তাঁদের নির্দেশাদি দানে তাঁর ক্ষমতাও। আপাদ-মস্তক জীবন্ত, বুদ্ধির তেজে স্পন্দিত, ব্যক্তিত্ব—যুগপৎ আকর্ষণীয় ও আধিপত্য-প্রবণ—মার্গারেট নোবল ছাত্রীদের উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলতে পারতেন। বিস্তৃত পড়াশোনাতেই কেবল তাঁর সাহিত্যপ্রীতির প্রমাণ ছিল না, লেখকের অভিপ্রায়ের দ্রুত অনুধাবনেও তা সুস্পষ্ট হত। অসামান্য সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গি অনবদ্য। তার ছাত্রীদের আজও চিনে নেওয়া যায়—এমনই তাঁদের প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা—তাঁদের এই শিক্ষয়িত্রী প্রতিটি অক্ষর যাতে পূর্ণ মূল্য লাভ করে সে সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি সক্রিয়ভাবে ব্যক্ত হল যখন ১৮৯০-এর মত সময়ে তিনি সপ্রমাণ কতকগুলি মানুষকে জুটিয়ে নিয়ে 'উইম্বলডন লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন করলেন, যা হায়, এখন অল্পদিন হল নিজ ইতিহাসে 'সমাপ্তির' রেখা টেনে দিয়েছে।

মার্গারেট নোবল মৌলিকতার পূজারী, গতানুগতিক রীতি তাঁর হাসির জিনিস। তাঁর ছাত্রীদের অভিভাবকেরা অনেক সময় তাঁর ভাবে-গতিকে আহত হতেন, যেমন, ধরা যাক, নিজ স্টুডিয়োর ম্যাণ্টলপিসের উপরে ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তি বসিয়ে রাখলেন, কিছুতে সরালেন না। যুক্তিতে, তর্কযুদ্ধে তাঁর মহা উল্লাস। যে বিতর্কের সময়ে বক্তারা উত্তেজিত ও উত্তপ্ত—সেই সময়ে তাঁর খুশী সীমাহারা। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে যোদ্ধাদের তেজীয়ান করে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে জ্বালা-ধরানো উক্তি ছুঁড়ে দিতেন, এবং যত প্রচণ্ড ভয়ংকর হয়ে উঠত সংঘর্ষ ততই তাঁর সুখের বৃদ্ধি। ওয়াল্ট হুইটম্যান, এমার্সন, থরো তাঁর অনুরাগের জিনিস। শেষ দুই লেখকের রচনা থেকে প্রাচ্য দর্শনের সমর্থক যে-কোনো অংশ অতীব তেজের ও আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্ধৃত করতেন। বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। খ্রীস্টধর্মের প্রচলিত রূপ সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে এলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন—বড় ওস্তাদের হাতে বীণা যেভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনলেন নিজের ক্লাব সিসেমে, মিস্ মুলারের উইম্বলডনের বাসভবনে, লণ্ডনের ভিতরে বা কাছাকাছি স্থানের নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে। যেখানেই ইনি যেতেন সেখানেই তিনি স্বামীজীকে বর্তমান যুগের প্রফেট বলে ঘোষণা করতেন। বহু জায়গায় স্বামীজীর উপস্থিতির ব্যাপারে তিনি সহায়তা করেছিলেন; তার মধ্যে স্যার রিচার্ড স্টেপলি প্রতিষ্ঠিত ব্লুমসবেরী স্কোয়ারের 'ক্রিস্টো-থিয়জফিক্যাল সোসাইটি'ও ছিল, যেখানে, প্রসঙ্গতঃ বলে নিই, স্বামী অভেদানন্দ ইংরাজীতে তাঁর প্রথম বক্তৃতা করেন। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়—এঁর প্রভাব ও স্থায়ী নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস, মিঃ ই. টি. স্টার্ডির দৃঢ় উদ্দেশ্য ও আর্থিক সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বামীজীর লণ্ডন-জীবনের সাফল্যকে বহু-লাংশে সম্ভব করে। বেদান্তে পূর্ণ অবগাহন করবার পর থেকে ইনি এঁর সকল বাগ্মিতাকে বেদান্তের পক্ষে প্রয়োগ করলেন। বিবেকানন্দের অপূর্ব জালে ধরা পড়ার পরে তাঁর বিষয়ে ও তাঁর সম্বন্ধীয় বিষয়ে কথা বলায় ইনি অক্লান্ত। "স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন আপনি!"—জিজ্ঞাসা করতেন: "যদি

না দেখে বা তাঁর কথা না শুনে থাকেন, অতি অবশ্যই শুনবেন। তাঁর মত কেউ নেই, তাঁর সমতুল?—কেউ নয়, কেউ নয়!" বাগ্মী, জেদী, প্রভুত্বপ্রিয় এই মহিলাটি বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত এমনকি অপরিচিতদের পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন ভারত-পুত্রের কাছে, যিনি আর কেউ নন, ইনি আশ্বাস দিয়ে বলতেন—স্বয়ং সত্য-সূর্য। স্বামীজীর বাণীকে ইনি গ্রহণ করেছিলেন—ধরে রেখেছিলেন—সর্বাত্মকভাবে। অবশ্য যখন ভারতে গিয়ে সেখানকার কাজে নিজ শক্তি নিয়োগের প্রশ্নটি এল, তখন স্বাভাবিকভাবে দ্বিধা করেছিলেন। বর্তমান লেখকের সঙ্গে তিনি প্রস্তাবের পক্ষ ও বিপক্ষের দিকগুলি নিয়ে প্রায়ই কথা বলেছেন—ঐ উদ্দেশ্যে যদি তিনি ভারতে যান, তাহলে, মায়ের বয়স হয়ে গেছে, তাঁকে দেখাশোনার ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে; লণ্ডন শহরের বহু দাবি তাঁর উপরে, সেগুলি পূরণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতাও তাঁর আছে—সেই সমস্ত আকর্ষণকে ত্যাগ করে যেতে হবে। সর্বোপরি, তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে, অধিকাংশ খ্রীস্টান বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনেরা অসন্তোষ ও সন্দেহ প্রকাশ করবেন—এই সমস্তই সহ্য করতে হবে তাঁকে। অপরদিকে তিনি অনুভব করেছিলেন "ডাক এসেছে"—মহাসাগরের। সে স্বর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অন্তরের গহনে। ধ্বনিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে—প্রহরে—দিবা ও রাত্রিতে। অবশেষে, তীব্র আধ্যাত্মিক সংঘাতের পরে তিনি অনিবার্য 'ত্যাগকে' বরণ করে নিলেন, জানালেন—'নৌকা পুড়িয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন'—সত্যই তাই। জানালেন—অতঃপর যাই হোক না কেন, পুরানো আবাসে, পুরানো জীবনে, পুরানো বন্ধুদের মধ্যে আর কখনো ফেরা সম্ভব হবে না—কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কিছু সময়ের জন্য ঘুরে যাওয়া অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। এই পরম অনুগত শিষ্যার জন্য স্বামীজীর ব্যাকুল স্নেহ ছিল—তিনি এক্ষেত্রে গভীরভাবে নিজ দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। অপরাজেয় তাঁর সাধুতা—এই শিষ্যত্বের ফল কি, কাজের জন্য তাঁকে অনুসরণ করলে কি ঘটতে পারে—কী কঠোর যন্ত্রণাময় সে জীবন—তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সর্বপ্রকারে। তাঁর এবং তাঁর দলের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সম্পর্কের কী কদর্থ করা হবে, কাজে ও কথায় তাঁর বিরুদ্ধে কতখানি গরল উদ্‌গিরণ করা হবে—সমস্ত ছবিই তিনি খুলে ধরেছিলেন।

এইখানে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। মার্গারেট নোবল মূলতঃ নারীদের নারী। তাঁর মেজাজ, সহানুভূতি, ব্যক্তিত্ব—সব কিছু নারীকেই আকর্ষণ করত। সর্ব বয়সের নারী, শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, প্রবীণেরাও, তাঁর গুণমুগ্ধ—সম্মান করত তাঁকে। অপরপক্ষে পুরুষেরা প্রায় কখনই এই আকর্ষণ অনুভব করেনি। আত্মার কোনো গূঢ় যাদুশক্তি পুরুষদের তাঁর থেকে দূরে ঠেলে রাখত।

তাঁর এই বিশিষ্ট গুণটিকে তিনি বাহ্যতঃ খুবই উপভোগ করতেন—তিক্ত সমালোচনার চাবুকে পুরুষদের ছিন্ন ভিন্ন করতে উল্লাস বোধ করতেন—তাদের বুঝিয়ে দিতেন, তাঁর চেতনায় নারীর স্থান মননের দিক থেকে অনেক উচ্চে স্থাপিত, পুরুষ যার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না। সুতরাং একথা খুবই স্পষ্ট যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পিছনে স্বামীজীর পুরুষ-প্রকৃতির প্রভাব ছিল না ; অপরপক্ষে তা স্বামীজীর আত্মার শক্তির প্রতি আকর্ষণ

—ভারতের সুপ্রাচীন শাশ্বত আত্মা, যা সাম্রাজ্যের ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েও যুগ যুগ ধরে অব্যাহত, যা অখণ্ড বিশ্বাসে একটি সত্যকে আঁকড়ে আছে—"সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, নানা মানুষ তাকে নানা নামে আখ্যাত করে।" মার্গারেট নোবলের কাছে এই সত্যই দাবি উপস্থিত করেছিল, এবং একেই প্রবল শক্তিতে নাছোড় হয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ভায়োলিন-বাদকের বিধবা পত্নী মিসেস ওলি বুল এবং মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের আর্থিক সাহায্যে এবং স্যার জগদীশ বসুর বন্ধুত্বলাভ করে* তিনি হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন। অজানা পথে যাত্রার ইশারা তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল, অদম্য সাহস তাঁকে বহন করেছিল। ভারতে তাঁর কাজ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, ভবিষ্যতেও বলা হবে অনেক কিছু। সেখানে এক বছরের শিক্ষানবিশী, তার পরে দীক্ষা। মার্গারেট নোবল সিস্টার নিবেদিতা রূপে সেই সব অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে যোগ্য স্থান লাভ করলেন, যাঁরা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর আবেদনকে সর্বোচ্চ বস্তু মনে করেন।

যাত্রাকালে তাঁর ছবি : তরুণী কিন্তু বিশিষ্ট নারী, নীল-ধূসর জ্যোতির্ময় আঁখি, হালকা সোনালি-পিঙ্গল কেশ, গাত্রবর্ণ স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল, আর হাসি—করুণায় ও আকর্ষণে ভরা। উচ্চতা মাঝারি, শরীর সতেজ, চলায় ফেরায় ক্ষিপ্র, ব্যগ্র, উৎসাহী, অদম্য। আইরিশ রক্তের জন্য (যার জন্য তিনি গর্বিত) উদার আবেগময়, উদ্দীপ্ত—কেলটিক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলী তাঁর মধ্যে—তাদের বাক্‌পটুতা, প্রভাববিস্তারের সম্মোহন শক্তি। এই সব কিছুই তিনি সবুজ দ্বীপ† থেকে বয়ে এনেছিলেন, ইংলণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে—যে-দেশকে বরণ করেছিলেন স্বদেশ বলে।

---

* এইখানে কিছু তথ্যগত ভুল রয়েছে। নিবেদিতার প্রথম ভারতযাত্রার পূর্বে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়নি, ভারতে পৌঁছানর অব্যবহিত পরেই তা হয়। মিসেস বুল বা মিস ম্যাকলাউড এই প্রথম ভারতযাত্রাকালে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন কিনা ঠিকভাবে বলা শক্ত। তবে এর ঠিক চার বছর পরে ইংলণ্ড থেকে তিনি যখন দ্বিতীয়বার ভারতযাত্রা করেন, তখন লেখক-কথিত ঐ কথাগুলি সত্য ছিল।

† *Emerald Isle* আয়ারল্যাণ্ডকে বলা হয় তার পান্না-সবুজ চেহারার জন্য।

ভগিনী নিবেদিতা

ও

ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু

ও

মিসেস ওলি বুল

মিস ম্যাকলাউড

শ্রীমতী অবলা বসু

স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রমেশচন্দ্র দত্ত

মিসেস ওলি বুল

মিসেস ওলি বুল জাতিতে আমেরিকান, বিয়ে করেছিলেন নরওয়েজিয়ানকে, এবং নরওয়ে ও আমেরিকার বহু সংস্থা ছাড়াও তাঁর বদান্যতা বিস্তৃত হয়েছিল দরিদ্র পরাধীন ভারতবর্ষের নানা কাজে। তিনি যথার্থই আন্তর্জাতিক মহিলা ছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য মিসেস বুল কী করেছেন তার আলোচনায় আসার আগে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিভাবে ঘটেছিল, এবং তখনকার আমেরিকান সমাজে তাঁর কি ধরনের স্থান ছিল, তা কিছুটা বলে নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আমরা লুই বার্কের বিবরণের অনুসরণ করছি।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কিছু আগে স্বামীজীর সঙ্গে মিসেস বুলের পরিচয় হয়। অল্প দিনেই সে পরিচয় প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। স্বামীজী তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন এবং তাঁর উপদেশ বা নির্দেশকে বহুমান দিতে থাকেন।

শ্রীমতী বার্ক লিখেছেন—

"স্বামীজীর সঙ্গে মিসেস বুলের প্রথম সাক্ষাৎকালে তাঁর বয়স চল্লিশের গোড়ার দিকে, তখন ১৪ বছরের মত বৈধব্যজীবন যাপন করছেন। প্রথমতঃ প্রকৃতিগত ভাবে মিসেস বুল সাহসী, স্বাধীনচিত্ত ও প্রাণোত্তপ্ত, স্বামীজী বলেছেন, 'অতীব আধ্যাত্মিক'; তদুপরি বিখ্যাত ভায়োলিনবাদক পতির সঙ্গে তাঁর ব্যাপক ভ্রমণ, নানা ম্যানেজার, শ্রোতা ও জনজীবন-সংশ্লিষ্ট বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয়—এক মহান শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো আছেই—এ সব কিছুই স্বামীজীর কাজে সাহায্য করার যোগ্য করে তুলেছিল তাঁকে, যার জন্য তিনি কেবল আমেরিকায় স্বামীজীকে যথাযোগ্য পরামর্শই দিতে সমর্থ হননি, অধিকন্তু ব্যক্তিগত সহানুভূতি এবং সহ-মর্মিতা দান করতে পেরেছিলেন।"

অতঃপর শ্রীমতী বার্ক মিঃ মর্টিমার স্মিথ লিখিত 'দি লাইফ অব ওলি বুল' নামক গ্রন্থ থেকে যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়েছেন তা এই :

বিয়ের আগে মিসেস ওলি বুলের নাম ছিল মিস সারা থর্প। তাঁর পিতা মাননীয় জোসেফ জি থর্প, ধনী ব্যবসায়ী, ম্যাডিসনের স্টেট সেনেটর। ম্যাডিসনের সুন্দরতম প্রাসাদে তাঁরা থাকতেন। মিসেস থর্প জবরদস্ত মহিলা, শহরের সোসাইটি-সাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞীস্বরূপা, শোনা যায়, ম্যাডিসনের সামাজিক জীবনে তাঁর মত অবিসংবাদিত আধিপত্য করতে আর কেউ পারেননি। 'ইয়াঙ্কি-হিল'-এর সেই বিরাট প্রাসাদ ছিল শহরের স্বীকৃত সামাজিক সম্মিলনভূমি, এবং থর্পদের উদ্যান-পার্টি, সঙ্গীতের আসর, আয়োজিত নাট্যাভিনয় এবং বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক নৈশভোজ প্রভৃতিতে আমন্ত্রণের জন্য সকলে উন্মুখ, ব্যাকুল। ইয়াঙ্কি-হিলের এই বিরাট প্রাসাদভবনে বিখ্যাত ব্যক্তিরা স্বতঃই আসতেন, এবং এখানেই একদা-বিবাহিত ষাট বৎসর বয়সের পৃথিবীবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওলি বুলের সঙ্গে সারা থর্পের পরিচয় ও প্রণয়—সারার

বয়স তখন কুড়ি পূরোয়নি। কৃষ্ণকেশী সারা ঈষৎ গম্ভীর স্বভাবের, বিষণ্ণ-সুন্দর, মনে গভীর ছাপ রেখে দেন, সংগীতকে ভালবাসেন ব্যাকুলচিত্তে, আর মায়ের সতর্ক দৃষ্টির জন্য নিজ বয়সের পুরুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। সারা আদর্শবাদী, স্পর্শকাতর, অভিমানী, উত্তেজনাপ্রবণ বালিকা। কাহিনী আছে, ১৭ বছর বয়সে সারা যখন মায়ের সঙ্গে ওলি বুলের এক কনসার্টে গিয়েছিলেন, তখনই স্থির করেন মানুষটিকে বিয়ে করবেন ; তিন বৎসর পরে সামাজিকভাবে যখন মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হলেন, তখনো তাঁর মতি পরিবর্তন হয়নি।

প্রথম দর্শনে এই প্রেমের, প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে এই রোমান্টিক আকর্ষণের হয়ত বৃথা-পরিণতি ঘটত, যদি না সারার জননী, সেই অসাধারণ মহিলা, এক্ষেত্রে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। স্বামীর প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে এই প্রণয়ে তিনি উৎসাহ সঞ্চার করেন। বিয়ে হয় ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে। বিচিত্র মিলন—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল ৪০ বছর বয়সের ব্যবধানই নয়—মেজাজ ও পটভূমিরও দুস্তর ব্যবধান। একজন, আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অতীব নিয়মতান্ত্রিক পরিবারের দুহিতা, অন্যজন, নিয়মহারা শিল্পীসম্প্রদায়ের অন্যতম। তবু প্রেম হয়ত সর্ব অসুবিধা দূর করে দিত যদি না মিঃ ও মিসেস থর্প প্রভৃতি পরিবারের সকলে এই দম্পতির উপরে সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখার চেষ্টা করতেন। কয়েক বৎসর ধরে থর্পদের পরিবারবাহিনী ঐ দম্পতির সঙ্গে থেকেছে, বেড়িয়েছে, তর্ক ও আলোচনা করেছে এবং উপদেশে উপদেশে ব্যস্ত রেখেছে। ফলে বিস্ফোরণ ঘটেছে অবিরত। শেষ পর্যন্ত, বহু চেষ্টাতেও যখন আবেগ ও উত্তেজনাপ্রবণ, বেহিসেবী ওলি বুলকে নিতান্ত বাধ্য, অনুগত, সভ্যভব্য জামাতায় রূপান্তরিত করতে অসমর্থ হলেন না, তখন মিসেস থর্প স্থির করলেন, লোকটি তাহলে তাঁর কন্যার উপযুক্ত স্বামী নয়। সুতরাং বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে সারা ও তাঁর শিশুকন্যা ওলিয়াকে (জন্ম ১৮৭১) নিয়ে তাঁরা ম্যাডিসনে ফিরে এলেন।

সারা এই অবস্থাকে দু বৎসর সহ্য করলেন, তারপর মায়ের মুখোমুখি হবার উপযুক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—ম্যাডিসন ত্যাগ করে চলে গেলেন স্বামীর কাছে নরওয়েতে। অতঃপর উভয়ের মোটামুটি শান্তির জীবন। 'মিসেস বুল বাস্তব-বোধহীন স্বামীর কাজকর্ম দেখাশানার ভার নিলেন, তাঁর কনসার্ট ট্যুরগুলি কার্যতঃ পরিচালনা করতে লাগলেন ;...বার্ধক্যগ্রস্ত অস্থির স্বভাবের মানুষটির পরিণত-বুদ্ধি কর্মদক্ষ পত্নী হয়ে দাঁড়ালেন—লোকটিকে তিনি ভালবাসতেন, না, তারো বেশী—পূজা করতেন।'

ইতিমধ্যে মিসেস থর্প ম্যাডিসনের জীবনে সন্তুষ্ট না হয়ে পরিবারসহ কেমব্রিজে চলে এসেছেন। এখানেই তাঁর পুত্র জোসেফের সঙ্গে বিখ্যাত কবি লংফেলোর কন্যার প্রণয় ও পরে পরিণয় ঘটে। মিসেস বুলও কেমব্রিজে একটি স্বতন্ত্র আবাস নেন, ১৮৮০ খৃীস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। শ্রীমতী বার্ক এর পরে 'দি লাইফ অব ওলি বুল' থেকে যা সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন, তা অনুবাদ করে দিচ্ছি—

"মিসেস বুল কেমব্রিজের সুপরিচিত চরিত্র হয়ে ওঠেন। ব্রাটল্ স্ট্রীটে তাঁর ভবনখানি, যেখানে তিনি ১৯১১ সালে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছিলেন, বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়ের এবং আদর্শবাদী নেতৃগণের সুবিখ্যাত সম্মেলনস্থল হয়ে ওঠে। শালীন, সংযত, কিছুটা বিষাদ-সুন্দর লাবণ্য নিয়ে তিনি সেইসব সমাবেশের নেত্রীত্ব করতেন। দেখা যেত, তাঁর এহেন সভাকক্ষে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বেদান্ত-দর্শনকে উপস্থিত করছেন সতর্ক ও প্রচ্ছন্নভাবে সন্দিগ্ধ কেমব্রিজের বন্ধুগণের নিকটে, উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করছেন, কিংবা জন ফিস্ক-এর চড়া ব্যারিটোনের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গতে নিযুক্ত আছেন। ভারতীয় সেগুন কাঠের প্যানেলযুক্ত বাসকক্ষে, যার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে ওলি বুলের আবক্ষ মূর্তি, সেই সঙ্গে তাঁর অগণ্য পোরট্রেট—এহেন পরিবেশে সমকালের বিতর্কমূলক সমস্যাসমূহ আলোচনা করতেন অন্য কেউ নয়—অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস, টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থ হিগিনসন, জোসিয়া রইস এবং জেন অ্যাডামস। সমাগতদের মধ্যে বিচিত্র মনুষ্যদের সাক্ষাৎ মিলত—অভিজাত মিস অ্যালিস লংফেলো, আরভিং ব্যাবিট, অধ্যাপক মান্সটারবার্গ, তখনো-সক্রিয় জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ, এমন কি সেই তরুণীটি পর্যন্ত —গারট্রুড স্টেইন, যিনি র‍্যাডক্লিফের শিষ্যা।"

মিসেস ওলি বুলের এই কেমব্রিজ বাসভবনে স্বামীজী আতিথ্য নিয়েছিলেন ১৮৯৪-এর অক্টোবরে, মিলিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজের এক প্রধান অংশের সঙ্গে এবং ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে, এবং এখানেই সম্ভবতঃ জেমস তাঁকে সমাধির অবস্থায় দেখেন।*

স্বামী বিবেকানন্দ ও মিসেস বুল

শ্রীমতী বার্কের গ্রন্থের বিবরণ এই পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে দেখব, মিসেস বুল ইংলণ্ডে এবং তারও পরে ভারতবর্ষে স্বামীজীর সঙ্গী হয়েছেন। ভারতবর্ষেই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা। গঙ্গাতীরে বেলুড়ে 'ধীরামাতার ভালবাসায় মাখা কুটীরখানি', সেখানে স্বামীজীর অপূর্ব আধ্যাত্মিক রূপের সাক্ষাৎ-দর্শন, পরবর্তী-কালে মিসেস বুলের অতিথিরূপে উত্তর ভারত ও কাশ্মীরে সদলে স্বামীজীর ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে পূর্বে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'

---

* উইলিয়ম জেমস স্বামীজীর খুবই গুণমুগ্ধ ছিলেন। 'বৈদান্তিক শিরোমণি' বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জেমসের মনোভাব কি ধরনের ছিল, তা আমি 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে সংকলন করে দিয়েছি। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ কর্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত জেমসের এক পত্রে পাই, তিনি স্বামীজীকে 'মানবতার গৌরব' রূপে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক জেমস ২ অগস্ট, ১৯০০ তারিখে মিসেস বুলকে লেখেন—

"I have just been reading some of Vivekananda's Address in England, which I had not seen. That man is simply a wonder for oratorical power. As for the doctrine of the One. I began to have some talk with that most interesting Miss Noble about it, but it was cut short, and I confess that my difficulties have never yet been cleared up. *But the Swami is an honour to humanity in any case.*"

(বক্রলিপি লেখককৃত। চিঠিটি প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ ১৯৬৭, সংখ্যায় প্রকাশিত)।

অধ্যায়ে উপস্থিত করেছি। মিসেস বুলের অর্থসাহায্যেই বেলুড়ের পুরাতন ঠাকুরঘর ও সন্ন্যাসীদের আবাস নির্মাণ সম্ভব হয়। তাঁর উদারতা ও বদান্যতার জন্য স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন, মিসেস বুলই সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ইঙ্গিত আংশিক 'রসদদার'।

স্বামীজী মিসেস বুলকে 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন—এর মধ্যেই সারা বুলের চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য পাই। মিসেস বুল কেবল টাকাকড়ি দিয়েই স্বামীজীর কাজের সাহায্য করেন নি, ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্ত সন্ন্যাসীকে কিছুটা সংযত করে লোকজীবনের পক্ষে স্নিগ্ধকরভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ কখনো বাধ্য শিশুর মত তাঁর ধীরামাতার নির্দেশ মেনেছেন, কখনো ঝলসে উঠেছেন বেপরোয়া ভঙ্গিতে। স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে এই উভয় রূপেরই সাক্ষাৎ পাই। ১৮৯৫-এর ১৪ ফেব্রুয়ারীতে মিসেস বুলকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন—"আপনি আমার ও আমার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন, সেজন্য কিভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তা বলতে পারি না, এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন।" ঐ চিঠিতেই পাই—"আর এক কথা, মনুর মতে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সৎকার্যের জন্যও অর্থসংগ্রহ ভাল নয়। আমি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝছি যে, প্রাচীন ঋষিরা যা বলে গেছেন তা অতি ঠিক—'আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'—আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম সুখ।" এতৎসত্ত্বেও সন্ন্যাসীকে অর্থ সাহায্য নিতে হয়েছে, যদিও জানিয়েছেন, "হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা-কিছু বড় কাজ হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়", (২১.৩.১৮৯৫)। সাহায্যের জন্য এবং 'জননীর ন্যায় সৎ পরামর্শের জন্য' মিসেস বুল সম্বন্ধে স্বামীজীর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না,* আবার আতঙ্কেরও সীমা ছিল না, পাছে সন্ন্যাসী বাসনায় বন্ধ হয়ে পড়ে।†

---

* "আপনার উদার দানের প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন।...শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনাকে আমি সর্বদাই সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করে এসেছি, এবং আমৃত্যু তাই করব।" স্বামীজী এ চিঠি লেখেন ১৮৯৬-এর ৯ ডিসেম্বর। ১৯০০-এর ১২ মার্চ তারিখেও স্বামীজী লিখছেন—"আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি।...আপনি আমার ও আমার আত্মীয়দের জন্য মায়ের চেয়েও বেশী করেছেন।"

† ১৮৯৬-এর ২৩ অগস্ট তারিখে মিসেস বুলকে স্বামীজী লিখেছিলেন—"দেখতেই তো পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে নেবার জন্য কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে।...এখন আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমনকি ঐ কাজটার উপরও কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না।...সুতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। এ আপনাদের টাকা, আপনারা ইচ্ছামত খরচ করবেন।...আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শিকল ভেঙেছি, আর ধর্মসংঘের সোনার শিকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদাই মুক্ত থাকব।...জগৎ রঙ্গমঞ্চে আমার যেটুকু অভিনয় করার ছিল, তা আমি শেষ করেছি।"

স্বামীজীর এই অনুভূতি আরও গভীর ব্যাকুলতায় প্রকাশিত হয়েছিল মিসেস বুলকে লেখা ১৮৯৫-এর ২৪ জানুয়ারীর চিঠিতে—"প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে, কালে তা অঙ্কুরিত হবেই।...বক্তৃতা এবং অধ্যাপনায় আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।...একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে—এবার একটি একান্ত

বিবেকানন্দের মত অনুভূতি-জগতের মানুষেরা সব সময়েই অতি স্পর্শকাতর। আমেরিকার সামাজিক জীবনে পথ চলার ক্ষেত্রে তিনি যেমন মিসেস বুলের সৎ পরামর্শের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন, অপরদিকে সেই উপদেশ বা নিয়ন্ত্রণ যখন সন্ন্যাসীকে মূল ধর্মে আপোষ করতে বলেছে, বিদ্রোহী হয়েছেন। মিস হ্যামলিন নামক জনৈক 'সম্ভ্রান্ত মহিলা' স্বামীজীকে 'নিউ ইয়র্কের ঠিক ঠিক লোকগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন।' এই মিস হ্যামলিন সম্বন্ধে মিসেস বুলের 'অতি উচ্চ ধারণা', এবং মিসেস বুল নিশ্চয়ই স্বামীজীকে মিস হ্যামলিনের পরামর্শ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজী তখন নিউইয়র্কের দরিদ্র পল্লীতে সাধারণের মধ্যে বিনা অর্থে ধর্মশিক্ষা দেবেন স্থির করেছেন। বলা বাহুল্য ধনী ও অভিজাত মিস হ্যামলিন দরিদ্র মানুষদের 'ঠিক ঠিক লোক' মনে করেন নি। স্বামীজীর সমস্ত অন্তরাত্মা ধর্মের এই নিয়ন্ত্রিত পণ্য চরিত্রের চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।* এছাড়া স্বামীজীকে আমেরিকায় ধর্ম-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেও বলা হয়েছিল। স্বামীজী যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় স্বার্থগুলিকে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন, তাতে মিসেস বুল যেমন শ্রদ্ধাবোধ করেছেন, ভয়ও পেয়েছেন তেমনি। তিনি সতর্কতা চেয়েছিলেন, মনে করেছিলেন, এই পৃথিবীতে স্বামীজীর একটা 'কাজ' আছে, সে কাজ হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে এই বেহিসেবী বেপরোয়া আচরণে। কিন্তু, নিবেদিতার ভাষায় বলতে গেলে, এই প্রফেট এমন এক ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন 'যা সত্যে ভীত নয়।' মেরী হেলকে স্বামীজী

স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে। তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল।...নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। 'একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই ছিন্ন বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন—হায়, এইগুলিই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়।" এই চিঠিতে স্বামীজী মিসেস বুলকে বলেছিলেন, "এদেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু।"

* মিসেস বুলকে ১১. ৪. ১৮৯৫-তে লেখা এক পত্রের কিছু অংশ—

"আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, দরিদ্র পল্লীতে একা এভাবে থাকলে ও প্রচার করলে কিছুই হবে না; আর কোনো ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস হ্যামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তাঁদের মতে যাঁরা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিদ্রোচিত কুটীরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, খাঁটি 'ঠিক ঠিক লোক' ঐস্থানে দিনরাত আসতে লাগল, তিনিও আসতে লাগলেন। হে প্রভো! মানুষের পক্ষে তোমার ও তোমার দয়ার উপর বিশ্বাসস্থাপন কি কঠিন ব্যাপার!!! শিব, শিব! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বেঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়! সবই যে তিনি!! হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর মধ্যেও তিনি। পাপীর ভিতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভিতরও তিনি। সবই যে তিনি!! সর্বপ্রকারে আমি তাঁর শরণাগত। সারাজীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়েছেন, এখন কি আমায় পরিত্যাগ করবেন?...হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনো কখনো একলা প্রবল বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্য এসব দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর।...প্রভু, তুমি সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা—তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জানো, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে, যার ফলে অপরে আমায় ত্যাগ করবে বা আমি মন্দের দিকে চলে পড়ব? মা, তিনি কখনই আমাকে ত্যাগ করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫তে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে শঙ্করাচার্যকেই নবরূপে দেখা গেল—অল্পাংশে তা উপস্থিত করছি :

"মধুরভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেরূপ হইতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে উহাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপোষ করিতে হয়, সেইখানে আমি পিছাইয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই—আমি সমদর্শিত্বের ভক্ত।

সাধারণ মানুষের কর্তব্য, তাহার 'ঈশ্বর'-স্বরূপ সমাজের আদেশ পালন করা। জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না।...যে-ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাবৃত। আর যিনি তাহা করেন না, তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।...

প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মহাশয়ের সঙ্গে আমার তর্ক, তৎপরে মিসেস বুলের সঙ্গে যে দীর্ঘ তর্ক, তাহা হইতে আমি সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি, কেন মনু সন্ন্যাসিগণকে 'একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে'—এরূপ উপদেশ দিয়াছেন।...হে মহা-পুরুষগণ, তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। যাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও,...জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। এইসব যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সকলের অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনী, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরিতে হইবে।...জগৎকে মনজোগানো কথা বলিবার সময় নাই।...এই নির্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে নিম্নস্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়। মিসেস বুল ভাবেন আমার কোনো কার্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য জগতে আমার কোনই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব। ...কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব! ভগিনী, দুঃখিত হইও না, কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র, শিশুদের অপরের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনো সেই উৎসের সন্ধান পাও নাই, যাহা 'হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পরিণত করে, এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়।' শক্তি থাকে তো লোকে যাহাকে 'জগৎ' নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস।...যাহারা আভিজাত্য নামক স্রষ্টা ঈশ্বরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, যদি তুমি তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে না পারো, তবে চুপচাপ থাকো, কিন্তু আপোষ ও মনস্তুষ্টি করা-রূপ মেকী অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিবার চেষ্টা করিও না।"

বিবেকানন্দের জীবনের গৌরব ও অভিশাপ এইখানে—তিনি এই অসংসার বৈরাগ্যে ডুবে থাকতে পারেন নি সর্বক্ষণ। 'মিথ্যা জগতের' যাতনা তাঁর মন থেকে 'সত্য ঈশ্বরকে' বিতাড়িত করেছে বার বার। মিসেস ওলি বুলের মত আধ্যাত্মিক

মানুষেরও এক্ষেত্রে বিচারে ভুল হয়েছে—বুঝি বিবেকানন্দও কর্মে আসক্ত, সংসারে লিপ্ত! মানবপ্রেমিকের আহত অভিমান তখন বলে উঠেছে—

"আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ খুব বেশী ভালবাসা।...হায়, যদি আমার একটুও ভালবাসা না থাকত!...হায়, যদি আমি নির্বিকার, কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম!...

বহু বৎসর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা করল, সে সংবাদ আমার কাছে এসে পেঁছিল। আমার দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সেই দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তি আমি চেয়েছি, কিন্তু ভক্তির আধার সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা থেকে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম! তাই যখন আমার নিয়তি, তাই হোক।...আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেবো না। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য যদি ভগবান আমায় তাঁর ছ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" (মিসেস বুলকে লেখা—১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯)।*

মিসেস বুল, তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবান এবং প্রতিভার ঐশ্বর্যে খেয়ালী স্বামীর সাহচর্যের জন্য নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের মত মানুষকে বুঝতে অন্যের তুলনায় অধিক সমর্থ ছিলেন, তাহলেও শিল্পীর যাতনা ও অস্থিরতার সঙ্গে অধ্যাত্ম-শিল্পীর ব্যাকুলতার ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত চেতনার পার্থক্য আছে, সর্বক্ষেত্রে তা অনুভব করতে পারেন নি। ফলে ভুল বোঝাবুঝি এবং মানসিক সংঘাত হয়েছে, অতিক্রান্তও হয়েছে তা। স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের এবং ভারতের জন্য কাজের দায় ঘাড়ে নিয়েছিলেন, সে কাজ তাঁর স্বভাবসঙ্গত নয়, কর্মভার তিনি ত্যাগ করতে উৎসুক, অথচ দুশ্চিন্তা—যদি গড়ে-ওঠা জিনিস ভেঙে পড়ে! মঠের কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে উৎকণ্ঠিত, কিন্তু কর্মীদের যথেষ্ট উপযুক্ত দেখছিলেন না। এইসব সময়ে

---

* স্বামীজী তাঁর ধর্মীয় মানবতার প্রকৃতির কথা মিসেস বুলকে অগস্ট, ১৮৯৫-এর এক চিঠিতে বলেছিলেন—

"যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি সেই জগতের জন্য, যার কাছ থেকে ভাবসম্পদ পেয়েছি সেই দেশের জন্য, যার একজন আমি সেই মনুষ্যজাতির জন্য আমি কিছু করব। যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী'—হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারছি। মুসলমানেরাও তাই বলেন। আল্লা এঞ্জেলদের বলেছিলেন আদমকে প্রণাম করতে। ইবলিশ করেনি, তাই সে 'শয়তান' হল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ, ইহাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর—তারা যখন আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করতে পারে না। তথাকথিত উচ্চ প্রাণিগণ, পরলোকগত অন্য দেহধারী ব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়; ঐ দেহ সূক্ষ্ম হলেও বস্তুতঃ হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানবদেহই। তারা এই পৃথিবীতে অপর কোনো আকাশে বাস করে, একেবারে অদৃশ্যও নয়। তারাও চিন্তা করে, আমাদের মত তাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সব কিছুই আছে—সুতরাং তারাও মানুষ। দেবগণ, এঞ্জেলগণও তাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয়, এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করে তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে।"

তাঁর অন্তর্যাতনার শেষ ছিল না, পরামর্শ চাইতেন বিশেষভাবে মিসেস বুলের কাছে, অভিমানে বলতেন—বিষয়ীর কাছে সন্ন্যাসীর মৃত্যুই তাহলে হোক। এই সময়ে স্বামীজীকে লেখা মিসেস ওলি বুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির নকল রেমঁ-সংগ্রহে রয়েছে, যাতে দেখা যায়, মিসেস বুল সত্যই মায়ের ভূমিকা নিয়ে সন্তানকে চালিত করতে চাইছেন (সন্তানটি যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ অধ্যাত্মপ্রতিভা তা কিছুটা মনে রেখে এবং কিছুটা ভুলে গিয়ে)। ১৯০০ খৃীস্টাব্দের ১ মে তারিখের সেই চিঠিটি উদ্ধৃত করার আগে স্বামীজীর মানসিক অবস্থার কিছু অংশ, মিসেস বুলকে লেখা পত্র থেকে—

"এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে।...আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে।...আমি এখন জো ও নিবেদিতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপ দান করুক।...আমি একটা ট্রাস্ট-দলিল করতে চাই,...শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা করে ফেলব।...আমি চাই বিশ্রাম, এক মুষ্টি অন্ন, খানকয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। মা এখন আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দেখাচ্ছেন। অবশ্য আপনাকেই তিনি এর আভাস প্রথম দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু তখন বিশ্বাস করিনি।...আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় বেশী বিশ্বাস করি।...এখন আমাকে চালিয়ে নেবার আলোক মা আপনারই হাতে তুলে দিচ্ছেন।......আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না।...আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়—কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।......" (১৭ জানুয়ারী, ১৯০০)

"আপনাকে আমি আমার জন্য আর কিছু করতে বলছিনা, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যা করেছেন, তাই যথেষ্ট, আমি যতটার উপযুক্ত, তার চেয়েও ঢের বেশী করেছেন।......আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন। আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ঐখানেই। অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাদের ধারণাও নেই যে, তারা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই আমাকে ভালবাসে। তাঁকে বাদ দিলে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থপূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র। যাই হোক, ভবিষ্যতে কি হবে, এই দুশ্চিন্তা, এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত, এই আকাঙ্ক্ষার পীড়া বড়ই ভয়ানক। আমি সে দায়িত্বের অনুপযুক্ত—আমার অযোগ্যতা আজ ধরা পড়ে গেছে। আমাকে এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। এ কাজের যদি কোনো নিজস্ব জীবনীশক্তি না থাকে তো মরে যাক। আর যদি থাকে, তবে আমার মত অযোগ্য কর্মীর জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।......আমি সারাজীবন মায়ের কাজ করেছি। এখন তা হয়ে গেছে—আমি আর তাঁর চরকায় তেল দিতে নারাজ। তিনি অন্য কর্মী বেছে নিন, আমি ইস্তফা দিলাম!"(৭ মার্চ, ১৯০০)

"আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি। মা-ই সব জানেন। আমার ভিতরে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসছে, আমার মন শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। আমি

জানি মা-ই সব ভার নেবেন। আমি সন্ন্যাসী-রূপেই মৃত্যুবরণ করব।" (১২ মার্চ, ১৯০০)

এই পটভূমিকায় মিসেস বুলের ১ মে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের চিঠিটি পঠিতব্য। এখানে পাঠকদের পূর্বে উদ্ধৃত নিবেদিতার ১ নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখের চিঠির বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,—স্বামীজী, মিসেস বুল ও নিবেদিতাকে গৈরিক বস্ত্র দিয়ে, কিভাবে নিজ কর্মের উত্তরাধিকার তাঁদের উপর অর্পণ করেছিলেন—সেই বিষয়টিকে। মিসেস বুলের পত্র—

My dear child,

I have been glad to speak of your Math accounts in London, and, as I anticipated, found, it made a most favourable impression upon Miss Soutter and others to know that Brahmananda had kept detailed accounts, as any of our workers in an organised effort with subscribers would do. And I have been thankful that I could by dealing with the accounts myself make it a clean record for you by means of my own subscription—placing it as a gift to you personally and thus making the 30,000 rupees in my copied report to the Math, stand as a balance in your favour as a Math fund. This leaves you some 4,000 rupees over and above, which, with your additions from California, puts it up some 2,000 or 3,000 rupees more, besides your present credit in New York with Mr. Leggett and what you have since earned in California.

The securities given your cousin and the amounts paid into the purchase of the Calcutta house now in litigation, were from the Sevier gift, I believe you told me, except for the amounts you took from Brahmananda for payments charged in his account.

I suggested to Saradananda to see what could be done for 4,000 rupees at Belur for building purposes, and he writes that you sent to him to request an estimate and plan to be made out. These have just come to me to forward to you. As I expected, an ordinary estimate would not do much with 4,000 rupees.

I am glad of this 25,000 rupees estimate for such a villa. It confirms me in the good results obtained by the engineer at the Math, both in the amount returned in work and materials for the amount of expenditure and the good taste also.

It was indeed a labour of love on his part and Brahmananda's. I have had experience in these matters of in Norway and the U.S., sufficient to make me appreciate what they so heartily gave you and the Math-work in their service.

If you pay a nominal rent for rooms in some such place on the Ganges as that where Gopala-Ma lives, for your mother and grandmother, would be practicable now?

I would advise you now to have no further dealings with money expenditure either for buildings or gifts or for any purpose whatsoever. But to hold in strict economy what remains in addition to your earnings, spending only the income of these except for necessities. This seems to me beyond doubt the only right way for you now. We will hope that your law-suits may soon be disposed of and your worried expenditure for these be determined. Your sad experience in these resulting from your efforts to benefit others by money dealings from yourself directly is sufficient evidence that whatever of good a blessing you have for any person or persons or work hereafter, will best come of your *sannyasin* freedom strictly held to. Now, thank Heaven! that you are so placed that you may be free and also may rest assured that you will bless others thereby.

Whatever Saradananda does for me is strictly carried out on a basis of accounts—while I appreciate the personal love and service which he adds by his care, thus blessing the little I can do—and what I have done for his family has but left him freer for the work in general, just what I have desired to do for you.

Now I see the time has come for you indeed to be the free *sannyasin*, blessed by your *Guru* and the peace that comes of that blessing. If at this point you choose the permanent—the spiritual—making no attempt to build upon material foundations, but look like a child for the daily influx of love and joy that shall flood your own life and the lives of all those who love you, all will be well.

I say this not from any abstract theorizing of fanciful notion, but after a patient study of you, your *Gurubhais*, and the environment of all. It seems to me a very critical time—where the choice is made possible to you now.

The object lesson A—gave me in New York was timely in enforcing all this which I have been coming to understand as the result of my study of your problem and your life. I can see that should you choose the external method and desert the spiritual, your failure would be greater than his, inasmuch as your powers are greater proportionately. And the wish or impulse to deal with any on the ordinary basis for the protection of them by yourself by means of money or even personal service that should remove you from the end for which you were born,—the message of Ramakrishna's joy, would be such a fatal mistake on your part. . . .

But for you, now that you are standing with a clean record as regards your obligations for work undertaken and carried out, and have added your own good efforts for which you have received a modest return in California, it would be a tragedy were you not to choose the freedom of the *sannyasin* and be done with organisation and ambition.

Should you not choose the best, we will be ever grateful for all that has been given and know that the Mother's work will not, as you say, suffer for any fault of our's, who, whether we will or no, are her servants.

Mother*

বিবেকানন্দ ও মিসেস বুলের সম্পর্কের যে-চিত্র উপস্থিত করলাম, তা নিতান্ত খণ্ড চিত্র সন্দেহ নেই। তবে নিবেদিতার জীবনে এবং জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে

---

* স্বামীজী মিসেস বুলকে 'ধীরা মাতা' বলতেন তাঁর ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য। তাঁর নির্দেশ চাইতেন—সন্তান যেমন মায়ের নির্দেশ চায়। 'ভারতীয় কাজের' জন্য মিসেস বুলের অর্থসাহায্যও তাঁকে নিতে হয়েছে। এই 'ভারতীয় কাজ', মঠ-সংগঠন প্রভৃতিকে স্বামীজী নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে নিজেই সমালোচনা করেছেন। এ সবকথাই সত্য কিন্তু সেই সমালোচনা যদি বাইরে থেকে আসত, তাহলে তাঁর স্পর্শকাতর মন আহত হতই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যের প্রয়োজন ছিল না অন্য কোনো সূত্র থেকে বৈরাগ্যশিক্ষার! নিজের তথাকথিত 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার' বিরুদ্ধে আত্মসমালোচনা আধ্যাত্মিক অসন্তোষ ভিন্ন আর কিছু নয়—যা অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বের সাধারণ স্বভাবের মধ্যে পড়ে—একথা অনেক সময়ই বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মিসেস বুল বিবেকানন্দকে অনেকখানি বুঝতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতেন না। ফলে ভুল বোঝাবুঝি হত।

স্বামী সারদানন্দের এই কালের একটি পত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য। পত্রটি ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-তে লেখা।—

"My dear Granny, yours of the 20th Aug. enclosed with Swamiji's and of the 23rd Aug. addressed directly to myself have both reached me this mail. I thank you very much for them.

It seems there is between yourself and the Swami some mis-understanding just at present and I am wondering how there can be such a thing between you two, who know each other's life by the light and grace which Sri R. (Ramakrishna) has bestowed on each. I can only hope that it will pass off soon and you will come to an understanding about each other's method of procedure. I believe all our mis-understandings arise from this different methods of procedure towards the same goal. I am glad to know you have worked out a plan for a sense of freedom for both sides, but my dear Granny, you know I am always averse to plans which do not run smoothly instilling peace and light and love on both sides rather than doubts and disappointments and mis-understanding and mis-interpretation of each other's motive of action. Whenever there is the latter there you can well rest assure of some defect in our plans. If these come to be results of my querry to you, I will never be able to excuse myself for having over done that which has brought this sad state of affairs between two persons, to whom above all (next to Sri R.) I ought to be grateful and thankful for all my days viz., Swamiji and yourself. But I am sure of your motherly solicitude for the Swami and I am sure too it will never come to pass. . . ."

মিসেস বুল যে স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার তাৎপর্য বুঝবার জন্য এই বিবরণের প্রয়োজন আছে, কারণ বিবেকানন্দ-সূত্রেই ভারত-সম্বন্ধে মিসেস বুলের সক্রিয় আগ্রহের সৃষ্টি।

কর্মী বিবেকানন্দ অপেক্ষা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মিসেস বুলের অধিক পূজার বস্তু ছিল। নিবেদিতার একটি পত্র থেকে আমরা আগেই দেখে এসেছি, ধীরামাতা বিবেকানন্দকে মাতা মেরীর কোলের শিশুরূপে ভালবাসতেন। সেই চির শিশু এবং চির সন্ন্যাসী তাঁর শেষ পত্রে ('বাণী ও রচনা'র পত্রসংকলন অনুযায়ী) মিসেস বুলকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন—

"ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে মায়ামুক্ত হোক, এই আমার চির প্রার্থনা।"

মিসেস বুল ও নিবেদিতা

ভারতে আসার পরেই নিবেদিতার সঙ্গে মিসেস বুলের যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে তা তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত বজায় ছিল। মিসেস বুলের কাছ থেকে নিবেদিতার প্রাপ্তির শেষ ছিল না, আবার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক আঘাত মিসেস বুলের সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন। স্বামীজীর কাজে মিসেস বুলের অর্থসাহায্যের বিষয় আমরা দেখে এসেছি; নিবেদিতার বিদ্যালয়ও প্রথমাবধি মিসেস বুলের অর্থ-সাহায্য পেয়েছে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতার গ্রন্থাদির এবং জীবন-যাত্রার জন্য মিসেস বুল অর্থব্যয় করেছেন। জগদীশচন্দ্র বসুর কাজেও মিসেস বুলের সাহায্য অপরিসীম। সেই ইতিহাস পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কিছুটা উদ্ধার করব।

মিসেস বুলের সঙ্গে নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্ক সুগভীর। নিবেদিতার মননশীল প্রকৃতিকে মিসেস বুল অনুধাবন করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁকে লেখা নিবেদিতার যে-সব পত্র পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে উভয়ের মানসিক ও আত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। সে ইতিহাস এত ব্যাপক যে, এখানে সামান্যই মাত্র উপস্থিত করতে পারি।

ভারতে আসার পরে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে নিবেদিতা মুগ্ধভাবে লিখেছিলেন—"মিসেস ওলি বুল প্রেমময় পবিত্রতার এবং মিস ম্যাকলাউড অগ্নি ও সাহসের অবতার।"* কিছুদিন পরে তিনি ম্যাকলাউডকে লিখেছেন (৭. ২. ১৮৯৯)—"শ্রীমা বললেন, ধ্যানের সময়ে তিনি সর্বদা সারাকে (মিসেস বুল) তাঁর বামে এবং জয়াকে (ম্যাকলাউড) সামনে দেখছেন।" ২৬.৪.১৮৯৯-তে নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখলেন—"ঐশ্বর্যময় জীবন তোমার—আমেরিকা, নরওয়ে এবং ভারতবর্ষকে এহেন ভালবাসতে পেরেছ।" একই বছরে ৩ অগস্টে ম্যাকলাউডকে—"সেন্ট সারাকে বলো, স্বামীজী তাঁর বিষয়ে বললেন, 'ঐ মহিলাকে বোধহয় আমি নিজের মায়ের চেয়েও ভালবাসি। ওঁর কেশাগ্রের

* মিসেস হ্যামন্ডকে ৬. ৬. ১৮৯৮ তারিখে লেখা চিঠি।

জন্য আমি শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত—উনি এতই ভালো আর সাহসী।' " পুনশ্চ (২৭. ১০. ৯৯)—"তিনি (সারা) মহীয়সী নারী। স্বামীজী হয়ত বলবেন, 'বোধহয় মহত্তমা।' " পুনশ্চ—"স্বামীজী জানালেন—তাঁর মতে মিসেস বুল 'সর্বোচ্চ ধরনের মহিলা।' " (৬. ৬. ১৯০০)

নিবেদিতার জীবনে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের স্থান অতি উচ্চে। উভয়েই তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং সাহায্য করতেন। উভয়েই নিবেদিতাকে নিকটে পেতে চাইতেন। এবং নিবেদিতার ভালবাসা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ঈর্ষার ভাব ছিল। নিবেদিতা মিসেস বুলের কাছ থেকে বহু আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা মিসেস বুলের মনের সান্নিধ্যে অধিক তৃপ্তি পেত, কিন্তু মনে হয়, মিস ম্যাকলাউডকেই তিনি প্রাণের আরও নিকটে পেয়েছিলেন। তাই বলে মিসেস বুলের প্রতি তাঁর ভালবাসা সামান্য ছিল না, এবং উভয়ের মত-সংঘর্ষের ক্ষেত্রে নিবেদিতা খুবই বিব্রত হতেন ও মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে চেষ্টা করতেন।

১৯ জুলাই, ১৯০১, মিসেস বুল সম্বন্ধে ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন—"উনি বড় বেশী মননপ্রধান ; যাচাই করতে, যুক্তিবিচার করতে অতিরিক্ত ব্যস্ত। ফলে কেবল সুসংগঠিত কিছু হয়ে ওঠেন—হাত বাড়িয়ে দিয়ে হৃদয়োত্তাপে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটান না। মনে হয়, তা তিনি বোঝেন।"

ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা একবার লিখেছিলেন (১৯. ৭. ১৮৯৯)—"জীবনের পথে যা আমি একমাত্র ভয় করি তা হল—যে-দুজনকে (যেমন তোমাদের দুজনকে) আমি সবচেয়ে ভালবাসি তারা দুজন দুটি ভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করবে এবং আমার উপরে ভিন্ন কর্তব্য আরোপ করবে।" নিবেদিতার এই আশঙ্কা বারবার সত্য হয়েছে। ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলের এক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সান্ত্বনা দিয়ে বড় সুন্দরভাবে নিবেদিতা লিখেছিলেন (২৪. ৮. ১৯০৫)—

"প্রিয় সেন্ট সারা, এই পৃথিবীতে কোনো আদর্শ বা আদর্শবাদী বর্তমান থাকবে না যদি না প্রথমে **ভালবাসার** উদয় হয়। তাই আমি সুনিশ্চিত যে, তোমার জন্য মানবিক স্নেহানুরক্তি য়ুমকে (ম্যাকলাউডকে) তোমার কাছে এনে দেবে। আর আমি বিশেষভাবে আশা করি, তুমি তোমার আদর্শগুলিকে কিছু সময়ের জন্য ছুটি দিয়ে য়ুমকে ভালবাসায় এবং য়ুমের ভালবাসায় নিজেকে ছেড়ে দেবে। যতক্ষণ দেহে আছি ততক্ষণ কোনো আদর্শের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেবার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি না বুঝতে পারিনা! ওহেন সমুচ্চ ঋষি-পদবীর কি সত্যই আমরা যোগ্য? জেদ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের দ্বারা আমরা আদর্শ বস্তুটাকেই কি দুঃসহ করে তুলি না? প্রিয় সারা, বিশ্বাস করো, জীবন যখন সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত, তখন বিপুল ভালবাসায় তোমার অধিকার, যার থেকে আনন্দ ও সান্ত্বনা পাওয়া তোমার ভবিতব্য। কেন নিঃসঙ্গ বোধ করবে—এত মহান, এত নিঃস্বার্থ তুমি! তবে স্বভাব, মেজাজ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কোনো ত্রুটি যদি পুনঃ পুনঃ ফিরে দেখা যায় তাহলে তা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, মস্ত অপরাধও তা করতে সমর্থ হয় না।"

মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের এই মনান্তর স্থায়ী হয়নি, হওয়া সম্ভব

ছিল না কারণ উভয়েই বিবেকানন্দের সন্নিকট, সেকথা সংঘর্ষের অবসানে আনন্দিত নিবেদিতা ২২ নভেম্বরের চিঠিতে লিখেছিলেন। ম্যাকলাউডকে লেখেন—"ভারতবর্ষের সেই অপূর্ব বৎসরটিতে (১৮৯৮) যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে গভীর আর কিছু সম্ভব হতে পারে না।"*

মিসেস বুল নিবেদিতাকে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, তার সমগ্র ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে না, এ বিষয়ে আরও কিছু বিবরণ জগদীশ বসু প্রসঙ্গে আমরা দেব, কিন্তু অপরপক্ষে বলা চলে, নিবেদিতাও তাঁকে কিছু কম সাহায্য করেননি। সে সাহায্য নিশ্চয়ই অর্থের নয়,† এবং অর্থের থেকে ছোট নয়—নিবেদিতা মিসেস বুলের বিক্ষত জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মিসেস বুল সেজন্য গভীর কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং নিবেদিতাকে একান্ত আপনার করে ধরে রাখতে চাইতেন, সেখানে অন্যের দাবিকে প্রসন্ন মনে নিতে পারতেন না, এই জন্য মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে তাঁর কখনো কখনো মনোমালিন্য হয়েছে।

মিসেস বুলের জীবন সুখের বা শান্তির হয়নি। তাঁর মত সক্রিয় ভাববাদীর জীবন কখনো তা হয় না। তাঁর যে জীবনকথা আমরা আগে দেখে এসেছি—তীব্র কল্পনাশক্তি, সঙ্গীতপ্রিয়তা ও আদর্শবাদের জন্য প্রথম যৌবনে বৃদ্ধকে বিবাহ, তার ফলে পারিবারিক জটিলতা, পরিবার-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বৃদ্ধ স্বামীর দায়দায়িত্ব তুলে নেওয়া— এহেন জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক দুঃখ-নিয়তির সম্মুখীন

---

* ওলি বুল ও ম্যাকলাউডের মধ্যে ম্যাকলাউডের সঙ্গে নিবেদিতার অন্তরঙ্গতা বেশী ছিল মনে হয়। নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে এ বিষয়ে আরও কিছু অংশ আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'ম্যাকলাউড' রচনায় উপস্থিত করার ইচ্ছা রাখি। মিসেস বুলের কাছ থেকে এত বেশী সাহায্য নিবেদিতাকে নিতে হয়েছিল, যে একটা গোপন কুণ্ঠা নিবেদিতার মনে থেকে গিয়েছিলই। ৮ এপ্রিল, ১৯০৭-এর এক চিঠিতে ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছেন—"টাকার বিষয়ে আমার চিঠিকে তুমি এমন উদার মনে গ্রহণ করেছ—সে তোমার মহত্ত্ব। তোমাকে চিঠি লেখার পরে সেণ্ট সারার অ্যালাউন্স এবং আর একটি জিনিস, যার বিষয়ে তুমি জানো, এসে গেছে, সুতরাং আগামী কয়েক মাসের স্বাচ্ছন্দ্য। তদুপরি তোমার ৪৮৬দ৹—রীতিমত সহায়ক।......

সারা ধনী, এবং এত সাহায্য করেন যে, তাঁর কাছে হাজির হলেই মনে হয় টাকা চাইতেই গিয়েছি।...আর তোমার কাছে—প্রয়োজন জানাচ্ছি।"

† ব্যক্তিগত কাজে মিসেস বুল নিবেদিতার অনেক সাহায্য নিতেন। ১৯০৪ সালে নিবেদিতার অনেক চিঠি থেকে দেখতে পাই, নিবেদিতার উপর মিসেস বুল তাঁর স্বামীর জীবনচিত্র রচনার ভার দিয়েছেন, এবং নিবেদিতা বেশ কিছুদিন সে বিষয়ে কাজ করেছেন। নরওয়ের ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ওলি বুলের আগ্রহ ও অংশগ্রহণের কথা এইসব চিঠিপত্র থেকে পাই। এই বিষয়টি লিখতে নিবেদিতা খুবই উদ্দীপনা বোধ করেছেন, এবং নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীত চেয়ে পাঠিয়ে তিনি মিসেস বুলকে বলেছেন—তোমাকে গদ্যে যুদ্ধসঙ্গীত দেব। ওলি বুল নরওয়ের ইতিহাসে এবং সঙ্গীতের ইতিহাসে যে মহামর্যাদার অধিকারী, সে বিষয়ে ভারতবর্ষে কোনো ধারণাই নেই। এমনকি য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত রমেশ দত্তও তা জানতেন না। ১৯০১ জুলাই মাসের এক চিঠিতে নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখেছিলেন—"মিঃ দত্তর কোনো ধারণাই ছিল না (নরওয়েজিয়ান) জাতির হৃদয়ে তোমার এমন স্থান, এবং 'নিজ-অজ্ঞতাহেতু' তিনি মিউজিক সম্বন্ধে এত অল্প জানতেন যে, এমনকি তোমার স্বামীর নাম যে সমগ্র পৃথিবীতে এত পরিচিত, তাও তাঁর কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার ছিল।"

মিসেস বুলের মৃত্যুর পরে অমৃতবাজার পত্রিকার এক লেখায় দেখতে পই, তিনি তাঁর স্বামীর জীবনী লিখেছেন। আমাদের অনুমান, সে লেখাটি নিবেদিতারই।

তাঁকে হতে হয়েছিলই। তার সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য তাঁকে বুদ্ধিকে অস্ত্র করতে হয়েছিল, না করে উপায় ছিল না, বিচিত্র প্রেমের ও বিবাহের যে জীবন্ত স্মৃতিটিকে তিনি পেয়েছিলেন সেই একমাত্র কন্যা ওলিয়া মানসিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না। মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর অসীম যন্ত্রণা। মেয়েটির মধ্যে গুণ ও বদ্‌গুণ, দুইই ছিল প্রচুর। স্বামীজী মেয়েটিকে জানতেন, স্নেহ করতেন, তার শুভাশুভ নিয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট চিন্তা ছিল।

এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে নিবেদিতা মিসেস বুলের আর্ত হৃদয়ে শান্তিসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা জানতেন, "ওলিয়ার সঙ্গে থাকলে সারার মধ্যে জীবন নেই। অপরদিকে এখানে যখন থাকেন, তিনি অনেকের কাছে প্রাণ ও আলোক,"* কিন্তু ওলিয়াকে পরিহার করাও সারার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন জ্বালায় অস্থির হয়েছেন, নিবেদিতা স্নিগ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে লিখে পাঠিয়েছেন—"কখনো ভুলো না যে, তোমার ও ওলিয়ার জন্য স্বামীজীর প্রাণে সর্বদা গভীর করুণ মমতা ছিল," (৩১. ১০. ১৯০৫)। আর একটি চিঠির সান্ত্বনাবাণীতে গভীর সত্যের উদ্ভাস—

"প্রিয় সেন্ট সারা, আমি জানি তোমার বিচ্ছিন্নতা ও আধ্যাত্মিক নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা সুগভীর। আরও জানি তা হবেই, হতে হবেই। যেখানে তুমি সবচেয়ে সুখী ও আশান্বিত, সেখানেও ও-জিনিস থাকে। এ তো সর্বদাই দেখা যায়—যাঁরা পৃথিবীর কাজ করবার জন্য আদিষ্ট, ব্যক্তিজীবনে সুখী হতে দেওয়া হয়না তাঁদের—সে সুখে পাছে তাঁরা মগ্ন হয়ে পড়েন! আমার কথা শুনবে? আমার মতে, যদি তুমি এই অবস্থা **মেনে নাও,** শান্ত সমাহিতভাবে মেনে নাও, এবং অন্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখো, তাহলেই ওলিয়ার জীবন দীর্ঘায়ত হবে, হয়ত সুখীও হবে।" (১২. ১. ১৯০৬)।

মিসেস বুলের সুখশান্তির জন্য নিবেদিতা কতখানি ব্যাকুল ছিলেন ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি (৭. ৬. ১৯০৬) থেকে বোঝা যায়—

"আমরা সেন্ট সারাকে এখন থেকে এখানে পেতে চাই, বয়ে নিয়ে নিয়ে যেতে চাই—আর বুক-ভাঙা নৈঃসঙ্গ্য ঘটতে দেওয়া চলবে না।......কিন্তু—কিভাবে তিনি তাঁর কেমব্রিজ-ভবনটি বন্ধ করে দেবেন? তবে ভাবনার কারণ নেই, যেভাবে হোক ব্যাপারটা সামলে নেওয়া যাবে।"

নিবেদিতার ব্যাকুলতার কারণ, তিনি সারার মহিমাকে সর্বসময়ে অনুভব করেছেন, যাঁর পরিবেশে বিকীর্ণ থাকে 'যথার্থ সঙ্গীত, মর্যাদা, উচ্চ চিন্তা, মনন, বুদ্ধি-বিনিময় ও আদর্শবোধ।' (১৮. ১২. ১৯০৬)

মিসেস বুলের জীবন নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল। শুভ কর্মপথে যখন সে জীবন চলেছে, তখন নিবেদিতার চলার পথ সুগম হয়েছে, আবার যখন জটিল চক্রে তা আবর্তিত হয়েছে, তখন মথিত হয়েছে নিবেদিতার ভাগ্য। মিসেস বুলের জীবনের শেষ পর্যায়ে একটি করুণ অধ্যায় আছে, যার শোক-গরলকে পান করতে হয়েছিল নিবেদিতাকেই। সে অধ্যায়ে আমরা

---

* ম্যাকলাউডকে লেখা, সেপ্টেম্বর ৪, ১৯০২

পরে প্রবেশ করব। এখন মিসেস বুলের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতার লেখা প্রবন্ধটি উপস্থিত করছি। তার পূর্বে মিসেস বুলের দেহত্যাগে অমৃতবাজার পত্রিকার লণ্ডন সংবাদদাতার রচনাংশটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য, যার মধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে মিসেস বুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে বলা আছে।—

"There will be many in India, perhaps particularly in Calcutta, who will feel that another good friend has passed out of sight when they receive tidings of the death of Mrs. Ole Bull, which took place at Cambridge, Massachusets, last Sunday (18th January). It was Mrs. Bull's close friendship with Sister Nivedita—whose name is a household word now in India—that brought her into intimate touch with the people of India, and her interest in the thoughts and movements of the country was particularly keen and sympathetic. It was simply an evidence of her beautiful character, for everywhere that her name is known she is remembered as a generous friend to serious thinkers and workers. A delightful personality and a renowned musician, her life had its great love romance. She was not twenty years of age when Ole Bull, a Norwegian musician of great ability and renown, and a great patriot as well, met her in America and heard her play. He not only admired her musical talent but loved her for herself, and the young girl in her teens married the musician of sixty, then at the height of his fame. Mrs. Bull has been a widow since 1880, but her Life of her husband, published long ago, shows how deep was the devotion of their married life. To Sister Nivedita the sincere sympathy of Indian and European friends will be extended."

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারী, ১৯১১)

নিবেদিতা-রচিত 'সারা চাপম্যান বুল' প্রবন্ধ

(In Memoriam: Sara Champan Bull, Modern Review, June 1911)

সারা চাপম্যানের (মিসেস ওলি বুলের) দেহান্ত হয়েছে গত ১৮ই জানুয়ারীতে, কেমব্রিজের (ম্যাসাচুসেটস্) বাসভবনে—যাঁরা তাঁকে তাঁর কোনো একটি ভারত-ভ্রমণকালে দেখেছিলেন তাঁরা কতখানি না বেদনাবোধ করবেন! মিসেস বুল সেই সকল বিশিষ্ট আমেরিকান মহিলাদের একজন, যাঁরা জীবনের পথে যে-সকল সুমহান কর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সে সকলকেই সহানুভূতি ও সাহায্য দান করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের দিকে তাকালে এই বিচিত্র ব্যাপারটি দেখতে হয়—ইদানীং এই কর্তব্য পুরুষের তুলনায় নারীরা কত বেশী গ্রহণ করেছেন! মধ্যযুগের ইউরোপ, এবং অদ্যাবধি ভারতবর্ষ, সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় সব কিছুর জন্য মহান পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ঋণী। একথা ইটালীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য যেখানে

খ্রীস্টীয় ধর্মসংঘের অবস্থিতি এইসব শিল্প ও সংস্কৃতিগত প্রয়াসকে এমন এক শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টির সামনে এনে হাজির করেছিল, সমাদর করবার মত শক্তি এবং পোষণ করবার মত সামর্থ্য যাদের ছিল। সাম্প্রতিক আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা-সংস্থা, বা পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন প্রধানতঃ নারীদের দ্বারা সহানুভূতি ও সাহায্য বিস্তৃত হয়েছে। যাঁরা দিয়েছেন— মিসেস বুল তাঁদের মধ্যে মহাদাত্রী। তাঁর দান গোপন [illegible] নির্দিষ্ট বা গ্রহীতাদের দাবির অধিকারকে কখনো বিস্মৃত হত না এবং তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থাকে সর্বাবস্থায় বিবেচনা করত। শেষোক্ত ব্যাপারটিই তাঁর পরিচিত জনদের কাছে তাঁর স্মৃতিকে এমন সমুচ্চে স্থাপিত রেখেছে। যদি যশের কোনো বাসনা থাকত, তাহলে এঁর পক্ষে কত সহজে তাকে অধিকার করা সম্ভব হত! অথচ অন্যপক্ষে তাঁর ব্যাপক দানের বহু শাখাবিস্তারের রূপ কেউ জানেনি, সন্দেহ করেনি। তাঁর দানগুলি গ্রহীতাদের চরিত্র এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর ব্যক্তিগত ধারণার রূপ অবিরত ব্যক্ত করেছে। তাঁর দান, গ্রহীতাকে নিজের কাছে মহীয়ান করে তুলত, এমনই বিরল অপরূপ গুণ তার মধ্যে ছিল, কেননা তিনি জানতেন দানের মধ্যে কিভাবে অন্তরঙ্গতা, মর্যাদা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করে দিতে হয়। তাঁর বদান্যতা বড়র মত ছোটতেও পৌঁছত, কিন্তু সর্বদা তাতে সেই একই গোপনীয়তা, অভাবের মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তি সম্বন্ধে একই প্রকার সতর্ক বিবেচনা। হিন্দুর গীতা বলে, 'সাত্ত্বিক দান, যা শ্রেষ্ঠ দান, কেবল সেই দানই সঠিক মানুষের দিকে, সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে প্রসারিত হয়।'* খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বলে, 'যিনি দেবেন, তিনি যেন সহজে দান করেন।'

---

* মিসেস বুলের 'সাত্ত্বিক দানের' সম্বধে নিবেদিতার এই কথাগুলি স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি। এই প্রবন্ধ লেখার প্রায় ১২ বছর আগে, ১৩ জুলাই, ১৮৯৯-তে ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন—

"তারপর অন্য এক ক্ষণে স্বামীজী বললেন, 'গীতা বলেন, তিন রকম দয়া রয়েছে— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসিক দয়া আবেগপ্রবণ, অন্য কিছু চিন্তা না করে, পরিণতি বা অন্য কিছুর কথা না ভেবে, কেবল সাক্ষাৎ ইচ্ছাচালিত হয়ে সাহায্য করে। রাজসিক দয়া সাহায্য করে গৌরবের জন্য। আর সাত্ত্বিক দয়া—', তিনি বললেন— 'যতই মিসেস বুলের কথা ভাবি ততই সাত্ত্বিক দয়ার কথা মনে হয়, কারণ ও-দয়া করতে হয় ঠিক মানুষকে, ঠিক উপায়ে এবং ঠিক সময়ে। মিসেস বুলই মনে হয় একমাত্র মানুষ যিনি জানেন ঠিক কিভাবে দিতে হয়, কত নিঃশব্দে অথচ কদাপি ভুল না করে। আর মার্গট, তোমাদের সব দয়া তামসিক ইত্যাদি ইত্যাদি।' "

নিবেদিতাকে জীবনে বহু দান নিতে হয়েছে এবং দিতে হয়েছে। এই দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের যোগ ছিল না। তবু পাছে স্বার্থ-সম্পর্ক ঘটে যায়, তাই নিজের মনকে বিচারে ও বিবেকে জাগ্রত রাখতে চেষ্টা করতেন সর্বসময়। ২৫ অগস্ট, ১৯০৪-এ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"আর একটি জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। ভ্রান্ত দান ধ্বংসের কারণ। বাস্তবিক, গীতা সেই কথাই শেষের দিকে তামসিক দান সম্বন্ধে বলেছেন। স্বার্থের ইন্ধনরূপে প্রদত্ত সকল দানই ভ্রান্ত। যখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, 'ধর্মান্তর' ঘটেছে যেন, ঐকান্তিকতা এসেছে, কিংবা বলা যায়, এমন একটি প্রয়াস করা হয়েছে সবকিছুই সেই প্রয়াসে, আত্মস্বার্থে নয়, উৎসর্গীকৃত, কিংবা যখন আত্মা চালিত করতে বা আত্মসাৎ করতে না চেয়ে সাক্ষীর ভূমিকা নিয়েছে, কেবল তখনি কিংবা তারও বহু পরে ক্রমে দান করার অবস্থা আসে।"

১৯ বছরের তর্ণী ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বিবাহের দ্বারা মিসেস ওলি ব্ল হয়ে বিশ্বের ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্বামী নরওয়ের মহান বেহালাবাদক, ইউরোপ-জোড়া খ্যাতি তাঁর। তারও বেশী তিনি। এখন নরওয়ের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরা এঁরই তীব্র-ব্যাকুল দেশপ্রেমের স্বপ্নে লালিত হয়ে জাতীয়তাবোধ লাভ করেছিলেন। সকল প্রতিভাবান ব্যক্তির মতই ওলি ব্ল জাগতিক বিষয়ে সহজে প্রভাবিত [illegible] মঙ্গলের পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বারবার বিরাট অর্থোপার্জন করেছেন, এবং বারবার অসাধু উকিল, [illegible] ম্যানেজার, কিংবা দ্ভার্গ্যের প্রবাদোক্ত গহ্বর সে টাকা স্বচ্ছন্দে তাঁর নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেলেছে! তথাপি এখনো তাঁর সেইসব অপ্র্ব উচ্চাশার কিছ্ কিছ্ অংশকে স্মরণ করা হয়। নরওয়েবাসীদের কলোনি করবার জন্য আমেরিকায় তিনি বিশাল ভূখন্ড কিনেছিলেন। তাঁর নেশন থিয়েটার,—উদ্বোধন করেছিলেন ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে—তার প্রথম তর্ণ ম্যানেজার হেনরিক ইবসেন, দ্বিতীয় ম্যানেজার বিয়র্নস্টার্ন বিয়ার্নসন। নরওয়েবাসীদের ঘৃণা করে ডেনিশদের প্রতি পক্ষপাত দেখাত, এমন উচ্চম্মন্য র্চিকে বাতিল করে দিয়েছিল এই থিয়েটার। এখানে যে-ভাষা ব্যবহৃত হল তা স্থানীয় উপভাষা, রসিকতা গ্রামীণ, অভিনেতা ও অভি-নেত্রীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামসম্হ থেকে সংগৃহীত। গানের ও কৃষক-বাদকদের ভার নিলেন ওলি ব্ল। আর নাটক?—ইবসেনের বিরাট সব প্রথম জীবনের নাটকগ্লি কি এই কথাগ্লি বলবার জন্য বর্তমান নেই যে, জাতীয় ইতিহাসে বীরকাহিনীগ্লির স্ত্রপাত এখান থেকেই! এ সবই সেইকালে ঘটল যখন বহ্ যুগ ধরে নরওয়েবাসীদের ভাষাকে ভদ্র সমাজের কথাবার্তার পক্ষে চাষাড়ে ভাষা বলে গণ্য করা হত।

রাজনৈতিকভাবে ওলি ব্লের জীবন দ্টি উদ্দেশ্যাসিদ্ধিতে নিয়োজিত ছিল, এক 'বিশ্দ্ধ পতাকা' আন্দোলন, দ্ই 'নরওয়ে-দিবস' পালন। ১৭ই মে তারিখে নরওয়ে-দিবস; ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ঐ দিনটিতে নরওয়ে স্ইডেনের কাছ থেকে স্বাধীন সংবিধান লাভ করে। ওলি ব্ল কিন্তু ঐ দ্ই উদ্দেশ্যের কোনটিকে সম্প্র্ণ সিদ্ধ দেখে যেতে পারেন নি। একথা ঠিক যে, বহির্বাণিজ্য বা দ্তাবাসের ক্ষেত্র ভিন্ন নরওয়ের পতাকার একাংশে নিজ চিহ্ন বজায় রাখার চেষ্টা থেকে স্ইডেনকে নিবৃত্ত হতে হয়েছিল; এবং কয়েকটি ঐকান্তিক হৃদয় ও মন ঐ পতাকার প্রশ্ন ও জাতীয় দিবস পালনের প্রশ্নে সংঘবদ্ধ হয়েছিল; তথাপি স্বয়ং ওলি ব্ল কিংবা তাঁকে যাঁরা ঘিরে থাকতেন এমন কেউ কল্পনানেত্রে দেখতে পাননি, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী দিবসের উৎসব পালিত হবে স্বাধীন নরওয়েতে, স্বনির্বাচিত এক রাজার অধীনে। ব্যক্তি-প্জার ক্ষেত্রে নরওয়ে ইউরোপে অনন্য; আর এই শতবার্ষিকী উৎসব আমেরিকায় অবস্থিত বিধবা নারীর হৃদয়ের সর্বশেষ বিজয়োৎসব—স্বামীর স্মৃতি-রক্ষায় যাঁর প্রেম ও ভক্তিপ্র্ণ দীর্ঘ তপস্যার কাল প্রায় সমাপ্ত। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০-এর প্রভাতে প্রথম যে টেলিগ্রামটি তিনি খ্লেছিলেন—শেষ রোগশয্যায় তখনই তিনি শয়ান—সে টেলিগ্রামটিতে স্বাক্ষর ছিল 'হাকন'। নরওয়ের রাজার প্রেরিত সেই টেলিগ্রামে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা ছিল—"এই দিনটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে সমগ্র নরওয়েতে।"

অতুলনীয় সৌভাগ্য আমেরিকান তর্ণীটির—১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ওলি ব্লের

পত্নী হবার পরে তিনি স্বামীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-ভাবনায় অংশ নিতে পেরেছিলেন। মিসেস ওলি বুল পরবর্তী জীবনে যে-ধরনের চিন্তা বা কাজেই নিজেকে প্রকাশ করুন, সব কিছুরই গভীরে নিহিত ছিল সুমহান স্বামীর কাছ থেকে লব্ধ প্রেরণা ও শিক্ষা। ওলি বুল ছিলেন জাতি-নির্মাতাদের শ্রেণীভুক্ত মানুষ। মৃত্যুকালে যে-পত্নীকে রেখে গেলেন, তিনি একই সঙ্গে তাঁর শিষ্যা। তাঁর জন্য শোক করতে রয়ে গেল যে-হৃদয়, তা লোকমাতার হৃদয়। মিসেস বুলের পরিণত জীবনের বৎসরগুলিতে সর্বাত্মক কল্পনা এবং এক ধরনের গৃহস্বামিনীসুলভ মিতব্যয়িতার বিচিত্র সংমিশ্রণ। বিশ্বজনীন মনের অধিকারী এক ভায়োলিন-বাদক (ওলি বুল নিজের সম্বন্ধে বলতেন, “নরওয়ের বুড়ো বেহালা-বাজিয়ে”) এক মহান জাতির [illegible] তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাই তিনি যেমন জাতির মূল্য অনুধাবন করতে সমর্থ ছিলেন, তেমনি ব্যক্তির মহত্ত্ব ও [illegible] মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যেহেতু জাতি-সংগঠক প্রতিভাকে সেবা করেছেন, সেইজন্য মহান পুরুষেরা কোন্ ভাবের প্রতিনিধিত্ব করেন তা বুঝতে পারতেন; মাতৃসুলভ কৌশলে তাঁদের অবকাশের বা ভ্রমণের ব্যবস্থা করে, বা তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বা উপহার দিয়ে এমন অবস্থা এনে দিতেন যার ফলে নানা সংকট তাঁরা অতিক্রম করতে পারতেন; তাঁদের ভগ্নহৃদয়ের যাতনা ভুলিয়ে ইনি নূতন আশার সৃষ্টি করে দিতেন। গোপনে হয়ত এমন একজনের উদ্দেশ্যে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছেন যাঁর সঙ্গে তাঁর মননের সাধর্ম্য নিতান্ত ভাসাভাসা—সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আত্ম-সমর্থনের ভঙ্গিতে হয়ত একান্তে বললেন, ‘কি করব, এমন একটা কণ্ঠ হারিয়ে যাবে, সে তো হতেই পারে না!’ কোনো মানুষ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে কতখানি মূল্যবান, সেই দিকেই তাঁর নজর ছিল, ব্যক্তিগতভাবে সে মানুষটি তাঁর পছন্দের কি না সে বিচার করতেন না। যে-কোনো দেশের মানুষ, তিনি ডাক্তার, সাংবাদিক, শিল্পী, দরিদ্র লেখক, অভাবী শিক্ষক—যে-কারো ভবিষ্যতের জন্যই তাঁর উন্মুক্ত উদারতা; যেন লোকজননীর সঞ্চয়-ভাণ্ডারের চাবিখানি রয়েছে তাঁর হাতে, তিনি বিতরণ করছেন প্রয়োজনের সামগ্রী। আর তাঁর দানে কোনো শর্ত ছিল না। যাদের রক্ষা করতে চেয়েছেন তাদের জন্য নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার ঠাঁই ও কাজের সুযোগ সংগ্রহে তিনি স্বতঃই প্রয়াসী। অথচ কি ধরনের কাজ তাঁরা করবেন, সে বিষয়ে কথাটি নয়, তাঁদের সংগ্রামের লক্ষ্য নির্দেশে বিন্দুমাত্র বাসনা নয়। এসব ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব এক রীতি ছিল। “আমার পরম **গৌরব**”, মৃত্যুশয্যায় তিনি বলেছিলেন, “আমি **সেবা করতে** পেরেছি।” তবে সেবার বস্তু নির্বাচনে, এবং মূল্য নির্ধারণে তাঁর স্বামীই নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রেরণা দিয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

বিবাহ-ব্যাপারটি তাঁর সঙ্গীতপ্রীতিরই ফলশ্রুতি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ম্যাডিসনে (উইসকনসিনে) জাত ও লালিত বালিকাটি যেভাবে হোক পিয়ানো বাজানো শিখে নিয়েছিলেন; এমন কম্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সুর তাঁর হাতে উঠত যে তাঁর পিতৃ-ভবনে অতিথিরূপে আগত সেই মহান ভায়োলিন-বাদকের সানন্দ মনোযোগ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং প্রভাতের অনুশীলনকালে সঙ্গত করবার জন্য তিনি বালিকা-টিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রভাবেই এঁর সঙ্গীত-প্রতিভা অধিক বিকশিত হয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে এঁর বাজনায় এক নিজস্ব মীড় ও মূর্চ্ছনার

সঞ্চার হয়েছিল, অতীব সুন্দর তা। সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে যখন তিনি বাজাতেন, কত মহান সৃষ্টির রীতি-সৌরভ ঘনীভূত হয়ে উঠত সেখানে। সুপরিচিত এক পিয়ানো-বাদিকা কুড়ি বছর আগে জাহাজে এঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেন, তখনকার পাঁচ মিনিটের আলাপে এঁর কাছ থেকে যে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, তার থেকে তিনি অতঃপর গ্রে'র সুর বাজানোর রীতিই বদলে নিয়েছিলেন। বিবাহের মধ্য দিয়ে ইনি ওলি বুলের সঙ্গীতজীবন ও জাতীয় জীবন, উভয়েরই অংশী হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গতকারিণীরূপে ইনি ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন, এবং ভিয়েনা, প্যারিস, ব্রাসেলস্ ও অন্যত্র লিস্‌জত্, রুবিনস্টাইন, স্ট্রাকেরস্‌থ্ প্রভৃতি স্বামীর সঙ্গীত-বান্ধবদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে লিস্‌জত্-এর চেহারার অসাধারণ ঐক্যের কথা প্রায়ই শুনেছেন। [illegible] যখন লিস্‌জত্-এর আবাসে দেখা করার জন্য গেছেন তখন লিস্‌জত্-এর পরিচারক তাঁদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে দৌড়ে ভিতরে গেছে—'কর্তার যমজ ভাই এসেছেন' জানাতে। ইউরোপের বহু বন্ধুরই ধারণা ছিল, অনেক দিন আগেই ওলি বুলের মৃত্যু হয়েছে। তাই ওলি বুলের শেষ বিরাট সফরের সময়ে তাঁর বাজনা শুনে বন্ধুদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে করমর্দন করে বলেছিলেন, 'কী আশ্চর্য। একথা তুমি ঘুণাক্ষরে জানাও নি তুমি আগের মতই অপূর্ব বাজাও!'——তরুণী বধূর পক্ষে তা ছিল এক পরম গর্বের ক্ষণ!

স্বামীর জীবনের শেষ তিন বৎসর উভয়ে প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে একত্রে বাজাতেন। যে-ঘরে তাঁরা বাজাতেন পত্নীর কাছে সেই ঘরখানি উপাসনা-মন্দির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরওয়েতে স্বভবনের সুন্দর সঙ্গীতকক্ষে পত্নী বাজিয়ে গিয়েছিলেন মোজার্টের বিদায়সঙ্গীত, চরম আনুগত্যের মহান শক্তিতে—যখন স্বামী চলে যাচ্ছেন চিরতরে। তারপরে—সারা বুল অনুভব করলেন সুরের মহারাজ্যের উপর যবনিকা-পাত হয়ে গেল আগামী বহু বছরের জন্য। তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের উপরে এই মৌন-নির্জন যেন ভাবী শান্তি ও নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি। সঙ্গীত? সে যে তখন তাঁর কাছে অসহ্য যাতনা! শেষ শয্যায় যখন শুয়েছেন, তখন তাঁর চারপাশের মানুষেরা গভীর বেদনানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন, তিনি বার বার বলেছেন—"আমি নিশ্চিত অনুভব করছি, আবার সেই মহাসঙ্গীত শুনতে পাব!"

পরবর্তী বৎসরগুলিতে আমেরিকাবাসী নরওয়েজিয়ানদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে অনুভব করেছে—ওলি বুলের বিধবা পত্নী অন্তরে নরওয়ের মানুষ। প্রশ্নাতীত বিশ্বস্ততা সম্পর্কবন্ধনকে যতখানি দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ রাখতে পারে, এখানে তাই ছিল। কিন্তু কালগতে নিজ কন্যা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হল, তখন নরওয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে ক্রমেই তিনি সচেতনভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন যাতে করে কন্যা অধিক সুযোগ পায়। এই কারণেই কয়েক বৎসর আগে বার্গেন-এ অভিষেক উৎসবে উপস্থিত হতে রাজি হননি। সেখানকার জনগণের সমক্ষে তিনি শেষবার আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৭ মে, ১৯১০-এ সিন্ডিং-কৃত ওলি বুলের মূর্তির আবরণ-মোচন সভায়। পরে, একই বৎসরে তিনি মিঃ আর, সি, দত্তকে (রমেশচন্দ্র দত্ত) অতিথিরূপে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

ভারত সম্বন্ধে মিসেস ওলি বুলের আগ্রহের সূত্রপাত ১৮৮৬-৮৭ সালের

শীতকাল থেকে, যখন তিনি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে বস্টনে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত ভগবদ্‌গীতার পাঠ শোনেন। এই ধর্ম-সাহিত্যের অনুশীলন তিনি আরম্ভ করেছিলেন,—এর মধ্যে দুটি জিনিস তাঁকে আকৃষ্ট করে : প্রথমতঃ, অমরত্বের গোটা সমস্যাটির বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা, দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ধর্ম-ধারণার অবাধ স্বাধীনতা। তিনি প্রায়ই বলতেন, এই হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েই তিনি খ্রীস্টধর্মকে ভালবাসতে শিখেছেন। মানবাত্মার নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। স্বামীর দেহত্যাগের পাঁচ বৎসরের মধ্যে গীতা তাঁর জীবনে অবতীর্ণ হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহী হন, এবং ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারত ও কাশ্মীরে এক বৎসর কাটান। এর অধিকাংশ সময় স্বামীজী তাঁর অতিথি ছিলেন। তার ফলে তিনি ভারতীয় জীবনকে যেভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তার তুলনা নেই। যে-বস্তুতে একবার আগ্রহী হয়েছেন, তার প্রতি তাঁর বিপুল নিষ্ঠা পরিচিতমহলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগাত ; রামকৃষ্ণ-মন্ডলীতে তিনি 'ধীরা মাতা' নামে পরিচিত ছিলেন। এই সময়ের পর থেকে ভারতবর্ষ তাঁর জীবনে অগ্রাধিকার পেয়েছিল ; ভারত ও ভারতীয়দের তিনি একনিষ্ঠ উৎসাহী বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। বিবেকানন্দের কর্মোদ্দেশ্যের সঙ্গে মিসেস বুলের সহানুভূতির সংযোগ স্বামীজীর আমেরিকা-জীবনের সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করেছিল একথা বলা যায়। গৈরিক বসনাবৃত সেই সন্ন্যাসীর বক্তৃতাসভায় উপস্থিত নারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মহীয়সী নন, তাঁর থেকে অনেক বেশী ধনশালিনীরা পূর্বেই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ যে-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তার প্রতি তাঁর তুল্য গভীর নৈর্ব্যক্তিক উদারতা ও স্নেহানুভূতি আর কেউ দেখাতে পারেন নি, সে দায়িত্ববোধ আর কারো ছিল না, শ্রদ্ধার বস্তুকে সেবা ও রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর তুল্য অনুশীলিত সামর্থ্যে আর কেউ অধিকারী ছিলেন না। অতঃপর বিবেকানন্দের আদর্শ, ধাত্রী-মাতা পেয়েছিল কিংবা তারো বেশী। একদা জনৈক আমেরিকানের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত হলে সমাগত সকলে একজোট হয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করেছিল, 'ঋষির সংজ্ঞা কি ?'—স্বামীজী তখন এক মুহূর্ত থেমেছিলেন, তারপরে শ্রদ্ধাঘন মৃদুস্বরে বলেছিলেন—'মিসেস ওলি বুল।'*

বন্ধু ও সেক্রেটারী ডাঃ লুইস জি জেনসের তত্ত্বাবধানে মিসেস বুলের গৃহ পরবর্তী কয়েক বৎসরে দার্শনিক আলোচনার স্বীকৃত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এইসব আলোচনার মধ্যে ভারতীয় এবং বৈদান্তিক বিষয়সমূহ যাতে যথাযোগ্য মনোযোগ পায়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। মিসেস বুলের দূর-ব্যাপক দৃষ্টি ও উদার মনস্বিতার কাছে একদেশদর্শিতা অসহ্য ব্যাপার। ধর্মান্তর সম্বন্ধে তাঁর আতঙ্ক ছিল। তাঁর মতে, যথার্থ বিকাশের ধর্ম যা, তা একদিকে পুরাতনের স্বীকৃতি ও সমর্থন নিয়েছে, অন্যদিকে একই সঙ্গে নূতনকে উন্মোচন করেছে। যে-কোনো জিনিস সম্বন্ধে আগে-ভাগে বরং তিনি সর্বাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবেন, পাছে অংশকে পূর্ণ বলে গ্রহণ করার মত প্রচলিত ভুল করে বসেন।

---

* এই সূত্রেই বোধহয় নিবেদিতা তাঁর চিঠিপত্রে 'সেণ্ট সারা' লিখতেন।

ভারত-প্রীতির ক্ষেত্রেও তিনি নিজ স্বামীকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন। ওলি বুলের একটি ক্ষুদ্র লেখায় দেখা যায়, তিনি সন্ধান করে দেখিয়েছেন, ভায়োলিনের সৃষ্টি ভারতেই। ভারতের কাছে নিজ স্বামীর কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকারে মিসেস বুল আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তা নিশ্চয় প্রায়ই জানাতেন, কারণ ১৮৯৮-এর মে মাসে আলমোড়ার বাংলোয়—হিমালয়ে তাঁর গৃহস্থালীর প্রথম দিনটিতে—স্বামী বিবেকানন্দ নিজের আবাসস্থল থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁকে একটি খেলার বেহালা উপহার দিয়েছিলেন (সেইসঙ্গে সেটিকে বাজাবার জন্য খেলার ধনুকও), যেটিকে মিসেস বুলের মনে হয়েছিল তাঁর স্বামী কর্তৃক উল্লিখিত আদি ভায়োলিনের রূপ। ঐ ভঙ্গুর জিনিসটিকে সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুদিনে তাঁর ড্রইংরুমের টেবিলের উপরে সেটিকে রাখা হয়েছিল।

স্বামী তাঁর কাছে প্রেরণাদাতারও অধিক। ভারতবর্ষীয় বস্তু বা ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি যে মনোভাব বোধ করেছেন, বা যে সাহায্য করেছেন, সেক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকও তাঁর স্বামীই। মিসেস বুলের দৃষ্টি সম্মুখ-প্রসারিত, তাঁর মনোবৃত্তি সংগঠনী। সহৃদয় তিনি, আবার প্রাজ্ঞও। ভারতীয় নারীর মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন, অবহেলায় হারাবার যোগ্য নয় যা। তাদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ অসীম, কিন্তু সে শিক্ষার আকার-প্রকার যাতে ঠিক পথে ঘটে, সে বিষয়ে সমধিক সতর্কতা ছিল। ভারতীয় মানসের সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা থেকেই তাঁর মধ্যে কৌতূহল জেগেছিল—এহেন ভারতীয় চরিত্র ভারতীয় মাতৃগণ সৃষ্টি করেছেন কোন্ শিক্ষায়? বাস্তব পরিচয়ের পরে তাঁর মনে কৌতূহলের স্থানে সুগভীর পরিতৃপ্তি এবং শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। ভারতীয় নারীরা তাঁদের এই শ্রেষ্ঠ সুহৃদের কাছ থেকে যে মর্যাদার দৃষ্টি, সহানুভূতিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছেন, তার তুলনা নেই।

জনগণের ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বপ্রকারের মননগত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা—সব কিছুই তাঁর অবিচলিত আশা ও বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী ছিল। এক্ষেত্রে নিখুঁত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দৃঢ় প্রত্যয় ও উৎসাহের সঙ্গে অপরূপ সংযমের সংমিশ্রণ, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতার গভীরতা ও প্রাজ্ঞ বিচার-শক্তি—এর তুলনা বিরল।

মিসেস ওলি বুল এদেশে দ্বিতীয়বার আসেন ১৯০২ সালে এবং তৃতীয়বার ১৯০৩ সালে। তাঁর অনেক বন্ধুই আশা করেছিলেন তিনি আবার আসবেন—দীর্ঘতর দিনের জন্য—কিন্তু তা হবার নয়। গত ১৮ই জানুয়ারীর প্রত্যূষে এক নিদ্রা থেকে অন্য নিদ্রায় চলে গেলেন, মৃত্যুসায়রে অবতরণ করলেন সর্বোত্তমা এক আমেরিকান নারী।

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র

নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রোড়পত্রে (২৮ অক্টোবর, ১৯৬৭) প্রকাশিত বর্তমান লেখকের রচনাটির নাম ছিল 'আলোকদূতী'। ঐ নামটি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারপথে স্থাপিত নিবেদিতার মূর্তির আখ্যা—*The Lady of the Lamp* -এর ভাষান্তর ছাড়া কিছু নয়। জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনসাধনার পূর্ণাহুতি দেবার সময়ে নিবেদিতার উদ্দেশ্যে কেন সর্বোত্তম নমস্কার জানিয়েছিলেন, সে ইতিহাস পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের কথা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষিপ্ত ক্ষীণস্মৃতির মধ্যে থেকে গিয়েছিল। তার গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই জনসমাজে ছিল না। প্যাট্রিক গেডিস লিখিত জগদীশচন্দ্রের জীবনীতে নিবেদিতার ভূমিকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, রবীন্দ্রনাথ বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য বসুর সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের কথা মাঝে মাঝে বলেছেন, এই পর্যন্ত। এই ঐতিহাসিক উদাসীনতার পরিবর্তন ঘটেছিল লিজেল রেম'র নিবেদিতা জীবনী প্রকাশিত হবার পরে। বইটির নারায়ণী দেবীকৃত বাংলা অনুবাদ পড়ে বাঙালী পাঠক চমকিত হয়ে জেনেছিল এবং জেনে চমকিত হয়েছিল—সত্যই নিবেদিতা এতখানি করেছিলেন! সেই বিস্ময়ের চমক গ্রাহ্য ধারণায় পর্যবসিত হয় মুক্তিপ্রাণা ও আত্মপ্রাণা-রচিত নিবেদিতার বাংলা ও ইংরেজী জীবনী দুটি প্রকাশিত হলে।

তবু স্বীকার করতে হবে, নিবেদিতার ভূমিকার ব্যাপ্তির তুলনায় প্রকাশিত ইতিহাস সামান্যই। তা কুয়াশা সরে যাওয়ার পরে হারানো নিমজ্জিত জাহাজের মাস্তুল-দর্শন মাত্র। ক্রমে নূতন নূতন তথ্য উপস্থিত হয়েছে এবং আমরা নূতনতর প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উচ্চকিত হয়েছি। যেমন ধরা যাক, নিবেদিতা স্মারকগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষের অনুরোধে নিবেদিতার মারাঠি জীবনীকার সুপণ্ডিত ডক্টর ভি ভি পেণ্ডসে যখন গোখলেকে লেখা নিবেদিতার অনেকগুলি চিঠির নকল পাঠিয়ে দিলেন, তাতে দেখা গেল, কাউন্সিল-সদস্য গোখলের মারফত কিভাবে নিবেদিতা সরকারী মহলে ডাঃ বসুর বিরুদ্ধে অবিচারের প্রতিবিধান চাইছেন।

কিন্তু পাইনি কত তথ্য তারও সীমা-সংখ্যা নেই। যিনি উজাড় করে সাহায্য করেন, তিনি ইতিহাসের কল্যাণের জন্য ইতিহাস রেখে যান না, বিশেষতঃ যদি নিবেদিতার মত আত্মবিলোপী চরিত্রের মানুষ তিনি হন। তথাপি—নিবেদিতা প্রচুর চিঠি লিখতেন, ডাঃ বসুকেও লিখেছেন—সে চিঠিগুলি গেল কোথায়? চিঠি লেখার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র হয়ত স্বভাব-সন্ত্রস্ত, তবু নিবেদিতাকে লেখা তাঁর চিঠি সংখ্যায় কম হওয়ার কথা নয়—সেগুলিই বা গেল কোথায়? জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রক্ষিত নিবেদিতার ডায়েরীগুলি—যার মধ্যে ডাঃ বসুর কাজের নোট ছিল—তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু তথ্য ইতিপূর্বেই দিয়ে এসেছি। সে ডায়েরীগুলি অপ্রকাশিত কিংবা লুপ্ত। জগদীশচন্দ্রের জীবনে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে

সর্বাধিক তথ্য যে-সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল সেই বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করেননি বলা চলে।

তথ্য উদ্ধারে নানা অসুবিধা। তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় ভূমিকার তুলনায় সামান্য হলেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছি। এক্ষেত্রে মুখ্য উৎস নিবেদিতার পত্রাবলী। অন্যান্য সূত্র থেকেও সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ অল্প নয়। ইতিপূর্বেই আমরা এ বিষয়ে নানাজনের সাক্ষ্যবিবরণ দিয়ে এসেছি। নিবেদিতার বোন এবং ভাই, মে উইলসন ও রিচমন্ড নোবল, সিস্টার দেবমাতা, র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতির সাক্ষ্য উল্লিখিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও আরও নানাজনের সাক্ষ্য দেওয়া হবে। এই সমস্ত উপাদান থেকে একটি খসড়া-চিত্র পাওয়া যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই চিত্র উপস্থিত করার কালে পাঠকদের কাছে একটি বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। বর্তমান লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র নন, অথচ বৈজ্ঞানিক বিষয় তাঁকে উপস্থিত করতে হচ্ছে। কিছু কিছু ভ্রান্তি ঘটবেই।

১৮৯৮ সাল পর্যন্ত ডাঃ বসুর জীবনের রেখাচিত্র

১৮৯৮ সালে নিবেদিতার ভারতে আসার কিছুদিন পরেই ডাঃ বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আমাদের বিবরণের মূল অংশের সূত্রপাত সেখান থেকেই। কিন্তু যেহেতু আধুনিক ভারতবর্ষের প্রধান বৈজ্ঞানিক পুরুষের সংগ্রামময় জীবনে এক মহীয়সী নারীর সেবা ও সাহায্য আমাদের উপজীব্য হবে, সে কারণে ঐ সংগ্রামের সূচনাপর্বের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনী, গভীর লজ্জার বিষয়, যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত নয়। বিবরণ দেবার কালে আমরা প্রধানতঃ প্যাট্রিক গেডিস রচিত 'দি লাইফ এ্যান্ড ওয়ার্ক অব স্যার জগদীশ সি, বোস' গ্রন্থটির উপর নির্ভর করব। সেই গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় যে-জীবনচিত্র দেওয়া হয়েছে, তারও সাহায্য নেব।

জগদীশচন্দ্রের পৈতৃক বাস বিক্রমপুরে, কিন্তু তাঁর জন্ম হয় মৈমনসিংহে, ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐকালে তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ওখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম বামাসুন্দরী বসু।

ভগবানচন্দ্র উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মানুষ। তিনি দেশপ্রেমিক কিন্তু তাঁর জাতীয়তা-বোধ ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়নি, বহু উদ্যমে তা সক্রিয় ছিল। সমাজ-উন্নয়নে তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ভিন্ন দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়, বিশ্বাস করেছিলেন। নানাপ্রকার কারিগরি শিল্পে ও বাণিজ্যে নিজের সমস্ত অর্জিত সম্পদ নিয়োগ করার পরে আদর্শবাদী ব্যবসায়ীর সাধারণ ভাগ্য, বিপুল ঋণের বোঝা, বহন করেছিলেন জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকাররূপে জগদীশচন্দ্র ঋণের বোঝার অতিরিক্ত আরও কিছু লাভ করেছিলেন। মানবচরিত্রের মহত্ত্বের উত্তরাধিকারও তিনি পেয়েছিলেন।

সাহসী, উদ্যমী, আদর্শবাদী ও কল্পনাপ্রবণ পিতা পুত্রের চরিত্র গঠন করে দিয়েছিলেন। পুত্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, "সময়ের পূর্বে তাঁর জন্ম ; তাঁর মত বহু জীবনের ভস্মাবশেষের উপরেই ভাবী বৃহত্তর ভারতের ভিত্তি নির্মিত হবে। কেন এমন হবে, তা জানি না, শুধু জানি যে, ধরিত্রী-মাতা বলির জন্য ক্ষুধার্ত।"

পরের জন্য আদর্শবাদ এবং নিজের জন্য সুবিধাবাদ—বলাই বাহুল্য এ নীতি ভগবানচন্দ্রের নয়। সুতরাং সকলকে চমকে দিয়ে তিনি বালক জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজী স্কুলের পরিবর্তে ফরিদপুরে নিজের স্থাপিত দেশী বাংলা স্কুলে। জগদীশচন্দ্র এর ফলে নিজ রক্তের মধ্যে স্বদেশ এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে পান। বহু পরে তিনি বলেছিলেন—"আজ বুঝতে পারছি, কি উদ্দেশ্যে বাংলা স্কুলে বাবা আমাকে ভর্তি করে দেন। সেখানে শুরুতে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে হয়েছে, সেই ভাষায় ভাবতে হয়েছে, জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, আমি নিজেকে জনগণের একজন বলে ভাবতে শিখেছি, উচ্চম্মন্যতা আমাকে সরিয়ে রাখেনি।"

স্বদেশ তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে বালকের মনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। যাত্রার আসরে রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ও তাদের প্রতি আকর্ষণ, ডাকাত-ভৃত্যের কাছে ভয়ঙ্কর কাহিনী শোনার রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, প্রবাহিত নদীতটে নির্জন দুপুরে বসে গতিশীল নদীতরঙ্গের সঙ্গে স্বপ্ন-কল্পনা মিশিয়ে দেওয়া এবং সন্ধ্যায় পিতার কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বস্তুরহস্য সম্বন্ধে স্বভাব-কুতূহলী মনকে মেলে ধরা—বালকের এই জীবন।

তারপর ১১ বছরের ছেলে মফঃস্বল থেকে কলকাতা শহরে এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। সে স্কুল থেকে অল্প পরেই সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে, এবং প্রথম দিনেই ক্লাসের চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধার চ্যালেঞ্জের উত্তরে লড়াইয়ে নেমে পড়া।—"বক্সিংয়ের তখন কিছুই জানতাম না, তাহলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম, প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম, তবু ছাড়িনি, শেষ পর্যন্ত জিতেছিলাম, এবং শিখেছিলাম, বাধা যত বড়ই হোক অনতিক্রম্য নয় ; এই মনোভাব পরবর্তী জীবনে মনন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিল"—জগদীশচন্দ্র বলেছেন।

১৮৭৫ সালে বৃত্তি নিয়ে এনট্রান্স পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন, বিজ্ঞান গ্রহণ করেন এবং ফাদার লাফোঁর শিক্ষায় বিশেষ প্রেরণা পান। প্রথমে তাঁর ঝোঁক ছিল 'প্রাকৃতিক ইতিহাসে', ফাদার লাফোঁ তার মোড় ফিরিয়ে দেন পদার্থবিদ্যার দিকে। ১৮৭৭ সালে এফ-এ এবং ১৮৭৯ সালে বি-এ পাশ করেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি ল্যাটিন ও সংস্কৃতও শিখেছিলেন।

বি-এ পাশের পরে তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ এল যখন স্থির করলেন ইংলণ্ড যাবেন আই, সি, এস হতে। পিতার আর্থিক বিপর্যয় তখন চূড়ান্ত। আই, সি, এস হয়ে পিতার কষ্ট দূর করবেন, সেই অভিপ্রায়। আই সি এস হতে না পারলে ব্যারিস্টারী। কিন্তু যাবেন কি করে—খরচের প্রশ্ন বাধা হয়ে দেখা দিল। তখন তাঁর মাতা, রক্ষণশীল হিন্দু রমণী, যিনি পুত্র-বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় ও সমুদ্রযাত্রার প্রশ্নে আতঙ্কিত, তিনি যখন দেখলেন পুত্র যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন নিজের সমস্ত

অলংকার এনে তার হাতে তুলে দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অলংকার বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়নি।

পিতার মহত্ত্ব এখানে আর একবার উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। তাঁর দুঃখ দূর করার জন্য জগদীশচন্দ্র শাসনকর্তার চাকরী নেবেন? পিতার কাছ থেকে পত্র পেলেন চরম নির্দেশ : "আমি জানলাম, আমি অপরের শাসক হব না, আমি শাসন করব শুধু নিজেকে ; বিদ্বান হতে হবে আমাকে, প্রশাসক নয়।"

ইংলণ্ড গিয়ে তিনি প্রথমে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কালাজ্বরে এমনই কাহিল হয়ে পড়েন যে, ডাক্তারী ছেড়ে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ১৮৮১-তে বৃত্তিসহ প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন তা গোড়ার দিকে নির্ধারণ করতে অসুবিধা হওয়ায় যত বেশী বিষয়ে সম্ভব ক্লাস করতে ও যত রকমের সম্ভব ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে থাকেন। এর ফলে ভবিষ্যতে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পদার্থ বিদ্যার দিকেই ঝোঁকেন লর্ড র‍্যালের উচ্চাঙ্গের শিক্ষাগুণে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভাইনস্‌ও তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁরা এঁর বিশেষ সহায়ক হন। জগদীশচন্দ্র প্রায় একই সঙ্গে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপস্' এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এসসি ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

সম্মানের সঙ্গে ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করে জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরছেন, তাঁর সামনে সফল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিশ্চয় উজ্জ্বল, বিশেষতঃ যখন বিখ্যাত উদারনৈতিক ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত অর্থনৈতিক অধ্যাপক Fawcet -এর সুপারিশপত্র রয়েছে। লর্ড রিপন স্বভাবসুলভ ঔদার্যের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে গ্রহণ করে তাঁকে যোগ্য চাকুরীর দেবার জন্য অবিলম্বে লিখে পাঠালেন ডি পি আই স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌টের কাছে।

এর পরেই জগদীশচন্দ্রের স্বর্গ হইতে বিদায়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন লর্ড রিপনের নির্দেশে। তিনি নিম্ন থেকে অনুরুদ্ধ হতে অভ্যস্ত, উপর থেকে আদিষ্ট হওয়া তাঁর খুবই অপছন্দ, বিশেষতঃ ব্যাপারটা যদি নেটিভ-সংক্রান্ত হয়। ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে কোনো চাকরি খালি নেই, তিনি জানালেন, তবে প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদানের পথ খোলা আছে। সে চাকরি নিতে জগদীশচন্দ্র অস্বীকার করলেন।

ব্যাপারটার ইতি সেখানেই হত যদি লর্ড রিপন ছাড়া অন্য কেউ ভারতের ভাইসরয় হতেন। চাকুরীপ্রাপ্তদের তালিকায় জগদীশচন্দ্রের উল্লেখ নেই দেখে তিনি প্রশ্ন করে পাঠালেন, এবং মহামান্য ভাইসরয়ের প্রশ্ন বলেই উত্তরে শিক্ষা-ডিরেক্টর অগত্যা তাকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে অস্থায়ী পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের চাকরি দিলেন।

ভারতীয়কে বাধ্য হয়ে চাকরি দিতে হয়েছে, এই অসম্মান ইংরাজের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্রের মাহিনা স্থায়ী বৃটিশ চাকুরিয়ার তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম, এবং পদ যেহেতু অস্থায়ী সেই কারণে মাহিনা স্বাভাবিকেরও

এক-তৃতীয়াংশ। জগদীশচন্দ্র কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু প্রতিবাদে মাইনে নিতে অস্বীকার করলেন, যখন তাঁদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা শোচনীয়তম।

পিতার ঋণশোধ উপযুক্ত পুত্রের কাছে তখন বড় সমস্যা। গ্রামের পৈতৃক ভবন তিনি বেচে দিলেন, পিতৃপিতামহের ভিটার প্রতি ভারতবর্ষীয় সংস্কারবন্ধন সবলে ছিন্ন করে। তার দ্বারা এক-তৃতীয়াংশ ঋণশোধ হল। পুত্র এইবার মায়ের অলঙ্কার ভিক্ষা করলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে আরও এক-তৃতীয়াংশ শোধ হল। স্তম্ভিত সম্মোহিত মহাজনেরা বললেন, আর প্রয়োজন নেই, যথেষ্ট শোধ হয়েছে। না, পুত্রের দেয় অংশটুকু বাকি ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর যুদ্ধজয় হয়েছে, তিন বছর চাকরির পরে তাঁকে প্রথমাবধি স্থায়ী বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং একসঙ্গে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই টাকায় অবশিষ্ট পিতৃঋণ শোধ করে জগদীশচন্দ্র জানালেন, পিতৃঋণ অপরিশোধ্য।*

চাকরি জীবনে সূচনা থেকেই জগদীশচন্দ্র দুইটি লড়াই আরম্ভ করেছেন। প্রথম, চাকরির ক্ষেত্রে ইংরাজ ও ভারতীয়ের যে-বৈষম্য তা দূর করবেন, দ্বিতীয়, প্রমাণ করবেন যে, ভারতীয়রাও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে, বৈজ্ঞানিক হতে পারে। ইংরেজ মহলে এর বিপরীত ধারণাই বলবৎ ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সি এইচ টনী ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক সমুন্নতি স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন (তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন), কিন্তু গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় যোগ্যতা স্বীকারে মোটেই রাজি ছিলেন না।†

বিলেতী ডিগ্রির সাহায্যে হয়ত বিজ্ঞান পড়ানোর অধিকার পাওয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। জগদীশচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানের শিক্ষক নয়, বৈজ্ঞানিক হতে

---

* বহু বছর পরে জগদীশচন্দ্র ফরিদপুরে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার বিষয় ছিল—'ব্যর্থতা—সুমহান!' পিতার বহু উদ্যমের অঙ্গাঙ্গি বহু ব্যর্থতার কথা বলবার পরে তিনি বলেছিলেন—

"ব্যর্থতা? হাঁ, কিন্তু অপমানজনক নয়, নিরর্থক নয়। তাঁর সংগ্রাম দেখে পুত্র সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে; এই কথাই সে বুঝেছে, কোনো কোনো পরাজয় জয়ের চেয়ে বড়। আমার কাছে তাঁর জীবন আশীর্বাদের, ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন কৃতজ্ঞ স্মরণের। প্রত্যেকেই বলেন, তিনি নিজ জীবনকে ধ্বংস করেছিলেন, আরও বড় কাজের যোগ্য ছিল তা। কিন্তু অল্প লোকই বোঝেন যে, অগণ্য জীবনের পঞ্জরাস্থির উপরেই মহাদেশ নির্মিত হয়। আর এমনই সব জীবনের ধ্বংসাবশেষের উপরেই ভাবী বৃহত্তর ভারত নির্মিত হবে। কেন এমনই হবে তা জানি না, শুধু এইটুকু জানি, ধরিত্রী-মাতা সর্বদাই বলি চাইছেন।" (গেডিস-লিখিত জীবনী)

† প্যাট্রিক গেডিস এ বিষয়ে লিখেছেন—

"There was also a strong doubt, not to say prejudice, against the capacity of an Indian to take any important position in science. Intellectual acuteness in Metaphysics and Languages had always been frankly acknowledged, but it was assumed that India had no aptitude for the exact methods of science. For science, therefore, India must look to the West for her teachers. This view was accepted by the Government, and so strongly maintained in the Education Department that when Bose was appointed Officiating Professor of Physics in the Presidency College, its Principal protested against this appointment on the above grounds."

চাইলেন। পঁয়ত্রিশতম জন্মদিনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'নূতন জ্ঞানের সন্ধানে এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত হবে।' তখন ভারতবর্ষের যা অবস্থা তাতে বৈজ্ঞানিক হতে চাইলেই তার সুযোগ পাওয়া যায় না। কলেজ-কর্তৃপক্ষ পড়ানোর চাকরি তাঁকে দিয়েছিলেন, সে কাজটা যাতে যথাসম্ভব করা হয় তার জন্য সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়ানোর দায় চাপিয়ে দিলেন! সেই কাজ সেরে তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা! তাছাড়া ল্যাবরেটরীর অবস্থা শোচনীয়। গবেষণার জন্য কোনো অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা নেই। অগত্যা নিজের পকেট ছিদ্র করে জগদীশচন্দ্র কুড়ি স্কোয়ার ফুট মাপের ল্যাবরেটরীতে আধুনিক ভারতের প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে লাগলেন।*

জগদীশচন্দ্রের প্রথম রিসার্চ হল—'হর্টজান ওয়েভ'-এর উপর। আলোকতরঙ্গের উপর ফ্যারাডের ফলিত গবেষণা, তার উপর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের, এবং তারপরে হর্টস্-এর কাজ যে-পথ উন্মুক্ত করেছিল, জগদীশচন্দ্র সেই পথেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণা-প্রাপ্ত ফলকে প্রকাশ করেছিলেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের বিজ্ঞান-পত্রে, মে, ১৮৯৫ সালে (paper "On the Polarisation of the Electric Ray") । এই পেপারটি 'ভারতে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছিল।' এর পরে জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় বিজ্ঞান-পত্র পাঠালেন লর্ড র‍্যালের কাছে, এবং সেটি 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হল ১৮৯৫ ডিসেম্বরে। তৃতীয় পত্রও লর্ড র‍্যালের সুপারিশে রয়াল সোসাইটি গ্রহণ করে প্রকাশ করল।

জগদীশচন্দ্র এইকালে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং টাউন হলে বেতারে বার্তা প্রেরণের পরীক্ষা দেখালেন সাফল্যের সঙ্গে। টাউন হলের সভায় লেফটন্যান্ট গভর্ণর উপস্থিত ছিলেন।†

---

* এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের মনোভাব তাঁর নিজের ভাষায়—

"কোনো ল্যাবরেটরী ছিল না, কোনো যন্ত্র-নির্মাতাও মিলত না। সবাই বলত, ভারতে কোনো মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার কাছে এই কথাটাই ঝলসে উঠেছিল—পুরুষমানুষ অবস্থাকে বিরূপ দেখলে তার সঙ্গে ঝগড়া করে না, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে মোকাবিলা করে, তার উপর আধিপত্য করে। তাছাড়া, আমরা সেই জাতির মানুষ, যে-জাতি সামান্য উপাদানে বৃহৎ বস্তু সম্পাদন করেছে।"

(শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

† "Now a new marvel was silently preparing to break upon the world—the application of Hertz's waves to wireless telegraphy, towards which Hertz seemed to have some prenominition and various later investigators were feeling their way, as notably Lodge, and above all Marcony. Bose himself had as early as 1895, in a public lecture in Calcutta, demonstrated the ability of the electric rays to travel from the lecture-room, and through an intervening room and passage, to a third room 75 feet distance from the radiator, thus passing through three solid walls on the way, as well as the body of the Chairman (who happened to be the Lieutenant-Governor)."

অধ্যাপক গেডিস এক্ষেত্রে এইসময় জগদীশচন্দ্র কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা বিশদভাবে বলেছেন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে যখন জগদীশচন্দ্র লণ্ডন থেকে ডি এসসি ডিগ্রি পেলেন এবং তাঁর গবেষণা লর্ড কেলভিন প্রমুখের সমূহ প্রশংসালাভ করল, তখন সরকারের কিছুটা টনক নড়ল, তাঁরা বাৎসরিক ২,৫০০্ টাকা অনুমোদন করলেন গবেষণা-কাজের জন্য।

লর্ড র‍্যালে ইতিমধ্যে ডঃ বসুকে ইউরোপ যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ডঃ বসু সরকারের স্বারস্থ হলেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। আমলাদের অসাড় কর্ণে সে আবেদন প্রতিহত হয়ে ফিরে এল, সেই অবস্থাতেই থাকত, যদি না আমলা-প্রধান গভর্ণর অগ্রণী হয়ে নিজ দায়িত্বে ডঃ বসুকে ইংলণ্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতেন।*[১]

'একালের কোনো ভারতবর্ষীয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায়' বেরিয়ে জগদীশচন্দ্র বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। লিভারপুলের ব্রিটিশ অ্যাসোশিয়েশনে বিদ্যুৎ তরঙ্গের উপর তাঁর প্রথম অভিভাষণ এমনই বৈদ্যুতিক হয়েছিল যে, বিখ্যাত পদার্থবিৎ লর্ড কেলভিন ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে ভারতে পূর্ণসজ্জিত বিজ্ঞানাগার স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে ভারত সচিবকে পত্র দিয়েছিলেন। 'টাইমস' পত্রিকায় রীতিমত প্রশংসা বেরিয়েছিল। রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পরে 'স্পেকটেটার' পত্রিকা তাদের অভ্যস্ত ভারত বিদ্বেষ পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য পরিহার করে এঁকে জ্ঞানতপস্বী ভারতীয় বিবেচনা করে ফেলেছিল,*[২] এবং ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী-সমাজ যুক্তভাবে বিজ্ঞানাগারের পক্ষে আবেদন জানিয়েছিলেন।*[৩+৪]

জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি ভারতের বিজয়ী বিজ্ঞানপুত্র।

---

*[১] লেফটন্যাণ্ট গভর্নর প্রথমাবধি ডঃ বসুর কাজের প্রতি শ্রদ্ধাপর। ডঃ বসু যখন দার্জিলিঙয়ে তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ড যাওয়ার ব্যাপারে দরবার করতে গিয়েছিলেন, তখন চমৎকার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। ডঃ বসু তাঁর কাছে এক বছরের 'ফার্লো' চাইলে গভর্নর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর আর্থিক সঙ্গতি এমন কী যে, তিনি এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইছেন? ডঃ বসু রুখে বলেছিলেন—সেক্ষেত্রে সরকার কি তাঁকে বৈজ্ঞানিক 'ডেপুটেশনে' পাঠাতে পারেন না? গভর্নর দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্ট কখনই নিছক শিক্ষা-গত ডেপুটেশনে রাজি হবে না। সেকথা শুনে জগদীশচন্দ্রকে কাজে-কাজেই কিছু সত্য কথা বলতে হয়েছিল : সিমলার এডুকেশন বোর্ড বড়ই দুঃখপ্রকাশ করে প্রস্তাব নিয়েছে, সরকারের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের পশ্চাদ্ধাবন কেউ করছে না!—জগদীশচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, সরকারের কাজে ও কথায় এত বৈষম্য কেন? বিজ্ঞানচর্চা না করলে সরকারের মর্মপীড়ন, করতে চাইলে শীতলতা! এতখানি সুবিনীত সত্যে অভ্যস্ত ছিলেন না গভর্নর, আলাপের সাঙ্গ সেখানেই হয়েছিল; ব্যর্থ জগদীশচন্দ্র পরদিন ট্রেনে উঠছেন কলকাতা যাবেন বলে—স্টেশনে তাঁর হাতে ডি পি আই-এর চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল, —সরকার ৬ মাসের 'ডেপুটেশন' অনুমোদন করেছেন, গভর্নর মহোদয় ব্যক্তিগত দায়িত্বে তাঁকে ইংলণ্ড পাঠাচ্ছেন, কারণ 'তাঁকে সাহায্য করা মানে পৃথিবীর বিজ্ঞানকে এগিয়ে দেওয়া।' অর্থাৎ দেখা গেল সবাই আমলা তবে কেউ কেউ আমলা নয়।

*[২] 'আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বাধিক জটিল শাখাসমূহে' এই 'সম্বংশজাত বাঙালী'র সহজ বিচরণে লণ্ডন স্পেকটেটার এমনই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল যে, ধাত্রী ভারতবর্ষ পর্যন্ত কিছু উচ্চ কথা শুনেছিল—

"The people of the East have just the burning imagination which could exhort a truth out of a mass of apparently disconnected facts; a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself, such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers; and a power of persistence—

---

it is something a little different from patience—such as hardly belongs to any European."

ধ্যানে অভ্যস্ত এশিয়ার সন্ন্যাসী-মন যদি বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তাহলে ভাবী পৃথিবীতে কী অসাধারণ ব্যাপার ঘটবে সে বিষয়ে সহর্ষ উদ্দীপনা প্রকাশ করে এই পত্রিকা লিখেছিল—

Nothing would seem laborious to him (Dr. Bose) in his enquiry, nothing insignificant, nothing painful, any more than it would seem to the true *Sanyasi* in the persuit of his enquiry into the ultimate relation of his own spirit to that of the Divine. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within that sphere of enquiry of a thousand men with the *Sanyasi* mind, the mind which utterly controls the body and can meditate and enquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment letting it be obscured by any terrestrial temptation."

*[৩] ভারতে ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন, অধ্যাপক ক্লিফটন, অধ্যাপক ফিটজিরাল্ড, ডঃ গ্লাডস্টোন, অধ্যাপক পর্নটিং, স্যার উইলিয়ম রামজে, স্যার গ্যাব্রিয়েল স্টোকস, অধ্যাপক সিলভেনাস টমসন, স্যার উইলিয়ম রুকার প্রভৃতি। প্রেসিডেন্সী কলেজে 'সুমহান সাম্রাজ্যের উপযুক্ত পদার্থবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী' স্থাপনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের এই আবেদনে বিচলিত ভারত সচিব ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্রটি সমর্থনসহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষেও সহানুভূতির অভাব ছিল না, ব্যাপারটির 'পরম গুরুত্ব' স্বীকৃত হয়েছিল এবং 'উপযুক্ত ভাবী মনোযোগের জন্য' সযত্নে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই সময়কার সহানুভূতিসম্পন্ন ভাইসরয় লর্ড এলগিনের পরে উদ্যমী লর্ড কার্জন এসে বিষয়টি সম্বন্ধে উদ্যোগী হয়ে চারজন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর কাছে মত চেয়ে পত্র দিলেন। দুই পদার্থবিজ্ঞানী বিশেষ সমর্থন করলেন, দুই শারীর-বিজ্ঞানী (যাঁরা জগদীশচন্দ্রের বিরোধীপক্ষের) বিরোধিতা করলেন। স্বদেশীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই লর্ড, ভোট সমভাগ হয়ে যাওয়ায় কাস্টিং-কর্মরূপে জগদীশ-চন্দ্রকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের দিল্লী দরবারে ও-বি-ই উপাধিতে ভূষিত করলেন!

*[৪] ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দেই যে জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিলেন না, তা বোঝা যায় বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্রিকা 'বোম্বে গেজেটে'র ৪ নভেম্বর, ১৮৯৬-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। যে-সরকার জগদীশচন্দ্রকে উপযুক্ত সাহায্য করছে না, ভারতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি সেই সরকারের মমত্ব যে কুম্ভীরাশ্রু—তা খুলে লিখেছিল পত্রিকাটি :

"Dr. J. C. Bose, the young Professor of Physical Science, at Calcutta, whose researches have filled Lord Kelvin with "wonder and admiration" has left London on a short visit to that illustrious man of science, and will afterwards proceed to the Continent with the object of inspecting the principal laboratories in foreign countries. All who have come in contact with him speak of Dr. Bose's modesty, and it is well that he possesses such a quality, otherwise his head might be turned by all the praise bestowed upon him by some of the greatest intellects in the United Kingdom. It will not surprise any-one to hear that Prof. Bose has been approached by more than one learned society anxious to include him amongst their

lecturers during the coming lecture season. Unfortunately his stay in Europe is very short and he may not be able to comply with those requests for other reasons connected with his work, he would like to remain a little longer. He is due in Calcutta shortly before Christmas, perhaps the most interesting and busiest part of the whole year for scientific works. He is meditating an application for an additional months leave. So reasonable a desire, ought, if possible to be gratified, but there is, we fear, sufficient, Philistinism in Whitehall to refuse any thing asked for in the name of science. And, yet, one of the most common complaints we hear is that the educated youth of India cares for nothing except the overcrowded profession of law and medicine. If the aspirations of Prof. Bose, and those who agree with him were fully realised, the industrial resources of India would be developed in a more systematic and scientific way that they are at present, and important new career offered to the graduates of our Indian Universities. It is to be hoped that he will have an opportunity before he returns to India of explaining how in his opinion the desired object may be attained."

অমৃতবাজার পত্রিকায় এই বৎসরেরই আর একটি মন্তব্যে (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) দেখা যায়, এলাহাবাদের জবরদস্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা পাইয়োনীয়ার, বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে পাঞ্জাব সরকার কোনো বিদায়ী ইংরাজ অধ্যাপকের পদে বসাবার প্রস্তাব করলে ঘৃণায় আঁতকে উঠেছিল। পায়োনীয়ারের এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের প্রতিবাদ করে মাদ্রাজ টাইমস যা লেখে অমৃতবাজার মন্তব্যসহ তা উদ্ধৃত করে :

"We certainly appreciate British scientists but with a Bengali scientist like Professor Bose knocking about—a man whom the whole world of science is delighting to honour, and whom British scientists are seeking to tempt to forshake Bengal, it is ridiculous to be making out that none but the European science professor can be the genuine article".

Dr. J. C. Bose, Bengali Professor of science at the Presidency College, Calcutta, is verily a giant among science professors, but one would imagine that the *Pioneer* had never heard of his existence. Our contemporary goes on to say that the new Bengali Professor is a disciple direct of Dr. Bose's and if his discipleship under such a teacher has been distinguished, which by the fact of the selection we may suppose to be the case, the Punjab Government may be congratulated on having secured his service."

প্রথম পর্ব : ১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯-এর জন্ন

বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের সাফল্য ও ভারতে উন্মাদনা

১৮৯৩ খৃীস্টাব্দের শেষভাগে চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব, সাফল্য, এবং তার ফলেই যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের উন্মেয় হয়—সমসাময়িক সাক্ষ্যের দ্বারা তা প্রমাণিত হতে পারে। তিরিশ বছর বয়সেই বিবেকানন্দ বিশ্ব-চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকায় দেড় বৎসর ধর্মপ্রচারের পরে তিনি ১৮৯৫ খৃীস্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য ইংলণ্ডে আসেন, তারপর আমেরিকায় ফিরে যান, পরের বৎসর আবার ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ডেও তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন, সেখানকার সংবাদপত্রে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে লন্ডন টাইমসের মত রক্ষণশীল কাগজও তাঁকে 'দুই গোলার্ধের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক' বলে উল্লেখ করে।

ঠিক এই সময়েই জগদীশচন্দ্রের নামও সংবাদপত্রে ও বিশেষজ্ঞমহলে বড়ো আকারে উল্লিখিত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে সন্ধান করার কালে আমরা জগদীশচন্দ্রের প্রচুর উল্লেখ লক্ষ্য করেছি। ১৮৯৫ খৃীস্টাব্দেই যে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-সাফল্য সংবাদপত্রের আলোচ্য বস্তু হয়েছিল, তা দেখতে পাই 'থিয়জফিস্ট' পত্রিকার নিম্নের মন্তব্যে—

"for the honour of India, let us all hope the rumour is true that Professor J. C. Bose, of the Bengal Presidency College, has made an original discovery which, if demonstrated to be all that is claimed for it, will place him in the front rank among modern scientists. It is said that Prof. Bose has been experimenting on the theory that the etheric waves may be used for telegraphing and all conducting wires dispensed with. It is alleged that he has achieved the result of sending signals of sound and light between two points with the help of ether only."

(১৬ মার্চ, ১৮৯৫-এর বেঙ্গলীতে উদ্ধৃত)

১৮৯৬ খৃীস্টাব্দে স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে আছেন, তখন জগদীশচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। লর্ড কেলভিন প্রমুখ ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা ভারতবর্ষে তখন আত্মশ্লাঘার কারণ ঘটাচ্ছে। তিলকের 'মারহাট্টা'র মত রাজনৈতিক পত্রিকা মন্তব্য করেছে—ইংরেজরা যেখানে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ঘা না খায়, সেখানে তারা গুণের সমাদরে অকুণ্ঠ।*

---

* মারহাট্টার ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৭-এর মূল্যবান মন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি—

PROF. BOSE'S TRIUMPHAL PROGRESS THROUGH EUROPE:

Every one will be sincerely glad to hear that Prof. Bose is winning golden opinions and receptions and honours wherever he is going in Europe. From the United Kingdom, Prof. Bose proceeded to Germany and from Germany he went by invitation to France. In the course of his triumphal progress he is delivering lectures to appreciative and learned audiences, and is being

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দকে ইংলণ্ডে ভারতের গৌরবের উপনিবেশ স্থাপনের বৎসর বলা যায়। এই বছর কুমার রণজিৎ সিংজী (রণজি) তাঁর ক্রিকেট দিয়ে প্রমাণ করেন, বিদেশীর পক্ষে ইংরেজকে তাদের জাতীয় খেলায় অতিক্রম করা সম্ভব। এই বৎসরই অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হন। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে প্রমাণ করেন এবং ভারতের সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে উদ্ঘাটিত করেন লণ্ডনের ড্রইংরুমে ও নানা সভাকক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতবর্ষীয়দের বিলেতী সংবর্ধনায় পরাধীন দেশের অপমানিত বিবেক স্বভাবতঃই কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল। দেশের পত্র-পত্রিকা এই সংক্রান্ত নানা মন্তব্যে পূর্ণ ছিল।* এক্ষেত্রে সমসাময়িক উন্মাদনার কারণ বোঝা যাবে লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের ৯ অক্টোবরের রচনা থেকে। সেটি 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটার' পত্রিকায় ১ নভেম্বর, ১৮৯৬-তে উদ্ধৃত হয়। এই রচনায় রনজিৎ সিংজী ও অতুল চ্যাটার্জী সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল তার কিছু অংশ—

"The head of the English cricket for the year, and the head of the India Civil Service Competition for the year are both Hindus. Mr. Chatterji's achievement is not less remarkable in the arena of intellectual athletics than is Prince Ranjitsinghji's in the world sport. Probably no career open to Englishmen exerts a more powerful attraction on the clever youth of our public schools and Universities than the India Civil Service and the competition for its appointments has been elaborated into the most searching test that the wit of the examiners can devise.

---

highly eulogised by the leading scientists of every country. Our readers are aware that he was even requested to reside in Scotland, and the request was made the most acceptable by a simultaneous offer of a well-equipped laboratory. The sincerity and warmth of the feelings of the English scientific world towards Prof. Bose shows that the fact of his being a foreigner, and what is more, one of the race of the ruled, does not come in the way of their appreciation and sympathy. The man of science in this respect offers a notable contrast to the man of politics at home. . . The man of politics takes stand on the narrow basis of the good of the country. . . The English politicians cannot but feel that the native of India with his aspirations for political eminence is a rival of himself. . . . These considerations of jealousy never or very rarely enter into the heart of men devoted to science. . . The honour which Dr. Bose or Dr. Bhandarkar before him got in the European countries can be explained. A native politician, of equal merit, cannot hope to command such treatment at the hands of the English people at home."

ইংরাজ রাজনীতিকদের চরিত্র সম্বন্ধে মারহাট্টা যা লিখেছে, তা প্রায় সর্বাংশে সত্য, কিন্তু ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের উদারতা সম্বন্ধে পত্রিকাটির সাধুবাদ সর্বথা সত্য নয়। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকরাও কি পরিমাণে ঈর্ষাকাতর ও স্বার্থপর, তা আমরা ক্রমে দেখব।

* এইসব মন্তব্যের কিছু কিছু *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে আমরা চয়ন করে দিয়েছি।

The distinguished academic careers of many of the 61 gentlemen who follow Mr. Chaterji in the list show the class of rivals among whom he has won the first place. . .

The service which Prince Ranjitsinghji has performed for India is not that he has proved one of his race to be capable of the highest achievement in our national sport but that the fact known to the whole English people. The few Englishmen who know the Indians well, readily admit that the Rajputs are brave at athletics, and the Brahmins clever at learning. But to the mass of your countrymen who pay get-money, Prince Ranjitsinghji's performances amount to a new discovery of India. It brings home to them the fact that among our fellow-subjects in Asia, these fellow-subjects whose very hundreds of millions turn them into numerical abstractions, there are men who can take the lead in the national sport which all Englishmen love and more or less understand. Prince Ranjitsinghji's victory has enabled the average Englishmen to realise India, and has made him respect Indians to a degree that no other triumph could have secured. But it merely is the crest of the wave of a movement which has long been going on in India, and which is then producing striking results. That movement is from the old pursuits of the East to the new pursuit of the West."

স্যার উইলিয়াম হাণ্টার ভারতে নবযুগোদয় দেখছিলেন, যেহেতু প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্ত্য পন্থায় পারদর্শী হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে এইকালে বাঙালী যুবক লেফটন্যান্ট সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিলের গৃহযুদ্ধের সময়ে যে বিরাট সাহস ও সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাও তাঁর উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ অর্জন করেছিল। অতঃপর জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম বলেন—

"Among the most interesting features at the British Association this year was the paper on Electrical Waves by Professor J. C. Bose. This gentleman, an M.A. of Cambridge, Doctor of Science of London, and a graduate of the Calcutta University, had already won the attention of the scientific world by his strikingly original researches on the polarisation of the electric ray. His later papers on the Indices of Electric Refraction and the Wave-length of Electric Radiation were published with high tributes, by the Royal Society. Lord Kelvin declared himself 'literally filled with wonder and admiration for so much success in these difficult and novel experimental problems.' The originality of the achievement is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as Professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct for himself his instruments as he went along. The paper which was read before the British Association the other day "On a Complete Apparatus for the Study of the Properties of Electric Waves" forms the outcome of this twofold line of labour—construction and research. Pro-

fessor Bose is not only an example of the change from the old philosophical and a prioré pursuits of learned Indians to the experimental science of the West, but he has also persuaded the Government to recognise that change. He has been deputed to visit the chief laboratories in Europe, with a view to forming a well-equipped laboratory in Calcutta for physical and electrical work. The position which Professor Bose has attained among British men of science, while himself still in the first energies of manhood is as significant as the successes of Prince Ranjitsinghji and Mr. Chatterji in their widely diverse fields of effort."

স্বামীজী ও ডঃ বসু একই কালে ইংলণ্ডে ছিলেন। প্রশ্ন উঠবে উভয়ে উভয়ের সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না? সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ পাইনি কিন্তু পারস্পরিক সচেতনতা ছিল তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ আছে। স্বামীজী সম্বন্ধে বিপুল আগ্রহের কথা জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার কাছে বলেছেন (কিছু পরেই তা দেখব), কিন্তু বিবেকানন্দ? আমাদের ধারণা, স্বামীজীও অপরপক্ষে ডঃ বসু সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন ছিলেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, বিবেকানন্দ ধর্মাচার্য হলেও স্বজাতির ঐহিক উন্নতির জন্য অতীব উদ্‌গ্রীব। স্যার উইলিয়ম হান্টার তাঁর রচনায় ভারতবর্ষীয়ের অতীন্দ্রিয় অভীপ্সাকে জাগতিক কৌতূহলের যেরকম বিরোধী ব্যাপার করে দাঁড় করিয়েছেন, তা করতে পেরেছেন বিবেকানন্দ-জাতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষদের সঙ্গে তার পরিচয়ের অভাব থেকেই। খেলাধূলা, ইতিহাস ও শিল্পচর্চা এবং বিজ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যগ্র মনোযোগের বিষয়ে তথ্যযোজনার স্থান এ নয়,—সে বিষয়ে প্রচুর তথ্য আছে—এখানে শুধু জানানো যায়, বিবেকানন্দের আদর্শ-ভারতবর্ষে বীরকর্ম এবং বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বিবেকানন্দের চোখের সামনে যে-ভারতবর্ষ ছিল, তা উকিল-ব্যারিস্টারে ভর্তি দেশ নয়, তা অধ্যাত্মসেবক ও জনসেবক, কর্মী ও বৈজ্ঞানিকের দেশ। স্বামীজী জানতেন, ভারতের পতনের মূলে ঐহিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা। ইহ-জ্ঞানে ঘাটতি থাকলে জাতীয় জীবনে সমতা আসবে না কখনো। তাছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, অধ্যাত্মজ্ঞানের মতই সত্যসন্ধানী, সুতরাং তিনি যখন জগদীশচন্দ্র নামক ভারতীয়ের মধ্যে বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় দেখলেন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাঁর গর্বের সীমা ছিল না, যদিও এবিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

কিন্তু অনুমান করবার উপযোগী কিছু উপাদান আছে বলেই বিশ্বাস করি। সংবাদপত্রে স্বামীজীর বিষয়ে তথ্যসন্ধানের কালে অতীব আকর্ষণীয় একটি সংবাদ আমাদের চোখে পড়ে। কেমব্রিজের 'ইণ্ডিয়ান মজলিস' রণজিৎ সিং ও অতুল চ্যাটার্জিকে সংবর্ধিত করার জন্য একটি সভার আয়োজন করে। এই সভার বিবরণ প্রকাশের পরে (সমগ্র বিবরণটির জন্য *Vivekananda in Indian Newspapers* দ্রষ্টব্য) অমৃতবাজার পত্রিকা ৮ জানুয়ারী, ১৮৯৭-তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলে—বড়ই দুঃখের বিষয়, ডঃ বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ঐ সভায় সংবর্ধিত করা হয়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য ঐ সভায় স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন।

কেমব্রিজের ইণ্ডিয়ান মজলিসের ঐ সভায় বক্তার পর বক্তা উঠে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলগানে সভাকক্ষ ঝঙ্কৃত করেছিলেন। বক্তাদের কণ্ঠ এক সুরে বাঁধা ছিল—

"It would be a poud day when India would be completely made one with England, one whole, one heart, one soul and one throne."

উচ্চ হর্ষধ্বনিতে ঐসব ভাষণ সংবর্ধিত হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ইংরাজেরা তৃপ্তির সঙ্গে ভারতীয়দের রাজানুগত্যের খাদ্য-পানীয় আস্বাদন করেছিলেন। ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ চলেছে; তা সত্ত্বেও যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের মানুষ শাসকদের প্রতি এই জাতীয় ভালবাসায় অভিভূত হতে পারে, তার থেকে তৃপ্তিকর কি থাকতে পারে?

বক্তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি। 'সাম্রাজ্যের স্বার্থই সর্বাগ্রে'—রণজির এই উক্তি সাম্রাজ্যবাদের শত্রু এই মানুষটির মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। অতুল চ্যাটার্জির ছিল ইতিহাসে পারদর্শিতা; স্বামীজী তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ভারতের যথার্থ ইতিহাস আপনি রচনা করুন—সে ইতিহাস অসুস্থ দাসত্ববোধের মধ্যে আত্মমর্যাদা আনবে। স্বামীজী গম্ভীরকণ্ঠে অধঃপতিত ভারতের উচ্চাঙ্গের রাজভক্তদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ভারতের এই পতনই শেষ কথা নয়, ভারত আবার উঠবে।

কিন্তু কাদের দ্বারা? নিশ্চয় তাঁদের দ্বারা, যাঁদের একজনের নাম জগদীশচন্দ্র বসু; সেই সভায় অনিমন্ত্রিত বা অনুপস্থিত সেই বৈজ্ঞানিকের কথা স্বামীজীর মনে না উঠে পারে না, যাঁকে ভবিষ্যতে মুক্ত অভিনন্দন জানাবার সুযোগ তিনি পাবেন।

নিবেদিতা—জগদীশচন্দ্র—বিবেকানন্দ—ওলি বুল

রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে নিবেদিতার উক্তি অনুযায়ী তিনি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ডঃ বসুর সঙ্গে পরিচিত হন।* পৃথিবীবিখ্যাত এক প্রতিভাকে কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে, তা দেখে তিনি শিহরিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় প্রতিভা—সত্যকার প্রতিভা—এতখানি দুর্দশায়! স্বভাবতঃই ভগিনী নিবেদিতার সহানুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, এবং আমরা সকলেই জানি, নিবেদিতা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি কিভাবে সম্ভব বুঝতেন না। অতঃপর জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবনে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, অন্য কোনো মানুষের সে ভূমিকা ছিল না। বর্তমান অংশে আমরা

* আত্মপ্রাণা বলেছেন, নিবেদিতা ভারতে আসার অব্যবহিত পরেই তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হয়। কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য নয়, অন্ততঃ নিবেদিতার উল্লিখিত পত্র অনুযায়ী।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের প্রথম পর্ব, ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে বসু-প্রসঙ্গ চয়ন করব। এই ৬ মাসকে একটি পর্ব করার কারণ এর পরেই নিবেদিতা য়ুরোপ যাত্রা করেছিলেন, বসুও য়ুরোপে গিয়েছিলেন, এবং প্যারিস কংগ্রেসে স্বামীজী, জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আদানপ্রদানের ফলে নূতনতর ভাব ও কর্মসম্পর্কের সূচনা হয়।

নিবেদিতার ভাবজীবনে আলোচ্য সময়ের গুরুত্ব আমরা বহুভাবে দেখে এসেছি। কর্মজীবনের পক্ষেও তা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কলকাতার শিক্ষিত সমাজে তাঁর এই কালের কার্যাবলীর দ্বারা অপূর্ব এক ইমেজ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বাগবাজার পল্লীতে তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, এবং লেডী অবলা বসুর সাক্ষ্য অনুযায়ী বুঝতে পারছি, তাঁর কাজের সাফল্য সম্বন্ধে সমস্ত সংশয়ের নিরাকরণ কিভাবে করেছিলেন। রক্ষণশীল বাগবাজারও ম্লেচ্ছ নিবেদিতাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। এই সময়েই তাঁর প্লেগ-সেবা (যার ইতিহাস আমরা পরবর্তী খণ্ডে উন্মোচন করব), যা স্তম্ভিত করেছিল জনগণকে এবং বিভ্রান্ত হয়েছিল আধুনিক কলকাতা যখন তিনি কালীবক্তৃতা করেছিলেন। কালীবক্তৃতার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। নিবেদিতার এই সর্বপ্রকার রূপকেই জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেসব বিষয়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া নিবেদিতা জেনেছেন। নিবেদিতার পত্র থেকে একদিকে যেমন আমরা স্বামীজী সম্বন্ধে ডঃ বসুর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি, অপরদিকে তেমনি আশাভঙ্গও, কারণ ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র তাঁর ধর্ম-সংস্কার অনুযায়ী কালীপূজা বা গুরুপূজাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। নিবেদিতার পত্রে সেইসব মানসিক সংঘাতের দলিল-চিত্র আমরা পাই। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র, এই দুই শ্রেষ্ঠ মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করায় নিবেদিতার আগ্রহ (নিবেদিতার ধারণা, সন্ন্যাস ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল), এবং দুই তীব্র প্রবাহের সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার গৌরবময় বেদনার অসাধারণ পরিচয় আমরা পত্রগুলি থেকে পেয়ে যাই।

এই সময়টি জগদীশচন্দ্রের জীবনে বড়ই সংকটকাল। সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর মুখের চেহারাটা তিনি এইকালেই ভালভাবে দেখতে পান। ইংরেজ সম্বন্ধে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়ের অভ্যস্ত শ্রদ্ধাবোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁকে জীবনে সংগ্রাম করে উঠতে হয়েছে, এবং কোনো কোনো ইংরেজের শত্রুতাও পূর্বে পেয়েছেন, কিন্তু সেটাকে জাতিগত আচরণ বলে মনে করার কারণ ঘটেনি—সাহায্য ও সহানুভূতি তো কম পাননি! প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরির যথাপ্রাপ্য সময়ে না পেলেও পরে পেয়েছেন, এবং ডিরক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন যেখানে বাধা দেন, সেখানে স্বয়ং ভাইসরয় বা লেফটন্যাণ্ট গভর্নর তো সাহায্য করেন! তাঁর বৈজ্ঞানিক পেপারগুলি ইংলণ্ডে বিপুল প্রশংসা পেয়েছে, এবং বৈজ্ঞানিক-সফরে যে সংবর্ধনা পেয়েছেন, তা যে-কোনো প্রত্যাশার অতীত। যখন ফিরে এসেছেন, সারা দেশ তাঁর জয়ধ্বনি দিয়েছে।

তারপরেই শুরু হয়েছে অন্তঃস্রোতের কুটিল বিপরীত গতি। ইংরেজ আমলাদের এবং কিছু ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের ঘৃণা ঈর্ষা ও পদে পদে বাধা দেওয়ার সে এক নারকীয় কাহিনী। 'পরাধীন দেশে জন্মানো যে কত বড় অভিশাপ', তা তিনি বুঝেছিলেন, এবং পরাধীন মনুষ্য হয়েও মাথা তুলে দাঁড়ানোর মত আত্মঘাতী

ঔদ্ধত্য যে নেই, তাও অনুভব করেছিলেন মর্মে মর্মে। নিবেদিতার চিঠিতে রয়েছে সেই আহত উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিভার বেদনাকরুণ চিত্র।

আর নিবেদিতা? 'মুহূর্তে জননী হলে হৃতভাগ্য দুর্গত জনের'।* জগদীশচন্দ্রের বেদনাভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন, সর্বপ্রকারে সেবার ব্রতও। নিবেদিতার ঐতিহাসিক ভূমিকার যবনিকা-পশ্চাতের রূপ দেখতে পাই যেখানে তিনি মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছেন। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, মিসেস ওলি বুল প্রতিভার ধাত্রী-জননী। ধনী ও সমজদার এই মহিলার উদার হস্ত সর্বদাই মহৎ ব্যক্তিত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে প্রসারিত। তাঁর সাহায্য পেলে জগদীশচন্দ্র সবিশেষ উপকৃত হবেন; তাঁর অর্থে গবেষণার সুবিধা হবে, তাঁর প্রতিপত্তিতে বিরোধী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজসাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা একটি কাজ করেছিলেন, যাকে সুমহান কৌশল বলা যায় : জগদীশচন্দ্রকে তিনি মিসেস বুলের পুত্র করে তুলতে চেয়েছিলেন। মিসেস বুলের জীবনের নিঃসঙ্গতার কারুণ্য নিবেদিতার মনে গভীরভাবে বেজেছিল ; তাঁর বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে কন্যা ওলিয়া শান্তি আনতে পারেনি। বিবেকানন্দ তাঁকে 'মা' বলেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এত বৃহৎ যে, সত্যই সর্বসময়ে তাঁকে সন্তান ভাবা যায় না। তিনি 'চাইল্ড' বটে, তবে 'হোলি চাইল্ড'। অপরপক্ষে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানতন্ময় সমাহিত রূপের প্রতি জাগতিক স্নেহ বোধ করা যায় ; নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে, জগদীশচন্দ্র যদি সন্তান-রূপে একবার গৃহীত হন, তাহলে মাতার সব কিছুতে সন্তানের অধিকার থাকবে। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র সত্যই মিসেস বুলের দ্বারা সন্তানরূপে গৃহীত হয়েছিলেন, এবং মিসেস বুলের দাক্ষিণ্য অজস্রধারে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল (সে ইতিহাস হায় সামান্যই লেখা হয়েছে), কিন্তু এই সমস্ত কিছুই অলক্ষ্যে থেকে ঘটিয়েছেন যিনি, তিনি কী অসাধারণ চরিত্রের মানুষ! নিবেদিতা মিসেস বুলকে বলেছিলেন, ভারতে তোমার একটি পুত্র আছে, যার স্নেহ চাই, সাহায্য চাই, তাকে পুত্র বলে তুমি গ্রহণ করো, আর জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, মিসেস বুলের মাতৃ-হৃদয় সন্তান চায়, তুমি তাঁকে মা বলে ডাকো।†

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৮৯৯ পর্যন্ত

৩ জানুয়ারী, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে—"আমার মঠযাত্রার কথা তোমাকে জানাতে চাই, স্বামীজীর ঘরের মিষ্টি ছোট্ট চায়ের টেবিলের কথা, পড়ানোর পরে যাতে বসে চা খেয়েছিলাম। আমার পড়ানো হিসাব—

> বুধবার তিনটেয় উদ্ভিদবিদ্যা ; চারটেয় অঙ্ক ; পাঁচটায় চা এবং 'হোম' ;
> শুক্রবার তিনটেয় শারীরবিজ্ঞান ; চারটেয় সেলাই ; পাঁচটায় চা এবং 'হোম'।

* নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট কবিতার ছত্র।

† এখানে উল্লেখযোগ্য, মিসেস বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মৌখিক পরিচয় ১৮৯৮-এর শেষভাগেই ঘটেছে।

'হোম' বলতে আজ স্বামীজীর সান্নিধ্য ; শুক্রবার—সেই প্রিয় বসুদের সঙ্গ, যাঁদের আমি নিতান্ত ভালবাসি।"

২১ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে : "ডার্লিং য়ুম, তুমি বলো যে, হিন্দু জাতির প্রতিনিধিরূপে দু' একজন হিন্দুকে ভালবাসব, তাই যথেষ্ট। কিন্তু কী অপূর্ব সব মানুষই না তারা সৃষ্টি করেছে! এখানি তিনজন মনুষ্য-দেবতার একটি দলকে পেয়ে গেছি—স্বরূপানন্দ, মিঃ পাদ্শা এবং ডঃ বসু।

এ'দের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে, তা ঠিকই করতে পারিনি। প্রত্যেককেই আমি সময়ান্তরে বন্দনা করি। তবে মিসেস বসু অধিকন্তু তাঁর স্বামীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে রয়েছেন, যেমন মিসেস অ্যাপেনন করেছেন। আবার ডঃ বসুর আত্মা অতি সুন্দর-সুকুমার, যে-বিশেষ গুণটির খানিক দেখেছি মিঃ অ্যাপেননের মধ্যে, খানিক মিঃ অলিভের মধ্যে, যার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে মনে হয় না। এক সন্ধ্যায় আমি বোকার মত বকবক করে শিকারীদলে যোগদান করব বলেছিলাম, যদিও জানতাম—ও জিনিস আমি করতে পারি এই চিন্তা তাঁকে ভয়ানক আঘাত করবে। অর্ধসচেতনভাবে আমি নিজের অবস্থা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছিলাম, আর তার ঘা তিনি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন—মুখ রাগে শাদা, প্রচণ্ড আবেগে শিহরিত—"এত নিষ্ঠুর কেন তুমি;"—চেঁচিয়ে উঠলেন—"অত সব সুন্দর সুন্দর জিনিস পড়ার কী ফল, যদি না **অন্তর দিয়ে** তা পড়ো?" এই বলে বারান্দায় চলে গেলেন ধূমপান করতে। এতে আমার চোখের উপরকার আবরণ যেন সরে গেল, দেখলাম কথাটা সত্য। **আমি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছি তাতে আমি আনন্দিত,** কারণ তার ফলে মানুষটির পূর্ণ মহত্ত্বের এই ঝলক দেখা গেল! সে অনুভূতি পরে ত্যাগ করেনি আমায়। শব্দ কত দীন! মুহূর্তটির কোনো আভাস তোমায় দিতে পেরেছি বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তুমি বুঝে নেবে। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল—এটা য়ুমের জন্য।*

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই তোমাকে গ্রাহাম ট্রাভেসের 'ফেলো ট্রাভলার্স' (ব্ল্যাকউড, এডিনবরা প্রকাশিত) জোগাড় করে নিতে বলতে হচ্ছে। এটি একটি ছোট গল্পের সংকলন ; এটিকে যাতে নিজের কাছে রাখি তার জন্য ডঃ বসু জেদ করেছেন, কারণ বইটি তাঁকে খুবই 'সাহায্য করেছে।' তুমিও নিশ্চয় বইটিকে ভালবাসবে।"

---

* শিকারের নিষ্ঠুরতার প্রতি ডঃ বসুর এই বিতৃষ্ণা কতদিনের? আমরা আগেই দেখেছি, আসামে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি শিকার করতে গিয়ে কালাজ্বর বাধিয়েছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহসের নানা কাজে তাঁর উৎসাহের কিছু বিবরণ প্যাট্রিক গেডিস দিয়েছেন। তাঁর শিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"His attendant, now an old Rajput Sepoy, taught the boy shooting; whence hunting expeditions as often as might be. A college vacation at nineteen culminated in a month in the Terai, with first experience of big game, and vivid impressions of jungle and forest. Then six months later came a fascinating invitation to a hunting holiday in Assam, from a friendly zemindar—a crack shot and distinguished hunter; and not only with wild buffalo in his forest, but rhinoceros."

১২ মার্চ, ম্যাকলাউডকে : "ডঃ বসু এমনিতেই হঠাৎ সেন্ট সারার কথা বলেন।"

১৫ মার্চ, ওলি বুলকে : "আমি তোমাকে ডঃ জে সি বসুর কথা, এবং তোমাকে তাঁর পত্র লেখার ইচ্ছার কথা জানাতে চাই। খুবই আশা করি, তুমি শীগগিরই তাঁকে ছোট্ট একটি চিঠি লিখে ফেলছ, সেইসঙ্গে মিস উইলকিনসের দুটি ছোট্ট বই পাঠাচ্ছি, যার কথা য়ুমকে আমি বলেছি, মনে হয় ডঃ বসু ও-ব্যাপারে লিখতে খুবই সঙ্কোচ বোধ করবেন। তিনি তোমার সম্বন্ধে সর্বদাই বলে থাকেন—'তুমি এমন একজন, যাঁর কাছে গভীর শোকের সময়ে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়।' সুতরাং আমি তাঁকে তোমার নরওয়ে-ভবনের অনেক কথা বললুম, তার আচ্ছাদিত আলোক এবং তার সঙ্গে জড়িত সুন্দর কিছু স্মৃতির কথা। জানি, ওগুলি তাঁর মনের উপরে শান্ত-সান্ত্বনার মত নামবে, কারণ উনি এখন দারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন। ওসব কথা বলেই আমি চলে গেলাম, কারণ ঐ সূত্রে যেসব ভাবনা জাগবে, তার সমাচ্ছন্ন অনুভূতিকে তুলনায় অল্প পবিত্র যে-কোনো জিনিসই ভেঙে দেবে।......

ডঃ বসুর প্রতি আমার ভালবাসা মিঃ অ্যাপারসনের প্রতি ভালবাসার তুল্য। অল্প সময়ই তাঁকে জানতে পেরেছি। আমার কালী-বক্তৃতার পর থেকে স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর তুল্য ব্যক্তির মনোভাব আমাকে বিশেষ দুঃখ দিয়েছে। এখন, তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যা বলো, তার যথার্থ মূল্য উদ্‌ঘাটিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এইসব জিনিসকে আমরা যে চোখে দেখি, তার থেকে ভিন্ন কোনো ধারায় তাঁর (বসুর) পক্ষে দেখা বস্তুতঃ কতখানি অসম্ভব, সেকথা যখন বললাম, তখন তাঁর বিভ্রান্ত ভাব দেখেই তা বুঝেছি। অন্য ক্ষেত্রে তিনি বিরাট পণ্ডিত, চিন্তাবিৎ, কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীর সঙ্গে তুলনায় তাঁর অবস্থা বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে তুলনায় অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অবস্থার তুল্য।

এসব ক্ষেত্রে কিভাবে কথা বলব বলো? খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে বেশী করে বলব, তার সর্বজনীন দিকটিকে প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করব কি? কারণ মনে হয় তুলনামূলক ধর্মের ব্যাপারটি সরাসরি উপস্থিত করা কার্যতঃ অর্থহীন।"

১৬ মার্চ, ম্যাকলাউডকে : "বসুদের কাছে আগামী সন্ধ্যায় না গিয়ে আজ সন্ধ্যায় যাব মনে করছি।......

একটি জিনিস চাই, মিস উইলকিনসের দুটি ক্ষুদ্র পুস্তক, বসুদের জন্য। তুমি বা লেডী সারা কি ভালবাসাসহ ওগুলি ৮৫ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতায় পাঠিয়ে দেবে? সেইসঙ্গে লেডী সারা যদি কিছু লেখেন, তাহলে বরফ গলবে।"

২৬ মার্চ, ওলি বুলকে : "আমি চাই, তুমি একথা জানো, আমি বসুদের কি রকম ভালোবাসি। **আমি অবশ্যই আশা করব যে, তুমি ডঃ বসুকে অন্তরে গ্রহণ করবে পুত্র বলে, কারণ তিনি সদাই তোমার কথা বলেন।**" (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

এই শিকারযাত্রার ফলেই কালাজ্বর ধরে, যা তাঁকে রীতিমত কষ্ট দেয়। এরই প্রতি-ক্রিয়ায় তাঁর শিকারে অপ্রীতি এসেছিল, কিংবা পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিশ্বাত্মবোধের ফলে তা হয়েছিল, কিংবা পুরুষের পক্ষে যাই হোক নারীর পক্ষে, বিশেষতঃ নিবেদিতার মত নারীর পক্ষে, শিকার অনুচিত—কিজন্য তিনি নিবেদিতার কথায় আঘাত পেয়েছিলেন বলা শক্ত।

৫ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : "এ সপ্তাহের বড় ঘটনা, ডঃ বসুর সঙ্গে শুক্রবার রাত্রে আমার কথাবার্তা। মানুষটিকে আমি ভালবাসি। বেশ কিছু তিক্ততার সঙ্গে তিনি বললেন, আমাকে মিস নোবলের বদলে সিস্টার নিবেদিতা বলতে তাঁকে যথেষ্ট আত্মশাসন করতে হয়েছে। অতঃপর আমাকে মানবিক কিছু ভাবতে তিনি অসমর্থ। বর্তমানে আমার ভয়ংকর সংকীর্ণতা তাঁকে অসহ্য আঘাত করে। (খুব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে ঘোরাফেরা করছে—যাঁকে আমি ভালবাসি ও বিশ্বাস করি এমন কেউ পূর্বে কি আমাকে 'সংকীর্ণ' মনে করেছে—তুমি বা সারা?)। আমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় বলবার জন্য তাঁকে মিষ্ট কথায় উস্‌কে দিলাম। তখন বেরিয়ে পড়ল। স্বামীজীর গুরুদেবের উপর দেবত্বারোপ।—"সংকীর্ণ ছাঁচে গড়া একটি মানুষ, যিনি নারীকে প্রায় শয়তানী মনে করতেন, যে-কারণে নারী দেখলে মূর্চ্ছা যেতেন!!!" শুনেছ এমন কথা! আঁতকে ও হেসে ওঠার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আমি বললাম, ও-বর্ণনা মেনে নিতে পারি না। স্বীকার করলাম, আমিও পূজা করি অন্ধভাবেই, তবে আমাদের কেউই তাঁর পূজা অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে চান না—স্বামীজী তো ননই। ও-পূজাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।—"ভারতের বর্তমান প্রয়োজন এমন ধর্ম, যা সকলকে আলিঙ্গন করবে, সকল সম্প্রদায়কে একত্র করবে, অবতারবাদ তা পূরণে অসমর্থ" ইত্যাদি। (বিচিত্র! আমার কাছে উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ও-জিনিসটিই একমাত্র উপায়, সম্প্রদায়ের শেষ জানাবার জন্য একজন অবতারেরই প্রয়োজন)। অবতারতত্ত্বে যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি স্বরূপানন্দের মত তাঁকে অবতার বলবেন না।—"এর দ্বারা নূতন ধর্মের উদয় প্রমাণিত হয় না।" আমি বললাম, কেউ তা চাইছে না। সংঘের সামনে এই যে অল্প কিছু শিক্ষামূলক কাজ রয়েছে, তার বেশী কেউ পরিকল্পনা করছে না বা করতে ব্যস্ত নয়। পূজার প্রশ্ন বা ধর্মের ব্যাপারটা ভবিষ্যৎই ইচ্ছামত ঠিক করবে (আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম, তাঁরা ইতিমধ্যে যা করেছেন তাই যথেষ্ট)। তারপর তিনি জানালেন, কী বিরাট শিহরণের সঙ্গে তিনি স্বামীজীর উক্তি শুনেছিলেন—"আমার জীবনোদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা", এবং একই শিহরণের সঙ্গে ইংলণ্ডে থাকতে স্বামীজীর কলকাতা-ভাষণগুলি পড়েছিলেন, দেখেছিলেন, মানবের যথার্থ কল্যাণ ও সত্যের জন্য কী গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে নিজের জনপ্রিয়তা ছিঁড়ে টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর যখন তিনি দেখলেন, নিজ গুরুপূজায় এবং অন্যান্য ব্যাপারে (যথা আমার কালীপূজা) উনি অগ্রসর তখন যাতনার সঙ্গে পিছিয়ে গেলেন। যে-মানুষ ছিলেন বীর, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন নতুন সম্প্রদায়ের ব্যাপারী!......

আমি তর্ক করতে পারতাম, কিন্তু ভাবলাম, তার সময় এখনো আসেনি। পরিবর্তে আমি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ পত্র লিখলাম, তাতে জোর দিয়ে বললাম, তাঁরা যদি আমাদের ক্ষেত্রে না পারেন, তাহলেও আমি যেন তাঁদের দেশপ্রেমের সমাদর করি। উভয় দলেরই প্রয়োজন আছে, তা স্বতঃস্পষ্ট, ইত্যাদি। একটি মিষ্ট উত্তর এল। এক্ষেত্রে এই পর্যন্ত।......

......প্রিয় বন্ধু মিঃ ঘোষ (গিরিশ ঘোষ) বলেন, ডাঃ বসু শীঘ্রই আমাদের একজন হয়ে যাবেন, কারণ তিনি উদাসীন নন।"

৮ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : "এখন তোমাকে অনেক কিছু বলতে ও তোমার দৈবী সাহায্য পেতে চাইছি। গতকাল বসুদের সঙ্গে কাটিয়েছি, সমস্ত দিনটিই ; এ যেন তোমার কাছে বালীতে, যেন প্রায় বেলুড়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। কারণ, যে বসুকে আমি ভালবাসি, পেতে চাই—তিনি আমারই। কী বিরাট! কী সরল! আর কী যন্ত্রণাসহন! যন্ত্রণাসহনের ক্ষেত্রে আমার নিজের অধৈর্যকে আমি কিভাবে না ঘৃণা করেছি যখন দেখলাম—যথার্থ বিরাট মানুষের মুখের কাছে তিক্ততায় ভরা জীবন-পাত্র। শুধু সুখী হওয়া কী সামান্য!—যদিও নিম-এর কথায় অপূর্ব সত্যতা রয়েছে—'উজ্জ্বল হওয়া অতীব ঐশ্বরিক ব্যাপার।' গতকাল বারান্দায় যে-কাহিনী তিনি বলেছেন, উৎকর্ণ বাতাসের কাছেও তার পুনরুচ্চারণ করলে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে। ইউরোপ থেকে গৌরবোচ্ছ্বাস নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় সহকর্মীদের আচরণে জাতি-পার্থক্যের বোধ যে-বৈষম্য ঘটিয়েছিল তার বিষয়ে অল্প উল্লেখ করে তিনি শেষ করেছিলেন, সে জিনিসটা তাঁর কাজের সমস্ত প্রাণ যেন শুষে নিয়েছে, 'কারণ, তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না ভালবাসা পাওয়া আমার পক্ষে কতখানি প্রয়োজন'। এসব কথা যদি তোমাকে জানাই, তোমার দিব্যভাবে তুমি ব্যাপারটাকে বুঝবে, যদিও কখনই তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করবে না। এই দুটি মানুষের কাছে কিভাবে লিখতে হয় তুমি জানো—মিস উইলকিনসের বই দুটি (তার একটা মোটামুটি রোমান্স এবং দূরাগত সঙ্গীতের মাধুর্যসিক্ত) বা অন্য ছোটখাট জিনিস পাঠিয়ে, তাদের বন্ধুত্ব প্রাপ্তিতে তোমার প্রীতি ও গৌরব-বোধের কথা লিখে—কি করতে হবে সে তো তুমি জানোই। তুমি শুনলে সত্যই গর্ববোধ করবে : জনৈক ইংরেজ (একেবারে গোপনীয় কথা) অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে বললেন (ইংরেজটি সম্বন্ধে আমি গর্বিত, কিন্তু তাঁর মনের লড়াইটা যে দরকার হল তার জন্য লজ্জিত)—'একদিন ভাইসরয় এঁর জুতোর ফিতে খুলে দেবেন, যদি ইনি যেভাবে আরম্ভ করেছেন সেভাবে চালিয়ে যেতে পারেন।'

না করে পারলাম না—নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে যতখানি ভালবাসা ও সাহস ঢেলে দেওয়া যায় ততখানি দিয়ে তা ভরালাম, এবং তার উপরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ঠিকানা লিখলাম, যাতে আগামীকাল সকালে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশের পথে সেটি পান। আমি লিখেছি—'আমার বন্ধুত্ব তোমার ও সেণ্ট সারার বন্ধুত্বেরই অভিব্যক্তি এবং রাজার (স্বামীজীর) ভালবাসার ও গর্বের প্রকাশ ; এর যোগ্য আপনি।' তুমিও, আমি তোমাকে বলেছি এই ভাব না দেখিয়ে তাঁকে আশা ও উৎসাহ-ঝঙ্কৃত কিছু শব্দ লিখে পাঠাতে পারো, ওগো আমার প্রিয় শক্তিমতী য়ুম! সারার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাতের প্রয়োজন নেই। তিনি (বসু) তো তাঁকে লিখতে ও তাঁর কাছ থেকে লেখা পেতে প্রাণান্ত-ব্যাকুল। গতকাল আমাকে তিনি বলেছেন, আমি যেন তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না জানিয়ে কদাপি সারাকে পত্র লিখি, কেননা তার স্রোত সদাই প্রবাহিত।'"

৯ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : [প্লেগ সেবার ব্যাপারে একেবারে প্রাণের ঝুঁকি নিতে নিবেদিতাকে স্বামীজী নিষেধ করেছিলেন।] "কিন্তু প্রিয় ডঃ বসু আমি চালিয়ে যাইনি বলে মর্মপীড়িত, এবং সেকথা খোলাখুলি বলবার সুযোগ তাঁকে

দিতে পেরেছি বলে গর্বিত, আত্মসমর্থনের চেষ্টা প্রায় করিনি, নিজের বিবেকের খোঁচা এড়াতে পেরেছি এমন গর্ব যে এখনো বোধ করতে পারছি না!*......

গত সপ্তাহে তোমাকে যা লিখেছি, ডঃ বসুর সেইসব কথা, খুঁটিনাটি পর্যন্ত (স্বামীজীর গুরুপূজা, সম্প্রদায়-পত্তন) স্বামীজীকে বললাম। তিনি বললেন, "তথাপি 'খোকাটি' তিন দিন ধরে আমাকে প্রায় পূজা করেছে—এক সপ্তাহের মধ্যে সে আমাদের লোক হয় উঠবে।" আমি বললাম, "হাঁ, সত্যই পূজা করেন" (প্রিয় য়ুম, কী গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আত্মসংযমের সঙ্গে সেই অপরূপ পূজা নিবেদিত, তা যদি জানতে!)। রাজা বললেন, "ঠিক! আর এরাই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে হৈ চৈ করে। এরা নিজেদের চেনে না। যা নিয়ে তাদের অন্তঃসংঘাত, অপরকে তাই করতে দেখলে তাদের ঘৃণা করে!" হঠাৎ আলোক। মহারাজাধিরাজ (য়ুরোপে) যাত্রা করার আগে যদি আমার বসুকে একবার মঠে নিয়ে যেতে পারি, যদি—যদি—যদি—শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ তুলে চান—যদি না চানও তবু এক সুন্দর দিবসে তাঁর বিষয়ে এই ডায়াগনোসিস তাঁকে আমি জানিয়ে দেবই।......

তারপর—স্বামীজী বিশেষ ধরনের মাছ রাঁধবেন সুতরাং মধ্যাহ্ন ভোজনে আমি আসব কি? এর সমাপ্তি সেখান থেকে সোজা প্রত্যাবর্তন এবং বসুদের ওখানে গমন।......সুতরাং দেখছ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহায্য করছেন। ওঁরা শ্মশানঘাটের কাছে সম্ভবতঃ দেড়টা নাগাদ আমার সঙ্গে মিলিত হবেন।......

বুধবার সন্ধ্যা। আমরা একত্র হয়েছিলাম। বসুদের ভালবাসি। ওখানে (মঠে) তাদের নিয়ে যেতে খুবই আনন্দ পেয়েছি। রাজাও সেই নিজস্ব প্রিয় স্বভাবে, একটু কণ্ঠ-বিকারের ভাবে; আসল কথা তিনি সত্যই ভাল নেই; লক্ষ্য করলাম প্রায়ই বুকে হাত বুলোচ্ছেন।......

মিসেস বসু এবং আমি সারা মাঠ হেঁটে জলের ধারে আমাদের সেই ঘাসে ঢাকা ঢালু জমিতে বসলাম। মিসেস বসুকে বললাম, আমাদের মধ্যে তুমি (ম্যাকলাউড) আছো অদৃশ্য রূপে, যখনি ওখানে যাই তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে যাওয়া-আসা কর। সুতরাং তুমি, এবং মিসেস বুল, যিনি প্রিয় ডঃ বসুর বিশেষ পূজামন্দির,—বিস্মৃত হওনি—হওনা কখনই।"

১৯ এপ্রিল, ওলি বুলকে: "য়ুমকে এই লিখছিলাম, কিভাবে গত রবিবার বসুদের সঙ্গে কাটিয়েছি। একেবারে স্বর্গীয়। এই প্রথম আমার প্রিয় ডঃ বসুর পূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছে অন্তর, আর পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ভারতস্থ ইংরাজদের লজ্জার বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

---

* প্লেগ সেবার ব্যাপারটি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। কিন্তু প্লেগ-ব্যাপারটি তখন কী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা এর অল্পদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশ-চন্দ্রের পত্র থেকে পাই—

"উপরের ঠিকানা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি পলাতক—প্লেগের অনুগ্রহে। আমার একজন ভৃত্য ছুটি লইয়া একদিন বড়বাজারে গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া একদিন পরেই প্লেগ হয়। আর ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু। বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া উক্ত ঠিকানায় (১৩৯ ধর্মতলা স্ট্রীট) আছি—কতদিন পলায়ন জানি না।"

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩)

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলে সব কথা বলতে পারব, কিন্তু এখন মোটেই নয়। এমনকি তাঁর শেষ কথাগুলিও উদ্ধৃত করা সঙ্গত হবে কি না সন্দেহ (কিংবা, তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে বলা সঙ্গত নয়!)—"ভালবাসা পাওয়া আমার পক্ষে কতখানি দরকার তা বলে বোঝাতে পারব না।"

অনবদ্য তিনি—কিভাবে এবং কেন—আমি না বললেও তুমি জানো। ইউরোপে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের জন্য সহকর্মীদের ভালবাসা ও সহানুভূতি হারাতে পারেন, যা পেয়ে এসেছেন যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত। 'আমি কি করে তাদের কাছে গিয়ে জানাবো যে, এর ফলে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটেনি? **তুমি** জানো, আমার ওধরনের কোনো অভিমান নেই।' মনোনিবেশের যে বিশেষ শক্তি তাঁর কাজকে এত বিরাট করে তুলেছে, তার জন্যই তাঁর পক্ষে ঐ ব্যবধান বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ফলে তাঁর কাজের উৎসাহ হারিয়ে যাচ্ছে, বাকি যা-কিছু, প্রিয় গ্র্যানী, তুমি জানই। **তোমার প্রতি ওঁর পুত্রের ভালবাসা** (ও'র ভালবাসা ও শ্রদ্ধা না জানিয়ে আমি যেন কদাপি তোমাকে চিঠি না লিখি, একথা আমাকে বলেছেন, কারণ তা সদাই প্রবহমাণ), **ওঁকে নিশ্চয় তুমি চিঠি লিখবে এবং পুত্র বলে গ্রহণ করবে।** কি করে বিরাট মানুষকে বিরাট কাজ করাতে হয়, তাতো তুমি জানই। এই মানুষটির মধ্যে তার নিজস্ব মধুর ও নিখুঁত রূপে যে মহিমা রয়েছে, তার থেকে বৃহত্তর মহিমা তুমি কখনো দেখনি, আমি জানি তুমি তা পরে বলবেই। জীবন এ'র কাছে বোঝা। তবু সাধুতার সঙ্গে তাকে ধরে আছেনই, শুধু তাঁর দেশবাসীর কাছে এইটুকু প্রমাণ করবার জন্য—প্রয়োগবিজ্ঞানে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা ইউরোপীয়দের তুল্যই বিরাট।

সারা সপ্তাহ ধরে ঐ অনুভূতি আমার হৃদয়ের মধ্যে কিভাবে বর্তমান ছিল কল্পনা করো। তারই মধ্যে এক ঘণ্টা আগে পত্র-সংলগ্ন ঔদ্ধত্যটি যখন পড়লাম, তখন আমার মনোভাব কি হতে পারে বুঝে দেখ। (নিবেদিতা সে রকম কিছু একটা লেখা নিশ্চয় পাঠিয়েছিলেন, যা আমরা পাইনি।) মানুষের উপর কতখানি অসম্মান আমরা চাপিয়ে দিতে পারি তারি নিষ্ঠুরতায় শুধু কেঁদেছি আমি।

এখানকার যে ক্ষুদ্র ইংরাজ সমাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে সেখানেও যখন ডঃ বসুর নাম উল্লিখিত হয়েছে তখন দু'একবার কঠিন গলায় বলতে হয়েছে—'এই মানুষটি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন।' তার মানে নয় যে, কোনো কিছু তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বলার ভঙ্গি? ওঁর দোষ কোথায়? তা আর কিছু নয়, উনি উল্লিখিত হবার যোগ্য! কিন্তু অমন ভালবাসবার, সহ্য করার, বহন করার শক্তি আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না। অথচ সব কিছুকেই নিজের মধ্যে পুরে রাখতে হচ্ছে, প্রকাশ করা যাচ্ছে না—মূক যন্ত্রণানুভূতি—ভয়ঙ্কর! উন্মোচন তাঁর ভবিতব্য নয়, সহনই ভবিতব্য। এখন আমি সম্পূর্ণ অন্য জিনিসের কথা ভাবছি—যার বিষয়ে তিনি বলেছেন।

তাঁকে আমার অগ্নিময় চিঠির একটি পাঠিয়েছি, য়ুমকে বলেছি সেকথা, মনে হয় সে বিষয়ে শুনে তুমি হাসবে,—তাতে বলেছি : যে-বন্ধুত্ব তাঁর উপরে এত অনুপযুক্তভাবে আমি অর্পণ করেছি, তার মধ্যে আছে তোমার, য়ুমের ও স্বামীজীর গর্ব ও বিশ্বাস, তাঁর প্রতি।"

২৫ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : "রাজা গতকাল আসেননি। কাল ছিল পূর্ণিমা। তিনি সারারাত দুটি সন্ন্যাস-অনুষ্ঠানের জন্য ধ্যানে কাটিয়েছেন। আর কেউই আসেনি। সুতরাং বসুদের সঙ্গে একলা একটি মধুর সন্ধ্যা কাটানোর গভীর আনন্দ উপভোগ করলাম। ওঃ য়ুম, সেখানে আমার পূজা ও ভালবাসা কতখানি! মানুষটিকে কখনো কখনো এত পুণ্যাত্মা মনে হয়—যেন তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়! শনিবার ওঁরা দু'মাসের জন্য বাইরে গেলেন। সুতরাং শুক্রবার রাত্রে বিদায় জানালাম। কিন্তু—নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠুরতা—পুনশ্চ নিষ্ঠুরতা আর নীচতা—বিজেতাদের। ডার্লিং য়ুম, তোমার বিরাট স্বর্গীয় হৃদয়কে আমি জানি, নচেৎ যে-জিনিসের সঙ্গে তুমি বিশেষ জড়িত নও, সে সম্বন্ধে বলে তোমাকে ক্লান্ত করে তুলতে সাহস করতাম না। কিন্তু হায়, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষকে' যদি যোগ করে দেওয়া যায় বিরাট কাজের শ্রান্তির সঙ্গে, সেইসঙ্গে আবহাওয়াঘটিত শারীরিক অবসাদ কিভাবে একজন ঋষি-মনীষীকে নিজ জীবনকে ঘৃণা করতে প্রণোদিত করে, তা কি বুঝতে পারো? জানো কি, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ" কথাটার মধ্যে অবজ্ঞা এবং অপমান জড়িত আছে! দেখতে পাচ্ছি, ইনি একদা ইংলন্ডের যে মস্ত চাকরি প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন, তার জন্য যেন অনুতপ্ত। মনে হচ্ছে—ক্ষমতা ও নীচতা তার জঘন্যতম কাজে সফল হয় বুঝি! আমি গত রাত্রে মিসেস বসুকে তাগিদ দিয়েছি, তিনি যেন চাকরির অন্য অফার সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কারণ যদি একটা অফারও পান, নিন বা ছেড়ে দিন, তা তাঁকে স্বাধীনতার ভাব ফিরিয়ে দেবে, পরিত্রাণের মত হয়ে দাঁড়াবে। আর তুমি কি মনে কর, পৃথিবীর এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে তাঁর ধরনের কাজ মহাগৌরবের সামগ্রী বিবেচিত হবে না?"

২৬ এপ্রিল, ওলি বুলকে : "তোমার বিষয়ে তোমার নতুন সন্তানের গতরাত্রের উক্তি—(তুমি) সেই আত্মা 'যা শান্তি বিকীর্ণ করে।'......

বসুদের কাছে গতরাত্রে আবার গিয়েছিলাম। একটা পার্টি হবার কথা ছিল, সাদা ফ্রক পরেছিলাম, সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু মধুর সজ্জা, যার কিছু অংশ এই সপ্তাহে লন্ডন থেকে এসেছে তুমি জানো। কিন্তু পার্টি হয়নি, তাতে আমি খুশি। পূর্ণিমা, গাছের তলায় আমরা বসেছিলাম। এতই পূত পরিবেশ যে, এক-এক সময় কথা কওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু কী বেদনা! বলো, **কেন** এই বিরাট আত্মাকে পীড়ন করে মেরে ফেলা হবে? কাপুরুষতা, স্বেচ্ছাকৃত অবজ্ঞা এবং অপ্রয়োজনে অসুবিধা সৃষ্টি। ইংলন্ডে তিনি যে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন, তার জন্য তাঁর স্ত্রী তিক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন; আমি অনুনয় করে বললাম, তাঁর (ডঃ বসুর) ক্ষোভ করা উচিত হবে না, নচেৎ মানুষের জীবন যে দুষ্ট লোকের শিকার হয়ে দাঁড়াবে, হয়ে দাঁড়াবে নিষ্ফল সংগ্রামের ক্ষেত্র! কিন্তু আমি মিসেস বসুকে তাগিদ দিয়েছি, যদি পারেন ওঁর জন্য নতুন চাকরির অফার সংগ্রহ করুন, কারণ এই মুহূর্তে যদি তিনি বিকল্প কিছু পেয়ে যান, তাহলে জীবনের নৈতিক স্বাধীনতা পুনশ্চ ফিরে পাবেন।......ইংলন্ডে শেষ যে ৯ মাস কাটিয়েছেন, সারাক্ষণ কাজ করেছেন, রবিবারও বাদ নয়, এমন বেগে যে

বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারে অসচেতন, ফলে সব কিছু মিশিয়ে ফেলতেন, সংবাদ, খাদ্য, ছোট জিনিস, বড় জিনিস। বৈজ্ঞানিক সত্য দর্শনের দিব্য ভাবাবেশ। তার পরেই ফিরে এলেন এই ধীর ধারাবাহিক ক্লেশবিদ্ধ জীবনের মধ্যে। গ্ল্যানী, আমি আমার স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করি। তাহলে তারা এত নীচ!

উনি এখন আর কাজ করতে পারেন না। আকাশ গুঁড়িয়ে গেছে, ঢুকতে হয়েছে বদ্ধ কূপে। তবু—একটিও তিক্ত কথা নয়— সর্বদা সেই বেদনাহত বিস্ময়; এই কথাটাই মনে জাগছে তাঁর—নিশ্চয় এটা প্রাপ্য; সর্বদা মনে করার চেষ্টা : এ তো ইংলণ্ডের যোগ্য নয়, ইংরেজ চরিত্রের অনুরূপ নয়!

তোমার মনে পড়ে, আমি কিভাবে স্বামীজীকে বলেছিলাম—আমি কখনো ইংরেজের পতাকাকে নমিত করতে পারব না? কিন্তু আর আমি ইংরেজের পতাকার সঙ্গে একাত্ম হতে পারব না। আমার পক্ষে আকাশে ওড়া যেমন অসম্ভব, এও তেমনি। দেখতে পাচ্ছি, এদেশে ইংরেজের প্রতিপত্তির দিন এখনো শেষ হয়নি—কবে সেদিন আসবে, **সমস্ত মানপ্রাণ দিয়ে** তাই চাইছি। প্রার্থনা করি, পুনর্জন্ম নিয়ে একদিন যেন ধ্বনি তুলতে পারি—"জয় তরুণ ভারত"—যেদিন আমাদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় আসবে—যেমন করে ইতালীর স্বাধীনতার দিন-গুলিতে ম্যাজিনির পাশে ধ্বনি ওঠাতে পারত তরুণতম, ব্যগ্রতম নবদলভুক্তেরা!

তোমাকে এই চিঠি লিখতে লিখতে যেন তোমারই কাছ থেকে পাওয়া একটি চিন্তা আমার মাথায় উঠেছে—আমি মিঃ মোহিনীর কাছে গিয়ে তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়ে তাঁকে দিয়ে মিঃ পাদশাকে চিঠি লেখাব এবং মিঃ পাদশার কাছ থেকে আমার বন্ধুর জন্য একটি উৎসাহসূচক উষ্ণ পত্র আদায় করে নেব, যাতে ভবিষ্যতের কথা, পরিকল্পনাদির কথা থাকবে, এবং ভারতের জন্য তাঁর (বসুর) দায়িত্বের কথা। এটা উপরপড়া কাজ হবে না, হবে কি, যদি মিঃ মোহিনী সাহায্য করতে স্বীকৃত হন! আমি জানি, তুমি অনুভব করবে যে, এতে কোনো ক্ষতি হবে না যদি এই ধরনের মানুষের মারফত তা করানো যায়। ইতিমধ্যে বলে নিই, আর কোনো বন্ধুত্ব থেকে আমি দুটি জিনিসের এহেন উপলব্ধি পাইনি—

এক, আমার মাতৃত্বের অনুভব ইত্যাদি, যা তুমি বুঝবে, এবং,

দুই, স্বেচ্ছায় নিম্নতর হওয়ার আনন্দ, যাতে অন্যের বিরাটত্ব ও ভালোত্ব উপভোগ করতে পারি। 'আমি চিনি হতে চাইনে মন, চিনি খেতে ভালবাসি।'

গতরাত্রে তিনি আমাকে একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর বন্ধুত্বের সমগ্র রূপকে প্রকাশিত করে। তিনি বলেছিলেন—

"আমি তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করেছি, যে-সীমায় তুমি হয়ত এখনো পৌঁছতে পারনি। কিন্তু আমাকে আশা করতেই হবে, একদিন তুমি সেখানে পৌঁছবে।"

সুমহান ব্যাপার নয়কি? প্রশস্তির নামে **প্রার্থনা!**

এখন এ বিষয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, কারণ তোমার হৃদয়ে উঠে গেছে বিষয়টি, যেমন আমার হৃদয়ে—এবং তুমি, য়ুম ও আমি মিলে এই দুইজনের চারিপাশে শক্তি ও প্রেমের উত্তপ্ত পরিমণ্ডলী রচনা করব, যাতে পৃথিবীতে এই কথাটাই বজায় থাকে—এখানে এখনো আশ্রয় আছে।

১ মে, ম্যাকলাউডকে : "লাঞ্চের সময়ে তাঁকে (স্বামীজীকে) ডঃ বসুর বিষয়ে অনেক কিছু বললাম। তাঁকে ঐ সন্ধ্যায় বিদায়সম্ভাষণ জানানোর কথা ছিল। স্বামীজী এত মধুর ও সহানুভূতিপর! গোপন রাখতে হবে এই ইঙ্গিত করে তাঁকে (স্বামীজীকে) একটা বিষয়ে বললাম—"একথাটা আপনার কাছে বলছি যেমন পাদরীর কাছে লোকে বলে (কনফেশন রূপে)", তাতে তিনি বললেন, "না না, এখানে ওসব কনফেশনের ভাব রাখার দরকার নেই, আমরা এখন দেশপ্রেমিক হিসাবেই কথা বলছি।"

পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ন্যাসিনী হবার যোগ্যতার জন্য আমাকে কী ধরনের নিখুঁত আচরণ করতে হবে বলুন? 'তুমি যেভাবে আছ সেইভাবেই থাক,'—তিনি দ্রুত বলে ঐ বিষয়ে আমার অভিপ্রায়ের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে বার করবার চেষ্টা করলাম, আমার ঘুরে বেড়ানো, নানা জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা তাঁর চোখে অপরাধ কি না, যেটা আমার নিজের চোখেই অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে। তিনি খোলাভাবে জানালেন, না, তা নয়। সুতরাং আমি সেই সন্ধ্যায় বসুদের বললাম, যতদিন তাঁরা চাইবেন আমি শুক্রবার-শুক্রবার আসছি।......

শনিবার কিন্তু তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখা গেল। চায়ের পরে তিনি আমাকে নিয়ে বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়ালেন।......ডঃ বসুর প্রশ্ন উঠল। তিনি কঠিনতম এক মনোভাবে ফেটে পড়লেন।—গৃহীর মুক্তি নেই। যদি সাহস থাকে, একথা যেন তাঁকে জানিয়ে দিই। তাঁকে বলো, যদি বিরাট কোনো ত্যাগ না করেন, তাহলে কখনই শক্তিশালী হবেন না। বিয়ে—জঘন্য!......এখন তিনি সেইসব সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দন লাভ করতে আরম্ভ করছেন যাতে তাঁর খাদ্য যারা স্পর্শ করেছে তাদের মনের চেহারা বুঝতে পারছেন।......অমুক অমুক কেন বিয়ে করল? এই মুহূর্তেও ঐ ধরনের মানুষের সংস্পর্শের জন্য শারীরিক কষ্ট অনুভব করছেন। তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। তা যদি নাও হয়, তবু আপোষ তিনি একেবারে ছেড়েছেন। আলমোড়ায় চলে যাবেন, ধ্যানে ডুবে থাকবেন। পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়বেন—চুরমার করে দেবে এমন সত্য প্রচার করবেন। মানুষের মধ্যে গিয়ে বলা যে, তারা ঠিক পথে আছে—এই মিথ্যের চমৎকার মজা কিছু সময়ের জন্য চলে, কিন্তু মিথ্যে মিথ্যেই। তারা ত্যাগ করুক। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ কর।

তারপর অতি শান্তভাবে বললেন, 'মার্গট, এসব এখন তুমি বুঝবে না, কিন্তু আরও অগ্রসর হলে বুঝবে। এই জিনিসকে বিশ্বাস করবার মত করে আমাকে মানুষ করা হয়েছে।'

আমি ভয় পেলাম—তিনি পাছে আরও উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুতরাং আমি একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সুন্দর গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলাম, এবং তিনি মিঃ মোহিনীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর প্রায় ফিসফিসানির স্বরে বিদায় জানিয়ে আমরা চলে এলাম।

তাঁর অধিকাংশ কথার উগ্রতা ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিকতা সত্ত্বেও তুমি জানো কী পবিত্র ও সঘন সেই মুড! আর, আমার যে-বন্ধুর উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তাঁকে যখন জানাবার সময় আসবে তখন আমার সাহসের অভাব হবে না। কিন্তু

আমার যেন মনে হয়, ও-বার্তা কিয়দংশে পেঁাছে গেছে। আমি বিশ্বাস করি না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ মানুষটির মত একজনকে প্রত্যক্ষে বলেন না।......ব্রাহ্মরা কি সত্যই তাঁকে ভালবাসে না।*......

ডঃ বসু চলে যাবার পরে আমি নিজেকে বলেছিলাম, তাঁদের অনুপস্থিতিতে আমি ব্যক্তিগত কিছু করব না, শুধু করব নৈর্ব্যক্তিক বিষয়, এবং আমি প্রবন্ধ লেখার কাজ তুলে নিলাম।......

ডঃ বসু চান, আমি ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করি। আমাকে ও-বিষয়ে চেষ্টা করতেই হবে।......

ডার্লিং য়ুম, ডঃ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে যে-সব অপ্রকাশিত এবং অপ্রকাশ্য চিন্তা আমার মনে জেগেছে—ভারত বিষয়েই—তার সবগুলি যদি তোমাকে বলতে পারতাম! মনে হয় সেগুলি একটা বইয়ে বা ঐ জাতীয় কিছুতে ধরা পড়বে।"

২ মে, নেল হ্যামণ্ডকে : "কী সব বন্ধুই না মানুষ পায় এখানে! একজন বিরাট মানুষ—যাঁর থেকে বিরাটতর কাউকে জেনেছি কি না সন্দেহ—আমাকে কোন্ প্রশস্তি করেছেন বল দিকি?—শোনো—খুবই কোমল কণ্ঠে বলতে হবে, তা এমনই পবিত্র—

'আমি তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করেছি, যে-সীমায় তুমি হয়ত এখনো পেঁাছতে পারনি, কিন্তু আমাকে এ আশা অন্ততঃ করতে হবে—একদিন তুমি সেখানে পেঁাছবেই।'"

৮ মে, ম্যাকলাউডকে : "বসুরা পথিমধ্যে। যাবার আগে তাঁরা বলেছেন, আমি যেন তাঁদের 'শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা পাঠিয়ে দিই আমার য়ুমকে।' আমি সানন্দে রাজি, এই অনুমান করে যে, য়ুমও তার শ্রেষ্ঠ **ভালবাসা** পাঠিয়ে দেবে ওঁদের।......

এক সন্ধ্যায় বসুদের সঙ্গে তোমার বিষয়ে কথা বলবার সময়ে আমি খুবই আমোদ বোধ করেছিলাম; কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, তোমার ভালোত্বে আমি ঈর্ষাতুর। এই কথায় ডঃ বসু আঘাত পান—এমনই তোমার ভালোত্ব!......

মিঃ স্টেড যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছেন, কি সুন্দর সেগুলি : 'যে আসন

---

* গৃহীদের মুক্তি নেই—স্বামীজীর এই ধরনের আগ্নেয় ঝলক সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক' কিন্তু অপূর্ব আধ্যাত্মিক। স্বামীজী বড় ত্যাগ চেয়েছেন ডঃ বসুর কাছে। আর নিবেদিতা চেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা পেঁাছে যাক তাঁর কাছে। এসব ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করতে আমরা চাই না, শুধু জানাবো, জগদীশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে সত্যই ত্যাগ করেছেন, ত্যাগের বজ্রকে নিজের প্রতীক করেছিলেন। এবং দাম্পত্য-জীবনে, প্যাট্রিক গেডিসের জীবনী থেকে এই বিচিত্র তথ্য পাচ্ছি (যে-জীবনী স্বয়ং ডঃ বসুর অনুমোদিত)—তিনি শেষ পর্যায়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে গেছেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা পেঁাছেছিল। গেডিস লিখেছেন—

"The advantages of celibacy to the intellectual life have so long been urged and acted on in East and West alike that it is as well that those whose experience and career have had the yet higher advantages of wedlock at its best should also bear their testimony."



লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম ভাষণ দিচ্ছেন।

SATURDAY NEW YORK EVENING JOURNAL. MAY 27. 1911.

VEDANTA PHILOSOPHY DEFENDED BY ELLA WHEELER WILCOX

By ELLA WHEELER WILCOX.

The sensational statements made in the will contest case of Mrs. Ole Bull regarding the teachings of vedanta are most misleading and unjust to that great philosophy. It was my privilege to be a pupil of Swami Vivekananda during his two Winters in New York.

This I regard as the greatest intellectual and spiritual opportunity of my life. Neither in the lectures of Vivekananda, his books or the vedanta philosophy are to be found any of the "wierd" "uncanny" or unwholesome teachings related by the witnesses as a part of Mrs. Bull's "lessons." The breathing exercises, inhaling, retention of the breath and exhaling, using a word which means God, are a part of vedanta teaching.

The very first physical act of a new born child is to breathe a long breath. After a few years children, especially in our Western world, cease to breathe deep breaths, because they wear restricting garments, and live indoors, and sit and stand with indrawn chest. In the Orient the morning devotions are begun with breathing exercises. Therefore, tuberculosis and catarrhal troubles are the least prevalent of all maladies in India. Vivekananda repeatedly warned his pupils against excesses in these exercises. Properly practised, they produce physical, mental and spiritual strength. Overdone, they produce disaster. Precisely as the right use of the X and violet rays cure disease, and the wrong use kill, or as a tonic may stimulate digestion, and too much tonic may induce indigestion.

DIRE INFLUENCE CONTROLLED HER SAID MRS. BULL

Alfred, Me., May 27.—Pretty Miss Siri Edith Swanander, of No. 629 Madison street, Brooklyn, was the star witness in the suit to break Mrs. Ole Bull's will, brought by Mrs. Olea Bull Vaughn, her daughter. Her testimony is of record to-day.

Miss Swanander is of Norwegian extraction. She teaches school, but lives with her mother in Brooklyn. It was at the Swanander house that Mrs. Bull passed several of the last weeks of her life. Miss Swanander testified:

"Mrs. Bull said to me that the night Edwina Vaughn died, in 1902, she was with Swami Vivekananda in India and that Swami came to her and told her that Ole Bull had made him his son when Edwina died."

She also said that at Greenacre last year Mrs. Bull said to her: "Swami Vivekananda came to me from the spirit land. He stood by my couch under an apple or cherry tree in full bloom. He spoke to me and said, 'I have sent Siri to take care of you.'

"Edwina, my granddaughter, also came to me from that land. She came in a pink radiance and comforted me."

Spoke of Malign Influence.

Swami Vivekananda

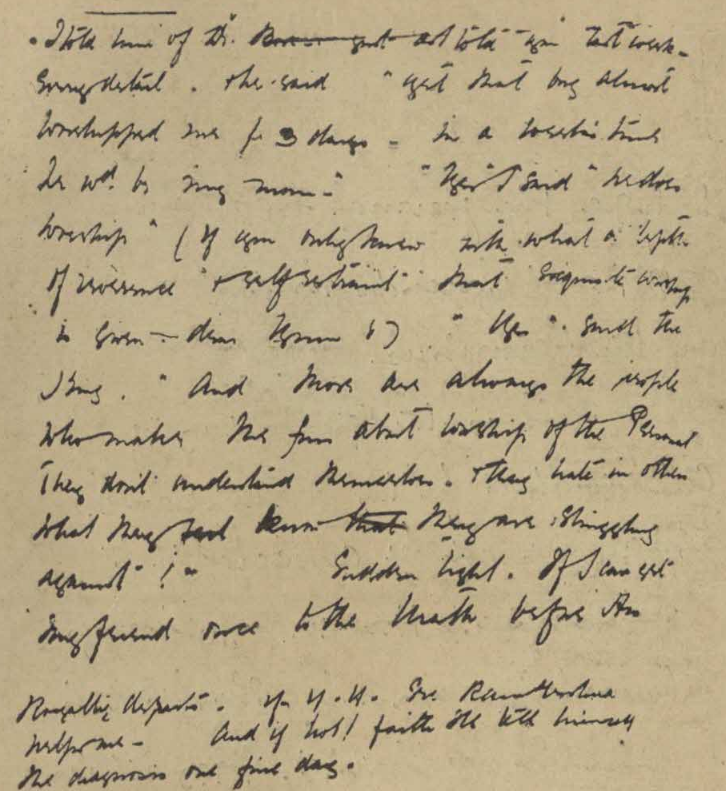


He is the teacher of the Vedanta philosophy, of which, it is alleged, Mrs. Ole Bull was a follower.

Mrs. Abbie N. Shapleigh had undergone a steady change.

Reference to the late Professor William James, of Harvard, and [illegible] Swami, [illegible]

আমেরিকান সংবাদপত্রে মিসেস ওলি বুলের উইলের মামলার সংবাদ। গ্রন্থের ৭১৪-৭১৫, ৭১৮-৭২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



মতপার্থক্য সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র স্বামীজীকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন, যা প্রায় পূজার পর্যায়ে উঠত, নিবেদিতার ৯।৪।৯৯ তারিখের এই চিঠি থেকে তা বোঝা যায়।

I told him of Dr. Bose—just as I told you last week—every detail, and he said, "Yet that boy almost worshipped me for 3 days—in a week's time he would be my man". "Yes", I said, "he does worship" (if you only knew with what a depth of reverence and self-restraint that exquisite worship is given, dear Yum!). "Yes", said the King, "And those are always the people who make the fuss about worship of the Personal. They don't understand themselves, and they hate in other what they had know they are struggling against!" Sudden light. If I can get my friend once to the Math before His Rayalty (Swamiji) departs—if if if—Sri Ramakrishna helps me—and if not, faith I'll tell himself the diagnosis one fine day.

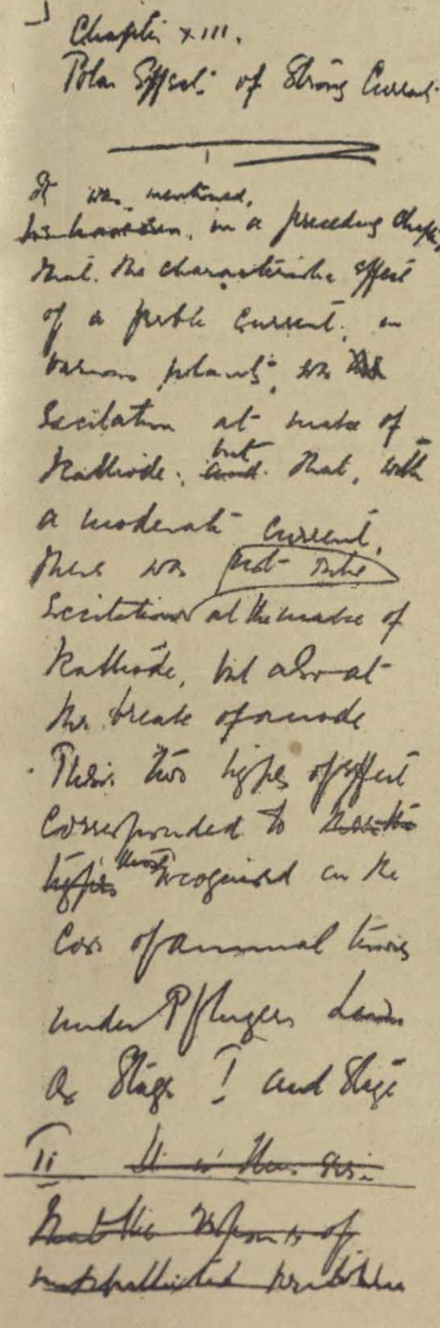
Friday
16th Oct. 1908

I hope the journey has been easy, and friends met you at the terminus.

This is the great day of Consecration for the Motherland. May we all be consecrated to her service! How many blessings have filled our life. The heart is filled to overflowing. May all the loved ones be in His safe keeping; God bless you and protect you always.

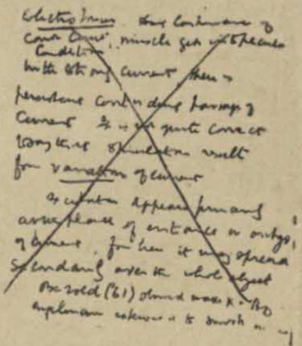


নিবেদিতাকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র। লক্ষণীয়—পত্রে সম্বোধন নেই—পত্র-শেষে স্বাক্ষরও নেই।—গ্রন্থের ৭৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

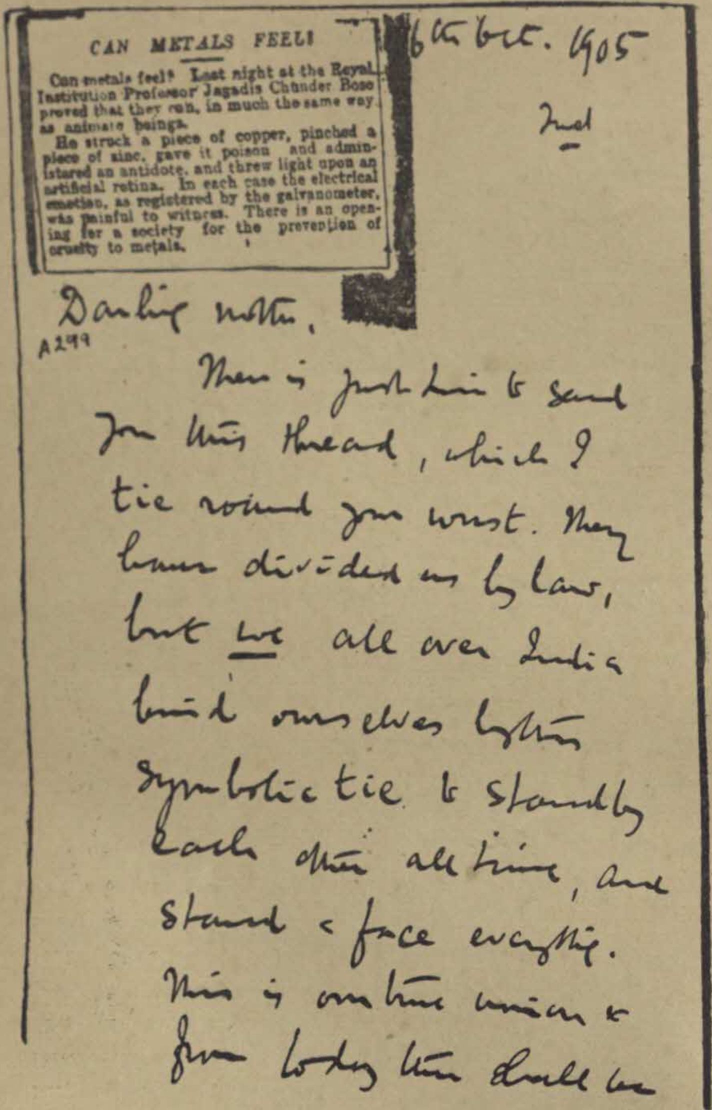


Chapter XIII.
Polar Effect of Strong Current.

It was mentioned, in a preceding chapter, that the characteristic effect of a feeble current on various plants is the excitation at make of Kathode; but that, with a moderate current, there was not only excitation at the make of Kathode, but also at the break of anode. These two types of effect corresponded to those recognised in the case of animal tissue under Pfluger's Law as Stage I and Stage II



জগদীশচন্দ্রের 'আবিষ্কার' এবং নিবেদিতার 'রচনা'—এ বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হল—হস্তাক্ষর নিবেদিতার। এই পৃষ্ঠাটির উল্টো দিকে ডঃ বসু কয়েক লাইন লিখে কেটে দিয়েছিলেন। সেটিরও ছবি দেওয়া হল।



CAN METALS FEEL?

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadis Chunder Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poison and administered an antidote, and threw light upon an artificial retina. In each case the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was painful to witness. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.

6th Oct. 1905

2nd

Darling mother,

A299

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by law, but we all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand & face everything. This is our true union & from today there shall be

বাংলা দেশের এক মহাপুণ্য দিনে জগদীশচন্দ্র এই চিঠিটি মিসেস বুলকে লিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখীবন্ধন দিবসে এটি লেখা। এক ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক হিসাবে পত্রটির বিশেষ মূল্য আছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন বলে সমালোচিত জগদীশচন্দ্রের হৃদয়-মন দেশাত্মবোধে কতখানি পূর্ণ ছিল, এই পত্রে তার পরিচয় আছে।—গ্রন্থের ৬৮৫ ও ৬৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

the beginning of new national life. We have turned back on ~~three~~ religion as strangers we for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters.

Yours affectionately

N. is just Don

packing off the fo Mrs for book her love heartfull. Please direct the enclosed

SAMUEL T. D. JONES
COUNSELOR AT LAW
60 WALL STREET
NEW YORK

June 30th, 1911.

Miss Josephine MacLeoud,
12 Bruton Street,
London, England.

My dear Madam:

At the request of Mr. Whitmarsh I am writing you regarding the appointment of an administrator upon the will of Swami Vivekannanda, Deceased. On the 12th day of April I sent a letter to Miss Noble setting forth the situation, a copy of which letter I enclose you herewith. Mr. Whitmarsh heard in response to this that Miss Noble was to cable him as to what their desires were but he has not as yet received word from her and suggested that I write you in the hope that you will possibly get in touch with the necessary people and he would thus get a definite response which would enable him to proceed with the appointment of public administrator. There is a possibility of the public administrator's consenting to waive his right in favor of Mr. Whitmarsh but we cannot be sure of that as yet.

Hoping that I may hear from you I beg to remain,

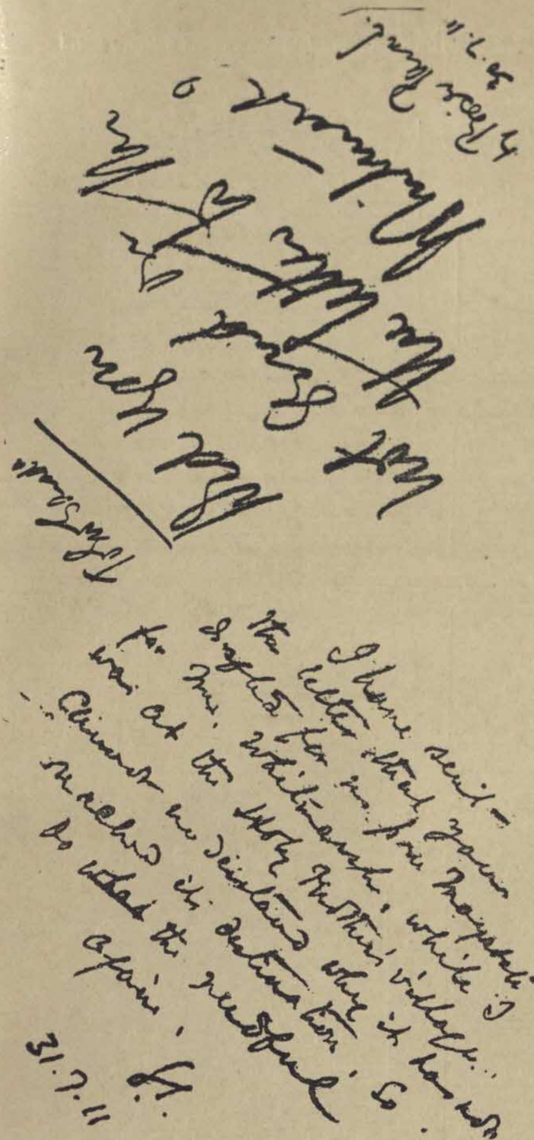
Very respectfully yours,

Samuel T. D. Jones

This has just come - Tra - Do try to ask what is necessary. to get this finished will you? Then have Mr. Whitmarsh appointed. Perhaps you have already done this.

স্যামুয়েল টি ডি জোনস, 'কাউন্সেলার অ্যাট ল'-কর্তৃক মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর উইল সংক্রান্ত একটি চিঠির প্রতিলিপি। চিঠিটির উপর মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা এবং স্বামী সারদানন্দ নিজ নিজ বক্তব্য লিখে দিয়েছেন। ম্যাকলাউড লিখেছিলেন—

"This has just come [?] *so* try to get what is necessary, to get this finished, will you? And have Mr. Whitmarsh appointed. Perhaps you *have* already done this.



নিবেদিতা লেখেন—

To Sw. Sarda. Did you not send on the letter to Mr. Whitmarsh?

from Bose Para Lane. 30.7.11

স্বামী সারদানন্দ লেখেন—

I have sent the letter that you drafted for us from Mayabati for Mr. Whitmarsh, while. I was at the Holy Mother's village. Cannot understand why it has not reached its destination. So do the needful again.

S.S. 31.7.11.

নিবেদিতার দেহান্তের পরে ইংলণ্ডের ডেইলী নিউজ, টাইমস এবং ভারতবর্ষের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শোকসংবাদ—

26 : 10 : 11 Daily News

MARGARET NOBLE.

A Tribute to a Remarkable Career.

(By S. K. Ratcliffe.)

News comes by a private cablegram from Darjeeling, in the Himalayas, that Miss Margaret Noble (known throughout India as Sister Nivedita) died there a few days ago, after a short illness. The announcement will bring profound grief to a large number of English and American people, to whom Miss Noble was known alike by her books and her vivid personality. It would be true to say that no Englishwoman has ever made for herself a similar place in the affections of the Indian people, or has tried to do the work to which she put her hand.

Irish by birth and family, the daughter of a Nonconformist minister, Margaret Noble was known in London twenty years ago as perhaps the most eager and brilliant member of a group of new educationists who, among other things, founded the Sesame Club. In the middle of the nineties she met the Swami Vivekananda, the first real missionary of Indian religion in the West. He had made a dramatic appearance at the Chicago Parliament of Religions two years before, had been astonishingly successful in his tour of the United States, and in 1895 was lecturing in London.

Margaret Noble became the most devoted of his followers, and in 1898 she went out to India to assist in the educational work of the Ramakrishna Brotherhood, of which Vivekananda was the head. She became, under the name of Sister Nivedita, an unattached member of the order, and began in her small house in Northern Calcutta a school for Hindu girls and classes for Hindu women—her aim being to provide modernised instruction on the firm basis of Eastern feeling and ideals. She lived with extreme simplicity entirely among Indians. Her name became known far and wide; there were few Indians of distinction unknown to her; she identified herself with their culture and thoughts, and as a consequence her influence was incalculable. To Young Bengal she was an inspiration, for there can be no doubt it was through her words, spoken and written, that the ideal of Indian nationality grew to be a living and absorbing force.

Not on its metaphysical side, but in its vital social relations, Margaret Noble was a constant and intense student of Indian thought. Some years ago she spoke frequently to audiences large and small in many cities of India, and her power of speech was a wonderful thing. In later years, when fever had destroyed her fine physique, she was content to use her pen—for the most part in the Indian monthly reviews. To readers in the West she is known chiefly through her most ambitious book, "The Web of Indian Life" (which by no means reveals her full powers), or through the "Cradle Tales of Hinduism," published three years ago. She contributed a paper on "The Present Position of Woman" to the proceedings of the Universal Races Congress held in London last July. She was forty-four years of age, and to many of us her death means the passing of a rare intelligence and of a dauntless and most beautiful soul.

MISS MARGARET NOBLE.

A private telegram from Darjeeling announces the death on October 28, at the age of 44, of Miss Margaret E. Noble, widely known in India as Sister Nivedita, of the Order of Ramakrishna-Vivekananda. A correspondent writes :—

"Miss Noble occupied a remarkable position among the Englishwomen who have thrown in their lot with the Indian people. She was of Irish parentage and birth, the daughter of a Congregational minister, the late Rev. S. R. Noble. A trained teacher of exceptional gifts, she was one of a group of educationists who in the early nineties founded the Sesame Club. In 1895 she came under the influence of the Swami Vivekananda, who was then lecturing on Indian religion and philosophy in London, and in 1898 went out to India for the purpose of opening a school for Hindu girls in connexion with the Ramakrishna Mission, of which Vivekananda was the head. Taking a small house in the northern quarter of Calcutta, and living in the simplest Indian style, Sister Nivedita grew to exercise, partly through her classes for Hindu girls and women and more through her writings and addresses, a wide influence in India. Her house was visited by leading Indians from every province, and there were few English or Americans of distinction passing through Calcutta who did not make a point of seeing her.

"In 1904 she published 'The Web of Indian Life,' and three years later a volume of 'Cradle Tales of Hinduism.' Last year her record of the life and teachings of Swami Vivekananda appeared under the title of 'The Master as I Saw Him,' and latterly she was engaged in preparing the Swami's lectures and letters for publication."

The Times

Thurs. Oct 26th 1911

NOBLE.—On the 13th Oct., at Darjeeling, MARGARET NOBLE (SISTER NIVEDITA), eldest daughter of the late Rev. S. Richmond Noble.

For "Hospital Nurses" see foot of 2nd Column.

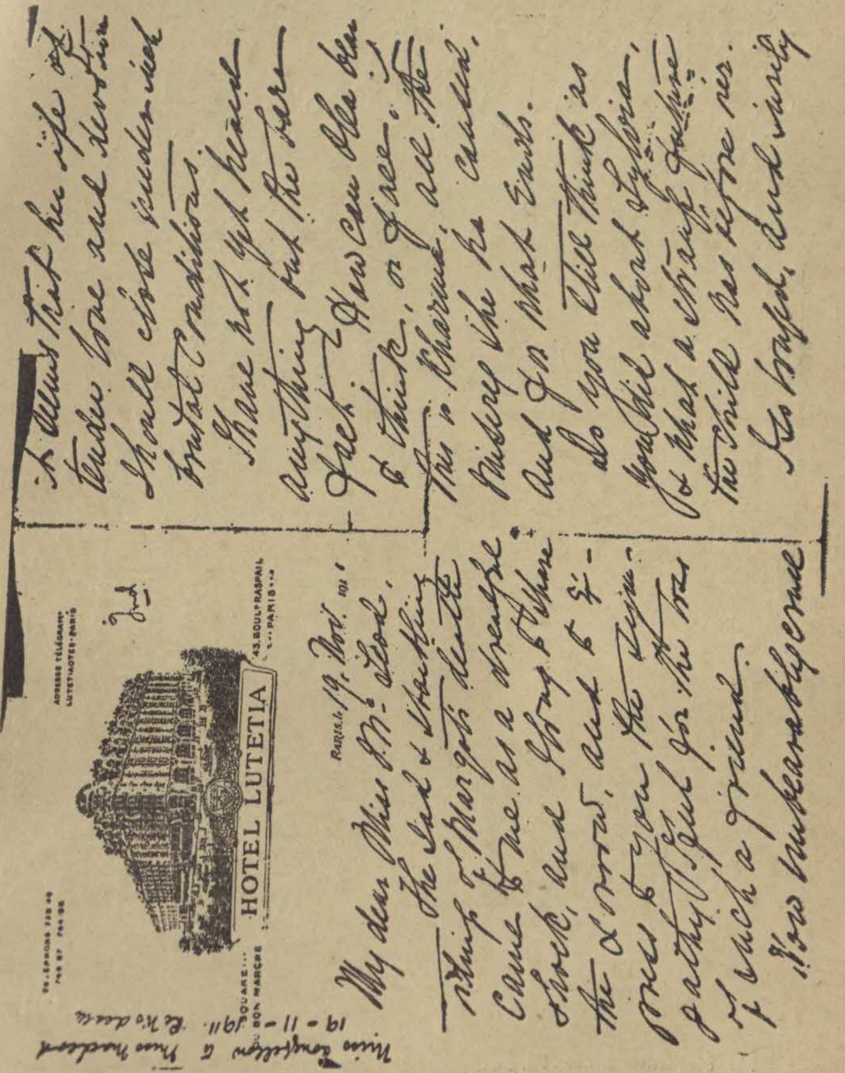
Thurs. Oct 26th 1911

The Times

Amrita Bazaar Patrika Oct 14 | 1911

ONE of the noblest and brightest souls
has passed away. Yesterday morning
Sister Nivedita departed this life at
Darjeeling. She was an Avatar, as it were,
of ideal self-sacrifice. No European, male or
female, loved India so passionately and so
sincerely as the deceased lady did. To the
service of India, she dedicated her whole
life, and hence she was called "Nivedita."
As a matter of fact, she has sacrificed
herself for the sake of her beloved land
of adoption. She left her own country, her
mother and brother, and all her early
associations at home for serving the Indians

and how magnificently did she serve them!
Her death will be mourned from one end
of the country to the other, while the
loss which poor India has suffered by this
sad event is simply incalculable. Perhaps it is
not generally known that she maintained a
considerable number of Hindu orphans and
helpless Hindu women at her own expense



Miss Longfellow to Miss Macleod
19-11-1911. Re Nivedita

TÉLÉPHONE
ADRESSE TÉLÉGRAPH. LUTETIAOTEL-PARIS
HOTEL LUTETIA
SQUARE DU BON MARCHÉ
43, BOUL^D RASPAIL PARIS

2nd

PARIS, le 19, Nov. 1911

My dear Miss J. McLeod.

The sad & startling news of Margot's death came to me as a dreadful shock, and I long to share the sorrow, and to express to you the sympathy I feel for the loss of such a friend.

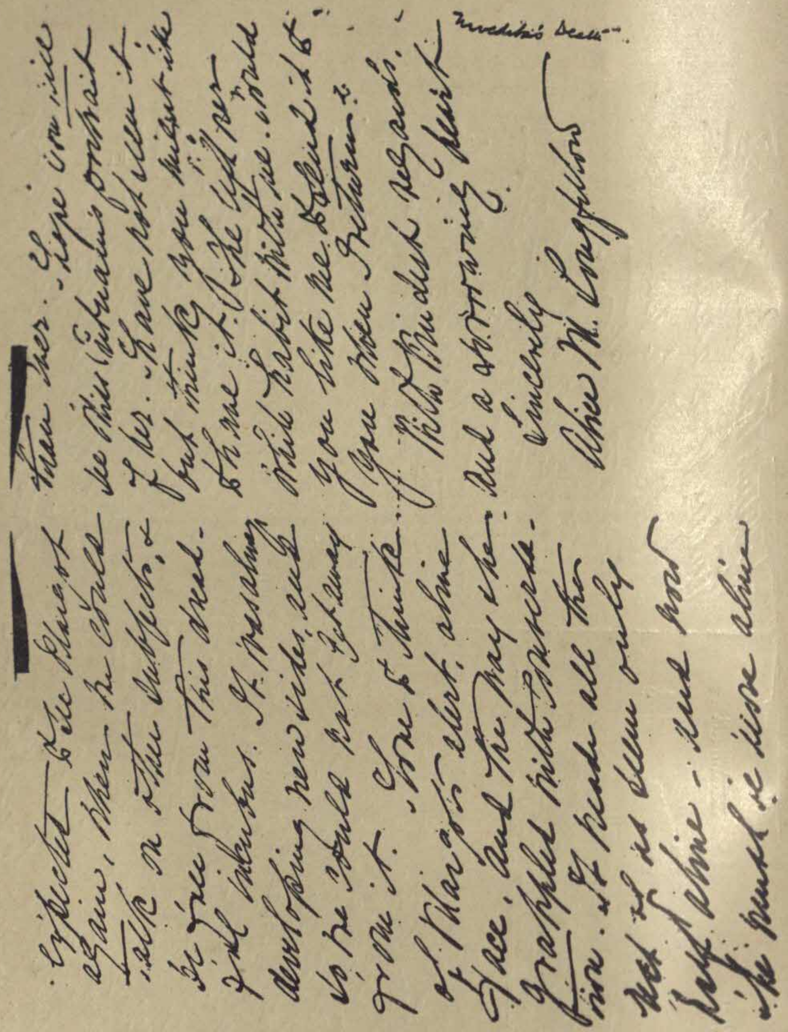
How unbearably cruel it seems that her life of tender love and devotion should close under such brutal conditions.

I have not yet heard anything but the bare fact. How can Ola blame to think, or face. Is this Kharma, all the misery she has caused, and for what Ends.

Do you still think as you did about Sylvia, & what a strange future the child has before her.

I so trusted, and surely

নিবেদিতার দেহত্যাগে মিস ম্যাকলাউডকে সান্ত্বনা দিয়ে মিস লংফেলো এই চিঠি লিখেছিলেন। ইনি বিখ্যাত কবি লংফেলোর কন্যা এবং নিবেদিতার অনুরাগী বান্ধবী। মিসেস বুলের উইলের মামলাই যে নিবেদিতার অকালমৃত্যুর কারণ, এই পত্রে তা ইঙ্গিত করা হয়েছে।—গ্রন্থের ৭২৭-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



Paris 19, Nov. 1911

My dear Miss M—Leod,

The sad and startling tidings of Margot's death came to me as a dreadful shock, and I long to share to sorrow, and to express to you the sympathy I feel for the loss of such a friend.

How unbearably cruel it seems that her life of tender love and devotion should close under such brutal conditions.

I have not yet heard anything but the bare fact. How can Olea bear to think, or face, if this is Kharma, all the misery she has caused and for what ends.

Do you still think as you did about Sylvia, and what a strange future the child has before her.

I so longed, and surely expected to see Margot again, when she could talk on other subjects, and be free from this dreadful incubus. It was always developing new sides and so she could not get away from it. I love to think of Margot's alert, alive face, and the way she grappled with conversation. It made all the rest of us seem only half-alive—and now she must be more alive than ever.

I hope you will see Miss Putuam's (?) portrait of her. I have not seen it, but think you might like to have it. She left her while habit with me. Would you like me to send it to you when I return ?

With kindest regards, and a sorrowing heart,

Sincerely
Alice M. Longfellow

only I don't see the way just now. Christine is nervous and is disinclined this moment to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary nerves or she does not feel herself up to it. Only one feels that we are letting time be wasted. If she had survived us she would not have allowed a single hour go by. But then she had no body, it was all mind. There was no such thing as despondency or despair in her composition.

Why did you not have another sister? I fear I shall never live to see your children grow up.

Yours ever
J.C. Bose

মিসেস উইলসনকে ২. ১১. ১৯১১ তারিখে লেখা জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির বিষয়বস্তু গ্রন্থের ৭৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। নিবেদিতার মৃত্যুতে ডঃ বসু কিরকম অসহায় বোধ করেছিলেন, এই চিঠিতে তিনি খোলাখুলি তা জানিয়েছেন। 'নিবেদিতা শরীরিণী নন, মনোময়ী'—তিনি বলেছেন; পরম বিষাদে পরিহাস করে প্রশ্ন করেছেন—"তোমার আর একটি বোন নেই কেন? তোমার মেয়েদের বড় হয়ে উঠতে দেখব, সে ভরসা যে করি না।"

The Bose Institute will also be beautiful architecturally. As you enter there is a large stone lotus on the left – that is the basin ~~in~~ in which water lilies will grow. Just overlooking that will be a bas-relief of a woman, with prayer beads and a lamp in her hand. ~~It was through her prayer that~~ The Institute is the embodiment of her prayer. On the 13th

The ashes were laid in a receptacle, just by the side of the lotus. There will be two stone seats, and there will be a overhanging Shefáli tree which sheds every morning lily white flowers, and makes a white carpet on the ground. The seed she brought from the Caves of Ajanta, and the plant was one of several which she planted in the School Grounds.

বসু বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের কিছু আগে ২৭. ১০. ১৬ তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা এই দীর্ঘ পত্রে (পত্রটির বিষয়বস্তুর জন্য গ্রন্থের ৭৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জগদীশচন্দ্র হৃদয় উন্মোচন করে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছিলেন নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে। "এই বিজ্ঞানমন্দির তাঁরই প্রার্থনামূর্তি", আচার্য বসু লিখেছিলেন। বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারপথে স্থাপিত সেই 'প্রার্থনামূর্তি'র নিত্যপূজা হবে শারদ প্রভাতে ঝরে-পড়া শুভ্র শেফালী ফুলে—মুগ্ধ মনে, প্রায় কবিতার ভাষায় জগদীশচন্দ্র তা বলে গিয়েছিলেন।

BOSE INSTITUTE
DIRECTOR
SIR J.C. BOSE, F.R.S.
TEL-ADDRESS BOSTUTE
TELEPHONE 1339 BARABAZAR

93, UPPER CIRCULAR ROAD.

Calcutta, the 7th October 1937.

Dear Mr. Herbert,

I received a letter from Mrs. Mary Wilson about your desire, in colleberation with Miss M.L.Reymond, to write a biography of Sister Nivedita. You ask for any documents left by the Sister. I may say that all Mss. left by her I collected and published through Messrs. Longmans, Green & Co. the two books named as "Footfalls of Indian History" and "Studies from an Eastern Home".

Sister Nivedita was also greatly interested in the revival of all intellectual advances made by India, and it was her strong belief in the advance of Modern Science accomplished by Indian men of Science that led me to found my Research Institute.

As regards the great devotion of the Sister in advancing women's education on national lines, the Nivedita School in the orthodox Indian quarters of Calcutta is a living example.

On the 26th September, 1937, Lady Bose performed the

মসিয়ে' হারবার্টকে লেখা এই পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাঠক শুধু লক্ষ্য করবেন, ডঃ বসু কী অকুণ্ঠে স্বীকার করছেন—নিবেদিতার প্রেরণাতেই তিনি তাঁর বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করেছেন।—গ্রন্থের ৭৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

II.

BOSE INSTITUTE

DIRECTOR
SIR J. C. BOSE. F.R.S.
TEL. ADDRESS BOSTUTE
TELEPHONE : 1304 BARABAZAR

93, UPPER CIRCULAR ROAD,

Calcutta, the.........................193 .

Opening Ceremony of Nivedita Hall about which the leading Indian Magazine says:

'The Nivedita Hall was built by the donation made by Lady Abala Bose, the Hall containing a beautiful painting of the Sister. This Hall will be a living memorial of Sister Nivedita's love of India and of her arts, as well as her great friendship with Lady Bose.'

It is difficult by mere correspondence to give any more information than the above. When Miss Reymond visits India, Lady Bose will give her every possible help.

Yours sincerely

J.C. Bose



নিবেদিতার একটি ক্রেয়ন-স্কেচ; নিবেদিতার দেহান্তের পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুমান, বসুবিজ্ঞানমন্দিরে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তিটি এই স্কেচের আদর্শেই করা হয়।



বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রবেশপথে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তি—
"লেডী অব দি ল্যাম্প।"

পেতে চাও জীবনে, সে আসন তোমারই সন্ধানে ফিরছে; তাই তার সন্ধানে বিরত হয়ে শান্ত হও!' শেষ পর্যন্ত এইটেই **সমগ্র** সত্য নয় কি? একদিন কোনো একটা ছুতো খুঁজে নিয়ে কথাগুলি ডঃ বসুর কাছে পাঠাব, কারণ এখন বুঝতে পারছি এই কথাগুলিই তাঁকে দেবার জন্য মনে মনে বৃথা সন্ধান করেছি।"

৩১ মে, ওলি বুলকে: "বসুদের কাছে লিখেছ। কী মিষ্টি তুমি। তোমার হৃদয়বত্তা ও মাতৃত্বকে নমস্কার করি। অবিলম্বে সবকিছু পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং জয় (ম্যাকলাউড) মনে হচ্ছে মিস উইলকিনসের বই একই মেলে পাঠিয়েছে। সন্দেহ নেই সবকিছু গতকাল পৌঁছেছে—বড় মধুর হবে তা।"

১৮ জুন, ম্যাকলাউডকে: "কেন, নিশ্চয় ডঃ বসু ও তাঁর স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন।"

দ্বিতীয় পর্ব: ১৮৯৯ জুন থেকে ১৯০২

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই হল দ্বিতীয় পর্ব। ১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহান্তের পরে নিবেদিতা কার্যতঃ জগদীশচন্দ্রের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং আমরা ১৯০২ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের ব্যাপ্তিকাল ধরেছি। জগদীশচন্দ্রের জীবনে এই সময়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, হয়ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'বসু সমরের' ঘনঘটায় পূর্ণ এই কালের ইতিহাস আমরা যথাসম্ভব তুলে ধরব, তার আগে স্বামীজীর সঙ্গে ডঃ বসুর নবসম্পর্কের ইতিহাসে প্রবেশ করা উচিত, কারণ নিবেদিতার চিঠি থেকে ইতিপূর্বে দেখে এসেছি, পরেও দেখব, তিনি ডঃ বসুর কাজ করেছেন স্বামীজীর কাজ মনে করেই।

এই পর্বে বিবেকানন্দ জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম সংযোগ এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখেছি ইতিপূর্বে। স্বামীজীকে জগদীশচন্দ্র যেমন বন্দনা করেছেন, তেমনি সমালোচনার মনোভাবও ছিল। স্বামীজীও জগদীশচন্দ্রের প্রতি প্রীতি বোধ করেছেন, তাঁর জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সহানুভূতিবোধ করেছেন, তেমনি একদেশদর্শী ধর্মদৃষ্টি সম্বন্ধে অভিযোগও বোধ করেছেন। ঐসব ক্ষেত্রে ধর্ম-ব্যাপারে সন্ন্যাসীর আপোষবিরোধী মনোভাবও দেখেছি। এইকালে জগদীশচন্দ্র মঠে এসেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে চা-পান সভায় মিলিত হয়েছেন, এবং স্বামীজী ডঃ বসুর বাড়িতে গেছেন বেশ কয়েকবার।*

* স্বামীজী ডঃ বসুর বাড়িতে এই সময়ে কয়েকবার গেছেন, এই সংবাদের পক্ষে জগদীশ বসু শতবার্ষিকী পুস্তিকায় প্রদত্ত বিবরণের উল্লেখ করতে পারি। সেখানে আছে, স্বামীজী চিকাগো থেকে ফেরার পরে উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর দুজনের

স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতার গুরু-ভক্তির প্রাবল্য ডঃ বসুর কিরকম কটাক্ষের লক্ষ্য হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথকে এইকালে লেখা অম্লরসপূর্ণ একটি চিঠি থেকে বোঝা যাবে। ১৮ এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ঐ চিঠিটি নিম্নোক্তপ্রকার—

"এবার আমেরিকা হইতে বিপিন বাবুর (বিপিনচন্দ্র পাল) একখানা চিঠি দেখিলাম। তাঁহার সহিত নিবেদিতার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। বিপিনবাবু এবং নিবেদিতা Mrs. Bull-এর বাড়িতে অতিথি ছিলেন। সেখানে বিপিনবাবু বিবিধ প্রকার pleasant কথাই বলিতেছিলেন, কিন্তু দৈবের নির্বন্ধ! সেখানে একটি meeting হয়, তাহাতে নিবেদিতা জাতিভেদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, বিপিনবাবু চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিবেদিতার মনে হইল যে, ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানে না এবং বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতি তাহাদের ভক্তি অপরিমিত নহে। অমনি বলিলেন, 'আমি জানি যে, এই meeting -এ একজন আছেন যিনি জাতিভেদ মানেন না, এবং সনাতন ধর্মের উপর যাঁহার আস্থা নাই।' তাহার পর বিপিনবাবুকে রণং দেহি বলিয়া challenge করিলেন। এইরূপ আকস্মিক-ভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপিনবাবু বলিলেন যে, জাতিভেদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। তবে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। It keeps down men of genius; for example, Swamiji could not have had so much influence যদি জাতিভেদ থাকিত, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে নিম্নজাতির উত্থান দুরূহ হইত। আর কোথায় যায়! মনে করিতে পারেন (বিবেকানন্দ) স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ কথা! অমনি এক scene । পরিশেষে ঘোরতর ঘৃণার সহিত নিবেদিতা বলিলেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দুও নহে, খ্রীস্টানও নহে, আর বিপিনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি মৎস্যও নহ, মাংসও নহ!!!!'

যোগাযোগ স্বামীজীর দেহান্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপরে উক্ত পুস্তিকার সম্পাদক লিখেছেন—

"The editor of this brochure had more than once heard from lady Bose how Swamiji, in between his sojourns abroad, would call on his friend in Calcutta and amuse him with stories of his many odd experiences abroad and regale himself with East Bengal dishes—hot curries—cooked specially for him by her—the hotter the better. One particular visit Lady Bose vividly remembered—the surprise the Swami gave by turning up late one winter evening in complete European attire, driving from Belur in a coach and pair."

ছবিটি সুন্দর, এবং এটির জন্য আমরা সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ। কেবল ডঃ বসুর বাড়িতে স্বামীজীর যাতায়াত সম্বন্ধে যে সময় দেওয়া আছে, তাতে কিছু ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। স্বামীজী তাঁর নানা বিদেশযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে কলকাতায় থাকাকালে ডঃ বসুর বাড়িতে যেতেন—এটা ঠিক হতে পারে না, তিনি যেতে পারেন মাত্র একটি বিদেশযাত্রার ফাঁকেই—পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তন (১৮৯৭) ও দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যযাত্রা (১৮৯৯-এর জুন) মধ্যেই, কারণ স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে ফেরার পরে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি—যেহেতু ডঃ বসু তখন বিদেশে রয়ে গেছেন।

আপনাকে সমস্যা দিতেছি; বিপিনবাবু তবে কি? সে যাহা হউক, এরূপ অসাধারণ ভক্তি অতি দুর্লভ।"*১

অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল কয়েক মাসের মধ্যে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে 'ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট' আয়োজিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং লেফটন্যান্ট গভর্নরের আনুকূল্যে ভারতের প্রতিনিধিরূপে সেখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পান।*২ সেখানকার ধর্মেতিহাস সভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীও আমেরিকা থেকে প্যারিসে গিয়েছিলেন। বলা চলে, জগদীশচন্দ্র এইখানেই বিবেকানন্দকে নিজ আকারে দেখেছিলেন, বিবেকানন্দও জগদীশচন্দ্রকে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল স্থানীয় পরিবেশের সংকীর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, বিশেষতঃ জগদীশচন্দ্রের পক্ষে।

বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের প্যারিস গমনকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক ভরতবর্ষ বিশেষ প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে স্বামীজীর কিন্তু বিশেষ ভরসা ছিল না। মূলতঃ তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যই পাশ্চাত্ত্যে গিয়েছিলেন, প্যারিস-সম্মেলনের বেশ কিছু আগে। নতুনভাবে নাড়া দেবার মত শারীরিক অবস্থা তাঁর নয়। তাছাড়া প্যারিস কংগ্রেস চিকাগো ধর্মমহাসভাজাতীয় কিছু ছিল না, তা জনকয়েক পণ্ডিতের সমাবেশ মাত্র, যাতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করার কথা, কেননা ফ্রান্সের ক্যাথলিকমণ্ডলী চিকাগোর অভিজ্ঞতার পরে ঐ জাতীয় কিছু করতে ভরসা করেননি। স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন তাঁর চিরজিজ্ঞাসু মনের প্রেরণায়, যা য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করতে চেয়েছে, সে জন্য ফরাসী সংস্কৃতির চাবিকাটি আয়ত্ত করার প্রয়োজন ছিল তাঁর। প্যারিসে গিয়ে মিঃ লেগেটের অভিজাত বাসভবনের বিদগ্ধ সম্মেলনে এবং অন্যত্র নিজ মহিমার আসন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক —সকলের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল। সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডিস, বিপ্লবী ও দার্শনিক প্রিন্স ক্রপটকিন, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস, শিল্পী র‍দ্যা, অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড, গায়িকা এমা কালভে, অভিজাত প্রিন্সেস ডেমিডফ,

---

*১ এই বর্ণনা সম্বন্ধে বক্তব্য—নিবেদিতা এখানে খুবই ঘোলাটে আলোকের মধ্যে আছেন। তবে সংঘর্ষের এক পক্ষের প্রদত্ত বিবরণই এখানে পাচ্ছি, এবং বর্ণনাকারী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। এই ঘটনাটির বিবরণ বিপিনচন্দ্র পরবর্তীকালে নিবেদিতার চরিত চিত্র দেবার সময়েও দিয়েছেন।

*২ বেঙ্গলী পত্রিকায় ৩০ জুন, ১৯০০ তারিখে এ সম্বন্ধে বের হয়—

"We understand that the Bengal Government has deputed Dr. J. C. Bose to attend the Scientific Congress to be shortly held at Paris. That Dr. Bose should have been selected among the scientists in India to represent the Government is a great and singular honour done to him. He really deserves it, and for this recognition we are indebted to the initiative of Sir John Woodburn."

ধর্মনেতা পিয়ের হিয়াসান্থ, আবিষ্কারক হিরাম ম্যাকসিম, এবং আরও কত নাম, যা বার করা সম্ভব হয়নি।*

বিলাসের এই অমরাবতীতে বসেই স্বামীজী সকল সত্যের শেষ সত্য মৃত্যু বা অমৃতকে অনুভব করেছিলেন অতি তীব্রভাবে, তাই চলে গিয়েছিলেন লেগেটের বিলাস ভবন ছেড়ে তরুণ ফরাসী সাহিত্যিক জুল বোয়ার দরিদ্র আবাসে, যার অপরূপ স্মৃতিকথা জুল বোয়া রেখে গেছেন।

এই বিবেকানন্দই জগদীশচন্দ্রকে যখন প্যারিস কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রদীপ্ত প্রতিভায় দর্শন করলেন, তাঁকে শেষ নমস্কার করে গেলেন ভারত-আত্মার প্রতীক পুরুষটি—জগদীশচন্দ্রের কীর্তির মধ্যে যে পাঁচ অক্ষরের অপূর্ব শব্দটি জ্বল জ্বল করছিল—ভা-র-ত-ব-র্ষ!

প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখেছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর (১৯০০); কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন-সংগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালি প্রভৃতি বুধমন্ডলী-মন্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ-মন্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির—নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে· সি· বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্ত্যমন্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ দান করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী—ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী-সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গৃহিণী যে-দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"† (পরিব্রাজক)

---

* বিবেকানন্দের প্যারিস-জীবন সম্বন্ধে আকর্ষণীয় তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখেছেন স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় মার্চ, ১৯৬৭ সংখ্যায়।

† ডঃ বসুর সাফল্যে স্বামীজী আনন্দে আত্মহারা; বিবেকানন্দ-জীবনীতে তাঁর মহা-স্ফূর্তির কথা আছে—

"Once at a distinguished gathering, when a disciple of a certain celebrated English scientist laid claim to the fact that her master was experimenting on the growth of a stunted lily, the Swami replied humorously, 'O, that's nothing! Bose will make the very pot in which the lily grows respond!" ('Life'—P 687)

প্যারিস কংগ্রেসে ডঃ বসুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেও স্বামীজী তাঁর বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, নিবেদিতার পত্র-মারফত তা জেনেছি। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জুন মেরী হেলকে স্বামীজী লিখেছিলেন—

বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা থেকে বিবেকানন্দের চরিত্রের একটি রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের যথার্থ যে-কোনো সেবককে তিনি নমস্কার করতে প্রস্তুত ছিলেন—তাঁরা জীবনের যে-স্তর থেকে যে-মত নিয়েই আসুন না কেন। তবে, সমসাময়িক ভারতবর্ষে সুপরিচিত নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রদ্ধেয় চরিত্র বিবেকানন্দ পাননি। তিনি যথেষ্ট বক্তা দেখেছিলেন, যথেষ্ট উকিল বা ব্যারিস্টার, যথেষ্ট শিক্ষিত স্বেচ্ছাদাস এবং স্বজাতি ও স্বধর্মদ্বেষী আত্মনিন্দুক, কিন্তু যথেষ্ট মানুষ নয়। কয়েকজনকে অবশ্যই তিনি শ্রদ্ধাযোগ্য দেখেছিলেন, যেমন ঈষৎ পূর্বের অজ্ঞেয়বাদী বিদ্যাসাগর, প্রবীণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কিংবা দেশপ্রেমিক তিলক, দায়িত্বশীল শিল্পপতি জামসেদজী টাটা, এবং জগদীশচন্দ্র বসু। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব বাল্যবন্ধুত্ব বা ধর্মবন্ধুত্ব নয়, বৃত্তি বন্ধুত্বও নয়—তা পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার সম্পর্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ভারতবর্ষে মাত্র দুইজনই যথার্থ আন্তর্জাতিক চরিত্র ছিলেন—তাঁরা পরস্পরের হাত ধরেছিলেন একটি বিশেষ কারণে, বলা উচিত বিশেষ ব্রতে— মাতৃভূমি এবং বহু সভ্যতার ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষের জীবনসত্যকে বাইরে উদ্ঘাটনের জন্য। অথচ বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে জীবনের অন্য ভূমিতে পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। সে পার্থক্যের কথা পূর্বে অনেক বলেছি। তাহলেও তাঁরা যে পরস্পরকে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা দেখিয়ে দেয়, মহামানবদের একটি সভাকক্ষ আছে যেখানে তাঁরা তাঁদের পরিবেশ ও পার্শ্বচরদের বাইরে ত্যাগ করে এসে সৌহার্দ্যে সানন্দে মিলিত হতে পারেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিবেকানন্দের কৃতজ্ঞতার আর একটি বড় কারণ ছিল। স্বামীজী বিজ্ঞানকে কখনই ধর্মবিরোধী মনে করতেন না। ধর্মের মূল সত্য বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত সত্যরূপে গৃহীত হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত বিখ্যাত আমেরিকান বৈদ্যুতিক নিকোলা টেসলা স্বামীজীর সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত পেয়ে পুলকিত হয়েছিলেন। আর স্বামীজী পুলকিত হয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন পদার্থ বিজ্ঞানের বেষ্টনী অতিক্রম করে শারীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করল, এবং জড় ও জীবের মধ্যে অখণ্ড সত্যের আভাস পেতে লাগল,—অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তখন কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেন নি।

আর বিবেকানন্দকে জগদীশচন্দ্র কোন্ অপূর্ব রূপে শেষ পর্যায়ে দেখেছিলেন, তার স্মারকরূপে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র দুটির উল্লেখ করা যায়।

নিবেদিতাকে ডঃ বসু ৯ জুলাই, ১৯০২, লণ্ডন থেকে লেখেন—

"তুমি যদি মনে করে থাক যে হিন্দুরা বসুদের পরিত্যাগ করেছে, তাহলে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোনমতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে। সেইজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।"

পরে ১৯০১-এ ইংলণ্ডে জগদীশচন্দ্রের অপারেশনের পরে স্বামীজী তাঁর স্বাস্থ্যের সংবাদ নিয়েছেন মিসেস ওলি বুলকে লেখা ৬ জানুয়ারী, ১৯০১ এবং ২৬ জানুয়ারী, ১৯০১-এর চিঠিতে।

"কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছু কিভাবে একজন মানুষ সম্ভব করল! আবার কিভাবে এখন সবকিছুর উপর স্তব্ধতা নেমেছে! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তার নিশ্চয়ই বিশ্রাম চাই। আমি এখনো যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দু'বছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি—সেই শক্তিধর পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা—তাঁর মধ্যে সবকিছুই বিরাট—সন্দেহ নেই।"

ওলি বুলকে লেখা—

"হারিয়ে যায়নি কিছুই। যে-সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান, তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহিরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকটি মহামুহূর্তের প্রতিধ্বনি—কালের মধ্যে যে-প্রতিধ্বনি চিরদিন অনুরণিত হয়।.....সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কর্ম কী, যথার্থতঃ তা অনুভব করবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? একজন মানুষ একলা কি করে ঐ সকল-কিছু সম্ভব করল তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারব? যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল। কিন্তু জানি, তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে—তাকে জাগিয়ে তুলবে—শক্তি দেবে।"

প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র

প্যারিস কংগ্রেসে ডঃ বসুর সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজী যে-ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তাতে মনে হতে পারে স্বামীজী স্বদেশবাসীর সাফল্যে অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তা কিন্তু সত্য নয়। প্যাট্রিক গেডিস, যিনি স্বয়ং প্যারিস কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর বসু-জীবনীতে জগদীশচন্দ্রের Response of Inorganic and Living Matter প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সাধারণভাবে এবং ডঃ বসুর গবেষণা-জীবনে বিশেষভাবে পেপারটির মূল্য নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন; তাঁর আলোচনা এবং অন্যত্র-সংগৃহীত তথ্য থেকে বুঝতে পারি, কতখানি দূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল এই ব্যাপারটির।

জগদীশচন্দ্র ৩১ অগস্ট, ১৯০০-তে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

"একদিন (প্যারিস) Congress-এর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর Congress-এর Secretary ...আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— But, monsieur, this is very beautiful (but-এর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই)। তারপর আরও তিন দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষদিন আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য

Secretary এবং President -এর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।"

প্যাট্রিক গেডিস প্যারিস-পেপার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার কারণ হিসাবে বলেছেন—

"So far, then, goes the story of this Paris paper, told at greater length than usual, alike on personal grounds and because of its importance *as including new departures.*"

(বক্রলিপি লেখককৃত)

এখানে 'দিক পরিবর্তনই' মুখ্য কথা। ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনে ইতিমধ্যে দিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, যার প্রথম প্রকাশ ঘোষণা প্যারিস-পেপারে। এর ফলে ডঃ বসু বিজ্ঞান-জগতে অতি বিতর্কিত চরিত্র হয়ে উঠবেন, এবং বাধায় বাধায় তাঁর গতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে।

জগদীশচন্দ্রের জীবনীতে পাই—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি বৈদ্যুতিক বিষয়ে গবেষণা করছেন তখনই পদার্থ-বিদ্যা ও শারীরবৃত্তের মধ্যবর্তী এক অংশে প্রবেশ করেন এবং দেখেন, এই দুই বিজ্ঞানতত্ত্বের সীমান্তরেখা অবলুপ্ত হয়ে এসেছে। 'জড়ের সাড়া'—এই অসাধারণ গবেষণার সূচনা এখান থেকেই।"

গবেষণা ও সিদ্ধান্তের অভিনবত্ব প্যারিসে সমবেত বৈজ্ঞানিকদের চমকিত করেছিল সন্দেহ নেই, এবং যেহেতু তৎক্ষণাৎ তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থে বা জাতিস্বার্থে আহত হননি—মুক্তকণ্ঠে ডঃ বসুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁরা পেপারটিকে 'সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' বলে স্বীকার করেন এবং কংগ্রেস-বিবরণীতে প্রকাশ করেন যথাসময়ে।

'বসু সমর'

'বসু সমর' কথাটি নিবেদিতার সৃষ্টি। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের একাংশের জাতি-স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের ক্রূর আকারের সঙ্গে পদে পদে সংঘাতের সেই কাহিনী

---

* শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় বলা হয়েছে—

"This happened in 1899 in connection with the responsive phenomena in the parallelisms between the response of what is called 'inorganic' matter and the response of 'living' substances. He found that the curve of fatigue of his instrument closely resembled the fatigue-curve of an animal tissue. He was able to remove the 'tiredness' of his receiver by the application of rest and of suitable stimulants. He was thus, as he said later, unconsciously led to the border region of Physics and Physiology and was amazed to find the boundary line vanishing and points of contact emerging between the realms of the living and non-living. In his investigation of 'life'-phenomena Prof. Bose was also led to the study of the response of plants, the half-way house between inorganic matter and highly complex animal life."

প্রথমে সংক্ষেপে বলে নেব, তারপরে আসবে ঐ সমরে নিবেদিতার অংশগ্রহণের কথা। আমি কয়েকটি অংশে ব্যাপারটিকে ভাগ করে নিচ্ছি।

১। প্যারিসে ডঃ বসু যে পেপার পড়েছিলেন, প্রায় সেই একই পেপার পড়েন ব্রাডফোর্ড বৃটিশ এসোশিয়েশনে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ডঃ বসুর বক্তব্যে প্রভূত উল্লাস বোধ করেন পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু শারীরতাত্ত্বিকেরা বিমূঢ় হয়ে নীরব থাকেন।*১ বসুর গবেষণা এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে তাঁকে ইংলণ্ডে চাকুরি গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়।*২

২। ডঃ বসুর পেপার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করার জন্য স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ তাঁকে রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। এখানেও পদার্থবিদ্‌দের উচ্চ প্রশংসা পান, কিন্তু শারীরতাত্ত্বিকেরা তাঁদের পূর্বতন বিমূঢ়তা কাটিয়ে আপত্তি তোলেন: ডঃ বসু পদার্থবিদ্যার প্রমাণ প্রয়োগ করেছেন শরীরবিদ্যার ক্ষেত্রে।

৩। ডঃ বসুর পক্ষে তৎক্ষণাৎ ঐসব আপত্তির নিরাকরণ করা সম্ভব হল না, কারণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অপারেশন হল, দুমাস রোগশয্যায় কাটল। রোগশয্যাতেও মস্তিষ্ক বিশ্রাম নেয়নি। শারীরিক সামর্থ্য কিছুটা ফিরে পাওয়ার পরেই ডেভি ফ্যারাডে ল্যাবরেটরীতে কাজ আরম্ভ করলেন যাতে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে শারীরবিজ্ঞানের প্রমাণই প্রয়োগ করতে পারেন।

৪। ১৯০১-এর এপ্রিল মাসের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণসহ ডঃ বসু বক্তৃতাদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। রয়াল ইনস্টিটিউশনে স্মরণীয় সভা হল ১০মে, ১৯০১। তার

---

*১ এই বক্তৃতার সাফল্য সম্বন্ধে ডঃ বসু পত্রে লিখেছিলেন—

"The reading of my paper at the Bradford meeting was a grand success. One of the leading physicists brought round his friends to see my apparatus and they were full of warmest congratulations."

বৈজ্ঞানিকেরা বলেছিলেন, বহু বৎসরের চেষ্টা ছাড়া এধরনের সিদ্ধান্তে পেঁছানো সম্ভব নয়।—

"They could never remember anything which had produced such a sensation among original investigators."

ডঃ বসুর পেপারটি 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিল—

"Physics and Chemistry, even perhaps biology, appear to be on the eve of a generalisation of unusual importance."

*২ জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এই চাকরি-প্রস্তাবের বিষয়ে ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-তে লিখেছিলেন—"বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার steroscope-এ MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন। আমাকে "you have a very fine research in hand, go on with it!" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important". আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।"

মিঃ লজ্ যে ইঙ্গিত করেছিলেন অধ্যাপক ব্যারেট স্পষ্টই সেই চাকরির প্রস্তাব করেন। 'অত্যন্ত ভালো চাকরি—অধ্যাপনার'—তাঁকে জানানো হয়েছিল।

আগে ৭ই মে তাঁর বক্তৃতার চুম্বক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রয়াল সোসাইটিতে। স্মরণীয় এই বক্তৃতা সভায়, বিস্ময়ের কথা, শারীরতাত্ত্বিকেরা কোনো প্রকাশ্য আপত্তি জানালেন না।

৫। 'মেঘ কিন্তু জমতে লাগল।' তাঁকে কেউ কেউ ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করে গেলেন। ঝড় ভেঙে পড়ল রয়াল সোসাইটির ৬ জুনের (১৯০১) সভায়। দুই প্রধান শারীরতাত্ত্বিক—বার্ডন স্যান্ডারসন এবং ডঃ ওয়েলার আপত্তি তুললেন বিশেষভাবে। ডঃ বসু সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি পদার্থবিজ্ঞানকে শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে বিজ্ঞানের জাতিভেদে আঘাত করেছেন।

৬। রয়াল সোসাইটি ডঃ বসুর পেপার মুদ্রিত করেছিল কিন্তু স্যান্ডারসন ও ওয়েলারের প্রতিবাদে মুদ্রিত পত্র প্রকাশিত হতে পারল না। পত্র প্রকাশিত হবে কি না হবে, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা সমভাবে বিভক্ত হন, সভাপতি স্যার উইলিয়ম ক্রুকসের কাস্টিং ভোট ডঃ বসুর বিরুদ্ধে গেল।*

৭। রয়াল সোসাইটিতে পেপার প্রকাশিত না হওয়াও যথেষ্ট লাঞ্ছনা নয়, এই সব বৈজ্ঞানিকদের তদ্বিরে ভারতসরকার তাঁর ডেপুটেশন-কাল বৃদ্ধি করতে অস্বীকৃত হলেন। অথচ গবেষণা-সমাপনের জন্য আরও কিছু সময় ইংলণ্ডে থাকা প্রয়োজন। ডঃ বসু স্থির করলেন, ফার্লো নিয়েই ইংলণ্ডে থাকবেন।

৮। রয়াল ইনস্টিটিউশন ল্যাবরেটরীতে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর কাজের অগ্রগতিতে অধ্যাপক ভাইনস্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এতই খুশী হলেন যে তাঁরা জানালেন, রয়াল সোসাইটি দরজা বন্ধ করে দিলেও লীনিয়ান সোসাইটির দরজা খোলা আছে। সেখানে ডঃ বসু বক্তৃতা করলেন (২১ মার্চ ১৯০২) এবং সোসাইটির কাগজে তাঁর পেপার প্রকাশিত হলও।

৯। লীনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা এবং সেখানে পেপার প্রকাশিত হবার পরে জনৈক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক চরম নীচতা দেখালেন। পূর্বকথিত ডঃ ওয়েলার দাবি করলেন, ডঃ বসুর আবিষ্কারের কোনো কোনো অংশের বিষয়কে তিনি আগেই নিজস্বভাবে প্রকাশ করেছেন। আসল কথা ডঃ ওয়েলার চুরি করেছিলেন। রয়াল সোসাইটিতে ডঃ বসুর বক্তৃতার প্রচুর নোট তিনি করেছিলেন, এবং রয়াল সোসাইটি অবিলম্বে ডঃ বসুর পেপার প্রকাশ না করায় সেগুলি ইনি পূর্বাহ্ণে নিজের নামে চালিয়ে দেন। এ বিষয়ে তদন্ত করা হয় এবং ডঃ বসুর অগ্রবর্তিতা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

১০। রয়াল সোসাইটির পত্রিকার দ্বার বন্ধ থাকায় ডঃ বসু স্থির করেন তিনি গ্রন্থ-মারফত তাঁর গবেষণাফল সকলের গোচর করবেন।

---

* ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায় ইংলণ্ডে যান, স্যার উইলিয়ম ক্রুকস সহসা তাঁর গবেষণাগারে হাজির হন। "ডঃ বসুর কাজ দেখে তিনি প্রশ্ন করেন—ডঃ বসু জানেন কি যে কার কাস্টিং ভোট রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় 'প্ল্যাণ্ট রেসপন্সের' পেপার-প্রকাশ বন্ধ করে দেয়? ডঃ বসু হতভম্ব। স্যার উইলিয়ম হাসিতে ফেটে পড়ে বলেন—'আমিই সেই ব্যক্তি।' পরে বলেন—'আমি বিশ্বাসই করিনি ও-জিনিস সম্ভবপর। মনে করেছিলাম, আপনার প্রাচ্য কল্পনাবিলাস আপনাকে বিপথে চালিত করেছে। এখন আমি সর্বতোভাবে স্বীকার করছি, আপনি প্রথমাবধি ঠিক।"

বসু-সমরে নিবেদিতার নেতৃত্ব
ওলি বুল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহায্য

আলোচ্য পর্বের অধিকাংশ সময়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন। নিবেদিতার সাহায্য এবং সংগঠন ভিন্ন ডঃ বসুর পক্ষে ঐ লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। এ ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি, হয়ত কোনোদিন হবেও না, কিন্তু বর্তমানে আমরা যতটুকু আলোকসম্পাতে সমর্থ, তার দ্বারাই গোটা চিত্রের আভাস পাওয়া সম্ভব। এখানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, জগদীশচন্দ্রের জীবনীসমূহে এই অধ্যায়ে নিবেদিতার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নি।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করেন। প্রথমে ইংলণ্ডে পরে আমেরিকায় যান। প্যারিস কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ নিম্নোক্ত প্রকার :

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ জুন ১৯০০ পর্যন্ত

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯, ওলি বুলকে : "গতকাল বসুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। ডঃ বসু বাস্তবিকই প্যারিসে আমন্ত্রিত হয়েছেন।......

কিভাবে না চেয়েছি তিনি অধ্যাপনা পদটি পান! পেলে অতি অবশ্যই অবস্থাকে তা সরল করে তুলবে। যাই হোক, আশা করি তিনি আসবেন এবং কখনই ফিরে যাবেন না। তাঁর ধরনের স্পর্শকাতর মনে জাতি-মর্যাদা যে যাতনা দেয় তা অতি মারাত্মক। তাছাড়া (কলকাতার) আবহাওয়াও গবেষণার সহায়ক নয়। তবু, আমি খুশী এই ভেবে—সব কিছুই বিশ্বমাতার হস্তে, যিনি প্রিয় ভারতের জন্য সত্যই কোনটি উত্তম তা দেখতে পান।"

২৬ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে : "গতকাল......বসুর চিঠি......এল।......

ডঃ বসুর আবিষ্কারাদি মহা গতিশীল। পাঁচ মাস একাদিক্রমে কাজ করে চলেছেন, রবিবার পর্যন্ত ছুটি না নিয়ে। সায়েন্টিফিক কংগ্রেস তাঁকে প্যারিসে যেতে বলেছে, কিন্তু তিনি প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিত নন, বাস্তব অসুবিধা অনেক। আমার কথা বলতে পারি, আমি চাই তিনি আসুন; নিশ্চিত ধারণা তিনি ফিরবেন না। তাঁর চিঠি পাঠিয়ে দেব, এই ইচ্ছা আছে। স্বামীজী তাঁর (বসুর) চিঠি পড়তে ইচ্ছা করবেন; তোমাকে বলবেন সেগুলি মিসেস বুলের কাছে পাঠিয়ে দিতে। আহা, আমার কী যে ইচ্ছা হয়—আমেরিকার অধ্যাপনা তাঁর জন্য যদি জোগাড় করা যায়!"

১৩ জানুয়ারী ১৯০০, ম্যাকলাউডকে : "গত রাত্রে ডঃ বসুর কাছ থেকে একটা

চিঠি পেয়েছি।...স্বামীজীর পড়া হয়ে যাবার পরে ডঃ বসুর চিঠি তুমি কি সেণ্ট সারার কাছে পাঠিয়ে দেবে?"

১৫ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে: "সেণ্ট সারা বসুদের সম্বন্ধে আমার মতই নিশ্চয়তা বোধ করবেন—হুর্‌রে!"

২৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে: "সেণ্ট সারাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি, তিনি লেডী ইসাবেলের কাছ থেকে শুনেছেন কি না—লর্ড রিপন লর্ড র‍্যালেকে কিছু অনুরোধ করতে পারবেন না যেহেতু তাঁকে তিনি জানেন না!!! সেইসঙ্গে মিঃ লাওয়েলকেও নয়। কিভাবে ব্যাপারটা সমাধা করা যায় জানতে চেয়ে মিঃ গেডিসকে লেখার ইচ্ছা আছে। সেণ্ট সারাকেও কাজটা করতে বলো।

যদি সরকার ডঃ বসুকে পাঠায়—পাঠাবে বলেই বিশেষ বিশ্বাস—সেক্ষেত্রে মনে হয় সেণ্ট সারা চাইবেন লাওয়েল-পদটিই তিনি নেবেন।"

১৩ মে, ওলি বুলকে: "বসুদের সম্বন্ধে কত না সুখী আমি। এখন আমি নিশ্চিত যে তাঁরা (প্যারিসে) আসবেন।"

৬ জুন, ম্যাকলাউডকে: "সেণ্ট সারাকে তুমি বলবে কি যে, মিসেস চেনীর এক পালিত পুত্র আছেন, জনৈক মিঃ জ্যাক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, তিনি ওঁর সঙ্গেই থাকেন। অধ্যাপক সেজউইকের অধীনে ভদ্রলোক কাজ করেন। অধ্যাপক সেজউইক Lowell Inc. Trust-এর কার্যতঃ ব্যবস্থাপক। মিঃ জ্যাকের কাছে আমি লর্ড রিপনের চিঠি দিয়েছি যাতে তিনি সে চিঠি অধ্যাপক সেজউইকের কাছে পাঠাতে পারেন, এবং তাঁকে দিয়ে বাকি কাজ করিয়ে নিতে পারেন। মিঃ জ্যাক বলেন, তাঁর কোনো প্রভাব নেই এবং কাজটার ভার নিতে তিনি সংকুচিত, কিন্তু মিঃ চেনীর দৃঢ় মত— কাজটা সম্পন্ন করবার এই-ই পথ। ব্যাপারটা অবশ্য বেশী হৈ-চৈ করে বা মুখমিষ্টির ভাব না দেখিয়ে, সহজভাবে করিয়ে নেওয়াই দরকার। তাই আমি মিঃ জ্যাককে ব্যাপারটার বিবরণ দিয়ে সরাসরি ছোট একটি চিঠি লিখলাম, তার সঙ্গে লর্ড রিপনের চিঠিও দিলাম—আজ প্রাতরাশের সময়ে মিঃ জ্যাককে সব দিয়েছি। 'উড়ন্ত মোরগের মত' আমি কিছু বীজ ইতস্ততঃ ছড়াতে পারি হয়ত কিন্তু অধ্যাপক সেজউইক যদি ব্যাপারটা নিজে নির্ধারণ করতে মনস্থ করেন, তাঁর উপরে সমস্তটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপ যাত্রা করেছেন, এখন অনুমান করা সঙ্গত যে, তিনি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পদের উপযুক্ত লোকের সন্ধান করবেন। তিনি বায়লজিস্ট (টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের), সুতরাং তাঁকে জালবন্ধ করা সহজ বলে তোমার মনে হওয়া উচিত, এবং তারপরে সেণ্ট সারা ডঃ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করা উচিত হবে কি না!"

২৪ জুন, ম্যাকলাউডকে: "(নিউইয়র্ক থেকে) বসুরা তাঁদের নিজস্ব প্রিয় স্বরূপে। লেডী বেটী (মিসেস লেগেট) বলেন, তাঁরা চমৎকার। অনুমান করতেই পারো এতে আমার আনন্দ ও তৃপ্তি কতখানি।"

নিবেদিতার জীবনীতে (মুক্তিপ্রাণা রচিত) পাই, আমেরিকা থেকে ২৮ জুন ১৯০০-তে তিনি প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ বৎসর মার্চ মাসে প্যাট্রিক গেডিসের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়। গেডিস প্যারিস প্রদর্শনীতে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর বৈঠক সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, নিবেদিতাকে তিনি সহকারিণীরূপে পেতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক গেডিসের নির্বন্ধে নিবেদিতা স্বামীজীর প্যারিসযাত্রার পূর্বেই সেখানে যাত্রা করেন। জুলাইয়ের শেষে স্বামীজী প্যারিসে যান। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউডও তখন প্যারিসে। অগস্ট মাসে ডঃ বসু সস্ত্রীক প্যারিসে গেলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে। লেগেট ভবনে স্বামীজী, নিবেদিতা, ডঃ বসু, মিসেস বুল প্রভৃতি মিলিত হতেন। সন্দেহ নেই, এঁরা সকলেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ বসুর অসামান্য সাফল্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এবং এঁরা কাছাকাছি ছিলেন বলে নিবেদিতার পক্ষে বসুর সাফল্যের বিবরণ ম্যাকলাউড বা ওলি বুলের কাছে লেখার (যাঁদের কাছে লেখা চিঠিই প্রধানতঃ আমরা পেয়েছি) প্রয়োজন হয়নি। তাই এইকালের নিবেদিতার অল্প পত্রেই বসু-সংবাদ পাই। যা পাই তা হল—

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, অগস্ট ১৯০০ পর্যন্ত

১ অগস্ট ১৯০০, ওলি বুলকে : "বসুরা এসেছেন তোমায় জানাতে চাই। তাঁরা চমৎকার। মিঃ ম্যাভর মিসেস বসু সম্বন্ধে **অতীব** উৎসাহী। চমৎকার নয় কি? এত প্রাণোত্তপ্ত—গেডিসের আবাসে বসুরা যখন কফি খেতে এসেছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন। প্রিয় গেডিস! পণ্ডিতদের পরস্পর সম্বন্ধে এই উদার মহত্ত্ব এবং হৃদয়মাধুর্য আমি এত ভালবাসি! আজ সকালে মিঃ ম্যাভরকে যখন শুধোলাম, ওঁদেরকে (বসুদের) কেমন লেগেছে, তিনি বললেন, 'অত্যন্ত ভাল। শ্রীমতী বসু—খুবই পছন্দসই, সর্বাত্মক মর্যাদাময়ী মহিলা, তাঁর মত অল্পই দেখা যায়।' খুব মধুর আর বিচিত্র-সুন্দর নয় কি? কী যে ভালবেসেছি ব্যাপারটা।...

আজ রাত্রে বসুদের কাছে যাচ্ছি।...

[নিবেদিতা ভারতীয় পৌরাণিক গল্পগুলিকে পাশ্চাত্য শিশুদের জন্য ইংরাজীতে রূপান্তরিত করতে আরম্ভ করেছিলেন, পরে যা 'ক্রাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্' হয়ে দাঁড়ায়। গল্পগুলি কিছু লেখা হয়েছিল, এবং ঘষা-মাজা চলছিল। এই প্রসঙ্গে—]

যদি তুমি সত্যই আসো, ওগুলি (গল্পগুলি) নিয়ে আসবে কি? তাহলে বসুদের উপর পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায়। ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আধ ঘণ্টা পরে ডঃ বসু ও-বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি নিতান্তই চান—ভারতীয় গল্প পাশ্চাত্য জগতে যাচাই করে নেওয়া হোক। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যে ভাবিত—এতে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত।"

[মুক্তিপ্রাণার রচিত জীবনীতে পাই, প্যারিসে স্বামীজী ও বসুদের সামনে নিবেদিতা 'দি স্টোরি অব দি গ্রেট গড' পড়েছিলেন—যেটি 'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।]

২৯ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে : "ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা-দুই আগে ডঃ বসুর কাছ থেকে চমৎকার একটা চিঠি পেয়েছি। মিস উইলির সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি নিশ্চিত যে ডঃ বসু মিস উইলিকে দারুণ পছন্দ ও প্রশংসা করবেন। আমি তাঁকে অপরূপ মনে করি।"

২৯ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে : "ওয়েলারদের এবং বসুদের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছ—অপূর্ব তোমার মহিমা। য়ুরোপে ডঃ বসুর পূর্ণতার ছবিতে আমি আনন্দিত—পুণ্যাত্মা মানুষটি!"

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা ইংলণ্ডে আসেন। ডঃ বসু অল্প কিছু আগেই এসেছেন। ব্রাডফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েশনে তাঁর বক্তৃতা এবং তার ফলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি প্রস্তাবের বিষয় আগেই উল্লিখিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে নিবেদিতার পত্র থেকে দেখেছি, ভারতে থাকতেই তিনি ইউরোপে ডঃ বসুর কোনো চাকরি-প্রস্তাবের জন্য কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকার কোথাও যাতে চাকরির অফার পান, সে বিষয়ে তার ব্যগ্র চেষ্টার কিছুটা আভাস তাঁর চিঠি থেকেই জেনেছি। জগদীশচন্দ্রের জন্য চাকরির প্রস্তাব কেন প্রয়োজন তিনি পত্রেই জানিয়েছেন—ঐ প্রস্তাব তাঁর মানসিক স্বাধীনতার, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কারণ হবে। চাকরি নেবেন কি না নেবেন, সেটা ভিন্ন কথা। তবে চাকরিসূত্রে বা অন্যভাবে ডঃ বসুর কিছুকাল ইউরোপবাস যে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার সাফল্যের পক্ষে প্রয়োজন, নিবেদিতা তা বুঝেছিলেন। ডঃ বসু চাকরি-প্রস্তাব যখন সত্যই পেলেন, তখন তাঁর মনের যে প্রতিক্রিয়া ঘটল—সেই প্রতিক্রিয়া ঘটবে নিবেদিতা জানতেন—জানতেন বলেই অত শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। ডঃ বসুর ঐকালীন মনের ছবি, বড় সৌভাগ্যের বিষয়, সরাসরি তাঁরই জবানীতে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে লেখা কতকগুলি চিঠি থেকে। মহাপ্রেম এবং মহাত্যাগের নির্যাস শব্দে শব্দে সেখানে—হিন্দুর আশা আকাঙ্ক্ষা গৌরব, ভারতবর্ষের ভাবনা। অনুমান করি, যে-দেশপ্রেম চিরদিনই তাঁর মধ্যে ছিল, বিবেকানন্দের 'মহান আত্মা', 'বিরাট আশা' এবং নিবেদিতার পাবক সংস্পর্শ তাকে জ্বালিয়ে তুলেছিল অজস্র শিখায়। জগদীশচন্দ্রের তেমনি কিছু পত্রের অংশ—

(চাকরি প্রস্তাবের কথা বলে) "এখন বলুন কি করি? একদিকে আমি যে-কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি, এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration -এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল।" (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০)

"জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না ; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না। তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ

করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে-থিয়োরী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এসব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যেদিকে দেখি, সেদিকেই অনন্ত আলোকরেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।" (৫ অক্টোবর)

"আজ প্রায় দু' মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে—এখানে থাকিব কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

ভাবিয়া দেখ—যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?...

তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সেসব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যেসব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চলডোর ছেদন করিতে পারি না।...

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।" (২ নভেম্বর)

"গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে প্রস্ফুটিত হইল?—কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখদুঃখের অংশী, সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না, এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।" (২৯ নভেম্বর)

জগদীশচন্দ্রের এইকালীন জীবনের যে-রেখাচিত্র দিয়েছি তদনুযায়ী ব্রাডফোর্ডে বক্তৃতার পরে তিনি রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা করেন এবং সেখানে পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রশংসা সত্ত্বেও শারীরতাত্ত্বিকদের আপত্তির সম্মুখীন হন। সেই আপত্তির নিরাকরণের পূর্বেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পূর্ব অবধি—

নিবেদিতার পত্রে বসু সংবাদ, নভেম্বর ১৯০০ পর্যন্ত

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০০, ম্যাকলাউডকে : "আমার ছোট্ট মা (নিজের মা) এইমাত্র ডঃ বসু ও মিসেস বসুকে ঠাঁই দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পক্ষে খুব প্রিয়

ব্যবহার নয় কি? আমি কিন্তু অপেক্ষা করতে বলেছি—যতক্ষণ না মিসেস বুল আসেন। ইতিমধ্যে আমি দারুণ বেহিসেবী খরচের মধ্যে যাচ্ছি—এক সন্ধ্যায় ওঁদের ঠান্ডা মটন সাপার দেব, যাতে তাঁরা ঘরোয়া পরিবেশ অনুভব করেন।"

১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে : "কয়েকদিন আমরা সারের পাইনবনে কাটিয়েছি, একেবারে স্বর্গে। আমার জন্মদিন সেখানেই কেটেছে—মা এবং বসুরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

প্রিয়তমা, তোমাকে বলে উঠতে পারব না—এই বন্ধুরা (বসুরা) আমাদের অভীপ্সার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের কাছে কতখানি হয়ে উঠেছেন। অদ্ভুত শোনাবে তবু সত্য মনে হচ্ছে—আমরা তাঁদের কাছে আবার গীতাকে এনে দিচ্ছি। ডঃ বসু অসতর্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন একটানা বলে যান তখন শুনতে কত ভাল লাগে ; বলে যান ভারতের অতীত ত্যাগের প্রচণ্ড কাহিনীগুলি একের পর এক—তখন কেবল এইভাবেই—তত্ত্বের শুকনো পাঁজরে আঙুল বুলিয়ে নয়—আমরা খানিকটা ধারণা করতে পারি, এই ধরনের আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কোন্ উত্তরাধিকার পেয়েছে।

সুতরাং আমার কাছে খুবই মর্মস্পর্শী মনে হল যখন গতকাল সকালে প্রাতরাশের আগে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন তিনি পরিকল্পনা করতে লাগলেন যে, যদি সর্বাত্মক ক্ষমতা হাতে এসে যায়, তাহলে ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে দশ বছরের জন্য আমরা কয়েকজন কি করব? আমরাই শুধু ছিলাম, এবং তিনি শিশুর মত কথা বলছিলেন। চার বছরের পাঠ্যসূচী নিয়ে আমরা **এহেন** প্রাথমিক বিদ্যালয় করব, তারপরে চার বছরের জন্য **এহেন** মাধ্যমিক ব্যবস্থা, এবং তারপরে স্কলারশিপ প্রভৃতির চমৎকার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি শুধোলাম—'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি করাবেন?'

'আমি তাদের মিঃ কুকের আকাঙ্ক্ষামত আত্মবিকাশের শিক্ষা দেব (কুকি দু' দিনের জন্য এসেছিলেন, আমাদের বটানি পাঠ দিয়েছেন, যার জন্য তিনি ও ডঃ বসু পরস্পর প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধায় বাঁধা পড়েছেন), কেমন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে হয় তার শিক্ষা দেব, আর শিক্ষা দেব ঐ জিনিসটা—ঐ যে তুমি বলে থাকো—কি যেন সেটা—কাজ, কাজ।...কারণ সত্যকার মহান শিক্ষার এটা হল তৃতীয় দিক। সুতরাং আমার লক্ষ্য হবে—মাত্র একটি বিজ্ঞানের লোক তৈরী করা নয়—বিজ্ঞানের **নিখুঁত** লোকগুলি তৈরী করা—বুঝতে পারছ?

অনুভব করতে পারো কি, এই কথোপকথন আমার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে?"

১৫ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে : "এই সপ্তাহের প্রতি দিনই তোমার কাছে লিখবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু টাটা স্কীম ও ডঃ বসুর পেপারগুলির উপর এত বেশী সময় গেছে যে, আমি লিখে উঠতে পারিনি।...

আমি বসুদের সঙ্গে আছি। প্রতিদিন কাজে ভর্তি। পয়লা ডিসেম্বর বা কাছাকাছি সময়ে তাঁর (বসুর) অস্ত্রোপচার হবার কথা।...

সিসেম (ক্লাব) এখন বক্তৃতার রাত্রিগুলিতে যা-তা। আগে যা ছিল সে রকম নয় একেবারে। আর লণ্ডন লণ্ডনই নয় লেডী ইসাবেল ছাড়া। তবে লণ্ডনের চেয়ে কিছু অধিক উত্তম—বসুদের সঙ্গ।

মিঃ আর সি দত্তকে (রমেশচন্দ্র দত্ত) বেশ ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। তিনি বললেন, রাজার (স্বামীজীর) সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। সকলের প্রিয় হবার জন্য মিঃ দত্তের চেষ্টা দেখে ডঃ বসু খুব আমোদ বোধ করেন। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক তুললাম, যদি তরু দত্তের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তাহলে স্বামীজীর সঙ্গে নিশ্চয় আছে—তিনি সেই মৃদু অভিযোগ অস্বীকার করলেন না। এই ধরনের ছোটখাট দু' একটা ব্যাপার হয়ে যাবার পরে, যা কিছু তাঁদের (রমেশ দত্তের) বংশের পক্ষে গৌরবজনক হতে পারে, তাকেই কোলে টেনে নেবার ঝোঁকের উপরে থাবা বসিয়ে ডঃ বসু জানালেন—'তাহলে তো স্বামীজী আপনার সৎ-ভাই।' ঐ ধরনের কথাবার্তা আমার অন্তরে প্রবেশের পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য ছাড়পত্র—তাও তিনি বললেন।

আমি চিঠি লিখতে পারছি না।...গোটা দিনগুলি কেটে যায় বিজ্ঞানে, অনুবাদে এবং ভারতের কথায়।...

ডঃ বসু আমাকে উত্ত্যক্ত করছেন...স্বামীজী ও মিঃ মোহিনীর বিষয়ে। আমি বললাম, 'ঐ দুটি মানুষের মধ্যে এমন কোনো সমতা নেই যে তুলনা করা যেতে পারে।'

মিসেস বসু শান্তভাবে মধ্যপথে থামিয়ে বললেন, 'নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন ; তুলনার প্রশ্নটা উদ্ভট।'

অবশ্য এই ধরনের গভীরতম বিষয়ে কেউ কথা বলতে চায় না কিন্তু এইরকম খড়কুটো স্রোতের গতি বুঝিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্যে (স্বামীজী ও বসু) গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ আছে, তা বিশ্বাস করার কারণ প্রায়ই পেয়েছি। এক এক সময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবি—প্রতীক পূজার ব্যাপারেও বোধহয় মতভেদ আছে কি না সন্দেহ।"

২২ নভেম্বর, ওলি বুলকে : "দুটি জিনিস তোমাকে দিতে চাই, গতরাত্রের ডিনারসূত্রে—

১। ঈথার ও ঈথার-বোনা বিশ্বজগৎ,

২। সুতরাং তুমি দেখছ—ফুল বা পতঙ্গ বা তুমি বা আমি—আমাদের সকলের জীবন দুই অনন্তের মধ্যে সেতুস্বরূপ—পিছনে আকারিত বিরাট অনন্ত, সামনে সম্ভাবনাগর্ভ অসীম অনন্ত।

তোমার ভালবাসা সকলকে দিয়েছি—খোকাকেও (ডঃ বসুকেও)। তিনি বললেন—"আঃ, তাহলে আমরা সত্যই এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।"...

ডঃ বসুর জন্মদিন শুক্রবার, ৩০শে।

[জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে 'খোকা' সম্বোধন নিবেদিতার পত্রে 'বোধহয়' এই প্রথম পেলাম। ভবিষ্যতে চিঠিতে এই শব্দটি নিবেদিতা বার বার ব্যবহার করবেন। মূল শব্দটি ছিল *'Bairn'* , স্কচ শব্দ, অর্থ, *A child*। জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার থেকে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তবু নিবেদিতার কাছে তিনি শিশুর মত প্রতীয়মান হতেন,

সেবা ও সাহায্য যার দরকার। নিবেদিতার বোন জানিয়েছেন, পূর্বে তা দেখেছি—যাঁর বিষয়েই নিবেদিতার *profound feeling* থাকত তাঁকেই সন্তানবৎ দেখতেন। অধিকন্তু মনে হয়, বিরাট প্রতিভাধর ঐ মানুষটির মধ্যে কোথায় একটা অবোধ শিশুসত্তা ছিল, যা গভীর চোখে ধরা পড়ত। স্বামীজীও ডঃ বসুর তুলনায় বয়ঃকনিষ্ঠ—তবু তিনি তাঁর বিষয়ে বলার সময়ে কখনো কখনো 'বালকটি' বলেছেন। অপরদিকে এও বলা যায়, সত্যকার প্রতিভা কখনই সম্পূর্ণ আত্মসচেতন হতে পারে না। সৃষ্টি রহস্যের সামনে তাঁরা এক ধরনের বিস্ময়পূর্ণ চাহনি মেলে থাকেন। নিত্য উৎসে নিত্যস্নায়ী বলে তাঁরা এমন এক নবীনতা বজায় রাখেন, যা চিরশৈশব বলে মনে হয়। বিবেকানন্দের কল্পনাতীত বিরাট ব্যক্তিত্ব—তবু তিনিই কি বহুজনের কাছে সন্তান বলে প্রতীয়মান হননি?]

২৯ নভেম্বর, ওলি বুলকে : "তুমি এখানে নাও আসতে পারো—এই সংবাদে আমাদের সকলেরই মনোভঙ্গ—ডঃ বসুর সর্বাধিক। যদি তুমি আজ রাত্রে যাত্রা করতে না পার, তবু যে-কোনো ক্ষেত্রেই 'তোমার জন্য একটি চেয়ার প্রস্তুত রাখা হবে'—এই কথা লিখে দিচ্ছি।...তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তোমার অভাব কিভাবে বোধ করছি।...ডঃ বসু হঠাৎ কয়েক মিনিট আগে মনে করলেন, একটি বইয়ে তিনি আমাদের সকলের স্বাক্ষর এবং প্রত্যেকের লেখা কয়েকটি কথা নিয়ে নেবেন ভবিষ্যতের জন্য স্মারক হিসাবে। আশঙ্কা হয়, তোমার নাম সেখানে থাকবে না এবং সে তো বিরাট ফাঁক।...

দ্বিতীয় পেপারটি বেশ দূর এগিয়েছে। এটি দারুণ।...তুমি নিশ্চয় শুনে অবাক হবে না—বৈজ্ঞানিক নকশা করতে, গণনা করতে, ভেবে জিনিস বার করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়; শেষে ইনি বলবেন—'আরও একটা দিন বৃথা গেল। আমি এত অলস কেন?' কিন্তু একটি মুহূর্তও নষ্ট করা হয়নি, বাস্তবিকই। গতকাল সকালে তার ফলে সোফায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে। সোমবার আমি তাঁর প্রচণ্ড মনের তড়িৎ প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ড্রইং করেছি, ফল—ভেঙে পড়া। বিস্ময়ের কিছু নেই যে ওঁকে একটি পেপারকে সর্বাধুনিক করতে দিনের পর দিন কাটাতে হয়।

তুমি তো জানো, আগামীকাল তোমার এবং মিসেস বসুর জন্য পোর্টফোলিও তৈরী রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। যা করেছি তা হল ডঃ বসুর জন্য ছোট মলিন বুককভার।...

আজ সকালে শুধু আমরা ছিলাম। হঠাৎ তিনি রেখাগুলি—যা এইভাবে যায় (এখানে মূল চিঠিতে নিবেদিতা রেখার নক্সা দিয়েছেন)—তার বিষয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন—'ম্যাগনীশিয়াম এবং অন্যান্য জিনিসে যে-প্রকার ঘোরানো বাঁকানো রেখা, মানুষ সেইভাবেই যেন গভীরের গভীরে ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে, একই সঙ্গে উচ্চের উচ্চে অব্যাহতভাবে উত্থিত হতে পারে তার জীবনের সর্বত্র। জীবনপথে মানুষ অগ্রে পশ্চাতে, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় ধাক্কা খেতে খেতে অগ্রসর হবে—শৃঙখল-মুক্ত—অবিরত—সর্বত্র। এরই নাম সত্যকার স্বাধীনতা।' শুনতে শুনতে আমি, কি স্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস—একেবারে স্বামীজীর দর্শন!

আমার কাছে মহা সুখের বিষয়টি তোমাকে বলতে চাইছি। এখন জগদ্ধাত্রী—পৃথিবীর ধাত্রীমাতার—শুক্লপক্ষ। ভাবতে ভাল লাগে যে, এই আত্মা (ডঃ বসু) জন্ম নিয়েছিল জীবনের যা-কিছু মধুর, রক্ষাকারী—তার মধ্যে...

দুর্গা অক্টোবরের গোড়ায়,

কালী সেই সময় থেকে নভেম্বরের মধ্যে,

জগদ্ধাত্রী—এখন—

দেখতে পাচ্ছ, রুদ্র, নিষ্ঠুর, বিশ্বশক্তির (দুর্গার) আধিপত্য তাঁর উপর নয়, কিংবা ভয় ও মৃত্যুর প্রিয় মাতারও (কালীর) আধিপত্য নয়। পরন্তু যাঁর থেকে সকল মানবীয় মাতৃত্ব উদ্ভূত হয়, জন্মকালে তাই তাঁর নিয়ন্তা—শেষেও তাই থাকবে।

ঠিক এই মুহূর্তে হয়ত তুমি দারুণ এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছ। ডঃ বসু মনে করেন না যে, তুমি যাত্রা করতে পারবে, আর মিসেস বসু নিশ্চিত যে তুমি এখানে আগামীকাল আসছই। ইতিমধ্যে, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং শুভ আশা। এই চিঠি পাঠাবার কারণ—তুমি আসতে না পারলে যাতে জানতে পারো যে, আমরা তোমার জন্য স্থান করে রেখেছি এবং উৎসব করছি তোমারই নামে।...

ডঃ বসু জানালেন—আমি তোমার উপর 'উৎপীড়ন' করি। তাই কি? ইচ্ছে করে তো করি না। আমি অবশ্যই বলব না 'আমি অতিশয় দুঃখিত', কারণ এই উৎপীড়ন সুমধুর, যদি সত্যই তা করে থাকি। উনি বললেন, আমি তোমার উপর করি, তুমি কর তাঁর উপরে, কারণ তিনি তোমার কোনো অভিপ্রায় রোধ করতে সমর্থ নয়, এবং অপরদিকে তিনি করেন আমার উপর।

দেখতে পাচ্ছ, আর একটি ত্রিভুজ!

ডঃ বসু বলেন, 'না, তুমি **কদাপি যেন** এখানে আসতে না পারার জন্য দুঃখবোধ করো না, কারণ তিনি অন্ততঃ মনে করেন তুমি এখানে **আছই**—তুমি আসো আর নাই আসো।

[ডঃ বসুর জন্মদিন উপলক্ষে চিঠিটি লেখা।]

জগদীশচন্দ্রের অপারেশন ও নিবেদিতার পত্র

জগদীশচন্দ্রের অপারেশন হয় ডিসেম্বর (১৯০০) মাসের প্রায় মাঝামাঝি। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তিনি ছিলেন এইকালে। মৃত্যুতমসা থেকে জীবনের আলোকে তাঁকে কার্যতঃ উদ্ধার করে এনেছিলেন যে-দুই নারী, তাঁদের প্রতি জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রীর কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না কোনোদিন। এ বিষয়ে নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেডী অবলা বসু যেকথা নিবেদিতার দেহান্তের পরে লেখেন, তা পরে উপস্থিত করব। এখানে মিসেস বুলের কাছে গেডিস জীবনীতে যে ঋণস্বীকার করা হয়েছে, তাই উদ্ধৃত করছি—

"After Bose's attendance at the International Science Congress at Paris in 1900, and subsequent cares, his health broke down, and he was in imminent danger, when Mrs. Bull, hearing of this, came over from the Continent, found him an expert

surgeon and helped to nurse him back to health. From this time a deep friendship grew up, and Bose found in her anew the great qualities of his own mother."

অপারেশনের পরে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠি থেকে ডঃ বসু এবং নিবেদিতার অন্তর্জীবনের গভীর রূপের সম্মুখীন হই। দেবদূতীর মত যিনি সেবাশুশ্রূষা করেছেন, তিনি তাঁর সহানুভূতিকাতর মনকে বিস্তৃত করেছেন রোগীর সর্ববিধ প্রিয় ভাবনার ক্ষেত্রে। দেখতে পাই নিবেদিতা ডঃ বসুর কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্ব অনুধাবন করতে গভীরভাবে প্রয়াসী। নিশ্চয় এর পিছনে ডঃ বসুর অনুভূতির উপর সমভাবনার স্নিগ্ধ প্রলেপ দানের বাসনা ছিল, কিন্তু সেই শেষ নয়—সর্বমতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সত্যসন্ধ্যানের ইচ্ছাও ছিল।

নিবেদিতার চিঠি—

২৫ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে : [ক্রীসমাস অপরাহ্ণ, ডঃ বসুর শয্যাপার্শ্বে] "আজ বড়দিন, কাল তোমার জন্মদিন। কতদিন হয়ে গেল তোমাকে একটা কথাও লিখে পাঠাইনি। চিন্তাশূন্যতার জন্য নয়, মূল কারণ, (ডঃ বসুর কাজে) শেষ শক্তি-বিন্দু ব্যয় করেছি, একেবারে তন্ময় হয়ে, পক্ষকাল পূর্ব অবধি। তারপর ১২ তারিখে ডঃ বসুর অপারেশন হল। অতঃপর আমরা সর্বদা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে আছি। তিনি বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। এই বাড়িতে একটি ঘরে তাঁর স্ত্রী থাকেন। আমরা পালা করে তাঁর সঙ্গে কাটাই। চমৎকারভাবে সেরে উঠছেন। আমার মনে হয় —আমরা সবাই আশা করি—অসুখের আগে তিনি যা ছিলেন, তার থেকে অনেক ভালো ও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। মাঝে মাঝেই তিনি খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত কাজের জন্য ছটফট করছেন।...

তুমি জানো, আমার সমস্ত হৃদয় উন্মোচন না করে তোমাকে কখনো কিছু লিখতে পারি না, তাই নীরব ছিলাম। প্রকাশের উপযোগী সুযোগ বা সামর্থ্য পাইনি। যা শিখেছি, শিখছি—তার অর্ধেক যদি তোমাকে বলতে পারতাম! অনেক কিছুই বলতে পারি না, কিন্তু একথা ঠিক, অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস—আমি সত্যই শিখেছি, এমন কিছু, যা অপরের সম্বন্ধে সর্বদা কোমলতর, মধুরতর এবং সশ্রদ্ধ করে তোলে। এখানে, প্রতি পদক্ষেপে, আমি তোমার জ্ঞানের কিছুটা আয়ত্ত করছি। কিন্তু হায়, এখনো জানিনা, কিভাবে আমার আত্মাকে অন্যের আত্মার সুরে বাঁধা যায় এবং প্রতি মুহূর্তে সুসমঞ্জস সম্পর্কে আসা যায়। আরও শ্রদ্ধা চাই—আরও —আরও—মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে—কতখানি যে প্রয়োজন তার!

এই ক্রীসমাসে আমি প্রথম 'লাবণ্য ও কারুণ্য-প্রতিমা' মেরীর পূজারী হয়েছি। প্রিয় য়ুম, এ যে কতখানি, কি বলব! যে আত্মাগুলি তোমার সান্নিধ্যে আসে তাদের প্রত্যেকের উপরে মাধুর্য ও সহানুভূতির বর্ষণে তুমিও লাবণ্য-কারুণ্য-প্রতিমা। কিন্তু আহা, মেরী! যে-মাতৃত্ব পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর মধ্যে, তার কণামাত্র যেন অন্যে পায়!

আজ অপরাহ্ণ কাটাচ্ছি ডঃ বসুর সঙ্গে। জাহাজের ডায়েরী (স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণের) স্বতঃই কিছু কিছু পড়তে চেয়েছি। ওঃ য়ুম, 'যোগসূত্র' হবার কোনো

ইচ্ছা নেই (স্বামীজীর পুরাতন বিভীষিকা—নিতান্ত সঙ্গত যা),* কিন্তু এই মানুষটি যদিনা তাঁর (স্বামীজীর) গোষ্ঠীতে এবং কাজে সবেগে প্রবেশ করেন তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ আমার কল্পনার অনুরূপ আকার নেবে না। ইনি স্বীকার করেন যে, কোনোকিছু আধাআধি করতে পারেন না। এ পর্যন্ত কর্মই তাঁর ধর্ম—আর সে কী ধর্ম! কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ কখনো ঘনায়নি এঁর উপরে এবং প্রতীক বিষয়ে ধারণা যত 'না'-এর বেড়ায় বাঁধা। কিন্তু কি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে স্বামীজীর মহা নির্দেশের কথা শোনেন! সেগুলি সত্যই বিরাট। সেই ৬ সপ্তাহের জন্য (স্বামীজীর সঙ্গে জাহাজে কাটানো ৬ সপ্তাহ) আমার কৃতজ্ঞতার শেষ হবে না কখনো। এঁর (বসুর) হিন্দু-কৃতজ্ঞতা অপরূপ। **আমাদের বন্ধুত্ব ও একত্র কাজের বিষয়ে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন তিনি খুবই সহজভাবে বললেন—'এসব কাজ কার জন্য তা জানি', এবং সেই 'কে' হলেন আমার পিতা (স্বামীজী)।"** (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

৪ জানুয়ারী, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে: "ডঃ বসু এখন প্রায় সুস্থ। মা তাঁর ছোট বাড়িটি তাঁদের ও আমার জন্য ছেড়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমরা উইম্বলডনে আছি।

আমি খুব ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্ম ঐতিহ্য ও অনুভূতি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি।† পাওয়ার পক্ষে এটি উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বস্তু—মনে হচ্ছে।

---

* এখানে স্বামীজী ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নিবেদিতার মধ্যস্থতাচেষ্টা এবং তার শোচনীয় ফলের দিকেই নিবেদিতা ইঙ্গিত করছেন। বিষয়টি পরে অল্পাধিক ব্যাখ্যাত হবে।

† ব্রাহ্মমতের প্রতি জগদীশচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল। 'দি ওয়ারল্ড্ অ্যান্ড দি নিউ ডিসপেনসেশন' পত্রিকার ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২-এর সংবাদে দেখতে পাচ্ছি লন্ডনে জগদীশচন্দ্রের বাসভবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে:

THE BRAHMO SAMAJ: SEVENTY SECOND ANNIVERSARY: For some years this anniversary has been observed by the little group of Brahmo students at Cambridge, but this year advantage was taken of the presence in this country of Professor J. C. Bose, M.A., D.Sc., of the Presidency College, Calcutta, to hold the celebration in London. Dr. Bose, who came over at the time of the Paris Exhibition, commissioned by the Indian Government, and is now carrying out some abstruse scientific investigations at the Royal Institutions, is residing with Mrs. Bose at Earling, and at their house the anniversary celebration took place on Friday, Jan. 24. Nearly twenty Brahmos, who are studying in London or at Cambridge, and a few English guests were present.

At the request of Dr. Bose the Rev. V. D. Davis first offered prayer, and an address was then given by the Rev. W. Copeland Bowie, who dwelt on the close sympathies which unite the members of the Brahmo Samaj and the Unitarians England, which has been strengthened by the visits to India of the Revs. J. T. Sunderland and J. Harwood, and especially of the late S. Fletcher Williams. Messrs. B. C. Ghosh, B. C.

ইনি (ডঃ বসু) অনুভব করেন যে, তাঁর কাছ থেকে তাঁর মত আমার শোনা উচিত মর্যাদার বিষয় হবে না, সুতরাং বলার সময়ে মনের প্রচন্ড বাধা তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। অবশেষে মনে হয়, আমি পাচ্ছি। সম্পূর্ণভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি। আমার বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ চান আমি এই করি, এবং যদি সম্ভব হয় এই পথে ঈশ্বরের সমীপে যাই। তোমার নিশ্চয় মনে আছে আমরা (অন্ততঃ আমি) প্রথমে শিব ও কালীকেও ভালবাসিনি। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণও সকল ধর্মকে সমভাবে ভালবাসেন নি। সুতরাং বর্তমানে এই যে প্রয়াসে আমি নিরত আছি, এর প্রতি কোনো আনুগত্যের অভাব না দেখিয়েও বলতে পারি, এটি আমার বাল্যের পিউরিটানিজমের সঙ্গে ভয়াবহরকমে এক। কিন্তু দারুণভাবে এও অনুভব করছি—যতই যা হোক, আমাকে আরও চেষ্টা করতে হবে। এবং কখনো কখনো আমি খুব স্বচ্ছভাবে, নিশ্চিতভাবে বোধ করি—এই ডাক, এই চেষ্টার তাগিদ এসেছে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। অন্য সময়ে স্বামীজীর কথা মনে পড়ে আর কেঁপে উঠি, কারণ মনে হয় না ব্যাপারটা তিনি বুঝবেন ও অনুমোদন করবেন। এবং তাঁর অননুমোদন এখনো আমার কাছে গভীরতম ব্যাপার। অধিকন্তু, আমার যেন মনে হচ্ছে, যে-উদ্দেশ্যে আমি জীবনযাপন করেছি, এপর্যন্ত স্বাধীনভাবে যা-কিছু বরণ করতে পেরেছি—সব কিছুই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু এইভাবে ভাবা আমার পক্ষে কী হীনতা! যেন নিজের হতভাগ্য ক্ষুদ্র সত্তাকে অন্যায়ে পতিত দেখা—এত ভয়ঙ্কর! বিস্ময়ের কিছু নেই যখন নিজেকে ক্ষুধার্ত, শীতল ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু দেখতে মানুষ এত সংকোচবোধ করে।

কী কান্ড! তুমি মাতাঠাকুরাণীকে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে দেখতে পাবে। কী অপূর্ব তা—আহা!......

ডঃ বসু ও মিসেস বসু প্রায়ই বলেন, কলকাতায় শেষে স্থির হয়ে বসার আগে ভারতের নানাস্থানে ওঁদের পরিচিত নানা জনের কাছে আমি চক্র দিয়ে ফিরছি (মিসেস বসুর ভাষায়) 'অশ্বমেধের অশ্বের মত।' আমার মনে হয়, যদি সত্যই তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহলে তা করবার মত কাজ।"

১১ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে : "আগামীকাল এলে অপারেশনের পরে একমাস কাটবে—যেদিন ডঃ বসু টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে বলেছিলেন—'ভদ্রমহোদয়গণ! এবার আপনারা ছুরিকাঘাত করতে পারেন!' এই সপ্তাহে তিন দিন তিনি ল্যাবরেটরীতে কাজ করেছেন, ঐ সময়ের মধ্যে প্রচুর কাজ হয়েছে। অপূর্ব নয় কি? ভারতীয় রক্ত এবার নিজ মর্যাদা রক্ষা করেছে। এত দ্রুত আরোগ্যের একমাত্র কারণ

Chatterjea, A. Dutt, and Dr. Bose himself also spoke, and Mr. Ion Richard, who referred to Mr. Fietcher Williams as having consecrated the good will, which unites our two communities, by his life and by his death.........

A cordial vote of thanks to Dr. and Mrs. Bose for their hospitable entertainment was also passed, and at the conclusion of the meeting the company adjourned for tea.

Inquirer.

হতে পারে তাঁর মিতাচারী স্বভাব। যে-ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন, তা তখন যা বুঝেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবং আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীকে অধিক ধন্যবাদ—আমরা ভালয় ভালয় অবস্থাটা কাটিয়ে এসেছি। কলকাতায় মার্চ মাসে ফিরতে চাইছি। আশাকরি তোমার চিঠিগুলি এর পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অনেক দিন ধরে মাতাঠাকুরাণী সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত। গত মেলে যে-সব চিঠি পেয়েছি তাতে আমার আশঙ্কাই সত্য বোধ হচ্ছে। সুতরাং দ্রুত যেতে ব্যগ্র।......

গত রবিবার আমি দুবার ব্রিজ ওয়েলস-এ বক্তৃতা করেছি।......সেখানে একটি অসাধারণ জিনিসের উদয় হয়েছে। তোমাকে বলেছিলাম—আমি ব্রাহ্মমতকে ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সারা বললেন, আমি তা মোটেই করছি না। যাই হোক, এক প্রার্থনানুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি দেখলাম, স্বামীজী এপর্যন্ত আমাদের যা দিয়েছেন, তারই সর্বোচ্চ অংশ অবলম্বন করেছি। এক ঝলকে তখন বুঝলাম, ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা এ-কাজ করতে আমাকে প্রণোদিত করেছে, যা আমি কখনই হয়ত করতাম না—অন্যের প্রয়োজনের আমন্ত্রণ ভিন্ন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম, আমি হয়ত প্রতীককে ব্যবহার করেছি অভেদ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকে ব্যাহত বা রুদ্ধ করতে। এবং যে-পর্যন্ত না সেই অভেদদৃষ্টি পুনরায় ফিরে পাই, আমি হয়ত প্রতীকে আর ফিরে যাব না। এই আবিষ্কারে কতখানি শান্তি পেয়েছি কি বলব! এটা কি অদ্বৈত সত্যের অপূর্ব প্রমাণ নয়—যে-সত্যকে প্রচণ্ড-ভাবে ঘোষণা করেন স্বামীজী—যেখানে প্রতিটি পথেই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষিত?

ডঃ বসুর সঙ্গে কখনো কখনো কথা বলে এই বিষয় কিভাবে না বুঝেছি! স্বামীজী এবং তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেন না, কারণ সেটা অশালীন হবে; এবং আমাকে সর্বদা জোর দিয়ে বলতে হয়—"দেখতে পাচ্ছেন না—সেই মানুষটি এত বিরাট যে, যে-পর্যন্ত আপনি সত্যের উপর এবং নিজের উপর বিশ্বাসী, আপনি কখনই তাঁর বিরোধী হতে পারেন না।'

একই সঙ্গে ডঃ বসুর মধ্যে এই অসাধারণ ব্যাপারটি দেখা যায়—অদ্বৈতের সেই পুরাতন ধারণা পিছনে থেকে তাঁকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে, যার মধ্যে অন্য বিজ্ঞানীরা অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ-ই প্রমাণগুলিই আমি ভালবাসি—কথা বা যুক্তি নয়—বা ঐ জাতীয় অন্য মারপ্যাঁচ নয়, যা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার,—ভালবাসি এই এক বা অন্য স্তরের অভিজ্ঞতাকে—যেখানে তা সর্বোচ্চ স্তরের নয়, সেখানেও। 'আমাদের উভয়কে সেই একই ব্রহ্মবস্তু করে তোলো।'......

মিঃ হাউই চান, আমি ভারতীয় শিক্ষা-প্রশ্ন নিয়ে কোনো সেরা পত্রিকায় ঝকঝকে জোরালো একটি প্রবন্ধ লিখি। এমনকি ডঃ বসুও বলছেন, এ-ব্যাপারে এক দৃঢ় ভূমিকা নেবার জন্য আমার প্রস্তুত থাকা দরকার। কেবল তাঁর দাবি, তা করার আগে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পূর্ণ অধিগত করে নিতে হবে; ও বিষয়ে এমন অথরিটি হয়ে উঠতে হবে যে, ওরা যেন আমাকে সভয়ে সম্মান করে। তা না হতে পারলে চুপ করে থাকাই ভাল।

উত্তম উপদেশ। সুতরাং আমি এ. এম. বসুর (আনন্দমোহন বসু) কাছে সাহায্যের জন্য লিখেছি।"

১৮ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে : "অল্প এক ছত্র, দারুণ তাড়াহুড়ার মধ্যে, শুধু মজার কথাটা জানাবার জন্য, যে-বিষয়ে সেণ্ট সারা দেখছি তোমাকে গোটাগুটি লিখে পাঠিয়েছে।......ডঃ বসু যে শান্তির সঙ্গে গত রাত্রের আঘাত গ্রহণ করেছেন তা আমাকে সবচেয়ে উল্লসিত করেছে। একদা তিনি স্বামীজীর চেয়েও স্পর্শকাতর ছিলেন। দেশাত্মবোধের সেহেন অনুভূতিপ্রবণ তরু থেকে কার্যকরী কিছু পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। যদিও তিনি এস—এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হয়েছিলেন, ও তাঁর কাছ থেকে অনেক বড়-কিছু আশা করেছিলেন, গত রাত্রে বাড়ি ফিরে যখন আমরা কাহিনীটি বললাম, তখন তিনি শুধু খাড়া হয়ে বললেন, 'আমি অন্য ধরনের বিবরণ আশা করেছিলাম। যাই হোক যা হয়েছে তাও উত্তম।' মিসেস বসু বললেন, উপরতলায় উঠে দেখেন, তিনি শান্তভাবে ঘুমোচ্ছেন!"

অপারেশনের দু'মাস পরে ডঃ বসু পুরোপুরি কাজ শুরু করেন এবং রয়াল ইনস্টিটিউশনে এক যুগান্তকারী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আসার আগে পাঠকদের নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে পুনশ্চ কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই। নিবেদিতা অসুস্থ বসুকে সেবা করে তাঁর হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়ার বা প্রেরণা দিয়ে আত্মিক বলাধানের চেষ্টাই মাত্র করেননি—বস্তুগত সাহায্যের চেষ্টাও যথেষ্ট করেছেন। সে প্রয়াস নানামুখী। ডঃ বসুর জন্য চাকুরী সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, বন্ধু সংগ্রহ, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে অংশ গ্রহণ, সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে প্রচার—সব কিছুই তাঁর কর্মতালিকার অংশ হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি তিনি বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে উপযুক্ত ভাষায় লিখে দিতে শুরু করেছিলেন। এই কাজ তিনি দীর্ঘদিন করবেন, এবং বসুর কর্মজীবনে এর গুরুত্বের কথা পরে আরও আলোচিত হবে।

নিবেদিতার পত্র থেকে আমরা পূর্বে দেখে এসেছি, পাশ্চাত্ত্যে, বিশেষতঃ আমেরিকায় বসুর জন্য চাকরী সংগ্রহে নিবেদিতা কতখানি ব্যস্ত ছিলেন এবং ব্যাপারটা কিভাবে সংগঠিত করছিলেন। জগদীশচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে চাকরি পেলেন, তখন চাকরি নেওয়া সম্বন্ধে তাঁর মানসিক দ্বিধার রূপ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে দেখেছি। নিবেদিতাও ব্যাপারটা জানতেন। বিকল্প পথ তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। একটি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, যার বিষয়ে ইঙ্গিত ডঃ বসু ও শ্রীমতী বসুকে ৫ নভেম্বর, ১৯০০-তে লেখা নিবেদিতার এক দীর্ঘ পত্র থেকে পাই। পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তবু উদ্ধৃত করিনি, এখানেও করছি না, কারণ গোটা বিষয়টি ভবিষ্যতে আমাদের বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে—জামসেদজী টাটা ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের কাছে এক বিরাট দানের প্রস্তাব করেন; ঐ টাকায় একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরী হবে, যেটির পরিচালনায় ভারতীয়দের বড় অংশ থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী সরকার

স্বভাবতঃই এধরনের প্রস্তাবে গররাজি হয়। স্বামীজী টাটা পরিকল্পনায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন; স্বামীজীর সূত্রে নিবেদিতাও। ভারত সরকারকে প্রভাবিত করবার জন্য তিনি বিখ্যাত বিশ্ববাসীদের অভিমত এর পক্ষে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এবং তিনিই ১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে মিসেস ওলি বুলকে দিয়ে ইংলণ্ডে এক ভোজসভায় বিভাগীয় বড় কর্তা স্যার জর্জ বার্ডউডকে নিমন্ত্রণ করান এবং সেখানে আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারের মনোগত অভিপ্রায় জানতে চেষ্টা করেন। আলোচনা অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, স্যার জর্জ বার্ডউড ঘাড় পাততে রাজি হননি। ভোজসভার পরেই নিবেদিতা আলোচনার বিবরণ ডঃ বসুকে লিখে পাঠান। এখানে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, টাটার পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহের অন্যতম কারণ—ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে তিনি সরকারী নিগড়মুক্ত এই উচ্চ গবেষণাকেন্দ্রে স্থাপন করতে চাইছিলেন।

এইকালে জগদীশচন্দ্র নানা চিন্তায় কতখানি বিপর্যস্ত ছিলেন, অপারেশনের পূর্বে লিখিত তাঁর একটি চিঠি থেকে বুঝতে পারি। চিঠিটি সম্ভবতঃ মিসেস বুলকে লেখা, নিবেদিতাকেও হতে পারে। পত্রটি মূলে উদ্ধৃত করছি—

33 Paris Sq.
16th Nov., 1900

My dear friend,

I fully understand your former advice. I some times think I would do anything to free myself from the hateful dependence and giving my mind to practical improvements held out such chance. At the same time I feel overburdened with many thoughts, often weary of thinking, and any new efforts, specially in the direction of business is too much for me. Even writing a simple business letter makes me useless for the day.

My paper will probably come before the R. Society next week and then too I will feel some restraint, as some of the important things which I recently did with crude homely apparatus, are capable of much improvement and far-reaching development with proper apparatus. If I give out the idea of my method, and do not continue the work myself, better results will be soon brought forward by others and my work will appear ridiculously crude. If I go to the nursing home, I shall have to stop the work for sometime.

I ought not to mind about success, but that they will ask an account of what I did, and then are some in the Government too anxious to run down anything I do.

But in all this you know what is best, and I will abide by your advice.

Yours affly.
Jagadish Ch. Bose

রয়াল ইনস্টিটিউশনে স্মরণীয় বক্তৃতার পূর্বে গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্রের উদ্দীপ্ত মূর্তির সংক্ষিপ্ত চিত্র পাই নিবেদিতার চিঠিতে। ১৫ মার্চে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"ডঃ বসু যেন বাতাসে ভাসছেন। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, এক যন্ত্রের পর অন্য যন্ত্র, তাঁর অপূর্ব অভিপ্রায়গুলি এখন বাস্তবায়িত সত্য। শ্বাসরোধ করে সসম্ভ্রমে শুধু চেয়ে দেখতে হয়। জগন্মাতা কিভাবে না তাঁর প্রেরণা এত অজস্রভাবে ঢেলে দিচ্ছেন!"

২২ মার্চে একই জনকে—

ডঃ বসুর কাজের তুল্য কিছু তুমি কখনো দেখনি। এযেন আবিষ্কারের ধারাবর্ষণ।"

অপরদিকে ঘরোয়া মানুষটিকে পাই ৪ এপ্রিলের পত্রে, একই জনকে লেখা—

"ডঃ বসু চান, তাঁর ছোট ভাগনা, মিঃ এ. এম. বসুর বাচ্ছা ছেলেটিকে বছর-খানেক কি তারো বেশী সময় আমি কাছে রাখি; কিন্তু তাঁর ধারণা সারদা দেবী হয়ত আপত্তি করবেন। তা কিন্তু আমার একেবারেই সত্য মনে হয় না, তবু জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছি। ছেলেটিকে আমি তার প্রতিদিনের বাংলা পড়ার সময় বাদ দিয়ে সারাক্ষণ নিজের কাছে রাখতে চাই। আমরা তাকে এমন দেশপ্রেমিক এবং এমন বৈজ্ঞানিক করে তুলতে চাই, যার তুল্য পৃথিবী দেখেনি।*......

---

* আনন্দমোহন বসুর এই শিশুপুত্রের নাম অরবিন্দমোহন বসু। এঁকে লেখা নিবেদিতার দুটি চিঠি পেয়েছি। নিবেদিতার পত্রের ভাষায় যে কী যজ্ঞাগ্নি জ্বলত, তা চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়। ভিসবাডেন থেকে ১০ জুন, ১৯০৯ তারিখে তিনি লিখেছিলেন—

"আদরের অরবিন্দ, আর একটি জন্মদিন সমাগত; এবার তা তোমাকে গৌরবে মণ্ডিত করেছে। তোমার সম্বন্ধে আমরা সকলেই কত গর্বিত! কত গর্বিত তোমার মামা, চেয়ে দেখছি। তিনি অল্পই বলেন, কিন্তু বলার সময়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ।

তাহলে, এইবার, পুরনো জীবনের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ। আমি জানি এখন এবং পরেও তুমি জীবনের **কঠিন পথই** বাছবে, পদে পদে একরোখা তেজে অগ্রসর হবে, কোনো শ্রমেই কাতর হবে না, কোনো ত্যাগেই পরাঙ্মুখ নয়, তোমাকে তা নিয়ে যাবে সমুচ্চ লক্ষ্যে। বিজ্ঞানের আচার্যত্ব কী অপরূপ—কখনো ভেবে দেখেছো? যে-হৃদয় শুধু সত্য চায়—যে-কোনো মূল্যে শুধু সত্য—সে-ই এর যোগ্য। **সর্বোচ্চের** জন্য যারা নিজেদের উৎসর্গ করে—প্রতি পদক্ষেপে নিজের হৃদয়কে বিচলিত করে এগিয়ে যায়—তারাই সিদ্ধিলাভ করে। তোমার মামার বিরাট জীবন আমি স্বচক্ষে দেখেছি; আমি দেখেছি তাঁর আত্মসংযমের রূপ, দেখেছি কী উচ্চ, কী পবিত্র, কী কঠিন তাঁর সত্যের চরিত্র—আমি তাই বিপুল আনন্দে ভাবছি—কী অপূর্ব! তাঁর ছায়ায় পথ চলার সৌভাগ্য তুমি পাবে, তুমি তাঁর শিষ্য হবে, সন্তান হবে! জন্মদিনে আজ কি তুমি প্রার্থনা করবে, যে-নূতন মন্দিরের দিকে তোমার জীবন তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি যেন তার যোগ্য হ্যত পারো!

প্রিয় বৎস, গুরুর কাছে কেমন করে যেতে হয়, সে সম্বন্ধে আমার দুটি-একটি কথা যদি শোনো!

যখন আমরা গুরুর সামনে দাঁড়াব, তখন আত্মায় থাকবে বিপুল স্তব্ধ শান্তি; বন্ধু-বান্ধব, অপর শিক্ষক, সকল চিন্তা-ভাবনা পিছনে পড়ে থাকবে। যেমন অর্জুন কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সমস্ত অতীত জীবন বিস্মৃত হয়ে, সর্বমনপ্রাণ উজাড় করে, করযোড়ে—শুনেছিলেন ভগবদ্‌গীতা। ঠিক সেই রকম। যখনই আমরা গুরুর সামনে দাঁড়াই—গীতা শুনবার জনাই দাঁড়াই। স্মরণে রাখতে হবে সর্বদা, এক অর্থে তিনি মোটেই মানুষ নন—

এক বিরাট সত্য—সত্যের মধ্যে স্থিত,—সেই সত্যের দর্শনই হবে সাধনার বস্তু। অন্য অর্থে অবশ্য তিনি মানুষই, সর্বদা আমাদের মনের মানুষ; সেজন্য তাঁকে ভালবাসব, তাঁর চরণে উজাড় করে দেব হৃদয় সম্পদ, তার দ্বারা যদি তাঁর সেবা হয়!

প্রিয় অরবিন্দ,, তোমার গীতা হবে তোমার বিজ্ঞান, ভাবী ভারতের জন্য সুবিরাট ধর্মবাণী উৎসারিত হবে তার মধ্য থেকে। তুমি এখন বুঝতে পারবে না, ঐ মহান সংগীতের শব্দরাজি তুমি যে বিশ্বস্ত হৃদয়ে শুনেছ—তোমার দেশের কাছে তার অর্থ কী দাঁড়াবে! এ ব্রত কতখানি উচ্চ ও কতখানি দুরূহ, তাও বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু একটি বিষয়ে আমার বিশ্বাস আছে, এমন কোনো ত্যাগ নেই আমাদের অরবিন্দ বসু যা করতে পিছিয়ে আসবে, এমন কোনো যন্ত্রণা নেই যা সে সানন্দে গ্রহণ করবে না, আর নিশ্চয় এমন উচ্চ কোনো ভালবাসা নেই যা প্রকাশ করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে!

প্রিয় পুত্র, স্বয়ং জগজ্জননী তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, তোমাকে তোমার শ্রেয়ঃতম, মহানতম প্রকাশে চালিত করবেন!—তোমার জন্য নিত্য ভালবাসায় ভরা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।"

মায়াবতীতে বসে ২৩ জুন, ১৯১১ তারিখে অরবিন্দমোহনকে লেখা নিবেদিতার আর একটি প্রাণাগ্নিপূর্ণ পত্র পাওয়া গিয়েছে। অরবিন্দমোহনের জন্মদিন উপলক্ষে একটি কলম উপহার দিয়ে নিবেদিতা আশা প্রকাশ করেছিলেন—"তোমার কাজের সকল যন্ত্রই, বিশেষতঃ এই কলমটি, যা সরস্বতীর প্রতীক, সর্বদা উচ্চ ও মহান আদর্শ প্রকাশে নিযুক্ত থাকবে।" তারপর লেখেন—

"যখন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, তখন তুমি ছোট্টটি, সবে শৈশব ছাড়িয়েছ। এখন তুমি একেবারে বি. এস-সি!

অনুভব করছি, আগামীকাল তোমার জীবনের একটি পবিত্র দিন, কতখানি তা এখন তুমি বুঝতেও পারবে না; কারণ তুমি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হচ্ছ, জীবনের বৃহৎ বিদ্যালয়ের প্রায় শেষ শ্রেণীতে; এ যেন প্রাচীন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করা। বেরিয়ে আসবে কিভাবে?

কখনো কি ভেবে দেখেছ যে, নতুন সুযোগগুলিকে গ্রহণ করার সামর্থ্যের দ্বারাই আমাদের পুরনো সুযোগগুলি মহিমান্বিত বা নিন্দিত হয়? কখনো ভেবেছ যে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ তিনিই যিনি সর্বাধিক **শিক্ষা গ্রহণের** শিক্ষা পেয়েছেন! শিক্ষা দেওয়া নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। তা আপনা থেকেই হবে। আমাদের কর্তব্য অপরকে এইটুকু দেখানো—**আমরা শিখতে জানি।**

আমি তোমার জন্য সুখ-সম্পদের পুত্তলরাশি কামনা করছি না। তোমার জন্মদিনের জন্য আমার কামনা—অনন্ত ধৈর্যময় আত্মোৎসর্গ ঘটুক তোমার জীবনে। সত্যের জন্য, কর্তব্যের জন্য, ভালবাসার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো—ত্যাগ করো, ত্যাগ করো, শান্তি না রেখে, শ্রান্তি না রেখে, শর্ত না রেখে, সীমা না রেখে; অর্জন করো সেই শক্তি ও ভক্তি যা বলে—নাও! নাও! কদাপি স্বপ্নেও বলে না—দাও! দাও! দাও!

তারপর, তোমার জন্য প্রার্থনা আমার—অনন্ত জ্ঞানের শক্তি হোক তোমার, আরও জানার তৃষ্ণায় অধীর হও, অধীর হও, যেটুকু সত্য পেয়েছ, কদাপি সন্তুষ্ট হয়ো না তাতে, **আদর্শের অভিমুখে** চড়াই ভেঙে ওঠো নিরন্তর, অক্লান্ত আবেগে, (কখনো আদর্শের ফল-পরিণতি—যশ, সৌন্দর্য, সুখ, সম্পদের জন্য লোলুপ হয়ো না)। আ-হাঃ অরবিন্দ, তোমার জন্য আমি সেই আদর্শই চাই, যা ডুবিয়ে দেয়, মেরে ফেলে, যা কখনো তৃপ্তি দেয় না, শান্তি দেয় না, যা কদাপি করায়ত্ত হয় না।

আর চাই, সাক্ষাৎ কর্তব্যের মধ্যে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে; ভবিষ্যৎ কি করবে না করবে, তা নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে দরকষাকষি করো না। মনের এই প্রবৃত্তি দূর করা সত্যই বড় কঠিন। কিন্তু যাকে আদর্শলাভ করতে হবে, তাকে জানতে হবেই, কিভাবে আনুগত্যের প্রবাহে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়, কিভাবে হাতের কাজের বাইরে না-দেখতে হয়। যেমন আমার গুরু বলতেন, 'কোনো পরিকল্পনা নয়।'

এ সকলই, দেখতে পাচ্ছ, মহান কঠিন আশীর্বাদ। সহজ নয় মোটে, সবচেয়ে **স্বাচ্ছন্দ্যহীন**। আশা করি, তুমি কখনো, কখনই, সহজকে, স্বচ্ছন্দকে বাছবে না, নিজের উপর কঠোর হবে, এমন উচ্চমানের জন্য লড়াই করবে, যা অন্যের প্রত্যাশার অতীত। ওয়াল্ট

সকালে ও সন্ধ্যায় সকলে মিলে আমরা ছুটির ব্যায়াম হিসাবে বাইসাইকেল চড়ছি। খুবই উপভোগ্য। এমনকি সেন্ট সারা পর্যন্ত রিচকে আচার্য করে চড়তে শিখছেন।*......

আমরা সকলে রান্না ঘরেই খাওয়া দাওয়া সারছি, কারণ ডঃ বসু খাওয়ার ঘরকে ছুটির সময়ের ল্যাবরেটরীতে রূপান্তরিত করেছেন। আহা, যদি দেখতে—যন্ত্রপাতি সাজানো অবস্থায় কি দারুণ দেখতে হয়েছে!"

রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পূর্বে নিবেদিতা ৩ মে, ম্যাকলাউডকে লেখেন—

"আগামী শুক্রবার রয়াল ইনস্টিটিউশনে ডঃ বসুর বিরাট বক্তৃতার দিন। ঐ বিরাট ঘটনার জন্য আমরা আশা করি মিসেস লেগেট এবং অ্যালবার্ট এখানে উপস্থিত থাকবেন। কত কি এর উপরে নির্ভর করছে। আশা ও বিশ্বাস করি যে, সভাকক্ষ তারকাখচিত হবে।"

ম্যাকলাউড, ওলি বুল প্রভৃতি সম্ভবতঃ রয়াল ইনস্টিটিউশনের ১০ মে তারিখের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাই তাঁদের কাছে এ বিষয়ে নিবেদিতার পত্র লেখার প্রশ্ন ওঠে না। সুখের বিষয় নিবেদিতা অবিলম্বে দূর ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে বিষয়টি লিখে পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি খুবই দীর্ঘ ছিল, রবীন্দ্রনাথ 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' নামক প্রবন্ধে সেই পত্র থেকে স্থানে স্থানে অনুবাদ করে দিয়েছেন। প্রবন্ধের বাকি অংশও, যাতে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল বিষয়টি সহজভাবে লিখিত, সন্দেহ নেই তা নিবেদিতার পত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে লিখিত। প্রবন্ধের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক সমাজের একাংশ কেন জগদীশচন্দ্রের বিরোধিতায় অগ্রসর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কারণ দেখিয়েছিলেন ; ভারতবর্ষে সহানুভূতি ও সহায়তাহীন কী শোচনীয় পরিবেশে কাজ করতে হয়, বেদনাকরুণ ভাষায় তা জানিয়েছিলেন;† আর শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন সেই 'প্রলোভনহীন

হুইটম্যান বলেছিলেন—"শোনো! আমার খাঁটি কথা বলছি, আমি পুরনো সহজ পুরস্কার দেবো না, **আমি তোমাকে দেব নূতন কঠিন পুরস্কার।"**

যেহেতু আমি তোমাকে এত ভালবাসি, তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি, যেহেতু আমি তোমার পিতাকে ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, এই যে-ঘরে বসে আমি লিখছি, সেই ঘরেই তিনি ৯ বছর আগে বাস করেছিলেন, যেহেতু আর একজন, যাঁকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, যিনি তোমাকে পিতার চেয়েও ভালবাসেন, যিনি স্বয়ং একটি বিরাট আহ্বান, বিরাট বিশ্বাস, তেমনি ভালবাসা—এই সমস্ত কারণের জন্য আমি তোমার উদ্দেশে এই দারুণ প্রার্থনা এনেছি; প্রিয়, আমার প্রিয় অরবিন্দ, এ সমস্ত করছি যাতে করে তুমি সেই পরম অভিপ্রায়ের বেদীমূলে নম্রচিত্তে, স্বার্থহীন প্রাণে আত্মনিবেদন করতে পারো।

চিরদিন তোমার প্রতি গভীরতম ভালবাসায় পূর্ণ—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

রেমং ও হারবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অরবিন্দমোহন এই দুটি চিঠির পটভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তিনি আমাকে কী অপূর্ব দুটি চিঠি লিখেছিলেন! একটি, যখন আমি বিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষায় পাশ করি (তিনি ভিসবাডেনে জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে তখন ছিলেন) এবং দ্বিতীয়টি, বি. এস-সি পাশের পরে। সে সময়ে আমরা সকলে মায়াবতীতে ছিলাম। রাত্রে সেটি লিখে পরদিন সকালে আমার হাতে দেন।"

* এ সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা পূর্বেই রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতিকথায় পেয়েছি।

† "সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,—চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের অনুকূল স্থান;—এই ত স্বদেশের লোক—এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না।" ('আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' প্রবন্ধ)

পণ্ডিত'কে "যিনি জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্মে এই হত-চারিত্র দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয়" হয়ে উঠেছেন।*

রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"আমাদের আচার্যের জয়বার্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।......

আমাদের দেশে দর্শন যে-পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেইপথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এপর্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হকস্লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোনো কোনো জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীবশরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড় বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বতঃ লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী-শক্তির নাড়ী-স্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ অতঃপর "এই সভায় উপস্থিত কোনো বিদুষী ইংরাজ মহিলার (নিবেদিতার) বিবরণ স্থানে স্থানে সাক্ষাৎ অনুবাদ করে দিয়েছেন—

> "সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসুজায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহার পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্বপশ্চাতে আচার্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিতভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

* জগদীশচন্দ্র কর্তৃক ইংলণ্ডে অধ্যাপক পদ প্রত্যাখ্যান এবং সম্ভবতঃ আবিষ্কার পেটেণ্ট করতে অস্বীকারের বিষয় ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম।" (একই প্রবন্ধ)

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙানো রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরনও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থ-তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে-সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে;—অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধ প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজস্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি।—

'I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things

—the mote that thrills on ripples of light, the teeming light on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.'

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ—শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল, পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।"

নিবেদিতা-প্রদত্ত বিবরণ রবীন্দ্রনাথকে ভাবাবিষ্ট করেছিল; ভারতের সত্য গৌরবের অনুধ্যান করেছিলেন কবি অতঃপর—

"লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি' —এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতি ক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,—আমরা অদ্য যাহাকে 'হিঁদুয়ানি' বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনামাত্র;—তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তর-নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে।...

আচার্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্মে কর্মে, সেই পথ ব্যতীত 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'"

রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত ফল হয়েছিল। অনেক বৈজ্ঞানিকের আক্কেলদন্ত গজদন্ত আকারে নির্গত হয়েছিল। তাঁদের চক্রান্তে জগদীশচন্দ্রের ডেপুটেশন-কাল বৃদ্ধি পেল না অথচ গবেষণার প্রয়োজনীয় অগ্রগতির জন্য আরও কিছুকাল য়ুরোপে থাকা দরকার—এসব বিষয়ে অল্পবিস্তর আগে জানানো হয়েছে। নিবেদিতা ও ওলি বুলকে বাদ দিলে এই কালে জগদীশচন্দ্রের প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্ত্যে প্রথম বৈজ্ঞানিক সাফল্যের পরে জগদীশচন্দ্র যখন ১৮৯৭ সালে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দিত করতে গিয়েছিলেন তাঁর ভবনে, সাক্ষাৎ হয়নি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শনরূপে একটি ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল রেখে এসেছিলেন। সে-ই পরিচয়ের সূত্রপাত। তারপরে পরস্পরের দেখা হোক বা না হোক, তাঁরা কাছাকাছি থাকুন বা না থাকুন, মধ্যবর্তী ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলটির বর্ণ গন্ধ ম্লান হয়নি কখনো। সেইকালে, একদিকে কবিবন্ধুর প্রতিভায় মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় গোচর হোক বিশ্বজনের কাছে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন জগৎ-সমক্ষে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের মূর্তির উপরে যবনিকাপাত যেন না হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহির্ভারতে প্রচারের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র কতখানি উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে ব্যাপারে নিবেদিতা কতখানি সাহায্য করেছিলেন, সে বিবরণ আমরা নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে দেব। এখানে জগদীশচন্দ্রের বর্তমান সংকটে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের কথাই আলোচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই এক্ষেত্রে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি জগদীশচন্দ্রকে পাঠান, তাঁর অর্থের যখন বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্র-জগদীশ পত্রালাপের যেসব অংশ মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকে দেখতে পাই—রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের পূর্ব থেকেই জগদীশচন্দ্রের জন্য ত্রিপুরার মহারাজার কাছে অর্থপ্রার্থী। এই বৎসরের সম্ভবতঃ নভেম্বর মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে পাই—"ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আপনার কার্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরও অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।" ২০ নভেম্বর লিখেছেন—"মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুশি হলেন। আচ্ছা তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও, তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও, সেটা যদি আমরা পুষিয়ে দিতে না পারি, তাহলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন?"

চিঠির ভাষা থেকে মনে হয় জগদীশচন্দ্র নন, অন্য কেউ রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্রের অবস্থার কথা জানিয়ে যাচ্ছেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, কবি যেন সরকারী কাজের বন্ধন থেকে মুক্তি নেওয়ার ব্যাপারে ডঃ বসুকে উৎসাহিত করেন। তিনি কে—অবলা বসু কিংবা নিবেদিতা? বা উভয়েই? নিবেদিতা যে হতে পারেন তার প্রমাণ এর কিছুদিনের মধ্যে, রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পরে, রবীন্দ্রনাথকে

পাঠানো নিবেদিতার বিবরণ। সে চিঠি মূলে আমরা পাইনি, এবং আরও অনেক চিঠিই নিশ্চয় পাইনি।

যাই হোক রবীন্দ্রনাথ তারপরে চিঠির পর চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে একই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। (১২ ডিসেম্বর ১৯০০, জানুয়ারী ১৯০১, ২১ মে ১৯০১, ৪ জুন ১৯০১, ২৫ জুলাই ১৯০১ ;—চিঠিপত্র—ষষ্ঠ খণ্ড)।

এর পরের কাহিনীর খণ্ডাংশ দেখা যাক—নিবেদিতার ১৯ জুলাই ১৯০১-এর চিঠি থেকে (ম্যাকলাউডকে লেখা)—

"ডঃ বসুর কাজকে যেরকম ব্যাপক আক্রমণ করা হচ্ছে তাতে আমরা অবশ্যই ভাবতে পারছি—ঐ লাইনে এতাবৎ করা এইটেই সেরা কাজ। শারীরতাত্ত্বিকেরা এমনই বিচলিত যে, চড়াই পাখির মত কিচির মিচির করছে। কখনো তাঁর গবেষণা ফলে তারা বিহ্বল, আবার কখনো বুক বাঁধছে, যেহেতু অক্সফোর্ডের বার্ড বলেছেন—ঐ একই পরীক্ষা তিনি পুনর্বার করে দেখেছেন যে, ঐ ফল হয়েছে আনিশ্চিত সংযোগের জন্যই! বার্ডের মন্তব্য তাঁকে জানাতে সাহস করিনি, কিন্তু অপরপক্ষে তাঁদের সকলের কাছে তাঁর চিঠি থেকে সমূহ স্বস্তি পেয়েছি। ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁরা তাঁদের সকল প্রভাব প্রয়োগ করে আমাদের হতভাগ্য হিন্দুটিকে সরাসরি কলকাতায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। কুছ পরোয়া নেই, ঐভাবে ভারতের সর্বনাশ করা যাবে না। **ওঁকে (বসুকে) কোনো কিছু না বলে আমি মিঃ টেগোরের কাছে লিখেছি—কোনো হিন্দু রাজা কি এঁর এবং এঁর কাজের ভার নিতে পারেন না?"** (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এইকালে নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় ঘটে, এবং বসুকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে উভয়ে একই অভিপ্রায়ে আবদ্ধ হন। চিঠিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে ১৬ জুলাই ১৯০১ তারিখে লেখা রমেশচন্দ্রের একটি চিঠি পাওয়া যায়, যাতে তিনি ইংলণ্ডে বসু-বিরোধী চক্রান্তের বিবরণ দিয়ে ডঃ বসুকে সাহায্য করা যে ভারতবর্ষের মানুষের বিরাট কর্তব্য, তা প্রবল আবেগের সঙ্গে লিখেছিলেন। এই পত্রেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হলে ডঃ বসুর কি পরিমাণ টাকার দরকার তারও হিসাব দিয়ে লিখেছেন— "The suggestions I have made in this letter are all my own." রমেশচন্দ্রের সাজেশানগুলি ব্যক্তিগত হতে পারে কিন্তু নিবেদিতা বা অবলা বসু সবই জানতেন। ২৩ জুলাই মিসেস ওলি বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন—

"মিঃ দত্ত আমাকে বলেছেন, তাঁর মতে, ডঃ বসুকে শৃঙ্খলমুক্ত করার সময় এসেছে। তিনি হিসাব করে দেখেছেন, কাজ চালিয়ে যেতে এবং শেষ করতে ডঃ বসুর প্রয়োজন—

সহকারীর মাহিনা ও অন্যান্য খরচ	...	বৎসরে ২০০ পাউণ্ড
যন্ত্রপাতি	...	বৎসরে ২০০ পাউণ্ড
ব্যক্তিগত খরচ, ভ্রমণাদির জন্য	...	বৎসরে ৬০০ পাউণ্ড

মোট—বৎসরে ১০০০ পাউণ্ড করে,
সারা জীবনের জন্য।

এই টাকা অ্যানুয়িটি হিসাবে ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এবং ২ লক্ষ টাকা হলেই তা করা যাবে। অর্থাৎ মাত্র ১৩,০০০ পাউন্ড ; তবু পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। অবশ্য আমার ভুল হতেও পারে। সে যাই হোক, গোপনে ভারত থেকে টাকাটা যাচ্ঞা করতে হবে, এবং আমাকে যাচ্ঞা-কাজে সাহায্য করতে হবে। তুমি জানো, পূর্বে তাঁর (স্বামীজীর?) বিষয়ে টাকাকড়ির ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য ভাল, এক্ষেত্রেও হয়ত কিছু পেতে পারি। তোমার কি মনে হয়? আমি বলেছি, ঐ ভিক্ষার কাজ আমার কাছে সর্বোচ্চ কল্যাণের কাজ হবে—নিশ্চয় তা হবে। মিঃ দত্ত আমাকে এমন সব লোকের দ্বারস্থ হতে বলতে পারেন, যাদের তিনি সহজে নিজে বলতে অসমর্থ। তিনি ইতিমধ্যেই মিসেস বসুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে মিঃ টেগোরের কাছে লিখেছেন। কিন্তু তাঁর ধারণা মিঃ টেগোর অসহায় বোধ করবেন।

এই কাজের আদর্শের দিকটিও মিঃ দত্ত উপলব্ধি করেছেন—এ কাজ করলে জাতি কতখানি লাভবান হবে, এ কাজ নবীন বিজ্ঞানকে পুরাতন বিজ্ঞানের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করে দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বলেন, কোনো 'নেটিভ গভর্নমেন্ট' (দেশীয় রাজ্য?) এ'র ভার নিতে সাহস করবে না। হায় টাটা! হায় টাটা!

সুতরাং প্রিয়তমাসু, যে-ব্রত তোমাকে প্যারিস থেকে টেনে এনেছে—'এ'দের সংকটের অবস্থা আমরা পার করিয়ে দেব'—তাকে আর টেনে রাখার প্রয়োজন নেই।"*

---

* ঐ ২৩ জুলাই তারিখেই মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার আর একটি চিঠি আছে, যার মধ্যে মনে হয়, ডঃ বসুর আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়া সম্বন্ধে ইঙ্গিতে কিছু বক্তব্য আছে।—

"*Re the patent*: Molybdenum being absolutely natural to electric conductivity, the curve being a straight line without deflection, this is a material of which standard high resistances can be made.

The Bairn has given you this information and more by now—but just in case—I am so pleased that you feel it was the nick of time. And I am *so so so* pleased Dearie that you are there!"

প্যাট্রিক গেডিস পেটেন্ট প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এসব বিষয়ে ডঃ বসুর উদাসীনতার কথা বলেছেন। ভারতীয় পূজামন্দিরে অর্পিত শুভ্র পুষ্পের বাল্যস্মৃতি বসুর মনে চিরদিন থেকে গিয়েছিল; তাঁর জ্ঞানসাধনা যেন ঐ রকম নিঃস্বার্থ সর্বশুভ্র হয়। তাই আবিষ্কারাদিকে ব্যবসায়ে খাটাতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। গেডিস লিখেছেন—

"In 1901, one of the great manufacturers of wireless apparatus proposed to Bose, just before his Royal Institution lecture of that year, to sign a remunerative agreement as to his new type of receiver; but to the business man's frank surprise, not to say disgust, he declined the offer. An American friend, indignant with what seemed such impractical quixotism, forthwith patented the invention in his name in America, but Bose would not use his rights, and allowed the patent to lapse."

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণেও ডঃ বসু জানান—এই বিজ্ঞানমন্দিরের আবিষ্কার পেটেন্ট করা যাবে না।

রমেশচন্দ্রের উদ্যোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল মনে হয় না। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ, পূর্ব থেকেই যিনি সাহায্য সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, তিনি কিন্তু রমেশচন্দ্রের আশঙ্কামত সত্যই 'অসহায়বোধ' করেননি, বরং উদ্দীপিত হয়েছিলেন।* রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে তাঁর ত্রিপুরা-সহায়কে স্মরণ করেছিলেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ আবার নিবেদিতার চিঠি পান—

"আজ মিস নোবলের চিঠিতে তোমার (বসুর) কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি।" (সেপ্টেম্বর ১৯০১)

পরের কাহিনী, রবীন্দ্র-পক্ষে—

"আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি।...তিনি (মহারাজা)) শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরও দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।" (ডঃ বসুকে লেখা, অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০১)

"জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে।" (২৪ শ্রাবণ, ১৩০৯)

নিশ্চয় ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চিঠির পর চিঠিতে "আর্য আচার্য জগদীশকে" অর্ঘ্যদান করে চললেন†, এবং নিবেদিতা নিশ্চয় জানিয়ে চললেন বসুর কীর্তিকথা। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার অধিকাংশ চিঠিই আমরা পাইনি, এবং নিবেদিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিও। কবিকে লেখা নিবেদিতার যে দুটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তার দ্বিতীয়টির অনুবাদ এখানে উপস্থিত করব, যদিও আমাদের আলোচ্য পর্বের (১৮৯৯ জুন—১৯০২) অল্প পরে সেটি লেখা—১৮ এপ্রিল ১৯০৩, তারিখে। এই দীর্ঘ পত্রটিতে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ডঃ বসুর আবিষ্কারের এবং বিঘ্নের বিবরণ দান করেছেন ; এমন চমৎকার

---

* রবীন্দ্রনাথ(...)অগস্ট ১৯০১ তারিখে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল।"

রমেশচন্দ্রের তৎপরতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন (২০ জুলাই ১৯০১)—"রমেশবাবুর সহিত সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার কথায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। একবার এইভাবে বাধা পাইলে যে আর ফিরিয়া যাইব না, তাহা বুঝিতে পারি। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। তোমার পত্র পাইলে স্থির করিব।"

† বাংলা দেশে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনাকে সুপরিচিত করতে রবীন্দ্রনাথ যৎপরোনাস্তি করেছেন। এ সম্বন্ধে চিঠিপত্রের (ষষ্ঠ খণ্ড) সম্পাদক জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে দুটি প্রবন্ধ লেখেন—"আচার্য জগদীশের জয়বার্তা" (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮) এবং "জড় কী সজীব?" (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)। "বন্ধু ও আত্মীয়মণ্ডলীকেও" রবীন্দ্রনাথ এই কাজে প্রণোদিত করেন। তাঁর সহকর্মী জগদানন্দ রায় এই সময় ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 'প্রিয় সুহৃৎ' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও একাধিক প্রবন্ধে একই কাজ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বাংলায় বিজ্ঞানের লেখায় নিবেদিতা কিরকম উৎসাহী ছিলেন বোঝা যায় তাঁকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার সম্পাদিত নিবেদিতা শতবার্ষিকী গ্রন্থে (ইংরাজী) চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছে।

সে লেখা যে, সেটি জগদীশচন্দ্রের জীবনের এক পর্যায়ের ভূমিকারূপে গৃহীত হতে পারে, এবং বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কেন ঐ কাহিনী বলবার যোগ্যতম মানুষরূপে নিবেদিতাকেই স্থির করেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক, নিবেদিতার পত্রোক্ত বিবরণের বেশ কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই জগদীশচন্দ্রের পত্র মারফত (নিবেদিতার পূর্বেকার পত্র মারফতও) জেনে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার পত্রের শেষ অংশে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, কী আর্ত ক্রন্দন—মানবতার পক্ষে, লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের পক্ষে, অগ্নি ও অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন। অনুবাদে, আমি স্বীকার করছি, মূলের রস কিছুই ফোটেনি।

জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার চিঠি

৯, ইলিসিয়াম রো,
কলিকাতা
১৮ এপ্রিল, ১৯০৩

প্রিয় মিঃ টেগোর,

অধ্যাপক বসু ঠিক ঠিক কি আবিষ্কার করেছেন এবং কোন্ অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে তাঁকে ঐসব আবিষ্কারের কাজ করতে হয়েছে, সে বিষয়ে বিবরণ লিখে পাঠাতে বলেছেন। মনে হয়, একটি চিঠির মধ্যে যতখানি লেখা যায়, সেই ধরনের বিবরণই আপনি চেয়েছেন। আরো ধরে নেওয়া যায়, এ চিঠি ব্যক্তিগত, তাই ভয় না রেখেই ইতস্ততঃ কোনো কোনো নামোল্লেখ করতে পারি, প্রকাশ্যে আমার লেখা উদ্ধৃত হবে না, এই বিশ্বাসে।

কলকাতায় আসার পরে আমি অধ্যাপক বসু ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে। মহা আতঙ্কিত হয়ে তখন দেখেছিলাম, ঐ রকম বিরাট বিজ্ঞানকর্মীকে কি ধরনের ধারাবাহিক অসুবিধা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়, এবং সেইসব অসুবিধা ও উৎপীড়ন ঘটাচ্ছেন তাঁরাই যাঁদের একান্ত ইচ্ছা তাঁর কৃতিত্বের অবসান হোক, কারণ ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে গাত্রদাহকর। গবেষণার সময় যাতে তিনি না পান তার জন্য কলেজ-রুটিন যতখানি সম্ভব শ্রমসাধ্য করা হয়েছিল, এবং সামান্য যা-কিছুই ঘটুক না কেন, তার জঘন্য কদর্থ করা ও বিরক্তিকর চিঠি লেখালেখিতে তাঁকে বাধ্য করা হত।

এসব জিনিস আপনার চোখে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু যে-কাজের জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যাপক ও ধারাবাহিক ভাবাবেগের প্রয়োজন হয়, সেখানে স্বাধীনতা ও শান্তির কতখানি প্রয়োজন সে বিষয়ে যদি আপনার কোনো ধারণা থাকে (তা অবশ্যই আপনার কাছে), তাহলে নিশ্চয় বুঝবেন, আমাদের বন্ধু যে, কাজ করে যেতে পেরেছেন এবং পারিপার্শ্বিকের ঐ চেহারা সত্ত্বেও সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন—কী অপূর্ব ব্যাপার তা! আমেরিকান বা ইংরেজ, ফরাসী বা জার্মানদের মত স্বাধীন দেশের লোকেরা ডঃ বসুর তুল্য বৈজ্ঞানিককে স্বজাতির মধ্যে পাবার জন্য সানন্দে যেখানে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে, সেখানে

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও ওহেন বিরাট বৈজ্ঞানিককে একেবারে একাকী কাজ করতে হচ্ছে—স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম এই দৃশ্যে! আমি তখন ইউরোপ থেকে সবে এসেছি ; খনিজ দ্রব্য ভেদ করে যায়, এমন ঈথার-তরঙ্গের আবিষ্কারক-রূপে সেখানে তাঁর নাম সুপরিচিত। ইউরোপে তাঁর কাজের সংবাদ বিলম্বে পৌঁছেছিল। রণ্টেজেন রশ্মির সঙ্গেই তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আবিষ্কার আরও গভীরে প্রবেশে সমর্থ, কারণ রণ্টেজেন রশ্মি অস্থি ও ধাতুতে প্রতিহত হয় কিন্তু এঁর আবিষ্কার তাদের ভেদ করে যায়। যতদূর মনে হয়, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই তিনি কলকাতার টাউন হলে ঐ অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্ব যন্ত্রযোগে প্রমাণ করেছিলেন, এবং তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের দু' বছর পরে, ইটালীর কিছু বৈজ্ঞানিক কাগজে দেখা যায়, মার্কনি ঐ রশ্মিকে ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন।

আপনি অবশ্যই বুঝবেন যে, বিজ্ঞান জগতে মার্কনি, টেসলা, ম্যাসিন ধরনের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকদের স্থান ডঃ বসুর মত সন্ন্যাসী-মনের সন্ধানীদের তুলনায় অনেক নিম্নে। সন্ধানীদের কাছে জ্ঞানই একমাত্র লক্ষ্য, জ্ঞানের জন্যই তাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণ করেন। এমন কি অধ্যাপক (অমুক) পর্যন্ত পেটেণ্ট নিয়ে, বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের বিরাট সুনামের ক্ষতি করেছেন, যাতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যাই হোক, ডঃ বসু এই বিশেষ ঈথার-তরঙ্গের অস্তিত্বই কেবল প্রদর্শন করেন নি, গবেষণার বিরাটত্বের মতই তিনি নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিরাটত্ব দেখিয়েছেন,—'কৃত্রিম চক্ষু' নামে পরিচিত তাঁর যন্ত্রটি সরল ও সংহত রূপের জন্য অত্যাশ্চর্য বস্তু বলে গৃহীত হয়েছে। প্রিন্স ক্রপটকিন বলছিলেন, অধ্যাপক টমসন এক সপ্তাহ আগে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে আলোকের পোলারাইজার-এর কাজ করছে এমন একটি কয়েক গজ দীর্ঘ যন্ত্র দেখালেন,—পরের সপ্তাহে ডঃ বসু সেই একই কাজ করলেন, অন্য কিছুর দ্বারা নয়, কেবল একখানি বই তুলে নিয়ে দেখালেন, (ঘটনাচক্রে সেটি একটি ব্রাড্‌শ!) কিভাবে রশ্মি এক দিক দিয়ে যাবে, অন্য দিক দিয়ে নয়। প্রিন্স ক্রপটকিন বললেন—"আমি নিজের মনে বললুম, এই হল সর্বোচ্চ প্রতিভার যোগ্য সহজতা।" ডঃ বসুর পদ্ধতি যে এমন আশ্চর্যরকম সহজ হতে পেরেছে, তার মূল কারণ অবশ্য—তাঁর থিয়োরী সমক্ষেত্রের ইংরাজ ও জার্মান প্রতিযোগীদের তুলনায় বহু গুণে উন্নত।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আমার বিশ্বাস তিনি রয়াল সোসাইটি মারফত পেপার প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে সর্ববিধ অসুবিধার মধ্যে কাজ করেও প্রতি বছর দুটি কি তিনটি পেপার প্রকাশ করে গেছেন—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যাওয়া পর্যন্ত এই রকমই চলে। (সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি যদি ২ বৎসরে একটি পেপার প্রকাশ করতে পারেন, সেটা উত্তম কীর্তিরূপে গৃহীত হয়!) আবার অধ্যাপক বসুর কাজ প্রতি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে মৌলিক এবং এক বিশেষ অর্থে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসম্পন্ন। একটি আশঙ্কায় তিনি সর্বদা তাড়িত হয়েছেন—যদি কোনো একটি ক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হন, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় তাঁর দেশবাসীর কোনো অধিকার নেই—তাই যেন প্রমাণিত হয়ে যাবে! লণ্ডনে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোগশয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, সেইসঙ্গে সর্বশেষ

আবিষ্কারসমূহকে প্রকাশের লড়াইও চলছে, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন—"সবাই জানে আমাদের অপূর্ব কল্পনাশক্তি রয়েছে, কিন্তু আমাকে অধিকন্তু প্রমাণ করতে হবে, নিখুঁত কাজের ক্ষমতা এবং নাছোড় লেগে থাকার ক্ষমতাও আমাদের আছে।" তা তিনি সত্যই প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড র‍্যালে এবং স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্, উভয়েই তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর পদ্ধতি যে নিখুঁত, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, এবং তিনি ১৮৯৫—৯৬-তে যে এক্সপেরিমেণ্ট দেখিয়েছেন, ১৯০১ সালেও তার পুনঃসম্পাদন করতে আর কেউ সমর্থ হল না! অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা বটে!

১৮৯৪ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়ের কাজ : অদৃশ্য আলোক-পোলারাইজেশনের উপর ডজনখানেক কি তারও বেশী স্বতন্ত্র অনুসন্ধান। 'Dark cross'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ ও অন্যান্য মূল্যবান কাজ—ইউরোপের অগ্রসর কর্মীদের কাছে বহুল ইঙ্গিতসূচক,—যাঁরা এঁর থিয়োরী এবং যন্ত্রাদি থেকে সূত্র গ্রহণে বিলম্ব করেন নি। ১৯০০ খৃীষ্টাব্দ থেকেই কিন্তু স্পষ্টতঃ এইসকল বিচ্ছিন্ন কাজগুলি বিরাট এক সাধারণীকৃত রূপের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে, যার সর্বাঙ্গসম্পন্ন রূপকে এখনো জগতের গোচর করা হয়নি, যখন করা হবে তখন থেকে উত্তরোত্তর তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর দর্শন-গত আগ্রহের সৃষ্টি করবে।

'Stress and Strain' -এর বিরাট থিয়োরীর ইঙ্গিতই আমি এখানে করছি। একে প্রকাশ করার মত সময় এবং সামর্থ্য যদি তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন, তাহলে তা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতই যুগান্তকারী আবিষ্কার হবে—পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের যোগ্য উপহার হবে তা।

এই ব্যাপক সত্যের গৌণ প্রয়োগই ইতিমধ্যে প্রভূত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—এর সূত্রে প্রথম যে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তা হল— 'Binocular Alternation of Vision'. আর একটি অধিকতর ব্যবহারগত (অর্থাৎ ব্যবসায়িক) আবিষ্কার ঘটিয়েছে—বেতার সংকেতের গ্রাহকযন্ত্রের উন্নতি ; লজ্-এর সহযোগী ডঃ মুরহেড খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন, এই পদ্ধতির ক্রমোন্নত যে ব্যবহার ইদানীং ভারতে করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডঃ বসুর পেপারগুলি ও কথাবার্তা থেকে তাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত লাভ করেছেন। এই থিয়োরীর বৃহত্তম প্রয়োগ অবশ্য খাঁটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই। ফটোগ্রাফির মধ্যে, রসায়নের মধ্যে এবং 'Molecular Physics'-এর মধ্যে যে আপাত বৈষম্যের রূপ রয়েছে, তার রহস্যসূত্র এর মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, এর থেকে 'Vegetable Response' নামক ব্যাপারের আবিষ্কার ও সূত্র নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। ডঃ বসুর এই মতবাদ, এইসব ক্ষেত্রের নানা ছোটখাট হবু থিয়োরীকারদের অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করেছে, এবং সেইজন্যই যে-সব শারীর-তাত্ত্বিক প্রাণের অনন্য স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে ব্যস্ত, তাঁদের তরফ থেকে কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে। এই বিরোধিতা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। এবং সাধারণতঃ এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বৈজ্ঞানিক নিজের বিরাটত্ব প্রমাণ করেন, এবং বিরোধীদের জয় করেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানগত বিরোধিতার সঙ্গে প্রচণ্ড জাতিবিদ্বেষও যুক্ত হয়েছে ; এবং আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, এইসব লোকই ইণ্ডিয়া অফিসে তদ্বির করে ডঃ বসুর ডেপুটেশন-বৃদ্ধির প্রস্তাব রদ করেছেন, ঠিক সেই সময়টিতে, যখন

ডঃ বসুর মত প্রচারিত ও পরিজ্ঞাত হতে আরম্ভ করেছে এবং তাঁর বই প্রকাশিত হয়নি।

যে-বিশেষ লোকটিকে আমি সন্দেহ করি তিনিই নভেম্বর মাসে ডঃ বসু ভারতে আছেন জেনে (যাঁকে যথার্থতঃ জোর করে ভারতে পাঠান হয়েছিল) তাঁর কিছু আবিষ্কার চুরি করেন ও নিজের নামে প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞান-জগতে ডঃ বসুর নাম এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ঐ ব্যক্তি ছোট একটি দল গঠনে সমর্থ হয়েছেন ; তবু যদি উপযুক্তভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বিশ্বাস করি সহজেই তাদের তুচ্ছ করে দেওয়া যাবে।

Response in Living and Non-living বইটির এখন জয়জয়কার। কিন্তু আমি আরও অনেক বড় কাজ চাই—যা কেবল এই ভারতের বৈজ্ঞানিকই লিখতে সমর্থ, সে বই হবে 'Molecular Physics' -এর উপরে, তার মধ্যে ভারতের যে-বিরাট মন উপনিষদের যুগে সকল মানবজ্ঞানকে পরিক্রমণ ক'রে তাকে অদ্বৈত বলে ঘোষণা করেছিল, সেই মনই ঊনবিংশ শতাব্দী যে-বিরাট বস্তু-পুঞ্জকে সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করেছে, তাকে পুনশ্চ দর্শন করে, নিছক অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী, যন্ত্র-উপাসক, স্বর্ণ-শিকারী পাশ্চাত্ত্যের কাছে পুনরায় ঘোষণা করবে—বহুরূপে প্রতিভাত এই বস্তুসত্য মূলে সেই এক—অদ্বৈত।

কিন্তু বুঝতে পারি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-ধরনের একটা কাজ আরম্ভ করার অনুরোধ পর্যন্ত করা যায় না। পূর্ণ সহানুভূতি এবং সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার যেখানে একান্ত প্রয়োজন, সেখানে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, যেহেতু চাকুরিয়া অতএব ব্যতিব্যস্ত-করা কাজের দায়, অন্নসংস্থানের নিত্য চিন্তা, ক্ষুদ্র ঈর্ষার উপরে ওঠার ক্ষমতা নেই এমন সামান্য আমলাদের সৃষ্টি-করা নানা অসুবিধা, —এও কি যথেষ্ট নয়? তথাপি আমরা তাঁকে বিরাট কাজে হাত দেবার অনুরোধ করি! কিন্তু **তাঁর** জন্য কতখানি করতে প্রস্তুত **আমরা**? আমরা কি তাঁকে এমন জ্ঞান-সঙ্গী দান করতে পারি, যিনি প্রেরণা দিয়ে এই কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে উৎ-সাহিত করবেন? একথা কি আমরা কখনো গভীরভাবে ভেবেছি যে, বর্তমান ভারতে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীর কাজে লিপ্ত আছেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁর পদে কাজ করতে রাজি হবে এমন যে-কোনো ইংরেজের, অতি সাধারণ ইংরেজের চেয়েও তিনি কম মাইনে পান?

লন্ডনের ডাঃ গারনেট আমাকে ভিয়েনার সুমহান বিজ্ঞান-কলেজের বিরাট জাঁক-জমকের কথা বলেছিলেন। সেই দেখে, তিনি যখন সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, কী বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার!—তখন সরকারী প্রতিনিধি সগর্বে বলেছিলেন, যদি এখান থেকে সারা শতাব্দীতে **একজন** যথার্থ বৈজ্ঞানিকও জন্মান, তাহলে তার তুলনায় এই সমস্ত ব্যয় **সামান্যই**। আমাদের মধ্যে এমন কথা বলবার মত কে আছেন?

ভারত! হে ভারত! তুমি কি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ একটি সন্তানকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে পারো না, যা তাকে বিশ্রাম দেবে না, ঠেলে দেবে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমারই জন্য সংগ্রাম করতে— যেখানে আগুন জ্বলছে লেলিহান, পাগল হয়েছে সংঘাত, এবং ঘর্মে ও শ্বাসে চলেছে দারুণ প্রয়াস। হে ভারত, যদি তুমি তা করতে না পারো—যদি তুমি নিজ সন্তানকে পর্যন্ত আশীর্বাদ ক'রে সজ্জিত আকারে

রণক্ষেত্রে পাঠাতে অসমর্থ হও—তাহলে এই বড় অসুখী অথচ বড় ভালবাসার দেশটির আসন্ন সর্বনাশ বিলম্বিত হোক, স্তব্ধ হোক নিয়তির সমুদ্যত বজ্র—তা বলবার কি কোনো অধিকার আমাদের থাকবে?*

প্রিয় মিঃ টেগোর, খুবই অসম্পূর্ণ এই কথাগুলি। কিন্তু ইতিমধ্যেই নোট বইয়ের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যবহার করেছি, সুতরাং এখানে চিঠি শেষ করতেই হচ্ছে।

আপনার চির বিশ্বস্ত—
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থরচনায় নিবেদিতার সাহায্য : ডঃ বসুর সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রবন্ধ ও বক্তৃতা

জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ

রয়াল সোসাইটির বৈজ্ঞানিক মুখপত্রে জগদীশচন্দ্রের পেপার প্রকাশ যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন জগদীশচন্দ্র গ্রন্থাকারে তাঁর গবেষণা প্রকাশ করবেন স্থির করেছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চয় নিবেদিতা ও মিসেস বুলের পরামর্শ পেয়েছিলেন, সাহায্য তো নিশ্চয়ই। ১৯০১ সালের অনেকখানি অংশ ধরে গ্রন্থরচনার কাজে নিবেদিতা সাহায্য করেন, এবং এই কাজে ব্যাপৃত থাকাই তাঁর ভারতযাত্রাকে বিলম্বিত করেছিল। জগদীশচন্দ্র তাঁকে ছাড়তে মোটেই রাজি ছিলেন না, এমনকি মিসেস ওলি বুলও নয়।

জগদীশচন্দ্রের *Response in the Living and Non-Living* নামক বইটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করা হয়েছিল দেশবাসীর উদ্দেশ্যে—

To my Countrymen
This Work is Dedicated.

উৎসর্গপত্রের বাঁ দিকে ছিল ঋগ্বেদের বাণী—

"The real is one: wise men call it variously"—Rig Veda.

---

* এই অনুচ্ছেদটির অনুবাদ নিতান্ত অসন্তোষজনক, তাই মূলও উদ্ধৃত করছি—

"Ah India! India! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,—not to sit at ease, but—to go out and fight your battles where the fire is hottest and the labour most intense, and the contest raging thickest? And if you cannot do this—if you cannot even bless your own child and send him out equipped, then,—is it worth-while that the doom should be averted, and the hand of ruin stayed, from this unhappy and so beloved land?"

বইটির ১৯১০ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল—২০+১৯৯। নক্সা ও ছবি ছিল—১১৭।

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে নানা সময়ে দেশবিদেশের নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, একথা বিক্ষিপ্ত সূত্রে শোনা গেছে, এবং নিবেদিতার জীবনীকারেরাও বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটি ছাড়া আমরা দ্বিতীয় কোনো রচনা আবিষ্কার করতে পারিনি। এখানে শুধু এইটুকু বিনা দ্বিধায় বলা চলে, সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে নিবেদিতার যে-রকম ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং সংগঠনে তিনি যেরকম পারদর্শী ছিলেন, তাতে স্বনামে ছাড়াও বেনামে তিনি নিশ্চয় লিখেছেন, কিংবা অপরকে লিখতে প্রণোদিত করেছেন।

রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় নিবেদিতার রচনা

অনেক সন্ধানের পরে জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে নিবেদিতার যে প্রবন্ধটি আবিষ্কার করেছি, সেটি ইংলন্ডের সুবিখ্যাত 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২-এর অক্টোবর সংখ্যায়। লেখাটির পিছনে অনেকখানি কাহিনী আছে —নিবেদিতার পত্র থেকে তার ক্রমিক বিবরণ পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য রিভিউ অব রিভিউজের সম্পাদক উইলিয়ম স্টেডের সঙ্গে আগে থেকেই নিবেদিতার পরিচয় ছিল। এ-বিষয়ে নিবেদিতার পত্র—

১ মার্চ ১৯০১, ম্যাকলাউডকে : "মিঃ স্টেড প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ডঃ বসুর 'চরিত-চিত্র' ছাপাবেন,* যা জীবন্ত ভারতের ছবি ফোটাবে।"

২২মার্চ একই জনকে : "চরিত-চিত্র নিয়ে এগোচ্ছি। এ ব্যাপারে তুমি উৎসাহ দিয়েছ, কল্যাণ হোক তোমার।"

১০ জুন, একই জনকে : "ডঃ বসুর চরিত-চিত্র আমি ঠিকই লিখেছি। তা এখন মিঃ স্টেডের হাতে। এটা মনোনীত হতে পারে।"

১৯ জুলাই, একই জনকে : "চরিত-চিত্র আমি লিখেছিলাম এবং কাজটা বিরাট দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এখন মিঃ স্টেড তা প্রত্যাখ্যান করছেন, এই কারণে যে, এতে ভারতবর্ষ বড় বেশী, ডঃ বসু বড় কম। যাইহোক, আমি আবার লিখছি, শেষ পর্যন্ত গৃহীত হবে এই প্রত্যাশায়।"

২০ জুলাই, মিসেস বুলকে : "বসুর চরিত-চিত্রের পুনর্লিখন সম্পন্ন হয়েছে। মিঃ স্টেডের চিঠি পুনরায় যখন পড়লাম, নিজেকে কি রকম যে বোকা স্বার্থপর মনে হল কি বলব। অবশ্যই তিনি, যদি চান, 'ভারত' অংশ বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অংশ

---

* রিভিউ অব রিভিউজে প্রায় প্রতি মাসে সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তির বহু চিত্রসংবলিত বিস্তৃত জীবনচিত্র ছাপা হত। কেউ খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিবেচিত হলে তবেই তাঁর চরিত-চিত্র ছাপা হত।

প্রকাশ করতে পারেন, তাতে আমি একটুও কিছু মনে করব না। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় করে সাক্ষাৎ করো। কেবল তিনি খোকাকে (বসুকে) কোনভাবে ভেঙে চুরে দেখাতে পারবেন না কিংবা আমাদের দুজনের কোনো একজনকে না দেখিয়ে কাজ সম্বন্ধে কোনা মন্তব্য করতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলো।......

চরিত-চিত্র হয়ে যাবার পরে বইয়ের ('দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ') কোন্ অধ্যায় আসবে বুঝতে পারছি না, সম্ভবতঃ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের অধ্যায়। এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমি সর্বদা মোহ বোধ করি। কিন্তু ডঃ বসুকে এবিষয়ে কিছু না বলাই ভাল—তিনি অত্যন্ত চটে যাবেন।"

২৩ জুলাই, মিসেস ওলি বুলকে : "চরিত-চিত্র নতুনভাবে করতে আমি সবিশেষ চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখলাম এখানে আসল পাণ্ডুলিপিটি নেই, কেবল কতকগুলি খসড়া কাগজপত্র রয়েছে। আসল লেখাটা নিশ্চয় উইম্বলডনে গ্লাস-কাবার্ডে রয়ে গেছে। সত্যই কাজটা আর করতে পারলাম না। মনে হয় সবচেয়ে সহজ কাজ হবে— বর্তমান আকারটিকে ভাগ করে তার মধ্যে সাক্ষাৎ চরিত্র সম্বন্ধে নতুন অংশ যুক্ত করে বলা—কিভাবে, কোন্ ভিত্তিতে ঐ চরিত্রের অভ্যুদয় হয়েছে। মূল অসুবিধা ঘটাচ্ছে আমার এই প্রবল বিশ্বাস : ঐ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অলৌকিক সৌন্দর্যে ও পবিত্রতায় সমমূল্য। প্রার্থনা করো, আমি যেন সেই উপনিষদ রচনার পরম অধিকার পাই যার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতি তাঁকে স্মরণ করবে।"

যে বিশাল কল্পনা ও আবেগ নিয়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর চরিত-চিত্র এঁকেছিলেন, উইলিয়ম স্টেডের সাংবাদিক বুদ্ধি সকল ভারতপ্রীতি সত্ত্বেও তার পূর্ণ মূল্য স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না। নিবেদিতা যেভাবে লিখেছিলেন, সেভাবে ছাপা হয়নি, এবং বড় দুঃখের কথা, মূল লেখাটির সন্ধান আমরা পাইনি। নিবেদিতার লেখাটি খণ্ডিত এবং পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল—'চরিত-চিত্র' রূপে নয়—জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থের আলোচনা রূপে। লেখার শেষে নিবেদিতার নামের আদ্য অক্ষর ছিল—M.N. সম্পাদক সূচনায় প্রশংসা করে বলেছিলেন, যোগ্য জনই এটি লিখেছেন। জগদীশচন্দ্রের পোরট্রেট এবং অনেক বৈজ্ঞানিক নক্সা লেখাটির মধ্যে ছাপা হয়।

THE BOOK OF THE MONTH

Is Matter Alive? By Professor Bose

[Messrs. Longmans, Green and Co. publish this day (October 15th) a scientific work by Professor J. C. Bose, B.Sc., London, of Calcutta University, which, under the simple title of "The Response of Matter", establishes the very startling truth that what we call dead matter can be proved to be alive!

He does not go so far as to suggest that a piece of steel has either sex or soul, or heart or mind, or consciousness. But he

does prove that organic substances are capable of feeling to an extent which enables them to make that distinct and registrable response to external stimulus which has hitherto been regarded as the distinctive sign of life.

The following account of the discovery of Professor Bose, written by a competent hand, is illustrated, by permission of the publishers, with blocks appearing in the book.]

Ever since the birth of modern science men have been fascinated by the difference between the organic and the inorganic. The mystery of life, and pre-eminently of animal life, has attracted as many inquirers as ever did the quest of the philosopher's stone for it seemed to imply a far greater miracle. Its myriad individuality; its eager movements; its peculiar forms; its growth of large from small, and back to embryo again ; its persistence of species combined with its rapid evanescence of individuals ; above all, its possession of consciousness, rising into thought and knowledge—these and other characteristics make up a phenomenon so complex and stupendous in its seeming unlikeness to all else in Nature, that, in the first enthusiasm of science, living things were inevitably assigned a place by themselves and a terminology of their own.

But alluring as was the task of dissecting out the mighty puzzle and putting it once more together, the scientific intellect had time after time to turn back from the attempt which it had already felt was foredoomed to failure. There were plants that moved visibly and animals that never moved at all ; and the very existence of the science of organic chemistry is an abiding protest in chemical regions against the arbitrary distinction between living and non-living products.

IF RESPONSE IS A SIGN OF LIFE

Yet there was one criterion of life which seemed to stand persistently alone. This was the characteristic of irritability, or power of responding to stimulus. You pinch your arm. There is an immediate response in the feeling of pain. In response to the stimulus something is sent along the nerve to the brain, which causes the sensation. In fact, we have here something like an electric circuit, the effect of a shock in any part of the body being sent along the conducting nerve to the detecting brain. If an isolated piece of muscle or nerve be connected with a detector of electric current—a galvanometer—then each time a muscle or nerve is stimulated by a pinch or shock of any kind the thrill of response is betrayed by an electric pulsation. These electric pulses give a faithful indication of the "livingness" of the tissue. When the tissue is killed the electric pulse ceases to beat. We can thus read the history of the life-process autographically recorded before our eyes ; we can watch the diminishing pulsation with the waning

of life and the final arrest at the moment of death. The up-and-down curve of the throbbing life is replaced by a line of immobility at the moment when it passes into non-life.

THEN METAL IS A LIVING THING

Thus the pulse of electric response is regarded as the criterion between the living and non-living. When it is not found, we are in presence of death or else that which has never lived. A living thing is responsive, a dead thing is not. The living response with the attendent phenomena of sensation were supposed to be due to the working of a mysterious "vital force" which found its dwelling-place in the living.

Alas, however, for human boastfulness! Since as the result of the latest discovery it appears that this harmless little arrogance of man eager to believe that his corporeal brain and frame obey laws different from, and greatly superior to, those which govern the mineral world—this seemingly innocent morsel of ignorant vanity is about to be refused to us. For as regards response, the gulf that yawned between vital and non-vital has been bridged, and the bounds of sympathy are pushed into a new domain by proofs that the responsive processes seen in life have been foreshadowed in non-life, and that even metals respond precisely in the same way as human beings!

It is too early as yet to estimate the full significance of such a discovery. The unity proclaimed is far-reaching and marks an epoch in scientific thought.

THE DISCOVERER OF THE LIFE OF METALS

Dr. Jagadis Chunder Bose, to whom we owe this discovery, is the professor of science at the University of Calcutta.

After taking his degree in Calcutta, he own entrance as a scholar at Christ's College, Cambridge, in the year 1881. His course there ended in 1884 with his taking simultaneously the Natural Science Tripos and the London B.Sc. Degree, and he returned to India to receive—thanks to the interest of Lord Ripon, then retiring—the Chair of Physics in the Presidency College, Calcutta.

Ten years later his work won the recognition of the Royal Society, which published his paper on the "Determination of the Indices of Refraction of various substances for the Electric Ray." In the year 1896-97 Professor Bose spent nine months in this country on his first scientific deputation from the Government of India. During this period he received the degree of D.Sc. of the University of London in recognition of the value of his research. The scientific world, both in England and on the Continent, was greatly interested in his apparatus for the detection and measurement of the properties of invisible light.

Since his return to India in 1897 Professor Bose's investigating energy must have been redoubled, to judge from its results. It was therefore inevitable that he should be sent once more to Europe by the Government of India as a delegate to the international Scientific Congress held in Paris two years ago. This was specially due to the great interest taken in the cause of scientific progress by Sir John Woodburn, the Lieutenant-Governor of Bengal. The first account of Professor Bose's discovery—the Responsive Power of Inorganic Substances—was thus announced before the Paris Congress, a full account of which appeared in the Transactions of the Congress. Since reaching England he has pursued the many-sided outcome of his enquiry, and his communications have been published in the Proceedings of the Royal Society. In May last year he delivered a Friday evening discourse at the Royal Institution dealing with the responsive phenomena in the living and non-living. He subsequently undertook an extensive inquiry on the response in the transitional world of plants, and an account of this work has been published in the Journal of the Linnaean Society.

CHARACTERISTICALLY HINDU

Finally, it is not the least remarkable fact about his great theory of stress and strain that this comprehensive conception should have revealed itself to a Hindu mind for the doctrine means simply that molecular action is one in all matter, living and non-living. And here Dr. Bose appears to have come, without intention, and working by the most modern methods, on the time-honoured goal of his people's effort. Dr. Bose's discovery is in some special sense the contribution of his whole race. We are told of a certain Madonna Cimabue's that it was carried in triumph about the streets, an old man in Florence wept for joy that they had lived to see such an advance in the painting of human emotion. Some such relation exists in this case between the regional thought and interest of the Hindu people and this scientific achievement of their fellow-countrymen. For if the simple ryot in his fields and the grain-seller in the Bazar could but master that technical jargon in which the man of science feels that his ideas must be buried—could but understand the concrete picture of the creation which *Stress and Strain*—suggests they would say quietly, "yes, that *must* be true!" Surely then are few instances of the dramatic fitness in the history of science to parallel this.

HIS WORK ON ELECTRIC WAVES

It will be interesting to say a few words of Professor Bose's previous work on electric waves, from which he was unexpectedly led to his present line of investigation. It was the English

physicist Maxwell who from theoretical considerations first come to the conclusions that light was a kind of electric vibration, to all but a single octave of which the human eye was blind. (Similarly with the ear, there are who ranges of sound inaudible to us; it is probable indeed that certain notes reach the insects which we shall never hear!) Hertz, in Germany, was able to produce electric waves by rapid electric vibration and narrowly anticipated in this Sir Oliver Lodge, the eminent English physicist. It is by means of this invisible light, sweeping through space with incredible swiftness in its mighty billows, that wireless messages are sent. Thus, with the discovery of electric vibration new realms of radiance possessing wonderful and unknown properties were opened out.

Naturally the great difficulty in investigating these rays arose from their invisibility. Some apparatus was required which would serve to detect them. Branly, in france, observed that the shock of electric waves produced changes in metallic particles by which their power of conducting the electric current became increased. What these changes might be remained a mystery, but it was evident that by this means detectors of electric waves could be made. At first, however, these detectors or receivers proved very capricious in their action, but Professor Bose succeeded in producing a type of receiver which was quite consistent in its working. He was also able to construct a very perfect electric wave apparatus with which the various properties of invisible light could be studied and measured. It was the wonderful performance of this instrument that surprised and delighted the leading *savants* who were amongst his audience at the Royal Institution five years ago. He took various so-called opaque objects—a book, human hair, blocks of wood, and so on—and producing electric waves with the help of his apparatus was able not only to show that rays passed through these masses, but also to measure the angle at which the unseen light become bent in its transmission. With unfailing certainty also the existence of hidden strains within opaque masses which detected by the same means.

"THAT TIRED FLEELING" IN METALS.

It was said that the precise nature of the changes made by invisible light on the mass of metallic particles which constitute the receiver remained a mystery. In practical application this fact had a grave drawback. After receiving a signal, the detector would become fatigued from the strain, and a tap had to be given to revive it. The whole thing went by rule of thumb. If the receiver was to be made more sensitive so that messages could be recorded from a greater distance and with greater speed, it must be self-recovering, so as to do away with

the contrivance of tapping. To bring out any improvement, therefore, it was clearly necessary that the theory of the receiver should be propely understood.

In the course of a lengthy research, in which a very patient and wearisome investigation had to be made of all the elementary substances, Professor Bose lighted on several which exhibit self-recovery, and of which therefore receivers could be made which would require no further tapping. He came to the conclusion, indeed, that the whole question was one of overstrain. This is seen on some materials like lead wire, which become easily overstrained, while others, such as a steel spring, exhibit greater elasticity, and therefore more easily recover from the effect of strain.

SENSITIVE ARTIFICIAL ORGANS.

It was while working on his theory of the effect of external stimulus on matter that he was led on to a new line of investigation, the outcome of which was the construction of artificial organs which stimulated the action of our sense organs. These artificial instruments transmitted the impressions received from without to be recorded by suitable electric recorders, just in the same way as our sense organs, the eye, for example send in messages received from the outside to be recorded by the brain. It is hardly to his mind a question of similarity, but rather of identity.

For what is the distinctive characteristic of life? Is it not the power to respond to external stimulus? We pinch or pass an electric shock through the arm, and a visible twitch shows that the muscle is still living. A dead body does not respond when pinched or shocked ; the sudden twitch is thus an indication of life. Physiologists make the twitching muscle record its autograph on a travelling strip of paper, and the autographic record tells the history of the muscle, the story of its stress and strain. When it is fresh the writing is bold and strong, as fatigue proceeds it becomes indistinct, and when the muscle dies the record comes to a stop.

There are, however, but gross indications of the vital condition. There are other and subtler processes which can not be so easily detected. Nervous impulses, for instance, are transmitted without any visible changes in the nerve. Yet when a flash of light falls on the eye, something is sent along the optic nerve to the brain, these to be interpreted (or recorded) as visual sensation. This visual impulse, produced by the stimulus of light, is an electric impulse. Whenever a shock or disturbance impinges upon a bundle of receivers of the human body, an electric thrill is produced and courses along the nerves which are but telegraphic wires, to the central station, the brain.

THE NERVOUS SYSTEM OF METALS.

These electric pulsations are regarded as the signs of life. External stress, like light and sound, gives rise to them, and the electric currents thus set up excite the brain and cause sensation. But when any organism dies, accidentally or otherwise, the living mobility of its particles ceases, the stress-pulses can no longer be sent along the nerves, and there is an end of response.

The electric twitch in answer to external stress is thus the perfect and universal sign of life, and the autographic records of these electric twitches show us the waxing and waning of life. Their gradual decline shows the effect of fatigue, their exaltation the climax of artificial stimulation, rapid decline the anaesthetic action of choloroform, total abolition of the end of life.

But is this electric response, the sign of life, entirely confined to what we call living things? Is it quite wanting in what we know as the inorganic?

By means of Dr. Bose's instrument this question can be answered definitely, for when the metals were stimulated by a pinch, they also made their autographic records by electric twitches, and thus, being responsive, showed that they could in no sense be called "dead"! Nay, more, it was found that given the records for living muscle, nerves and metals, it was impossible to distinguish one record from the other for the metals also, when continuously excited, showed gradual fatigue; as with ourselves, so with them, a period of response, even a tepid bath was found helpful in renewing vigour ; freezing brought on cold torpidity, and too great a rise of temperature brought heat rigor.

METALS CAPABLE OF DEATH

It is said, however, that the ultimate sign of life is inevitable death. An animal is living as long as it is capable of dying. It is true that death can be hastened by poison. Then can the metals be poisoned? In answer to this was shown the most astonishing part of Professor Bose's experiments. A piece of metal which was exhibiting electric twitches was poisoned ; it seemed to pass through an electric spasm, and at once the signs of its activity grew feebler, till it became rigid. A dose of some antidote was next applied ; the substance began slowly to revive, and after a while gave its normal response once more!

But if the inorganic be indeed touched with this glimmer of living response, then it ought to be possible to construct artificial organs of perception. Of all the organs we possess none is so wonderful as the eye. Professor Bose therefore turned his

attention to the construction of an artificial retina which would respond to light. But this particular organ has one advantage over the human eye, inasmuch as its sweep of vision is practically unlimited, detecting waves of invisible as well as visible light, whereas we are confined to a single narrow octave.

HIS ARTIFICIAL EYE

It was while he was striving to interpret the hieroglyphic records of his artificial eye that Professor Bose came upon certain hitherto unnoticed and extraordinary phenomena of human vision, for if the action of the artificial correspond with that of the real eye, then the peculiarities of both must be present in each. It may be said that according to the stress and strain theory, the sensitive elements in the retina respond to light simply because they are strained or disturbed by it, as a wire is strained by twist. Just as on the removal of twist the wire continues to vibrate, so do the strained particles in the sensitive retina go on oscillating, and thus send pulsating currents to the brain. These pulsating currents, again, cause a pulsating visual sensation. For if one look at a bright object, then shut the eye, the bright object looked at will appear and disappear several times in succession. These "sight echoes" are very persistent, and from the incipient stage of the process we call memory.

WHY WE HAVE TWO EYES

. Another fact discovered from the clues given by the artificial retina is that when we look at any object the two eyes do not, at any given instant, see equally well but each takes up the work of seeing and resting alternately. One falls asleep, as it were, while the other is waking to its maximum consciousness, and then *vice versa.*

Thus Professor Bose was led to the paradoxical statement that under certain circumstances we can see much better with the eyes closed than with them open. To prove this it is only necessary to look at the light through a modified stereoscopic apparatus in which, instead of photographs, we have placed to different inscriptions.

On looking through this one finds the two images superposed, making a blurr. But on shutting the eyes the tangled writing is unravelled and the constituent parts of a sentence are read clearly by the brain.

Thus sight lends itself to interpretation by the process of strain asd self recovery amongst sensitive atmos and what is true of the complex organism of the eye is found common to all nerve, all muscle, and to that matter which we have long thought of as lifeless and insensate.

A VAST NEW FIELD OF INQUIRY

It will be seen by the latest scientific reader that these experiments teem with significance. Not only do they completely destroy all barriers of a hard and fast kind between responsiveness of the organic and inorganic, showing that the one is merely some greater complexity of the other; not only do they impress us profoundly with the mystery of the sensitiveness of all things, but they are full of practical suggestions alike for the worker in wireless telegraphy and for medical science. In the last field they are of vast importance for the effects of drugs have been hitherto capable of only vague experiment, while here we have an opportunity suddenly opened to us of arriving at the clearest data with regard to fundamental processes, quantities and the rest.

THE ALL-PERVADING UNITY OF THE UNIVERSE

Yet every step in this vast simplification—making them all appear as various rhythms and harmonies of a singles fundamental sequence—only drives the question deeper—"Who is He that sits within, striking the molecules this way and that? Or what is He, 'Pure, free, ever the witness,' Who interprets the records of strain, using the brain as His galvanometer, and discarding alike the laboratory and its instrumetns when these no longer please Him?" Dr. Bose does well to end his lecture, given at the Royal Institution, May 10th, with the striking passage:—

It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things: the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our earth, and the radiant suns that shine above us—it was then that I understood for the first time that a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of ganges thirty centuries ago:—

"They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth, unto none else, unto none else!"

Thus we see that the so-called vital response of living matter has met with the same fate as other differentiae of the organic and the inorganic—that once more there is no hard-and-fast line between the living which respond and the non-living which do not, but in both alike we see the spectacle of matter as a whole possessing irritability and passing out of the state of responsiveness into that of irresponsiveness; having its response in both alike afflicted by external circumstances and agencies, often identical; responding in different ways in both alike, according as the stimulus is great or little, the criti-

cal degree being often the same. In metals and plants, as in animal tissues, we have been shown the phenomena of weariness and depression, together with the possibilities of recovery, of exaltation, of irresponsiveness which is death.

Who can regret this? Is it not the inevitable destiny of all conceptions which imply that a given phenomena is unique, mysterious and beyond analysis to check inquiry and thwart the advance of scientific thought? Science can grow only where the mind of the student is prepared to recognise an underlying unity amongst apparently diverse phenomena.

"They who behold but one in all the changing manifoldness of this universe, unto *them* belongs Eternal Truth ; unto none else—none else."—M.N.

আলোচ্য পর্বে ডঃ বসুর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রদত্ত নিবেদিতার তিনটি বক্তৃতার সংবাদ আমরা পেয়েছি। নিবেদিতা ৯ জানুয়ারী ১৯০২ তারিখে 'প্যারিস হইয়া' যখন ভারতগামী জাহাজে উঠলেন তখন তাঁর মন জগদীশচন্দ্রের কীর্তি ও মহিমার বোধে আচ্ছন্ন এবং ডঃ বসুর মত প্রতিভাকে যে-সাম্রাজ্যবাদী শাসন নিষ্পিষ্ট করতে চায় তার বিরুদ্ধে ঘৃণায় পূর্ণ। জাহাজ ৩রা ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে পেঁছেছিল। একই জাহাজে রমেশচন্দ্র দত্তও প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। উভয়কে মাদ্রাজের মহাজন সভা হলে ৪ ফেব্রুয়ারী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ভাষণে নিবেদিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতায় ইচ্ছা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্রের প্রশংসা করতে পারেননি, কারণ সাক্ষাতে প্রশংসা করা বিধেয় নয়, এবং বিখ্যাত ভারতীয়দের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ও কিছু বলতে পারেননি, যেহেতু কন্যা কি করে পিতার বিষয়ে বলবে, কন্যার জীবন যেখানে পিতাই গঠন করেছেন—বলেছিলেন দূরস্থিত জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে—যেহেতু দেশবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রয়োজন আছে সেই নিঃসঙ্গ বিরাট সংগ্রামীর পক্ষে।* বক্তৃতাটি অবশ্য

* জগদীশচন্দ্রের স্পর্শকাতর অন্তর দেশবাসীর সাহায্য ও সমর্থনে উদ্দীপিত হবে, তা বুঝে সে বিষয়ে নানা আয়োজন করা হয়েছিল, ভারতে এবং ইংলণ্ডে। বলাবাহুল্য এসব ব্যাপারে নিবেদিতার সক্রিয় যোগ থাকতই। এই সময়ে লণ্ডনে একটি ভারতীয় সংস্থার পক্ষ থেকে ডঃ বসুকে অভিনন্দন জানানো হয়। বেঙ্গলী কাগজে ৩১ জুলাই, ১৯০১ তারিখে তার বিবরণ বেরিয়েছিল।

LONDON LETTER

(*From Our Own Correspondent*)

London, July 12

DR. J. C. BOSE

No one deserves greater honour than Dr. J. C. Bose, the eminent scientist. He has own renown all over the world and has endeared himself to the land of his birth by his services to science. India is proud to possess such a son ; for, he

শুধু জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধেই নয়—ভারতবর্ষের অতীত মহিমা ও বর্তমান জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে নানা কথা তার মধ্যে ছিল। ভারতবাসীকে দীনতাবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলার জন্য উদ্দীপ্ত আহ্বান নিবেদিতা জানিয়েছিলেন। স্বামীজী এই বক্তৃতায় খুবই খুশী হন।

বক্তৃতাটির বস্তু-অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি। অমৃতবাজার পত্রিকার ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯০২ সংখ্যা থেকে এটি সংগ্রহ করেছি :

মাদ্রাজ মহাজন সভায় নিবেদিতার বক্তৃতায়
জগদীশ বসুর কথা

"আমার জীবনের অবর্ণনীয় সৌভাগ্য, আমি আধুনিক ভারতের কয়েকজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। তাঁদের একজন (স্বামী বিবেকানন্দ) আপনাদের সুপরিচিত। তাঁর বিষয়ে বলা এখানে আমার কাজ নয়, কারণ কন্যা তার পিতার প্রশংসা বিশ্বজগতের সামনে করতে পারে না। এক্ষেত্রে সে মাত্র নিজ জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে—তাই হবে তার পক্ষে সর্বোচ্চ কাজ। ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি (রমেশচন্দ্র দত্ত) সামনেই রয়েছেন, সাক্ষাতে তাঁর প্রশংসা করা অসৌজন্যকর। তাঁর কাজ এবং চরিত্র অনিবার্যভাবে যে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করে—তাকে হৃদয়ের নীরব গহনে স্থাপিত রাখতেই হবে এক্ষেত্রে। আসুন, মাতৃভূমির অপর এক বিশ্বস্ত সন্তানের কথা বলি, যিনি বহুদূরে একাকী কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে স্মরণ করা প্রয়োজন প্রতিদিনের প্রেমে ও প্রার্থনায়। আমি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলছি।

---

lifts her in rank in the comity of nations. The other day, the "Sukha Samity" of London had a luncheon in honour of the distinguished scientist. Among those present were Messrs Dadabhai Naoroji, Romesh Ch. Dutt, Nishi Sen and J. D. Dutt. Many letters of regret were read. Dr. Mullick wrote that he was sorry he could not be present as he was in Edinburgh on professional and political work. Nothing else would have prevented him from being present, as there was no one whom he should like to honour more than Dr. J. C. Bose. Mr. Sen presided, and proposed the guest's health in most eloquent terms. He eulogised Dr. Bose's services to science and hailed his as one of the greatest scientists of the day. Mr. Naoroji and Mr. Dutt also made complimentary speeches and said that any country would be proud of Dr. Bose. Dr. Bose, rising amidst cheers, said with his usual modesty that he was not worthy of the honour, conferred on him. He had in his own humble way tried to follow his instincts; and anything he had done, was but a poor subject for eulogy that had been showered on him. Such gatherings as these were compliments, indeed, and encouraged him in his duties. For nothing was more encouraging than the appreciation of one's neighbours.

অপর যাঁদের উল্লেখ এইমাত্র করলাম, তাঁদের মত ইনিও ভারতের পুরাতন জীবনের হৃদয়কেন্দ্র হতে উত্থিত। বাংলা দেশের সবচেয়ে রক্ষণশীল এক অংশের ইনি গ্রাম-বালক। এঁর মা—সরলপ্রাণা সেইসব হিন্দুরমণীদের একজন, যাঁরা পরম মাধুর্যে, স্নিগ্ধতায় ও ত্যাগে পূর্ণ—যাঁদের নিয়েই হিন্দুজাতির গৌরব। এঁর পিতা—বাংলার এক লেফটন্যান্ট গভর্নর নিজের ডায়েরীতে একবার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"আজ এমন একজন ভারতীয়ের সাক্ষাৎ পেলাম, যাঁর সমতুল আমি কখনো দেখিনি।" ডাঃ বসু তরুণ বয়সে এক বিশিষ্ট ইংরাজ বিজ্ঞান-শিক্ষকের কাছে পড়েছিলেন। তাঁর পত্নী আমাকে বলেছেন—বালকটি যখন ইংলণ্ডে যাবে, তাঁর পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"বৎস, আমার যতখানি সামর্থ্য আমি তোমাকে ততদূর নিয়ে গেছি; যদি তুমি আরও এগিয়ে যেতে চাও, যাও, সেখানেও আমার আশীর্বাদ পাবে।"

পিতা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতীতের সঙ্গে, রীতি-নীতি ও পরিবারের সঙ্গে, যে স্নেহবন্ধন হিন্দুকে জড়িয়ে রাখে, পারিপার্শ্বিক ও সমাজের যে বাঁধনে সে বাঁধা থাকে, তার গুরুভারের কথা যখন চিন্তা করি, এবং অপরদিকে দেখি, এই পূর্ণ অব্যাহতির ছবি—তখন মনে হয় যেন 'মুক্তি'-চেতনার সম্মুখীন হয়েছি আমরা, যে-জ্বলন্ত মুক্তি-বোধের কাছে পৃথিবীর অপর সকল জাতির স্বাধীনতা-বোধ নিতান্ত ম্লান। এই মুক্তির আদর্শই হিন্দুর সকল চিন্তায় প্রতিফলিত; যা-কিছু স্থানীয়, সীমাবদ্ধ এবং স্থূল, তাকেই এই আদর্শ বহুদূরে বিতাড়িত করে। ডাঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। বস্তুজগতের অভেদ প্রতিপাদক তাঁর অধুনাতন বিরাট আবিষ্কারগুলির কথা আপনারা অনেকেই জানেন। তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ উপস্থিত করেছেন। তাঁর কিছু গৌণ আবিষ্কারের কথাও আপনারা শুনেছেন। মার্কনির নাম শোনা যাবার আগেই তিনি কলকাতার এক বারান্দার মধ্য দিয়ে, এমনকি একবার জনৈক লেফটন্যান্ট-গভর্ণরের দেহের মধ্য দিয়ে বেতারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন। আপনারা এও জানেন, যখন রন্টেজেন রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহল শিহরিত হয়ে উঠেছিল যখন জনৈক ভারতীয় আগন্তুক একই ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক এবং গভীর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আর, সম্প্রতি আপনারা নিশ্চয়ই দৃষ্টি-রীতি, ফটোগ্রাফি-তত্ত্ব এবং এজাতীয় অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধে অসাধারণ আবিষ্কারের কথা শুনেছেন। এই মানুষটি যেখানেই গিয়েছেন, ভারতের পতাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছেন, আর সেই পতাকা প্রোথিত করেছেন বিজ্ঞান-অভিযানের একেবারে মুখাগ্রে।

এসব জিনিস সহজে করা যায় না, অনন্ত সংগ্রাম ছাড়া করা সম্ভব নয়। ফলাফলকে এক্ষেত্রে সংবর্ধিত করাই যথেষ্ট নয়। এইসব শক্তিধর সেবকের সাহস ও ভরসাকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণকে গ্রহণ করতে হবে; জনগণের নিরন্তর প্রেম ও সমাদর ওঁদের পাখায় বলাধান করবে।

এই বিশেষ জীবনটির দিকে তাকিয়ে যখন আমরা নিজেদেরই প্রশ্ন করি—এজীবন এত বিরাট হল কিভাবে, কিভাবে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের জগতে অবতীর্ণ প্রথম

ভারতীয় পুরুষটি এক ঝটকায় উঠে গেলেন একেবারে শিখরের উপরে—তখন আমার মনে তিনটি কারণের উদয় হয়।

প্রথমতঃ, ডাঃ বসু এদেশ থেকে ছাত্ররূপে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে। তাঁর পিতার আশীর্বাদ এমন একটি জিনিসের প্রতীক ছিল, যা প্রবেশ করেছিল অতি গভীরে। তিনি পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাধারার সম্মুখীন হবার সময়ে পাশ্চাত্ত্য স্বতঃসিদ্ধগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন, যে-কোনো মূল্যে সত্যলাভ করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গে সকল পূর্ব ধারণা ও সংস্কারের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, তিনি মতের ব্যাপারে একেবারে ধোয়া-মোছা শ্লেট নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। শুধু মননের দিক দিয়ে যদি হয়, যে-কোনো হিন্দু এই স্বাধীনতাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বরণ করতে পারেন, এবং এখানকার অনেকে তা করেছেনও। কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ভারতীয় পুরুষটির ভাগ্য তাঁকে এমন এক পরিস্থিতিতে স্থাপন করেছিল, যেখানে মনোজীবনকে তার সাধুতা বজায় রেখে বহির্জীবনের আচার আচরণের সঙ্গে সুসঙ্গত হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে উপাদান ডঃ বসুর জীবনের রূপ নির্ধারণ করেছিল, তা হল, ছাত্ররূপে তাঁর কঠোর ও সর্বাত্মক পরিশ্রম। বিজ্ঞানকে নির্বাচন করার পরে যুবকটি যত প্রকারের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব, তাই করতে সচেষ্ট হয়েছিল, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, তড়িৎ-বিদ্যা, শরীরবিজ্ঞান সবকিছু। ভ্রান্তি ঘটল না কোথাও, প্রতিহত করতে পারল না কিছু। রণজিৎ সিং ক্রিকেট-জগতে যা করেছেন, বিজ্ঞানের জগতে তিনি তাই ঘটালেন—অভ্রান্ত পরিণতিতে পৌঁছাবার জন্য উভয়ক্ষেত্রে একই দুর্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশনের এই যুগে যে ব্যাপক সংস্কৃতি তিনি অর্জন করেছিলেন, তার তুলনা বিরল। এখানে বলা উচিত, ঘটনাচক্রেই মাত্র তিনি পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ভারতে ফেরার পরেও তাঁর মনের রূপ বদলায়নি। একবার ফটোগ্রাফি ধরলেন, অন্য সময়ে ফনোগ্রাফ-রেকর্ড নিয়ে পড়লেন, ফল—অতীব চমৎকার এক 'সংগ্রহ।' যে-জিনিসই এই মানুষটি ধরুন—তাকে সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত ইনি সন্তুষ্ট নন। শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফ, শ্রেষ্ঠ ফনোগ্রাফ, শ্রেষ্ঠ রেকর্ড। পূর্ণতার জন্য এই উৎকণ্ঠা কি আদর্শ তপস্যা নয়? তারপর—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতির অসামর্থ্য সম্বন্ধে নাক-সিঁটকানো অবজ্ঞার উত্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঝলক—বিরাট ভারতীয়টি মিথ্যা প্রমাণ করলেন সকল অবিশ্বাসকে—বিখ্যাত হলেন নিজের সামর্থ্যে, কর্মে।

অধ্যাপক বসুর ভাগ্যক্ষেত্রের পরম সুবিধা অবশ্য তাঁর ভারতীয় জন্ম। এপর্যন্ত আমরা অন্যান্যের সঙ্গে তাঁর কম বেশী সম-অবস্থার কথাই আলোচনা করছিলাম। যদি তিনি দেশকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষাটুকু ছাড়া আর সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দায়মুক্ত স্বাধীন চিত্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা অন্য কারণে নয়, পূর্ব-সিদ্ধান্তের বোঝা বইছে না, এমন সব পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মানসিক সমভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁর প্রতিভা আছে—পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরাও কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁদেরও প্রতিভা আছে। লর্ড কেলভিনের কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ১৪ বছর বয়সে ডিগ্রি এবং ঐ ধরনের ব্যাপার। সুতরাং এবার অধ্যাপক বসুর

সংগে অন্যান্যদের পার্থক্যের প্রসংগে আসা দরকার—বলা দরকার, স্বদেশ ও স্বদেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি, যাঁরা ভারতের ঐতিহ্যকে নির্মাণ করেছেন সেই সরল সত্যসন্ধ মানুষগুলির প্রতি ভারতীয়রূপে তাঁর বিপুল ঋণের কথা।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ছাত্রগণ সৃষ্টির বিচিত্র ও বিভক্ত প্রকৃতিকে দেখাতে বদ্ধপরিকর, যার জন্য পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান নিরন্তর বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ। বস্তুর সংগে বস্তুর পার্থক্য দেখানোই ঐ বিজ্ঞানের ব্রত যেন। জড় ও চেতনকে পৃথক করছে কোন্ কোন্ জিনিস—সে সম্বন্ধে তার পুনঃ পুনঃ উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্ন।......এক্ষেত্রে ভারতীয় পুরুষটির প্রতিক্রিয়া কি ধরনের ছিল? কেন তাঁর প্রতি রক্তবিন্দু ঐক্যবোধে স্পন্দিত হয়েছিল? বলা যায়, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, তড়িত-তত্ত্বকে আলাদা আলাদা খাঁচায় অতি সাবধানে বন্ধ করে রাখায় তাঁর কোনোই আগ্রহ ছিল না। সে কথা উক্ত বিখ্যাত ভারতীয় শুক্রবার সন্ধ্যায় সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মেলনভূমি গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল ইনস্টিটিউটে কৌতুকের সংগে বলেছেন। তিনি বলেছেন—'ভারতে একটি বিজ্ঞানই আছে—সৃষ্টি-বিজ্ঞান— The Science of Nature ।' তাই তিনি যখন দুই আপাত-পৃথক বিরাট সৃষ্টি-ধারার মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেন, তখন তাতে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের মত বিভ্রান্ত বা তিক্ত-চিত্ত হন না—কেননা একে **অভ্যর্থনা** জানাবার যথেষ্ট অধিকার তাঁর আছে। রেখার মধ্যে রেখাকে, আয়তনের মধ্যে আয়তনকে, সমগ্রের মধ্যে সমগ্রকে তিনি **সানন্দে** নিমজ্জিত হতে দেখেন। সর্ব বস্তুর যে অদ্বৈত দর্শনে তাঁর চিত্ত পূর্ব থেকেই নিবিষ্ট, এসকলই তার পক্ষে নূতন প্রমাণ। এই ভাবের দ্বারা তিনি পরিবৃত হয়ে আছেন সমস্ত জীবন ধরে। অশিক্ষিত ভৃত্যেরা এবং সুশিক্ষিত বন্ধুরা, দোলনার জীবন থেকে বর্তমান জীবন পর্যন্ত সময়ে সবাই যেন এই কথাই যোগ-সাজস করে তাঁকে শুনিয়েছে। মাতৃস্তন্যের সংগে একে তিনি পান করেছেন। মৃত্যুকেও যে তিনি দেখেন প্রত্যাবর্তনরূপে! এরই দ্বারা তিনি জাতীয় ভাবের সংগে যুক্ত। সমগ্র জগৎ যদি পার্থক্য কল্পনা করেও, ভারতীয় হয়ে কিভাবে তিনি **অদ্বৈতকে** অনুভব করে পীড়িত হতে পারেন?

ভারতীয় ঐতিহ্যের আর একটি জিনিস বিজ্ঞানচর্চায় সমূহ সুবিধা সৃষ্টি করে, উৎকৃষ্ট ভাষায় যাকে বলা হয়েছে—"সন্ন্যাসী মন।" জ্ঞানের সংগে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগের এই পদ্ধতি দৈহিক শ্রান্তির ক্ষেত্রে মনঃসংযোগকে ব্যাহত হতে দেয় না। ভারতের ধর্মে কখনই ঈশ্বরকে **'শিক্ষা' করার** কথা বলা হয়নি—ঈশ্বরকে **জানতে** বলা হয়েছে। মনকে সৎ-বস্তুর সংগে একাত্ম হতে হবে। এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের চরিত্র,—অনুমান, তথ্য-পরীক্ষা এবং যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের সংগে নিতান্ত পৃথক। পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অনুমান ও তথ্য-যুক্তির পথ গ্রহণ করেন। গাণিতিক উন্নতি এই পথেই হয়েছে। কেবল ভারতীয় জনগণই কোনো ঘটনার পূর্ণ স্বরূপ অনুধাবন করার পরেই তাকে বিশ্লেষণ করে। এই মানস-সংস্থান লাভের উপযুক্ত শিক্ষাও সে পেয়েছে; এবং এমন একটি সমাজ ও সভ্যতা ভারতের আছে, যা অন্তর্জগতের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের আদর্শে চালিত। এই সকল ব্যবস্থা থাকার জন্য এই পথে জ্ঞানলাভের শক্তি পৃথিবীর অন্য যে-কোনো স্থানের

তুলনায় ভারতে সহজতর, এবং এর দ্বারা ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথে অপরিসীম মূল্যবান জাতিগত প্রস্তুতির সুযোগ লাভ করে।

এই হেতু যখন আমি এই ভারতীয় পুরুষটিকে তাঁর সর্বশেষ সুমহান ঘোষণা—জড় ও চেতনের মধ্যে অব্যাহত প্রবাহের তত্ত্ব-ঘোষণার পক্ষে উদ্যত দেখি—তখন জানি, তাঁর সাফল্য তাঁর দেশেরই সাফল্য, তাঁর সংগ্রাম ভারতেরই সংগ্রাম, এবং তিনি—শতাব্দীর মধ্যে এক নিঃসঙ্গ আকার—যেন ভারতের নারী ও পুরুষের প্রতি মহা আহ্বান—যা বলছে, তারা যেন (অধ্যাপক গেডিসের ভাষায়) পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ছাঁট-কাট না হয়ে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে আচার্যরূপে প্রবেশ করতে পারে—মননের ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে ভারতের সমশক্তি—নহে, কোন মতে নয়!—যেন ভারতের আধিপত্য তারা প্রমাণ করতে পারে সম্মানের সংঘাতে! এমনই একটি বিষয়ে আমি আপনাদের সকলের সমক্ষে অধ্যাপক বসুর বার্তাবাহী, যে-বার্তা ভবিষ্যতে উপযুক্ত অবসরে ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করব।

ভারতের বিরাট পুরুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিরাট পুরুষদের তুলনায় কোনো অংশেই ন্যূন নন। গৌরব বোধ করুন তাঁদের নিয়ে, ভালবাসুন তাঁদের, সর্ব প্রাণ দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করুন। তাঁদের জন্য **কদাপি** আপনাদের লজ্জিত হতে হবে না।

আর, ভারতীয় জন্মের গৌরব যিনি বৃদ্ধি করবেন, তাঁর জন্য আদর্শের মান উচ্চে রাখুন। প্রশ্ন করুন—তিনি কি সত্যের জন্যই সত্যকে চান—নাকি নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য? তাঁর হৃদয় কি উদার—একনিষ্ঠ? তিনি কি চলার পথে অদম্য, অক্লান্ত? জ্ঞানের জন্য এবং ন্যায়ের জন্য কি তাঁর তৃষ্ণা চির অতৃপ্ত, কামনা চির জাগ্রত?

যদি উত্তর হয় 'হাঁ', তাহলে, যাঁরা জাতি-আচারের একটিও কোনদিন ভাঙেন নি তাঁদের তুলনায় ইনি অন্ততঃ কুড়ি গুণ বেশী ভারতীয়—যদি অবশ্য স্বদেশীয়ত্ব মাপার কোনো উপায় থাকে!

মহাশক্তিধর এই জাতি। শুধু সেই শক্তির স্বরূপ জানতে হবে এবং প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিজীবনে তাকে ব্যক্ত করতে হবে,—তা যদি হয়, কেউ ভারতের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। তাহলে মাকড়সার জালের মত সকল সমস্যার জাল ছিন্ন হয়ে যাবে।

এবং—পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে যে চরম সত্য ঘোষণা করা ভারতবর্ষের নিয়তি, যদি কোনো পন্থা তার উপলব্ধি থেকে ভারতবর্ষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই পথ সাময়িকভাবে যত লাভজনকই মনে হোক, তার দ্বারা ভারতের কোনই অগ্রগতি হবে না।

এই অসত্যের মধ্যে যে সত্যকে দর্শন করতে পারে, মৃত্যুর মধ্যে দেখতে পায় জীবনকে, নিত্য পরিবর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে দেখে পরম ঐক্যকে, চির শান্তি তারই মধ্যে—শুধু তারই মধ্যে—অন্য কোথাও নয়।

'বিজ্ঞানে হিন্দু মন' বক্তৃতা

মহাজন সভার বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেছিলেন—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি ডঃ বসুর বার্তাবাহী, যাকে ভবিষ্যতে উপযুক্ত অবসরে ভারতীয় শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করবেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিবেদিতা ২১ মার্চ ১৯০২ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে 'বিজ্ঞানে হিন্দু মন' বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। জানি না কলকাতার ঐ বক্তৃতায় নিবেদিতা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কি না। ইন্ডিয়ান মিরারে ২৮ মার্চ ১৯০২ তারিখে ঐ বক্তৃতার যে রিপোর্ট বেরোয় তাই উদ্ধৃত করছি।*

SISTER NIVEDITA'S LECTURE IN CALCUTTA

Sister Nivedita's lecture commenced by the reading of the invocation to creation from the Rig Veda, the most wonderful pronouncement of the religious scientific consciousness of any age or people.

In referring to the recent work of Dr. Bose in Europe, the lecturer pointed out the relation which his present theory of stress and strain holds to his previous accomplishment on the subject of electric waves. The wonderfully practical nature of his scientific work was shown in the fact that he had constructed by far the most perfect detector of wireless signals yet produced. The manipulative dexterity here displayed must have served him well in such later experiments as that in which he proved the continuity of mechanical and light stimulus by balancing the effect of a sunray on one wire by a twist of the hand on another.

The continuity of living and non-living was only one point in the great line of argument verified in experiment by which Dr. Bose aimed at establishing in scientific form the doctrine of the fundamental unity of phenomena. For all the phenomena of heat, light, electric radiance, and chemical union and disruption, might be regarded at bottom as but different aspects

---

* এই বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি নিবেদিতার বিশেষ প্রশংসাসহ অমৃতবাজার পত্রিকায় ৫ মার্চ ১৯০২ তারিখে বেরোয়—

SISTER NIVEDITA—Our readers will be glad to learn that the same Sister Nivedita, Miss Margaret E. Noble, who once drew much of public sympathy towards her for her indefatigable work during the plague, is again amongst us here in Calcutta during this dreadful season. Nor can any of us forget her enthusiasm for Hindu religion. She will deliver an address on "The Hindu mind in modern science" at the Classic Theatre Hall, on Friday, the 21st instant, at 6 p.m. The Hon'ble Justice Sarada Charan Mitter will preside. The lecture is a public one.

বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি বেঙ্গলী কাগজেও বেরিয়েছিল ২১ মার্চ তারিখে।

of the single basic occurrence of the swing of molecules under stress, this way and that. A great stress produced overstrain and overstrain was apt to result in reversal or rebound past the point of equilibrium. So every given force had the power of producing not only its proper but also its opposite effect. This fact was not without interest for students of the doctrine of the Maya. Matter, and the laws of matter, were one, whether manifested in physiological or in what are called "purely physical" sequences. Simple mineral matter such as metal, was just as subject to stress of any given kind as the animal body, a steel ware could be killed by poison, or brought to life by the right antidote, like a muscle or a human being.

The lecturer dealt much with the work of careful preceding observers like Lodge and Waller. It was clear however, that even in the field of the former worker, a research so comprehensive and unexpected must be revolutionary. But it was the great glory of science to welcome truth from any quarter, and whatever its effect upon ourselves.

Improving the continuity of living and non-living, Dr. Bose had conceived the audacious idea of testing whether plant tissues would respond to a pinch or a tap by an electric disturbance, like as had long been known, the animal and like, as he was now prepared to prove the metals.

By this attempt, Dr. Bose had opened out to Western men of science an area of investigation hitherto unthought of where most accurate and simple methods would replace the system of indirect inference.

In dealing with more technical matters, the lecturer showed that our great countryman had further added to western power of research by suggesting methods of experiment on electric response which would not require the preliminary abnormalising of the specimen. Hitherto it had been thought necessary to "injure" one end of the muscle or nerve for experiments, in order to produce the necessary inequality of current on stimulation. Dr. Bose had adopted the "Block method" and the "method of exaltation" by which no less than to additional sects of an experiment might be made, without abnormal conditions of any kind, incorroboration or disprove of any given observation.

The practical issues of these investigations were likely to prove of extraordinary utility in wireless telegraphy and also in medicine. In wireless telegraphy, Dr. Bose's discovery of molecular self-recovery and other phenomena of metals, would be sufficient to sweep away many crudities, notably that of the tapping apparatus to restore sensitiveness. In medicine, we had heard for the first time a possibility of precise testing and demonstration of the influence of drugs or metals,—which always remain, however continuous with the animal, less pressures from the human point of view.

Theoretically, it remained with Dr. Bose to prove his theories in face of the determined and natural reluctance of scientific men in the West—tried and faithful workers in their own paths, many of them—to accept them. But if once accepted and incorporated, there could be no doubt that this, the first voice through which the Hindu genius was speaking in science, would be heard through all time side by side, not with the patient observers of details, but with such masters as Newton and Darwin and La'Place.

In the lecturer's opinion, the Hindu race had an aptitude of the strongest kind for scientific work. The brilliant imagination, the dogged persistence, and the manipulative dexterity which distinguished this worker, might be proved to be a race-characteristic, not an individual inheritance.

Above all, as Dr. Bose himself had been heard to say on one occasion, Hindus had the incomparable advantage in science of freedom of thought. "They did not take God into their keeping!" One of these worst defects in their equipments was a habit of "wicked, self depreciation." The strong man must believe in himself and so must the strong people, and they must expect no help. To the soul that strives for *Gnan,* what help can be given? What conditions were necessary? A raging fever of realisation, a thirst for renunciation for *Tapasya* who could differ that soul from its path?

All direct knowledge was *Gnan.* All efforts, all concentration was *Tapasya.* Let the young men of Bengal turn to knowledge in this spirit. Let them cease from spurious limitation of foreigners out of marcenary motives and live for Truth as their fathers lived. Let them regard self as nothing, and the work in hand as all, and proving thus the actual nature of Hinduism, it was likely that they might find themselves in Science leading the world.

Babu Norendro Nath Sen said that it was a pleasure and a privilege that he should have been invited to propose a vote of thanks to the noble and gifted English Lady, who had both interested and delighted them that evening by her thoughtful, animated and eloquent discourse. The large gathering that he saw before him testified to the popularity of Sister Nivedita, and the esteem in which she was held by Hindus, and, she might fitly add, by all classes of the community. Miss Margarette (Sic) Noble was an honour to English womanhood, and to the great English race itself. There was scarcely a Hindu heart in which she did not maintain a cherished place, because of the repeated, striking and convincing proofs she had given them of her deep, sincere and practical sympathy with the Indian people, with their religion, and with their history and traditions. They had been admiring as well astonished witnesses, of her philanthrophic—and to her personally dangerous—work in the back slums of Calcutta. English womanhood, as exemplified

in Annie Besant and Margarette Noble, went far to benefit India in various ways. It was they who were the peace-makers for all kind between divergent races and religions. It was such as they who would make enthusiastic realize the dream of a final blessed Union between the East and the West under God's dispensation.

The speaker has much pleasure also to propose a vote of thanks to the chair. No better gentlemen would have been called on to preside on that occasion. They had known him as a good Hindu, who was fired with the spirit of propagating the truths of a religion in which he had utter faith. They had seen him set his whole heart on the education of their children on purely Aryan lines. A distingushed *alumnus* of the Calcutta University, a Premchand Roychand Scholar, despite his weight of Western materialistic education, his faith in the creed of his fathers, had grown with the years till that faith was steadfast as the rock of ages and could not be uprooted or shaken.

The Chairman, in replying to the vote of thanks, reminded the audience that it was due to Sir John Woodburn's personal love and fidelity to Science that their distinguished countryman had been sent to the West on Government Service.

নিবেদিতার বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় ডঃ বসুর কথা

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা প্রধানতঃ স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রচারের জন্য ভারতভ্রমণ করেন। 'দি ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' কাগজের ২৬ অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যায় দেখতে পাই নিবেদিতা বোম্বাইয়ের ছাত্রদের কাছে ডঃ বসুর আবিষ্কারের কথা বলেছিলেন। সোস্যাল রিফর্মার ঐ সূত্রে ডঃ বসুর কাজ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে।—

SISTER NIVEDITA gave the students of Bombay the other day a view of the discoveries of Prof. Bose. The following excerpt from the address of the President of the Botanical Section of the British Association whose sessions were held this year at Belfast, explains them from the point of view of a scientist and assigns to them their proper place in relation to previous discoveries:—

"Some very striking results were only a few months ago published by Bose on the electric response in ordinary plants to mechanical stimulation. He arranged a piece of vegetable substance, such as the petiole of the horse—chestnut, or the root of a carrot or radish, so that it was connected with a galvanometer by two nonpolarizable electrodes. The uninjured tissue gave little or no evidence of the existence of electrical currents ; but if a small area of its surface was killed by a burn

or the application of a few drops of strong potash, a current was observed to flow in the stalk from the injured to the uninjured area just as was the case in animal tissue. The potential difference in a typical experiment amounted to 12 volt. The tissue was then stimulated either by tapping or by a torsion through a certain angle, and at once a negative variation or current of action was indicated, the potential difference being decreased by 0·26 volt. Very soon after the cessation of the stimulus the tissue recovered and the current of rest followed as before. Bose's investigations extended considerably beyond this point, and established a very close similarity in behaviour between the vegetable substance and the nerves of animals. Summation effects were observed, and fatigue effects demonstrated, while it was definitely shown that the responses were physiological. They ceased entirely as soon as the piece of tissue was killed by heating. This remarkable demonstration of similar electrical properties to those possessed by nerve strengthened very greatly the view of the conduction of stimuli in the plant by means of the protoplasmic threads which have been demonstrated by Gardiner and others to exist throughout the plant, uniting cell to cell into one coherent whole."

তৃতীয় পর্ব : ১৯০২—১৯১১

স্বামীজীর দেহত্যাগ ১৯০২-এর জ্বলাই মাসে—তখন থেকে ১৯১১-এর অক্টোবর মাসে নিবেদিতার দেহত্যাগ পর্যন্ত তৃতীয় পর্বের ব্যাপ্তিকাল। স্বামীজীর সমাধি নিবেদিতাকে সর্বপ্রকার পার্থিব বন্ধন থেকে কার্যতঃ মুক্তি দিয়েছিল। এর পরে সিদ্ধান্তের, কাজের, সাফল্যের ও ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই। স্বামীজী যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা, স্বামীজীর ইচ্ছায় কাজ করেছেন, স্বামীজীর ইচ্ছার সঙ্গে সংঘর্ষও হয়েছে কখনো কখনো, কিন্তু কোনো কিছুই বিবেকানন্দকে অতিক্রম করে নয়। অতঃপর নিবেদিতার নূতন ভূমিকা।

সে ভূমিকা—ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিবেকানন্দের দায় বহনের। যতদিন বিবেকানন্দ জীবিত, ততদিন নিবেদিতা ভারতের 'সেবিকা বান্ধবী'; তারপরে—'ভারতের সন্তানের' মাতা। নিবেদিতা স্বয়ং তা সচেতনভাবে অনুভব করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নূতন ভাবনার প্রভাব দেখা যাবে।

রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মুক্তি নেওয়ার পরে বাইরের দিক থেকে দেখা যাবে, নিবেদিতা বসুপরিবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছেন। ডঃ বসুর বিজ্ঞানের কাজে তিনি বিপুল সময় দিচ্ছেন, বসুপরিবারের সঙ্গে অবকাশের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন, সবই ঠিক, তবু এখন সমগ্র ভারতবর্ষ নিবেদিতার ধ্যান ও কর্মের আশ্রয়, তার বিজ্ঞান

নয় শুধু—ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তাঁর কল্যাণ-কর্মের বিস্তার।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত

স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্বে নিবেদিতার লেখা চিঠিতে ডঃ বসু সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অনুভূতি ফুটেছে, তারই অংশ :

২ জুন ১৯০২, ম্যাকলাউডকে—(মায়াবতী থেকে) "জানাবার বিশেষ কিছু নেই, শুধু মনে হচ্ছে, এই বৎসর ডঃ বসুর প্রত্যাবর্তন চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে।...
ভাবছি তুমি হয়ত নরওয়েতে হাজির হবে। কে জানে! অবশ্যই আশা করি যে ডঃ বসুও যাবেন।"

৭ জুন, একই জনকে—"এর মধ্যে তুমি আমার শিশুর (বসু) সাক্ষাৎ পেয়েছ। যদি তুমি ধেয়ে গিয়ে তাকে—তার হৃদয়, মন এবং কল্পনাকে—বন্দী করে ফেলতে পার, তা করো। জীবনের স্পর্শ সে চায়, মজা চায়, নতুন আকর্ষণ চায়। ভ্রুক্ষেপ করি না কোথা থেকে তা সে পায়—যদি সে সত্যই পেতে চায়। পূর্ণ কর তাকে 'আনন্দে'। সে অনুভব করুক—আবার সে বাঁচতে শুরু করেছে। তার কাছে ধর্মের কথা বলো, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কথা, কিংবা আবোলতাবোল যা ইচ্ছা—কি বলছ তাতে কিছু এসে যায় না।

কেবল যদি তাকে **না ভালবাসো**, ভালবাসার ভঙ্গি করো না। আমি কিছুই মনে করব না যদি তুমি স্বতঃই মনে কর যে, সে তোমার মনে সাড়া জাগায় না। সে ক্ষেত্রে কোনো পথ নেই। যাতে চূড়ান্তভাবে সে তোমাকে ভালবাসে তা করো, যদি না মনে হয় পরে তাকে পরিহার করবার প্রয়োজন হবে!

শুধু এইটুকু চাই, এর বেশী নয়—এটা বেশী কি?"

২ জুলাই, একই জনকে—"আমার শিশুটির বিষয়ে তোমার মিষ্টি চিঠি সম্বন্ধে কি আর বলতে পারি বলো! ঐভাবে তোমার লেখাটি—এ যেন তারই খানিক স্পর্শ। এত খুশী আমি—তুমি অমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলে। তোমার মুখে তার মাধুর্য এবং শিষ্ট নম্রতার কথা শুনে নিতান্ত ভাল লাগল। বেচারা খোকাটি আমার! ভয় হয় সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইটুকুই আশা করতে পারি, সেন্ট সারা তাকে তার শক্তির বাইরে যাবার তাগিদ দেবে না। ভরসা করি—পরের শীত সে বস্টনে কাটাতে পারবে। সারার পরিবেশ অপূর্ব। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতে চায় সে। বাইরে থাকার ব্যাপারে কতই ধৈর্য দেখিয়েছে। তার ১০ জুনের বক্তৃতা কী প্রচণ্ড জয়-সূচক। আমাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই।...

প্রিয় য়ুম, আমার অভিপ্রায়, তুমি ভাল থাক; কিন্তু অসুস্থতা হয়ত সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর হবে না যদি তা কাউকে তোমার নৈকট্যে এনে দেয়। মায়েদের অহঙ্কার এমনই হয়—দেখতে পাচ্ছ। তোমার জীবনে সে (বসু) সম্ভবতঃ সুদূর ক্ষুদ্র একটি ঘটনা। আমি চাই, সে তোমার মধ্যে সুখের বিরাট উৎস দেখুক। সে বলে, তুমি

প্রেমের মতই প্রেমময়। তাই হোক। পৃথিবীতে অবতীর্ণ এক বিরাট স্বর্গ-স্বপ্ন তুমি—যাকে আমাদের সবারই প্রয়োজন।"

নিবেদিতার উপরের চিঠির দুদিন পরে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ১০ জুলাই ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লেখেন—"গ্রিন্ডলের সাহায্যে ডঃ বসুর মারফত তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।" ১৬ জুলাই একই জনকে—"ডঃ বসুর মারফত আমার পাঠানো বার্তা কি পেয়েছিলে?"

স্বামীজীর দেহত্যাগ নিবেদিতার মনে যে বিপ্লব ঘটায়, তার ফলে পুরাতন সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার অনেক বদল হয়ে যায়। ভারতের জাতীয়তার জাগরণই তাঁর কাছে প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়—সেইটাই স্বামীজীর কাজ—তার কাছে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব, যা অল্প কিছু আগেও সমস্ত মনোযোগ অধিকার করে ছিল, হ্রাস পেয়ে যায়। নিবেদিতার মনের দিক-পরিবর্তনের ফলে নানা স্থানে বিক্ষোভ-তরঙ্গ উঠলেও তিনি আদর্শে অবিচলিত ছিলেন। এই সংঘাত, আমরা লক্ষ্য করব, তাঁর অপরূপ চরিত্রকে উন্মোচিত করেছে। মানুষকে উত্থিত, উন্নীত করবার মত হিরণ্ময় স্পর্শ সে চরিত্রে ছিল।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ডিসেম্বর ১৯০২ পর্যন্ত

২৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"আমার জীবন সম্বন্ধে সেন্ট সারার ধারণা আমাকে কুঁকড়ে দেয়। তিনি চলে যাবার পর থেকে কারো জন্য ব্যক্তিগত ভালবাসা বোধ করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হোক, কাজ হোক—একথা নিজেকে বলেছি বার বার, কিন্তু ওভাবে আর নয়—যদি তা না হয়, তাহলে আমি তাঁর (মিসেস বুলের) উপস্থিতি এখানে চাইব, কিন্তু কাজ আমি একলাই করব।

ওঃ য়ুম, তুমি দৈবী, কারণ তুমি আমার প্রতিটি কথা বোঝো। যে-সাহায্য দিয়েছি, তার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, তীব্র জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছি। ভাবছি, তাকি ভাল হয়েছে! আমি তাঁর (মিসেস বুলের) বিবেচনাকে বিশ্বাস করি না, তুমিও করো না। তিনি নিজের ইচ্ছার গোটা ভার চাপিয়ে দেবার ক্ষেত্রে একেবারে বিবেচনাহীন।"

২৮ জুলাই, একই জনকে—"আশা করি তুমি আমার ছোট খোকাটিকে একেবারে যা-তা মনে করনি। বেচারা শিশুটি! তাকে এখানে নিরাপদে ফিরে পেতে খুবই ইচ্ছা হয়। প্রিয়, মধুর, নীড়সুখী প্রাণ! সদাই তার আশ্রয় ও আনন্দ চাই।"

২১ অগস্ট, একই জনকে—"খুবই অসুস্থ ছিলাম। গত সপ্তাহে মাত্র তোমাকে ও খোকাকে ছোট চিঠি পাঠাতে সমর্থ হয়েছি।...

খোকার হতাশ ভাবের কথা যে লিখেছ, তাতে আমি খুব উৎকণ্ঠিত হব না তুমি জানোই। আবিষ্কারের জ্বরের আগুন যে একটু কমেছে, তাতে আমি খুব খুশী; কোনো মানব-মস্তিষ্ক ও-জিনিস আর সইতে পারত না। তার সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত, কেন না তাহলে বিরতিগুলো বিশুদ্ধ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত।

বিচিত্র! ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি এত অসহায়! তুমি জানো না, তার কতখানি মঙ্গল তুমি করেছ। সে বিষয়ে আমি খুবই নিশ্চিত। বেচারা শিশুটি! বড় কিছুর সঙ্গে সর্বদা সংস্পর্শ থাকা তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।"

৪ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"বুঝতে পারছি, পরবর্তী কয়েক মাস আমার খোকাই আমার মূল দায়িত্ব হবে।"

১০ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, সেখানে স্বামীজীর কথা বলবার জন্য। তারপর আরম্ভ হবে বক্তৃতা সফর। সুতরাং খোকা যখন ঘরে ফিরবে, তখন জগন্মাতা আমাকে অন্যত্র রাখছেন। তাতে দুঃখিত নই। কেবল বোম্বাই বন্দরে (?) দাঁড়িয়ে তার জাহাজের আগমন দেখতে চাই।"

১৪ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"বসুদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে বোম্বাই জাহাজ-ঘাটায় মিলিত হব।"

১ অক্টোবর, একই জনকে—"দেখতে পাচ্ছ, আমার ছোট্ট খোকাটি স্বর্গীয়। কিন্তু যেখানে দেশের ব্যাপার, সেখানে **আমিই গুরু**। সেণ্ট সারার প্রবল প্রভাবে ও-ব্যাপারটা সাময়িক ভাবে যেন ভুলে যাওয়া হয়। তুমি জানোই, আমার মিষ্টি শিশুটি ইদানীং কিসব বাজে কথা বকছে, যার প্রতিটি শব্দকে সেণ্ট সারা সশ্রদ্ধভাবে পুনরুচ্চারণ করছে, যেন সেগুলি আমার ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মাবলী। এখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি, সেটাই অদ্ভুত। আর, যদি না (বসু) নাগপুর হয়ে কলকাতা যেতে মনস্থ করে—যা করলে ১৬ মিনিটের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—আমরা ১৯শে বা ২০শের আগে তার দেখাই পাব না। তার জন্য দুঃখিত নই। তখনো আমি আলাসিঙ্গা ও মাদ্রাজের দিকে ডানা মেলে আছি। আর যদি তোমার শিশু (ওকাকুরা) সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে (গুপ্ত আন্দোলনের ব্যাপারে)...তাহলে হয়ত এই দাঁড়াবে—খোকা ও আমি আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে নিতান্ত ঘটনাচক্রে মাত্র কখনো-সখনো মুখোমুখি হয়েছি! বিচিত্র! বিচিত্র! তবে কদাপি ভেবো না, আজ যেহেতু জীবন সম্বন্ধে বৃহত্তর, সত্যতর দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে, সে কারণে তার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। না, তা সত্য নয়, আসল বস্তু পূর্বের মতই একইভাবে বর্তমান। তবে তা নৈর্ব্যক্তিক বস্তু, নামের দ্বারা সীমায়িত নয়। মনে রেখো, যা ঘটেছে, তার প্রয়োজন ছিল প্রাণ ও মস্তিষ্ককে রক্ষা করার জন্য, এবং সম্ভবতঃ আমার কর্ম-ক্ষয়ের জন্যও। এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের খ্রীস্ট, মহম্মদ বা নারীপূজার মত ব্যাপার; একবার তা সম্পন্ন করবার পরে তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

১১ অক্টোবর, একই জনকে—"আগামীকাল খোকার অবতরণ করার কথা। আমি যে-রকম অনুরোধ করেছি সেইভাবে তারা যদি নাগপুর হয়ে কলকাতা যায় তাহলে এখানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রবিবার সকালে এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা একত্র বেড়াবো। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছি না, কারণ খোকার মধ্যে কতক-গুলো অদ্ভুত জিনিস আছে যা আশাভঙ্গ করে। আর যদি তারা ঐ কথায় রাজি না হয়, তাহলে ২০শে নভেম্বর নাগাদ কলকাতায় দু' তিন দিন তাদের পাব, তার পরে পুনশ্চ বিচ্ছেদ। তারপরে বড়দিনের সময়ে যদি সে নতুন কোন আহ্বান

পায় এবং গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের পুনশ্চ সাক্ষাতের সম্ভাবনা নিতান্ত ক্ষীণ। সবই স্বামীজীর হাতে। এখন সবই তাঁর জানা। সুতরাং সবই ঠিক।...

বোম্বাইয়ে একজন ফটোগ্রাফার আমার ফটো তুলতে চেয়েছিল। এসে সে খোকাকে দেখল। দেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল—'এ যে মস্ত সাধু!' আমার সুখের পরিমাণ বুঝতেই পারছ। নিগু (ওকাকুরা) বড় চমৎকার, আমার সঙ্গে কথা ব'লে, আমার ভাবগুলি বুঝে, এবং সেগুলি আমার কাছে পুনশ্চ পেঁাছে দিয়ে সে আমাকে বিরাট সাহস দিয়েছে, যাতে করে ভাবগুলিকে খোকার সঙ্গে বিনিময় করতে পারি। ব্যক্তিগত ভাবটুকু চলে গেছে মনে হচ্ছে, কিংবা হয়ত সবই আমার কল্পনা।"

২৩ অক্টোবর, একই জনকে—"আমার খোকা এসেছিল। আমার আশঙ্কা সত্য হয়েছে, তারা অন্য পথে কলকাতায় গেছে। ১৯শে নভেম্বর তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার জন্য সাক্ষাৎ হবে বলে মনে হয়। কিন্তু শুনছি, জানুয়ারীতে সে পাশ্চাত্ত্যে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ ক্ষণিক সাক্ষাৎই সর্বোচ্চে পাচ্ছি।"

৯ নভেম্বর, একই জনকে—"খুব সম্প্রতি আমার এক শিষ্য হয়েছে।...সে কিছুটা লজ্জিত ভাবে পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের শক্তি সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করে কিছু বললে। তাতে আমি শুধু এই বললাম, যেখানে এক বছর কি দু' বছর আগে আমি শিশু ছিলাম, সেখানে এখন আমি মা।...আজ তিন ঘণ্টা আমার খোকাকে পেয়েছিলাম—ফলে আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। গতকাল সে এসেছিল, তারই ভাষায়—কঠিন, শীতল ও হিংস্র হয়ে—তারপরে চলে গিয়েছিল আলোকে ও মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে। আজ কিন্তু সারাক্ষণই সব কিছু পবিত্র ও সুন্দর। অন্যের সঙ্গে যেমন বলি তেমনি তাকে সহজভাবে খোলাখুলি সব বলেছি। দায়িত্ব হবে তারই। আমি যে-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাকে সে বোঝে, এবং তার কথায় যে তন্ময় পূজার সুর যা অর্ধ-সচেতন এবং অজানিতে উন্মোচিত—আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে আদর্শকে আমি তার কাছে নামাইনি এতটুকু। আর তুমি জানো আমার মধ্যে কোথাও কোনো কপটতা নেই। সুতরাং সব কিছু ঠিকঠাক। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি কোনো প্রলোভনের কারণ হয়েছি, সে বলল—'তুমি আমাকে **স্বাভাবিক** করেছ, তুমি আমাকে ঈশ্বরের সন্তান করে তুলেছ।'...

ইতিমধ্যে বলি, আমার খোকার কলেজীয় পার্থিব জীবন পুনরায় স্বচ্ছন্দ হয়েছে। মিঃ র‍্যাটক্লিফের মারফত তার স্বতন্ত্র প্রমাণ আমি পেয়েছি—সত্যই তা হয়েছে, হবেও।"

১৯ নভেম্বর, একই জনকে—"আমার ছোট্ট খোকাটিকে ভালভাবে দেখতে পেয়েছি।"

২১ ডিসেম্বর, একই জনকে—"আমার ছোট্ট খোকা এখন বিশেষ শক্ত সমর্থ ও সুন্দর। একে ভালবাসার আগে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমি এত ভালবাসতে পারি। আমরা আমাদের সকল সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা বলেছি। সে মুক্ত আত্মা, কোনো কিছুর উপরই নির্ভরশীল নয়, আমার প্রাণ শান্তি পেয়েছে তা

শুনে। সেণ্ট সারার কাছে অনন্ত ঋণ—আমাদের এই কথাবার্তা সম্ভব হয়েছে বলে। তবু ব্যাপারটা যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়াত। কেবল জানতাম, আমি তাকে (বসুকে) অকারণ বেদনা দিতাম। আহা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ তিনি যেভাবেই হোক আমাকে সেবা ও ত্রাণ করবার শক্তি দিয়েছেন।"

১৯০৩ খৃীস্টাব্দটি ডঃ বসুর জীবনে খুব শুভ বৎসর নয়। কর্মজীবনে বাধা যথারীতি বজায় ছিল। নিবেদিতার সাহায্যও ছিল। কিন্তু এই বৎসরই জীবনের গভীরতম প্রত্যাশার মৃত্যু হয়েছিল—তিনি ও তাঁর স্ত্রী তীব্র শোক পেয়েছিলেন, যে শোক, আমরা অনুমান করি, ডঃ বসুর উৎসর্গকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই বৎসর তাঁদের একমাত্র সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।

খোকা ও 'বো'র (বউ) সন্তান হবে—সেই সম্ভাবনায় নিবেদিতার উচ্চকিত প্রাণ, তারপরে মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন আশার যাতনা, এবং তারপরে শ্রীমতী বসুর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে অপরূপ সান্ত্বনা বাণী। যে-প্রাণ অপরের বেদনা টেনে নেয়, সেই প্রাণই যে যথার্থ সান্ত্বনা দিতে পারে—নিবেদিতার লেখা পড়ে তা বোঝা যায়।

জগদীশচন্দ্রের শোক : নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ডিসেম্বর ১৯০৩ পর্যন্ত

২৮ জানুয়ারী ১৯০৩, ম্যাকলাউডকে—"সেণ্ট সারা এখানে এসে খোকার রক্ষাকর্ত্রী ও আশ্রয়দাত্রী হলে খুব খুশী হব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকা হয়ত এখানে থাকবে না। সেক্ষেত্রে সেণ্ট সারা খোকার কাছাকাছি থাকুন তাই চাই।... আমি জানি, সারার পারিপার্শ্বিক সুন্দর, যদিও সর্বাংশে তা খোকার প্রয়োজন পূরণ করবে না, তবু নিঃসঙ্গতার তুলনায় কতগুণে ভাল।"

২৬ মার্চ, একই জনকে—"আমার বেচারা খোকা, তার কি যে যা-তা সময় যাচ্ছে!"

২ এপ্রিল, একই জনকে—"আমার খোকার কাছে জীবন বোঝা হয়ে উঠেছে। ভগবান জানে তার ফল কি হবে। সেদিন সন্ধ্যায় তার সঙ্গে একলা ছিলাম, মনে হল যেন জমাট বিষণ্ণতার সামনে বসে আছি—তাকে যেন নড়ানো যাবে না। ঈশ্বর করুন, লক্ষ লক্ষ লোকের এই অবরুদ্ধ যাতনা যেন শীঘ্র দূরীভূত হয়ে যায়। ছোট্ট বউটি মাতৃত্বক্ষণটির দিকে ধীরভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তাকে কত সুখী দেখাচ্ছে!"

৯ এপ্রিল, একই জনকে—"খোকা ডেমনস্ট্রেশনসহ দুটি অপূর্ব বক্তৃতা করেছে।... মিসেস বসু দিন পনেরর মধ্যে সন্তান আশা করছে। অপরূপ নয় কি? এর দ্বারা নূতন জীবন ও নূতন আশার সূচনা হবে, তাই আশা করি। তুমি ভাবতেই পারবে না কী যে মধুর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে!"

২৩ এপ্রিল, একই জনকে—"তোমাকে বলেছি কি, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মিসেস বসুর সন্তান হতে যাচ্ছে! অপূর্ব নয়কি ব্যাপারটি! অনুভব করছি, আমি

যাদের ভালবাসি তাদের মধ্যে একটি শিশুর উপস্থিতি বিরাট মিস্টিক তাৎপর্য যুক্ত করে দেবে। নিঃসন্দেহে কিন্তু শিশুটি হবে উৎসর্গীকৃত। যখন তার আবির্ভাব হবে, আমার বিশ্বাস তুমি তাকে (বসুকে) মধুর করে কিছু লিখবে।"

৭ মে, একই জনকে—"তোমার ভালবাসা খোকাকে দিয়েছি, তোমাকে সে তার ভালবাসা জানাচ্ছে। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে। ছোট্ট বউটি, বলব কি, মাতৃত্বে একেবারে জ্যোতির্ময়ী। যে-কোনোদিনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা। তার দর্শন পেতে আমার ব্যাকুলতার কথা কি করে বোঝাই বল!"

১৮ মে, অবলা বসুকে—

"আমার ছোট্ট মা, আজ সারাদিন ধরে তোমারই জন্য যে কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ঘুরেছে ফিরেছে, সেগুলি বলতে চাইছি বলে আমাকে যেন অশালীন ভেব না। আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি—জানি না বলার অধিকার আছে বলে তুমি মানবে কি না—আমার কাছে তুমি এখনো সেই মা হয়েই আছো—শিশুটি যেন আমাদের সকলের মধ্যে প্রাণময় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।

এই সকালে এক বিচিত্র শোক নিয়ে ফিরেছি।—শিশুকন্যাটিকে দু' এক মুহূর্তের জন্যও আমরা হাতে তুলে নিতে পারলাম না, আমাদের এই মানুষের পৃথিবীতে তার আত্মাকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্যাপ্‌টিজমের মত কোনো অনুষ্ঠান করা গেল না, তার আগেই সে চলে গেল অনুদ্বিগ্ন অকলঙ্করূপে! স্বামী সদানন্দ এলেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বললাম। সদানন্দ বললেন—যে-মাসগুলি ধরে জননী সন্তানের প্রতীক্ষা করে—যে-মাসগুলিতে তুমি পরম ধৈর্যে, পরম মাধুর্যে প্রতীক্ষা করেছিলে—হিন্দুদের কাছে সেইকালে শিশুর সত্তা জীবন্ত, ব্যক্তিত্ব আকারিত, এবং সান্নিধ্য বাস্তব সত্য—তখনকার অনুষ্ঠানগুলি শিশুকে ভালবাসা ও অভ্যর্থনা জানানোর অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। এই ভাবনাটি বড় সুন্দর তাকি তুমি মনে করো না, যার ফলে অনুভব করতে পারবে সেই ছোট্টটি এখনো তোমার সঙ্গেই আছে, সর্বদা তোমার সঙ্গে মা ও শিশুর যোগসূত্র রেখে যাচ্ছে, যদিও সেইসঙ্গে এও সত্য, তোমাকে অনেক মধুর সুখ ও সেবার তৃপ্তি ত্যাগ করতেই হবে। হয়ত তুমি বৃহত্তর মাতৃত্ব অর্জন করেছ, যেহেতু তোমার ক্ষেত্রে প্রাণের না হয়ে শোকের grand sacrament হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ভাবেই হোক, আমি অনুভব করি, যেন তোমার কন্যার সন্নিধি বেশী করে থাকবে তোমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদের সময়ে, তোমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদ আগে তার কল্যাণ করবে, তারপর তোমার। মনে রেখো, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, তা সর্বদাই পূর্ণ, জ্যোতির্ময়, বলীয়ান। যারা ভালবাসে তাদের কাছে অসহায় দেহখানি কি মধুর! মনে হয় তোমাদের তিনজনের মধ্যে এই সুন্দর সম্পর্ক সর্বদা বজায় থাকবে, যদিও এখানে জন্মমুহূর্তই হয়েছে মৃত্যু-মুখের উন্মোচনের ক্ষণ। বোধহয় মুক্ত আত্মারাই প্রবেশপথে পৃথিবীকে ত্যাগ করে যায়। তেমনই এক অতিথির সেবা-পূজা হয়ত তুমি করতে পেরেছ।

সে যাই হোক, প্রিয় আমার—আমার কাছে তুমি চিরদিনের মা। যদি তুমি কোনো চলতি আনন্দকে হারিয়ে থাকো, আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি একই

সঙ্গে সেই মহান জীবন্ত শক্তিলাভ করেছ যার ফলে আরও বেশী করে সার্বভৌমিক মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ—যেহেতু পৃথিবীর লোক যাকে বিচ্ছেদ বলে তারই অনুভূতি লাভ করেছ। সারদাদেবী নিজের একটি সন্তান চেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ওগো, একদিন তুমি এত ছেলে পাবে যে তাদের নিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারবে না।"

চিরদিন তোমারই, আমার অতি প্রিয় তুমি,
—ইতি মার্গট

রোমান ক্যাথলিকেরা কোনো লোকান্তরিত ব্যক্তিকে 'সেন্ট' পর্যায়ে উন্নীত করার অনুষ্ঠানে তিনি যে সেন্ট তার পক্ষে প্রমাণ দেবার জন্য জানায়, কিভাবে তাঁর মধ্যবর্তিতায় মিরাকল্ সংঘটিত হয়েছে। এটা দেখিয়ে দেয়, তাঁরা মৃতের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁরা মনে করেন জীবিত ও মৃতেরা এক বিরাট প্রার্থনায় সমবেত হয়েছেন, যে-প্রার্থনা পরস্পরের হৃদয়নিহিত এবং পরস্পরের জন্য কৃত—এবং জগতের জন্যও। যখন তুমি দেহত্যাগ করবে, তুমিও তাতে যোগদান করবে এবং কে জানে হয়ত মধুর আত্মাটিকে তুমি চিনে নেবে, যে তোমার দিকে দৃষ্টি মেলে ছিল, প্রার্থনা করেছিল তোমারই সঙ্গে। নয় কেন?

অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। মৃত্যুর অন্তরে জীবন—নিশ্চয় তা একটি মহান মিস্টিক পবিত্র সত্য।"

২০ মে, ম্যাকলাউডকে—"প্রিয় শিশুটি—কন্যা—গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে হয়েছিল—মৃত অবস্থায়—জন্মাবার আধ ঘণ্টা আগেই বোধহয় গতপ্রাণ। মায়ের জীবনই শুধু বাঁচানো গিয়েছিল, তাও কষ্টে। বেচারা—বেচারা—ছোট্ট জননী। হারিয়ে গেল কতখানি!"

১৯ জুন, একই জনকে—"এক সপ্তাহ আগে সেন্ট সারা এসে পৌঁছেছেন, আমাশয়ে অত্যন্ত অসুস্থ, তাই অবিলম্বে দার্জিলিঙ যাওয়ার পরিবর্তে বসুর সঙ্গে তাকে থাকতে হল। তিনি এখন অনেক ভাল, সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় নিশ্চিত যাত্রা করছি।"

২৩ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"এই শীতে বোধ হয় পাশ্চাত্ত্যে যাচ্ছি না।...... এখানে এত জিনিস খুলে যাচ্ছে—বেট-এর স্কুল, মুসলিম-সংযোগাদি, আমাদের সঙ্গে মিস লকউডের যোগদানের সম্ভাবনা এবং বিজ্ঞানের কাজ,—এবং আমাদের পল্লী সম্বন্ধে অজস্র পরিকল্পনা—এ সবের জন্য মনে হয় স্বামীজী চান আমি এখানে থেকে যাই।"

১৭ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"নতুন পুস্তক সম্বন্ধে খোকার আইডিয়াটি অপূর্ব। কিন্তু আমরা একটা নতুন পেপার শেষ করছি।"

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ *Plant Response* ("Plant Response as a means of Physiological Investigation") ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে নাগরী অক্ষরে সংস্কৃতে লেখা ছিল—'মাত্রে'। বইটি বিরাট, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮+৭৮১। এতে ২৭৮টি চিত্র ও নক্সা। এর ভূমিকায় লেখক অন্যান্য কথার সঙ্গে জানিয়েছেন—

"The investigations described in the present volume have been an outcome of my work on the similarity of Responsive Phenomena in Inorganic and living Matter, first communicated as a Memoir to the Science Congress at Paris, in August 1900, and subsequently expanded into greater detail in my book on *Response in the Living and Non-Living......*"

জগদীশচন্দ্রের এই দ্বিতীয় কীর্তির প্রতি পৃষ্ঠায় যাঁর হস্তাক্ষর, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি মুদ্রিত অক্ষরে, কারণ তা করলে মিথ্যাচার করা হত। এই গ্রন্থ যতখানি জগদীশচন্দ্রের ততখানিই নিবেদিতার—অন্ততঃ অনুভূতির দিক থেকে। নিবেদিতা গ্রন্থটিকে (এবং গ্রন্থগুলিকে) 'আমাদের বই' বলেছেন। আবিষ্কার অংশ জগদীশচন্দ্রের, প্রেরণার প্রধান অংশ নিবেদিতার, রচনাংশ তাঁরই, নক্সা প্রভৃতিও বহুলাংশে তিনিই করেছেন, প্রকাশের এবং প্রচারের ব্যবস্থাতে তাঁরই মুখ্য ভূমিকা। এই বইয়ের কাজ যখন তিনি করেছেন, এখানে জানানো উচিত, তখন সেটাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল না। ভারতের জাতীয়তা আন্দোলন-সংগঠনে ইতিমধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন। তার জন্য ব্যাপক বক্তৃতা-সফর এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত সংগঠনে অংশগ্রহণ। তাছাড়া সাংবাদিকতা আছে, নিজের গ্রন্থরচনা আছে (শ্রেষ্ঠ দুই গ্রন্থ, 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' এবং 'দি ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্' এই সময়েই রচিত হয়), লোকসেবার কাজ আছে, বিদ্যালয় চালনা রয়েছে এবং জ্ঞাত অজ্ঞাত অগণ্য কাজ রয়েছে যার অংশমাত্র সম্পন্ন করতে পারলে যে-কেউ মহাকর্মী আখ্যা পেতে পারে। এই সময়ের মধ্যেই তিনি দুবার গুরুতর পীড়িত হয়ে প্রায় মৃত্যুদর্শন করেছেন, যা তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল। নিবেদিতার জীবনে অন্য অলৌকিকতা ছিল কি না তা প্রশ্নের বিষয় হতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষমতা এবং মননশক্তি যে অলৌকিক পর্যায়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

অন্য হিসাবের প্রয়োজন নেই, যদি কেউ নিবেদিতার ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার বিষয়ে সামান্য ধারণা রাখেন তিনিই বুঝবেন, সেই সমস্ত কাজ করেও যদি তাঁকে জগদীশচন্দ্রের প্রথম চারটি বইয়ের এবং মধ্যবর্তী কালের প্রচুর পেপারের লেখার ও নক্সা তৈরীর মূল দায়িত্ব নিতে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কী অসাধারণ কাজ করেছেন মাত্র ১০ বৎসরে! ঐ চারটি বইয়ের মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এবং নক্সার সংখ্যা প্রায় হাজার!* এবং এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়

---

* *Plant Response* এবং *Comparative Electro-Physiology* —এই দুইটি বইয়ে নিবেদিতার সাহায্য সবচেয়ে বেশী। বিরোধী পক্ষের চক্রান্তের উপযুক্ত জবাব

নিবেদিতার মত উৎসর্গীকৃত চরিত্রও দাবি না করে পারেন নি—ভারতীয় বিজ্ঞানকে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে অন্ততঃ লজ্জিত হতে হবে না।

বিজ্ঞানের কাজ ১৯০৩ সালে চললেও পুরোদমে চলে ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে। এই সময়ে নিবেদিতার যে সব চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্য থেকে ডঃ বসুর কর্মজীবনের খণ্ডিত দিনপঞ্জী যেন আমরা পেয়ে যাই। গবেষণা সাফল্যে উদ্দীপনা, বিরোধী আক্রমণে যাতনা এবং তাকে জয় করার প্রবল প্রয়াস। রয়াল সোসাইটির দ্বার একবার মনে হয়েছিল বুঝি খুলেছে—উল্লাসের সীমা ছিল না তাতে, তারপরে যখন চক্রান্তের ফলে ঈষৎ উন্মোচিত দরজা বন্ধ হয়ে গেল তখন মানুষের নীচতায় অসীম ক্ষোভে—সবই পাওয়া যাবে চিঠিগুলি থেকে।* এই পর্যায়ে জগদীশচন্দ্রের ব্যাপারে মিসেস বুলকে লেখা চিঠির সংখ্যাধিক্য পাঠক লক্ষ্য করবেন। ডঃ বসুর গবেষণায় মিসেস বুলের সক্রিয় সাহায্যের কথা পাঠক পূর্বেই জেনে এসেছেন। সেই সক্রিয়তা কতখানি ছিল এখানেই পাঠক দেখবেন। চিঠিগুলি থেকে দেখা যাবে, ডঃ বসুর সঙ্গে কাজ করার জন্য নিবেদিতার জীবন-যাত্রার মূল ভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন। এই সূত্রে আমরা মিসেস বুলকে লেখা ডঃ বসুর কয়েকটি চিঠিও প্রকাশ করব, এবং ডঃ বসু ও নিবেদিতাকে লেখা মিসেস বুলের কিছু চিঠিও। ডঃ বসুর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে এই পত্রগুলির অসীম গুরুত্ব ভবিষ্যতে স্বীকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জগদীশচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ

১৯০৭ সালে ডঃ বসুর তৃতীয় বই প্রকাশিত হয়। নাম—

Comperative Electro-Physiology: A Physico-Physiological study.

এইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪+৭৬০। ছবি ও নক্সার সংখ্যা ৪০৬। ভূমিকায় বলা হয়েছে—

দেবার জন্যই গ্রন্থগুলির রচনা। যে বিরোধিতা এত বড় সৃষ্টি সম্ভব করতে পারে তা অভিনন্দনযোগ্য মনে হয়েছে অধ্যাপক গেডিসের কাছে। বই দুটির পিছনে যে বিপুল প্রতিভা ও পরিশ্রম রয়েছে তার গৌরব ডঃ বসুকে দান করে অধ্যাপক গেডিস লিখেছেন—

"But happily Bose's response to this combination of environmental stimuli, by turns so depressing and so exasperating, was of the intensity and duration required for the large and sustained experimental productivity summarised in the two books which Bose wrote for publication. *They include an amount of work and fresh result during the three years of their production to which there can be few parallels in science;* so that, despite the painfulness of these experiences, we can now hardly regret them. We must, in fact, rather congratulate their sufferer upon stimuli which have proved to be of such effective increase in his own movements and growth." (Italics mine)

"This volume concludes the line of investigation on responsive phenomena in general, which I commenced with the publication of a Memoir at the International Congress of Science, Paris, 1900......"

এই গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের এক পর্যায়ের, বলা যায় মুখ্য পর্যায়ের গবেষণার সমাপ্তি। জগদীশচন্দ্রের জীবনের এই পর্ব ১২ বৎসরের এবং হিন্দু জীবনে ১২ বছরের অর্থাৎ এক যুগের তাৎপর্যের কথা নিবেদিতার মনে বারবার এসেছে, যেমন ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র যে দশ বৎসর সাধনার ব্রত নিয়েছিলেন, তার সমাপ্তির কথাও।

আলোচ্য পর্বের মধ্যে ডঃ বসু ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে নিবেদিতার বুদ্ধ-গয়া ভ্রমণ এবং বজ্রচিহ্ন আবিষ্কার। এই ভ্রমণের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য 'নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হবে। 'বজ্রকে' নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র উভয়েই প্রতীক করেছিলেন, এবং নিবেদিতা চেয়েছিলেন, ভারতের জাতীয় পতাকায় 'বজ্র'-প্রতীক গৃহীত হোক।

ডঃ বসুর জীবনী লিখবেন, নিবেদিতার এই অভিপ্রায়ের কথাও জানতে পারি, যার উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত লিখে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এইসব এবং আরও বহু তথ্য ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়ে নিবেদিতার চিঠি থেকে মিলবে। সেইসঙ্গে ব্যক্তিজীবনের নানা কথা, যার অন্তরঙ্গ স্পর্শ আমাদের কাছে সুপবিত্র সুগভীর অভিজ্ঞতার মত।

১৯০৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত নিবেদিতা, মিসেস বুল, ডঃ বসু প্রভৃতির পত্র

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ ১৯০৭ পর্যন্ত

৭ জানুয়ারী ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে—" 'ওয়েব' তাঁর (স্বামীজীর) বই—তাই নয় কি? আর কোনো উৎসর্গ পত্র নয়, শুধু লেখা 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে!' গুরুজীর জয়। প্রিয় য়ুম, তোমার সমস্ত জীবন মুখর হয়েছে এই কথায়—'ওয়াহ্ গুরু!' এই উৎসর্গটি খোকা নিজের হাতে লিখেছে, আমার পক্ষে।"*

১৭ মার্চ, ওলি বুলকে—"এ চিঠি দীর্ঘ হবে না কারণ আমার নিতান্ত সময়াভাব। এ সপ্তাহে খোকাকে অপার যাতনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তার বালক ভাগিনেয়, যে তার নিজের শিষ্যও বটে—মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। কিন্তু আমি জানি স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ফিরিয়ে আনবেন। গতকাল সকালে মনে হয়েছে তার বিপদ কেটেছে। স্বামীজী কখনই প্রিয় কোনো জীবনকে ত্যাগ করেন

* নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে জগদীশচন্দ্রের হস্তাক্ষরে উৎসর্গ-পত্রটি লেখা, আমি দেখেছি।

না। এই হল সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা। মধ্যবর্তীকালে, এই সংকটের জন্য খোকা ও ছেলেটির মধ্যে সম্পর্ক অপূর্বভাবে গভীর হয়েছে। সে এখন আমাদের ছোট্ট 'খোকা'র (অরবিন্দমোহন) মতই ঘনিষ্ঠ। কোনো কিছু তাতে চিড় খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু খোকার (বসুর) যাতনা হয়েছিল নিদারুণ।

(অমুকের) চিঠিতে জানছি যে, ওয়েলার রয়াল সোসাইটিতে দাঁড়িয়ে উঠে (ডঃ বসুর) পেপার প্রকাশে বাধা দেবার মত স্পর্ধা দেখিয়েছে! কল্পনা করতে পারো! তুমি হয়ত ভেবেছ, খোকার নাম শুনলে সে মুখ লুকোবে। তার চিহ্নও নেই!

কিন্তু শক্তিসামর্থ্যে আমরা কত না বেড়ে উঠেছি! ব্যাপারের ভাবনায় এক মুহূর্তও ব্যয়িত হয়নি, শুধু শান্ত প্রশ্ন—এর পরে করণীয় কি? এবং—তা করবার জন্য লেগে যাওয়া।

এখন থেকে জুলাই পর্যন্ত আমার প্রতিটি উদ্বৃত্ত মুহূর্তে তার কাজে দিতে চাই।"

১৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"কয়েক সপ্তাহ যে তোমাকে লিখতে পারিনি তার জন্য মিষ্টি করে কিছু বলেছ। আমি লখনৌ ও বারাণসীতে সফরে গিয়েছিলাম, তারই মধ্যে প্রকাশকদের কাছে চিঠিপত্র ও আমার বৈজ্ঞানিক-সহায়িকার কাজ—এসবের জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।"

২৪ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"আগামীকাল আমার জন্মদিন ('নিবেদিতা'-জন্মের) —মনে আছে তো? আজ লেখার সময় খুবই অল্প, কারণ এই সপ্তাহে বিজ্ঞানের দাবি ছিল প্রচণ্ড, এবং সে চাপ বজায় থাকার সম্ভাবনা আছে।"

১৪ এপ্রিল, ওলি বুলকে—"আমাদের প্রিয় খোকা এত কঠোর পরিশ্রম করছে!"

[১৯০৪-এর মে মাসে মিসেস সেভিয়ারের আমন্ত্রণে বসু-পরিবারকে নিয়ে নিবেদিতা মায়াবতী যান। প্রায় দেড় মাস সেখানে তাঁরা থাকেন এবং 'প্ল্যাণ্ট রেসপনস্' গ্রন্থের কাজ পুরোদমে চলে। ডঃ বসু পরেও নিবেদিতার সঙ্গে ১৯০৭-এর গ্রীষ্মে এবং ১৯১১-এর গ্রীষ্মে মায়াবতী যাবেন, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁর স্থায়ী প্রীতি-সম্পর্কের সূত্রপাত হবে। নিবেদিতার দেহান্তের পরেও ডঃ বসু মায়াবতী গিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ডঃ বসুর সম্বন্ধে যত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সংঘ-সম্পর্কহীন কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে সেরূপ হয়েছে কি না সন্দেহ। অদ্বৈত আশ্রমের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারতের যে-বিশেষ সংখ্যা বেরোয় তার অনেকগুলি লেখায় ডঃ বসুর উল্লেখ থাকে এবং তাঁর দেহান্তের পরে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোকসংবাদ লেখা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে গভীর প্রীতিসম্পর্কসূচক এই সংবাদগুলির কয়েকটি আমরা চয়ন করে দিচ্ছি :

"Mr. Herbert Spencer, shortly before his death, wrote to Dr. J. C. Bose in highly appreciative terms regarding his scien-

tific work, the results of which that great philosopher was desirous of incorporating in his own writings." [P.B. Oct., 1906]

NERVOUS IMPULSES

(*Report of a lecture by Dr. J. C. Bose, C.I.E. at Advaita Ashrama, Mayavati*).

On the afternoon of June 23rd, the Mother brought her guests up to the Ashrama, and there monks and visitors sat in a circle, to listen to a talk by Dr. J. C. Bose. It has become a custom with Dr. Bose, when visiting Mayavati, to give at least one lecture to the assembled monks, and on this, his third visit, the tradition was notably maintained.

Dr. Bose the ideal teacher. Not only does he start always from the familiar, and make each point simple to demonstration, as he proceeds, but he appears unable to pass from one step of an argument to another, until definitely satisfied that all, even the lowliest of his hearers, understands.

[P.B. Aug. 1911]

PROFESSOR BOSE'S LECTURE AT MAYAVATI.

Professor J. C. Bose, M.A., D.Sc., C.I.E., C.S.I. of the Presidency College, Calcutta who is widely celebrated in scientific circles in Europe and America, as well as in his own land, was again a most welcome visitors at our Ashrama. He is always delighted to spend the summer holidays at our Ashrama because of the opportunity for solitude and complete retirement as well as for the calm and deep thinking it affords, and also because of the great beauty of the surrounding scene. And again, as the chief event of his stay, so far as the Mother and inmates of the Ashrama were concerned, was the lecture, which he has given each time of his visits, concerning the lines of his research.

This year, however, the lecture which has always been held in the Ashrama Library, proved an even more interesting event than the previous lectures, considered both from the text of his subject and the number of hearers. As to the latter, the Mother and invited the European residents of the near-by station of Lohaghat, headed by Mr. R. Nestor, the sub-divisional officer, to attend the address; also the Tassildar Sahib of Champawat had been invited. Thus, in all, there was a gathering of quite thirty persons, a considerable audience for a lecture in a monastery situated in the heart of the Himalayas and far distant from towns and railways.

The subject of Professor Bose's lecture was "The Irritability of Plants." For the occasion his assistant, Bosiswar Sen, B.Sc., had made, at his instructions, a sample of a recording instrument frequently used in the experiments at the Presidency

College Laboratory. With this instrument, to which a plant had been attached, Professor Bose illustrated his ideas on plant response and the methods employed for making automatic records. It was the automatism of the plant in writing out its own history under the influence of various shocks and narcotics which proved of the greatest interest to the distinguished lecturer's audience. He pointed out, by drawing and lucid explanation, the astonishing fact that plants respond to external stimuli in much the same way that animals respond; in fact in some instances the response is even more complex and quicker in plants. Previously it had been supposed, so said Professor Bose, that the response of a plant was purely physical of hydro-mechanical. Through his successful investigations, however, he had been able to prove that the changes induced in a plant, through electric or other stimuli, were physiological, proving the existence of a nervous, living, sensitive apparatus in the structure of a plant. In making his experiments Professor Bose said, it was necessary to invent an instrument that would record time to as infinitesimal a degree as a thousandth part of a second. He exhibited also the practical results of his new, demonstrated theories, how they would in time revolutionise practical botany. He also suggested how scientific discoveries proved, more and more as they were extended, the underlying unity of life, despite the multiplicity of living forms and showed, how science was in real consonance with the teachings of the Hindu philosophers that, "From a multi-verse we proceed to a universe."

The lecture proved most interesting, as may readily be imagined. The guests were entertained with light refreshments and in spite of a most rainy day and a journey of seven miles both in coming to and returning from Mayavati, the guests expressed their great interest and delight. Professor and Mrs. Bose remained in all about seven weeks at Mayavati, leaving this place on the twenty-third of June to resume his interesting work in Calcutta. [P.B. June 1913].

THE ADVAITA ASHRAMA, MAYAVATI, HIMALAYAS

(*A Report of work from 1911 to 1913*).

The Ashrama counts among its honorary guests and visitors, numbering 63 within the last 3 years, many distinguished persons, Indian and Western. The great scientist, Dr. J. C. Bose, C.S.I. passed his summer holidays every year in the precincts of the Ashrama and greatly enjoyed the calm, and the salubrious climate, returning to the field of his work fully refreshed in health and vigour. His sojourn, besides being pleasant, was highly instructive to the residents of the Ashrama. He kindly gave a lecture each year on his new discoveries, and thus the members had the opportunity of hearing with absorbing in-

terest his discourses on (1) The Similarity of Stimulus and Response between Human organisms and plants, (2) Do plants feel? and (3) Irritability of Plants. In these lectures, he spoke of his latest discoveries before even they were given out to the public. Sister Nivedita during her last visit to the Ashrama in the summer of 1911, also gave a valuable talk to the members setting forth in her unique way the aims and ideals in Education and study that should guide the Vivekananda Brotherhood in making them eminently useful in their service to the Motherland. [P.B. Dec. 1913].

অদ্বৈত আশ্রমের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারতের বিশেষ সংখ্যায় (জানুয়ারী, ১৯৫০) *Reminiscences of Mayavati Ashrama* প্রবন্ধে বলা হয়েছিল :

"Sir Jagadish Chandra Bose, the famous scientist, who had been to Mayavati four or five times, used to say, 'when I am at Mayavati, ideas rush into my mind, but when I am in Calcutta, everything seems to dry up.' "

ঐ সংখ্যাতেই *Advaita Ashrama, Mayavati: Early Years* প্রবন্ধে দেখতে পাই, মায়াবতীতে একটি পায়ে হাঁটার পথের নাম 'Bose's Walk.' ঐ পথ ধরে ডঃ বসু পাদচারণা করতেন। এই প্রবন্ধের মধ্যেই একটি ছবি দেওয়া হয়েছে, যাতে দেখা যায় আশ্রমের 'মাদারস্ বাংলো'র বারান্দায় বসে আছেন স্বামী অতুলানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী বিরজানন্দ, সিস্টার ক্রিস্টিন, মিসেস সেভিয়ার এবং লেডী অবলা বসু।

পুনশ্চ, *Fifty years of Advaita Ashrama, Mayavati* প্রবন্ধে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে ডঃ বসু এবং আনন্দমোহন বসুর নাম আছে।

ডঃ বসুর দেহত্যাগের পরে জানুয়ারী ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারতে বিস্তৃতভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। তার প্রথম অনুচ্ছেদ :

"The death of Sir Jagadish Chandra Bose on the 23rd of November last has been deeply mourned by the nation as well as by the whole of the scientific world. It has also been felt as a personal loss by us. He was long closely associated with the Advaita Ashrama, Mayavati, Himalayas. For a number of years both he and Lady Bose used to visit the Ashrama almost annually and to stay here during the summer months. The members of the Ashrama were drawn to them by their easy and natural manners, and they often used to watch with great interest Dr. Bose's demonstration of the fascinating story of plant's life."

১৪ জুলাই, ওলি বুলকে—"আগামীকাল তুমি আমাদের টেলিগ্রাম পাবে—'Victory, Royal accepts' (অর্থাৎ জয় হয়েছে, রয়াল সোসাইটি বসুর পেপার

প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছে)। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ও (বসু) নিজে তোমাকে লিখবে। ট্রানজাকশনস্-এর জন্য গৃহীত হওয়ার অর্থ—ইংলণ্ডের বিজ্ঞানের রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হওয়া। এপর্যন্ত যা হয়েছে এটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা।"

২১ জুলাই, ওলি বুলকে—"আমরা 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশন্' নিয়ে কী গর্বিত! এখন যদি বোটানি বইটি লিখে ফেলতে পারা যায়! তারপর আমরা আবার ফিজিকস্-এ ফিরে যেতে পারব।" (এরপর পত্র খণ্ডিত)

২৮ জুলাই, ওলি বুলকে—*"Philosophical Transaction* -এ খোকার পেপার প্রকাশের তাৎপর্য বুঝতে পারো কি? এর অর্থ—১৯০১-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চে সে বোটানিতে ডুব দেয় এবং ১৯০৪-এ এমন কিছু লিখল যাকে ইংরেজরা ঐ বিষয়ে তাদের বেদগ্রন্থে প্রকাশ করতে পেরে গর্ব অনুভব করতে পারল। ১৯০৪ শেষ হবার আগে একটি বই প্রস্তুত করার যথেষ্ট আশা রাখি, যা উদ্ভিদ জগৎ পরিক্রমণ করে ব্যাপারটার ইতি করে দেবে। সাড়ে তিন বছরের কাজ একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানকে তার মূলীভূত ঐক্যের সমন্বিত রূপে অঙ্গীভূত করে ফেলল! ভাবো একবার! সব রেকর্ড গুঁড়ো! পরের মেলে রয়াল সোসাইটিতে খবর পাঠাবার আশা রাখি। বর্তমানে দমবন্ধ করে আমাদের কাজ চলেছে, গ্রহণ, বর্জন, সংযোজন প্রভৃতি। আমার ক্ষুদি-ক্ষুদি লেখার চেহারা দেখলে তুমি হাসবে।

ভারতের 'ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি' বা উচ্চতর বিজ্ঞানের জন্য একটি ভারতীয় বৃত্তির প্রবর্তন করে তোমার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কি? খুব খরচ হবে কি? আমেরিকা হয়ত একদিন খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করবার কারণ খুঁজে পাবে।"

১১ অগস্ট, মে উইলসনকে—"ডঃ বসু তোমার চিঠি শোনেন গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে। বইটির (সম্ভবতঃ 'দি ওয়েব') বিষয়ে তিনি প্রতিটি শব্দ শুনতে চান এবং মার্গট ও সিসিলির (মে'র দুই মেয়ে) বিষয়ে প্রতিটি শব্দ। তিনি প্রায়ই বলেন, যখন সুযোগ ছিল তখন ছোট্ট মার্গটের উপরে তাঁর সমস্ত স্নেহ ঢেলে না দেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই ভুল হয়েছে।"

২১ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"আমার অযোগ্য মস্তকটির যে রেখাচিত্র মিস স্টাম করেছেন, তার ফটোগ্রাফ ও মুদ্রণ কী মনোরম হয়েছে! বিজ্ঞানের মানুষটি (বসু) শাসিয়ে রেখেছেন, এইটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আমার পোরট্রেট বললে শেষ করে ফেলবেন। আর—এটিকে সত্যই ভালবাসি, কারণ এর রচনায় স্বামীজীর সাহায্য ছিল। কী মধুর দিনই না ছিল তখন!*

---

* মড স্টামের আঁকা এই স্কেচ-এর বিষয়ে নিবেদিতা ৮. ২. ১৯০৫ তারিখে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"সেণ্ট সারাকে লিখেছি, তিনি যদি পারেন মিস স্টামের আঁকা আমার স্কেচ-এর ফটো যেন পাঠিয়ে দেন। এটিকে এমনই সুন্দর বিবেচনা করা হয়েছে যে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এটি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহৃত হতে দেবো না।"

বিজ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ। গত একবছর ধরে আমরা যা লিখেছি তা একেবারে বোমা! প্রায় মাসে-মাসে একটি করে পেপার। শেষের দিকে গতি একটু কমাতে হয়, কারণ আমাদের শারীরিক সামর্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হবার মুখে। যাইহোক, ভরসা করি, এ অবস্থা স্থায়ী হবে না, অবকাশযাপনের পরে আমরা আবার নবোদ্যমে কাজ আরম্ভ করতে পারব, একটা বিরাট বইয়ের কাজ, যা দু'বছরের মত সময় নিতে পারে। কাজটি চলতি ধারণার থেকে এত অগ্রগামী এবং এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে যে, অবিলম্বে এর প্রকাশন সম্ভব হবে না। গত অক্টোবরের কাজ ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক সমাজে কয়েক মাস আগে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আরও ডজনখানেক কাজ করে ফেলেছি যা বিবেচিত হবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি!

ভেবে আনন্দ হয় যে, **আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান তার মূল রূপে যেমন, তেমনি লেখায় প্রকাশের ক্ষেত্রেও সামান্যতম ত্রুটিমুক্ত থাকবে না। এইদিক থেকে আমরা আশা করতে পারি, সর্বকালে এটি ক্লাসিক হয়ে থাকবে।"**

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

১৩ নভেম্বর, ওলি বুলকে—"খোকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ। আমার নিজের অভিমত, সে আগামী অক্টোবরে, ১৯০৫-এর অক্টোবরে, ছুটিতে থাকার অনুমতি চাইবে......" (পত্র খণ্ডিত)

১ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"গতকাল ছিল খোকার জন্মদিন। এই দিনটিকে বলি 'বজ্র-দিন', কারণ তার দশ বছরের ব্রতের সমাপ্তি ঐ দিনে। এখন সে মুক্ত। মনে হয় স্বাধীনতা সর্বদাই ঐ রকম—সকল বহিরঙ্গ বাধ্যবাধকতার সমাপ্তি— —তখন—"আমার আর কিছু করার নেই, ঈশ্বর তাই সহায় হোন!" আরও বলি, আমরা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে নিয়েছি। ফরাসীরা যেমন নেপোলিয়ানকে বলে L'homme, তাঁকে ইঙ্গিত করবার জন্য আর কোনো কথার দরকার হয় না, তেমনি প্রাচীনকালে বুদ্ধের নাম লেখার পরিবর্তে বজ্র বললেই চলে যেত।

এবিষয়ে আরও অনেক গভীর কথা আছে, যা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নানা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারবে যখন স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে বজ্র কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।"

১ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"খোকার জন্মদিন তাকে স্পষ্টই সুখী করেছে। এবং সে একটি অসাধারণ এক্স্পেরিমেন্ট করেছে, যাতে একটি আকর্ষ তার ইচ্ছামত পাক খুলে বিপরীত দিকে পাক দিতে সচেষ্ট।

ঐ সন্ধ্যায় সামান্য কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। গিয়ে দেখলাম, পড়ার ঘরের সাজ বদল। তার (বসুর) ডেস্কের পিছনে পুরনো পিয়ানোর কাঠ দিয়ে লম্বা তাক তৈরী হয়েছে। কোণের বিছানাটাকে নীচু করে ডিভানে পরিণত করা হয়েছে, দেওয়ালে ডিসটেম্পার করে সবুজ রঙ; কাঠের রঙ সাদা।

তদুপরি, বুদ্ধগয়ার মোহন্ত আমাদের প্রায় নিখুঁত একটি স্তূপ দিয়েছেন, যাতে সুন্দর বুদ্ধ বসে আছেন বহু শত ক্ষুদ্র বুদ্ধের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। এই

স্তূপটিকে তার (বসুর) ডেস্কের কাছে একটি স্তম্ভের—পদ্ম-স্তম্ভের—উপরে বসান হয়েছে। সব বুককেস বিতাড়িত—তাদের জায়গায় তিনটি নীচু বুককেশ। ফলে এখন ঘরের মধ্যে হাঁপ ছাড়া ও বিশ্রাম করার জায়গা হয়েছে।...

তোমার পক্ষ থেকে আমরা ভারতীয় রীতিতে তৈরী চারটি পশমী জিনিস দিয়েছিলাম—তার দুটি খাঁটি সাদা সিল্ক ও পশম মিশিয়ে তৈরী, আর দুটি বিস্কুট-রঙের ফ্লানেলের। খুব একটা কায়দার ব্যাপার; বিশেষ আনন্দ দিয়েছে।......

তোমাকে জানাই, গতকালকার দিনটিকে আমরা ভবিষ্যতে সর্বদা 'বজ্র-দিন' বলব, কারণ ঐদিন তার দশ বছরের ব্রতের সমাপ্তি। আমরা ও-বাড়িতে পতাকা নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে বজ্র আঁকা।"

৫ মার্চ ১৯০৫, ওলি বুলকে—"গত রাত্রি ছিল শিবরাত্রি। খোকা (ডঃ বসু) 'খোকা'কে (অরবিন্দমোহন বসু) নিয়ে এসেছিল। ...একটি সংবাদপত্রে কিছু অসুবিধাজনক সংবাদই এই আগমনের মূলে।

বুধবার। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। সকালে মঠে গিয়েছিলাম গোলাপ নিয়ে। দুপুর থেকে কাজ চলেছে, আমি এত ক্লান্ত তার ফলে। বহু দরকারের কথা বলবার আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ভালবাসার, প্রার্থনার কিছু করবার জন্য প্রাণ তৃষিত। মন্দ খবরটি কি, তুমি তা নিজেই দেখবে। বলবার মত যা-কিছু খবর সবই মন্দ খবর। প্রতিদিন সংগ্রাম তীব্রতর, অসাধুতা জঘন্য—জঘন্যতর ক্রমে—তিক্ততার বৃদ্ধি। জগজ্জননী, মা মাগো! মানুষ কি করতে পারে বল?

হাত দিয়ে যেন সমুদ্র রুখবার চেষ্টা—তাই মনে হচ্ছে—ঠিক তাই।......

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রিয় সারা, দেখতে পাচ্ছ, উৎসাহজনক কিছু নেই কোথাও। মায়ের কাছে প্রার্থনা করো—ওরা যেন এখনো পেপারটিকে চেপে দিতে না পারে—তা যেন 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশানস্'-এ প্রকাশিত হতে পারে। অবশ্যই প্রার্থনা করো।...

গভীরতর শান্তি এনে দিতে কিভাবে না চাই! সেই ক্ষমতা যাতে পেতে পারি, তার জন্য প্রার্থনা কখনো থামিও না। আর তার (বসুর) জন্য সেই স্থির আলোকের প্রার্থনাও কদাপি থামিও না—যেখানে সব শক্তি, সব কিছু মাধুর্যে ভরা। একবার তুমি বলেছিলে, এমন একদিন আসবে যখন সে (বসু) আমার ধর্মবিশ্বাসের পর্যন্ত অংশীদার হবে। নিশ্চয় করে বলতে পারি না কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে সে সময় এসেছে। এমন ভবিষ্যৎবাণী আরও করো তুমি—ঐসব কথা কিভাবে না শুনতে চাইছি!...

পেপারটির বিষয়ে গণ্ডগোল হয়ত খোকাকে আর এক বছরের পরে য়ুরোপে যেতে বাধ্য করবে—কে জানে!"

[এর পরেই নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুখের সময়ে তাঁকে বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে বসুদের বাড়ির কাছাকাছি বিরাট খালি বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়, তাতেই তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। নিবেদিতা ৫ এপ্রিলের চিঠিতে তা জানিয়েছেন।]

১২ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"ডঃ বসুর বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। হাঁ—পরবর্তী শরৎকালের মধ্যে আমরা বোটানির একটা বই বার করে ফেলতে পারব, যা বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে অতীব বিস্ময়কর বোধ হবে, এ আশা আমরা রাখি। সে (বসু) যেভাবে দেখছে তাতে কাজটা সম্পূর্ণ শেষ করতে কয়েক বৎসর লাগবে, কিন্তু কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে যাচ্ছে!"

৪ মে, গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে—"আমার সম্বন্ধে আপনি যে-সব সহৃদয় উক্তি করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমি তার যোগ্য নই। আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে আমরা—ডঃ বসু এবং আমাদের (নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন) উভয়ের পক্ষে বলছি—আপনাকে একেবারে অন্তরঙ্গমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত মনে করি।"

২৩ মে, ম্যাকলাউডকে—"বুঝে দেখ, ১২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মেলা থেকে ৮ মে, আমাদের এখানে আসার তারিখ পর্যন্ত, আমি প্রায় কোনো কাজ করিনি। আবার এখন আমরা বিজ্ঞানের নতুন কাজে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। সুতরাং—একেবারে অকেজো নই!"

২৪ মে, ওলি বুলকে—"শুভ জন্মদিন বার বার আসুক। খোকা তোমাকে তার করতে চাইছিল। কিন্তু এখানে এত সুন্দর সব তিব্বতী জিনিস রয়েছে এবং সেগুলি এতই দামী যে, খোকার মনে হল তারই কিছু ঐ টাকায় কিনে তোমাকে পাঠান ভাল, যাতে স্থায়ী আনন্দ পেতে পারো।...

খোকা আমাকে একটি **শিয়ালছানা** দিয়েছে ; যদিও তার দাম চার আনা কিন্তু যেহেতু কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার সুন্দর কালো চোখের দিকে না তাকিয়ে পারি না, খোকা বলে, অমন ব্যয়বহুল জিনিস সে দেখেনি! কয়েক দিনের মধ্যে ওটিকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছা।...

ঠিক হয়েছে আজ শেয়ালছানাটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তোমার জন্মদিনের সম্মানে। বল, তুমি খুশী হওনি!"

১৩ জুন, ওলি বুলকে—"খোকা বলছে, তুমি পাশ্চাত্যযাত্রার পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে উদ্‌গ্রীব। তার ইচ্ছা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলি যে, এখানে নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং সেই একমাত্র লোক যে আত্মসমর্পণ করেনি, সুতরাং আরও এক বছর কি দেড় বছরের জন্য এদেশে তার একাদিক্রমে অবস্থান প্রয়োজন। এখনি সে লেফটন্যাণ্ট গভর্নরের কাছে পুনরাবেদন করতে চাইছে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ; যদি তা সফল হয় খুবই ভাল ; না হলে ব্যাপারটা সহ্য করতে হবে। কিন্তু আরও ১২ কি ১৮ মাসের আগে সে পদত্যাগের কথা ভাবতে পারছে না।...

বইয়ের বিষয়ে। এই বইটি অপর বইয়ের চেয়ে আকারে ২সিসি বড় হবার সম্ভাবনা। তবু খরচের হিসাব মাত্র ১৬০ পাউণ্ড ; তার উপর নক্সার জন্য ২০০ পাউণ্ড। আমাদের ধারণায় এ খরচ খুবই কম। অবশ্য তুমি যা বলেছ, আমার নিশ্চিত ধারণা তা সত্য। কিন্তু খোকার সমস্ত মনপ্রাণ বইটির যোগ্য মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য এমনই পড়ে আছে যে,—এটিকে 'একটি বজ্র' করে তুলতে চায়। তাই আমি এর

সম্বন্ধে কোনো কিছুতে প্রতিবাদ করিনি। সব জড়িয়ে মনে হয় ৩০০ থেকে ৪০০ পাউন্ড খরচ হবে। সে এখন এটিকে একখণ্ডে বের করবে বলে ঝুঁকেছে। যদি তাই হয় তাহলে খরচ কম হওয়ার কথা।"

২১ জুন, ম্যাকলাউডকে—"অবিরত কাজ করে যাচ্ছি, এবং বোটানির উপর নতুন একটি বই প্রায় শেষ। বিজ্ঞানের ভারতীয় মানুষটির মধ্যে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি তাঁর কাছে যে-সাহায্যই আসে সবই ব্যবহার করতে পারেন, এক্ষেত্রে গেডিসের মত নন তিনি। **এখানে** বৃথা ব্যয়িত চেষ্টা বলে কিছু নেই।"

২১ জুন, ওলি বুলকে—"জন্মদিনের মুখে লেখা তোমার চিঠি এখানে এসে পেঁছেছে। গতরাত্রে কি আগের রাত্রে খোকা আমাকে বলছিল—তুমি এবং আমি **বর্তমান আছি**, এইটে জানলেই চলে যায়। সে বলেছিল, তার কাজের বিরুদ্ধে সকল বিক্ষোভ, মাপামাপির চেষ্টা এবং প্রতিঘাতের চেষ্টার উল্টোদিকে সে রেখেছে **তোমার** অভ্যর্থনা, হৃদয়ের উত্তাপ এবং তারিফ : 'যদি সে (বসু) আর কিছু কখনো না করে তাহলেও ইতিমধ্যে যা করেছে তাই যথেষ্ট।' পরের শীতের কথায়, সে তোমাকে জানাতে বলেছে, তার সর্বদা ভয়—(ভারতে) আসার পথে তোমার ভালমন্দ কিছু হতে পারে, সুতরাং সে কোনো দারুণ সংকটের জন্য তোমার আগমন জমিয়ে রাখতে চায়। আমার অসুখের সম্বন্ধে যদি সে পূর্বাহ্নে কোনো সংকেত পেত তাহলে তোমাকে নিশ্চয় ডেকে পাঠাত।

কিন্তু আমরা সর্বদাই তোমাকে চাই—এটা অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে।...

বোটানির উপর বইটির শেষের অধ্যায়গুলি এখন লেখা হয়ে গেছে।"

২০ জুলাই (চিঠির খণ্ডিত পৃষ্ঠা)—"খোকা আজ এল—এত ক্লান্ত। আহা বেচারা! আমি এখন আরও শক্তি পেয়েছি। ফলে দেখতে পাচ্ছি, আমার কাজ শুধু দিয়ে যাওয়া—কেন, কোথায়, তার ফল কী হবে—এসব যাচাই করা নয়।"

১৭ অগস্ট, ওলি বুলকে—"সূচীকর্মকে তুমি আশাপ্রদ মনে করেছ বলে আমি আনন্দিত। আমার মতে উন্নতি হচ্ছে ক্রমেই। মহিলাদের মধ্যে একজন সদ্য খোকার জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করেছে, যা সে বরোদার মহারাজাকে দেবে।

এখন বল দিকি শুনে কি বলবে—১লা জুলাই আমরা নতুন বইয়ের ১ থেকে ২০ অধ্যায় পর্যন্ত ডাকে পাঠিয়েছি ; গতকাল পাঠিয়েছি ২১ থেকে ৩১ অধ্যায়—আরও ১১টি অধ্যায়! বাকিটা লিখতে হবে, যা অবশ্য মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়।

এ পর্যন্ত **১৬৮টি** নক্সা এবং ২৭৯ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। কিন্তু বাকি আছে দ্বিগুণ পৃষ্ঠা, যার অর্থ ৫০০ থেকে ৫৫০ পৃষ্ঠা!

গত সপ্তাহে এক ইংরাজ অধ্যাপকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছ থেকে খোকা সম্বন্ধে যথেষ্ট নাক-সিঁটকানো কথা শুনলাম। আমি চুপ করে ছিলাম, তাকে কিছু বলিনি, কিন্তু মনোভাব? এখন শুধু চাইছি তাদের এমন কিছু দিতে যাকে পৃথিবী স্বীকার করবে। তুমি এখানে না থাকার ভ্রান্তির লজ্জা কিভাবে না অনুভব করছি। তুমি থাকলে একটা দল তৈরী করা যেত, যার ফলে ওরা এত বেশী এগোতে

সাহস করত না। এই বিশেষ লোকটি আবার খোকার বন্ধুরূপে বিবেচিত হতে ব্যস্ত—ভেবে দেখ একবার! যাই হোক, এসব খোকার কাছে ধরা পড়েনি।”

২৪ অগস্ট, ওলি বুলকে—“প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চিঠি লিখব না যেহেতু আমরা এই সপ্তাহে বইটির উপর কঠোর পরিশ্রম করছি।”

৩১ অক্টোবর, ওলি বুলকে—“খোকাকে লেখা তোমার চিঠিগুলি দীর্ঘ পথে ঘুরছে এবং সে এখনো তোমার শেষ চিঠি পায়নি। সুতরাং আজ যতখানি পারি ততখানি সংবাদ তাকে দিয়েছি। আমরা বইখানি এখন প্রায় শেষ করেছি। সে বলেছে, আগামী বছর এই সময়ে দু' বছরের জন্য ইংলণ্ড যেতে চাইবে। এবার আমেরিকা যেতে চায়। ফিরবে জাপান হয়ে, যাতে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা বুঝে নিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমরা জাপানের জন্য যে পরিচয়পত্র দিতে পারি, তা সে চায় না। তার ধারণা আগামী মে ও অক্টোবরের মধ্যে আর একটা বই লিখবে ‘ইলেক্‌ট্রো-ফিজিওলজি অ্যান্ড প্ল্যান্টে’র উপর। আকার হবে অনেকটা প্রথম বইয়ের মতই। এ বইটা হয়ে যাবার পরেই সে যেতে পারবে। এসব তোমাকে জানাচ্ছি, যাতে করে তুমি তার পরিকল্পনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পার। বেশ বুঝতে পারছি যে, তাকে পাশ্চাত্যে যেতেই হবে যখন তাঁর বইটি পঠিত হতে আরম্ভ হবে।”

২২ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—“আমরা ক্রমে খোকার বোটানি বইটির আকাশ-প্রমাণ কাজ শেষ করে আনছি। এখন উপসংহার অংশটি লেখা হচ্ছে। আশা করি তার জন্মদিন ৩০ তারিখে এর আনুষঙ্গিক বাড়তি আবিষ্কারগুলিও বইয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে, এমন কি ভূমিকা পর্যন্ত। এর মানে কাজের একেবারে সমাপ্তি নয় ; তবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো রচনা নয়—এই পর্যন্ত। আশা করছি, শেষ হলে মাসখানেক কি মাস দুই বিশ্রাম ও ভ্রমণ করব। এখন আমরা সপ্তাহে তিন কি চারদিন কাজ করি, সকাল আটটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, মধ্যে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুই আহারের জন্য বাদ। ছুটির দিনে প্রায়ই এর থেকে বেশী করি। বুঝতেই পারছ, এর ফলে আমরা দুজনেই কি রকম শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কারণ প্রায় প্রতিদিন একাদিক্রমে এমনই চলেছে ১৯০৪ অক্টোবরের সূচনা থেকে।...

গত রবিবার আমরা একটি মাল বওয়ার নৌকা নিয়েছিলাম, তাতে করে নদীতে বহু ঘণ্টা কাটিয়েছি। এ ধরনের নৌকায় লেখা-পড়া এবং শোয়া-বসা করা যায়, অনেকটা ছোট ড্রইংরুমের মত। আমরা বালি পর্যন্ত গিয়েছিলাম, যাওয়ার পথে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চা মঠে খেয়েছিলাম, তারপরে ফেরার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে নেমেছিলাম। এর প্রতিটি স্থান, যার সঙ্গে স্মৃতি-সম্পর্ক আছে, সেগুলি এখন কত না সুমধুর ভাবনায় আমার মন ভরিয়ে তুলেছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।”

৬ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—“তুমি জানো আমার বিজ্ঞান-পূজা সত্ত্বেও আমি ক্যাথলিক মতকে ভালবাসি। যখন আমার খুবই অল্প বয়স, সবে বাল্য অতিক্রম করেছি, তখন ভাবতাম, এখনো তাই ভাবি—আমার একমাত্র বাসনা হবে সত্যেরই বাসনা। সেই সত্যের সন্ধানের সঙ্গে মধ্যযুগপ্রীতির সংঘাতেই আমার জীবনযন্ত্রণার সূত্রপাত। স্বামীজী সে যন্ত্রণা মোচন করে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন নতুন জগৎকে।

সকল পুরাতন পৃথিবী এই নতুন জগতের অন্তর্গত। কি বিচিত্র! জানো কি, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য, যখন তাঁকে একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম, শুনেছিলাম যে, সর্বপ্রকার জ্ঞান তারই অন্তর্লীন, তখন নিজের মনে বলেছিলাম, "বেশ কথা, তবে এই তত্ত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দিতে হবে; তত্ত্বটিকে এখনকার মত কাজ চালাবার জন্য মেনে নিলাম!" আর এখন পাঁচ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহায়ে ঐ তত্ত্বের পরীক্ষা করে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছি! কারণ, একথা অবশ্যই সত্য, অন্যের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মী যে সাফল্যলাভ করে, তার মূলে ভারতীয়ের 'ভিশনের' প্রকৃতি। নতুন বইটির উপসংহারের কথাগুলি গতকাল আমরা লিখেছি। এসব কথা অপরকে জানিও না, কিন্তু আমাদের আনন্দ কল্পনা করতে পারো তুমি। অন্য জিনিসও করবার আছে। সে সব সেরে সদানন্দকে নিয়ে দার্জিলিঙ যাবার ইচ্ছা আছে বিশ্রামের জন্য। কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরে প্রুফগুলি শেষ করার আশা রাখি। তারপরে ভরসা করি মাসখানেক ভ্রমণ।

আগামী মে মাসে একটি নতুন বিজ্ঞানের বই আরম্ভ করার ইচ্ছা। তার আগে শুরু করতে গররাজি হয়েছি।

১২ জানুয়ারী ১৯০৬, ওলি বুলকে—"আমি যেন আমার ভবিষ্যৎ-জীবন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। যে-ইঙ্গিত চাই, যে-জিনিসটি সন্ধান করছি, বারাণসীর এক গণকের কাছ থেকে তা পেয়ে গেছি। এখন আমার একটিমাত্র উৎকণ্ঠা এই লেখার (স্বামীজীর জীবনী লেখা) দ্বারা স্বামীজীর কাজকে নিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপন করা, তারপর অবশিষ্ট বৎসরগুলিতে অপর কর্তব্যে নিজেকে নিয়োগ করা। ভাবতে বড় ভাল লাগে, ব্যাপারটা তুমি অবিলম্বে বুঝেছ, গভীরভাবে নিয়েছ, এবং পরম বিশ্বাসে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ। তোমার নিশ্চয় স্মরণ আছে, স্বামীজী আমাকে পরিস্থিতিকে একটু এগিয়ে দেখার জন্য স্বাধীনতা দিয়েছিলেন,...ব্রিটানীর সেই সুমধুর সন্ধ্যায়, বলেছিলেন,—'ও জিনিসও মায়েরই।' যদি আমি মারা যাই, আমার অত্যন্ত ইচ্ছা তুমি খোকাকে ব্রিটানীতে নিয়ে যাবে, যে-বাগানে স্বামীজী আমাকে তাঁর শেষ শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, যেখানে প্রফেটের উত্তরাধিকার আমার উপর অর্পিত হয়েছিল—সেই স্থানটি দেখাবে।

[এই চিঠিতে এবং আগেও দেখা যায়, নিবেদিতা স্থির করেছেন স্বামীজীর জীবনী লিখবেন। তার জন্য য়ুরোপে যেতে ইচ্ছুক। তার ফলে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে নিবেদিতার মনোভাব—"আমি কিছু বেছে নিতে পারি এমন অবস্থায় আছি মনে করি না। আমার নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" ডঃ বসু যাতে কিছু মনে না করেন সেজন্য ওলি বুলকে লিখেছেন—"খোকাকে বলো, তুমি আমাকে চাও। এতে বিচ্ছেদ সহজতর হবে।]

৪ এপ্রিল, (খণ্ডিত চিঠি)—"ইলেক্‌ট্রো-ফিজিওলজি' হবে মননগতভাবে 'সর্বোচ্চ উড্ডয়ন'..."

২ মে, ম্যাকলাউডকে—"বসুরা মনে হয় না মিঃ গেডিসকে চিন্তাবিৎরূপে

জানেন।...ডঃ বসুর এক ভাগিনেয়র প্রতি মিসেস গেডিস একেবারে মাতৃসুলভ আতিথ্য জানিয়েছেন।...ডঃ বসু মিঃ গেডিসকে তাঁর এক কপি বই পাঠাচ্ছেন।"*

৭ জুন, ম্যাকলাউডকে—"এই গ্রীষ্মে খোকার শরীর বিশেষ দৃঢ় নয়। সেই বিরাট গ্রন্থটি তৈরী করা তামাশার কাজ ছিল না। কিন্তু এই বছরটি যদি কোনো-ভাবে নিরাপদে কাটে, আমার আশা বিশ্বাস, জগন্মাতা তাহলে তাকে বসন্তকালে দু' বছরের অবকাশ যাপনের সুযোগ দেবেন। অতীব অতীব প্রয়োজন তার। বেচারা খোকা। আমার মনে হয়, ঐ হল তার বাইরে যাবার সেরা সময়, কারণ আমি যখন ওখানে নেই সে অত প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই কিছু পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে। এই বিরাট সাফল্যের আনন্দ তার সান্ত্বনারূপে তো রইল!

৮ জুন, (খণ্ডিত পত্র)—"তোমার সঙ্গে অনেক কথাই আছে। কখনো কখনো আমি ভাবাভিভূত হয়ে পড়ি যখন ভাবি খোকার জীবনীর কয়েক অধ্যায় অন্ততঃ তোমার সঙ্গে বসে কিভাবে আমার প্রস্তুত করে ফেলা উচিত।"

১৬ জুলাই, ওলি বুলকে—[মিসেস বুলকে লেখা এই পত্রটি বড়ই দুঃখের বিষয় খণ্ডিত। যতটুকু পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, এটি যেন নিবেদিতার জীবনের স্ব-পরিকল্পিত মানচিত্র। ভবিষ্যৎ-জীবনের নানা পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনাও দিয়েছেন। প্রধান গ্রন্থ হবে স্বামীজীর জীবনী। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে, নিবেদিতা লিখেছেন, "তুমি জানো আমি খোকার জীবনীর জন্য কাগজ-পত্র প্রস্তুত রাখতে চাই।" এই চিঠিতেই নিবেদিতা টাকার একটা অংশ বিজ্ঞানের জন্য রেখে যাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন—

"তোমার প্রতিশ্রুত অর্থের বাকি তিন হাজার পাউণ্ড—খোকার হাতে থাকবে; সে টাকা সে দেবেন (দেবেন্দ্রমোহন বসু) বা খোকা (অরবিন্দমোহন বসু) বা দুজনের জন্যই খরচ করবে। অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানের সেবায় তাদের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য নিযুক্ত হবে কি না, তা বিবেচনা করে।"

এই পত্রেই নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য অর্থ রেখে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং লেখেন যে, যদি জনগণ তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারে কোনো

---

* অধ্যাপক গেডিস তাঁর বসু-জীবনীর ভূমিকায় কেন এই জীবনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন তা জানিয়েছেন। বায়োলজিতে অধ্যাপকের আদি আকর্ষণ, সেই সঙ্গে ফিজিওলজিতেও, সুতরাং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বসুর আবিষ্কার তাঁকে আকৃষ্ট করে। ক্রমে সে পরিচয়ের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসে। পরে অধ্যাপক যখন ভারতে চাকরি নিয়ে আসেন, তখন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। অধ্যাপক গেডিস বিজ্ঞানের নানা শাখায় পারদর্শী হলেও সমাজ-বিজ্ঞানের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসকে সামাজিক পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এবিষয়ে অধ্যাপক লিখেছেন—

"All the sciences and all their scientific men are social products, and must be studied as such in the sociological way. This book, though originally planned in its simplest and most direct aspect and purpose—as an exposition of a life-work—is thus something of a sociological study also."

অর্থদান করে তাহলে সে টাকা যাতে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়, সে বিষয়ে ডঃ বসু মনে রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।]

৮, অগস্ট ওলি বুলকে—"আজ বো-র (বউ-এর অর্থাৎ অবলা বসুর) জন্মদিন। আমি তোমার জন্য একটু উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু খোকা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, তুমি বাড়ি ফেরার পরে তোমার পাঠানো বার্তা সে পেয়েছে।"

অগস্ট ২৯, ম্যাকলাউডকে—"যে-পর্যন্ত আমরা 'প্ল্যাণ্ট রেসপন্স' লিখেছি, সে অবধি তার বাইরে কোনো কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার কাজের অংশ দম বন্ধ করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের বর্তমান বইটি সম্বন্ধে একই পরিমাণ কাজ করি, কিন্তু মনের দিক দিয়ে **অনুভব করি** যে, আমি মুক্ত! মনের আধখানা অংশ আমি দিনান্তরে, কোনো দায়ভার বোধ না করে, নিজের চিন্তায় দিতে পারি, এটা কি বিচিত্র প্রাপ্তি নয়।"

৫ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"রবিবার আমরা খোকার...জন্মদিন পালন করছি। কী মনোরম। প্রাচ্য বীররূপে একমাত্র যে সম্মান তার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা হল—একটি সুসজ্জিত চেয়ারের প্রস্তাব—যা সে অস্বীকার করল।...আর বউ—তার জন্য যে সামান্য উপহারের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম, তাতে সে এতই বিস্মিত ও বিব্রত হল যে, টেবিলের অপরপ্রান্তে নিছক লজ্জায় সরে গেল।

যখনই আমরা সবাই মাসখানেকের মত সময় একত্র থাকি, তখন এই ধরনের দু'চারটি সহজ ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করি। ওগুলি কতখানি সুখ এনে দেয় যদি দেখতে।...

তোমাকে কি বলেছি, বিজ্ঞানের মানুষটি আমাকে রবিবার **মহাভারতের সমগ্র ইংরাজী অনুবাদ** দিয়েছে! দশ ভল্যুমে বাঁধিয়ে নেওয়া হচ্ছে। **তারপরে** এর মধ্যে প্রবেশ করে ক্রমে সংশোধন করা যাবে। বিজ্ঞানের মানুষটি মনে করছে যে, দু-বছরের মধ্যে শেষ করা উচিত, কিন্তু যদি চার বছরের মধ্যে হয়ে ওঠে সুখী হব, কারণ এই কাজকে জীবনের **পরম কাজ** করতে চাই না এবং মানুষ যে-সব উপকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে তার সীমা আছে। বিজ্ঞানের মানুষটি নিজের আগ্নেয় উদ্দীপনা দিয়ে বিচার করে, যদিও তার নিজের কাজ **একটিই** এবং তাতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন আমরা এমন ভাল একটা রাঁধুনী পেয়েছি যে 'বউ' আমাদের ঈর্ষা করছে।"

১২ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"গত রবিবার খোকার সুন্দর প্রাপ্তি ঘটেছে। পৈতৃক গ্রাম দর্শন ও সেখানে অভিনন্দন। নিকট দূর সর্বস্থান থেকে লোক জড়ো হয়েছিল, আশীর্বাদ, অভ্যর্থনা ও নমস্কার জানাতে। স্কুলের ছেলেরা তার পালকী বা মোট বেয়ারাদের বইতে দেয়নি। সমস্ত জায়গাটা তার জন্য উৎসবে মেতে উঠেছিল—কুড়ি বছর আগে যে-বালকটি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি এক আত্মীয়ের কাছে বেচে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সামনে—সৎসাহসের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উগ্র বাসনায়। ঐ উৎসব অবশ্য আসলে জ্ঞানীর প্রতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অর্ঘ্য। জয় হোক তার! অপূর্ব মনে হচ্ছে নাকি?"

[ব্রহ্মচারিণী কল্পলতা প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার মার্চ, ১৯৫৯ সংখ্যায় জগদীশ বসু ও নিবেদিতার উপরে এক প্রবন্ধে ১৯০৬ সালে মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার পত্রের অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' গ্রন্থের উপর সম্ভাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে তথ্য আছে।—

"(অধ্যাপক) ভাইনস্ দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন, তাতে বইটিকে কী কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে তা বলা আছে। বেচারা খোকা—চিঠিটি তাকে ক্রমান্বয়ে মুহ্যমান ও ক্রুদ্ধ করেছে। আজ সকালে আমরা তার উত্তর লিখছি। ভরসা করি তারপর, ওটা আর খোঁচা দেবে না।

অপরের নামোচ্চারণ সে খুব কম করেছে বা উদ্ধৃতি কম দিয়েছে বলে একটা প্রচন্ড চেঁচামেচি হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি জানো, সে একাজ ভেবেচিন্তেই করেছে কারণ নামোল্লেখ না করাই ভাল। উল্লেখ করলে সেটা তাদের কাছে শাস্তিস্বরূপ হবে কারণ নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রান্তি দেখাবার জন্যই তা করতে হবে। সোজা এই দাঁড়ায়, আমি খোকাকে বলেছি—তাকে অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। যে-প্রবীণদের সে অতিক্রম করেছে তারা শুধুই ঘৃণা করে যাবে, কিন্তু নতুনেরা তার কথা শুনবে—অনুসরণ করবে তাকে। নেতা যাঁরা, প্রত্যাদিষ্ট যাঁরা—নিঃসঙ্গ তাঁদের হতেই হয়। তাই যদি সমস্বরে জয়গান না হয়, খোকা আশা করে, তুমি তীব্র নৈরাশ্য বোধ করবে না।"]

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭, ওলি বুলকে—"'নেচার' পত্রিকার বহু-আশঙ্কিত সমালোচনা এসে পেঁৗছেছে,—পাঁচ কলমব্যাপী! সমালোচক কাগজটির মতই 'ভাইটালিস্ট'। সুতরাং সে 'প্ল্যান্ট রেসপনস্‌কে' 'বেদ' বলে ছাড়পত্র দেবেই না। কিন্তু ইঙ্গিত করেছে। যে-জিনিসটি স্পষ্টই তাকে অভিভূত করেছে, তার বিষয়ে সে বলেছে—'বইটির চরম স্বাতন্ত্র্য লেখকের বিজ্ঞানগত অতীতের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে, যিনি পদার্থবিজ্ঞান থেকে এসেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুতঃ আলোচক যদিও বইটিকে তৃপ্তচিত্তে নিতে নিতান্ত গররাজি, তবু আমার মতে এটি একটি প্রচন্ড আলোচনা। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বোস্টন ট্রানস্‌ক্রিপ্ট-এ যা অল্প কিছু বেরিয়েছে, সারা ভারতে তা পুনরুল্লিখিত হয়েছে।...

খোকার স্বাধীনতা সংগ্রহের পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা কর।"

২৭ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে—"ভারতীয় সংস্কার হল—১২ বছরে কোনো চিন্তা পূর্ণ বিকশিত হয়। তাই ডঃ বসু তাঁর বর্তমান বইটি (Comparative Electro-Physiology) মে মাসের আগে শেষ করতে চান—তাঁর প্রথম রচনা-প্রকাশের পরে ১২ বছরের মাথায়।...

গ্রীষ্ম এখন দুয়ারে। কাজকর্মকে তা এত বেঁধে দেয়! ইতিমধ্যে বসুরা মে ও জুনের জন্য কাশ্মীরের কথা বলে রেখেছে। যদি যাওয়া হয়, মিসেস সেভিয়ার যোগদান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি এবং বউ ডান্ডি নেবেন, এবং আমরা তিনজন হাঁটব। ভয় হয়, এটা বসুদের পক্ষে বিরাট খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা প্রায় সকল ছুটির বেড়ানোর খরচ বহন করে। এধারে দার্জিলিঙয়ে যে বসন্ত দেখা দিয়েছে!"

[নিবেদিতার মারাঠি জীবনীকার সুপণ্ডিত ডঃ ভি ভি পেণ্ডসে 'নিবেদিতা স্মারক গ্রন্থের' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত) জন্য গোখলেকে লেখা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের অনেকগুলি চিঠির নকল পাঠিয়েছিলেন। ডঃ বসুকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিবেদিতা নানা মহলে কি রকম তোলপাড় করতেন, তার সামান্য একটা আভাস ঐসব চিঠি থেকে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে—বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে লেখা নিবেদিতার অতি সামান্য চিঠিই আমরা পেয়েছি।

২৭ মার্চ তারিখে ক্রিস্টিন গোখলেকে লেখেন—

"পত্র সংলগ্ন ডঃ বসুর কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবেদিতা আপনার কাছে পাঠাতে বলেছেন, যার ব্যবহার ইচ্ছামত আপনি করতে পারেন বা নাও পারেন। তার ধারণা, আপনি হয়ত এটিকে প্রয়োজনীয় বোধ করবেন। ডঃ বসু গতকাল এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি এই ধরনের একটা কিছু চাইছেন। কিন্তু সেটা লেখার সময় যখন এল তখন তিনি "বেয়াড়াপনা" করলেন, এবং সবকিছু বাতিল করে দিলেন। এ জিনিসটি তিনি চলে যাওয়ার পরেই লেখা হয়েছে, এর কথা তিনি জানেন না, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকেই এটি পাঠানো হয়েছে। অয়ারলেস্ টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে তাঁর কাজের কোনো উল্লেখের ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সংকোচ বোধ করেন, এবং সম্ভবতঃ তার উল্লেখ করা তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করবেন না। করণীয় কি তা আপনিই ভাল বুঝবেন।"

গোখলেকে এইসব কথা বলার বা বিবরণ লিখে পাঠানোর কারণ যে, কাউন্সিল-সদস্য গোখলের মারফত সরকারী মহলে নাড়া দেওয়া, তা সহজেই বোঝা যায়।

ক্রিস্টিন-প্রেরিত গোখলেকে লেখা নিবেদিতার পত্রটি—]

"প্রিয় মিঃ গোখলে, একটা খসড়া করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। এর থেকে আপনি যা উত্তম বিবেচনা করবেন, তাই নেবেন।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত কিছু পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অধিকার তার জন্মেছে। ভারত যে যোগ্যভাবে তা করতে সমর্থ তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। এখন একমাত্র প্রশ্ন, এর জন্য অধিকতর সুযোগ সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার কি পন্থা গ্রহণ করবে? এখানে জানানো যায়, সমুচ্চ বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা, অর্থাৎ কোনো বিশেষ ধারায় কাজ করার জন্য বিজ্ঞানকর্মীর ব্যক্তিগত অনুরাগ এবং তাকে ধরে থাকবার জন্য তীব্র মননগত ব্যাকুলতা—এ জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করা যায় না, বা কেবল সংগঠনের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে তা উৎপাদন করা যাবে, এমন আশাও করা যায় না। হায়, ঐসব উচ্চ গুণাবলী নশ্বর মানবের ইচ্ছামত ওঠ-বোস করে না। একমাত্র যা করা যায়, ব্যক্তিবিশেষ বা সরকার যা করতে পারে, তা হল যেখানে স্বতঃই তা স্ফুরিত হয়েছে সেখানে সুযোগ নিয়ে সে তার লালনের ব্যবস্থা করতে পারে।

আমার স্বদেশীয় ডঃ জে সি বসু যে-কাজ ইতিমধ্যেই করেছেন, তা জগতের সামনে উপস্থিত আছে। তথাপি এই ত গবেষণার সবে সূত্রপাত—যাকে প্রাণপাত পরিশ্রম করেই মাত্র তিনি সমাপ্ত করতে পারেন। সরকার অতীতে এই ক্ষেত্রে তাঁর দানের সমাদর করেছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষে এই সমাদরকে পূর্ণভাবে কার্যকর

করাই কি সর্বোত্তম নীতি হবে না—সরকারের গৌরব ঘোষণার পক্ষে উপযুক্ততর জিনিস আর কি থাকতে পারে? তাঁর হাতে উচ্চতর গবেষণার কোনো বিরাট কেন্দ্রের সংগঠন দায়িত্ব অর্পণ করার উপযুক্ত সময় কি এখনই নয়, যার জন্য ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক সমাজ ইতিমধ্যেই প্রস্তাব করেছেন? আর, তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেসব আবিষ্কার তিনি ইতিমধ্যেই করেছেন এবং ভবিষ্যতে করতে পারেন—সেই পথে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যাতে তিনি নিজের সমস্ত সময় নিয়োগ করতে পারেন, সেই বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করে তাঁর প্রতিভা ও উৎসাহের যথাসম্ভব সদ্-ব্যবহার করাই কি সরকারের ন্যূনতম কর্তব্য হবে না?

এখানে জানানো যায়, এদেশে বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধার জন্য যে দাবি উঠেছে, টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন তার মোটেই উপযুক্ত উত্তর হবে না; কারণ হাত-ফিরি হওয়া জ্ঞান দু'দিনেই অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং তা কদাপি প্রাণসঞ্চারক নয়। যতক্ষণ না জনগণ নিজেদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা সঞ্চারিত করতে পারছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মৌলিক চিন্তার অভ্যাস ও মানুষের মৌল জ্ঞানরাশিকে অগ্রসর করিয়ে দেবার সামর্থ্য অর্জন করছে, ততক্ষণ অপর দেশের মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির প্রয়োগের চেষ্টা উত্তরোত্তর অযোগ্য মনে হবে।"

২৮ মার্চ, গোখলেকে—"আগামীকাল গুডফ্রাইডে, আমরা সবাই একত্র হব আশা করছি। এমনকি মিসেস বসু পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগদান করছেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য ফাঁক কেটে আপনি কি আসতে পারেন না? আপনাকে কত না পেতে চাই।......ডঃ বসু বিশেষভাবে এটা চান, এবং আজ রাত্রে দেখা পেতে ইচ্ছুক। এবিষয়ে তাগিদ দিচ্ছেন।......

আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরে আসছেন না কেন? আপনার প্রতিশ্রুতি পেলে এবিষয়ে আমরা মনস্থির করতে পারি। বিরাট অরণ্যের মধ্যে পাইন, দেওদারের নীচে—সেখানে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকব, কিংবা সন্ধ্যার ছায়া যখন নদীর উপরে ঘনতর হয়ে উঠবে—তখন সেখানে বসে আমরা সুমহান বিষয়ে কথা বলে যাব। এমন সুযোগ যাঁরা পান, তাঁরা পরবর্তী জীবনের জন্য পেয়ে যান আলোক ও শক্তির ঐশ্বর্য।"

৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—আমরা যদি কাশ্মীর যাই, মিসেস সেভিয়ার বেরিলিতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। সে যাই হোক, এতদিনের মধ্যে এই প্রথম বিজ্ঞানের মানুষটির ও আমার কাছে ছুটি সত্যই ছুটি হওয়ার সম্ভাবনা।" (দার্জিলিঙয়ে তাঁরা ছুটির সময়ে বিজ্ঞান কাজ করতেই যেতেন।)

৮ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"আবার যখন আমরা বোসপাড়া লেনে গেঁড়ে বসেছি তখন আশা করি হলিস্টার আমাদের এখানে এসে পেঁাছবে, জুলাই মাসে। ভারতীয় জীবনের সমস্ত মজা দেখাবার ব্যবস্থা অবশ্যই আমরা করব। বসুরা, রায়েরা এবং অন্যান্যরা তার সঙ্গে সুসজ্জিতা সুন্দরী রমণীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে এবং আমরা তাকে মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে দেব।......

আমরা হয়ত কাশ্মীরে যেতেই পারব না কারণ বসুপরিবারের একটি মেয়ে ক্ষয়রোগে দ্রুত মৃত্যুর পথে। আহা রে!"

১১ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"কাশ্মীর যাত্রার পরিকল্পনা, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, মনে হয় পরিত্যক্ত হয়েছে। তার পরিবর্তে আমরা সম্ভবতঃ অমরনাথ-জাতীয় তীর্থযাত্রায় যাব। চমৎকার হবে না? কিন্তু হায়, তা ঘটবার আগে বসুরা হয়ত মস্ত শোক পাবেন, কারণ তাঁদের প্রিয় এক ভাইঝি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে।"

[১২ এপ্রিল তারিখে গোখলেকে লেখা এক চিঠিতে ক্রিস্টিন জানিয়েছেন, 'নিবেদিতার সর্বশেষ মতলব বদরীনারায়ণে তীর্থ করতে যাওয়া।' ক্রিস্টিন সঙ্গী হবার জন্য গোখলেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বদরীনারায়ণ পরিকল্পনা বদলে মায়াবতী হয়েছিল।]

২৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"মায়াবতীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব খানিকটা হাঁটা-চলা করার আশা রাখি। এবং প্লেগ যেহেতু খোকার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেহেতু আমাদের যাত্রাকে পূর্বপরিকল্পনার চেয়ে আগে অবশ্যই ঘটাতে হবে।

তাহলেও তার (বসুর বইয়ের) শেষ অধ্যায়গুলি এবং আমার শেষ গল্প দুটি সমাপ্ত করবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার (বসুর প্রথম পেপার) প্রকাশনের পরে পয়লা মে তারিখে ঠিক ১২ বছরে পুরোবে এবং এবিষয়ে তার কুসংস্কার রয়েছে। ভারতে ধরা হয় যে, ১২ বছরে কোনো চিন্তা পূর্ণতা পায়। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, সকল সাধু বলেন তাঁদের সিদ্ধি পেয়েছেন ১২ বছরে।"

২৪ এপ্রিল, ওলি বুলকে—"খোকার বাড়ির এক ভৃত্যের প্লেগ হয়েছে। সুতরাং তারা সবাই ছড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের নিজ নিজ কাজটুকু শেষ করা পর্যন্তই মাত্র অপেক্ষা করব, তারপরেই পাহাড়ে যাত্রা করব। মায়াবতী যাবার পথে এবং মায়াবতীতে থাকা কালে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পায়ে হাঁটার ও তাঁবু-জীবনের আশা রাখি। একমাত্র অসুবিধা, ঐ অঞ্চলে একটি নরখাদক বাঘ ঘুরছে।

ভাবো একবার, আমি কৃষ্ণবিষয়ে লেখা শেষ করেছি। দশটি কাহিনী! কিভাবে না উপভোগ করেছি! খোকা অবশ্য বলেছে, অপরেও উপভোগ করবে।......

নিতান্ত বাসনা ছিল, 'যার সমস্ত জীবন মহাভারতের প্রতি ভালবাসায় মুখর,*

---

* জগদীশচন্দ্রের অপরিসীম মহাভারত-প্রীতির কথা নানাসূত্রে পাই। রামায়ণও তিনি ভালবাসতেন কিন্তু দোষেগুণে মিশ্রিত পৌরুষ-ভীষণ মহাভারতীয় চরিত্রগুলিই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। অধ্যাপক গেডিস অনেকখানি অংশ নিয়ে এঁর মহাভারত-প্রীতি এবং পরবর্তীজীবনে তার প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সকল মহাভারতীয় চরিত্রের মধ্যে কর্ণ চরিত্র আবার তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। জগদীশচন্দ্র কিভাবে আত্মহারা হয়ে কর্ণ-জীবনের ঘটনাগুলি বলে যেতেন, গেডিস তা বর্ণনা করেছেন। দৈবাহত কর্ণের নিষ্ফল সংগ্রামের মহিমার কিছু রূপ তিনি নিজের পিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বলতেন—"কর্ণের জীবনই আমাকে সাধারণ পার্থিব সাফল্যকে ক্রমেই তুচ্ছ করতে শিখিয়েছে। তথাকথিত বিজয় কী সামান্য! আমি সংঘাত ও পরাজয়ের উচ্চতর অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছি; বুঝেছি যে, পরাজয়ের মধ্যেই আসল সাফল্য নিহিত। এই উপায়ে আমি আমার জাতির একটি সর্বোচ্চ ভাবাদর্শ উপলব্ধি করতে পেরেছি—আমার প্রতিটি তন্ত্রী ঝঙ্কৃত

বইটি তাকেই উৎসর্গ করব। কিন্তু সে বলল, পরিবর্তে একটি শূন্য পৃষ্ঠাই সে চায়।

এখন আমরা নির্ধারিত দ্বাদশ বৎসরের শেষ সপ্তাহে। অতীব তাৎপর্য-পূর্ণ চারটি অধ্যায়ের উপর কাজ করছি। 'সজীব পদার্থের সাড়া'র উপরে সমস্ত কাজের পদার্থগত ফলের উপসংহার করা হয়েছে দুটি অধ্যায়ে—গভীরতম অপরূপ রীতিতে। নিজের দানের বিষয়ে তার খোলাখুলি বক্তব্য, তা'Molecular Theory'. সমস্ত জিনিসটি আমাদের সম্ভ্রমে স্তম্ভিত করেছে—কোনো ঐশ্বরিক শক্তি যেন এক বিরাট পদার্থ-বিজ্ঞানীতে অবতীর্ণ হয়ে বিজয়োল্লাসে পরিতৃপ্ত! এবং এর পরেই অবিলম্বে সে 'psychological inferences'এর দুটি অধ্যায় যুক্ত করেছে। দারুণ—অপূর্ব! এবার বলো তাহলে, ঐ দ্বাদশ বৎসর যোগ্যভাবে পরিসমাপ্ত! সবিস্ময়ে ভাবি, এর পরে কি আছে! নতুন আবিষ্কার কি! হয়ত বাস্তব প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত জয়। কে বলতে পারে!

নতুন বইটি শেষ বইটির মত বোধহয় ৭০০ পৃষ্ঠার হবে। অধ্যায়সংখ্যা মনে হয় ৪৫।

আমার ধারণা খোকা আজ সন্ধ্যায় ফিরবে, আর বউ আগামীকাল কিংবা শনিবার। মুমূর্ষু ভাইঝির স্বামী এসেছে। যদি মেয়েটির মৃত্যু হয়, তার স্বামী কাছে থাকাকালেই সে চলে যাবে, এই আমার বিশেষ বিশ্বাস।"

১৭ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"ডঃ বসুর বিদেশযাত্রা হঠাৎ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে—স্বাস্থ্যের কারণে। কিন্তু যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক আমি **১৫ অক্টোবরের** আগে ভারত ছাড়তে পারব না।......যাই হোক খুব সুন্দর হবে যদি মাদাম

হয়েছে অতীতের স্পন্দনে। ন্যায়সংগ্রাম করা, কুটিলতার আশ্রয় না নেওয়া, বাধা অগ্রাহ্য করে সোজা পথে চলা—এই হল সত্যকার জয়ের ভিত্তি এবং এই হল মহত্তম আধ্যাত্মিক শিক্ষা।"

জগদীশচন্দ্রের মহাভারত-প্রীতি ও কর্ণ-প্রীতি সম্বন্ধে আরও কিছু উক্তি 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে (পৃ—১৫৭-৫৮) সংকলিত আছে। সেখানে প্রদত্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কর্ণ-কুন্তী সংবাদ এ'র প্রেরণাতেই লিখেছিলেন। 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, ডঃ বসু তাঁর জীবনের পরম ভাষণে—বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণে—শিষ্যের কাছে গুরুর সুমহিম পরাজয়ের কথা বলতে গিয়ে অর্জুনের বাণে মৃত্যুবরণ করে ভীষ্মের আনন্দের কথা বলেছিলেন।

মহাভারত থেকে জীবনে এতকিছু পেয়েছেন বলে জাতীয় সংস্কৃতি থেকে এই ধারার বিলোপের ভাবনায় আশঙ্কিত হয়েছিলেন। গেডিস ডঃ বসুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"I feel how necessary it is to keep alive the great traditions of the heroic age of India through travelling *Jatra* players and the reciters of the epics. It is through them that the highest national culture has been kept alive among the people. They are fast disappearing, and we must either revive the institution or have its modern equivalent......... It should be! It must be! Then and then only shall we fully realise the true India."

এই পটভূমিকায় নিবেদিতার উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে।

ওয়েলারস্টিন ডঃ বসুর জন্য বোডেনেক্সে একটি আমন্ত্রণ জোগাড় করেন, এবং আমরা যদি সকলে একত্রে কিছু সময়ের জন্য অ্যারিসে যেতে পারি। কিন্তু এবছর তা হওয়া সম্ভব হবে না বোধ হয় কারণ ডঃ বসুর যাওয়া এবং ভিসবাডেনে 'বাথ' নেওয়া দরকার। সে ওখানে অক্টোবরের শুরুতে যেতে পারে।"

১৯ জুলাই, গোখলেকে—"আজ খবর পেয়েছি, চিকিৎসকদের চাপে ডঃ বসু দুবছরের ফার্লো পেয়েছেন। অবর্ণনীয় স্বস্তি এতে, কারণ এর ফলে তিনি পালাতে পারবেন। তাঁর মন মরে যেত যদি আরও বেশীদিন রাশীকৃত লোক-সঙ্গে তাঁকে কাটাতে হত। নির্বোধ লোকে প্রতিভাকে যে-রকম শক্ত-গুঁড়ির গাছ মনে করে, সেরকম নয় তা। তা অতি স্পর্শকাতর নমনীয় এক সৃষ্টি।

কিন্তু ডেপুটেশনের বদলে যে ফার্লো হল, এতে আমি একেবারে সন্তুষ্ট নই। যখন আমি এই দেশ—ভারতের—কথা ভাবি, তখন দেখি, কিভাবে বিদেশীরা এই দেশের উদারতাকে শোষণ করে মেদস্ফীত হচ্ছে, আর অন্যদিকে এর মাটির সন্তানেরা দেশসেবায় ব্রতী হয়ে নিতান্ত ক্লেশস্বীকার করছে—যা শাস্তিরই তুল্য! আমি ক্ষুব্ধ—ক্রুদ্ধ। এল এল আর-এর (লালা লাজপত রায়?) প্রশ্নটি কী যথার্থ—ইংরেজরা কি এদেশকে আকাশ থেকে পেড়ে এনেছে?"

২০ জুলাই, ওলি বুলকে—"আমার পক্ষে শীতকালের জন্য কোনো পরিকল্পনা করা নিরর্থক, কারণ খোকার সমস্ত স্কীম এখন তচনচ। বর্তমান পরিস্থিতি কি—তুমি বুঝতে পারবে না। চাপানো কাজ দ্বিগুণ, ডিরেক্টর দুর্লভ, ফলে তার হতবুদ্ধিকর অবস্থা। সরকার নিতান্ত ভারত-বিরোধী। ওগো প্রিয় সারা, অবস্থা যৎপরোনাস্তি মন্দ।

আজ একজন ইংরেজ ডাক্তার তাকে দেখতে গেছেন, কারণ তার বাতের মত হয়েছে যাতে এক ধরনের জার্মান 'বাথ' দরকার। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সুপারিশ হয়ত ছুটি পাওয়ার কারণ হতে পারে। বলা শক্ত। একবার কলেজের বাইরে যেতে পারলে তার কদাপি—কদাপি ফেরা উচিত নয়। এটা খুবই স্পষ্ট। মা যেন পথ দেখান।"

২১ জুলাই, ওলি বুলকে (পত্র খণ্ডিত)—"আমাদের ছোট্ট খোকাটির জন্য প্রার্থনা করো, মা যাতে সর্বদা তার সঙ্গে থাকেন, সবকিছু যাতে তার অভিপ্রায়ের অনুকূল হয় এবং শেষপর্যন্ত ভারত যেন তার বিজ্ঞানের অভিযানে বিজয়ী হয়—সামরিক অভিযানে কদাপি নয়।"

২৫ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"২ বছরের ফার্লো মঞ্জুর হয়েছে! হতে হবেই। মা যে কলকাটি নাড়ছেন, ফলে সে ডেপুটেশন পেয়েছে, যার অর্থ বিজ্ঞানের সংস্থান, কিন্তু মধ্যবর্তীকালে তার অর্থ স্বাধীনতা! আর পৃথিবীতে স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় জিনিস। সম্ভবতঃ ৩০ অগস্ট তারা (বসুরা) বোম্বাই ছাড়ছে, নামবে মার্সাই বা ব্রিন্দিসিতে, বোডেনেক্সে একটি আমন্ত্রণ এবং......অ্যারিস সত্যই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এসকলই সেণ্ট সারার তার-বার্তা অনুযায়ী—ইতালী বা লণ্ডন, তিনি যেখানে অবতরণ করতে বলেন—তদনুযায়ী ঠিক হবে।"

৩১ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"বসুরা 'পি এণ্ড ও' জাহাজে বোম্বাই ছাড়ছে ৩১ অগস্ট, এবং প্যারিস হয়ে ভিসবাডেন যাচ্ছে তার বাত সারাবার জন্য। মনে হয়—প্যারিসে যে কয়েক ঘণ্টা কাটাবে, তখন তোমার সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা তাদের নেই—কি বলো? সময় দাঁড়াবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। সেণ্ট সারাকেও তার করেছি, যাতে অগস্টের শেষে যাত্রা করতে পারে। তাহলেই সারার পরিকল্পনা সর্বাধিক কার্যকরী হবে।"

[ক্রিস্টিন গোখলেকে ৩১ জুলাই লেখেন—

"কয়েক দিনের জন্য আমরা দমদমে ('ফেয়ারী হলে') আছি। দুই লেখক (জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা) তাঁদের বই শেষ করছেন।......বসুরা সম্ভবতঃ ৩১ অগস্ট বোম্বাই থেকে যাত্রা করবেন। নিবেদিতা নিজের যাত্রার বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নয়, কিন্তু ১৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ যেতে পারবে মনে করে।......

নিবেদিতা এখনি আমার কাছে হাজির, যাত্রার বিষয়ে আলোচনা করতে। ফলকথা, সে পূর্বনির্ধারিত ১৫ কি ১৭ অগস্ট বোম্বাই থেকে যে-জাহাজ ছাড়বে তাতেই যাবে। আপনাকে সে দু'একদিনের মধ্যে লিখবে মনে হয়।"

ক্রিস্টিনের এই চিঠি থেকে এবং নিবেদিতার অন্যান্য চিঠি থেকেও দেখা যায়, নিবেদিতা নিজের যাত্রার দিন সহসা এগিয়ে নেন। মনে হয় এর মূলে ছিল রাজনৈতিক কোনো কারণ।]

১ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে—"খোকা ৩১ অগস্ট প্যারিস হয়ে ভিসবাডেনের জন্য যাত্রা করছে। হয়ত তুমি এবং আমি অ্যারিসে কয়েকদিন কাটিয়েও তাদের প্যারিসে ধরতে পারব, এবং তাদের বিদায় জানাতে পারব। যদি তাই হয়—তাদের কদাপি বলো না—চমক দিতে হবে। ১২, ১৩ বা ১৪ অক্টোবরের মধ্যে তাদের পৌঁছানো উচিত।"

১ অগস্ট, গোখলেকে—"ইতিমধ্যেই আপনি জেনেছেন, ডঃ বসুর ডেপুটেশন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মহাভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত তিনি ফার্লো-টুকু পেয়েছেন। শিক্ষাবিভাগে যে অসহ্য দল তৈরী হয়েছে এবং যেভাবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার মুখে, তাতে যদি তাঁকে নির্ধারিত সময়ের কাজ করে যেতে হত—সপ্তাহের কুড়ি ঘণ্টার কাজ এবং অশেষ রকম সরকারী চিঠিপত্রের হয়রানি—তাহলে পরিণতি কি দাঁড়াত বলতে পারি না। যা হোক এখন যা দাঁড়িয়েছে—তিনি 'কমপ্যারেটিভ ইলেক্‌ট্রো-ফিজিয়লজি' বইয়ের শেষ বাক্যগুলি লিখছেন এবং অন্যদিকে উন্নতির লক্ষণও দেখা গেছে।

ভূপেনবাবুর (ভূপেন্দ্রনাথ বসু) কাছ থেকে অবশ্য শুনলাম, স্বয়ং Mr. Earle মতপ্রকাশ করেছেন—ডঃ বসু ফেরার পরে তাঁর চাকরির যে-কয় বছর বাকি থাকবে, সেই সময়ে তিনি পেনসনসহ অগ্রিম অবসর নিতে পারবেন; তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগারে কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার বাড়তি আয়ও থাকবে—তাঁকে মুক্তি দেবার এই একটা পথ! তাঁরা নিতান্ত শীতল মস্তিষ্কে এর একটা হিসাব পর্যন্ত কষে ফেলেছেন—মাসে ৭০০৲ টাকা

কি ৮০০৲ টাকা। অর্থাৎ গবেষণার সর্বোচ্চ সম্মান—আয় হ্রাসের শাস্তি! শিক্ষা-বিভাগের দিকে তাকিয়ে দেখুন—তা পাঁচশো থেকে হাজার পাউন্ড এবং বারশো পাউন্ড পর্যন্ত মাহিনার লোকদের দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে, যারা ইংলণ্ডে থাকলে বহু কষ্টে বছরে সত্তর থেকে একশো টাকার বেশী রোজগার করতে পারত না। আর এই লোকটি, যেহেতু ভারতীয়, সেই কারণেই তাঁকে তাদের সকলের তলায় স্থাপন করতে হবে! অ্যাকাউন্টস্ অফিসে সন্ধানের দ্বারা অধিকন্তু বার করা গেছে, ঐ যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যকরী হতে হলে তাকে অনন্ত লালফিতার ফাঁস খুলে বেরুতে হবে, যেখানে নিতান্ত সহজ ব্যাপার হত এই অর্ডারটি দেওয়া —"এই ব্যক্তি বিশেষ-কর্তব্যে অবশিষ্ট কার্যকাল পর্যন্ত নিযুক্ত হলেন এবং এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হবে।" অবিরত এরকম অর্ডার বেরুচ্ছে। এক্ষেত্রে ঐটেই একমাত্র উচিত কাজ হত। যদি এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, তাহলে আকাশপাতাল তোলপাড় করে আপনার মুসাবিদা করা তাঁর মূল আবেদনপত্রটি উদ্ধার করাই আমার কাজ হবে, যার দ্বারা যখন তিনি পাশ্চাত্ত্যে আছেন, তখনকার জন্য প্রয়োজনীয় সহকারীর ব্যবস্থা, ভ্রমণ-ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে। এপর্যন্ত আমি জানি না ভূপেনবাবু কি রকম সফল হয়েছেন। লর্ড অ্যাভেবরী লিখেছেন, তিনি এ ব্যাপারটা মর্লির দৃষ্টিতে আনবেন এবং ইংলণ্ডে লর্ড মিন্টোর জনৈক বন্ধু ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পত্রে তাঁকে লিখেছেন। কিন্তু ফ্রেজারের হাত ছাড়িয়ে ব্যাপারটা বার করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভূপেনবাবু নভেম্বর মাসে প্রীতি ও আস্থার পরিবেশের মধ্যে বিদায় নিচ্ছেন; তিনি বলেছেন, এ জিনিসটি তিনি ব্যক্তিগত পুরস্কাররূপে দাবি করবেন।"

মিসেস বুল ও জগদীশচন্দ্রের পত্র

[এই পত্রগুচ্ছে ১০টি চিঠি আছে, চারটি মিসেস বুলের, ৬টি জগদীশচন্দ্রের। পত্রগুলির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মূলেই সেগুলি প্রকাশ করলাম। মিসেস বুলের চিঠিগুলি নকল করা, যতদূর মনে হয়, নিজেই সেগুলি নকল করে রেখেছিলেন। ডঃ বসুর মূল চিঠিগুলিই পাওয়া গিয়েছে। ১০টি চিঠির ২টি ১৯০৪ সালের, ৮টি ১৯০৫ সালের। ১৯০৫-এর চিঠিগুলি অতি মূল্যবান। এগুলি থেকে বোঝা যায়, ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনে মিসেস বুল কী স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

৩০ মার্চ, ১৯০৪ তারিখে মিসেস বুলকে লেখা (কিংবা নিবেদিতাকে?) চিঠিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিষয়ে জনৈক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যাতে দেখা যায়, তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক মহলে কতখানি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

১৩ এপ্রিল, ১৯০৪ তারিখে মিসেস বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিতে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ওয়েলারের নষ্টামির কিছু পরিচয় আছে।

মিসেস বুলকে লেখা তারিখহীন একটি চিঠিতে, যেটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ১৯০৫ সালে লেখা মনে হয়, জগদীশচন্দ্র মিসেস বুলের কাছে বিনীত মার্জনা চেয়েছেন নিবেদিতার অসুখের সময়ে তাঁকে আসতে বলেননি বলে।

৩ জুন, ১৯০৫ সালে নিবেদিতাকে মিসেস বুল যে চিঠি লিখেছেন, তাতে দেখা যায়, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নিবেদিতার জীবিকার আর্থিক দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে চান। তিনি ব্যাঙ্ককে সেই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। নিবেদিতার অসুখের সময়ে যে-সব খরচ হয়েছিল, তার পরিমাণও জানতে চেয়েছেন। খরচের কথা বলতে নিবেদিতা যেন সংকোচবোধ না করেন, কারণ—'ও তো মা ও মেয়ের মধ্যে স্বাভাবিক জিনিস।' এই চিঠিতেই মিসেস বুল জানিয়েছেন, নিবেদিতা যেন তাঁর অভিপ্রায়সূচক এই চিঠি সংরক্ষণ করেন, যা ভবিষ্যতে দেখিয়ে দেবে, এইসব ব্যবস্থাদি হয়েছে তাঁরই অনুরোধে ও তাগিদে। গভীর আবেগের সঙ্গে মিসেস বুল লিখেছিলেন—"তোমার বাড়িতে সেবায় যত্নে তুমি আমাকে সুখী করেছিলে। তোমার কাছ থেকে যা নিয়েছি, এ-জীবনে আর কারো কাছ থেকে তা নিইনি। যদি তুমি ভবিষ্যতে আর একটি শব্দ বা চিন্তা আমার জন্য ব্যয় না করো, তবু আমাকে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিয়েছ তুমি।"

৩ জুন, ১৯০৫ তারিখের চিঠিতে মিসেস বুল নিবেদিতাকে বলেছেন, স্বামীজী লেখার জন্য শান্তি ও অবসর চাইতেন, তোমারও তা প্রাপ্য। স্বামীজীর জীবনী রচনা করার পরিকল্পনা নিবেদিতা করেছেন, তার উল্লেখ করে তিনি বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্যের ব্যাপারে নিবেদিতার 'অনুশীলিত দক্ষতার' বিষয়ে বলেছেন।

১২ জুন, ১৯০৫ তারিখে জগদীশচন্দ্রকে মিসেস বুল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক চিঠি লেখেন। তাতে প্রথমে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রশংসা ছিল। তারপরে নিবেদিতার দক্ষতার প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তিনি ল্যাবরেটরী বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ব্যাপারটুকু অনুধাবন করতে ও তাতে সাহায্য করতে সমর্থ। তারপরে মিসেস বুল একটি নির্মম সম্ভাবনার কথা বলেছেন—মৃত্যুর উপর কারো হাত নেই—জগদীশচন্দ্রেরও তো আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে! সেক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রচনাদি যাতে সংরক্ষিত ও প্রকাশিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এঁর প্রস্তাব, নিবেদিতা যেহেতু যোগ্যতার সঙ্গে সবকিছুর মধ্য দিয়ে যেতে পেরেছেন সেক্ষেত্রে ডঃ বসু তাঁকে 'লিটারারি একজিকিউটার' করুন—এবং গোটা ব্যাপারটাকে মৌখিক না রেখে লেখাপড়ার মধ্যে আনুন। এসব বিষয়ে উইল করার অভিপ্রায়ও মিসেস বুলের আছে। নিবেদিতার অসুখের সময়ে জগদীশচন্দ্র যেভাবে সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইনি বলেছেন—নিবেদিতা ধর্মীয় প্রেরণায় ত্যাগ ও সেবা করতে উদ্গ্রীব, কিন্তু বাস্তব পরিশ্রমের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থা থাকা উচিত। স্বামীজী বিশ্রাম চাইতেন, লিখবেন বলে—তাঁর সন্তান যেন তা পায়—যাকে স্বামীজীর জীবনী লিখতে হবে। মিসেস বুলের এই চিঠিতেই দেখা যায়, **তিনি জগদীশচন্দ্রের বই লেখার, যন্ত্রপাতি কেনার, সহকারী রাখার খরচাদি বহন করছেন।** একটি বিরাট কাজে অংশগ্রহণের গৌরব অনুভব করেই তিনি এ জিনিস করেছেন।

২৮ জুন, ১৯০৫-এর চিঠিতে ডঃ বসু মিসেস বুলকে কলকাতায় শিক্ষা-বিভাগের 'দারুণ চক্রের' কথা বলেছেন। তিনি এতই উত্যক্ত যে, লেফটন্যাণ্ট গভর্নরকে জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে মুক্তি নেবেন।

৩১ অগস্ট, ১৯০৫-এর চিঠিতে ডঃ বসু মিসেস বুলকে তাঁর কঠোর পরিশ্রম, আবিষ্কার এবং নরওয়েতে অবকাশযাপনের সুমধুর স্মৃতির কথা বলেছেন।

১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ তারিখে মিসেস বুলকে বঙ্গভঙ্গের সময়ে রাখী-বন্ধনের রাখী পাঠিয়ে জগদীশচন্দ্র আবেগময় ভাষায় লিখেছেন—আইন আমাদের পৃথক করেছে, কিন্তু মনে আমরা এক। এই ঐক্যচেতনা ভারতের নূতন জাতীয় জীবন সৃষ্টি করেছে।—'জানি তোমার হৃদয় আমাদেরই সঙ্গে আছে—তোমার প্রার্থনাও যুক্ত হোক আমাদের প্রার্থনায়।'

এই চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিটিউশনে তাঁর বক্তৃতা-বিষয়ে একটি সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ জুড়ে দিয়েছেন।]

DR. BOSE TO MRS. BULL (OR NIVEDITA?), MARCH 30, 1904

There is a very outspoken letter from a distinguished F.R.S. who has been himself in the council of referees. The letter appears in this week's Nature.

"My attention has been recently directed to the letters of Messrs Buchanon and Heaviside (?). What I wish to point out is that every author who feels aggrieved has a remedy in his own hands, which consists in abstaining for the future form sending papers for publication to the society. A sufficient supply of papers for publication in their Transactions or Proceeding constitute the life-blood of the societies to which I refer (R.S.) and if the supply were cut off these societies will die of inanition. (The authors) will then not be subjected to the disadvantage of having their papers referred to a *Secret inquisition* composed of persons whom I can testify, from personal experience as a former Councillor of a learned society (R.S.), frequently know far less about the subject matter of the paper than the author does, and whose reports, to my personal knowledge have frequently contained errors from not understanding the papers.

The practical and common sense course would be to boycott the society."

A. B. Basset, F.R.S.

In this week's Sanjibani there is a letter from Japan, with special reference to Conference, signed by A. K. Majumdar.

"It is very sad that there is no chance of the Congress. The gentleman who was asked by O.K. to preside has declined. The East Honganji who were said to have favoured the idea —the chief priest of this section has given out that he will have nothing to do with the Congress. . ."

Did you see in today's Statesman Sarala Devi's appeal for Volunteers for Red Cross—on behalf of Japan? All communications to be addressed to S. Devi, Ballygunge.

I am glad to think that since such a noble example has been set, others will imitate in this laudable object and express their sympathy for Japan.

I hope the cold is better and in spite of yesterday's cold(ness).

Sincerely yours
J. B.

DR. BOSE TO MRS. BULL, APRIL 13, 1904

Calcutta

My Dear Mother,

Your letter came rather early—earlier than the English mail I think through Genoa.

I have not heard anything from Vines—my letter about Waller will reach him by this time. In any case I dislike the whole thing—specially scientific matter degenerating into personalities. I think it is meant that I shall have to write the book and henceforth that [ ] be my mode of expression.

What I am doing now is to print each paper as is completed. In this way the material of the whole book will be collected; and then I could rearrange with necessary alterations in the form of a book. This however makes the thing costly, virtually printing twice over. But otherwise I shall not get him(?) to write the book afresh. I won't feel writing things chapter by chapter.

My nephew had another relapse and that upset the whole household. He is much better now and I am thinking of arranging a sea-voyage for him.

I am sorry the last Paper, copy of which I promised you is but partially typed and illustrated—there being so many interruptions in the meanwhile. I hope to complete them and you shall not only have these, but my new papers which I shall have printed. The great difficulty is in having illustrations as I can't get anyone who can do the illustrations. I have to get these done slowly by some of my outest (?) friends.

Could you now spare the typed copy of the Papers which is now hanging fire before the Royal Society? I shall use these for certain chapters of the book. If all goes well, I hope to have the material for book collected by next January; and all the printed slips, suitably posted will be sent to publishers in England for speedy publication. I hope this to [.........] Plant book published by May, 1905.

As for the particular quotation you wanted about fatigue, I do not quite understand the particular passage you want.

There is a mention of it in my 'Similarity of Response in the Living and Non-Living' printed by Electrician. Unfortunately I have no copy of it except one in bound volume, Waller's copy being sent to Vines. I sent you a copy of the passage from it.

By the way I cannot tell you how very helpful your (......) has been. When Vines wanted the history of the case, I had no evidence. But on opening the desk I found Waller's letter and his copy of my paper with annotations neatly tied up and marked very *precious,* and these made it possible to show up Wallers through his own admission.

With much love,

Yours affectionate son.

DR. BOSE TO MRS. BULL, 1905

My dearest Mother,

How good of you to say that you wish to see your bairns. I always wished to think that you would come whenever we wished for you. But the last time you came, you were so ill, that I am afraid of asking you, till some supreme occasion should rise. I am always keeping the call sacred for that occasion. When the child (Nivedita) was ill, I would have sent for you but that there was no time. But you must at least in your mind hold yourself ready to come all at once. If I can only feel that, I shall feel so much rested.

We have done $\frac{3}{4}$th of the work. Then remains the last $\frac{1}{4}$th. There is abnormal heat-wave in Calcutta—there is a talk of the college being closed for another fortnight. In that case I may be able to finish it, at least the rough sketch of it.

With much love,

Yours affectionate,
Son.

MRS. BULL TO NIVEDITA, JUNE 3, 1905

Dearest Margot,

I am immensely relieved by your return of the paper, and turning down, so to speak, of the whole matter. It is proof that no real necessity exists for a change of conditions for either health, life or work. A change might well cause more loss than the meeting of known difficulties. Had my anxiety been justified by reality you would have been the first to feel it and to grasp the opportunity, even though as in the past we assumed a burden heavy and seemingly not just, except that it is imposed by Providence,—and so to be shared or carried by us as well. The five years could have been taken only provided, I met the obligation the completed service, thereby securing a pension after death for one, will secure. This extreme venture on my part and its acceptance—poor as it would be as

an alternative—I felt, if my proposal were accepted, some such letter were needed to preserve, to show my people in the future possibly that it was wholly my request and urgence. Your impression of it shows me how free you are from any anxiety concerning the immediate future as regards health and the necessities of the work. You would be the first to grasp at a straw—as such an alternative would be—if necessary, and only with and by your co-operation could it have been blessed.

Please understand that I am wholly at rest about it, and shall instantly free my estate from any contingency which only an impersonal end excused me for wishing to secure at so relatively a disproportionate cost.

I enclose a note to Grindlay in London, and shall be glad if you find it convenient to allow me to take up the note. As they hold the paper for you, it will be necessary, I find, to collect it in this manner. I do not feel quite warranted in sending my letter on direct to them, lest you find it inconvenient to place it and thus lose interest. I am on half interest—better than none, of course, holding it for you. I shall be glad to have your cable "pay" if you will permit me to do so. I also enclose order for you on Grindlay of Calcutta, to pay you the balance due me with them.

In March 30th 1904, it stood 1159. 1. 9.

I have been hoping to learn the amount for house-rent, nurses, physician—&c. that was advanced necessarily for you. That seems the natural thing between mother and child. Will you please let me have it?

You who have made me happy in your home and care, from whom I have accepted as from no other person in my life, have made me rich also if you never give me another thought or word. Your task is so great, and conditions so difficult you will remember that while I love your letters, they are never to be a matter of duty on any day whatsoever.

Lovingly, dearest—Margot,
Mother.

Will Messrs. Grindlay & Co., Calcutta, have the goodness to pay to Margaret E. Noble, the balance with them to my credit, and oblige.

Cambridge, Mass., U.S.A. — Sara C. Bull
168, Brattle St. — (Mrs. Ole Bull)

MRS. BULL TO MESSRS. GRINDLAYS & CO., JUNE 3, 1905

To Messrs. Grindlay & Co.,
51, Parliament Street, London.

Gentlemen,

Mrs. Ole Bull desires to make payment of the note held

by Miss Margaret E. Noble, and with you for safe keeping. The Cambridge Trust Co. will meet the obligation if you will forward the note to your Boston correspondents with your directions to collect the amount. I am sending a copy of this to Miss Noble in Calcutta, asking her to cable me "pay" if it is convenient for her to receive it now, when I will forward this duplicate to you direct, and, meantime, she will write you her own wishes regarding the same then paid to you for her.

168, Brattle St., Cambridge,
Massachusetts.

Very truly,
Sara C. Bull
(Mrs. Ole Bull)

এই চিঠির উল্টোদিকে নিবেদিতা লিখেছিলেন—

I don't understand the how when or wherefore of *this*. Is it not strange? I have just read, after writing this unhappy letters, this wonderful quotation you send from [ ].

I feel strangely able to believe how that the whole difference between soul and soul lies in their different capacity for various degrees of joy. I could never have foreseen myself praying—as I do now—"O God give me joy!"!!!

MRS. BULL TO NIVEDITA, JUNE 3, 1905

My dearest Nivedita,

Please find enclosed a draft for £ 100 for your personal use.

It used to be my dream that some day Swamiji would (?) have quiet, books and the favourable conditions for writing. May I not ask you to let me try to secure these to you? And to feel that you earn these by the trained efficiency you bring to your work?

If this is the kind of work you feel it best to give yourself to in your present state of health, I shall be grateful that you are able to do so.

But after so serious an illness and the labour of the secretary you may need a complete respite.

The life of Swamiji and the same line of publication you have already initiated, no one but yourself can contribute so—either to make conditions favourable to writing—or to use for your health until it is safely established—you will count this contribution especially sent. And the same amount I mean to respect next year and the succeeding years.

To the present moment I know of no duty that you have not fulfilled amply, generously and [ ]

During your illness your writings have been a solace and strength.

The book on Marriage(?). Mrs. W. feels to herself personally a great need met.

You will have received by last mail my order for the amount of my balance, with Grindlay Calcutta, for your general purposes and uses, and I will hope for your cable "pay" that I may ask Grindlay of London to collect your note from me. The money stands ready to meet it.

I do hope that you may secure a larger interest there for it.

Hoping, dear, that there is some joy in the convalescence for you and if less [ ] yet that you may be well.

Lovingly,
Sri Sara.

MRS. BULL TO DR. BOSE, JUNE 12, 1905

My dear Son,

I have sent four chapters of the book—many, many, prints, I understand as related to previous work. How clearly you set aside previous conclusions of writers, say: Prof. Waller's. [ ] and go into these wonderful demonstration by thermal and optic and mechanical means. The new instrument even more complex and marvellous than that I saw, and the *applications* of current etc *all automatic*! ! It is strange that each sentence means so much, and yet I do not understand anything!

The secretary is fortunate to follow all without the laboratory work.

I have mentioned in my correspondence my desire that your records and scientific *mss.* should be safe-guarded. The uncertainty of life and, as well, the uncertainty of the right disposal of your Papers in case of your death, make this wise. All that your secretary has gone over with you she could edit properly.

If you could persuade her possibly, to put it on an understood basis of i.e. professional kind—this would if you wish by will to empower her to act as your literary executor with full control of your notes and scientific Papers, be generally respected and understood.

Your prompt action at the time of her illness was a worthy recognition of your right to make conditions for her recovery and comfort as your co-worker. And if you wish to make this privilege on your part in an emergency, comes the possible emergencies that one may reasonably prepare for, I shall be glad.

She was always from her nature itself in the freedom—her religious calling gives her, opportunities ample to give her service:—but in the matters when she earns by actual manual work, it is a satisfaction to have that put on an acknowledged basis?

It was my desire always that Swamiji should come to have the leisure for writing which he always craved. If his child can achieve this, it seems to me a continuity, to us all, of that which,

one thought of for him. His life remains to be written and much else in the same line already published by her.

I hope that she may persist me to so arrange for the condition essential to her quiet and health that she may accomplish this and at the sametime, feel that she is *earning* her right to do this by bringing her trained efficiency to the task.

I shall be thankful if my feeling can meet the occasion and, together, we provide for her the necessary conditions;—for I presume she will not venture as in the past so much general expenditure of physical strength. The illnesses persist to as a closure of one course or another and not the combining, as hitherto, such exacting labours with [ ] voice and teaching together.

Thank you for letting me know the publishing estimate.

And if for assistants and other possible expenses (instruments) etc. you require more than I have sent this year for the Plant-research—please tell me.

I enclose a draft for that publishing amount—and thank you so much for letting me have a very tiny share in the Great Work. If you can arrange £50 for secretary allow me please to send that for this year.

And above all stands radiant the love with which my life is blessed!

God grant, protect and give you strength and peace always,

Always Mother

Did I leave with you a precious note of mine given you until I should make my wish secure in my will? If so, please return it to me.

DR. BOSE TO MRS. BULL, JUNE 6, 1905

Dearest Mother,

I had to postpone work for a couple of days—and am renewing it today. Just finished about 500 pages of the book, another 200 to be written yet.

I do not know what the future might bring, but I have sent a message to the Lt. Governor that I mean to have freedom for my work, whether with or without their help. Of course you know that they have now the strongest combination(?). It is just as well that things should come to a crisis one way or another.

With much and much love,

from your affectionate

Son

DR. BOSE TO MRS. BULL, AUGUST 31, 1905

My darling Mother,

Your short note telling me that you are having such beautiful rest, gave me much joy. How I look forward for your

letters! Tell me that you wish to look after me just as in Norway. How I dream of those days when used to sleep hours under the pines, on ground carpeted with moss, and the fierd so near. I wish I could make another such rest.

But next two months is to be strenuous work. I have got wonderful results shewing what is the true meaning of 'Constitution', why a drug affects on in one way, and another in a different way. It is wonderful that I should have been able to solve this great mystery.

With much love,
from your son.

DR. BOSE TO MRS. BULL, OCTOBER 16, 1905

CAN METALS FEEL?

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadis Chunder Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poison and administered an antidote, and threw light upon an artificial retina. In each case the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was painful to witness. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.

(*Cutting from a paper*)

Darling Mother,

There is just time (?) to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by laws, but *we* all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand and face everything. This is our true union and from today there shall be the beginning of new national life. We have turned back on relying on strangers, we for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters.

Yours affectionate
Son

N. (Nivedita) is just packing off the mss. for book. Her love heartfull. Please direct the enclosed.

য়ুরোপে দু' বৎসর

১৯০৭ সালের শেষ দিনে নিবেদিতা নিজের ডায়েরীতে লিখেছিলেন—

"অপূর্ব বৎসর! দমদমে শুরু—লণ্ডনে শেষ। দুটি বই বেরিয়েছে—'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিয়লজি' ও 'ক্র্যাডল্ টেলস অব হিন্দুইজম্'। কাজ চলছে অপরগুলির। ধন্য বৎসরটি! মা মা মা!"*

ইতিমধ্যে নিবেদিতা পূর্ব পরিকল্পনার চেয়ে আগেই য়ুরোপে চলে এসেছেন। ১৯০৭ সালের ১৫ অগস্ট তিনি যাত্রা করেন এবং ১৯০৮ সালের ১৬ জুলাই প্রত্যাবর্তন করেন, অর্থাৎ মোটামুটি ২ বৎসর য়ুরোপ-আমেরিকায় কাটান। এই-সময়ে অন্যান্য বহু কাজের সঙ্গে তিনি ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক মিশনের ব্যাপারে যথারীতি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ডঃ বসুর য়ুরোপযাত্রার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ ইতিমধ্যে আমরা নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখে এসেছি। জগদীশচন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—

"Detailed descriptions of his experimental methods and the results of his researches in the new realm were for the first time embodied in his *Plant Response* (1906) and *Comparative Electro-Physiology* (1907). The desire was now widely expressed that Prof. Bose should prove his results with practical demonstrations, and the Government of India, in response, sent him on his third scientific deputation to England and America in 1907-8. After a short sojourn in England he went to the United States—for the first time—visited laboratories and lectured before select but appreciative audiences in different American Universities. It is interesting to recall that the suggestion for his visiting U.S.A. first came from the eminent Indian politician—Gopal Krishna Gokhale, a life-long friend and admirer of Jagadish Chadra Bose."

যাঁরা আমাদের বর্ণনাধারা অনুসরণ করে এসেছেন, তাঁরাই বুঝবেন, স্মারক পুস্তিকার বিবরণে আংশিক সত্য মাত্র প্রকাশিত। বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ভারত সরকার অতীব সুশীল—ডেপুটেশন দেবার জন্য সদাই ব্যগ্র। তা যে সত্য নয়, একথা আর বলে বোঝাবার দরকার নেই। ভারত সরকারের ঘোলাটে চোখের জন্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা সংগ্রহে নিবেদিতা প্রভৃতিকে কি ধরনের পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার আভাস আগে পেয়েছি। স্মারক পুস্তিকায় দেখছি, ডঃ বসু ডেপুটেশন পেয়েছিলেন, ফার্লো নয়—নিবেদিতার পত্রে এই নিয়ে টানা হেঁচড়ার সংবাদ ছিল। হয়ত শেষ পর্যন্ত সরকার ডেপুটেশনে রাজি হয়েছিলেন! স্মারক-পুস্তিকার একটি তথ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু সংশয় থেকেই গেল—ডঃ বসুকে আমেরিকা যাবার প্রথম তাগিদ দিয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে?—নিবেদিতা বা ওলি বুল নন? অথচ নিবেদিতা বা ওলি বুল এর বহু আগে থেকেই ডঃ বসুর জন্য আমেরিকায়

---

* নিবেদিতা-জীবনী, আত্মপ্রাণা

অধ্যাপনা পদ সংগ্রহে ব্যস্ত। তাছাড়া গোখলেকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, ডঃ বসুর ব্যাপারে নিবেদিতাই গোখলেকে চালিত করেছেন।

নিবেদিতার জীবনী গ্রন্থগুলি থেকে পাই—আলোচ্য দুই বৎসরে নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গে বহুবার মিলিত হয়ে য়ুরোপ-আমেরিকায় অনেক সময় কাটিয়েছেন। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭-এ নিবেদিতা বসুদের নিয়ে ইংলণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডে যান; তাঁরা ২৬ সেপ্টেম্বর জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করে ৫ অক্টোবর সেখানে পৌঁছান এবং মিসেস বুলের অতিথিরূপে সেখানে থাকেন। প্যাট্রিক গেডিস তাঁর বইয়ে লিখেছেন, আমেরিকায় বক্তৃতাকালে ডঃ বসু মিসেস বুলের ভবনকে নিজের হেডকোয়ার্টার রূপে ব্যবহার করেছিলেন। স্বামীজীর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহের জন্য কারাবাস করার পরে আমেরিকায় গেলে সেখানে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন নিবেদিতা ; ডঃ বসু সেকাজে পরামর্শ দেন। ১৯০৯-এর জানুয়ারীতে নিবেদিতা নিজের মায়ের শেষ অসুখের সময়ে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন তার বর্ণনা বিস্তৃতভাবে আগে করেছি। ডঃ বসু পরবর্তী মার্চ (১৯০৮) মাসে ইংলণ্ডে ফেরেন। মে মাসের শেষে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও সস্ত্রীক ডঃ বসু য়ুরোপে যান ; একমাস থাকেন ভিসবাডেনে। ৩০শে জুন তাঁরা জেনিভায় যান মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক দেখার জন্য। তারপরে মার্সেলিজ থেকে ২ জুলাই, ১৯০৯, ভারত যাত্রা করেন।

আলোচ্য দুই বৎসরে নিবেদিতা রাজনৈতিক কাজে কি প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় ছিলেন, তার যথাসম্ভব বিবরণ আমরা নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন আলোচনা-কালে দেব। এইকালে নিবেদিতার যে-সব চিঠি পেয়েছি তার মধ্যে বসু-সংবাদ বিস্তারিত নয়, তার কারণ খুবই স্পষ্ট। ডঃ বসুর বেশী সংবাদ নিবেদিতা মিসেস বুলকে দিতেন—এই সময়ে মিসেস বুলের কাছেই ডঃ বসু ছিলেন। ম্যাকলাউডও অনেক সময়ই কাছাকাছি ছিলেন; সুতরাং স্বভাবতঃই ঐ দুজনকে লেখা নিবেদিতার চিঠি সংখ্যায় অল্প হয়েছে, ফলে বসু-সংবাদও অল্প পেয়েছি।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৯০৯ পর্যন্ত

১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৭, ওলি বুলকে—"আমার খুবই বিশ্বাস, খোকা এখন পোর্টসঈদে।"

১১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"তুমি লিপজিগে যাচ্ছ! খোকা বলছে সেও যেত যদি সে জানত তোমার সঙ্গে যেতে পারবে! বউ বলছে, তোমার কোনো 'বন্ধন নেই।' বউ বড় মিষ্টি।"

২৯ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"এখানে শুধু রাত্রিটুকুর জন্য এসেছি, ...আগামীকাল খোকার জন্মদিন।......আমি চলে গেলেও খোকা ল্যাবরেটরীতে যেতে পারবে।"

২৪ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"আমরা গতকাল লর্ড কেলভিনের সমাধিকৃত্যে গিয়েছিলাম। খোকা বলছে—তাঁর বিয়োগে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড়

ব্যক্তিত্ব অপসৃত হল। তাঁর মত শিশুর আনন্দ নিয়ে নতুনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আর কেউ রইল না—আর কেউ তাঁর মত কর্তৃত্ব-প্রবণতা বা ঈর্ষা থেকে মুক্ত নয়।"

৯ মার্চ ১৯০৮, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডকে—"তোমাকে গোড়ায় কোনটির বিষয়ে বলব? 'নেচার' পত্রিকার ৫ মার্চ, ক্রোড়পত্রে আলোচনাটি বেরিয়েছে। সেটি পড়ে মনে হবে—"শয়তানও বিশ্বাসী হয়"—অতখানি অমিত্র যখন প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। অধিকন্তু ঐ আলোচনায় ফার্ন এবং ফুলকপির মধ্যে উদ্ভিদ-স্নায়ুর আবিষ্কারের কথা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং ইতিমধ্যেই ওয়েলারের পালের বাতাস কেড়ে নেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং স্পষ্টতঃ সে কাজ করছেন তাঁরই দলের একজন—যিনি আবার ভিবিসেক্‌শনিস্ট! এই ধরনের আলোচনা দেখিয়ে দেয় যে, পৃথিবী ওহেন আবিষ্কারফলকে স্বীকার করার পক্ষে এখনো প্রস্তুত নয় —এবং সেটাই সবচেয়ে মূল্যবান স্বীকৃতি—আজ আমি তা বুঝতে শিখেছি।......

ইতিমধ্যের ঘটনা—তিনি (বসু) গতকাল ১১-৩০-এর সময়ে পরীক্ষাকাজে গিয়েছিলেন, ১-১৫ মিনিটের সময়ে ফিরলেন নাচতে নাচতে। অভিপ্রেত ফল সব ঘটছে! অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম ক'রে মনে হয় চূড়ান্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তা হল—সমগ্র উদ্ভিদ-স্নায়ুকে বিচ্ছিন্ন না করে, তার এক প্রান্ত সাধারণ পেশী-তন্ত্রীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখার পরে উন্মুক্ত তন্তুর সঙ্গে একটি সংযোগ এবং পাতার সাধারণ পেশী-তন্ত্রীর সঙ্গে অপর একটি সংযোগ করা। তিনি সমস্ত স্নায়ুকে উন্মুক্ত করে এক প্রান্ত সংযোগের জন্য দিতেন; কিন্তু এই জিনিসটি [এখানে পত্রের মধ্যে একটি নক্সা আঁকা ছিল]—যা কলকাতায় প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল, এই আবহাওয়ায় তার ফল শুভ হয়নি।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, গতকাল দিনটি উত্তম। বড় ধন্য দিন শনিবার।......

অ্যালবার্টকে (মিসেস লেগেটের কন্যা) বলো, তার স্বামীর (জর্জ মণ্টেগু, পরে লর্ড স্যান্ডউইচ) তুল্য প্রিয় জিনিস আর কিছু হয় না। যখন অক্সফোর্ড থেকে ওয়ারেনের উত্তর সম্বন্ধে তাঁর চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলাম, তখন বিজ্ঞানের মানুষটির মুখের চেহারা যদি দেখতে! **বিশ্বাস করি,** জগন্মাতা এখন আমাদের কৃপা করতে আরম্ভ করেছেন। মায়ের করুণাহস্ত উত্তোলিত হচ্ছে—পদ্মের কাছে উড়ে আসছে মধুকর। কত আশা! কত আশা আমার!"

১৩ জুলাই, মিসেস লেগেটকে—"মিসেস বুল এখনকার পরিকল্পনামত বোস্টনের উদ্দেশ্যে ভাসছেন।......বসুরা এবং আমি ২৬ সেপ্টেম্বর যাত্রা করার আশা রাখি।"

১৮ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"পরের মঙ্গলবার খোকার বক্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ ও ঘোরালো ব্যাপার হবে। তোমার উপস্থিতির কত না প্রত্যাশা করি।"

১৬ সেপ্টেম্বর, মিসেস উইলসনকে—"৮ সেপ্টেম্বর থেকে আমি বসুদের সঙ্গে আছি।"

৮ অক্টোবর, ম্যাকলাউডকে—"ঠিক এইক্ষণে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্যই অবশ্য প্রধানতঃ মন অধিকার করে আছে। এখন ঐ ব্যাপারটিই ভারতের বিরাট

দায়ভার। ওটা মন থেকে কিছুটা নেমে যাওয়ার পরে প্রকাশকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনাদি করব।"

২২ অক্টোবর, ম্যাকলাউডকে—"৯-৩০ মিনিটে এখানে পৌঁছে প্রিয় মানুষগুলিকে দেখলাম। মনে হচ্ছে, টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের বায়োলজিক্যাল ক্লাব ওঁর কাজকে তার প্রাপ্য যথার্থ মূল্যদান করতে পারবে—ও'র এবং ও'র কাজ সম্বন্ধে তারা একেবারে খুশীতে মত্ত !!!! নতজানু হয়ে আমেরিকাকে নমস্কার! বিকাল চারটের সময় অধ্যাপক সেজরিক, ও তাঁর অধস্তন-অধ্যাপক, এবং ২০—৩০ জন অগ্রসর ছাত্রের কাছে উনি বলবেন ; তারপরে ক্লাস ভেঙে সমবেত সকলে এখানে দেখতে আসবেন ; ফলে মিসেস বসু চা-বিতরণ করবেন।...

অধস্তন-অধ্যাপক জানালেন, বসুই তাঁর আগামী কালের বক্তৃতার সম্পূর্ণ বিষয় হবেন। এমনই প্রগাঢ় সমাদর!......ডঃ বসুকে প্রদীপ্ত দেখাচ্ছে। সেণ্ট সারাকে পর্যন্ত তাঁর ভাইয়ের (মিঃ থর্প) মারফত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সুতরাং মিঃ থর্প পর্যন্ত এই তারকার বিশালত্ব বুঝেছেন, অথচ ইংলণ্ডে গেডিসই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই সমস্ত কিছুকে যথার্থ অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন !!! জানতেই পারবে না, মা কি খেলা খেলছেন।"

৩ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"খোকা ৮ বা ৯ ডিসেম্বরে হয়ত নিউইয়র্কে যেতে পারে। তাঁদের এবং সেইসঙ্গে তাঁদের একজন সহকারীর থাকবার জন্য কি কোনো বোর্ডিং হাউসের নাম করতে পারো, কিংবা কোনো মাঝারি হোটেল? কিন্তু মনে হয় বোর্ডিং হাউসই উপযোগী হবে।"

১০ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"হোটেলের ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ। খোকা আজ এখানে বক্তৃতা করবে।"

১ ডিসেম্বর, মিসেস লেগেটকে—"হঠাৎ হয়ত পরের শনিবার বসুদের নিয়ে আমি তোমার ওখানে গিয়ে মিঃ লেগেটের সঙ্গে রিজলিতে দেখা করতে পারি, নিউইয়র্কের বদলে। এ যদি হয় তাহলে আমি অতীব আনন্দিত হব। এতে শুধু আবার তোমার সাক্ষাৎ পাবার সুন্দর সুযোগ মিলছে তাই নয়, অধিকন্তু আরও বহু দিক থেকে সুবিধা হয়ে যাবে। রাত্রে ৭-৩৫ মিনিটে আমাদের কিংসটনে পৌঁছতে হচ্ছে; তবে যেহেতু আমি সঙ্গে আছি, সেক্ষেত্রে ছোট ট্রেন যদি পাই (ট্রেন মিলবে বলেই ধারণা) তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।......তারপরে, খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, রিজলি ছাড়তে হবে সোমবার সকালে, কারণ মিঃ বসু বিশেষভাবে চান, নিউইয়র্কের [......] 'ফরেস্ট প্লেস' আমি তাঁকে সঙ্গে করে দেখাই। তারপরে আমাকে মঙ্গলবার সকালে পিটারবার্গে উপস্থিত হতে হবে। তবে আশা করি, এই ব্যবস্থায় তুমি কিছু মনে করবে না। এই ভ্রমণে বসুদের সঙ্গে থেকে যে সাহায্য করতে পারছি এতে আমার আনন্দের সীমা নেই, আর সঙ্গে থাকলে সাহায্য করাটা খুবই সোজা আমার পক্ষে!"

২৩ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"দোষ তোমারও নয়, লেডী বেটীরও নয়, তোমাদের লোকটির—সে তোমাদের নির্দেশের উপর বুদ্ধি ফলাতে গিয়েছিল। ডঃ

বসু আগামী সোমবার জোনস্ হপ্‌কিনস্-সভায় আমেরিকান বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। এটি বিশেষজ্ঞ-সমাবেশ, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের মত। [কয়েক মাস আগে এক ছোকরা, যার নিজস্ব কোনো অধিকার নেই, বা ডঃ বসুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের স্বার্থের কথা ভেবে ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপালের কাছে হাজির হয় (ডঃ বসুর বক্তৃতার জন্য)। ব্যাপারটা শোনা মাত্র আমরা তাকে থামিয়ে দিয়েছি, কারণ, ডঃ বসুর গবেষণার মর্যাদার পক্ষে তা হানিকর হবে। ডঃ বসু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বক্তৃতার জন্য সরাসরি আহূত হবেন—তাই তো প্রত্যাশিত!] আমি যখন ছিলাম না তখন বসুরা আবিষ্কার করেন যে, বাল্টিমোরে বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ডেলিগেট-হোটেল রয়েছে; সেখানে তিনি ঘর নিয়ে নেন। তোমার পরামর্শমত আমি গতকাল বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে একটি গোপনীয় চিঠি লিখেছি, তিনি যাতে হোটেল-কর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু অতিথির বিষয়ে কথা বলেন। আমি যে লিখেছি তা বসুদের বলিনি।"

৩০ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"বসুরা বাল্টিমোরে। আর আধ ঘণ্টা বাদে ডঃ বসু তাঁর পেপার পড়বেন। জগন্মাতা তাঁকে আশীর্বাদ করুন—সফল হোন তিনি!

আমি লক্ষপতি হবার বিশেষ চেষ্টায় আছি, যাতে আগামী বৎসরগুলিতে ভারতে নারীশিক্ষা ও বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে!

আর—ওটা কি শুধুই গালভরা আশা মাত্র? ভাবতেই আমার হৃদয় উত্তাল—শুধু লিখতেই তাই! আর হে মাতঃ, **আমি** তো লিখে ফেলেছি, এখন সেটা সমাধা করে ফেলাই **তোমার** কাজ হবে।"

৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, ওলি বুলকে—"বউয়ের বক্তৃতায় খুব খুশী।"

৩ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"ডঃ বসু সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনার কথা যে-চিঠিতে লিখেছ, তা আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি, কেবল তার বিষয়ে উল্লেখ আছে এমন দুটি চিঠি পেয়েছি। তোমার আইডিয়া কি তা অনুমান করতে পারছি না, কিন্তু যদি কোনোভাবে তার কোনো সাহায্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়—সেক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতাই হবে আমার একমাত্র অনুভূতি।"

৯ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"তুমি কি এপ্রিলে লণ্ডনে যাবে? ঐসময়ে আমি ওখানে থাকার আশা রাখি।"

৩ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"এখন যেন হাসপাতালে আছি। বউ লিভারপুলে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে নেমেছে।......গত শনিবারে, এক সপ্তাহ আগে এখানে এসেছি, কিন্তু তার খারাপ সময় এখনো কাটছে না, এবং ডাক্তার তাকে আরও তিন দিন শয্যাগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।......

ডঃ বসুর ল্যাবরেটরী?—এবিষয়ে কদাপি কোনো কথা নয়। ঐ নামে অভিহিত করার সাহস নেই। শোনামাত্র সরকার তেলেবেগুনে হবে—ঐধরনের বোঝাপড়ার কোনো ফিসফিসানি শুনলেও।"

২৯ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"মনে হয় আমরা হয়ত ভিসবাডেনে যাব বিজ্ঞানের মানুষটির জন্য, কেননা তার পা আবার কষ্ট দিচ্ছে।"

২ মে, ম্যাকলাউডকে—"আশঙ্কা হয়, বিজ্ঞানের মানুষটি ভাল নেই। হয়ত বাত নয়......আমি খুবই উৎকণ্ঠিত।"

১১ মে, ম্যাকলাউডকে—"যদি আমরা ভিসবাডেনে যাই, সম্ভবতঃ তুমি এবং আমি ভিলা হার্থাতে একই ঘরে কাটাতে পারি। বসুরাও থাকবেন। এটা যদি তোমার পছন্দ হয়, অবিলম্বে জানাবে যাতে বউ ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে।"

২ জুন, ম্যাকলাউডকে—"খোকা সবসময় তোমার কথা ভাবছে, বলছে।"

নিবেদিতা ভারতে ফেরেন ১৯০৯-এর ১৬ জুলাই, তারপরে মিসেস ওলি বুলের গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে দার্জিলিঙ থেকে সোজা আমেরিকা যাত্রা করেন এবং মিসেস বুলের কাছে পৌঁছান ১৫ নভেম্বর, ১৯১০। মধ্যবর্তী এক বছরের কিছু বেশী সময়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর সঙ্গে পুরোদমে বিজ্ঞানের কাজ করেছেন (সিস্টার দেবমাতার সাক্ষ্য আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করে এসেছি), এবং ১৯০৯-এর বড়দিনে অজন্তা, ১৯১০-এর গ্রীষ্মের ছুটিতে কেদার-বদরী, ও পুজার ছুটিতে দার্জিলিঙ গেছেন। শেষ পর্যায়ের এই সব ভ্রমণের কথা বলার আগে নিবেদিতার চিঠি থেকে বাকি অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে দেব। এখানে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে গিয়েছে—বাংলা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক পরিণতিতে। নিবেদিতা সরকারের সন্দেহভাজন। সর্বপ্রকার জাতীয়তাবোধ সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে দূরে থেকে বিজ্ঞানসাধনা করতে চান, এবং সরকারের আনুকূল্য সর্বদা প্রার্থনা করেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সরকারকে নিশ্চয় সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল এবং শিক্ষাবিভাগে তাঁর শত্রুদের দাঁত ও নখকে আরও বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, নিবেদিতা তাঁর ব্যক্তিগত পত্রে পর্যন্ত বসু-প্রসঙ্গ যথাসম্ভব পরিহার করেছেন (নিবেদিতার চিঠি তখন সেন্সার হচ্ছিল)। আমরা আগেই দেখেছি (৩ এপ্রিল, ১৯০৯) নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে ডঃ বসুর ল্যাবরেটরীর কথা তুলতে নিষেধ করেছেন। তবু ল্যাবরেটরী গঠনের কাজ চলছিলই, এবং সেকাজে মিস ম্যাকলাউডের অল্পাধিক সাহায্য ছিল। নিবেদিতা এই সময়ে খানাতল্লাসের বা গ্রেপ্তারের ব্যাপারে এতই ভাবিত হয়েছিলেন যে, ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক কাজ সংক্রান্ত ডায়েরীগুলি বোনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, বসুর বিষয়ে নিবেদিতা অনেক সময়েই প্রায় সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেছেন।

পুলিশী উৎপাত নিবেদিতাকে বিরক্ত এবং ডঃ বসুকে আতঙ্কিত করে তোলে। রাজনৈতিক কার্যাবলী থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি নিবেদিতাকে বিশেষ চাপ দেন। এই সময়ে একটি ঘটনায় আপাত স্বস্তির কারণ ঘটে—ভাইসরয়-পত্নী লেডী মিন্টো নিবেদিতার বিষয়ে শুনে গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এই সাক্ষাতের

ফলে পুলিশী যন্ত্রণা কমে যায়। তবে তা চিরতরে দূর হল, এমন নিবেদিতা মনে করেননি। শুধু তাঁর মনে হয়েছিল, মিণ্টোর আমল পর্যন্ত তিনি কিছু অধিক সুবিধাভোগ করবেন।

নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখতে পাই, শ্রীমতী অবলা বসু সারদাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করে এসেছেন। এই সময়ে দেশনায়কেরা অনেকেই তাই করছেন, কারণ তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, জাগরণের মূল প্রেরণা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেরই।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯১১ পর্যন্ত

৫ অগস্ট ১৯০৯, ম্যাকলাউডকে—"মাতা ঠাকুরাণী **অপরূপ**। গতরাত্রে বো (অবলা বসু) গিয়েছিল তাঁর পাদস্পর্শ করতে। চমৎকার নয় কি? সকল মহান জাতীয়তাবাদীই এখন তা করেন। সকলেই স্বীকার করছেন—আহ্বান এসেছিল স্বামীজীর মধ্য দিয়েই। সেদিন যখন মাতাঠাকুরাণীকে বললাম, 'মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আপনার অসংখ্য সন্তান এসে জুটবে—সেদিন তো এসে গেছে! সারা দেশই তো এখন আপনার!' শ্রীমা বললেন, 'তাই তো দেখছি!'"

অক্টোবর ২৭, ১৯০০, ম্যাকলাউডকে—"আমরা বসুদের অতিথি (দার্জিলিঙয়ে)। তবে আমরা ভিন্ন বাড়িতে আছি, খাবার সময়ে নেমে আসি। এবারকার (বৈজ্ঞানিক কাজের) পর্ব এত নিদারুণ ঠাসা ছিল যে, আমি পরের বই আরম্ভই করতে পারিনি, কিন্তু আরম্ভ করতে কত না চেয়েছি।"

২ ডিসেম্বর ১৯০৯, ম্যাকলাউডকে—"অন্য কথা বলার আগে বলে নিই, খোকার মনে হয়েছে যে সে ২০০ পাউণ্ডের দুটি এবং ২০ পাউণ্ডের একটি টাকার অঙ্ক তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়েছে। নিঃসন্দেহে তা তোমার দানের ফল। সে অবশ্যই তোমাকে নিজে লিখে ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তার আগেভাগে বলে নিই, এটা বড় স্বস্তির কারণ হয়েছে। তুমি তার ল্যাবরেটরীকে শৈশবে পালন করছ, কী অপূর্ব। ভারতে তোমার মহা ভূমিকা!

প্রিয় মিঃ দত্ত (রমেশ দত্ত) মারা গেছেন! খোকার জন্মদিন, ৩০শে নভেম্বরের সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শিব! শিব! এবছরটি কী ভয়ঙ্কর!"

৩ মার্চ ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"লেডী মিণ্টো তাঁর জন্য কিছু স্বদেশী বিস্কুট আনতে বলেছেন। তাঁকে অজন্তার একটি স্কেচও আমাদের দিতে হচ্ছে।

---

* নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রকাশিত 'ভারত-তীর্থে নিবেদিতা' নামক গ্রন্থে ৩ মার্চ ১৯১০-এ লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির অংশানুবাদ দেওয়া আছে—

"গতকাল লেডী মিণ্টো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।...বসু খুবই স্বস্তি-বোধ করছেন। কারণ ইদানীং পুলিশের উপদ্রব বড়ই বেড়ে চলছিল। তাই তিনি চাইছিলেন, আমরা কয়েকজন রাজকর্মচারীকে বন্ধু হিসাবে লাভ করি। র‍্যাভির বন্ধু স্যার গাই ফ্লীটউড উইলসন ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটি স্থগিত রাখায় বসু উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়ে এই ব্যাপার ঘটল, যার ফল অনেক বেশী কার্যকরী ও কল্পনার অতীত।"

সেটি তরুণ বুদ্ধিমান এক শিল্পীর করা। নেহাৎ খোকার অনুরোধেই এটা করতে হল, নচেৎ ঐ ত্যাগস্বীকার আর কিছুতে করতে পারতাম কি না সন্দেহ।"

১৪ এপ্রিল ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"জানো কি, খোকা আমাদের গণেন-বালকটির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে—এই বইয়ের ('দি মাস্টার') টাকায় আমাকে ভূস্বামিনী করে তুলবে। হলে নিতান্ত খুশী হব—তা যে স্বামীজীর উপহার হবে!"

৫ মে ১৯১০, মিসেস উইলসনকে—"ডঃ বসু সর্বদা মার্গটের (নিবেদিতার বোনঝি ও ধর্মকন্যা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তুমি যা-কিছু বলেছ, তা তাঁকে গতরাত্রে বলেছি। তিনি অবশ্যই চান, ছোট তাবিজটি ব্যবহার করা হোক। ডাকে যাবার সময়ে যদি পথিমধ্যে ভেঙে যায়, তুমি নিশ্চয় তা জানাবে, কারণ সহজেই আমরা নতুন পাঠাতে পারি। এই ছোট্ট মুসলমানী জিনিসটি সম্বন্ধে খোকার অসাধারণ বিশ্বাস। ব্যাপারটি বিচিত্র।"

২৫ অগস্ট ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—

[মধ্যবর্তীকালে নিবেদিতা বসুদের নিয়ে কেদারবদরী ভ্রমণ করে এসেছেন। সামান্য পরেই সে প্রসঙ্গ আসবে।

বর্তমান চিঠির অংশ এবং ২২ সেপ্টেম্বরের চিঠির অংশ আমরা মূলে উদ্ধৃত করছি, কারণ এইকালে ডঃ বসুর বিষয়ে নিবেদিতা কি রকম আধা সাংকেতিক বা আবৃত ভাষায় কথা বলতেন, তার রূপ চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যাবে। ২৫ অগস্টের চিঠি থেকে ডঃ বসুর ল্যাবরেটরীর প্রাথমিক পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাবে।]

"I have been almost wiring to you this week: *Explain Laboratory Prince.* I have asked my journalistic friend to come and talk to you about it. It flashed across me one night at the Holy Mother's evening service that the recent visitor at Hinching broke ought to be interested in the scheme by you or George. *We* have not been able to write to him about it, though we have tried, because of the insecurity even of the registered post. I am more and more anxious that it should be in a separate building of its own and not merely in a broken and modified version of the family home! That was to have been a source of income, but now owing to difficulty of buying land close by it will be sacrificed in October, if Mother gives no definite leading in time to stop this.

We want 3 things in the building:

(1) Good working-resources,

(2) And equally important, a good lecture-hall,

(3) A library and museum, for all sorts of collections, instruments etc., and study. About *this* we need not talk. It is provided, I think, if the rest is. Also garden for specimens.

All this in private Indian context."

September 22, 1910, To May Wilson: "I am thinking of sending you a few old diaries to place with my others. I think

I shall feel better if such papers are with you before the Mintos go—and if anything should happen, you would always know that I would rather *you* searched them than anyone else, unless it were Himself (Dr. Bose) or Xtine (Christine).

Again—it might someday happen that material was wanted for a biography of Himself (Dr. Bose). I have asked that £ 100 should be left by anyone [S C B (Sara C Bull) or J C B (Jagadish C Bose)] to Mr. Ratcliffe, for this purpose. If so, my diaries would be found full of material. Probably Xtine would be the only person who could pick out the references with absolute certainty."

নিবেদিতার সঙ্গে বসুদের ভ্রমণ

ইতিমধ্যে আমরা অনেকবার বলে এসেছি, নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গে অবকাশভ্রমণে যেতেন। এইসব ভ্রমণকালে তাঁরা অনেক সময় অনুকূল আবহাওয়ায় (প্রায়ই পাহাড়ে যেতেন) বিজ্ঞানের কাজ করতেন। কিন্তু ডঃ বসু বা নিবেদিতা ভ্রমণকালে ভ্রমণের অন্যতর উদ্দেশ্যকে কখনই বিস্মৃত হতেন না। ভ্রমণ তাঁদের কাছে মহৎ শিক্ষা—যেহেতু তাঁরা কেবল কল্পনায় দেশ বা জাতিকে দেখতে চাননি, সাক্ষাতে দেখতে চেয়েছেন। ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ নিবেদিতার মনোজীবনে এই ভ্রমণগুলির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্র এ নয়, কিন্তু ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, সেই তন্ময় বিজ্ঞানী, যিনি গবেষণাগারে জীবন যাপন করবেন, তিনিও ভারতভ্রমণকে দেশাত্মবোধের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর জীবনীকার, সুবিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডিসের রচনাংশ উদ্ধৃতিযোগ্য। বিয়ের পর থেকেই জগদীশচন্দ্র তাঁর পত্নীর সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেন (ইনি দশ বার পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ করেছিলেন!) এবং সে ধারা জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অধ্যাপক গেডিস তাঁর ব্যাপক ভ্রমণের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"এই ভ্রমণ-ব্যাপারটি আপাতভাবে মনে হয় বসুর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু তা বস্তুতঃপক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কার্যের প্রাণশক্তি দিয়েছিল, সর্বোপরি তাঁকে ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও কর্মসাফল্যের ঊর্ধ্বে ভারত-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত রেখেছিল।...এর ফলেই এই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত আধুনিক পদার্থবিদ্ অদ্ভুত ব্যাপকভাবে তাঁর স্বদেশকে জেনেছেন—নিতান্ত খাঁটি এক ভারতবাসীর মত করেই ভারতকে বুঝেছিলেন।"

ইংরেজ সাংবাদিক এবং সরকারী কর্মচারীরা অগভীর ধারণা থেকে বলে থাকেন, ভারতের ঐক্য আধুনিক কালের সৃষ্টি—তা উকিল-ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিকদের ম্যাজিনি-আদর্শের উদ্‌গিরণ এবং ছোকরাদের মানসিক উত্তেজনার আশ্রয়। অধ্যাপক গেডিস সেই সিদ্ধান্তের অসারতা দেখিয়ে বলেছেন, 'ভারতের মূলীভূত ঐক্য তার ধর্মচেতনায়, তার নারীদের আত্মায়', তার রাজধর্মে ও কর্মে। সে ঐক্যবোধ মুসলমান শাসন, এমন কি ইংরাজ শাসনও নষ্ট করতে পারেনি। জগদীশচন্দ্র সেই ঐক্যচেতনার স্পর্শলাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি যখন দাক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শ্রীরঙ্গম মন্দির

দর্শনে যান, তখন অতি পবিত্র সংরক্ষিত স্থান, একেবারে গর্ভমন্দিরের ভিতরে তাঁকে যেতে বলা হয়। জগদীশচন্দ্র জানান, তিনি মোটেই রক্ষণশীল হিন্দু নন, জাতিভেদে বিশ্বাস করেন না, সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে কালাপানির পারে গেছেন, সুতরাং ঐ জায়গায় প্রবেশের কোনো অধিকার তাঁর নেই। পুরোহিত বলেছিলেন, 'আপনি সাধু। চলে আসুন।'

এমনই সব অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছিল ডঃ বসুর মনে। তিনি বলেছেন—

"এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ভারত আমাকে তার সন্তানরূপে নির্মাণ করেছে, রক্ষা করেছে। ভারতের বাইরের জীবনের গভীরে তার অবিচ্ছিন্ন প্রাণের স্পন্দনকে আমি অনুভব করি।"

গেডিসের বসু-জীবনীতে নিবেদিতার সঙ্গে বসুরা যে সব ভ্রমণ করেছেন, তার অনেকগুলির উল্লেখ আছে। যেমন তাঁদের মায়াবতী-ভ্রমণ, বা বুদ্ধগয়া-ভ্রমণ। অজন্তা-ভ্রমণের কথাও পাই। এই ভ্রমণে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, সস্ত্রীক জগদীশ বসু ও গগেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। লেডী হ্যারিংহামের তত্ত্বাবধানে এবং নিবেদিতার প্রেরণায় নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার অজন্তার গুহাচিত্র নকল করতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার চিঠিতে ঐ ভ্রমণের দু' এক টুকরো সংবাদ—

"পরের সপ্তাহে মিসেস হ্যারিংহ্যামের সঙ্গে অজন্তায় মিলিত হওয়ার কথা। ফেরার আগে ইলোরাও সেরে নেওয়ার কথা। ইতিহাসের মহাভোজ এক মাস ধরে, যা এক বছরের লেখার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান!"

"তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, বড়দিনের আগের দিন আমরা সারা রাত্রি ধরে অজন্তা-মুখো চওড়া রাস্তায় হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়িয়েছি। অপূর্ব চন্দ্র যখন নেমে গেল, এক ঘণ্টা পরে আমরাও নেমে এলাম মিসেস হ্যারিংহামের তুষারশুভ্র তাঁবুতে—তাঁকে বললাম—'শুভ বড়দিন!' তারপর তিনটি পরমানন্দের দিন কাটালাম,—শিল্পের—ইতিহাসের—গ্রন্থের—ভ্রমণের—গুহার—তিনটি দিন।"

ডঃ বসু তাঁর অজস্র ভারত ভ্রমণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনে রেখেছিলেন ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালের কেদারবদরী ভ্রমণটিকে—একথা তাঁর অনুমোদিত জীবনীতে পাই। আমরা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের চিঠি থেকে দেখেছি, বহুদিন ধরেই এই ভ্রমণের জন্য নিবেদিতার আগ্রহ ছিল, এবং তাঁরা ১৯০৭ সালেই এই ভ্রমণ-পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। কেদারবদরী ভ্রমণ ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রা, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভূখণ্ডের মানুষ একত্রে যাত্রা করে এই তীর্থে। গেডিস লিখেছেন—"এর পূর্বে আর কখনো তাঁরা এমন ব্যাপক ধর্মপ্রভাবের রূপ দেখেন নি, যা ঐতিহ্যগত ও স্বাভাবিক। এক সুরে সকলের প্রাণ বাঁধা। জাতি নির্বিশেষে সকলে সকলকে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র বন্ধুভাবে সম্বোধন করে। কেদারের বিরাট তুষারশিখর দর্শনমাত্রে প্রতিটি মুখ ভাবোদ্দীপ্ত—কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে ওঠে—জয় কেদারনাথ কি জয়! নরনারী সকলেই যেন প্রার্থনায়, পূজায়, ভাববিহ্বলতায় সমাচ্ছন্ন। অন্ধ একটি মানুষ সংকীর্ণ মারাত্মক একটি পথে, চূড়োর উপরে, হাতড়ে

---

* নিবেদিতা এই ভ্রমণের উপর দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন— *The Ancient Abbey of Ajanta* এবং *Elephanta—the Synthesis of Hinduism.*

হাতড়ে উঠছিলেন, তাঁকে যখন বলা হল, ভাই, সামলে চলুন, তিনি বললেন, প্রভু পথ দেখাচ্ছেন, আমার ভয় কি?"

এই ভ্রমণের উপরে নিবেদিতার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। নিবেদিতার মন কতখানি সমৃদ্ধ ঐ বইটিই তার প্রমাণ। প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন ও পৌরাণিক সাহিত্যে অধিকার এবং মানুষের প্রাণসত্যকে অনুভব করার আশ্চর্য ক্ষমতার আভাস এই ক্ষুদ্র বইটির মধ্যে মিলবে। অন্ধ বৃদ্ধের যে ঘটনাটির কথা গেডিস লিখেছেন, সেটি এখানেও পাওয়া যাবে, এবং আরও কিছু ঘটনা, যাদের কথা সরলাবালা সরকার তাঁর অনবদ্য নিবেদিতা-স্মৃতিতে বলেছেন।

নিবেদিতার চিঠিতে এই ভ্রমণের কিছু সংবাদ মেলে।

নিবেদিতার পত্রে কেদারবদরী যাত্রা-সংবাদ

২৫ মে ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"(রুদ্রপ্রয়াগ থেকে) এই যাত্রাটি যথার্থই তীর্থযাত্রা। সব ধরনের জায়গাতেই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তিন রাত্রি মাত্র ডাকবাংলোতে! সুতরাং কল্পনা করে নাও। বসুরা একেবারে অপূর্ব। এত সহজে সন্তুষ্ট তারা, যে-কোনো জিনিসের সেরা রূপ দেখতে প্রস্তুত, এবং ধর্মজীবনের অভিব্যক্তিতে আগ্রহী। এই উত্তপ্ত নদী-উপত্যকায় বিপদও যথেষ্ট।"

জুন ১২, মিসেস উইলসনকে—"এই যাত্রাটি কি রকম হয়েছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমাদের সমস্ত শক্তি তা হরণ করে নিয়েছে। গত ৭।৮ দিন ধরে বেচারা মিসেস বসু অসুস্থ।...

হরিদ্বার নামক মনোরম এক ক্ষুদ্র শহর থেকে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম এবং তীর্থযাত্রার পথ অনুসরণ করে পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করতে হয়—যাত্রার সে অংশ সমাপ্ত হয়েছে—এটাই কঠিনতম যাত্রা। এখন আবার বদরীনারায়ণের তুষারের অভিমুখে।

প্রথমে আমরা এমন একটা রাস্তা ধরে গিয়েছি, যেখানে ইউরোপীয় বা তাঁদের ভাবানুরূপ মানুষের জন্য কোনো ব্যবস্থাদি নেই। রাতের পর রাত আমরা মুসাফিরদের সরাইখানায় কাটিয়েছি—ঠিক বেথলিহেমের মত—এবং এ ধরনের অবস্থানের চরম অভিজ্ঞতা ঘটেছিল যখন পার্শ্ববর্তী এক বিরাট মঠে আতিথ্য নিয়েছিলাম। আমাদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দানের লক্ষণরূপে একটি ঘোড়াকে তার আস্তাবল থেকে বিতাড়ন করে সেখানে মিসেস বসু ও আমার স্নানাগার করে দেওয়া হল! কিন্তু ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুই পরে যখন আমি বাড়ীতে হাত ধোয়ার জন্য সেখানে গেলাম তখন চমৎকৃত হয়ে দেখি—অশ্ববর তাঁর স্বস্থানে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পুনরধিষ্ঠিত হয়েছেন। তখন ডাক ছেড়ে কাঁদার অবস্থা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, সরাইয়ে জায়গা না হওয়ায় জোসেফ এবং মেরীকে কিভাবে সহজেই আস্তাবলে ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছিল! আমাদের যাত্রার এই অংশটি কি অচিন্তনীয়ভাবে পুরাকালীন! এখন আমরা তিব্বতের অভিমুখীন সামরিক পথে, এবং প্রতি ক্ষেপে থাকবার স্বাচ্ছন্দ্যকর জায়গা পাচ্ছি।...

সারা পথে অতি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য, এবং অসাধারণ ঐতিহাসিক স্থান-

সমূহ। কষ্ট স্বীকারের উপযুক্ত পথ। এখন দিনের পর দিন চলেছি রাঙা গিরিখাতের মধ্য দিয়ে, মাঝে মাঝে পাতলা পাইন বন, তাছাড়া আর কোনো গাছ নেই। ধূমলবর্ণ গিরিসংকট। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বা কাম্বারল্যাণ্ডের তটভূমির মত। আহা, অপূর্ব, যেন দেবতাদের বিহারস্থান! মিঃ র‍্যাটেলের নাছোড় তাগিদে আমি তাঁদের ও তোমার জন্য ছোট্ট ডায়েরী রাখছি, কিন্তু তার থেকে তোমরা বিশেষ কিছু পাবে মনে হয় না, কারণ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি লিপিবন্ধ করার এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছি, যার অর্থ কেবল আমার কাছেই স্পষ্ট—নিজস্ব ভাবে সেগুলি কিছুই নয়।"

১২ জুন, ম্যাকলাউডকে—"আমরা বদরীনাথের পথে। দৃশ্যাবলী অপরূপ। কিন্তু পথযাত্রার অসুবিধা সবিশেষ। মিসেস বসু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু আমরা থামিনি,—মনে ধরে রেখেছি অমরনাথের মহাস্মৃতি।"

২৯ জুন, ম্যাকলাউডকে—"আমাদের অপূর্ব তীর্থযাত্রা সমাপ্ত। স্বামীজী নিশ্চয় চাইতেন, আমরা এই তীর্থ করি। আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে কে জানে, কিন্তু এ এক অমর সম্পদ—এমনভাবে রক্ষিত ও পুণ্যাশিসপূত যে এমন কি খোকা পর্যন্ত তার মহিমা মেনে নিয়েছে। ভালভাবে নামছি আমরা—কী স্বস্তি!"

৬ জুলাই, মিসেস উইলসনকে—"বিজ্ঞানের মানুষটিকে সুস্থ, সবল, জ্যান্ত অবস্থায় কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে পেরে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। বেচারা বউই কেবল বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—সে এখন আবার ভাল হয়ে গেছে। সব জড়িয়ে আমরা ৪২ দিন হেঁটেছি, ৬ দিন হাঁটা বন্ধ ছিল। মোট ৪৮ দিন।"

নিবেদিতার রচনায় কেদার-বদরী ভ্রমণ

জগদীশচন্দ্রের সেরা স্মৃতি যে ভ্রমণটিকে ঘিরে, যে-ভ্রমণকালে তিনি ভারতের সুগভীর আধ্যাত্মিক স্বভাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন—সে অভিজ্ঞতার কিছুটা স্বাদ পেতে হলে নিবেদিতার পূর্বোক্ত তীর্থকাহিনীটুকু না পড়লে নয়। আমি খুব সামান্য কিছু উদ্ধৃত করছি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের অনুভূতির ঐক্য কতখানি!

"কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের মধ্যবর্তী পথের কোনো এক জায়গায় খেতে বসেছি, এমন সময়ে আমাদের দলেরই কে একজন বলে উঠল—'ভেবে দেখো, এখান থেকে মানসসরোবর মাত্র দশ-বার দিনের পথ! এর সব জায়গাটাই কৈলাস! আমরা কৈ-লা-সে!' সত্যই তাই। সেই পরম কাম্যলোকে প্রবেশ করেছি প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ বেয়ে। ক্ষুদ্র অথচ অবর্ণনীয়-সুন্দর, বারাণসীতুল্য হরিদ্বার থেকে যাত্রা করে, হৃষীকেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, আমরা পায়ে পায়ে, স্তরে স্তরে ভারতের সর্বস্থানের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছি এক পুণ্যভূমি থেকে অন্য পুণ্যভূমিতে, অবশেষে পৌঁছেছি সর্বতীর্থসার কেদারনাথে ; সেখান থেকে এখন চলেছি বদরীনারায়ণের পথে—সেখান থেকে ফিরে নামব আমাদের সাধারণ জীবনে, আমাদের সমতলের গৃহে, আমাদের প্রতিদিনের কাজে। অপূর্ব কথা কটি—আমরা কৈলাসে

আছি। স্তব্ধ হয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত, তাদের অর্থ ঘনালো মনের গহনে। পাইন ও দেওদারের মধ্যে বসে আছি, পায়ের তলায় পার্বত্য কুসুমরাজি, পিছনে কাল-প্রাচীন তীর্থভূমি, সামনেও তাই—মনে হল, কৈলাস?—হতে পারে, অসম্ভব কি?...

এই তীর্থযাত্রা থেকে প্রথম যে-ভাবটি মনে জাগে, তা হল ভারতের সুগভীর ঐক্যবোধ। পথযাত্রীদের মধ্যে পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মালাবার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং বাংলার মানুষেরা আছেন, প্রতি ক্ষণে তাঁদের দেখি, অতিক্রম করে চলে যাচ্ছি। শুধু এইজন্যই ঐক্যবোধ করছি না, অধিকন্তু এই ব্যাপারটি আমাদের সামনে রয়েছে—এই উত্তরতীর্থের মহান পূজারী-ব্রাহ্মণ, মোহন্তরা সবাই দক্ষিণী। বদরীনারায়ণের পথে পান্ডারা পর্যন্ত দক্ষিণদেশের লোক। কেদারের ক্ষেত্রে অবশ্য পান্ডাদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি যেভাবেই হোক, বর্তমানে তাঁরা একেবারে স্থানীয় অধিবাসী।... কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ বা অন্যান্য পুণ্যস্থানের মোহন্ত বা রাহুলেরা তাঁদের উত্তরাধিকারী দক্ষিণদেশ থেকে মনোনীত করতে বাধ্য। এইভাবেই আধ্যাত্মিক ভাব-ধারাকে জীবন্ত রাখা হয়েছে, গত হাজার বছর ধরে, যা সর্বদাই ভারতের অতিপ্রান্ত দেশসমূহ থেকে উত্থিত ও প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমে মগধ, তারপরে দ্রাবিড়দেশ থেকে তরঙ্গ উঠে ভাসিয়ে দিয়েছে হিমালয়কে। সেইসঙ্গে এও প্রমাণিত হয়েছে, মাতৃভূমি সত্যই এক, উত্তর ও দক্ষিণ অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, জাতিগত, ভাষাগত বা রাজনৈতিক খন্ডরূপের কোনো কাহিনী কখনই সম্পূর্ণ ভারতকাহিনী হবে না।...

কোনো ভারতীয়ের কাছেও, যদি তিনি তীর্থযাত্রা না করে থাকেন, এই পথের জীবন উদ্ঘাটিত করে দেবে নতুন আলোক। ভারতে নারীর স্থান ও নারী-জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কে? এই তীর্থযাত্রা করেছেন নিশ্চয় এমন কেউ নয়। পথে চলতে চলতে দেখি কখনো একাকী, কখনো জোড়ায়, কখনো দশ-বিশ বা তারো বেশী সার-দেওয়া নারীর দলকে, তার মধ্যে তরুণী থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই আছেন। তাঁদের আচরণে ত্রাস বা অহেতুক লজ্জা-সংকোচ নেই। কখনো দেখা যায়, কেউ হয়ত কিছুটা দলছাড়া হয়ে পড়েছেন, হাতে জপমালা নিয়ে মগ্ন হয়ে পথ হাঁটছেন। কখনো আবার এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, তিনি যেন কোনো দলেরই নন—একাকী। কিন্তু প্রায় সবাই আনন্দময়, দেশজ রীতি অনুযায়ী সবাই প্রায় যেহেতু সর্বক্ষণ অলঙ্কার পরে আছেন, মনে হচ্ছে উৎসবের, আনন্দের ছড়ানো পরিবেশ। যাত্রীরা সবাই সবাইকে চেনে। পরিচিত পৃথিবীর আড়ষ্ট ক্ষুদ্রতা এখানে নেই। দেখা হলেই সবাই কথা বলে; নারী হোক, পুরুষ হোক, বলে ওঠে, 'জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়!' কিংবা 'জয়, বদরীবিশাল কি জয়!' প্রতি সম্বোধনের জয়ধ্বনিতে যে মাধুর্য ও আলোকের ঝলক ওঠে তা বর্ণনাতীত।...প্রাচ্য অভিবাদনের সৌকুমার্য লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে। হয়ত কেউ চলেছেন জপমালা ফেরাতে ফেরাতে, হয়ত চান না নিজের মৌনভঙ্গ করতে, এসব ক্ষেত্রে কী না মর্যাদা ও মিষ্টতার সঙ্গে তিনি ঈষৎ নত হয়ে সেই অভিবাদনকে গ্রহণ করেন।...

এক নদীর শুষ্ক খাতের উপরকার সুবৃহৎ প্রস্তরগুলির উপর দিয়ে কঠিন পথ ভেঙে উঠবার সময়ে দুই বৃদ্ধাকে দেখলাম, তাঁরা প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে-পড়া অথর্ব শরীর—বদরীনারায়ণ দর্শন করে তাঁরা নামছেন। ভয়ঙ্কর পথ—

একজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন—আমরা এগিয়ে গেলাম সাহায্যের জন্য। আমাদের শিউরে-ওঠা চীৎকারের উত্তরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন—বিজয়ের আনন্দ তাঁদের ভঙ্গিতে—'সাহায্যের দরকার কি? নারায়ণ কি পথ দেখাচ্ছেন না? তিনি যখন দর্শন দিয়েছেন, এসবে কী এসে যায়?'...

হরিদ্বারে যাদের যাত্রারম্ভ তারা কী সুখী!...চন্দ্রালোকিত রাত্রে যাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে পান্ডাদের সঙ্গে নিয়ে, গান গাইতে গাইতে পথে চলে। আর, আহা, গঙ্গায় সেই সন্ধ্যারতি! ব্রহ্মকুন্ডের অর্ধচন্দ্রাকার সিঁড়ির শেষ ধাপে ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুরোহিত দীপাধার দোলাতে থাকেন, শতদীপ একসঙ্গে জ্বলে, সেটিকে দেখায় ছোট আলোকতরুর মত। তাঁর পিছনে পূজার্থীর দল, প্রধানতঃ নারী তাঁরা; তাঁর সামনে সেতু ও অর্ধচন্দ্রাকার দ্বীপের উপরে যাঁরা বসে-দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের নানা বেশবাস ও আকারে নানা প্রদেশের চিহ্ন ফুটে আছে—সবাই গভীর স্তব্ধ যতক্ষণ পুরোহিতের পূজারতি চলছিল—শেষ হওয়া মাত্র সবাই উত্তাল হয়ে উঠল মন্ত্রগানে। সমবেত সঙ্গীতের তরঙ্গদল আছড়ে পড়তে লাগল ক্রমান্বয়ে, একের উত্তরে যেন আর একটি—গঙ্গার মহিমার অপূর্ব সঙ্গীত। আর দূরে বিস্তৃত হয়ে আছে সবুজ ভূখন্ড, বনরাজিনীল বন্ধুরতা, তার উপরে সদ্য নেমেছে সন্ধ্যার আবছা কুয়াশার অঞ্চল। সমস্ত পরিবেশটিই যেন অপূর্ব এক পূজা।...

কেদারনাথ এখন আট মাইল দূরে। শেষ দিনের পথ ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ শেষ চার মাইল খাড়া চড়াইয়ের অংশটুকু।...জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, কিন্তু ওঠার কষ্টও নিদারুণ। যন্ত্রণাকঠিন সিঁড়ির মত পথ, জীবনযন্ত্রণার মতই—পান্ডা কষ্টহাসির সঙ্গে বললেন—'স্বর্গের সিঁড়ি!' সবই কিন্তু মন থেকে মুছে গেল যখন অবশেষে উচ্চ অধিত্যকায় পেঁছলাম এবং কেদারনাথের এলাকার কাছাকাছি এসেছি অনুভব করলাম। তৃণাচ্ছাদিত বিশাল অধিত্যকা, কুসুমাস্তীর্ণ, মুঘল শিল্পীর আঁকা বেহস্তের ছবির মত। প্রতি পদক্ষেপে যাত্রীদের অতিক্রম করে যাচ্ছি বা আমাদের তাঁরা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। সমবেত ব্যাকুলতার রূপকে ভাষায় ফোটানো সম্ভব নয়। অবশেষে—সেই মুহূর্তটি—দেখা গেছে মন্দির—বুক চিরে যেন আবেগ-ধ্বনি বেরিয়ে এল আমাদের বাহকদলের, অন্যান্য সকলের।...সোমবার পেঁছবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম কারণ শিবের দিনে মন্দিরদর্শন মহাপুণ্যের কাজ। কিন্তু যখন হাজির হলাম দুপুর হয়ে গেছে, সন্ধ্যারতির সময়ের আগে মন্দির খুলবে না। বিকাল গড়িয়ে গেল, পাহাড় থেকে নামল নীলাভ কুয়াশা, ঢেকে দিল সবকিছু; তারই মধ্য দিয়ে, পথের ধারে বসে দেখছি, ধূসর কম্বলে ঢাকা সাধুদের অস্পষ্ট আকারগুলি এপাশ-ওপাশ করছে বন্ধ দ্বারের সামনে। সহসা ডাক দেওয়া হল—আরতি হবে—দেখতে এসো তোমরা! অন্ধকার নেমেছে, কিন্তু কুয়াশা সরে গেছে, তুষার ও তারকা ঝকঝকে উজ্জ্বল। ঝলমলে আলোয় ও ঘন্টারবে পূর্ণ মন্দির—বাইরে থেকে উৎসুক যাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছি। আরতি-দীপের শেষ দোলাটুকু যেমনি থামল—উন্মুখ যাত্রীদের আকুতির ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরে সে কী দৃশ্য! পথ করে দাও! পথ করে দাও! সবাই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে, রুদ্ধশ্বাসে,—ঝুঁকে পড়ছে—স্পর্শ করছে—জড়িয়ে ধরতে চাইছে প্রতীক

পর্বতখণ্ডটিকে। আসছে—আসছে—মানুষ আসছে!...জীবনের পরমতম দৃশ্য দেখলাম—সেখানে সিঁড়ির উপরে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাত্রীতরঙ্গের ধেয়ে যাওয়ার সেই ছবিটুকু! মনে হল সমস্ত ভারতবর্ষ যেন পরম একের সামনে নত-শায়িত—কেদারনাথ যে অদ্বৈতের শিখর। সমস্ত ভারতের সকল স্থান থেকে সকল পথ বেয়ে মানুষ যেন আসছে, কাড়াকাড়ি করে এগিয়ে উঠছে, কেন, কিসের জন্য?—আর কোনো কারণে নয়—ঈশ্বরকে স্পর্শ করবে তারা।...

কেদারে থাকার দ্বিতীয় দিনে এক বৃদ্ধ এলেন দেখলাম, দীর্ঘদিনের অসুস্থ। তিনি দর্শন করলেন। ব্যস্ত হয়ে পূজা শেষ করছেন, পাছে পূজা শেষের আগেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়। সবে পূজা শেষ, এখনো প্রার্থনার শেষ শব্দটি ঠোঁটে কাঁপছে, সাফল্যের সুখাবেশ এখনো জড়িয়ে আছে—তাঁরও যুদ্ধ শেষ! প্রভাতের সোনার আলোয়, বাতাসে, সুদীর্ঘ কয়েকটি নিশ্বাস-ব্যাকুলতায় মুক্ত হয়ে গেল আত্মা। মহাদেবের আশীর্বাদ ভক্তের প্রতি—এমনই করুণার স্পর্শ তাঁর আত্মজনের উপরে!”

মিসেস ওলি বুলের দেহান্ত থেকে নিবেদিতার দেহান্ত

মিসেস বুলের শেষ দিনগুলি

মিসেস বুলের জীবনচিত্র দেবার সময়ে বলে এসেছি—এঁর কাছ থেকে নিবেদিতা পার্থিব জীবনে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছেন, জীবনের মর্মান্তিক আঘাতও এঁর সূত্রেই পাওয়া। পাঠকদের মনে থাকতে পারে—নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন তিক্ত বিষাদের সংগে বলেছিলেন—ওলিয়ার (মিসেস বুলের কন্যা) ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই নিবেদিতার জীবনাবসান। এ কাহিনী বেদনাময়, তবু উন্মোচন করছি জীবননাট্যের প্রয়োজনে। “যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়, হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান”—স্বামীজীর এই কথাগুলির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্বয়ং স্বামীজী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী নিবেদিতা।

ওলি বুলের গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা সোজা দার্জিলিঙ থেকে বস্টনে যাত্রা করে সেখানে পেঁাছান ১৫ নভেম্বর। অসুখের সংবাদ তিনি আগে থেকেই পাচ্ছিলেন। ২৫ নভেম্বর, ১৯০৯-এর এক চিঠিতে ম্যাকলাউডকে লেখেন—“সেন্ট সারা আমাকে এক শান্ত মধুর চিঠিতে লিখেছেন—তিনি সম্ভবতঃ আগামী শরৎকালের আগে এখানে (ভারতে) আসছেন না। তা ভালই। শুধু আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি পীড়িত এবং গুরুতর কিছু ঘটার বিপদ রয়েছে। ওঃ য়ুম, তা কী ভয়াবহ হবে! এত জনকে সাহায্য করে এগিয়ে দেবার পরে তাঁকে একই দারুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে! কী ভয়াবহ!!!...ভাবতেও শিউরে উঠি! কিন্তু যদি তিনি চান তাহলে খুশী হয়ে তাঁর কাছে হাজির হব। ও-ধরনের কিছু শুনলে তুমি নিশ্চয় আমাকে জানাবে, কি বলো?”

১১ জানুয়ারী, ১৯১০-এর এক চিঠিতে ডঃ চেনীকে জানিয়েছিলেন—“মিসেস ওলি বুল তাঁর কেমব্রিজ (ম্যাসাচুসেটস্) ভবনে আছেন। তিনি আমায় লিখেছেন,

নিজের বাড়িতে আগুনের পাশে বসে বড় আরামের শীত কাটাচ্ছেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা, তাঁর শরীর নিতান্ত কৃশ-দুর্বল। তাছাড়া তিনি তো আরাম, শান্তি ও নীরবতায় তৃপ্ত থাকতে পারবেন না!" ১৭ মার্চ ম্যাকলাউডকে লেখেন—"সেন্ট সারার চিঠি কিছুদিন ধরে অশুভসূচক হয়ে উঠছে। অবশেষে খোকা তার করল। উত্তর এল—"সন্তোষজনকভাবে আরোগ্য ঘটছে।" এখনো কিন্তু জানি না ওঁর কোনো ভয়ঙ্কর অপারেশন হয়েছিল কি না! তবে তাই মনে হচ্ছে। যদি হয়, তিনি তাঁর আরামের আশ্রয়ে থেকে আরোগ্যলাভ করছেন, এটা খুবই স্বস্তির বিষয়। যদি এখানে থাকতেন, দায়িত্ব হত নিদারুণ।" ২৫ মে, ম্যাকলাউডকে—"বড় আশা করি সেন্ট সারা গুরুতর অসুস্থ নন। দুশ্চিন্তার কারণ ঘটা মাত্র তাঁকে হারালাম, এর থেকে ভয়ঙ্কর কী হতে পারে!" বড় উদ্বেগে ৭ জুলাই ম্যাকলাউডকে প্রশ্ন করে পাঠালেন—" 'সারার জীবনের শেষ' লিখেছ কেন? নিশ্চয় তুমি বলতে চাইছ না তাঁর জীবনান্ত হতে যাচ্ছে!"

৪ অগস্ট ১৯১০ একই জনকে—"কিভাবে না বিশ্বাস করতে চাই যে, সারার আরও বহু বহু বছর জীবন অবশিষ্ট আছে! বেচারা, বেচারা সারা! তাঁকে কিছুতে মরতে দিতে পারি না। উপরের ঢেউয়ের নীচে গভীর তলদেশে মানুষের জন্য মানুষের কতখানি না ভালবাসা থেকে যায়!" ১১ অগস্ট, একই জনকে—"সারার জন্য আমাদের উদ্বেগের সীমা নেই। আশঙ্কার যথার্থ হেতু নেই, মনে করতে চাইছি বিশেষভাবে।" এরপরে এক চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন তাঁরা পরবর্তী মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর দার্জিলিঙ চলেছেন, এবং "সেন্ট সারার বিষয়ে একটু আশান্বিত বোধ করছি; মনে হচ্ছে, তাঁর অবস্থা কিছু ভাল।"

নিবেদিতার বৃথা আশা। সারার উদ্বেগজনক অবস্থার কথা টেলিগ্রাম করে ক্রিস্টিন জানালেন, এবং অবিলম্বে তিনি ছুটলেন। ১৪ অক্টোবর ১৯১০, যাত্রাপথে কলম্বো থেকে ম্যাকলাউডকে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে সারার জন্য মনোবেদনার সঙ্গে আর একটি আশঙ্কার ছায়াপাত হয়েছে—ভারতে আর কি তিনি ফিরতে পারবেন? নিবেদিতার ভয় ছিল, হয়ত ভারত সরকার তাঁর ভারতে ফেরা নিষিদ্ধ করে দেবেন।—

"মারাত্মক বিপদের সময়ে কিভাবে না তোমার দ্বারস্থ হতে হয় সকলকে! তোমার পছন্দমত কোনো 'সাইকিক'কে জিজ্ঞাসা করবে—অবশ্যই কাউকে না কাউকে জিজ্ঞাসা করবে যে,—এই কি আমার শেষবারের মত ভারতত্যাগ, কিংবা আবার কখনো খোকাকে দেখতে পাব এবং তার সঙ্গে থেকে কাজ করতে পারব? ক্রিস্টিন টেলিগ্রাম করেছিল : 'Await you here Sara accepts'; তার অর্থ আমরা বুঝলাম, সারার পাশে আমি যাই, সারা তাই চাইছেন। সুতরাং আমি কার্যতঃ দু'-একদিনের মধ্যেই যাত্রা করলাম। কিন্তু—বলো—আমি ফিরব তো? ভবিষ্যতে আছে কি? ১৬ তারিখে নেপলস্ অভিমুখে নর্থ জার্মান মেল ডিফ্লিন্জারে যাত্রা করব; ১৬ নভেম্বরে কুনারডার কাসপাথিয়া করে নিউইয়র্কে পৌঁছবার কথা। সুতরাং ১৭ই সারার কাছে পৌঁছচ্ছি।

ওঃ য়ুম, দুঃখসাগর! (পত্র এখানে খণ্ডিত)...

সারা নিঃসঙ্গ—নচেৎ হয়ত আসল বিপদ কিছু নেই! সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হচ্ছি না। প্রিয় য়ুম, তাঁকে যে নিরাময় **হতেই হবে!** আমরা তাঁর সম্বন্ধে বিরক্ত হতে পারি, বিদ্রোহ করতে পারি, কিন্তু জীবনের কী অর্থ, যদি এইসব কঠিন শক্তির সঙ্গে সংঘাত না থাকবে! ভারত থেকে ঔষধ এবং ব্যবস্থাপত্র পাঠানো হয়েছে; যদিও সারার খুবই নিঃঝুম অবস্থা, তবু মনে হয়, ঐসবের ফল ভাল হবে।

প্রিয় সদানন্দ (যিনি রোগশয্যায়) এখনো জানেন না কি হয়েছে, কারণ আমি সোজা দার্জিলিঙ থেকে চলে এসেছি। আমি চাই যে, এসব জিনিস যতদিন সম্ভব তাঁর কাছ থেকে ঢেকে রাখা হোক।"

সারার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে নিবেদিতা কি দেখেছিলেন, কতকগুলি চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যায়। অনেকগুলি চিঠিই খণ্ডিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, বেশী বেদনাদায়ক বর্ণনার অংশ ম্যাকলাউড ছিঁড়ে ফেলে তবে চিঠি হস্তান্তর করেছিলেন। আমরা তেমন কয়েকটি চিঠি থেকে অংশ তুলে দিচ্ছি :

৪ ডিসেম্বর ১৯১০ ম্যাকলাউডকে—"এই চিঠি পাবার অনেক আগেই ক্রিস্টিন তোমার কাছে চলে যাচ্ছে। গত বুধবারে আমি তাকে ম্যারিটানিয়া জাহাজে বিদায় জানিয়েছি। মনে হচ্ছে সারা এখন ভালর দিকে। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমেরিকায় গুপ্ত রহস্যবাদীদের মধ্যে যত সব শয়তানী ধারণা। তাদের পাল্লায় পড়লে মাথা ঠিক রাখা অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। মনে হয়, যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিতে পারলে সারা ক্রমে আরোগ্যলাভ করবেন। তবে কতকগুলি বিষয়ে তিনি নিতান্ত বেয়াড়া। তাঁর থেকে জোরের সঙ্গে অসঙ্গত দাবি করতে আর কোথাও দেখিনি। তবু সীমাবদ্ধ সেগুলি, এবং ঊর্ধ্বতর আকর্ষণে সাড়া দিতে পারেন অপূর্বভাবে। সম্ভবতঃ তাঁর সবচেয়ে মন্দ দোষ—নিজ ইচ্ছাকেই চরম ভাবা—তার জন্য অবিরত তিনি নিজ শক্তি ব্যয় করেন, সংরক্ষণ করেন না—আরোগ্যের জন্য যা করার প্রয়োজন ছিল। খুব আদর্শ অবস্থা নিশ্চয় নয়, কিন্তু ধৈর্য ছাড়া পথ খোলা নেই। আর আমাকে যে বাস্তব সেবা করতে হয় না তার জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞ। তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণাই আছে, আমার সময় উৎসর্গীকৃত। সেজন্য সবচেয়ে সতেজ মধুর মন নিয়ে আমি তাঁর কাছে যেতে পারি।"

৭ ডিসেম্বর ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"এখনো সূর্যোদয় হয়নি। চারদিক বরফে ঢাকা। চা আসার পূর্ব পর্যন্ত বহুক্ষণ শুয়ে থেকেছি, প্রার্থনা করেছি—আমরা **সবাই** যেন আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে ক্ষুদ্র গোপন স্থান রক্ষা করি, যে-স্থানটিতে আমরা তাঁর সঙ্গে মিলতে পারি, বেড়ে উঠতে পারি অব্যাহতভাবে, কোনো হিপ্‌নোটিজমের বা প্রভাবের বশবর্তী না হয়ে। এ আমার ন্যায়সঙ্গত বাসনা আমি জানি, কারণ স্বামীজী এই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিলেন, এবং একে তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্বস্ব করে তুলেছিলেন। সেই ঠাঁইটুকুর বাইরে অনেকের সঙ্গেই তিনি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতেন, নিজের সীমান্তের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি দৃক্‌পাত করতেন, কিন্তু যদি প্রত্যেকের ঐ নিজস্ব ভূখণ্ডে অনধিকার প্রবেশের কোনো চেষ্টা কোনো পক্ষে কখনো দেখেছেন, সহ্য করেননি কোনোমতে। এই অন্তরখণ্ডটির অস্পৃষ্ট থাকাকেই তিনি বলতেন স্বাধীনতা।

আমাদের এই স্বাধীনতায়—যত ক্ষুদ্রই হোক না তার আকার—আমরা যেন তার মধ্যে অখণ্ড স্বরূপে থাকতে পারি! ক্রমেই যেন সৎ ও অসতের পার্থক্য করতে পারি অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে!...

যারা প্রার্থনায় বিশ্বাস করে না তাদের ব্যস্ত করার দরকার নেই। কিন্তু যারা করে—জর্জ, অ্যালবার্টা, স্পেনস্, যে-কেউ—তারা যেন সেণ্ট সারার জন্য প্রার্থনা করে, যাতে তিনি এই মহাবিপদের ক্ষণে তাঁর আত্মবোধ ফিরে পান, সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

এসব কথা তাদের অবশ্য বলো না। এসব কিছুই তুমি, আমি, খোকা ও ক্রিস্টিনের মধ্যে থাকবে।...

আর করুণা করে আমার জন্য প্রার্থনা করো তোমরা সকলে, যাতে আমি প্রেমময়, ধৈর্যময়, গভীর আত্মসমাহিত মৌনের মধ্যে অবস্থান করতে পারি। ওঃ য়ুম, আমি এত আতঙ্কিত!...প্রেম, ধৈর্য, আত্মসংযম—ভুলো না আমার এইসব প্রয়োজনের কথা।"

৯ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে পুনশ্চ লিখলেন—

"মনে হয় সেণ্ট সারার বিচিত্র সব ধারণা এবং মিসেস ব্রিগসের প্রভাব সম্বন্ধে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছি।...মিসেস এইচ-এর ধারণাই বোধ হয় ঠিক, মৃত্যুর বা উন্মত্ততার আশঙ্কা হয়ত সত্যই নেই। আমি মাথা ঠিক রাখতে চাইছি। একই সঙ্গে অভিজ্ঞতা কিন্তু অতি বাস্তব এবং সমাচ্ছন্ন বিভীষিকা। মোট ফল, সেই স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি—'এই মায়াজাল ছিঁড়ে ফেল—মুক্তি খোঁজো।' তারা যেভাবে পারুক নিজেদের ব্যবস্থা করুক, তাদের 'সাইকিক' প্রভাবগুলি নিজেরা লড়াই করে সিদ্ধান্ত করুক, কিন্তু ত্রাণ আছে একটি ক্ষেত্রেই—**মুক্তিতে**। একটি উপায়েই সাহায্য করা সম্ভব—এই মুক্তিলাভ করে।"

২৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ পত্র ম্যাকলাউডকে একই বিষয়ে—

"(সারার কথা লিখে) তোমাকে ভয়ানক যাতনা দিয়েছি—তার জন্য দুঃখিত। সহজ স্নিগ্ধ প্রভাবের মধ্যে সারার অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে, যত ধীরেই হোক, এবং বোধহয় পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে দেখা এখন সম্ভব। অধিকন্তু, লোকজন সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলেছেন।...যে ভাব নিয়ে তোমাকে গোড়ায় লিখেছিলাম তা জঘন্য মনে হচ্ছে—সম্ভবতঃ তা মিথ্যাই। ভালবাসা ও সরলতায় তিনি যে সাড়া দিচ্ছেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, আমি যে রোগনির্ণয় করেছিলাম, তা সম্পূর্ণ ভুল নয়। অন্ততঃ মিসেস ওয়ালডেনের সতর্কবাণীকে সত্য-প্রমাণ করবার মত যথার্থ।

প্রিয় মিসেস হেলিজ বললেন—'তাঁকে অর্থ দান করতে প্রণোদিত কর—এই বন্ধন মোচন কর।' ঠিক এই পথেই আমি দু' একটি নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছি। এর ফল ভালই হবে মনে হয়।...

মনে পড়ল সেই **অসাধারণ** অহমিকা, ডাইনিতন্ত্রে বিশ্বাস, সমালোচনার ও নিন্দার প্রবৃত্তি, গ্রীষ্মকালে ক্রিস্টিনকে সরিয়ে দেওয়া, যা ক্রিস্টিনের পক্ষে উত্তম, তবু নিজে কি ঝুঁকিই নিয়েছিলেন।...

যাই হোক য়ুম, মিসেস হেলিজের সিদ্ধান্ত হল—এক মুহূর্তের নোটিসে চলে যাবার জন্য তৈরী থেকো। আমি প্রস্তুত। থাকার সময় আমি কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িয়ে যাচ্ছি মাত্র। তবু, এই সংগ্রামক্ষেত্রের তলদেশে দুঃখী, আশঙ্কাতুর, মহান ও উদার হৃদয় রয়েছে, যা মানুষের জন্য এত কিছু বিরাট জিনিস করেছে, শতগুণে যা ফিরে আসা উচিত তাঁর কাছে। আর আমার পরম সৌভাগ্য, এই কাজে, বিশুদ্ধ প্রেম ও কৃতজ্ঞতার প্রয়াসে, আমি স্বামীজীর হাতের যন্ত্র হতে পেরেছি। অগস্ট মাসে সিরি যখন সারার কাছে এসেছিলেন, তখন সারা বলেন, তিনি সদ্য ভাবতে শুরু করেছেন যে 'তিনি ভালবাসতে পারেন এমন আর কিছু অবশিষ্ট নেই।'... বেচারা, বেচারা!...কিন্তু ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি, খোকা না থাকলে ক্রিস্টিনের মতই আমার অবস্থা হত—কোনো প্রভাবই থাকত না। কখনো কখনো নার্ভাস হয়ে পড়েছি, যেমন হতাম ১৯০৮ সালে।

...যথার্থই দেখতে পাচ্ছি বন্ধুত্ব একটা বন্ধন। মুক্তির সন্ধানই অন্যের কাছে প্রাণরস এনে দেয়। যখন আমরা নিছক ভাল করতে চাই তখন ক্ষতি করি, বোধহয়, কে জানে!

হ্যাঁ, সেণ্ট সারার জন্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় করো, তাকে সত্যই ভালবাসো, তার উপর যথার্থ বিশ্বাস রাখো, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে তাকে দেখো, কিংবা সেইসঙ্গে শ্রীমার অনুধ্যান জুড়ে দিও।* এই নিঃসঙ্গ আত্মার উগ্র সরব আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র এইগুলি প্রয়োগেই সাহস করতে পারি। কিন্তু সে সত্যই ভালবাসে, ভালবাসা চায়! কী বেদনা! সে যা চায়, ভাল বা মন্দ, সব কিছু করতে তাকে সাহায্য করব, যদি সত্যই নিশ্চিত বুঝতে পারি তা যথার্থই তার ইচ্ছা। শিব! শিব!

ভালবাসার সমুদ্র তোমার জন্য। অবশ্যই ভালো হয়ে ওঠো তুমি এবং ৯০ বছর পর্যন্ত বাঁচো, নচেৎ দুঃখে আমার মৃত্যু হবে।"

যেসব পত্রের অংশ উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে বোঝা যায় জীবনের শেষ পর্বে সেণ্ট সারার বিচিত্র পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত বিচারবুদ্ধি, বিরাট অহমিকা ও নিন্দাপ্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং মিস্টিক জীবনের প্রতি আসক্তি গিয়ে পৌঁছায় 'ডাইনিতন্ত্রে' বিশ্বাসে। এই পরিবর্তনের সূচনা নিবেদিতা ১৯০৮ সাল থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। তারপরে, কোনো এক বন্ধুর প্রভাবে, যাঁর নাম কি আমরা বলতে পারব না, মিসেস বুল অশরীরী প্রেতচ্ছায়া দেখতে আরম্ভ করেন এবং অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন থাকেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। বদান্যতাই যাঁর স্বভাবধর্ম, তিনি কৃপণের লোলুপ আতঙ্কে টাকাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছিলেন। ক্রিস্টিনকে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই, এবং লিজেল রেম'র জীবনীতে আছে, নিজ কন্যা ওলিয়াকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন ও পুত্ররূপে যাঁকে গ্রহণ করেছিলেন সেই জগদীশচন্দ্রকেও পরিহার

* স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, শ্রীমাকে লেখা নিবেদিতার অপরূপ চিঠিখানি, যার মধ্যে আছে, সারার জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে শ্রীমাকে মেরীর মতই মনে হয়েছিল তাঁর, সেই চিঠিখানি কয়েকদিন আগে, ১১ ডিসেম্বর নিবেদিতা লিখেছিলেন।

করেছিলেন। নিবেদিতার কাছে এই অবস্থা অসহনীয়। কেবল 'মিসেস বুলের' পরিবর্তনের ব্যাপার যদি হোত, নিবেদিতা ব্যস্ত হতেন না, কিন্তু এ যে স্বামীজীর 'ধীরা মাতার', 'সেন্ট সারার' অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের লৌকিক মনস্তত্ত্ব আমরা অনুমান করতে পারি—কিন্তু আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের মীমাংসা আমাদের সাধ্যাতীত। এবং অধ্যাত্মরহস্যসন্ধানীদের কাছে পরম 'আধ্যাত্মিক' সেন্ট সারার এই পরিবর্তনের হেতু অবশ্যই মনোযোগের বিষয় হবে। নিবেদিতা যৎপরোনাস্তি মর্ম-পীড়িত হয়েছিলেন। সারার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনাই তাঁর প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য তিনি দুইভাবে চেষ্টা করলেন, সারাকে আবার তাঁর মাতৃত্বের হারানো অনুভূতি ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, অপরদিকে চাইলেন, মুক্তির আধ্যাত্মিক চেতনা, যা বিবেকানন্দের মহাদান, তারই স্মৃতি যেন সারার অন্তর্লোকে প্রত্যাবর্তন করে।

নিবেদিতা যাওয়া মাত্র তাঁকে অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত সারা আঁকড়ে ধরেছিলেন। সেবায় শুশ্রূষায় তিনি অনেকটা সুস্থ হলেন কিছুদিনের মধ্যে। মনের সহজ অবস্থা খানিক ফিরলে ওলিয়া ও জগদীশচন্দ্রকে—সারা সচেতনভাবে যাঁদের বিতাড়িত করেছেন, কিন্তু আচ্ছন্ন চৈতন্যে যাঁদের তীব্রভাবে কামনা করছেন—এই দুটি মানুষের কথা সারার মনে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন তিনি। সারাকে দান করবার জন্য প্রণোদিত করলেন—যেহেতু তাই ছিল সারার সহজ স্বভাব। আর ভরিয়ে দিলেন, ধুইয়ে দিলেন তাঁর মনপ্রাণ সত্য আধ্যাত্মিকতার নির্মল আলোকে। সারার জীবনাবসান হল—শেষ ক্ষণে পুরাতন—চিরন্তন—স্বরূপের স্পর্শ পেয়ে। নিবেদিতার সেই অসাধারণ প্রয়াস—যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবাণবিদ্ধ সহযোদ্ধাকে শত্রুর আক্রমণ এড়িয়ে মহাবীর বহন করে আনছেন স্বভূমিতে!—হাঁ, অসাধারণ সন্দেহ নেই।

২৮ ডিসেম্বর ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"সেন্ট সারা সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যান্ডে কাটাবার পরিকল্পনা করছেন। তারপরে যদি যথেষ্ট শক্তি পান, ফরাসী জাহাজে ভারতে যাবেন এবং চন্দননগরে বাড়ি ও নৌকা নেবেন।...

সারার বিষয়ে আমি কেবল প্রার্থনা করছি, কোনো 'চিকিৎসা' নয়।...আমি শুধু প্রার্থনা করছি ভালবাসার জন্য—অন্তরে বাহিরে শুধু ভালবাসা—ভালবাসা দাও, নাও, অনুভব করো। অনন্ত ভালবাসার তরঙ্গ—ভেসে যাক বন্দরের বন্ধন, ছিঁড়ে যাক জাহাজের নোঙর, তাই তাই তাই চাই।...তার প্রয়োজন তার বিরাট প্রকৃতির পুনর্বাসন—ভালবাসা—শুধু ভালবাসা—স্বার্থবোধ না রেখে ভালবাসা। শেষের দিকে কয়েক বছর যেন সে চাবিটি হারিয়ে ফেলেছিল।"*

১ জানুয়ারী ১৯১১, ম্যাকলাউডকে—"প্রিয় যুম, কাশ্মীরে আমাদের সেই বিরাট বৎসরটি—তা কী গভীর ও নিত্য বর্তমান! মুখে মুখে বলে চিঠি লেখানোর

* সারার পুরনো প্রকৃতি পরিবর্তনের মধ্যেও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। ৯ ডিসেম্বর, ১৯০৯ তারিখে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন—"সেন্ট সারার শেষ চিঠিতে পেয়েছি—তিনি রিজলিতে কয়েকদিন কাটাবেন বলে ভাবছেন। আহা, আমার বড় আশা, তাই যেন হয়! তাহলে মনে হবে—সকলের মাঝখানে স্বামীজী বুঝি এখনি পা ফেলে চলে আসবেন!"

ক্লান্তিকর চেষ্টার জন্য অপেক্ষা না করে সেণ্ট সারা এখনি তাঁর হয়ে আমাকে তোমার কাছে লিখতে বললেন। আজ সকালে বড় মুহ্যমান ও দুর্বল তিনি। ডাক্তারদের চিকিৎসাবিধানের একটা ব্যাপারের জন্য রাত্রি অস্থিরতায় কেটেছে। কিন্তু গত রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ভারতরঙ্গ অনুভব করে তবে বিদায় নিয়েছিলাম। আজ সকালে তিনি আমাকে কুণ্ঠিতভাবে সেই অপূর্ব রাত্রিটির কথা বললেন, যখন এডউইনা মারা গিয়েছিল, তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্যে ছিলেন ; তাঁর জন্য কি করেছেন, কি বলেছেন, সব কিছুর কথাই আমাকে জানালেন ; অপূর্ব তা, সে-ই তাঁর জীবনের মূল সুর। নিজে থেকে বললেন—অতঃপর নতুন জীবন তাঁর। তাঁর বিচারবুদ্ধি অন্য কাউকে নিন্দিত করতে নয়, কেবল নিজেকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে প্রযুক্ত হবে। প্রিয় য়ুম, দেখ কেমন ধীরে ধীরে মেঘ সরে যাচ্ছে! সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে হৃদয়! জানলা খুলে দিয়েছি, তারপর চলে এসেছি—ও যেন তাঁর জীবনের সংকট-সন্ধির ক্ষণ। শান্তি নেমেছে আমার মনে। আমি বুঝেছি, এই শারীরিক দুর্বলতার মধ্যে হয় তাঁর আত্মা মুক্তি পাবে, নচেৎ প্রাণশক্তিপূর্ণ নতুন জীবন সত্যই আরম্ভ হবে, যা তাঁকে সর্বদা যে রকম ছিলেন আবার তেমনই দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে। আমি কোনো একটি সম্ভাবনাকে সনিশ্চিত বলে ধরছি না, কারণ দুটোই নিম্নমুখী, শুধু অনুভব করব যে, স্বামীজীর চরিত্র ও অভিপ্রায়ের গঙ্গাপ্রবাহ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাসাগরের দিকে। অনন্তের সেই মহাতরঙ্গের তুলনায় আমাদের জীবন বা আমাদের মৃত্যু—কী মূল্য তাদের! তুমি এখানেই আছ, সুতরাং আমরা কথা বলতে—বলতে—বলতে পারি! কত কি দেখছি, বুঝছি আমি!

সেণ্ট সারা তোমাদের সকলের বিষয়ে বড় মধুর ভালবাসাভরা কথা বলেছেন।...

ওঃ য়ুম, যে আত্মা সত্যই মহান ও আলোকিত তার পক্ষেই এইভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব। ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলি আবার আসবে, অবশ্যই, কিন্তু মনে হয় তাদের সংখ্যা কমে যাবে, এবং স্বাস্থ্য ফিরলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রথমে খুব ধীরে সন্তর্পণে, তারপরে আরও স্পষ্টভাবে কাশ্মীরের বৎসরটির পুরানো অপূর্ব সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। মাতৃত্বের জন্য তীব্র বাসনা, ওলিয়ার মধ্যে যা মূর্তিমতী, সারার মধ্যেও তাই রয়েছে ; কেবল সেইসঙ্গে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো চাই, স্বামীজীকে আবার শিশু ভগবানরূপে ('হোলি চাইল্ড্') দেখার ক্ষমতা ফিরে পেতে হবে। এখন তিনি তা 'দেখতে' পাচ্ছেন মনে হয় না, কিন্তু বুঝতে পারছি, তাঁর হৃদয়ে রয়েছে সেই অনুভব।...

(রাত্রে)। তিনি এখন অনেক অনেক ভালো। একসঙ্গে সারাদিন, সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কাটাবার পরে বিদায় নিয়েছি। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন তোমায় তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাই।"

১৬ জানুয়ারী, ডঃ চেনীকে—[ডঃ চেনী 'দি মাস্টার' বইটির উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে] "মিসেস বুল খুবই অসুস্থ। তাহলেও আপনাকে গভীর শুভেচ্ছা ও অনন্ত ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেননি। যদি কোনো কিছু আমার সাফল্য বলে তিনি মনে করেন, তাহলে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং অপরিসীম গর্বিত হন। (হিবার্ট জার্নালে) আপনার আলোচনাটির সূত্রে তিনি প্রায় একটি উৎসব

খাড়া করে ফেলেছিলেন—তাঁর ঘরের ফুলগুলির মধ্যে একটি উৎসর্গিত হয়েছিল 'প্রিয় ডাঃ চেনীর পক্ষে।' "

১৮ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে—"শোকসংবাদ ইতিমধ্যেই তোমাকে তার করে দেওয়া হয়েছে। গতকাল কী উজ্জ্বল দিন কাটিয়েছিলেন! প্রদীপ নেভার আগে শেষ উজ্জ্বলতা। আজ সকাল ৫টায় অল্প তিনটি গোঙানি—সে-ই হল সংকেত। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে ছিলাম, ৮টায় তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত। মিঃ থর্প, ওলিয়া, ডাক্তার—সকলেই এখানে ছিলেন। তাঁদের আসার আগে, যখন হয়ত সজ্ঞান তিনি, আমি মন্ত্রোচ্চারণ করলাম—'হরি ওঁ! রামকৃষ্ণ! ওঁ শান্তি!' শেষ যখন, আমরা খ্রীস্টীয় আশীর্বচন পাঠ করলাম—আত্মা নির্গত হয়ে গেল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবই মঙ্গল। আমি জানতাম তিনি চলে গেলেন স্বামীজীর সান্নিধ্যে—একেবারে সরাসরি। গতকাল তিনি চাপাস্বরে বলেছিলেন, আমি এখনো আমার ডেস্কের উপরে স্বামীজীকে এনে রাখিনি। তিনি বলেছিলেন—'যিনি বীর।' বুঝেছিলাম তিনি **বুদ্ধের** কথা বলতে চাইছেন। তিনি বলেছিলেন—'এ পর্যন্ত সে মূর্তি দেখিনি।' আমি উত্তর দিলাম, 'প্রিয় আমার, তুমি কাল সকালেই তা দেখবে!' অন্যভাবে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ যে ভাবেই হোক আমি একটা কিছু তাঁর জন্য করছিলাম, যা সন্তুষ্ট করেছিল তাঁকে। কত ক্লান্ত ছিলেন! এখন তিনি দেখছেন—স্বামীজীকে বুদ্ধরূপে!"

মিসেস বুলের উইলের মামলা

নিবেদিতার জীবনে চরম দুঃখদিন এল এর পরেই। মিসেস ওলি বুলের উইলে দেখা গেল—জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এবং ভারতে নারীশিক্ষার জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উইলের অধিকার নেবার জন্য শোকগ্রস্ত নিবেদিতাকে অপেক্ষা করতে হল, কারণ ওলি বুলই পূর্বাবধি তাঁর কাজের প্রধান সাহায্যদাত্রী, এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখবার জন্য ব্যয়বহনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতীয় কাজের জন্য মিসেস বুলের টাকা নেওয়ার ব্যাপারে নিবেদিতা নৈতিক সংকোচ বোধ করতেন না, যেহেতু তিনি মনে করতেন স্বামীজী তাঁর কর্মের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন দু'-জনের উপরে; ওলি বুলের উপরে সংস্থানের দায় এবং নিবেদিতার উপরে আন্দোলন চালানোর দায়।

এইবার, উইলের বিধান জানবার পরে, মিসেস বুলের মানসিকভাবে অসুস্থ কন্যা ওলিয়া হিংস্র হয়ে উঠল। মাকে সারা জীবন তিলে তিলে দগ্ধ করেছে যে-মেয়ে, মায়ের অবর্তমানে তাঁর পরম বান্ধবীর উপরে সে গরল ঢেলে দিল। ওলি বুলের এত টাকা কেন ভারতবর্ষে যাবে? নিবেদিতা কোন্ উদ্দেশ্যে দূর ভারতবর্ষ থেকে ছুটে এসেছে? নিবেদিতা কী খাইয়েছে মাকে—তা কি বিষ নয়? নিবেদিতা ওলি বুলের যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য কিছু কবিরাজী ওষুধ খাইয়েছিলেন। সে জিনিস ওলিয়ার ও তাঁর প্ররোচক বন্ধুদের প্রচারে বিষ হয়ে দাঁড়াল। উইলের মামলা আরম্ভ হয়ে গেল।

এতখানি লাঞ্ছনার জন্য নিবেদিতা প্রস্তুত ছিলেন না। প্রেম, পবিত্রতা, শক্তি ও ত্যাগ যাঁর প্রতি নিঃশ্বাসে, তাঁর বিরুদ্ধে ঐ অপবাদ তাঁকে একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছিল। অন্তর্যাতনা এমনই নিদারুণ হয়েছিল যে, এই ঘটনার পরে যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরাই শিউরে উঠেছিলেন। একেবারে বুড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি—দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছিল যেন—তাঁর বোন সেকথা বলেছেন। নিবেদিতার মত আধ্যাত্মিক স্বভাবের মহিলা স্বতঃই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন—কোন্ পাপের দংশনে এতখানি জ্বালা তাঁর! লিজেল রেম'র নিবেদিতা-জীবনীতে সে উত্তর আছে।—

"হঠাৎ নিবেদিতা সব বুঝতে পারেন। শিব! শিব! কোন্ কালীদহ থেকে বিষয়-বাসনার কাল-নাগ ফুঁসে উঠেছে ঈশ্বর-ভক্তদের গ্রস্ত করতে, তা জানলেন। মুমূর্ষু নারীর স্মৃতিতে বিস্মৃত-সন্তান জগদীশকে ফিরিয়ে এনে, তাঁর শয্যাপার্শ্বে কন্যাকে পৌঁছে দিয়ে তিনি নিজে কি পথ খুলে দেননি? ওলিয়ার সঙ্গে তার মায়ের একটা বোঝাপড়া হোক, এ বাসনা তো তাঁর হয়েছিল। আর তাঁর জীবনের সবচেয়ে গর্বভরা উচ্চাশার পরিতৃপ্তি—ধীরামাতার ধর্মপুত্র জগদীশ বসুর কর্মজীবনের সাফল্য ঘটাতে তো তিনি আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়েছিলেন। তাই তো আঘাত নামল।"

নিবেদিতার সমস্ত মন এর পরে ভরে থাকবে প্রস্থানগানে। এই সময় থেকে নিবেদিতার মৃত্যুকালের কিছু পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পত্রধারার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করব। দেখা যাবে, এই কালে তিনি কাজ করেছেন, জগদীশ বসুর বিজ্ঞানের এবং নিজের লেখার কাজ, কিন্তু কোনো কাজেই তাঁর টান নেই, বারবার ফিরে গেছেন নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক ক্ষণটিতে—কাশ্মীরে কাটানো অপূর্ব বৎসরটির ধ্যানে।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, সেপ্টেম্বর, ১৯১১ পর্যন্ত

মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে ডঃ বসুর জন্য ওলি বুলের সাহায্যের একটা রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের এক চিঠিতে নিবেদিতা ওলি বুলকে লিখেছেন—

"তুমি তো জানো, স্কুল যথার্থতঃ তোমারই; আমার লেখাগুলিও তাই; **বিজ্ঞানের বইগুলিও তোমারই, এবং ল্যাবরেটরী তোমারই হবে।"**

(আত্মপ্রাণাকৃত জীবনী)

এখানে জানানো উচিত, নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রথমাবধি মাসিক দুশো টাকা করে মিসেস বুলের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে, যা নিবেদিতার দেহত্যাগের পরেও অব্যাহত ছিল। মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, মিসেস বুলের ভাই মিঃ থর্প পরেও বহু-দিন অবধি বাৎসরিক দুশো পাউন্ড বিদ্যালয়ে সাহায্য পাঠাতেন, যার দ্বারা, বিদ্যালয়ের ১৯১৯-২২ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিদ্যালয়ের 'অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।' নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রকাশিত নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে বিদ্যালয়ের ১৯১৯-২২-এর রিপোর্টের যে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে আছে—"এই ঘটনার (মিসেস বুলের মৃত্যুর) কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সম্পত্তি

হইতে আমরা এককালে যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহাই বিদ্যালয়ের চিরস্থায়ী তহবিলের মূল ভিত্তিস্বরূপ।"

নিবেদিতার লেখাগুলি কেন ওলি বুলের, তার স্পষ্ট কারণ বুঝতে পারছি না। ওলি বুলের টাকায় নিবেদিতার বই ছাপা হয়েছিল (যা ঠিক নয় বলেই মনে হয়) বলেই কি নিবেদিতা একথা বলেছেন, কিংবা ওলি বুল নিবেদিতার জীবনযাত্রার ব্যয়ভার অধিকাংশে বহন করতেন বলেই (যে-কারণটা অধিক গ্রাহ্য) ঐ স্বীকারোক্তি? সম্পূর্ণ উত্তর আমরা দিতে পারব না।

বিজ্ঞানের বইগুলি কেন ওলি বুলের, নিবেদিতার ও ওলি বুলের চিঠি থেকে তার কারণ আগেই জেনেছি। বইগুলি ছাপার টাকা মিসেস বুল দিয়েছিলেন, এবং বইগুলি এভাবে লেখা সম্ভব হয়েছিল ডঃ বসুর সঙ্গে কার্যকালে নিবেদিতার জীবনধারণের ভার ওলি বুল গ্রহণ করেছিলেন বলে। এ-ছাড়া ডঃ বসু ওলি বুলের কাছ থেকে আরও কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য এইকালে পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারব না, পেয়েছিলেন অবশ্যই, এবং সেই সঙ্গে জানি, মিসেস বুলের আতিথ্য উন্মুক্ত ছিল সর্বদা এবং তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয় ছিল সামাজিক প্রতিপত্তি।

নিবেদিতা বলেছেন ডঃ বসুর বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী মিসেস বুলেরই হবে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে দেখেছি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি ডঃ বসুকে ৩,০০০ পাউন্ড দিয়ে যেতে চান। বলা বাহুল্য এই অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে ছিল ওলি বুলের প্রতিশ্রুতি। মনে হয়, তারপরে নিবেদিতা আরও কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন ডঃ বসুর বিজ্ঞানাগারের জন্য, এখানে সে বিষয়েই বলেছেন। সেই টাকার পরিমাণ কত, ডঃ বসু সে টাকা পেয়েছিলেন কি না আমরা জানি না। ওলি বুলের উইলে সে টাকার বরাদ্দ ছিল। উইলের মামলায় নিবেদিতা জিতেছিলেন বলে নিবেদিতা স্কুল টাকা পেয়েছিল পরে, ডঃ বসু কি পাননি? ঠিক উত্তর জানা নেই; ডঃ বসুর চিঠি থেকে এইটুকু শুধু জেনেছি, তিনি প্রথমে স্থির করেছিলেন, তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন ওলি বুলের মৃত্যুদিনে।

নিবেদিতা তাঁর একটি অসমাপ্ত কাজের বিষয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০, ওলি বুলকে লিখেছেন—বসুর জীবনী তিনি লিখে যেতে পারলেন না! নিবেদিতা লিখেছিলেন—

"আমার জীবনের অপূর্ব ১২ বছর* সমাপ্তির মুখে।......আমার খুবই আশঙ্কা হয় তাঁর (বসুর) জীবনী লেখার জন্য বেঁচে থাকব না। কিন্তু আমি জানি, এই কাজের জন্য তুমি উইলে এস কে আর (এস কে র‍্যাটক্লিফ) বা 'এন'-এর (নেভিনসন) উদ্দেশে ১০০ পাউন্ডের বিশেষ ব্যবস্থা করে যাবে। ও টাকা অবশ্যই লেখকের উপযুক্ত দক্ষিণা হবে না, শুধু সময়ব্যয়ের মূল্যটুকু! জীবনী সহজেই ভারত থেকে ভারতের খরচে প্রকাশ করা যাবে। আমার কাগজপত্র তাদের জন্য থাকবে। তবু আমি যেভাবে তাঁকে দেখেছি, সেভাবে বোধ হয় আর কেউ কোনদিন দেখবে না।

* স্বামীজীর কাছে দীক্ষার পরবর্তী ১২ বৎসর।

বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রতি মুহূর্তের বিরামহীন সংগ্রাম এবং কী সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ঐ সংগ্রাম করে গেছেন, 'এন' (নেভিনসন) বোধ হয় সবচেয়ে ভাল করে তার বর্ণনা দিতে পারবে।" (এই চিঠি আত্মপ্রাণা ও মুক্তিপ্রাণার উদ্ধৃতি মিলিয়ে উপস্থিত করেছি।)

প্যাট্রিক গেডিস যখন পরবর্তীকালে বসু-জীবনী লেখেন, তখন ধরে নিতে পারি, তিনি নিবেদিতা-সংগৃহীত তথ্যগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁর মত করে বসুকে আর কেউ দেখেন নি। সে দেখার রূপ নিবেদিতা শেষ বারের মত ১৯১০, নভেম্বরে জেনোয়া থেকে ডঃ বসুর জন্মদিনে যা লিখে পাঠিয়েছিলেন (পরবর্তী জন্মদিনের আগেই নিবেদিতার দেহান্ত হয়) তাতেই স্পষ্ট। নিবেদিতা যে মহান উদ্দীপ্ত ভাষায় লিখেছিলেন, অনুবাদে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আমরা জানি।—

> "আমাদের পরম প্রিয় তিরিশ তারিখটি—শ্রেষ্ঠ জন্মদিনটি—ঐ দিনেই এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছবে। অনন্ত পুণ্যে পূর্ণ হোক এই দিন; নিত্য প্রসারিত মাধুর্যে ও আশীর্বাদে সম্পূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হোক বারবার এই মহাদিন! বাইরে দেখতে পাচ্ছি ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সুমহান মূর্তি, তার তলায় শুধু লেখা, 'লা পাত্রি', আর ভাবছি, একদিন আসবে যখন এই কথাগুলি তোমার নামের নীচে মৌন-মুখর শব্দরূপে উৎকীর্ণ থাকবে। ঐ বিরাট দুঃসাহসী মানুষটি—এবং তাঁরই মত আরও দুঃসাহসীর দল যাঁরা নিজ দেশবাসীর কল্যাণের জন্য অজানা সমুদ্রে পথ খুঁজেছেন—ওঁদের সকলের সঙ্গে তুমি ইতিমধ্যেই কিভাবে না আত্মিক সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে গেছ!
>
> জয়ী হও—চিরজয়ী! মানুষের সামনে হও আলোক, পদতলে হও প্রদীপ। আর শান্তি, গভীর শান্তি পাও তুমি—তুমি নূতন ভুবনের আবিষ্কর্তা—চেতনাসমুদ্রের হে মহান নাবিক!"

পরবর্তীকালে নিবেদিতার চিঠি থেকে আরও দুটি বসু-সংবাদ উদ্ধৃত করছি। ১৯১১ সালের গ্রীষ্মে নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গে আবার মায়াবতী যান। সেখানে তাঁরা একমাস ছিলেন এবং উভয়ে বিজ্ঞানের বই লেখার কাজ করেন। ডঃ বসু আশ্রমবাসীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। "নিবেদিতা আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের কাছে 'মনন সংস্কৃতি'র বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি জোর দিয়ে বলেন, জ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মমূলক ও ধর্মসম্পর্কহীন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সঙ্গত হবে না।" ধর্মজীবনের ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাঁর এই কথা শুনে কোনো কোনো তরুণ বয়স্ক ধর্মব্রতী আপত্তি করে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তো নিরক্ষর ছিলেন! নিবেদিতা এতে বিশেষ বিরক্ত হন। মায়াবতী থেকে ১৯ মে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"গতকাল আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ভাষণ দিতে হয়েছিল। ধর্ম-পথবর্তীদের পক্ষে সর্বোচ্চ জ্ঞানসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছিলাম।

তাতে তরুণদের কেউ কেউ ভড়ং করে বলল—শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত ছিলেন না। পরে খোকা বলল, ওকথা শুনে সে এতই রেগে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্ম-সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওরা কি **উপলব্ধি করতে** পেরেছে যে, গঙ্গার ধারে দিনের পর দিন বসে এক হাতে মাটি, অন্য হাতে টাকা নিয়ে এ-হাত ও-হাত বদল করা এবং পরিশেষে দুটোকেই সমমূল্য জ্ঞান করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অর্থ কি? ওই নির্বোধেরা কি অনুভব করতে পারে না, এর জন্য কতখানি মনঃশক্তির প্রয়োজন? ওরা কি মনে করে যে, তাপ—গণিত, গ্রীক, পদার্থতত্ত্ব বা ধর্ম—যাতেই প্রকাশিত হোক কোনো পার্থক্য হয়? ওরা কি দেখতে পায় না জ্ঞানের অভেদবোধই শিক্ষার মূল কথা?"

৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"জেনে খুশী হবে যে, মায়াবতীতে বসে বিজ্ঞানের মানুষটির নতুন বইয়ের ১২টি অধ্যায় শেষ করা গেছে—তার সমস্ত লেখার মধ্যে এ পর্যন্ত যা কঠিনতম। সুতরাং আমি অলস হয়ে নেই, যদিও বুঝতে পারছি না, আমার লেখা পূর্বের মত বীরোচিত হচ্ছে কি না! হোক, তাই চাই!"

২৪ অগস্ট, ডঃ চেনীকে—"গত রবিবার অধ্যাপক বসু ও শ্রীমতী বসুর সঙ্গে ছোট নৌকাটি করে গঙ্গার উপরে সারাদিন কাটিয়েছি। নৌকা ভেসে চলল—মন্দির পেরিয়ে, কত ঘাট পেরিয়ে—কতদূর—আপনার চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম—সবাই পড়লাম আর আপনার বিষয়ে কথা বললাম। রবিবারের অপরাহ্নগুলিতে, অপরূপ গঙ্গার উপরে আমাদের যাত্রার কথা কখনো কখনো যদি মনে করেন, জানবেন, তখন আপনি আমাদের মনে জাগরূক ছিলেন।"

১৩ সেপ্টেম্বর, মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে যা লেখেন, তার মধ্যে ডঃ বসুর বিষয়ে তাঁর শেষ বক্তব্য পাই—

"শেষ চিঠিতে খোকার সম্বন্ধে যা বলেছ, কী প্রাণোত্তপ্ত সত্য কথাগুলি! তুমি বলেছ তুমি বসুর জন্য গর্বিত, কারণ বিজ্ঞানে অপারদর্শী ভারত তাতে পারদর্শী হয়েছে। আমার ধারণা, স্বামীজী ঠিক এই কথাই ভাবতেন; মনে হয়, তিনি তাকে এত ভালবাসতেন যা আমরা ভাবতেও পারি না। আমি নিজে সর্বদা অনুভব করেছি, ভারতের মহিমার বিষয়ে কখনো সন্দেহ করা যাবে না যদি আধুনিককালে ভারতের বিপাকের অবস্থার কথা ভাবার পরে চিন্তা করে দেখি—তা সত্ত্বেও ধর্মে ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর জন্য ভারতবর্ষ কতখানি দিয়েছে! ডঃ বসুর কাজের মূল্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ভারতে আরও যেসব মহান ব্যক্তি আছেন ভারতের সেবার দ্বারাই তাঁরা মহান, সীমাবদ্ধ এক গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁরা কাজ করেন। কিন্তু ধর্মে বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞানে বসু **পৃথিবীর জন্য** দান রেখেছেন।"

উইলের মামলার আরও কথা

মিসেস বুলের উইলের মামলায় নিজ স্বত্বরক্ষার জন্য নিবেদিতা আইনগত চেষ্টা ত্যাগ করেননি কারণ ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রামের ক্ষমতা তাঁর ভগ্ন শ্রান্ত

মনে তখনো অবশিষ্ট ছিল। এই মামলা তাঁর নৈতিক মহত্ত্বের উপর প্রচণ্ড আঘাত, আবার তাঁর চরিত্রের বিজয়ক্ষেত্রও বটে। ২৯ মার্চ তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে অপরাজেয় মনঃশক্তির প্রকাশ—

"সে যাই হোক, আমি ঠিক করেছি, যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আমাকে যেতে হবে, তার মুখোমুখি হব সাহসের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে।......মিঃ থর্পকে লিখেছি, যদি আমি [......], তাহলে আশা করি অপরপক্ষে তারা তোমাকে কর্তব্য করতে দেবে। মনে হয়, আমার মনোভাব মামলায় অসুবিধা ঘটাবে। আমি মিঃ পার্কারকে লিখেছি, তিনি যেন বিশেষ বিশেষ সময়ে সেন্ট সারার সঙ্গে আমার কতকগুলি গোপনীয় বৈষয়িক আলোচনা হয়েছিল, সেগুলির স্বত্বরক্ষা করেন। তার বাইরে আমার কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা অবশ্যই নিরানন্দকর হবে, কিন্তু সহ্য করতেই হবে— **সহ্য করা যাবে**। এ পথ স্বামীজীই দেখিয়েছেন। বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করছি আমি; **খ্রীস্টের বিচারের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে যে, যখন সমস্ত পৃথিবী তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলেছে, তখন যথার্থতঃ তিনিই পৃথিবীর বিচার করেছিলেন!** সুতরাং দৃঢ় হও। এখানেই অবতারের দেওয়া শক্তি। তাঁর (খ্রীস্টের এবং স্বামীজীর) কোনো একটি সহজ আচরণ বুঝবার জন্য সমস্ত জীবনের—জীবনের সুগভীর যন্ত্রণার—প্রয়োজন হয়। এসব কথার উল্লেখ আর করার দরকার হবে না ভবিষ্যতে, এবং আমি আর কিছু জানতেও চাই না, যদিও আমি সম্মুখীন হতে পারব, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। শিব! শিব!"

ওলিয়ার বীভৎস নৃশংস আচরণ তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজনকে কম পীড়িত করেনি। তাঁর নিজের মামা মিঃ থর্প নিবেদিতার পক্ষে মামলার তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মিঃ থর্পের সঙ্গে পরে যিনি বিবাহিত হন, কবি লংফেলোর কন্যা মিস লংফেলো, স্নিগ্ধ সান্ত্বনাভরা চিঠি লিখেছেন নিবেদিতাকে। অপরপক্ষে, নিবেদিতার অসীম মানসিক শক্তি—তিনি ওলি বুলের উপর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায়, (তার অনুবাদ আগেই দিয়েছি), যার মধ্যে ওলি বুলের পরবর্তী বিকারের কথা নেই, আছে শ্রেষ্ঠ শক্তি ও ঔদার্যমহিমার কথা। সে লেখা ওলি বুলের পরিবারের মানুষদের খুশী করেছিল। নিবেদিতা বৃহত্তর আকারে মিসেস বুলের জীবনচিত্র রচনার কথাও ভেবেছেন।*

নিবেদিতা বলেছিলেন, তিনি সহ্য করতে পারবেন। বাইরে হয়ত পেরেছিলেন, কিন্তু ভিতরে একেবারে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে সংবাদপত্রে

---

* ১৬ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মিস লংফেলোর রচনাটুকুর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।...মিঃ থর্প মডার্ণ রিভিউতে সারার উপর আমার প্রবন্ধ পড়ে প্রশংসা করে চিঠি পাঠিয়েছেন, গত কাল সেটি পেয়ে খুবই খুশী। তাঁরা যে সন্তুষ্ট, এতে আমার আনন্দের অবধি নেই। এখন কেবল আশা করি, তাঁরা পৃথিবী-বিখ্যাত কোনো পত্রিকায় বড়ো আকারে এবিষয়ে রচনার ব্যাপারে আমার পরিককল্পনায় সহযোগিতা করবেন। সেটি লিখবার আগে তাঁদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে আছি, কারণ প্রথমতঃ কাজটা কঠিন, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যদি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তাহলে বৃথা প্রভূত সময়ব্যয়। তবে যদি মিস লংফেলো সহযোগিতা করেন, কাজটা করে ফেলা যায়।"

৭ সেপ্টেম্বর মিসেস উইলসনকে লেখেন—"আমি সব দিকে চিঠিপত্র লিখছি, যাতে মিঃ থর্প সারার **জীবনী** বার করার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান। শিব! শিব!"

প্রকাশিত মামলার বিবরণ পাঠাতেন। সে কাগজগুলি অংগারের মত তাঁকে দগ্ধ করত। শেষে সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে ম্যাকলাউডকে নিষেধ করেন। নিবেদিতার বোন অভিযোগ করে বলেছেন, ট্যান্টিনের এই অবিবেচনার কাজই নিবেদিতাকে মেরে ফেলেছিল, যার জন্য ম্যাকলাউড পরে অনুতপ্ত হন।

৪ জুলাই নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন—

"সব সময়ে শরীর বিশেষ ভাল থাকে না। কাগজের টুকরোগুলো (মামলার বিবরণ যাতে আছে) ভয়াবহ মুহূর্ত এনে দেয়।......অন্য কারো চিঠি আমাকে পাঠিও না। প্রতিটি উল্লেখ যন্ত্রণা বাড়ায়।"*

---

* কেবল তাঁর নিজের নাম লাঞ্ছিত হয়েছিল বলেই নয়, নিবেদিতার গুরুর নাম ও শিক্ষাকেও টেনে আনা হয়েছিল মামলায়। নিবেদিতার পক্ষে অসম্ভব সে যন্ত্রণা। ওলি বুলের প্রাচ্য ধর্মানুরক্তির মূলে বিবেকানন্দের প্রভাব, সুতরাং মিসেস বুল শেষ বয়সে যে বিচিত্র ভৌতিক চেতনায় আচ্ছন্ন থাকতেন, তার মূলেও তাহলে এই বিবেকানন্দের শিক্ষা রয়েছে! নিয়তির লীলা একেই বলে, গুপ্ত রহস্যবাদের জাতশত্রু বিবেকানন্দ মৃত্যুর পরে অভিযুক্ত হলেন বিকৃত রহস্যবাদের প্রচারক বলে! এই জঘন্য মিথ্যার প্রতিবাদে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তৎকালীন আমেরিকার সুবিখ্যাত কবি ও লেখিকা এলা হুইলার উইলকক্স আছেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে রক্ষিত নিউইয়র্ক ইভনিং জার্নালের মে ২৭, ১৯১১-র কর্তিত অংশে এবিষয়ে সংবাদ দেখেছি।

সংবাদটি এইরূপ—

VEDANTA PHILOSOPHY DEFENDED BY
ELLA WHEELER WILCOX

"The sensational statements made in the will contest case of Mrs. Ole Bull regarding the teachings of *Vedanta* are most misleading and unjust to that great philosophy. It was my privilege to be a pupil of Swami Vivekananda during his two Winters in New York.

This I regard as the greatest intellectual and spiritual opportunity of my life. Neither in the lectures of Vivekananda, his books or the Vedanta philosophy are to be found any of the "wierd", "uncany" or unwholesome teachings related by the witnesses as a part of Mrs. Bull's "lessons." The breathing exercises, inhaling, retention of the breath and exhaling, using a word which means Gall, *are* a part of Vedanta teaching.

The very first physical act of a new born child is to breathe a long breath. After a few years children, especially in our Western world, cease to breathe deep breaths, because they wear restricting garments, and live indoors, and sit and stand with indrawn chest. In the Orient the morning devotions are begun with breathing exercises. Therefore, tuberculosis and catarrhal troubles are the least prevalent of all maladies in India. Vivekananda repeatedly warned his pupils against excesses in these exercises. Properly practised, they produce physical, mental and spiritual strength. Overdone, they produce disaster. Precisely as the right use of the X and violet rays cure disease, and the wrong use kill, or as a tonic may stimulate digestion and too much tonic may induce indigestion.

নিবেদিতার পত্রে তাঁর শেষ দিনগুলির কথা :

স্বামীজীর অনুধ্যান এবং বসু-সংবাদ

নিবেদিতার শেষ কয়েক মাসের চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, জীবনের প্রতি আসক্তি তাঁর চলে গেছে। সমস্ত মনপ্রাণ গুরুর ভাবে ভরপুর। তাঁর বন্ধন ছেদনের উপযুক্ত পরিবেশও তৈরী হয়েছিল। অনেকগুলি প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেছিল ক্রমান্বয়ে। ১৯০৯ জানুয়ারীতে নিজের মা, ১৯১০ জানুয়ারীতে মিসেস বুল, ফেব্রুয়ারীতে স্বামী সদানন্দ, জুলাইয়ে স্বামীজী-জননী ভুবনেশ্বরী দেবী, অগস্টে

In all religions, sciences, arts and professions there are too many teachers illy prepared for their work.

Vivekananda was a master. He urged the most careful preparation and years of study and self-development before his pupils attempted to be teachers. Despite his warnings, many of them rushed into the field to impart informations which they had not yet received.

The Vedanta philosophy teaches the full development of body, mind and soul, and methods of concentration, and the realisation that *all life is one*. Christ studied this philosophy in the Orient, and it was a part of "Vedanta" when He said, "I and my Father are one."

There are many foolish women who study Vedanta and think they must cease -to be human—who strive to be disembodied spirits—while still in the earthy form.

But, properly understood, this religion teaches each human being to make the *best of life* in the position to which he or she is called. The best wife, husband, parent, friend and citizen, and to perform every duty cheerfully and perfectly, and to be happy in this life while conscious that it is only one plane of many—one room in the Father's mansion.

If Mrs. Bull feared demons and rubbed her furniture with oil to drive away uncanny influences, she did not learn these things from Vedanta philosophy for that teaches, above all things, that each soul makes its own destiny and contains all divine powers within itself, and that through realisation of the *one life* we may all become Christ, "One with the Father."

Absolute fearlessness, absolute unselfishness, absolute kindness to all living things must result from a proper understanding of the real Vedanta philosophy. It is profound as the ocean depths ; all other religions, all other philosophies, all the sciences are contained in it ; and, while it has its codes and rules for those who wish to become adepts and masters, it has also its simple wholesome and helpful line of training for the man and woman who want to make happy homes and successful toilers. It teaches self-reliance, self-conquest and self-development, and these must be the [......] of immortality."

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—মৃত্যুপ্রবাহ! নিবেদিতা অনুভব করতে থাকেন, স্বামীজী তাঁর স্বজনদের ক্রমে সরিয়ে নিচ্ছেন। নিবেদিতাও স্বয়ং চলে যাবার জন প্রস্তুত হন। এইকালে নিবেদিতার নানা চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। শুরু হবে মিসেস বুলের মৃত্যুর পরে নিবেদিতার ভারতযাত্রা থেকে—

২৪ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"তোমার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত কতই প্রাণোত্তপ্ত আর সুন্দর। তোমার সঙ্গছাড়া হবার পরেই 'বেলুড় ও কাশ্মীরের' চকিত আলোক-ঝলক পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম— যা ছিল আমাদের।......

শিব! শিব! প্রাচ্যের সুমহান পথে আরও এক পা এগোলাম, অনন্ত আনন্দ আমার। কিন্তু তোমার জন্য বুকে মোচড় লাগবে—হয়ত তুমি নিজের দিকে নজর দেবে না মোটে—ফলে হারিয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে! না না না—বাঁচো বাঁচো বাঁচো—তোমার জীবন মানে আমাদের সুখ—যতই বাঁচো তার পরিমাণ কম হবে না এতটুকু!......

(তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে) আমি একাকী, তার জন্য ভেঙে পড়ে কাঁদতে পারি! তোমাতে আছে শক্তি। আমার ভালবাসা দিও—সবকিছুতে, সকলকে, বিশেষ করে র‍্যাটক্লিফদের, আর যদি চাও মে-কে। আমি চাই শুধু বিশ্বাস করতে—শুধু বিশ্বাস করতে। আর নীরব হতে। কোনো গুহায় মাত্র ২০ বছরের নিঃসঙ্গবাস এইসব আসক্তির ইন্দ্রিয়জ ছাপগুলি একেবারে মুছে দিয়ে সত্যকার অনুভূতি দিতে পারে এবং যথার্থ আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে—একি সত্য নয়? কিন্তু সেক্ষেত্রেও ও-জিনিস ঘটবে না যদি-না ঐ নির্জন-জীবনের সমস্ত সময়ে ব্রহ্মে নিমজ্জিত থাকা যায়! সেই অনন্ত উপলব্ধির মধ্যে মানুষ চির আনন্দে পূর্ণ থাকে।

'ক্রাইস্ট দি মেসেনজার' পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম, তুমি কিভাবে কোন্ আলোকে তাঁকে দেখেছ! হাঁ, নিশ্চয়, তোমার আধ্যাত্মিক বোধ সত্যই প্রত্যক্ষ।

২৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"আজ যখন জাহাজের ডেকে বেরিয়ে এলাম তখন ক্রীট থেকে ৪-৫ মাইল তফাতে মাত্র! ক্রীট, তার সুদীর্ঘ তুষার-গিরিমালা নিয়ে—অপরূপ!"

[স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৯ সালে পাশ্চাত্ত্য যাত্রাকালে ক্রীট দ্বীপ দেখার স্মৃতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।]

৭ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"বোম্বাই বন্দরে ঊষার উদয়। রাত্রির আঁধারে আচ্ছন্ন দ্বীপখানি যেন উত্থিত হল জলতল থেকে।...ভারত—ভারত—অবশেষে!"

১২ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"রবিবারে পৌঁছেছি। ফেরার কী আনন্দ। আজ রাত্রে বিজ্ঞানের মানুষটি ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন এক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য। কিন্তু তিনি আজ অসুস্থ, আমরা ভয় পাচ্ছি। তবু আবার কাজ শুরু হওয়ার আনন্দ অপরূপ। কী শিথিল মুষ্টিতেই মানুষের আনন্দ ধরা থাকে, আর সুখের মধ্যে ঢাকা থাকে কতখানি দুঃখ!

মাতাঠাকুরাণী গতকাল কলকাতায় পৌঁছেছেন দীর্ঘ তীর্থযাত্রা সেরে। আমি এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। তার ফলে একটু যে শান্তি পেলেন, তার জন্য মনে হয় তিনি কৃতজ্ঞ হবেন।

বিজ্ঞানের মানুষটি বলছেন, পরাজয়ের জন্য আমাদের নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে। সুতরাং আমরা ৬ মাসের জন্য স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছি, এবং খরচ একদম কমিয়ে আনছি। ক্রিস্টিনের স্থান পরিবর্তন দরকার। সে মায়াবতীতে গ্যানীর (মিসেস সেভিয়ার) সঙ্গে ৬ মাস কাটাবে।"

১৬ মে, ম্যাকলাউডকে—"নৈনিতাল থেকে আলমোড়া যাওয়ার পথে ১৮৯৮ সালে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য মসুয়ানালায় তুমি যে বিশেষ ঘরটিতে ছিলে, তাতে এখন আছি, সে আনন্দ বুঝতে পারো? স্বামীজী এখানেই আমাকে আমার জীবনের প্রথম তুষারশৃঙ্গ দেখান। শিব! শিব!

য়ুম, য়ুম গো! আমি অনুভব করছি কত বেশী, আর আমার বলার কথা কত অল্প! আজ বোধহয় বসুদের বাড়িতে নূতন ঘরের প্রথম ইঁট গাঁথা হল। আজ মায়েরও জন্মদিন। প্রার্থনা করি এই দিনে, দিনটি পবিত্র। ডার্লিং, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। ঐটুকুই তো চাইতে পারি শুধু!"

১৬ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে—"পরিবর্তিত অবস্থায় অবশ্যই আমার উইল পুনর্লিখন করতে হবে, যেহেতু তুলনায় অল্প রেখে যেতে পারব। কিন্তু এখনো মনে করি, কাজের যেন নতুন পর্ব আরম্ভ হবে।

হঠাৎ খেয়ালে আলেকজান্ডার গতকাল মায়াবতীতে চলে গেছে। মনে হয়, সে ও ক্রিস্টিন ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই ভাবিত, যদিও বুঝতে পারি না ক্রিস্টিনের অত চিন্তার কারণ কি? কিন্তু কেউ অপরের জন্য কিছু নির্ধারণ করতে পারে না—পারে কি?

ওগো য়ুম, মরতে পারলে বেঁচে যেতুম। বহুদিক থেকেই জীবনকে এত ব্যর্থ মনে হচ্ছে। নারী-শিক্ষার জন্য আমি যে, সত্যই উপযুক্ত (?), তা যেন অনুভব করতে পারছি না।...সবকিছুই মনে হয় ভাল চলবে যদি আমাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়!

একটি কি দুটি বই মাত্র লেখা বাকি আছে, যেগুলো সত্যই আমার লেখা উচিত। তাদের মধ্যে, খোকার জীবনী অনেক ভাল করে লিখতে পারবে র‍্যাটক্লিফ। বাকি থাকবে ইতিহাস, কয়েকটি নিরীক্ষা গ্রন্থ এবং শিক্ষার বই। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখনো আমার কিছু বলার আছে। সেইসঙ্গে খোকাকে বিজ্ঞানের আর একটি পর্বে এগিয়ে দেওয়ার সাহায্য। তারপরে সকলেরই সুন্দর সমাপ্তি! তাই হোক, তাই চাই। যাদের ভালবাসি এমন কারোর চেয়ে বেশীদিন বাঁচাকে আমি ডরাই। অবশ্য সবই অন্য রকম মনে হবে যদি ১৮৯৮ সালের স্বর্ণোজ্জ্বল আশা-স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু তাকে সার্থক করাও তো প্রায় অসম্ভব। ও সুযোগ তো অন্যে পাবে না। তাদের জন্য আর কত লিখব! কত বলব!"

৩১ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে—"ক্রিস্টিন স্থির করেছে, সে ব্রাহ্ম স্কুলে এক বছরের জন্য শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষাদানের কাজে যোগদান করবে, সেইসঙ্গে ছোট স্কুলের প্রধানও হবে। এইভাবে সে অর্থোপার্জন করতে পারবে, কিন্তু সেই কারণেই সে যায়নি, আরও পঞ্চাশটা কারণ রয়েছে। তার সিদ্ধান্তে আমি খুশী। এর দ্বারা মনে হয় সে মনের প্রসার, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা লাভ করবে, যা তার পাওয়া

খুবই দরকার। এখানেই তার বাসস্থান থাকবে; আমার বিশ্বাস আমরা একসঙ্গে শনি-রবিবার ও ছুটিগুলি কাটাব। অভিজ্ঞতালাভের পরে সে 'ব্যক্তিত্ব' হয়ে উঠবে না, অপরপক্ষে ভবিষ্যতের কাজগুলিকে চালাবার পক্ষে যোগ্যতা অর্জন করবে।"

১১ সেপ্টেম্বর, মিসেস লেগেটকে—[স্বামীজীর সমাধিমন্দির ও পাথরের রিলিফ মূর্তি নির্মাণের ব্যয়ভার সম্ভবতঃ মিসেস লেগেট বহন করতে আগ্রহী হন। তদনুযায়ী জয়পুরে জনৈক প্রস্তরশিল্পীর সঙ্গে গণেন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করেন। এসবের টাকার হিসাব ও ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে নিবেদিতা অনেকগুলি চিঠিতে মিসেস লেগেটকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই কাজটিকে স্বভাবতঃই মহা কর্তব্যকর্ম বলে নিবেদিতা নিয়েছিলেন। এই চিঠিতে কিভাবে মূর্তি নির্মিত হচ্ছে তার বিবরণ দেওয়ার পরে নিবেদিতা লিখেছেন—]

"এহেন উদ্দেশ্যে টাকা খরচ অপূর্ব ব্যাপার। এমন জিনিসের জন্য তো মানুষ তপস্যা করে!

তোমাকে মধ্যযুগীয় ভাব-পরিবেশ খানিক বর্ণনা করি। ভাস্কর প্রস্তর-নিহিত স্বামীজীর ভাবমূর্তির প্রতি আহুতি দান করলেন : "হে স্বামীজী! আমার হাতে আপনি আবির্ভূত হউন সুচারুরূপে!" সকাল ৮টা থেকে রাত ৯৷৷টা পর্যন্ত তিনি কাজ করেন, কাজের মধ্যেই খেয়ে নেন। আমাকে বলে পাঠিয়েছেন—যদি কাজ সন্তোষজনক না হয়, এক পয়সাও তিনি নেবেন না, টাকা ফেরত দেবেন।

আমি অবশ্য ভয়েই আছি। কারণটা তুমি বুঝবে। ডাঃ বসু সূচনাকালে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন, জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন এই কাজ। সত্যই তাই, যদি ভাল দাঁড়ায়!"

১১ সেপ্টেম্বর, মিস লংফেলোকে—[মিস লংফেলোর উল্লেখ আগে করেছি। ওলি বুলের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এই মহিলা নিবেদিতার প্রতি ওলিয়ার অনুচিত ব্যবহারে খুবই মর্মপীড়িত হন। তাঁর স্নিগ্ধ সান্ত্বনাপূর্ণ কয়েকটি চিঠি এইকালে নিবেদিতার অন্তর্জ্বালার অনেকখানি উপশম করে। ১৬ অগস্টে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা মিস লংফেলোর পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ৭ সেপ্টেম্বর বোন মে-কে নিবেদিতা মিস লংফেলোর চিঠির উল্লেখ করে বলেছেন—'সত্যই তিনি যথার্থ অনুরাগী বিশ্বস্ত বন্ধু।' এঁর সঙ্গে নিবেদিতার হৃদয়ের যোগ কতখানি গভীর হয়েছিল তা বোঝা যায় ৫ সেপ্টেম্বরের সুদীর্ঘ পত্রখানি থেকে। চিঠিটির ছত্রে ছত্রে বিদায়ের সুর।—]

"অব্যাহত কাজের শান্তিময় অপরূপ এই দিনটিতে মধুরতম প্রহর হল সেটি, যখন তোমার চিঠি পেলাম, ব্রেকন ওয়েলস্ থেকে যেটি পাঠিয়েছ ১৪ অগস্টে। এখন ঠিক সন্ধ্যাদীপের কাল ,প্রদীপখানি জ্বালিয়ে আমার কাছে আনা হয়েছে এই মুহূর্তে, আর সন্ধ্যারতির শাঁখ ঘণ্টা ঘড়ি বাজতে শুরু হয়েছে চারিদিকে। এখন পূজ্য মানুষ, পূজ্য জিনিসের সামনে লুটিয়ে প্রণাম করার সময়। আহা, গত ১৩ বছরের কত না মধুস্মৃতি ঘনিয়ে আসছে মনে! কত না অপরূপ গভীর পূর্ণ তরঙ্গ ডুবিয়ে দেয় আত্মাকে গোধূলির কালে! স্বামীজী সব সময়ে জোর দিয়ে

বলতেন—'জীবন এবং মৃত্যুর পারে;' কদাপি শুধু জীবনের বা শুধু মৃত্যুর পারে বলে তৃপ্ত হতেন না। সে কথা এইসব দিনে উপলব্ধি করার বড়ই প্রয়োজন কারণ মৃত্যু কতজন—হায় কত প্রিয় পরিচিতকে নিয়ে চলে গেল!

আমাদের ছোট বাড়িটি যেভাবে সৌন্দর্যের প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে যাচ্ছে—কখনো কখনো বড় ভয় পেয়ে যাই!

আমাদের বাড়িতে এক বছর আগে চারধারে ফুলের বেড় দিয়ে ঘেরা চৌকো লন তৈরী করা গেছে।

বাগান আমাদের নিজেদের সদর দরজার সামনে; চারদিক দেওয়ালে ঘেরা, যার জন্য আমাদের হিন্দু বালিকারা বিকেল চারটের সময় সাড়ি পরে সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে।

ঘাস বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, গাছগুলি ভালভাবে ধরে গেছে। গত জুন মাসের শেষ থেকে আমি একলা আছি। আর আছে ঝি-চাকর। ফলে কাজের সুযোগ ও শান্তি অনবদ্য। তবে প্রিয় মিস টমসন যেমন বলেছেন, আমি মোটেই শরীরে সেরকম দৃঢ় হয়ে উঠিনি—আমি আতঙ্কে প্রায় মৃতপ্রায়—যার সম্মুখীন হয়েছিলাম—ওঃ কী ভয়ঙ্কর কাহিনীকে অভিনীত হতে দেখলাম! তার মধ্যে ভয়ঙ্করতম হল—তমসাচ্ছন্ন আত্মা—স্বেচ্ছায় তমোময়—অসীম শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত। ত্রাণ পেয়েছি? হাঁ! আমরা সবাই যেভাবেই হোক সমস্ত সময়টিতে ত্রাণ পেয়েছি। কিন্তু একই সঙ্গে, সে আত্মা মুক্ত, এই পৃথিবীতেই, হায় জানত না তা! এই মৃত্যুর জন্য গভীর গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। যদি তিনি বাঁচতেন তাহলে অবশ্যই তিনি যাতনা পেতেন—দারুণ যাতনা—কিন্তু সেই যন্ত্রণার পথেই উপলব্ধি আসত। পাপীর শাস্তিতে **অধিকার** আছে, একথা কত না সত্য—প্রায়শ্চিত্তের জ্বলন্ত শুদ্ধি-যাতনা। প্রিয় সেন্ট সারার জীবনের শেষ সপ্তাহগুলিতে মাত্র প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, কিভাবে তিনি ওলিয়ার চেয়েও—যার বিষয়ে আমরা সকলেই জানি—গভীরভাবে সারাজীবন ধরে কেবলই নিজেকে মাতৃরূপে অনুভব করার জন্য সন্ধান করে গেছেন। শেষ সন্ধ্যায়—তা যে শেষ সন্ধ্যা তা প্রায় বুঝতেই পারিনি—তাঁর বিছানার পাশে উঁচু চেয়ারটিতে বসেছিলাম—আমি তখন প্রবলভাবে একটি প্রার্থনার বিষয়েই সচেতন হয়েছিলাম—তাঁকে যেন **মাতৃভাবে** নিজেকে অনুভব করতে দেওয়া হয়! আর পরদিন প্রত্যুষে আত্মা উড়ে গেল! প্রিয় মিস লংফেলো, বলো, তাঁর মাতৃত্বের সেই উপলব্ধি কি ওলিয়াকে ত্যাগ করতে ঘটতে পারে? সে তো পরম মুক্ত ভালবাসার উপলব্ধি! এমন অসাধারণ ঘটনায় কোন্ আত্মা জাগ্রত না হবে? আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, সুযোগ যেন তিনি পান, এখন বা ভবিষ্যতে, যেভাবে তিনি বেঁধে রাখতেন ও সাহায্য করতেন, তার পরিবর্তে নিজের অনন্ত ভালবাসাকে উপলব্ধি করে, যারা তাঁকে দুঃখ দিয়েছে তাদের ক্ষমা করে তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিরাট মহিমায়, যাকে অগ্রাহ্য করতে কেউ পারবে না।

এইসব কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, এই দেহ কী না বন্ধন, কী না অন্ধকার! কি ভাবে তা আমাদের অন্ধ করে রাখে, জড়িয়ে রাখে শিকলে! আমাদের সত্য স্বরূপকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। কী সত্য একথা! যে-পর্যন্ত না আমরা বিরাট আত্মাদের নিকতনে উপস্থিত হতে পারি, তার পূর্বে ওকথা অনু-

ভবই করতে পারি না, নিজেদের হৃদয়ের রহস্যের গভীরেই নামতে পারি না! নিষ্ঠুর সত্য নয়কি কথাগুলি, অথচ কী সহজ সাধারণ সত্য!

এক প্রাচীন আইরিশ বীরকাহিনীর এক বীর বলেছে: 'শুধু বাঁচার কি অর্থ? সে কাজটা তো আমাদের হয়ে আমাদের ভৃত্যরাও করতে পারে! অনন্ত ছাড়া লাভ করবার শ্রেয় বস্তু আর কি আছে? আর মৃতরাই শুধু তা পায়!' কিন্তু আমার মনে হয় না সকল মৃত তাকে পায়! তা যদি পেত তাহলে সকল জীবিতও তাকে অনুভব করে না কেন? নিখিল সত্য একটিই আছে, যাকে আমরা—জীবিত বা মৃত যে নামেই হোক না কেন, যে স্থানেই হোক না কেন—উপলব্ধি করতে চাই।

'জ্ঞানযোগ' নামে স্বামীজীর একটি অপূর্ব বই আছে; সেটির উপর কাজ করছি। কিছুদিনের মধ্যে সেটি প্রকাশিত হবে উৎকৃষ্টতর ইংরেজিতে। লংফেলো-ভবনে থাকার সময়েও সেটির সম্পাদনা করেছি।

প্রিয় মিস লংফেলো, এই গ্রীষ্মে তোমার স্থির, দৃঢ় সহৃদয়তায় পূর্ণ যে দুটি-তিনটি চিঠি পেয়েছি, সেগুলি যে কতখানি শক্তি ও সান্ত্বনা আমাদের দিয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না। ঠিকই বলেছ তুমি, বাঘেরাই সবচেয়ে মন্দ সঙ্গী নয়। আর 'ট্রানস্‌ক্রিপ্টে' তুমি যে ছোট বিবৃতিটুকু পাঠিয়েছ, তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর কৃতজ্ঞ। এ ধরনের লেখার মধ্যে এর চেয়ে নিখুঁত আর কিছু আমি দেখিনি, এত নৈর্ব্যক্তিক অথচ আস্থাপূর্ণ। প্রিয় সেন্ট সারার জন্য এ ধরনের কাজ করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমি একটা বই করার পরিকল্পনা পর্যন্ত করে ফেলেছি, কিন্তু প্রবন্ধই শ্রেষ্ঠ হবে মনে হয়।...কিন্তু যদি বই হয়, ওলিয়া সম্বন্ধে নিষ্ঠুর নগ্ন সত্য তাতে থাকবেই।

নানা দিক থেকে (মিসেস বুলের) জীবনটির বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর অর্থকে অপরের সাহায্যার্থে নিয়োগ করে নিজের বৃহৎ শোকের প্রকাশ-মাধ্যম করে তুলেছিলেন, যার ফলে বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল এবং নিজেকে তার দৃঢ় কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। তারপর প্রাচ্য চিন্তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তাছাড়া কতকগুলি ব্যক্তিগত আদর্শকে বাস্তবায়িত করাও রয়েছে। কোনো কিছুকেই বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন না করে পারতেন না।

আমরা বিজ্ঞানের একটি নতুন বইয়ের উপরে কাজ করছি; আমাদের হাত দিয়ে পৃথিবীকে নাড়া দেবার মত সমৃদ্ধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অধ্যায়গুলি ক্রমেই বেরুচ্ছে। তাছাড়া হ্যারাপের (প্রকাশক) জন্য 'মিথস্ অ্যান্ড লিজেন্ডস্' বইয়ের এক তৃতীয়াংশ লিখে ফেলেছি। আর স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা একেবারে আগেকার মত কমিয়ে ১২-১৬ জনে দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু উপযোগিতায় বিশেষ কমেনি তা; ছাত্রীরা সকলেই বিবাহিত মহিলা বা বিধবা, তাই কম গোলমাল করলেও এঁদের শেখাতে অনেক বেশী শক্তি লাগে, যা ১০০ জন বালিকার গোটা স্কুল চালাতে লাগত না। মিসেস বনির (?) ওখানে শিক্ষাপদ্ধতির উপরে সপ্তাহে দু'দিন বক্তৃতা করছি। সুতরাং সময় নষ্ট হচ্ছে বলা যাবে না। এখন 'মিথস্ অ্যান্ড লিজেন্ডস্' ঘাড় থেকে নামাতে বিশেষ উৎসুক। তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের উপরে বইটির কাজে ফিরে যেতে পারব; সেইসঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির উপরে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বইটি লিখে

ফেলব। যদি এইসব কাজ সমাধা করতে পারি তাহলে শান্তিতে মরতে পারব, আর সেইজন্যই মনে হয়—সেকাজ হয়ে উঠবে না এখনি!

শরৎ এখনো আছে—তুমি সত্যই ভারতে আসবে, কত না আশা করি! তুমি এসো, যদি পারো। মিসেস লেগেট, জর্জ এবং অ্যালবার্টা এই শীতে আসার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু এখন তা বাতিল। তাতে খুবই দুঃখিত। আমাদের নারী-নিবাসের বাগানটিকে শুধু নিজের ব্যবহারে রক্ষা করা বিরাট স্বার্থপরতা! এখন প্রিয় মিস লংফেলো—শুভরাত্রি—পুনশ্চ শুভরাত্রি।......

স্বামীজী হয়ত বলতেন, জীবনের যদি নির্দিষ্ট মান না থাকে তাহলে ব্যবহারগত মানও থাকে না। কঠোর আত্মশাসনের দ্বারা এইসব আচরণ-মান নিয়ন্ত্রিত হলেই জীবন থেকে সরে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং সর্ববস্তুতে বিরাজিত অভেদ-সত্যকে অনুভব করার ক্ষমতা জন্মে। তারপর আসে সমদর্শন, প্রশংসা নিন্দা, উত্তাপ শৈত্য সব যখন সমান বোধ হয়। অন্য কথায়, যতক্ষণ আমরা স্বার্থপর থাকি, আমাদের জীবনের মানদণ্ডেও স্বার্থপরতা থেকে যায়। কিন্তু স্বার্থ যদি চলে যায় তাহলে এইসব মানের প্রশ্ন থাকে না, কারণ কোনো প্রলোভনই তখন আকর্ষণ করে না। বাসনার মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে তখন।"

এই চিঠি লেখার পাঁচ সপ্তাহের মাথায় নিবেদিতা ১৩ অক্টোবর তারিখে দার্জিলিঙয়ে বসুভবনে দেহত্যাগ করেন। যে মৃত্যুকে নিবেদিতা এত ভালবেসেছেন, বন্দনা করে এসেছেন চিরদিন, সে মৃত্যুকালের কোনো বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাইনা, যদিও সংক্ষিপ্ত ভাবপূর্ণ কিছু বর্ণনা রয়েছে শ্রীমতী অবলা বসুর লেখায়, যা অল্প পরেই আমরা উপস্থিত করব। নিবেদিতার শেষের পত্রগুলি থেকে বোঝা যায়, স্বামীজীর ধ্যানই তাঁর সমস্ত আত্মাকে আবৃত করে রেখেছিল—সেই বিবেকানন্দের কোন্ স্বরূপ তাঁর চিত্তক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তার বিবরণ পাইনি—শ্রীমতী অবলা বসুর পক্ষে তা দেওয়াও বোধহয় সম্ভব ছিল না, বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণে। নিবেদিতার দেহান্তের পরেই তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে তিনটি টুকরো লেখা পাওয়া যায়—"প্রিয়তম", "লীলা" ও "মৃত্যু"। লেখাগুলি শেষ যাত্রার পূর্বে লেখা অনুমান করা যায়।* সে যাই হোক মিস লংফেলোর চিঠি থেকে পুনশ্চ এই নিষ্ঠুর সত্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়ছে—ওলি বুলের উইলের মামলাই নিবেদিতার অকালমৃত্যুর হেতু।

---

* লেখা তিনটি আধ্যাত্মিক আকৃতিতে পূর্ণ। যেমন 'প্রিয়তম' লেখাটি—

"ঈশ্বর-তৃষ্ণাই জীবনের সমগ্র অর্থ, একথা যেন চিরদিন স্মরণে থাকে। আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম ঈশ্বরই—তবে তিনি আমারই বাতায়নে দৃষ্টি মেলেছেন, আমারই দ্বারে করাঘাত করেছেন। এই প্রিয় পরমের কোনো প্রয়োজন নেই, তবু তিনি মানবিক প্রয়োজনের আকার নিয়েছেন, যাতে আমি সেবা করতে পারি। তাঁর ক্ষুধা নেই তবু তিনি প্রার্থী, যাতে আমি দিতে পারি। তাঁকে দ্বার খুলে আশ্রয় দেব বলেই তো তিনি ডাক দিয়েছেন। তাঁর বিশ্রাম রচনা করে দেব বলেই তো তিনি ক্লান্তি নিয়েছেন। আমার দানে ভিক্ষাপাত্র ভরিয়ে নিতে ভিক্ষুকের সাজে তাঁর আগমন। প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, আমার সব তোমারই জন্য। আমি তোমারই তোমারই। আমাকে নিঃশেষ করে দিয়ে পরিবর্তে বিরাজ করো তুমি।"

নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদ জানার পরে মিস লংফেলো মিস ম্যাকলাউডকে ১৯ নভেম্বর লেখেন—

"মার্গটের সহসা মৃত্যুর শোকসংবাদ এসে আমাকে ভয়ানক আঘাত করেছে। তোমার শোক আমারও শোক। এমন একজন বন্ধু চলে গেল, তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছি।

কী অসহ্য মনে হয় যখন ভাবি, তাঁর মত সুকোমল ভালবাসা ও ভক্তির জীবন ওহেন নারকীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাপ্ত হল!

এখনো পর্যন্ত বাইরের তথ্যটুকুর বাইরে আর কিছু শুনিনি। যে-দুঃখ ওলিয়া দিয়েছে এবং যে পরিণতি হয়েছে, তার কর্মফলের মুখোমুখি ওলিয়া কিভাবে হবে জানি না।

সিলভিয়া (ওলিয়ার কন্যা) সম্বন্ধে তুমি পূর্বে যা ভাবতে এখনো তাই ভাবো কি? শিশুটির সামনে কি বিচিত্র ভবিষ্যৎ!

কতই চেয়েছিলাম, আশাও করেছিলাম, মার্গটের সঙ্গে আবার দেখা হবে, অন্য নানা বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলব, এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন থেকে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু ও-বিষয়টার নতুন দিক সদাই দেখা যাচ্ছিল আর সে মুক্তি পাচ্ছিল না তার থেকে। আলোচনার বিষয়ের মধ্যে মার্গট যখন ঢুকে পড়ত, তার তখনকার দীপ্ত, সচেতন, জীবন্ত মুখের চেহারা মনে পড়লে কী গভীর আনন্দ হয়। তার তুলনায় মনে হয় আমরা অর্ধ-জীবিত। আর এখন, সে আগের চেয়েও কত বেশী, কত বেশী জীবিত।"

উইলের মামলার জন্য নিবেদিতা যখন সবচেয়ে অন্তর্যাতনায় আছেন, তখন বস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্টে মিস্ লংফেলো নিবেদিতার বিষয়ে চমৎকার একটুকরো রচনা প্রকাশ করেছিলেন। রচনাটি নিবেদিতাকে এতই সান্ত্বনা ও আনন্দ দেয় যে, কয়েকটি চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন, আমরা দেখেছি। রেম'-সংগ্রহে তার কর্তিত অংশ রয়েছে। সেটি এই—

SISTER NIVEDITA

Some twelve years ago there came to Boston a young lady, a member of a Hindu religious order, to speak at one of the meetings of the Free Religious Association. Her bright, intelligent face, her earnest manner and attractive personality, enhanced by the simple white habit of her order, made a strong impression on the audience.

Miss Margaret Noble, although her home was in England, is of Irish family, and has all the ardour and fire of the Celtic temperament. She believes strongly in the universality of true religion, in all its various manifestations. The old religion of India made the strongest appeal to her intense, imaginative nature, and her ardent desire is to enlighten the Western world in regard to its many beauties and heights of spiritual thought. She has adopted the country and its life so completely that she

sees everything from the Indian point of view. She knows it to be a country where the ideal is the real, and the real the ideal, and she hopes to bring some of this idealism to the hard, practical life of the West, and to carry to India the best part of this practicability as a basis for its daily life.

Miss Noble has made several visits to Boston, giving talks in private houses, and has many friends here, but her chosen life is among the Hindus in India, where she loves the simple, religious, poetic customs and people. With another sister of the order, she has opened a school in Calcutta for girls and for married women, whose husbands desire to widen their interests beyond the home life. Miss Noble has also found time to write several books about India—its legends and religion. The last one, "My Master", was most favourably reviewed by Canon Cheyne in the Hibbert Journal.

He says: "This book may be placed among the choicest religious classics on the same shelf with "The Confessions of St. Augustine," and Sabatier's life of St. Francis..........There are many important ideas which might be quoted from this remarkable volume. . . The possibility of finding all religions true and yet be a loyal adherent of one of them."

In Miss Noble's case she has never broken her connection with the English Church, of which she is a communicant. At Christmas time the monks of the order show their reverence for Jesus by reading the story of the Nativity, somewhat in the spirit of the early Franciscans, and the miracle plays. Several months ago, at the urgent summons of her dying friend Mrs. Ole Bull, she dropped her work and at a day's notice took the long journey to America to be with her friend and to give the comfort one may at such a time.

After her friend's death her desire was to return to her home and work as speedily as possible, but she felt bound by some promised lectures, and by the desire to be of assistance to her friend's family.

The Hindus act as if their dead were still present in the body as well as in the spirit. Their belief is that "the soul of the righteous goes back to the Father, to be poured out as love, wisdom and peace." "The human frame looses a life, which is gained by all who loved the soul, radiating as wisdom, beneficence and love."

With this thought in her mind, she lingered in this country for several weeks, and then, feeling she was not longer needed, she returned to India as quietly as she came.

Her parting greeting from the steamer was a verse from the Indian Daily Prayer for the world.

In the East, and in the West,
In the North, and in the South
Let all things that are,
Without enemies, without obstacles,

Having no sorrow, and attaining cheerfulness,
Move forward freely,
Each in his own path!

ALICE M. LONGFELLOW

Craigie House, June 29.

নিবেদিতার দেহান্তের পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় জগদীশচন্দ্রের প্রয়াস : নিবেদিতা বিষয়ে ডঃ বসুর কয়েকটি চিঠি

নিবেদিতার দেহান্তের পরে জগদীশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা কল্পনা করতে পারি কিংবা পারি না। কী সে যন্ত্রণা যা বিঁধেছিল এই বিরাট পুরুষের হৃদয়কে, যে-হৃদয় শুধু একাকী বহন করে, নিজের হাহাকারে অপরকে পীড়িত করতে লজ্জিত হয়, সেই বেদনার সামান্য আভাস আমরা পাই ১৯১৩ সালে লেখা সিস্টার ক্রিস্টিনের এক চিঠি থেকে—

"ডঃ বসু দৈহিক ও মানসিকভাবে এখন অনেক ভাল। তিনি আমাদের মধ্যে বেশীদিন থাকবেন না, এ ভয় আর না করলেও চলবে। জীবন তাঁর কাছে নীরস, প্রাণহীন। অবিরত বলছেন, জানি না কী করে আমার দিন কাটবে! মার্গট তাঁকে পুরোপুরি বুঝেছিল ; সহানুভূতি, সাহায্য, উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছিল। বুঝতেই পারো, কী শূন্যতা সৃষ্টি করে সে চলে গেছে!"

যে-ইতিহাস-পরিক্রমা আমরা দীর্ঘ কয়েক শত পৃষ্ঠা ধরে করলাম, তারপরে নিশ্চয় আমরা বিস্মিত হব না যদি শুনি, নিবেদিতার মৃত্যু জগদীশচন্দ্রের প্রায়-মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, এবং দেড়-দুই বৎসর পরেও তিনি হাহাকার করেছেন। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই, নিবেদিতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের কোনো লেখা পাওয়া যায়নি। এই অদ্ভুত ব্যাপারের হেতু কি?

জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিস্বভাবে একটা শালীন সংকোচ ছিল, যা ধন্যবাদ ঘোষণার আতিশয্যকে অনেক সময়েই স্থূল মনে করত। তদুপরি নিবেদিতার বিষয়টি একেবারেই স্বতন্ত্র—জগদীশচন্দ্রের জীবনের প্রেরণালক্ষ্মী তিনি—তাঁর কাছে প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতার চেয়ে প্রগল্‌ভতা আর কি হতে পারে? ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কিন্তু জগদীশচন্দ্র হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন অকুণ্ঠে। তেমন দুর্লভ কয়েকটি চিঠি আমরা রেম' সংগ্রহে পেয়েছি। সেগুলি উপস্থিত করব।

নিবেদিতাকে লেখা ও নিবেদিতার সম্বন্ধে লেখা
জগদীশচন্দ্রের পত্র

আগেই বলে এসেছি নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লেখা চিঠি আমরা প্রায় পাইনি। নিবেদিতার যে-কটি চিঠি পেয়েছি, সেগুলির উল্লেখ পূর্বে করে

এসেছি। নিবেদিতাকে লেখা ডঃ বসুর মাত্র একটি চিঠিই রেমণ্ড-সংগ্রহে রয়েছে।* আর আত্মপ্রাণার নিবেদিতা-জীবনীতে আর একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত আছে। এই পত্রটিতে, কার্জনের বিরুদ্ধে নিবেদিতার কৌশলী আক্রমণের জন্য ডঃ বসু তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। লর্ড কার্জন তাঁর সমাবর্তন ভাষণে প্রাচ্যদেশীয়দের কার্যতঃ মিথ্যাবাদী বলেছিলেন। নিবেদিতা তার উত্তরে অমৃতবাজার পত্রিকায় এক বেনামা লেখায় কার্জনের নিজের রচনাংশ উদ্ধৃত করে তাঁকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেন, যার ফলে সর্বত্র বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খুব অল্প কয়েকজনই আসল লেখক কে, তা জানতেন। জগদীশচন্দ্র জানতেন। নিবেদিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ভালই হয়েছে, লেখকের পরিচয় লোকে জানে না।—"বজ্র যেন সর্বদা কালো মেঘের পশ্চাতেই থাকে, যাতে করে আকাশের কোন্ অংশ থেকে তা নিক্ষিপ্ত হল, তা কেউ না বুঝতে পারে!"

রেমণ্ড-সংগ্রহে রক্ষিত জগদীশচন্দ্রের পত্রটির তারিখ ১৬ অক্টোবর, ১৯০৮। কোথা থেকে লেখা, চিঠির মধ্যে তা নেই ; তবে পোস্টাল স্ট্যাম্প থেকে বোঝা যায় কেম্ব্রিজ ম্যাসাচুসেটস্ (অর্থাৎ ওলি বুলের বাড়ি থেকে) থেকে লেখা, পাঠানো হয়েছিল নিউইয়র্কে মিসেস লেগেটের ঠিকানায়। পত্রটির মধ্যে, সবচেয়ে বিচিত্র কথা, কোনো সম্বোধন বা স্বাক্ষর নেই। হাতের লেখা অবশ্যই জগদীশচন্দ্রের এবং খামের ঠিকানায় মিস মার্গারেট নোবলের নাম। সহজেই বোঝা যায়, অতি গভীর আত্মিক সম্পর্কের জন্যই জগদীশচন্দ্রের পক্ষে সম্বোধন করা বা স্বাক্ষর দেওয়া সম্ভব হয়নি, যার অর্থ, জগদীশচন্দ্রের হৃদয়ে প্রতিভাত মার্গারেট নোবলকে কোনো নামেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চিঠিটির ছবি আমরা দিয়েছি বলে এখানে অনুবাদ দিচ্ছি—

"আশা করি যাত্রা নির্বিঘ্ন হয়েছিল, এবং বন্ধুদের সঙ্গে গন্তব্য স্টেশনে দেখা হয়েছিল।

আজ মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গের মহাদিন, (রাখীবন্ধনের দিন)। তাঁর সেবায় আমরা যেন সবাই নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি! কত আশীর্বাদে ভরপুর আমাদের জীবন। পূর্ণ হৃদয়, উদ্বেল। সকল প্রিয়জন যেন তাঁর আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, রক্ষা করুন চিরতরে।"

নিবেদিতার মৃত্যুর কুড়ি দিনের মধ্যে ডঃ বসু মিসেস উইলসনকে যে পত্র লেখেন, তার মধ্যে গ্রন্থরচনায় নিবেদিতার সাহায্যের বিষয়ে সমস্ত কথা এক লাইনে বলে নেওয়া হয়েছে : "যে বইটি সে আমাকে লিখতে সাহায্য করছিল, তা আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।" সে বই নিয়ে অগ্রসর হবার কোনো সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই, একথা বলার পর ডঃ বসু বললেন, "নিবেদিতা থাকলে কিন্তু এক দণ্ড সময়ও নষ্ট হতে দিত না। তবে সে তো শরীরিণী নয়—সে মনোময়ী।"

---

* ইতিপূর্বে উদ্ধৃত জগদীশচন্দ্রের ৩০ মার্চ, ১৯০৪-এর চিঠি নিবেদিতাকে লেখা হতেও পারে।

চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

My dear friend, 2nd Nov. 1911.

I have faced and gone through the papers left. There is a mass of material for two books, but very incomplete. Then there are some of which two books could be made up.

And then the book which she was helping me to write is staring me in the face. I have not at present the strength to do anything with it.

And lastly there is the Women's School. She left it *entirely* under the control and guidance of Christine. When I asked N. to leave a prviso, in case Christine could not carry out the work—poor child broke down feeling her helplessness. Then we assured her that every one of her wishes will be fully carried out, and that *they shall.*

Only I don't see the way just now. Christine is nervous, and is disinclined at this moment to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary 'nerve' or she does not feel herself up to it.

Only one feels that we are letting time be wasted. If she had survived us she would not have allowed a single hour go by. But then she had no body, it was all mind. There was no such thing as despondency or despair in her composition.

Why did you not have another sister? I fear I shall never time to see your children grow up.

Yours [. . .]
J. C. Bose

এর পরে ১৪ অগাস্ট, ১৯১২ তারিখে ডঃ বসু মিসেস উইলসনকে যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যে নিবেদিতার বাসকক্ষ, গ্রন্থাগার এবং আরব্ধ কার্যের নির্বাহ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আছে।—

93 Upper Circular Rd.,
14th Aug. 1912

Dear Mrs. Wilson,

I am glad to see your taking so much interest in the children. I hope Miss Richard's school will be suitable. Thinking I would be interested, Miss Macleod sent me your letter to her. About little Cecily, you speak something about non-conformist conscience which I could not understand. If she wants to be a saint by all means encourage. Bless the child!

There is another reference about my desire to keep Nivedita's room like a museum, and Christine's want of freedom and scope. You were afraid I would feel hurt if you wrote to me about it. Please never think like that, for misunderstanding might arise on absolute wrong basis.

I am afraid you must have misunderstood Christine's letter. You would know how impatient Nivedita was of all morbid sentimentality, and a man is still more sane in such matters. The question arose about the dispositions of the books and other things, that was in her sitting room at Bosepara. You will understand that it is a workroom with some distinction—with a few fine pictures and Ivory Crucifix and a beautiful and rare statuette of Buddha. It was used as her study and reception room—this being in the outer courtyard where the Zenana school girls do not come.

I gathered from Christine that she would like the valuable collection of books on India, to be undisturbed so that girls from the school might afterwards consult it. So I encouraged the idea, and wished Christine to use the room for her school, as a library recitation room or any other purpose; or Christine might use it to receive her men friends. It was left to her entire disposal. Lest she misunderstood me, I asked her last Sunday, whether the room has been used for the school. She said that as it was in the outer courtyard, she used it for her own reception room. I then enquired whether she would like to have the existing furniture changed and get other things. To this she said, nothing could be so distinguished as the present arrangement.

You must remember that Christine has another and better sitting room of her own. She has the entire control and management of the school.

Naturally, the Math and leading monks have the school under them. But I have arranged matters in such a way that the only thing they do is to find money at the beginning of each month. They have no voice in the management or the policy of the school. Christine can have the school open as long as she likes, or keep it close. There is no one to whom she has to give any account. We only hear anything she wishes to tell us. The matter, as I said is left solely and absolutely under her control.

She spoke sometimes ago about the stifling atmosphere of Bosepara and the heat. So we arranged that she would stay with us and go to school everyday. We have a large house, and there are we two and my sister. There is thus plenty of space. After much pressure, Christine came on a visit, but stayed only two days. She spoke of the rooms being much cooler at No. 17 Bosepara! She has not come twice (?). I think she would miss her friends in the lane.

You will have an anxious time moving to the new place. You have not sent me the new address, so I am sending something to you earlier than I intended. I want the children to observe the birthday in October. My bankers will send a cheque of 10 to 5 Ashgrove. (Messers Henry King Co., London).

With best wishes for the new venture.

Yours very sincerly
J. C. Bose

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে পাঁচ বছর কাটবে—জগদীশচন্দ্র অবশেষে সফল হবেন তাঁর এবং নিবেদিতার স্বপ্নকে সফল করতে। বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর, ডঃ বসুর ৫৯তম জন্মদিনে। অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি চলছিল। এইকালে নিবেদিতার স্মৃতি জগদীশচন্দ্রের মনকে কিভাবে আলোড়িত করেছিল তার সুগভীর পরিচয় পেয়েছি ২৭ অক্টোবর, ১৯১৬ তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা একটি চিঠি থেকে। অপূর্ব চিঠিটি—প্রতিটি শব্দ অনুভূতি-রেখাঙ্কিত। এর মধ্যে জগদীশচন্দ্র হৃদয় উজাড় করে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পত্রের সূচনায় তাঁর নিঃসঙ্গ করুণ মনের ছবি। মিসেস উইলসনকে লিখেছিলেন—"তুমি জানো না, তোমার এবং তোমার সন্তানদের চিঠি জীবনে সুখের ও সৌন্দর্যের যা-কিছু আছে, তারই স্পর্শ এনে দেয়। আমার প্রতি সহৃদয়, এমন অনেকে আছেন সত্য, কিন্তু আমি স্বভাবে সংকুচিত, নতুন বন্ধু করতে পারি না, এমন বন্ধুর কথা বলছি, যাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা চলে।"

এর পরে নিবেদিতার কথা প্রায় কাব্যের ভাষায়—

"আমরা ১৩ তারিখটি (নিবেদিতার মৃত্যুদিন) উদ্‌যাপন করেছি, কিন্তু আগামীকাল হল (নিবেদিতার) জন্মদিন। ঐ দিনটি যখন স্মরণ করব, আমাদের মনে পড়ে যাবে, তাঁর আত্মা উত্থিত হয়েছে, বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে। যে-শক্তি প্রতিদিন আমার মধ্যে জাগছে, যেভাবে আমি উত্তরোত্তর ভার বহন করে চলতে পারছি, যা এককালে সুদূর স্বপ্নের বিষয় ছিল—এই সকলের মধ্য থেকে আমি ক্রমেই বুঝতে পারছি অমরতার যথার্থ অর্থ কী? যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি—সকলে বলছে কোনো একা মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব—তাহলে সে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।...

বসু বিজ্ঞানমন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়েও সুন্দর হবে। প্রবেশপথের বাম পার্শ্বে পাথরের বিরাট একটি পদ্ম—পদ্মটিই জলাধার, যার উপরে সত্যকার পদ্ম ফুটবে। তার উপরে রিলিফ মূর্তি, এক নারীর. তাঁর হাতে জপমালা এবং প্রদীপ। এই বিজ্ঞানমন্দির তাঁরই প্রার্থনামূর্তি। ১৩ তারিখে চিতাভস্ম একটি আধারে করে পদ্মের ঠিক পাশে স্থাপন করা হয়েছে। দুটি প্রস্তরবেদী থাকবে, ঝুঁকে পড়বে একটি **শেফালী** গাছ, যা প্রতি সকালে ঝরিয়ে দেবে ক্ষুদ্র শুভ্র ফুলগুলি, মাটির উপরে বিছিয়ে যাবে ঘন আস্তরণ। এর বীজ তিনি এনেছিলেন অজন্তা গুহা থেকে, এবং বিদ্যালয়ভবনে রোপণ করে যে-কয়েকটি চারা তৈরী করেছিলেন, তারই একটি এনে বসিয়েছি।"

জগদীশচন্দ্র যা বললেন, এর বেশী আর বলা সম্ভব নয়। তবে আর একটি তথ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—জগদীশচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল

মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুদিনে বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করবেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তাছাড়া ঐ চিঠি থেকে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের নিবেদিতা সম্বন্ধে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সংবাদও পেয়েছি। আরও জেনেছি, নিবেদিতার পত্রগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে ডঃ বসু ও মিসেস উইলসনের মনে আলোচনা চলছিল।

পত্রটি মূলে এই—

Darjeeling
27-10-16

My dear Mrs. Wilson,

Your much welcome letter just received. You do not know how your letters and those of the children put me in touch with all that has been happy and beautiful in life. Though there are many who are kind to me, I am naturally reticent, and I cannot make new friends—I mean those to whom you can talk about things that matter.

We observed the 13th, but tomorrow is the Birthday. We will think of that day reminding us that her spirit is risen and is among us. Through the strength that is daily coming to me, and the way in which I am able to carry out more and more of what at one time had been like a dream, through these I realise more and more of the real meaning of immortality. If I am able to carry out that work, which everyone thinks it impossible for one man to accomplish—that will be due to the strength which comes from the life and memory of those who are living in us.

I had to work out many things, and the strain was too great. I am glad to say that my natural constitution is very strong, and two weeks rest in the hill station has made a different person of me. I hope it will not be necessary in the future to over-exert myself.

I have the good fortune of winning the love of our own people, as also the trust of the government! How long it takes for people to be properly understood! You will be astonished to hear that our present Governor Lord Carmichael is a great admirer of Nivedita. He has bought all her works, and wanted very much to have a good portrait.

The Bose Institute will also be beautiful architecturally. As you enter there is a large stone lotus on the left—that is the basin in which water lilies will grow. Just overlooking that will be a bas-relief of a woman, with prayer beads and a lamp in her hand. The Institutite is the embodiment of her prayer. On the 13th, the ashes were laid in a receptacle just by the side of the lotus. There will be two stone seats, and there will be a overhanging *shefali* tree, which sheds every morning lily white flowers, and makes a white carpet on the ground. The seed she brought from the caves of Ajanta and the plant was one of several which she planted in the school grounds.

I intend to formally open the Institute on the anniversary of St. Sara's passing away—I believe about the 11th Jan. It will be a great national occasion. Other people are realising its importance, as you will see from the enclosed which some friends have printed for private circulation.

As regards the papers and correspondence, I have a good number, I also got copies of letters to St. Sara. But these may not be enough. What do you think of the following idea? I could have the letters accepted by the Modern Review and as we publish them, there will be others coming in from people who would see the [ ] in the magazine. These may afterwards be collected, rearranged (if necessary) and published in book form.

Write to me as often as you can. For I feel very solitary. I try to keep myself busy and my work finds good acceptance. The outside appreciation can never fill up that longing to have the touch of hands that met [ ] in comradeship or in token of blessing.

With much love to self (?) and children.

Yours affectionately,
J. C. Bose.

আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে যখন লিজেল রেম' ও জিন হারবার্ট একত্রে নিবেদিতা-জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন, তখন স্বভাবতঃই ডঃ বসুর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। মিসেস উইলসন ডঃ বসু ও রেম'-হারবার্টের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করেন। মিসেস উইলসন শ্রীমতী রেম'কে এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করেছেন—

"শ্রীযুক্ত জিন হারবার্ট এবং শ্রীমতী রেম' কলকাতায় এসে সাক্ষাৎ করলে অবশ্যই সুখী হব। আমার বৈজ্ঞানিক জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে পূর্ণ সাফল্যলাভ না করা পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ে নিবেদিতা যে সাহায্য করেছেন—সেই কথাই শুধু তাঁদের বলতে পারব। তৎকালীন যথার্থ পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত নয়, এমন কারো পক্ষে ভারতের জাতীয়তার উদ্বোধনে নিবেদিতার নিঃস্বার্থ ভক্তি এবং সুদীর্ঘ সহনের মূল্য বোঝা সম্ভব নয়।"

ডঃ বসু ৭ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে জিন হারবার্টকে যে চিঠি লেখেন, তাতে সুস্পষ্টভাবে জানান—"ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিবেদিতার গভীর বিশ্বাসই আমাকে আমার রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছে।" টাইপ করা এই চিঠিটির ছবি ছাপা হয়েছে বলে বিষয়বস্তুর পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন নেই।

অবলা বসুর নিবেদিতা বিষয়ে রচনা

[নিবেদিতার প্রতি প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রয়াসকে কৃতজ্ঞতার নগদ বিদায়ের মত ডঃ বসুর মনে হয়েছিল। যে কাজ নিজে করতে পারেননি, অপরকে

দিয়ে যথাসম্ভব সে কাজ করিয়ে নিয়েছেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় অবলা বসুর নামে প্রকাশিত শোকপ্রবন্ধে বসুদম্পতির বক্তব্যই নিবেদিত হয়েছিল। নিবেদিতা স্মৃতিভাণ্ডারে শ্রীমতী বসুর নামেই চাঁদা দেওয়া হয়। রেমণ্ড-হারবার্ট যখন জগদীশচন্দ্রকে নিবেদিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন, তখন সংক্ষেপে মূল কথা বলে ডঃ বসু জানান, অতঃপর বাকি কথা লেডী বসুই বলবেন। ডঃ বসু যখন অনুভব করেছিলেন, নিবেদিতা সম্বন্ধে কিছু লেখা তাঁর পক্ষে সত্যই অসম্ভব, এমনই অনির্বচনীয় সে অনুভূতি, অথচ লেখা প্রয়োজন, তখন তিনি দেশের সবচেয়ে বড় বাণীশিল্পীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই অনুরোধ রক্ষায় এবং নিজ প্রাণের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছিলেন, তার ফলে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামক অসাধারণ রচনাটি আমরা পেয়েছি। নিবেদিতার রচনা সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজে ডঃ বসু কতখানি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার তথ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। নিজ উইলে বসুদম্পতি নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা রাখেন, যা দিয়ে লেডী বসু তাঁদের স্থাপিত 'বাণীমন্দিরে' নিবেদিতা হল নির্মাণ করে দেন।

মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত লেডী বসুর রচনাটির অনুবাদ উপস্থিত করছি।*]

---

* লেডী বসুর কথা ইতিমধ্যে অজস্র উল্লিখিত হয়েছে। ডঃ বসুর এই জীবন-সঙ্গিনী সত্যই শ্রদ্ধেয়া মহিলা। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে সর্বগুণসম্পন্না সাধ্বী গৃহিণী বলেছেন, তাঁর চরিত্রগুণ সহজেই অনুমান করা যায়। ডঃ বসুর জীবনীকার অধ্যাপক গেডিস শ্রীমতী বসুর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাজ্ঞান করে বলেছেন—'বসু সত্যই ভাগ্যবান, এমন জীবনসঙ্গিনী পেয়েছিলেন!' ডঃ বসুর দীর্ঘ সংগ্রামজীবনে ইনি স্নেহ ও শক্তি নিয়ে সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছেন। অর্থকষ্টের মধ্যে যখন তাঁদের যেতে হয়েছে, কঠোর মিতব্যয়িতায় গৃহিণীপনার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন; আবার ডঃ বসুর দেশী বিদেশী অতিথি, বন্ধু বা ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রসন্ন মর্যাদার সঙ্গে।

অবলা বসুর জন্ম ১৮৬৫ সালের ৮ অগস্ট। বিশিষ্ট ব্রাহ্ম দুর্গামোহন দাশের ইনি দ্বিতীয় কন্যা; প্রথম কন্যা সরলা রায়, অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী, পরে গোখলে মেমোরিয়ল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী। দুর্গামোহন দাশ প্রথমে কেশবচন্দ্র সেনের দলভুক্ত ছিলেন, পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন। এখানে স্মরণযোগ্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অবলা বসুর খুড়তুতো ভাই।

অবলা বসু প্রথমে বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরে মাদ্রাজে মেডিকেল শিক্ষা নিতে শুরু করেন, চার বছর তা নেনও, কিন্তু সমাপ্ত করার আগেই ১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহিত হন, ও শিক্ষায় ছেদ আসে। অতঃপর স্বামীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে তাঁর জীবন মিশে যায়। ডঃ বসুর সব কয়টি বিদেশ ভ্রমণে ইনি সঙ্গী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে এঁর আগ্রহ থাকার জন্য বিদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যথাসম্ভব দেখেছিলেন।

স্বদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে এঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে ইনি নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ইনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। এইকালে বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ইনি প্রধানতঃ গ্রামনারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নারীশিক্ষার উপযোগী শিক্ষিকা তৈরীর ব্যবস্থা করেন। সূচীশিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দান আছে। বিধবাদের শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ইনি ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণীভবন করেন। দুঃখী ও উদ্বাস্তু মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উইমেনস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কিছু সময়ের সভানেত্রীও ইনি ছিলেন, এবং আড়িয়াদহে সাধনা আশ্রম স্থাপন করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে তা দান করেন।

এখন থেকে ঠিক তের বছর আগে একজন ইংরাজ রমণী, বয়সে তরুণী, স্বাস্থ্যের আর তেজের প্রতিচ্ছবি, উৎসাহে জ্বলন্ত মুখখানি—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন : তিনি আমাদের নারীসমাজের সেবা করতে চান, বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে, আর সেইজন্য যাদের সেবা তিনি করতে চান তাদের জীবনযাত্রা বরণ করবেন, ঠিক তাদেরই একজন হয়ে যাবেন।

আরও অনেক দিন পরে, যখন আমি তাঁর বন্ধুত্বের পুণ্য গৌরব পেলাম, তখনই ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলাম মার্গারেট-ই-নোবলের জীবনের আধারে রয়েছে কী শক্তি! সে কী না পুণ্য আশিস্ তিনি সহস্রধারে বর্ষণ করতেন তাঁর সঙ্গধন্যদের উপর। কতদিকে তিনি আমাদের মাতৃভূমির প্রত্যক্ষ সক্রিয় সেবা করেছেন, সে কথা আজ এত শীঘ্র আমরা বলে উঠতে পারব না। এখানে আমি শুধু আমাকে যা এত অভিভূত করেছে, সেই তাঁর সুন্দর জীবনের দু'একটি আলোকরেখাকে অবারিত করছি।

তাঁর এমন জীবন, এ কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। তাঁর পিতা ইংরাজ ধর্মযাজক, বাগ্মী—জীবনের বিরাট সাফল্য-সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে, তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে তরুণ বয়সে ম্যাঞ্চেস্টারের দরিদ্রদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। পিতার বন্ধুদের একজন ভারতে ধর্মপ্রচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তিনি দেখা করতে এসে বন্ধুকন্যাটির শিশুমুখে সুগভীর আধ্যাত্মিক আবেগ লক্ষ্য করে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন, একদিন ভারতের ডাক তোমার কানে পৌঁছবে। দৈববাণীর মত কথাগুলি, সত্য-বাণীর মত তা সফল হয়েছিল। পিতাও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তরুণী পত্নীকে বলে যান, ভবিষ্যতে একদিন তাঁদের শিশুকন্যার কাছে মহান্ আহ্বান আসবে, সেদিন জননী যেন তাঁর কন্যার পাশে সমর্থন নিয়ে দাঁড়ান। তিনি প্রথম থেকে এইভাবেই উৎসর্গীকৃতা। তাই যখন আহ্বান সত্যই এল, তখন মায়ের প্রাণ যদিও বিচ্ছেদ-বেদনায় মথিত, তবু তাঁর লোকান্তরিত স্বামীর স্মৃতি তাঁকে শক্তি দিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর কন্যার ভক্তি-ভুবন ভারতবর্ষ তাঁরও শ্রদ্ধাতীর্থ ; তাঁর উইম্বলডনের গৃহখানিতে ভারতীয়রা সর্বসময় তাদের নিজস্ব ঘরখানি খুঁজে পেত।

শিশুকন্যাটির মধ্যে ক্রমে বিরল মনস্বিতার বিকাশ ঘটল। হাক্সলি পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধিশক্তিতে চমৎকৃত হলেন। কালক্রমে তিনি বিরাট একটি শিক্ষা-আন্দোলনের কেন্দ্রচরিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। এই আন্দোলনের অন্যতম পরিণতি বিখ্যাত 'সীসেম ক্লাব'। তাঁর অপূর্ব মনস্বিতার জন্য যখন লন্ডন শহরে তাঁর সামনে বিরাট ভবিষ্যতের দ্বার খুলে গেছে, ঠিক তখনি ভারতের ডাক তাঁর কাছে পৌঁছল। স্বামী বিবেকানন্দ তখন লন্ডনে প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। প্রাচ্যের সেই বাণীতে তিনি সাড়া দিলেন। আজীবন সেবার ব্রত ধারণ করে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন অনতিবিলম্বে।

যাঁরা অবলা বসু সম্বন্ধে বেশী জানতে চান, তাঁরা ডঃ ডি. এম. বসু রচিত, মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জুন, ১৯৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত *Abala Bose and her life and times* প্রবন্ধটি পড়লে ভাল করবেন।

তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতে আমি কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল ভগিনীদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভরসা বোধ করতে পারিনি। এর কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে তাঁর বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে আহ্বান জানালেন। সেখানে গিয়ে চমৎকৃত। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাড়ি নিয়েছিলেন বলে প্রথমে কোনো হিন্দু ভৃত্য তাঁর কাজ নেয় নি। তিনিও প্রতিবেশীদের ভাবে আঘাত করার চেয়ে বিনা চাকরেই রইলেন। কতবার হয়েছে, রান্না করা সম্ভব হয়নি, শুধু ফল খেয়ে কিংবা কোনো সহৃদয় প্রতিবেশী যা পাঠিয়েছেন, তাই খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কিছুদিন পরে সেই প্রতিবেশীরাই তাঁকে এমন আপন জন বলে মনে করল যে এমন কি সবচেয়ে রক্ষণশীল অথচ শ্রেষ্ঠা তাপসী নারীও* তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতে পেরে খুশী হলেন।

সে এক অপরূপ কাহিনী—কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে, ধৈর্যশান্ত প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করলেন! প্রথমে এল পাড়ার শিশুর দল। তাদের নিয়ে কিন্ডার-গার্টেন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল। শিশুর মায়েরাও বেশীদিন সরে থাকতে পারলেন না, তাঁরাও এলেন। তাঁদের পড়ানোর পৃথক ব্যবস্থা হল। অনাথা আর বিধবারা, তাঁর কাছে সর্বদা পেত সহানুভূতি ও সেবার প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ হৃদয়ের আশ্রয়। শিক্ষয়িত্রী করে তোলার ইচ্ছা নিয়ে তাদের তিনি শিক্ষা দিতেন।

এইভাবে রক্ষণশীল সমাজের বুকের মধ্যে 'ভগিনী নিবাস'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটল। ভারতে তাঁর এই কাজ এমন ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অতিশ্রেষ্ঠ মানুষেরও কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে আসতেন। তাঁরা ফিরে যেতেন এই দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—যে-দেশকে ইনি স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন।

পাশ্চাত্তোর একজন এঁকে কন্যা বলে গ্রহণ করেছিলেন।† তাঁর সাহায্যে এবং নিজ লেখা থেকে অর্জিত টাকায় ইনি নিজ সংসার ও বিদ্যালয় চালাতেন। তাঁর প্রতিবেশীরা জানতেন, তাঁর আয়ের বড় অংশ কিভাবে দুঃখীর প্রয়োজনে, ক্ষুধাতুরের ভোজনে ব্যয়িত হত। নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর জন্য তিনি উৎসর্গ করতেন।

তাঁর পৌরনীতিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র রূপে অচিরে তাঁর গলি এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চল পরিচ্ছন্নতার একটি আদর্শ ছবি হয়ে দাঁড়াল। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজ হাতে পথ পরিষ্কার করে পথ দেখালেন। এই সময়েই কলকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব ঘটে। তখন জনগণের ভীষণ আতঙ্কের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। পাগলের মত ট্রেন, স্টীমার বোঝাই করে পালিয়েছিল লোকে। ভীতির যখন চরম, ঠিক তখন মার্গারেট নোবল ত্রাণবাণী নিয়ে এলেন। একদল তরুণকে সংঘবদ্ধ করে তাদের সাহায্যে তিনি শহরের উত্তর অঞ্চলের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর অংশগুলি

* লেখিকা এখানে সম্ভবত সিদ্ধ তাপসী গোপালের মার কথা বলছেন। এঁর বিষয়ে আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে।

† অবলা বসু এখানে মিসেস ওলি বুলের কথা বলেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডও নিবেদিতাকে সাহায্য করেছেন।

পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্লেগরোগীদের সেবার ভার নিলেন, যে-কাজে রোগীদের ছোঁয়াচ ছিল অপরিহার্য। একবার নীচুঘরের একটি শিশুরোগী মারা গেল তাঁর কোলে শুয়ে—সে তাঁকে নিজের মা মনে করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ছিল সারাক্ষণ।

সন্তানকে ঘিরে রক্ষা করার এই মাতৃত্ব তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে—তিনি একবার নিজ ভৃত্যকে গায়ের গরম কাপড়টি দিয়ে দিলেন ; ফলে যদিও তাঁকে শীতে কাঁপতে হয়েছিল, তবু ভেবেছিলেন, ঐ দরিদ্র মানুষটির প্রয়োজন তাঁর থেকে বেশী। অন্যের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করার এ তো মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। চারিপাশের মানুষের অভাব ও দুঃখে তিনি কখনো অভ্যস্ত হতে পারেননি। আর তাই ছিল তাঁর নিত্য বেদনার কারণ।

প্রথমবার যখন ভারতে আসছেন, তখন একই জাহাজে আসছিল একটি ইংরেজ যুবক। ছেলেটিকে তার পিতামাতা বাড়িতে সামলানো অসাধ্য মনে করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেন। ছোকরা অসংযত-প্রকৃতি, খাওয়ার টেবিলে উৎপাত-বিশেষ। সকলেই তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু মার্গারেটের হৃদয় ভরে গেল গভীর করুণায়। বাড়ির শাসন আর প্রভাবের বাঁধন-কাটা ছেলেটির ভবিষ্যৎ কী ভয়ঙ্কর! ছেলেটির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে লাগলেন, তাকে তাঁর সঞ্চয়ের মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিসটি, একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন। ঐ ঘড়িটি জন্মদিনে মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মার্গারেট ছেলেটিকে বলেছিলেন, সে যেন কদাপি ঘড়িটি হাতছাড়া না করে—নিজ জীবনকে নিজে নির্মাণ করতে সে সমর্থ—তার উপরে একজনের এই বিশ্বাসের স্মারকরূপে যেন সে উপহারটিকে রক্ষা করে। গত বছর ছেলেটির মায়ের কাছ থেকে একটি মর্মস্পর্শী পত্র এসেছে। নিবেদিতার মধ্য দিয়ে তাঁর পুত্র কিভাবে নবজীবনের পথ খুঁজে পেয়েছিল, ঐ পত্রে সেকথা তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন ; দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর পুত্র সেকথা স্মরণ করেছে,—মা লিখেছিলেন।

নিবেদিতার মাতৃহৃদয়ের ঐ সমুদয় রক্ষা-শক্তি এসে কেন্দ্রীভূত হল ভারতবর্ষে। যে কঠোরতা বরণ করতে হল, তা অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে দিল। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে রইলেন দীর্ঘদিন। আরোগ্যলাভের পরে ডাক্তারের বিশেষ সতর্কবাণী শুনলেন, কর্মবাহুল্য তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বনাশা।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সংবাদ যে এসে গেল! এ দেশের মানুষের কষ্ট, আর তিনি শান্ত নিশ্চিন্ত থাকবেন, সে কি হয়! তাঁকে যেতেই হবে। দিনের পর দিন বরিশালের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন বন্যাপ্লাবিত কর্দমাক্ত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে। যে-ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলেন, তাকে পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন 'পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা' রচনায়। জলাভূমির উপর দিয়ে অবিরত ভ্রমণ, তদুপরি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও মানসিক চাপ, ফলে বিশ্রী ধরনের ম্যালেরিয়া ধরল তাঁকে। দারুণ রোগযন্ত্রণা, তবু তাঁর মর্মযাতনার তুলনায় সে কত সামান্য! আবার কাজ শুরু করার মত ক্ষমতা ফিরে পেতে দীর্ঘদিন লাগল। কিন্তু তিনি কোনদিনই এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর পাশ্চাত্তের প্রিয় বন্ধুরা ও এখানের ডাক্তার বন্ধুরা শহরের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর কোনো স্থানে বাসাবদল করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলেও ফল হয়নি, যে-স্থানটি তাঁকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছে তার প্রতি বিশ্বস্ত তাঁকে যে থাকতেই হবে! 'এই গলিটি আমাকে দত্তক নিয়েছে, আমি একে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।' ছোট ছোট যে-সব বাচ্চাগুলোকে গলিতে টলমল করে চলতে দেখেছেন তারা তাঁকে ঘিরে বড় হয়ে উঠেছে—তারা তাঁর সন্তান। কতো ঝড়ো-প্রাণ তাঁর কাছে এসেছে, তিনি তাদের মহৎ করে তুলেছেন। তিনি বাছাই করে নেবেন? সে হয় না। তিনি তুলে নেবেন, যা এসেছে।

প্রতিদিনের জীবনে যা দেখেছি, সেই বিশেষ নারীপ্রকৃতির দিক থেকেই তাঁর কথা আমি বলছি। পূর্ণ তপস্যা আর ন্যায়ৈষণা তাঁকে বেষ্টন করে থাকত পবিত্র অগ্নির মত, তাঁকে আলোকিত করত। অন্যেরা বিরাট নৈতিক ও মানসিক শক্তিরূপে তাঁকে জানবে। এ দেশের পরম প্রয়োজনের ক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, ঐ শক্তির ঐশ্বর্য নিয়ে। তাঁর মত সম্পূর্ণ আত্মবিলয় আমি কোথাও দেখিনি। ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, বা পন্ডিত-কুলের অনেককেই আমি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ম মনীষা, মহান্ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসায় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হতে দেখেছি।* যে-সকল বিরল গুণরাশি পাশ্চাত্ত্য দেশে বিরাট ভবিষ্যতের পথ খুলে দেয়, সে সকলই তাঁর ছিল, আর সমস্তই তিনি অর্পণ করেছিলেন আমাদের মাতৃভূমির সেবায়। তিনি ইংলন্ডকে কম ভালবাসতেন, তা নয়, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ন্যায়ের মধ্য দিয়েই ইংলন্ডকে বড়ো থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে একাত্ম করে দিতে পেরেছিলেন, যাতে আমি তাঁকে কখনো বলতে শুনিনি "ভারতের প্রয়োজন", "ভারতীয় নারী"—সব

---

* নিবেদিতার প্রতিভার ও চরিত্রের প্রতি 'শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় পূর্ণ' বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামগুলি লেখিকা এখানে দেননি। এই প্রবন্ধে তার অবকাশও অল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালেও অবলা বসুর কাছ থেকে সে নামগুলি সংগ্রহ করা হয়নি। জগদীশ বসু ও তাঁর পত্নীর পক্ষে এই নামগুলির সঙ্গে যতখানি পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল, অন্যের পক্ষে ততখানি প্রায় নয়। বিশেষত জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে নিবেদিতার যোগ থাকায়, এবং নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে গ্রন্থে লিপিবন্ধ করার মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করায়, স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক মহলের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘটেছিল। নিবেদিতা অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্বীকৃতির জন্য বহু লড়াই করেন। এখানে একথাও বলতে হবে, জগদীশচন্দ্রের চিন্তা ও আবিষ্কার-গুলিকে নিবেদিতা যে গ্রন্থবন্ধ করেছেন, তা তিনি করতেই পারতেন না, যদি না স্বয়ং তীক্ষ্ম বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হতেন। লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে, যাঁরা জগদীশচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে নিশ্চয় নিবেদিতারও।

নিবেদিতা বোসপাড়া লেন নামক বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলিকে বাসস্থান করলেও বিশ্বচরিত্র। পৃথিবীর চিন্তাবিদ মহলের বৃহৎ অংশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। সে তালিকা বর্তমানে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। নিবেদিতার দেহত্যাগের পঁচিশ বছর পরে সেই কাজ আরম্ভ ক'রে নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেম' অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছেন। বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিন, বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলা, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস্, সমাজকর্মী মিসেস অ্যাডামস্, রাজনীতিবিদ্ রামজে ম্যাকডোনাল্ড, জন ল্যান্ড, কেয়ারহার্ডি, আর্ল মর্লি, লর্ড মিন্টো ও লেডী মিন্টো, সাংবাদিক উইলিয়ম স্টেড, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, এফ জে রেয়ার, ডবলিউ নেভিনসন, অধ্যাপক চেনী, ধর্মযাজক হাউই, সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডিস প্রভৃতির নাম করা যায়। হাক্সলি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন, একথা প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। আমি যে কয়েকটি নাম করলাম, তা অগণ্যের অঙ্গুলী-গণনীয় অংশ মাত্র।

সময়ে তা "আমাদের প্রয়োজন", "আমাদের নারী"। বাইরে থেকে তিনি সাহায্য করতে আসেননি, কদাপি নয়, তিনি আমাদেরই একজন, আমাদের মুক্তির জন্য ব্যাকুল বেদনায় সন্ধান ও সংগ্রাম করে ফিরেছেন।

আর অল্পই বলবার আছে। ভারত সম্বন্ধে দুটি বৃহৎ গ্রন্থরচনার ভার তাঁর উপর দিয়েছিল লন্ডন ও নিউইয়র্কের দুই প্রধান প্রকাশক। সেই কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এর সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের শ্রমসাধ্য কাজও করে চলছিলেন। ফলে স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটল। মনে হল দার্জিলিঙয়ের সুন্দর আবহাওয়ায় হয়ত তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার হতে পারে।

অনেক বছর আগে একদিন বিদেশে রোগশয্যায় তিনি আমার শুশ্রূষা করেছিলেন, আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। এবার সুযোগ আমার। আমরা আশা হারাই নি, কিন্তু তিনি জানতেন, নিয়তি অন্য কথা লিখেছে। তাই বলে কোনো বিষাদ নয়। প্রতি প্রভাতে উজ্জ্বল হাসি আর দীপ্ত কথায় আমাদের অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর জীবনের প্রিয় কাজের কথাই শুধু বলতেন—"আমাদের মেয়েদের" শিক্ষা—সে শিক্ষা কি করে চালাতে হবে, সেই কথা। তাঁর যা-কিছু সম্বল, বই থেকে ভবিষ্যতে যা-কিছু আয় হবে, সবই তিনি উইল করে দিলেন মাতৃভূমির সেবায়।

সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গিয়েও এই শেষের দিনগুলিতে তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর আত্মবিলয় সম্পূর্ণ হয়নি। কে-যেন তাঁকে একবার তাঁর প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কথা বলেছিল! সেই কথাটি নিশ্চয় তাঁর মনে ফিরে এসেছিল। তিনি প্রার্থনা করলেন, এবার তিনি যেন চলে যেতে পারেন, যাতে অন্যরা বেড়ে উঠতে পারে।*[১]

---

*[১] নিবেদিতার এই প্রার্থনা তাঁর গুরুর মনোভাবের সঙ্গে কী গভীরভাবে এক। নিবেদিতা তাঁর গুরুর চিন্তায় ও কাজের মধ্যে জীবনের প্রতিটি শ্বাস নিয়েছেন—অন্তিম ক্ষণেও গুরুর অনুরূপ ভাবনায় তিনি সমাচ্ছন্ন হলেন। স্বামীজী বারাণসীতে তাঁর শেষ ভ্রমণ সাঙ্গ করে ফেরার পরে, নিবেদিতা লিখেছেন, "Strangely enough, in his first conversation......his theme was the necessity of withdrawing himself for a time, in order to leave those that were about him a free hand.

"How often" he said, "does a man ruin his disciples, by remaining always with them! When men are once trained, it is essential that their leader leave them, for without his absence they cannot develop themselves!" (The Master as I saw him).

নিবেদিতা অবশ্য কখনো নিজেকে নেতা মনে করতেন না, এবং যে-কারণে বিবেকানন্দ নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছেন, হুবহু সেই কারণে নিশ্চয় নিবেদিতা নিজে সরে যেতে চাননি, কিন্তু নিবেদিতার মহিমা এইখানে, 'শিষ্যা' বা 'ভগিনী' নিবেদিতাও নিজের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে অপরের বৃদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ মনে করেছিলেন। নিবেদিতার এই উগ্র ব্যক্তিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায় আছে।

নেতা বিবেকানন্দ পরবর্তীদের পথ করে দেবার জন্য কিভাবে উদ্গ্রীব হয়েছিলেন (যার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর চরিত্রমহিমার প্রতি নমস্কার জানিয়েছেন) তার পরিচয় মিস ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথাতেও পাই।—

"He said, 'I delivered my message and I must go'. I asked, 'Why go?' and he said, 'The shadow of a big tree will not let the smaller trees grow up. I must go to make room".

দার্জিলিঙয়ে আসার কয়েকদিন আগে তিনি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন বন্ধুদের কাছে পাঠাবার জন্য।*২ সেটি বিশ্বের জন্য মানুষের প্রতিদিনের প্রার্থনা। তিনি বোধহয় জানতেন, এই তাঁর বিদায়বাণী। বিশ্বমুক্তির জন্য নিরন্তর প্রার্থনার তুল্য তাঁর যে-জীবন—এই বৌদ্ধ প্রার্থনায় তারই ধ্বনি। প্রার্থনাটি তিনি আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন :

> শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত যাহা কিছু আছে, সে সকলের শ্বাস প্রবাহিত হউক, তাহারা নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক।
> পূর্বে এবং পশ্চিমে, উত্তরে এবং দক্ষিণে যাহা কিছু আছে, যাহা শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত, তাহাই নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক।

তাঁর কাছে অজ্ঞানই চরম বন্ধন। তাঁর আনন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যখন তিনি আবৃত্তি করতেন :

> অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ; আমার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রবেশ কর। হে রুদ্র, তোমার কল্যাণ-মধুর মুখদ্বারা তুমি আমাদের নিরন্তর রক্ষা করো!

মেঘে কুয়াশায় পূর্ণ দিনগুলি। কিন্তু ১৩ই অক্টোবরের প্রভাতে কিছু কালের জন্য মেঘ সরে গেল। যে-তরী ডুবছে, তার কথা তিনি বললেন, কিন্তু সূর্যোদয়ও দেখবেন, সে কথাও। তুষারের উপর সদ্য সূর্যোদয় হয়েছে, তারই একটা আলোকরেখা যখন বিচ্ছুরিত হয়ে প্রবেশ করেছে কক্ষে, তখনই সেই বিরাট সংগ্রামী আত্মা চলে গেল, অন্য ঊষার দ্বারে।

তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে আছি আমি, হৈমবতী উমার যে-কাহিনী বলতেন, তা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। এই তো সেই ঋতু, যখন তিনি পিতৃগৃহে আসেন। আমার সামনেও আর এক উমা, তুষারশুভ্র তুষারকন্যা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে ফিরে এসেছেন আবার তাঁর ভারতের ভবনে। তাঁর স্বজন, স্বগৃহকে জানবার জন্য কি তাঁর এই আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল! নাকি আমাদের পিতার গৃহে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম বলে কোনো কথা নেই!

---

*২ কথাটি আক্ষরিক সত্য নয়। মিস্ লংফেলোর জুন, ১৯১১-র লেখায় দেখেছি, ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি এই প্রার্থনাটির অনুবাদ পেয়েছিলেন।

বসু বিজ্ঞানমন্দির*

জগদীশচন্দ্র মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, ভারতীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিবেদিতার আগ্রহই আমাকে আমার বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছে। আগেও মিসেস উইলসনকে এক পত্রে লিখেছিলেন : নিবেদিতার স্বপ্নই আমার বিজ্ঞানমন্দিরের মধ্যে রূপায়িত। তাই বলে গবেষণাগার স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা নিশ্চয় নিবেদিতা তাঁকে দান করেন নি। নিজস্ব গবেষণাগার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই আনন্দস্বপ্ন, জগদীশচন্দ্রের মত কল্পনাপ্রবণ বৈজ্ঞানিকের তো নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ যাঁকে অধিকাংশ সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় বিনা গবেষণাগারে গবেষণা করতে হয়েছে। ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে গবেষণাগার গড়ে উঠেছিল, তাও তাঁরই সংগ্রামের ফলে। সেইসঙ্গে কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার স্থাপনের ক্ষীণপ্রাণ স্বপ্ন-শিশুটিকে মাতৃস্নেহে লালন করেছিলেন নিবেদিতা—তারই জন্য আচার্যের ঐ কৃতজ্ঞতা।[১]

বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৯১৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী, জগদীশ-চন্দ্রের জন্মদিনে। প্রথমে স্থির করেছিলেন মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুদিনে উন্মোচন করবেন, পরে নিজের জন্মদিনে তা করেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয় তাঁর, বা অধিক ভাবে তাঁর অনুরাগীদের মনে হয়েছিল— মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়, বসু বিজ্ঞানমন্দির বসুর আবির্ভাব দিনেই ভূমিষ্ঠ হোক ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে। আমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে, এইরকম এক ৩০শে জানুয়ারীকে অভিবাদন জানিয়ে নিবেদিতা কী লিখেছিলেন। চেতনাসমুদ্রের মহান নাবিকের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত নিবেদিতার সুমহান গদ্য স্তোত্রটির শব্দগুলি একবার শুনলে কখনো ভোলা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে আবাহনসংগীত লিখেছিলেন, তার ধ্রুবপদ ছিল—

> বল, 'জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
> জয় তপস্বীরাজ হে!
> জয় হে, জয় হে, জয় হে!'

বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবার আগে জগদীশচন্দ্র একটি কাজ করেছিলেন —নারী-দধীচির অস্থিচূর্ণ স্থাপন করেছিলেন দ্বারপ্রান্তে। দধীচির আদর্শকে তিনি বহু পূর্বেই পেয়েছিলেন ভারতীয় পুরাণ কাহিনী থেকে। কিন্তু সে আদর্শ বাস্তব সত্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিল নিবেদিতার মধ্য দিয়ে। তাই নিবেদিতা যখন বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধ-বেদীমূলে বজ্রচিহ্ন আবিষ্কার করলেন, এবং ভাবলেন, এই বজ্র প্রতীক হোক ভারতবর্ষের, তখন তাঁর সে অভিপ্রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন ডঃ বসু। তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতীক—বজ্র, মন্দিরভবনের শীর্ষে তা স্থাপিত। তারই নিম্নে আচার্য বসু স্বতঃই নারী-দধীচির বজ্রাস্থি স্থাপন করেছিলেন। সে কথা কিন্তু জানত খুব অল্প জনেই। আচার্য বসু নিবেদিতার

* এই অধ্যায়ের পাদটীকাগুলি অধ্যায়শেষে একত্রে দেওয়া হয়েছে।

বোনকে সে সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর পত্র থেকে আগে জেনেছি। এ বিষয়ে আচার্য বসুর ছাত্র, বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ বশীশ্বর সেন আলমোড়া থেকে ২১ জুন, ১৯৩৯ তারিখে এক পত্রে লিজেল রেমংকে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিলেন :

"The day she left Calcutta for Darjeeling in the last week of September 1911, she told me that she was feeling quite unhappy over the fact that she had not written the History of India she promised Swamiji she would, and also that she wanted a life of the 'Man of Science' written. She showed me the material she had collected......I owe my science to Sister Nivedita. She it was who placed me under Sir J. C. Bose. It is difficult for me to express in words what I feel about her. In my own little ways I try to express in life some of the dynamic ideas she used to radiate.

I brought back her ashes from Darjeeling, part of which is now at Belur Math and the rest of it is now in my little chapel at 8, Bosepara Lane, Baghbazar, Calcutta. *When the Bose Institute was founded, Sir J. C. Bose asked me to put some of her ashes there. At the base of the fountain I put a little box containing Nivedita's ashes, just where the bas-relief of Sister Nivedita has been placed. Except Lady Bose no one else knew it.*" (বক্রলিপি লেখককৃত)

দ্বারপ্রান্তে নিবেদিতার যে মূর্তিটি স্থাপন করেছিলেন, তার নাম 'লেডি অব দি ল্যাম্প', অর্থাৎ দীপরূপিণী ; মন্দিরপথে দীপধারিণী তো নিশ্চয়ই। নিবেদিতাই বিজ্ঞানমন্দিরের আলোকদূতী—নীরব নমস্কারের সঙ্গে সেই স্বীকৃতিটুকু আচার্য বসু প্রবেশপথেই নিবেদন করলেন। অথচ নিবেদিতার নাম সেখানে নেই। এর থেকে সুগভীর সুগম্ভীর শ্রদ্ধানিবেদন অল্পই সম্ভব।

মূর্তিটি যে নিবেদিতার, একথা বসু বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন সম্বন্ধে যে-কটি বিবরণী দেখেছি, কোথাও চোখে পড়েনি। মিসেস উইলসনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠি তো সাধারণের জানার কথা নয়। বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার তিন বৎসরের মধ্যে ডঃ বসুর যে-জীবনী অধ্যাপক গেডিস লেখেন, তার মধ্যে স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখা গেল। তিনি লিখেছিলেন—

"Her (Nivedita's) fervid faith in the long-dreamed of Research Institute, its possibilities for science and its promise for India, was no small impulse and encouragement towards its realisation ; and thus is explained the memorial fountain with its bas-relief of 'Woman carrying light to the Temple' which adorns the entrance of his Institute."[2]

নিবেদিতার স্বপ্ন বোধহয় বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিটি পাথরে মিশে ছিল। সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে বিজ্ঞানমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। বিস্তৃত সভাগৃহটি 'অজন্তার স্মারক', ছাতের বিশাল পদ্ম অজন্তার থেকেই অনুকৃত।

সভাগৃহের এক মুখ্য আকর্ষণ নন্দলাল বসুর অসাধারণ রূপক চিত্রটি, যার নাম 'অন্বেষণ'। তাতে দেখা যায়—পবিত্র নদীমুখ থেকে সূর্যোদয়ে যাত্রা করেছে ঋজু প্রখর-আকার 'জ্ঞান', যে-অসি দিয়ে পথ পরিষ্কার করে অগ্রসর হবে তার শাণিত অগ্রভাগ সে স্পর্শ করে আছে; এই দুঃসাহসী যাত্রায় তার বধূ-সঙ্গিনী 'কল্পনা' বাঁশি বাজিয়ে সুরের প্রেরণা ছড়িয়ে দিচ্ছে মনে। সভাগৃহের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ব্রোঞ্জ, রৌপ্য ও স্বর্ণ-নির্মিত একটি সুমহান মূর্তি—সূর্যদেবের—রথে করে তিনি চলেছেন তিমিরহরণ ও আলোকবর্ষণের নিত্য যাত্রায়।

ভারতরসের মধ্যে সঞ্জীবিত আচার্য বসুর কল্পনার সঙ্গে ভারত-শিল্পের একালের ধাত্রী-জননী নিবেদিতার কল্পনা এই মন্দিরসজ্জার পরিকল্পনায় মিশ্রিত ছিল বুঝতে অসুবিধা হয় না।[৩]

বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন সকলের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করেছিলেন, তখন সেই প্রৌঢ় মহাবিজ্ঞানীর হৃদয় কী অসীম আবেগে আলোড়িত হয়েছিল, তা কোনো কল্পনাতেই ধরা দেবে না। সিদ্ধির আনন্দ, সিদ্ধির বিষাদ নিশ্চয় মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল, জীবিত কণ্ঠের মঙ্গলাচরণের মধ্যে, তিনি নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন, মিশে গেছে লোকান্তরগত আত্মার অন্তহীন আশ্বাস-নিঃশ্বাস। আচার্য যখন প্রবেশ করছিলেন, তাঁর অঙ্গে ছিল শুভ্র উত্তরীয়ের বর্ম, বহু যুদ্ধের বহু আঘাতেও যা অটুট, কিন্তু বর্মতলে ঢাকা ছিল কত রক্তচিহ্ন! এবং পায়ের তলায় কত ক্ষুদ্র কণ্টক! সদ্য বিঁধেছে তেমন একটি কণ্টকের কথা আমরা জানি।

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনের আয়োজন যখন সম্পূর্ণপ্রায়, দেশের মানুষ এবং পত্রপত্রিকাগুলি যখন একত্র হয়ে আচার্যকে অভিবাদন জানাচ্ছে, ঠিক সেই সময়টিতে 'বাঙালী পদার্থবিদ্' নামের অন্তরালবাসী কোনো এক ব্যক্তি দেশের প্রধান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র স্টেটসম্যানকে বেছে নিলে আচার্য বসুর বিরুদ্ধে বিষোদগারের ক্ষেত্ররূপে। ঘৃণা, ঈর্ষা, ও পরশ্রীকাতরতার তেমন দৃষ্টান্ত অল্পই মিলবে। প্রশংসনীয় সময়জ্ঞান সেই 'বাঙালী পদার্থবিদ্'-এর যিনি বীরের করায়ত্ত অমৃতভাণ্ড ওষ্ঠাগ্রে তোলার ক্ষণটিকে বেছে নিয়েছিলেন বিষক্ষেপ করবার জন্য।*[৪] এমন আঘাত জগদীশচন্দ্র পূর্বে অনেক পেয়েছেন, তবু স্বদেশে স্বদেশবাসীর (?) কাছ থেকে এই বিদ্বেষ-দংশন মনে হয় তাঁর অসীম সহ্যশক্তিকেও বিদীর্ণ করেছিল, নচেৎ কেন তাঁর উদ্বোধন-ভাষণের বৃহৎ অংশ জুড়ে প্রতিকূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বীরপ্রাণকে আহ্বান করা থাকবে, কেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে নানা চক্রান্তের কাহিনী জানাবেন, এই সিদ্ধির সিদ্ধিপূজার ক্ষণে। আচার্য বলেছিলেন—

"কী সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার সমস্ত জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না। যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু যাঁহারা কর্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।"

নিজের বিরুদ্ধে কিছু চক্রান্ত-কথা জানানর পরে আচার্য বলেছিলেন—

"এইসকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর; বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।"

মানুষ নীচ, আচার্য তা বহু জেনেছেন। আবার মানুষ মহৎ, তাও জেনেছেন কখনো কখনো। তেমনি একটি দৃষ্টান্ত এই ভাষণে না দিয়ে পারেন নি। 'বর্তমান উদ্ভিদ বিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপ্‌জিগের জার্মান অধ্যাপক ফেরারের অর্ধ-শতাব্দীর অসীম কৃতিত্বের ফল।' কিন্তু জগদীশচন্দ্রের 'কোনো কোনো আবিষ্ক্রিয়া' যেহেতু ফেরারের 'কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে', সেই কারণে জার্মানী ভ্রমণকালে সংকোচবশে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক ফেরারকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ফেরারের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কিন্তু অযাচিতভাবে জগদীশচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছিল। অভিভূত কণ্ঠে আচার্য বসু এই ভাষণে বলেছিলেন—

"ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এ বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের।"

বিজ্ঞানের জন্য অর্থসংগ্রহের পিছনে অর্থলোভ আছে এই নীচ সন্দেহের সুমহান উত্তর আচার্য দিলেন—

"সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে।......এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার......জগতের সম্পত্তি হইবে, এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোনো পেটেন্ট লওয়া হইবে না, কারণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থ-লাভের উপায় নহে।"[৫]

বিজ্ঞানমন্দির যে সত্যই মন্দির, প্রতিষ্ঠাভাষণের সূচনায় আচার্য বসু সঘন কণ্ঠে তা নিবেদন করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গের ব্রত তিনি নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন—

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। **আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।"**

'মন্দিরের' কথা বলেছিলেন একালের আচার্য, কণ্ঠে ছিল প্রাচীন ভারতীয় আচার্যদের ভাষাভঙ্গি। তিনি 'দেবতার' কথা বলেছিলেন, 'আরাধ্যা দেবীর' কথাও।

ভাষণের শেষাংশে ছিল বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'রই প্রতিধ্বনি। সমস্ত ভাষণটিতে ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির প্রগাঢ় মুদ্রণ।*৬

'বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠার তাম্রলিপি' ছিল নিম্নরকম—

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম।
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪

আচার্য বসু ভারতের গৌরবকে নিজ সাধনার ধন করেছিলেন, প্রতিষ্ঠাভাষণে তা না জানিয়ে পারেন নি :

"ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্রনির্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে নাই, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি। সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল।"

প্রতিষ্ঠাভাষণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে মাত্র একজনের স্পষ্ট উল্লেখ আচার্য বসু করেছিলেন। পিতার বৃহৎ বিফল সংগ্রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদিতা হয়েছিল। বাকি কারো কারো কথা আভাসে বলেছিলেন ; যেমন নিজের ধর্মপত্নীর কথা :

"আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যে বহুদিন অটল রহিয়াছে।"

এর পরে যা বলেছিলেন, সে কথাগুলি প্রাধানতঃ নিবেদিতার (কিছুটা মিসেস ওলি বুলের) সম্বন্ধে তাতে সন্দেহ নেই :

"বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।"*৭

নিবেদিতা বা মিসেস বুলের নাম না করতে জগদীশচন্দ্রকে কতখানি আত্মশাসন করতে হয়েছিল, ভাবতেও স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। যথার্থ ভক্তি কখনও প্রগল্ভ হয় না।*৮

এই প্রায় আত্মগত স্মরণ-মননেই নয়, নিবেদিতার উদ্দেশে জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, যখন তিনি বিজ্ঞানমন্দিরের 'পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন' এবং মন্দিরগাত্রে সন্নিবিষ্ট অর্ধ-আমলক চিহ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। বজ্রচিহ্নকে নিবেদিতা বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, তার পটভূমিকা ভবিষ্যতে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে উপস্থিত করব। অশোকের অর্ধ-আমলক কাহিনীর প্রতি নিবেদিতার অনুরক্তির সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ এ-পর্যন্ত আবিষ্কার করে উঠতে না পারলেও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির এই একান্ত অনুরাগিণী নারী ঐ সুন্দর কাহিনীর বিষয়ে অনবহিত ছিলেন মনে হয় না, এবং কোনো সুন্দর বস্তুর প্রতি নিবেদিতার মনোযোগের অর্থ তাঁর সন্নিকটের মানুষদের সে বিষয়ে আবশ্যিক মনোযোগ, আশা করি নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে পরিচিতজন মাত্রেই তা স্বীকার করবেন। আর যদি এই কাহিনীর প্রতি প্রীতি আচার্যের ব্যক্তিগতই হয়, কিছু এসে যায় না, কাহিনীর অন্তর্গত সত্যবস্তু নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র, উভয়ের জীবনেই প্রতিফলিত হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হইয়া থাকে দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব।"

এই উদার বৈরাগ্য, ভাষণশেষে অসাধারণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের ভাষা নিতান্ত সরল, সে সরলতা সত্য-সঞ্জাত ; তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলিতে তাঁহার অব্যাহত আত্মা ধ্বনিময়। সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করেই প্রসঙ্গ শেষ করব :

"জীবন আঘাতেরই ক্রিয়া।......আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হয়।...... (কিন্তু) একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে। তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে আর উঠিবে না।......ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা।......

কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানবচিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্য জ্ঞান প্রচারদ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলকমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে-দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া

থাকে।*[১] আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্ধ আমলক মাত্র ; কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনর্বার কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্য দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নয়, হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে, এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তারপর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্য দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।"

---

[১] অধ্যাপক গেডিস তাঁর বসু-জীবনীতে লিখেছেন, ১৮৯৬ সালে ইংলণ্ডে প্রথম স্বীকৃতি পাবার পরে ডঃ বসুর মনে বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের কল্পনা জাগে। গবেষণার যে-অসুবিধা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, অন্য অনুসন্ধিৎসুদের যাতে সে কষ্ট ভোগ করতে না হয়, সেজন্য এই পরিকল্পনা। 'কিন্তু তাঁর এই ভিশন্, যা তখন স্বপ্নমাত্র, তার জন্য অপরের দ্বারস্থ হতে তাঁর গর্বিত স্বভাবে বেধেছিল। যা কিছু করতে হবে, নিজেই করবেন, নিজে ঝুঁকি নিয়ে।' এইজন্য তাঁর পত্নী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করে টাকা জমিয়েছেন। 'এই সময় থেকে পরবর্তী ২৫ বৎসর এই লক্ষ্য সিদ্ধিতেই তাঁর (ডঃ বসুর) মনপ্রাণ নিয়োজিত হয়েছিল।'

[২] অধ্যাপক গেডিস আচার্য বসুর বন্ধুগণের পরিচয় দিতে গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে বন্ধুত্বকে সমুচ্চে স্থাপন করেছেন :

"Latest among these friendships, but in some ways of the very highest importance, came that with Margaret Noble, better known as Sister Nivedita."

নিবেদিতার মনের ব্যাপ্তি ও কর্মক্ষমতা অসাধারণ ছিল বলে শিক্ষামূলক ও সামাজিক অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের কাজকেও গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল, এবং তিনি মনে করতেন, ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সহায়তা ক'রে ভারতীয় বিজ্ঞানের জাগরণের কাজ করছেন,—এইসব কথা বলার পরে অধ্যাপক গেডিস জানিয়েছেন, সংকটকালে নিবেদিতা ডঃ বসুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিবেদিতা চরিত্র-মহিমার কথা জানাতে গিয়ে অধ্যাপক গেডিস লেডী বসু এবং এস, কে, র‍্যাটক্লিফের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। র‍্যাটক্লিফ বলেছেন—"যাঁদের উপর তিনি তাঁর বন্ধুত্বের মহাসম্পদ অর্পণ করেছেন, তাঁরা সেই স্মৃতিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ আশীর্বাদ বলে মনে করেন।" আর, লেডী বসু 'ন্যায়ের শুভ্র দ্যুতিকে' নমস্কার জানিয়েছেন।

অধ্যাপক গেডিসের কথাগুলির উপর বিশেষ মূল্য আরোপ করছি, কারণ, প্রথমতঃ, নিশ্চয়ই ডঃ বসুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি লিখেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত-ভাবে নিবেদিতাকে জানতেন। নিবেদিতার সঙ্গে এই বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকের সম্পর্কের বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। এখানে এইটুকু বলতে চাই—গেডিসের বসু-জীবনীতে নিবেদিতার চরিত্রের প্রতি যে ধরনের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, সেরকম অন্য কারো বিষয়ে করা হয়নি।

[৩] বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে যে-সব বিবরণ বেরিয়েছিল, তার মধ্যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার বিবরণই নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। ১ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে প্রকাশিত সুদীর্ঘ এই বিবরণের সূচনায় এই বিজ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকে ভারতীয় বিজ্ঞান এবং বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে আখ্যাত করা হয়। স্থাপত্য ও অলঙ্করণের প্রভূত প্রশংসার পরে বলা হয়, যিনি এর কল্পনা করেছেন তিনি বিজ্ঞানী নিশ্চয়, কিন্তু সেইসঙ্গে কবি ও শিল্পীও বটেন। রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"It is a magnificent edifice that has reared in Upper Circular Road, built entirely of stone, expressing fine artistic design....... Yesterday a Temple of scientific learning was opened in that beautiful and massive building, which posterity will cherish with reverence as associated with the honoured name of Sir Jagadish Chunder Bose, the prince of Physicists of modern times. It will be regarded as an accession to the beauty and grandeur of the City of Palaces.........The design of the edifice which owes its inception to the imaginative insight of Sir J. C. Bose, shows him at once in the role of a great poet and artist......All the details of the building have been worked with a scrupulous regard for the fitting and the beautiful,...... thereby truly realising the dictum of Socrates. The decorations are again symbolic, reminiscent of old world grandeur and solemnity.........The whole institution represents the working of a virile mind in its scientific, artistic and spiritual aspects, Science and Art thus converging to serve the highest spiritual purposes."

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের স্থাপনা ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, একথা কেবল বাঙালী জাতীয়তাবাদী 'বেঙ্গলী'তেই লেখা হয়নি, বিখ্যাত বিলেতী সংবাদপত্রসমূহেও লেখা হয়েছিল। এক বিরাট রচনায় 'টাইমস' যা লেখে তার দু'এক লাইন—

"To bringing about the scientific renaissance (of India) Sir Jagadis has influentially contributed. Indians are justly proud of the possession of a few men who gained world-wide reputation in their particular fields of activity......In this (scientific) field there is no fundamental difference between the Western and Eastern mind as was assumed when Sir Jagadis began his work. It may be, as one writer said, that the bent of research and the colour of theories will take something from the inherent qualities of the Indian mind; but the faith in ascertainable truths and the appeal to facts can underline that research and those theories equally well in India and in Europe."

Athenaeum পত্রিকা স্পষ্ট ভাষায় লেখে—

"The foundation of an Institute for research in pure science is an event in the history of India. The publication of the Transactions, and first fruits of its activity, shows that it is an event also in the history of science."

৪ স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৭ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে 'এ বেঙ্গলী ফিজিসিস্ট' নাম দিয়ে এক ব্যক্তি এক পত্র লেখেন। পত্রের উদ্দেশ্য ২৫ নভেম্বর তারিখে বেঙ্গলী পত্রিকায় ডঃ বসুর উপর প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ। বেঙ্গলী পত্রিকার রচনাটিতে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করে বলা হয়েছিল, "পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে তা নূতন পথ উন্মোচন করেছে" ইত্যাদি। সেইসঙ্গে ডঃ বসুর গবেষণাগারকে সাহায্য করার আবেদন জানানো হয়েছিল। স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'বাঙালী পদার্থবিদ্' বলেন, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নূতন পথ উন্মোচনের দাবি ভিত্তিহীন; ডঃ বসু ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, হাইনরিখ হর্টসের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। রেডিও-টেলিগ্রাফের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় সমুদয় গৌরব মার্কনির উপরে আরোপ করে ইনি লেখেন—

"Prof. Bose was only one of the many physicists who were attracted to the study of the subject by the discoveries of Hertz, and while some of his laboratory experiments with waves of very short wave length were undoubtedly interesting, it is incorrect to say that his work opened out any essentially new path in physical science."

এইসব কথাও যথেষ্ট অপমানসূচক মনে হয়নি। ইনি অধিকন্তু জানিয়েছিলেন, ডঃ বসুর কোনো ছাত্র বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক পেপার করতে পারেননি।

দুদিন পরে উক্ত পত্রলেখক স্টেটসম্যানে একই বিষয়ে আরও একটি চিঠি লিখলেন। তাতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের উপরে এক হাত নিয়ে পত্রলেখক জানালেন, দেশীয় কাগজগুলির অভ্যাস, সমস্ত ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক বা আধা-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতকগুলি জিনিসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে, সরকারের কাছ থেকে অকারণে টাকা আদায়ের ফিকির করা। এক্ষেত্রে ডঃ বসুর কাজকর্মকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ফাঁপানো হয়েছে। পত্রলেখকের উদ্দেশ্য, ফাঁপানোকে ফাঁসানো।—

"Prof. Bose's work has been so used and it is so frequently written upon in extravagant language in your contemporaries that I think it would be useful for once to reduce it to its proper dimensions."

এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রথমেই জানালেন, ইউরোপীয় মাপকাঠিতে ডঃ বসু প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নন। বলার হেতু? ডঃ বসুকে কোনো বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ দেওয়া হয়নি, সম্মানসূচক উপাধি, বা অ্যাকাডেমিক প্রাইজ পাননি, যদিও নিজের বৈজ্ঞানিক কাজগুলিকে অপরের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য বারবার তিনি পাশ্চাত্ত্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর এক্সপেরিমেন্টগুলি বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল, এসব কথা একেবারেই বাজে, তাঁরা ভদ্রতার হাততালি দিয়েছিলেন মাত্র। যে রয়াল সোসাইটিতে ৫০০ সদস্য, সেখানেও তাঁকে সদস্য করা হয়নি, যদিও বারবার তার প্রার্থী তিনি ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে ডঃ বসুর কাজে গণিত প্রতিভার কোনো ছাপ নেই, যা এইজাতীয় সেরা কাজে অবশ্যই থাকে। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত বা যুক্তিতে একটি নিতান্ত বদ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই তিনি লাফ মারেন, ফলে সিদ্ধান্ত সন্দেহজনক হয়। তার প্রমাণ, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'প্ল্যান্ট' ও তাদের 'নার্ভাস সিস্টেমে'র উপর সর্বশেষ রচনায় ডঃ বসুর নামোচ্চারণ পর্যন্ত করা হয়নি। পত্রলেখক পুনশ্চ জানালেন, ডঃ বসুর অধীনস্থ গবেষকেরা কোনো উল্লেখযোগ্য পেপার প্রকাশ করতে পারেননি, এটা তাঁর অযোগ্যতার আর একটি প্রমাণ।

ডঃ বসু নিজে বাদ-প্রতিবাদে পারঙ্গম নন, এবং 'বসু সমর' করবার জন্য (হায়, এবার গৃহযুদ্ধ!) কোনো নিবেদিতা ধরাধামে বর্তমান নেই, অগত্যা আহত ও লজ্জিত হারিতকৃষ্ণ দেব এগিয়ে এলেন। স্টেটসম্যানে ১ ডিসেম্বর তাঁর যে পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখতে পাই, ডঃ বসুকে খাটো করার এই চেষ্টার মূল কারণ স্পষ্টভাবেই লিখেছেন, তা আর কিছু নয়, প্রফেশনাল জেলাসি। তাছাড়া পদার্থবিদের পক্ষে সাধারণভাবে প্ল্যান্ট ফিজিয়লজি'র উপরে গবেষণাকে তারিফ করাও সম্ভব নয়। যেমন ডঃ বসু নিজে পদার্থবিজ্ঞানী বলে একদা তাঁর গবেষণাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন শারীরতাত্ত্বিকেরা। বিজ্ঞানী মহলে ডঃ বসুর আবিষ্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, ও তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নন,— তার জবাবে ইনি লেখেন :

'This however proves nothing more than that the Royal Society is slow to accept far-reaching ideas.'

হারিতকৃষ্ণ তির্যক বিদ্রূপের সঙ্গে লেখেন—'সেখানকার অধিকাংশ ফিজিয়লজিস্ট মনে করেন ডঃ বসু নিছক ফিজিসিস্ট, এবং বাঙালী ফিজিসিস্ট, অতএব তাঁরা প্ল্যান্ট ফিজিয়লজির বিষয়ে তাঁর মত মানতে পারেন না। ইউরোপের বিজ্ঞান-পণ্ডিতদের মধ্যে এক ধরনের জাতিভেদ রয়ে গেছে।' এনসাইক্লোপিডিয়ায় ডঃ বসুর অনুল্লেখের প্রসঙ্গে ইনি জানান, ঐ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১০ সালে, আর ডঃ বসুর শেষ কাজ 'রিসার্চেস্ অন দি ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্টস্' বেরিয়েছে ১৯১৩ সালে, যার মধ্যে সূক্ষ্মতর যন্ত্র-

পাতির সাহায্যে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তকে অখণ্ডভাবে প্রমাণ করেছেন, স্থূলতর যন্ত্রপাতির দ্বারা আগে তা করা হয়েছিল বলে গৃহীত হয়নি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের উপর ডঃ বসুর কাজ এনসাইক্লোপিডিয়ায় বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এই তথ্য পরিবেশন করে শীতলভাবে হারিতকৃষ্ণ বলেছেন, এ ব্যাপারটি 'বাঙালী পদার্থবিদে'র কাছে উপভোগ্য মনে হয়নি বলেই তিনি এড়িয়ে গেছেন। ডঃ বসু ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি., সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছেন, আরও গৌণ বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন, একথা অধিকন্তু হারিতকৃষ্ণ জানিয়েছেন। বাঙালী পদার্থবিজ্ঞানীর অবগতির জন্য তিনি আরও জানিয়েছিলেন, তিনি ডঃ বসুর ছাত্র বা ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নন। শেষের দিকে তিক্ত বিষাদের সঙ্গে ইনি লেখেন, প্রফেট নিজ দেশে সম্মানিত হন না, এবং 'বাংলা দেশে প্রফেট যাতে কখনো সম্মানিত না হন, তার ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি!'

'বাঙালী পদার্থবিদ্' নাছোড় পত্রলেখক। অপরকে লাঞ্ছিত করবার জন্য বিদ্বিষ্ট মনে যে ব্যক্তি কাজ শুরু করে, সে মধ্যপথে থেমে যায় না। বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের সঙ্ঘবদ্ধ বাধার বিরুদ্ধে ডঃ বসুকে কিভাবে সংগ্রাম করে পথ কেটে এগোতে হয়েছে, সে ইতিহাস এই ব্যক্তির জানার কথা নয়, কারণ জানার ইচ্ছা নেই। জানলেও ভুলতে বাধা নেই। অতএব ৪ ডিসেম্বর তারিখে এঁর যে উত্তর বেরুল, তাতে দেখা গেল, 'ইলেকট্রো ফিজিয়লজি' গ্রন্থের উপরে 'নেচার' পত্রিকার কদর্য সমালোচনাটিকে ইনি সুখের সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, (নিবেদিতার পত্রে যার উল্লেখ আগে দেখে এসেছি); জানা গেল, মাঝারি বুদ্ধিমান ছোকরারা ডি. এস. সি. উপাধি পায়, এবং সরকার স্যার উপাধি দেয় নানা অতিরিক্ত কারণে। ইনি উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, নাইটহুডের মূল্য নেই যথার্থ বৈজ্ঞানিকের কাছে, আসল জিনিস সমস্তরের বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি।

যতদূর দেখেছি, হারিতকৃষ্ণ উত্তর দেননি। বলাবাহুল্য গালাগালির জন্য গালাগালির আসরে নামতে তাঁর রুচিতে বেধেছিল। উত্তর কিন্তু এসেছিল, কিছুদিনের মধ্যে, 'বাঙালী পদার্থবিদের' পক্ষে বড় অসুখকর সেই উত্তর। প্রথমতঃ অ্যাবার্ডিন ইউনিভার্সিটি ডঃ বসুকে সম্মানসূচক এল এল ডি উপাধি দিল; তার পরে ১৯২০ সালে রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো করে নিল, যে-সম্মানকে 'বাঙালী পদার্থবিদ' প্রার্থিত বলেও লঘু করে দেখানর চেষ্টা করেছেন ('যে রয়াল সোসাইটিতে ৫০০ সদস্য আছে'), যদিও বিখ্যাত প্যাট্রিক গেডিসের মতে :

"The honour recognised by men of science throughout the British Dominions as the proudest of all is the award of the fellowship of the Royal Society."

এই সম্মান পাবার জন্য ডঃ বসুকে যুদ্ধসমাপ্ত ইংলণ্ডে ১৯১৯-এর মাঝামাঝি পুনর্বার যাত্রা করতে হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড যাত্রায় সকলেই তাঁকে নিষেধ করেছিল, কিন্তু সংগ্রামী জগদীশচন্দ্র সন্দেহের উপরে সত্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর। এই ভ্রমণে অসাধারণ সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হয়। বড় বৈজ্ঞানিক হবার পক্ষে যা যা প্রয়োজনীয় বলে 'বাঙালী পদার্থবিদ্' জানিয়েছিলেন, সবই তিনি পেয়েছিলেন। রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো করেছিল পদার্থবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান, উভয় বিজ্ঞানে দানের জন্যই। মহাভারতের ভক্ত আচার্য জগদীশের মহাকাব্যিক বিজয় এটি। ১৯ বছর আগে রয়াল সোসাইটি যাঁর পেপার প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই পেপারের প্রতিপাদ্যকে সসম্মানে সে বরণ করল মধ্যবর্তী বছরগুলিতে ডঃ বসুর ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলে। অধ্যাপক গেডিস জানিয়েছেন, যে-সব বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের স্বীকৃত রাজপথ দিয়ে হাঁটেন, দ্রুত সম্মান তাঁরা পেয়ে যান; সে সম্মান সবচেয়ে বিলম্বে সবচেয়ে কঠিন পথ বেয়ে আসে ডঃ বসুর মত মানুষের কাছে :

"Who find themselves impelled over the frontiers as drawn, moving among the conceptions of different sciences and pursuing experiments in territory where, inevitably, they are looked upon as intruders."

এ লেখা হারিতকৃষ্ণের নয় (যাঁর বিষয়ে 'বাঙালী পদার্থবিদ্' বলেছিলেন, তুমি কে হে বাপু, বিজ্ঞানী তো নও!), স্বয়ং প্যাট্রিক গেডিসের।

জগদীশচন্দ্রই ভারতবর্ষে প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এফ, আর, এস্ হলেন, একথা টাইমস লিখেছিল; এর আগে শ্রীনিবাস রামানুজম্ এফ, আর, এস্, হয়েছিলেন গাণিতিক গবেষণার জন্য। আচার্য বসুর সুদীর্ঘ সাধনার প্রশংসা করার পরে টাইমস অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই স্বজাতি-সমর্থনে লেখে, এঁকে সম্মানিত করতে এত যে বিলম্ব হল, এর মূলে কোনো জাতি-প্রশ্ন নেই। টাইমস্ প্রভৃতি পত্রিকার এইসব প্রশংসাবাণীর পিছনে বৃহৎ বৈজ্ঞানিকদের সমর্থন ছিল। অধ্যাপক জে আর্থার টমসনের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিখেছিলেন—

"It is in accordance with the genius of India that the investigator should press further towards unity than we have yet hinted at, should seek to correlate responses and memory impressions in the living with their analogous in organic matter, and should see in anticipation the lines of Physics, of Physiology and of Psychology converging and meeting. These are questionings of a prince of experimenters whom we are proud to welcome in our midst to-day."

আমাদের পূর্বপরিচিত অধ্যাপক ওয়েলারের (যিনি 'বাঙালী পদার্থবিদে'র ভাব-পিতা) পক্ষে এসবই মর্মান্তিক মনে হয়েছিল। টাইমস্ পত্রিকায় পত্রযোগে তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন, নিজের ভিন্ন অন্য ল্যাবরেটরীতে ডঃ বসু নিজের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করুন! ডঃ বসু তা গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরীতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতে ২৩ এপ্রিল, ১৯২০ তারিখে যে পরীক্ষা দেখান তাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে লর্ড র‍্যালে, অধ্যাপক বেলিস্, ডি, এইচ ব্ল্যাকম্যান, এ জে, ক্লার্ক, ডবলিউ সি ক্লিনটন, এফ জি ডোনান টাইমস্ পত্রিকায় ৪ মে তারিখে লেখেন—

"We are satisfied that the growth of plant tissue is correctly recorded by this instrument, and at a magnification of from one million to ten million times."

জগদীশচন্দ্রের চিরশত্রু 'নেচার' পত্রিকাতেও এই অংশটি উদ্ধৃত হয়েছিল, শুধু তাই নয়, সেখানে আরও লেখা হয়েছিল—

"Sir W. H. Bragg and Professor F. W. Oliver, who have seen similar demonstrations elsewhere, give like testimony that the crescograph shows actual response of living plant tissues to stimulus."

যুদ্ধজয়ী মহাবীর সম্ভ্রম-আকর্ষক একটি পত্র লিখলেন ৫ মে'র টাইমস্ পত্রিকায়—

"যে-সব সমালোচনা ন্যায়বোধকে লঙ্ঘন করে তা জ্ঞানের বিস্তারের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-স্বরূপ। আমার অনুসন্ধানকার্যের বিশেষ প্রকৃতি স্বতঃই অসাধারণ সব বিঘ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, গত কুড়ি বছরে এইসব অসুবিধা বহুলাংশে স্ফীত হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ব্যাখ্যা এবং আরও মন্দ নানা চেষ্টার দ্বারা।... আমার পথে যে-সব বাধাকে ইচ্ছাপূর্বক স্থাপন করা হয়েছিল, এখন তাদের উপেক্ষা করতে পারি, বিস্মৃত হতে পারি। যদি আমার গবেষণাফল কোনো বিশেষ থিয়োরীকে উলটে দিয়ে এখানে ওখানে কোনো কোনো ব্যক্তিকে শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ করে, তার যথেষ্ট ক্ষতি-পূরণ কিন্তু হয়েছে এদেশের বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া উত্তপ্ত অভ্যর্থনায়।"

ঠিক এই সিদ্ধিক্ষণে যিনি সবচেয়ে আনন্দিত হতেন, তিনি মরজীবনে ছিলেন না। জগদীশচন্দ্রকে তাই বিশ্বাস করতে হয়েছিল, নিবেদিতার বোনকে তিনি সেকথা

লিখেছিলেন—"যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি, সকলে বলছে কোনো একা মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব,—তাহলে সে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।"

*৫ জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য ১১ লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ভারত সরকার বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। জীবিতকালে তিনি ১২ লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড তৈরী করে যান। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী বাকি সম্পত্তির সাহায্যে তিন লক্ষাধিক টাকার আর একটি ট্রাস্ট স্থাপন করেন। অর্থসংগ্রহে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বের বিষয়ে তাঁর মৃত্যুর পরে স্মৃতি-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"...অবশেষে ঐশ্বর্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হতে পারল।...কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধকরি ভারতবর্ষে আর কখনো পায়নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্তই আপন লোক-বিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেননি। লক্ষ্মীর...আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।"

এ-সবই আচার্যের নিষ্কাম কর্ম, বিজ্ঞান-দেবতাকে হৃদয়ে রেখে যা তিনি করেছিলেন।

*৬ আমি এখানে প্রবাসীর পৌষ, ১৩২৪ সংখ্যায় মুদ্রিত 'জগদীশচন্দ্রের নিবেদন'-এর উপর নির্ভর করেই একথা বলছি। ইংরাজী ভাষণে কিন্তু এই ধরনের কথা বর্জিত। আন্তর্জাতিক প্রচারের জন্য যা মুদ্রিত হয়েছে, তার উপর থেকে একান্ত জাতীয় সংস্কৃতির ছাপ ডঃ বসু মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন মনে হয়। বাংলা ভাষণটি জগদীশচন্দ্রেরই রচনা, কারণ তাঁর ভাষাভঙ্গিতে এটি রচিত; এবং ইংরাজীর সঙ্গে বাংলা ভাষণের কোনো কোনো স্থানে এতই তফাত যে, সে-রকম স্বাধীনতা অনুবাদকের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

*৭ "In all my struggling efforts I have not been altogether solitary; while the world doubted, there had been a few, now in the City of Silence, who never wavered in their trust."

*৮ এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত করা হয়নি। জানিনা তার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীমহলে কোনো গুঞ্জন উঠেছিল কিনা! বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত গেডিসের বসু-জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের বিশেষ উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথকে ডঃ বসুর পুরুষ বন্ধুদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে ("Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest has been that with the Poet Rabindranath Tagore") আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে উভয়ের পারস্পরিক সহায়তার বিষয়ে অধ্যাপক গেডিস যা বলেছেন, তাতে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রচারে ডঃ বসুর প্রয়াসের অপেক্ষাকৃত অধিক বিবরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অপর পক্ষে বাংলা দেশে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও সাধনাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টাই শুধু করেননি, অর্থসাহায্য সংগ্রহেরও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, সে বিষয়ে তথ্য আমরা দিয়ে এসেছি। তাই মনে হয়, এই প্রসঙ্গে গেডিসের রচনাংশটুকু রবীন্দ্র-মহলকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করেনি। সে কারণেই কিনা জানি না, নিজের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে ভাষণ দিতে উঠে আচার্য বসু জীবিত সহায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের সর্বাধিক উল্লেখ করেছিলেন। বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাভাষণে জগদীশচন্দ্র লোকান্তরিত কয়েকজনের বিশ্বাস ও সাহায্যের প্রতি যে-ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, জীবিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই ভাষাই ব্যবহার করলেন:

"In all my efforts I have not altogether been alone. In days of our common insecurity my life-long friend Rabindra Nath Tagore was with me. Even in those doubtful days his faith never faltered."

(Amrita Bazar Patrika, Dec. 2, 1928)

আচার্য বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। এর সংগঠনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বৃহৎ ভূমিকা ছিল, যিনি আচার্য বসুর ছাত্র, এবং জগদীশ-চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনার প্রথম পর্ব থেকেই প্রবাসী ও পরে মডার্ন রিভিউ মারফত আচার্যের কীর্তি-কথা প্রচার করে এসেছেন। আচার্য বসুর প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষে অভিনন্দনপত্র পাঠ করতে উঠে তাঁর নিশ্চয় মনে হয়েছিল, এই অনুষ্ঠানে নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন অবশ্য-কর্তব্য। এখানে উল্লেখযোগ্য নিবেদিতার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যের তুলনায় নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে অধিক জানতেন। প্রবাসী পত্রিকায় পৌষ, ১৩৩৫ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' পাই—

"গত ১লা ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞানমন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।...আচার্য মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমাদের তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে বলা হয়। তাহা পড়িবার পর আমি মৌখিক কিছু বলিতে চাহিয়াছিলাম। তাহার তাৎপর্য এই :

"এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত কেহ হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে সেখান হইতে যোগ দিতেছেন। তিনি এই আশা পোষণ করিতেন, যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও অচিরে জগৎকে নূতন কিছু শিখাইবে। বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান-মন্দির তাঁহার জীবিতকালে নির্মিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেন যে, বসু বিজ্ঞানমন্দিরে নূতন জ্ঞানলাভার্থ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীর আগমন হইবে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। নিবেদিতার সহিত সমসাময়িক সমুদয় ভারতীয় মনীষীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে জানিয়া যেমন তিনি ভারতের প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছিলেন, ও ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য বসুকে জানিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তিনি উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন।"

এর পরে রামানন্দ সূচনাপর্বেই যাঁরা জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম করেন—রবীন্দ্রনাথের ও বিবেকানন্দের। "একত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ("বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে") সেটি, এবং "আর এক মনীষী" বিবেকানন্দের জগদীশ-প্রশস্তি (পূর্ব উদ্ধৃত) পাঠ করেন।

জগদীশচন্দ্রের আর্থিক সংকটের কালে রবীন্দ্রনাথ সাহায্যের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের জীবিতকালে তা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানি না, তবে ডঃ বসুর দেহত্যাগের পরে স্মৃতি-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা বিবৃত করেছিলেন। ঐ ভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে অথচ গভীরভাবে কিছু বলেন। তা এই—

"এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বভূমিকায়।"

*১ ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে নিবেদিতা যখন বজ্রচিহ্নটি আবিষ্কার করেছিলেন, তখনই কয়েকটি চিঠিতে বজ্রের তাৎপর্যের বিষয়ে লেখেন। তারপরে ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তার কিছু অংশ :

"দেবতারা চরম একটি দৈবাস্ত্র চাইছিলেন। তাঁরা জানলেন যে, যদি এমন কোনো মানুষ পাওয়া যায় যিনি স্বেচ্ছায় নিজের অস্থি দান করে দেবেন, তবেই ঐ অজেয় অস্ত্র নির্মিত হতে পারবে। তদনুযায়ী তাঁরা ঋষি দধীচির কাছে দল বেঁধে গিয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। বিদ্রূপের মত শোনালো তাঁদের কথাগুলি। মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষ সব কিছু, শেষ নিঃশ্বাস অবধি, দিতে পারে, কিন্তু তাই বলে নিজের শরীর দান—হোক না ইন্দ্রবজ্র নির্মাণের প্রয়োজন! দধীচির কাছে কিন্তু এটি মোটেই অসম্ভব ত্যাগ নয়। স্মিতহাস্যে দেবতাদের কথা শোনার পরে পরম আনন্দে উত্তর দিয়েছিলেন, সে উত্তর,

মুহূর্তে প্রাণত্যাগ, যার ফলে পড়ে রইল মানবতার প্রয়োজন সাধনের জন্য ঋষির সর্বোচ্চ দান।

এখানে তাহলে আমরা বজ্রের তাৎপর্য পেয়ে যাচ্ছি। স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র। সে-ই নিঃস্বার্থতার সাধনা আমাদের করতে হবে, যাতে দেবহস্তের বজ্র হয়ে উঠতে পারি। কিভাবে—সে প্রশ্ন আমাদের নয়। হিসাব-নিকাশও আমাদের জন্য নয়। আমাদের জন্য শুধু রয়েছে বেদীমূলে আত্মদান। বাকি কাজ করবেন দেবতারা। তাঁরাই বহন করেন আমাদের। বজ্র দুর্ভেদ্য নয়, দুর্ভেদ্য সেই হস্ত যা বজ্র ধারণ করে। মা! মা! আমাদের অহংকে দূর কর! যশের, লাভের, দেহসুখের আধিপত্য যেন আমাদের উপর না হয়! তুমি সূর্যকিরণ, আমরা যেন তোমার তাপে বিলুপ্ত হয়ে যাই।"

নির্দেশিকা

এই নির্দেশিকা দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিবেদিতা-সম্পর্কিত বিষয়, দ্বিতীয় ভাগে বর্ণানুক্রমিক সূচী। ব্যবহারের সুবিধার্থে নিবেদিতা-তথ্য, জীবন ও ব্যক্তিত্ব, পত্রাবলী, প্রসঙ্গ-আলোচনা, ভাষণ, রচনা, শোকবার্তা এবং শ্রদ্ধার্ঘ—এই সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের সর্বত্র, প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়। সে কারণে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ পৃষ্ঠানুযায়ী না করে কয়েকটি শ্রেণীতে বিবেকানন্দ-তথ্য দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ভাগে।

প্রচলিত রীতিঅনুযায়ী অভারতীয় ব্যক্তির নাম পদবী (সারনেম)-অনুসারে এবং ভারতীয় নাম ব্যক্তিনাম-অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নিবেদিতা-নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশিকা

এছাড়া আরো অজস্র সংবাদ, নিবেদিতার রচনার উৎকৃষ্ট বহু অনুবাদ। ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে হলে এই আকর গ্রন্থটি অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই গ্রন্থ ভাব ও চিন্তার নৈরাশ্যের ও নৈরাজ্যের যুগে চির আশাবাদী, চির সংগ্রামী এক প্রতিভাময়ী নারীর জীবনসাধনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে ভারতাত্মা ও বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগস্থাপনে সহায়তা করবে।

প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে :
স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস; নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ; বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজানা সংবাদ;

নব্যবঙ্গীয় চিত্রশিল্প আন্দোলনের ইতিহাস ও তাতে নিবেদিতার নেতৃত্ব;

ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণে নিবেদিতার বিখ্যাত গ্রন্থগুলির গুরুত্ব;

নারীশিক্ষা আন্দোলন ও সমাজসেবা আন্দোলনে নিবেদিতার কর্ম ও প্রেরণা;

ভারত ও পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রভূত সংবাদ;

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক;

সমসাময়িক সংবাদপত্রে নিবেদিতা-সংবাদ;

অজস্র দুর্লভ ঐতিহাসিক চিত্র।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু আধুনিক ভারতীয়
সংস্কৃতির ব্যাপক ইতিহাস রচনায়
নিযুক্ত। তারই কিছু সন্ধানফল
'বিশ্ববিবেক', যৌথ চেষ্টায় প্রস্তুত
'বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস'
এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র'
নামক গ্রন্থগুলিতে পরিবেশিত।
ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও সাহিত্যিক মননশীলতার
অপূর্ব সমন্বয়ের ফসল
তাঁর এই সর্বাধুনিক গ্রন্থ
'নিবেদিতা লোকমাতা' নিঃসন্দেহে
একটি কালজয়ী সৃষ্টি হিসাবে
সম্মান পাবার যোগ্য।